"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম

(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২৬ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

১৩২৬ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

চিত্র সূচী

৪৩শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩২৬ [১ম সংখ্যা

মিস্‌টিক কবি

আধুনিক কালে এক শ্রেণীর কবিদের Mystic Poets নাম দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বলা বাহুল্য, একটা-কিছু সাধারণ গুণ বা ধর্ম্ম এই সম্প্রদায়ের কবিদের মধ্যে লোকে লক্ষ্য করিয়াছে, এবং সেই জন্যই এই সাধারণ নামটি দিয়াছে। এখন, সে জিনিষটি কি? ইংরাজী 'মিস্‌টিক' কথার অর্থ গুহ্য, রহস্যপূর্ণ—যাহা অপরিচিত, দূরে-দূরে, সহজ সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায় না, নিত্যনৈমিত্তিক অনুভূতি-উপলব্ধির মধ্যে ধরা যায় না। ফলতঃ দেখি এই মিস্‌টিক কবিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে আধ্যাত্মিক বিষয়, ভিতরের অন্তরাত্মার কথা। স্থূল জগতের কর্ম্ম-জীবনের দিকে ইঁহারা দৃষ্টি দেন নাই, সাধারণ মানুষের সহজ-লক্ষ্য নিত্য-পরিচিত ভাবের বৃত্তির প্রেরণার ঘাত-প্রতিঘাত কিছু দেখান নাই, মানুষ তাহার মানবীয় প্রকৃতি লইয়া কি করিতেছে বা কি করিতে চায় সেটি তাঁহারা বিবেচনা-যোগ্য মনে করেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন, সূক্ষ্ম জগতের কথা, ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখী গতিকে টানিয়া ফিরাইয়া তাঁহারা অতীন্দ্রিয়ের দিকে চালাইয়া দিয়াছেন; মানুষের সহিত, প্রকৃতির সহিত তাঁহারা অশরীরী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে চাহিতেছেন আত্মাকে আত্মার ভিতর দিয়া, মানুষকে ভগবানের ভিতর দিয়া—ইহকে অমুত্রের আভায়, সান্তকে অনন্তের দ্যোতনায়।

সুতরাং এমন জিনিষকে, সাধারণ মানুষের কাছে যাহা কঠিন, দুর্ব্বোধ, গুহ্য, তাহাকে যে মিসটিক নাম দেওয়া হইবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। কারণ মানুষের পরিচয় বিশেষ ভাবে এই জগতের, স্থূলের, দেহের সঙ্গে।

তারপর অধ্যাত্মের কথা, সূক্ষ্মজগতের, ভাবলোকের বিষয় প্রাচ্যে যতখানি সাধারণের সম্পত্তি, ইউরোপে তেমন নয়। ইউরোপে যে এ-রকম কাব্যকে মিস্‌টিক বা রহস্যজনক বলিবে তাহা আশ্চর্য্যের নয়। ইউরোপ বেশীর ভাগ চিনে, জানে কর্ম্ম-জগতের কথা, ইহের এপারের যে সমস্ত অনুভব উপলব্ধি—ইউরোপের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ মনীষী কবি তাঁহারা এই সকলকেই ফলাইয়া দেখাইয়াছেন, মানুষের সহিত আর-এক জগতের সম্বন্ধের কথা তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্পলোকে এবং অল্পই বলিয়াছেন তাই না পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্য চিরদিন the Mystic Orient এই নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, mysticism হইতেছে যাহা realism, বাস্তবতা—তাহার বিপরীত। বাস্তব কথাটি এখানে একটু ব্যাপক অর্থেই লইতে হইবে। বাস্তব কেবল তাহাই নয়, যাহা একেবারে জড় বা স্থূল। প্রাণের আবেগ, মনের ভাব, বুদ্ধির চিন্তা—এ-সব জিনিষ সকলেরই সুপরিচিত, সাধারণ মানুষ ইহাদিগকেও বাস্তব বলিয়াই জানে, অনুভব করে। একিলিসের শৌর্য্য, রোমিও-জুলিয়েতের প্রেম, ইয়াগোর ঈর্ষা, রোদরিগের (Rodrigue) মর্য্যাদাভিমান, অথবা হোরাসের (Horace) স্বদেশপ্রীতি, নিসুস-ইউরিয়লের (Nisus and Euryalus) বন্ধুত্ব, রামের পিতৃভক্তি, সাবিত্রীর পাতিব্রত্য—এ সকলই মানুষের সাধারণ বৃত্তি, এ সকলই হইতেছে এ জগতের, ইহমুখী। ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, ওপারের কিছু নাই, তাই বাস্তব—অর্থাৎ মিস্‌টিক নয়। শুধু মানুষকে কেন, সৃষ্টিকে প্রকৃতিকেও এই বাস্তবতার দিক হইতে দেখা যাইতে পারে, খোলা চোখে সহজভাবে সকলে যেমন দেখে। শেক্সপীয়রের 'the floor of heaven inlaid with patines of bright gold,' কালিদাসের 'ভাগীরথী নির্ঝরসীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ' খুব স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সাধারণ কথাই কি নয়? এখানে দুর্লক্ষ্য প্রহেলিকা কিছু নাই, বাহিরের ছাপটি চোখের পর্দ্দার উপর যেমন পড়িয়াছে তাহারই আলেখ্যখানি ওপারের, ঠিক চোখে যাহা দেখা যায় না, এমন বাস্তবের অতীত জিনিষ কিছু পাই না—ইহা Realismই।

কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, ভগবৎ-কথা হইলেই যে তাহা মিস্‌টিক হইবে এমনও নয়। কারণ ধর্ম্ম, ভগবান সম্বন্ধে কতকগুলি মোটা ভাব সকল মানুষেরই মধ্যে আছে। মানুষের অন্যান্য সাধারণ বৃত্তির ন্যায় এটিকেও একটি সাধারণ বৃত্তি বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। পরলোকে বিশ্বাস, ভগবানে ভক্তি, দেবদেবী বা অদৃশ্য শক্তির পূজা এ সকল কোন না কোন রকমে মানব-প্রকৃতির অতি পরিচিত বিষয়। এ সকল জিনিষ মানুষমাত্রেই ন্যূনাধিক পরিমাণে চিনে, জানে, অনুভব করে। ইহাদের মধ্যেও সূক্ষ্ম কিছু নাই, অতীন্দ্রিয় আর-এক জগতের রহস্য কিছু নাই—এ সকল এ জগতেরই কথা, তবে একটু উপরের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া চাওয়া মাত্র। 'হে ভগবান, তুমি আছ, আমায় উদ্ধার কর'—ইহা সহজ

প্রাণের সুলভ উচ্ছ্বাস। যে ভাব লইয়া, যে স্তরে দাঁড়াইয়া আমরা বলি—

আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে
ভূধরে সলিলে গহনে

প্রায় সেই একই ভাব, একই স্তর হইতে আমরা আবার বলি—

রাত পোহাল ফরসা হল
ফুটল কত ফুল—

উভয়ই স্পষ্ট সাধারণ সর্ব্বজন-অনুভব্য কথা। উভয়েই এ জগতের, প্রাকৃতের, প্রত্যক্ষ্যের—পার্থক্য শুধু এইটুকু, একস্থানে উহার মধ্যেই ডুবিয়া মজিয়া আছি, আর একস্থানে দৃষ্টি একটু উপরের বা ভিতরের দিকে দিয়াছি; কিন্তু প্রতিষ্ঠা একই, অনুভূতির ধরণটি একই। এ জগৎকে ছাড়িয়া দিই নাই, আর একটি লোকে উঠিয়া তবে এ জগৎকে ও-জগৎকে সৃষ্টিকে দেখি নাই।

অন্যদিকে, তত্ত্বকথা দার্শনিক তথ্য হইলেই যে অধ্যাত্ম বা মিস্‌টিক হইবে তাহাও নয়। কারণ দার্শনিক রহস্যকে মানেন না, তাঁহার কাজই হইতেছে বুদ্ধির কাছে তাহাকে সরল সহজ সুস্পষ্ট করিয়া ধরা। বিচারের লজিকের মানদণ্ডে সকলকে কাটিয়া ছাঁটিয়া সাজাইয়া তিনি দেখেন। যেমন হইয়াছে বা হইতে পারে, এ জগতের যেমন ধরণ-ধারণ ঠিক সেই রকমেই সত্যকে উপস্থিত করেন—ইহারই নাম প্রমাণ। অঘটন, অত্যাশ্চর্য্যকে স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে না বসাইয়া দিতে পারিলে তাঁহার স্বস্তি নাই। ফলতঃ, দার্শনিক বৃত্তি বা শুদ্ধ বিচার-বুদ্ধি যাহা জড়বস্তুকে জড় হিসাবেই দেখিতে চায় না, যাহা চায় বস্তুর ভিতরের সাধারণ অবস্তু (abstract), তাহা বাস্তবিকতারই উল্টা দিক, তাহা চলিতেছে খেলিতেছে বাস্তবিকতা—Realismকেই ঘিরিয়া। দর্শনও বস্তুতন্ত্র, তাহা মিস্‌টিক নয়। কাণ্টই পড়ি বা শঙ্করই পড়ি—তাহা যতই কেন আর-এক জগতের—noumenonএর, ব্রহ্মের কথায় ভরপুর হউক না, মনে হয় সে সকলে এ জগতেরই ছাপ লাগিয়া আছে। খুব নূতন, খুব অপ্রত্যাশিত—গুহ্য কিছু—সেখানে পাই না। যে সহজ বুদ্ধির বলে বুঝিতেছি ওথেলোর হৃদয় কি রকমে ক্রমে ক্রমে ভীষণ গরলে ভরিয়া উঠিল, সে গরলে অব্যর্থভাবে কেমন করিয়া মরিল দেস-দিমোনা, ঠিক সেই সহজ বুদ্ধিকে আর একটু সুতীক্ষ্ণ আর একটু শাণিত করিয়া লইলেই বুঝিব, ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা, এ কথার মানে কি? শঙ্কর অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন, সেক্সপীয়র প্রাকৃত প্রাণের একটা স্থূল প্রবৃত্তির কথা বলিয়াছেন—কিন্তু দুইই এক ধরণে, অর্থাৎ দুইএরই ধরণ (method) realism, তাহা mysticism নহে। কালিদাসের মত তুমি বল,

শ্রোণিভারাদলসগমনা

আর শঙ্করেরই মত বল,

জলং পঙ্কবদত্যন্তং পঙ্কাপায়ে জলং স্ফুটম্।
যথাভাতি তথাত্মাপি দোষাভাবে স্ফুটপ্রভঃ॥
—(বিবেক-চূড়ামণি)

এক দিয়া দেখিতে গেলে উভয়েরই মধ্যে পাই একভাব—স্ফুট করিয়া সাধারণের অনুভূতির সহিত মিলাইয়া ধরার প্রয়াস। প্রথমটি তুমি আমি সকলেই বুঝি—অনায়াসে ধরিতে পারি, দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক কথা

হইলেও আমরা সকলেই সেই একই রকমে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তা আমরা যতই প্রাকৃত জন হই না কেন।

Mysticism আর-এক জগতের কথা, সত্য বটে—কিন্তু ততখানি আর-এক জগতের কথা নয় যতখানি আর এক জগতের ভঙ্গিমায় কথা বলা। রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকতার ওপারের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ভেরলেন (verlaine) বলিয়াছেন বিশেষ-ভাবে এ জগতেরই অনুভূতির কথা অথচ ভেরলেন হইতেছেন মিস্‌টিকদিগের রাজা। অন্য কথায়, mysticism জিনিষটি ঠিক ঠিক এক মতবাদ নয়, মূলতঃ এটি হইতেছে একটা ভাব, প্রাণের একরকম ধাত, দেখিবার এক ভঙ্গী। ইহা নির্ভর করে মানুষের প্রকৃতির স্বভাবের এক বিশেষ গড়নের উপর। সে গড়নটি কি?

মানুষের মধ্যে আছে দুইটি বৃত্তি, দুইটি টান। এই দুইটিই আছে যুগপৎ, দুইটিই প্রবল—তবে যেটি যাহার মধ্যে প্রবলতর হইয়া উঠে, যেটির উপর যাহার সত্তা কিছু ঝুঁকিয়া পড়ে, সেইটির রঙে ভঙ্গিমায় তাহার সকল দৃষ্টি সৃষ্টি রঞ্জিয়া গড়িয়া উঠে। একটা হইতেছে অনন্তের দিকে টান, আর একটি সান্তের দিকে; একটি ওপারের দিকে, আর একটি এপারের দিকে। যে দিকটা মানুষের খোলা সান্তকে এপারকে চাহিয়া, তাহা লইয়াই মানুষ positivist, realist—বস্তুতন্ত্র; আর যেদিক চাহিয়া রহিয়াছে অনন্তের ওপারের উদ্দেশ্যে, তাহা লইয়াই সে Idealist বা মিস্‌টিক। সান্তের ভাবে প্রণোদিত হইয়া সে চায়, যে জিনিষ জানিতে হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া জানিতে, যে জিনিষ ধরিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে ধরিয়া রাখিতে। তাহার জগৎটি হইবে সুষীম, একটা যথানির্দ্দিষ্ট রেখার ঘের উহাকে বেড়িয়া থাকিবে; শক্ত, নিরেট, নড়চড় হয় না এমন স্থানই তাহার বাসভূমি; যে জিনিষ-পত্র লইয়া তাহার কারবার তাহাও তরল বাষ্পীয় কিছু হইবে না, নিজের হাতের মুঠির মধ্যে সকল জিনিষ সে পুরিয়া রাখিতে চায়। যাহা-কিছু ক্ষীণ মলিন অস্পষ্ট ছায়াময়, যাহা-কিছুর মধ্যে সন্দেহ দ্বিধা অনিশ্চয়তার লেশমাত্র দেখা যায় সে সকলে তাহার তুষ্টি নাই। সে ভালবাসে মধ্যাহ্নের দীপ্ত ছটা। ইহাই হইতেছে মানুষের মধ্যে আছে যে positivist বা বস্তুতান্ত্রিক। অন্যপক্ষে তাহার ভিতরে আছে যে অনন্তের ভাব, সে নিথর স্থির স্থাণু কিছু চায় না, সে সর্ব্বদাই চায় গতি, সীমাকে সে চলে অতিক্রম করিয়া, তাহার চক্ষু পড়িয়া আছে যাহা দেখা যায় না তাহার প্রতি, তাহার হাত দুখানি প্রসারিত যাহাকে ধরা যায় না এমন জিনিষের উদ্দেশ্যে। তাহার অভিজ্ঞা, তাহার পরিচিত ক্ষেত্রটির চারিধার সে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—তাহার জগতের কোন বেড়া নাই, তাহার দিকচক্রবাল সরিয়া সরিয়া ক্রমে ছায়াময় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, মিশিয়া মিলাইয়া অজানায় অ-পাওয়ার ওপারে। জিনিষকে বড় কাছে কাছে রাখিলে, তাহার সব জানিয়া বুঝিয়া ফেলিলে, একটা বিশেষ বিগ্রহের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া ধরিলে, তাহার সৌন্দর্য্য, রহস্য, রোমান্স কিছু থাকে না—তাই সে রাখে দূরে দূরে, সম্মুখে একটা

ঝিলিমিলি টানিয়া দিয়া। মানুষের মধ্যে মিস্‌টিক যে, তাহার কাছে মধ্যাহ্নের তপন বড় রূঢ় রুক্ষ—সে ভালবাসে গোধূলির আলো-ছায়া-মিশ্রণ।

তাই বলিয়া মিস্‌টিক যে কল্পনার মায়া-রচনার দাস, তিনি যে সত্যকে সাক্ষাৎ দেখেন না উপলব্ধি করেন না, এমনও নয়। মিস্‌টিকের অনুভূতিব, সৃষ্টির মধ্যে সে রকম একটা আভাস পাই বটে, যেন কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া, কুয়াশায় ঘেরা, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অভাব—সত্যকে তিনি যেন ধরিতে পারেন নাই, সেইদিকে উন্মুখ হইয়া আছেন, এখনও অন্ধকারেই হাতড়াইতেছেন আর অনুমানে তাঁর মনগড়া একটা প্রতিবিম্ব কিছু সৃজন করিতেছেন। কিন্তু ঠিক তাহা নয়। এ রকম যে আপাততঃ বোধ হয় তাহার একটা গভীর কারণ আছে। মিস্‌টিক সত্যকে সাক্ষাৎ দেখিতে উপলব্ধি করিতে পারেন, কিন্তু সে সাক্ষাৎ দৃষ্টিকে তিনি চোখে দেখার ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে চাহেন না। সত্যের মধ্যে, বস্তুর অন্তরাত্মায়, তাহার নিগূঢ় সৌন্দর্য্যে আছে যে একটা অনন্তের ভাব তাহা যে অনির্ব্বচনীয়; তাহাকে স্থূলের প্রকাশের মানুষের এই খণ্ডিত অসম্পূর্ণ সঙ্কীর্ণ মালমসলায় ঢালিয়া গড়িলে সে অনির্ব্বচনীয়ত্ব যে সবই নষ্ট হইবে, সত্য উপলব্ধির বিরুদ্ধাচরণই করা হইবে। তাই বাক্য বল, ছন্দ বল, রং বল, রেখা বল,—এ সকলকে তাহাদের স্থূল জগতের কাটাছাঁটা ধরাবাঁধা গড়নে রচিলে চলিবে না। অসীমকে অনন্তকে যথাযথ দেখাইতে হইলে সীমার সান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে বটে, কিন্তু সে সীমার সান্তের মুখ খুলিয়া রাখিতে হইবে, তাহাদের উপর যত অল্প জোর দেওয়া যায় তাহাই করিতে হইবে। ইহাই হইতেছে মিস্‌টিকের শিল্পসূত্র। মিস্‌টিক যে তাঁহার সত্যের উপলব্ধিকে একটু হেঁয়ালির ছন্দে প্রকাশ করেন, একটা পাতলা অবগুণ্ঠনের মধ্যে ধরিয়া দেখান, তাহা তিনি ইচ্ছা করিয়াই করেন অথবা আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে ভিতরের এই ভাব এই প্রয়োজনের টানেই করেন যে অনন্তকে অব্যক্তকে অনন্তের অব্যক্তের মতন করিয়াই লোকের সম্মুখে ধরিতে হইবে—নতুবা সে অনন্তের উপলব্ধির সার্থকতা কি?

প্রাচীন কবিতার ও আধুনিক কবিতার পার্থক্যও ঠিক এইখানে। প্রাচীন কবিগণ বিশেষভাবে এ জগতেরই কর্ম্মজীবনের কথা বলিয়াছেন, সত্য বটে; কিন্তু তাঁহারা এ জগতের কথাই বলুন, আর ও-জগতের কথাই বলুন, যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছেন এ জগতের কাঠাম ও ভঙ্গী দিয়া, এইটিই হইতেছে তাঁহাদের প্রধান বিশেষত্ব—এ জগতের স্থূলের ভঙ্গিমা অর্থাৎ বুদ্ধি যে ভঙ্গিমা চিনে, গড়ে। বের্গসন দেখাইয়াছেন স্থূলে জড়ে যে বিন্যাস, যে শৃঙ্খলা, যে অতিনির্দ্দিষ্ট অতিস্পষ্ট কাঁটাছাটা ভঙ্গী সেটি হইতেছে বিচারবুদ্ধির দান। বিচারবুদ্ধিই জগতের কর্ম্মজীবনের বস্তুকে এমন সীমায় সীমায় সুবীম করিয়া ধরিয়াছে, তাহাকে এমন অঙ্গে অঙ্গে বাঁধা ও নিরেট, হাতের মধ্যে রাখিবার ব্যবহার করিবার যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত জগৎ জীবন, জগতের জীবনের সত্য নিগূঢ় সত্য যাহা তাহা সে রকম কিছু নয়

—তাহা চির-চঞ্চল; বিশেষ সীমা সুস্পষ্ট রেখা, একটা আরম্ভ ও একটা শেষ সেখানে কিছু নাই; একটির মধ্যে আর একটি ঢলিয়া গলিয়া চলিয়াছে। প্রাচীন কবিগণ কিন্তু এভাবে জগৎকে দেখেন নাই; বুদ্ধির কাছে স্ফুট করিয়া ধরিবার জন্য, বুদ্ধির কাঠামের মধ্যেই তাঁহাদের অনুভূতি উপলব্ধিকে গড়িয়া সাজাইয়া দেখাইয়াছেন। ক্লাসিক-সাহিত্য এই ভঙ্গিমার চরম পরিণতি। ইহার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন যাঁহারা তাঁহাদেরই নাম রোমাণ্টিক কবি। জগৎ সত্যের মধ্যে আছে যে একটা নিরবচ্ছিন্ন গতি, একটা চঞ্চল একটানা প্রবাহ, আলো-আঁধারের মিশামিশি লইয়া যে একটা অনির্দ্দেশ্যের অসীমের অখণ্ডের অনির্ব্বচনীয় অভিব্যঞ্জনা, রোমাণ্টিকগণ কাব্যরচনায় তাহারই কিছু প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবুও রোমাণ্টিকগণ ক্লাসিক সাহিত্যের প্রভাব একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। ক্লাসিকগণের মত বস্তু-জগতের উপর একান্ত জোর না দিলেও, তাঁহারা সেইদিকেই অনেকখানি হেলিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কর্ম্মজীবনের কথা তেমন বলেন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন প্রাণের ভাবের অনুভব, তাঁহারা দিয়াছেন প্রাণ-জগতেরই দোলায়িত গতি, স্বপ্নলোকের আবেশ; তবুও সে প্রাণের ভাবুকতা খেলিয়াছে এ জগতের উপরই ভর করিয়া, তাঁহাদের স্বপ্নরচনা এই জাগ্রতেরই শৃঙ্খলাকে অনেকখানি মানিয়া লইয়াছে। রোমাণ্টিকও বস্তুতান্ত্রিকেরই আর এক মূর্ত্তি।

মিসটিক কবি রোমাণ্টিকের শেষ পরিণতি। জড়জগতের, এপারের ওজন-করা বস্তু আর কাটা-ছাঁটা ধরণ-ধারণ সব তিনি বদলাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। তাই তিনি চাহেন তত্ত্বের কথা, ভাবের ভঙ্গিমা। বুদ্ধি দিয়া বুঝা, স্ফুট জাগ্রত করিয়া ধরা তাঁহার ধাতুতে নাই; তিনি অন্তরাত্মা দিয়া অন্তরাত্মার বস্তুকে অনুভব করেন, অশরীরীকে ইঙ্গিতের সাহায্যে লক্ষ্য করেন মাত্র। জগৎ, সৃষ্টি, প্রকাশ, রূপ যাহা, মিস্‌টিকের কাছে তাহার নিজস্ব মূল্য তেমন নাই। এ সব হইতেছে একটা গভীরতর বিরাটতর সত্তার পরিচ্ছদ, আবরণ, এ সকলকে শুধু সঙ্কেত, রূপক বা সিম্বল হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এ ই (A E) যেমন বলিয়াছেন এ সব 'Veils of Maya,' 'Vesture of the Soul'—ইহাদেরও নিজের একটা সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য ততখানি সুন্দর যতখানি তাহা প্রতিফলিত করিতেছে ভিতরের অনির্ব্বচনীয় অনির্দ্দেশ্য সৌন্দর্য্যকে। এপারের যাহা-কিছু মনোলোভা তাহা যে ওপারেরই ক্ষীণ ছায়া—সেই ওপারের প্রতি চাহিয়াই কবি গাহিয়াছেন—

আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে
ভাষাবিহীন অজানিতের গানে
সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে
কাহার বাঁশী এমন গভীর স্বরে!

—(গীতাঞ্জলি)

এই ওপারকে চক্ষু মেলিয়া দেখিবে কে? কে তাহার স্বরূপটি রূপের মধ্যে ধরিয়া গাঁথিয়া পরিপূর্ণ প্রকট করিবে? অবাঙ্‌-মনস-গোচর যাহা তাহা বাক্যের চিন্তার রেখায় সবখানি প্রকাশ করিয়া ফেলিবে কে? অন্ততঃ মিস্‌টিক যিনি তিনি তাহা করেন

নাই এবং তাহা যে সম্ভব এমনও বিশ্বাস করেন না। মিসটিক যেন চক্ষু মুদিয়া (১) বাক্ সংযত করিয়া ভিতরে ভিতরে হৃদয়ের সহিত হৃদয় সংযুক্ত করিতেছেন, প্রাণ দিয়া প্রাণকে স্পর্শ করিতেছেন—তাঁহার কর্ত্তব্য জানা নয়, বোধ করা। বোধের অনুভবের মধ্যেই ত সব, জানিলে ত ফুরাইয়া গেল, অজানার মধ্যেই সব রহস্য, সব সৌন্দর্য্য। এই অজানার মধ্যেই আবার সত্য; কারণ জানা যাহা, তাহা সত্যের একটা দিক, একটা বিচ্ছিন্ন অঙ্গ বা ছায়া মাত্র। অজানার অসীম অনন্ত প্রসারেই পূর্ণ সত্য।

মিস্‌টিক কবি জিনিষের রূপ দেখেন না, এমন কি জিনিষের অর্থও বুঝেন না, তিনি অনুভব করেন জিনিষের ভাব। উপনিষদ বলিয়াছেন 'সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিসৃতং'—প্রশান্ত অবিক্ষুব্ধ সৎ-এর মধ্যে প্রাণ-শক্তি যখন ঢেউ খেলিয়া উঠে তখনই বস্তু সব রূপ ধরিয়া বাহির হয়। মিস্‌টিক ঠিক বস্তুর সৃষ্টির প্রাক্‌কালের এই প্রাণের প্রথম তরঙ্গ-ভঙ্গটি অনুভব করেন, দেখাইতে চাহেন—ইহাই বস্তুর ভাব, ইহারই মধ্যে ডুবিয়া লুকাইয়া আছে বস্তুর অর্থ ও রূপ। এই খানেই পাই বস্তুর নিগূঢ় জীবনসত্য, এইখানেই অনন্তের অসীমের সহিত তাহার একাত্ম মিলন। ইহাই বস্তুর ওপারের ভাগবত সত্তা ও সৌন্দর্য্য, এইটিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মিস্‌টিক কবিকে বলিতে হইতেছে—

ডুব দিয়ে এই প্রাণ-সাগরে
নিতেছি প্রাণ বক্ষ ভরে
আমায় ঘিরে আকাশ ফিরে
বাতাস বহে যায়—(গীতাঞ্জলি)

ঠিক এইজন্যই মিস্‌টিক কবি সঙ্গীতের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন—এমন কি ভেরলেন কাব্যের মধ্যে শুধু সঙ্গীতই চাহিয়াছেন, সঙ্গীতই কাব্য। (২) কারণ সঙ্গীতের মধ্যে পাই সেই একেবারে অস্পষ্ট না হইলেও কেমন অনির্দ্দেশ্য ভাব, সেই 'প্রাণ এজতি'। সঙ্গীতের ধর্ম্মই হইতেছে বিশেষের, অতিস্ফুটের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা নয়, কিন্তু একটা সুবিস্তৃতের বাঁধন-হীনের দিকে, কেমন এক গতির মাদকতার দিকে উধাও হইয়া চলিতে থাকা। বাক্যের অর্থের যে

(১) Mystic কথাটি গ্রীক muein চক্ষু মুদিত করা, নির্ব্বাক হইয়া থাকা—হইতে আসিয়াছে, এমন কেহ কেহ বলিতেছেন।

(২) Paul Verlaine কাব্য রচনার যে সূত্র দিয়াছেন তাহাতে আমরা যে রকম মিস্‌টিক কাব্যের ব্যাখ্যা দিতেছি তাহারই স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন—

De la musique encore et toujours !
Que ton vers soit la chose envolée,
Qu'on sent qui fuit d'une áme en allée
Vers d'autres cieux á d'autres amours.

"চাই সঙ্গীত, শুধুই সঙ্গীত। তোমার কবিতা যেন হয় উড়িয়া-যাওয়া জিনিষটি, মনে হওয়া চাই অন্তরাত্মা যেন ছুটিয়া চলিয়াছে আর একরকম সব স্বর্গের দিকে, যেখানে আছে আর একরকম সব ভালবাসা।"

কাঠিন্য যে সসীম রেখা, সঙ্গীত তাহাকে ক্রমাগত ভাঙ্গিয়াই চলিতে চাহিতেছে। তাই দেখি মিস্‌টিক চিত্রকর রেখার উপর জোর দেন নাই, তিনি জোর দিয়াছে রংএর উপর। বাস্তবিক ভাবের যে খেলা তাহা রংএরই খেলা, তাহাতে বুদ্ধির দেওয়া কাটা ছাঁটা রেখা যেন সব মুছিয়া মিলাইয়া যাইতেছে, এ যেন চিত্ত-সাগরের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে যে আলো-ছায়া, জাগিয়া উঠিতেছে যে একটা আবেশ। সঙ্গীতও এই ভাবের রংএরই খেলা—তাহার উদ্দেশ্য একটা সাধারণ, খুব ঠিক করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না এমন একটা জিনিষ কিছু উদ্রেক করা

. ইহাই মিস্‌টিকদিগের কথা—Blake ও Verlaine এই হিসাবেই খাঁটি মিসটিক। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠে এই রকম মিস্‌টিক কাব্যই কাব্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কিনা, মানুষের পূর্ণ তৃপ্তি ইহাতেই হয় কি না। কাব্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কিনা, তাহা বলা কঠিন কিন্তু একমাত্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যে নয়, তাহা নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে—এমন কি মিস্‌টিক কবিতারও অন্য মূর্ত্তি অন্য ধরণ থাকিতে পারে ও আছে, এমনও আমরা বলিতে পারি। আর মানুষের তৃপ্তির কথা যদি ধরা যায়, তবে আমাদের বোধ হয় এই শেষোক্ত ধরণেই মানুষের পূর্ণতর তৃপ্তি।

মানুষের তৃপ্তি কোথায়? উহা হইতেছে পাওয়ার মধ্যে, ধরার মধ্যে। মিস্‌টিক—অর্থাৎ যে mysticismএর ব্যাখ্যা আমরা দিয়াছি, যাহা প্রতিফলিত হইয়াছে Symbolism, Impressionismএর মধ্যে—সে মিসটিক চাহিতেছেন না-পাওয়া, না-ধরার জিনিষ; অতৃপ্তিই তাঁহার সৃষ্টির গোড়ায়, অথবা বলিতে পার অতৃপ্তির মধ্যে যে তৃপ্তি। কারণ তৃপ্তি অর্থে নিঃশেষ হওয়া, ফুরাইয়া যাওয়া; তৃপ্তি সম্ভব সসীম সঙ্কীর্ণ ইহের স্থূল জগতের জিনিষে—মিস্‌টিক ঠিক যে তাহাই চান না, বস্তুতান্ত্রিক বা বুদ্ধি-তান্ত্রিকদের সঙ্গে এইখানেই ত তাঁহার সকল দ্বন্দ্ব। কিন্তু কথাটি এই, জিনিষকে পাইলে, ধরিলে, জানিলেই যে তাহা খাট হয়, ফুরাইয়া যায়, এমন সর্ব্বত্র ঘটিতে বাধ্য নয়। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে, ব্রহ্মই হইয়া যাইতে হইবে, ভগবানকে পাইতেই হইবে, ধরিতেই হইবে-কিন্তু তাহাতে ব্রহ্ম খাট হয় না, ভগবানও ফুরাইয়া যায় না। সিদ্ধির অর্থই তৃপ্তি অতৃপ্তির যে সৌন্দর্য্য সার্থকতা তাহা সাধনার পথে। সিদ্ধির স্থিতি সাধনার গতি অপেক্ষা কি বড় নয়? প্রকৃতপক্ষে বেশীর ভাগ মিস্‌টিক কবিদিগের মধ্যে পাই—মধ্যপথের কথা, চলার মুখে যে উপলব্ধি বা অনুভূতি ফুটিয়া উঠিতেছে—তাই ইঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে একটা সন্দেহ, অধৈর্য্য, অস্পষ্টতা, ঘোরালো কিছু মিশিয়া থাকে। দূর হইতে একটা অজানা নূতন জগতের সন্ধান পাইয়াছেন, কি এক নূতন উপলব্ধি তাঁহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে—সে সম্বন্ধে নির্ভীক ভাবে জোর করিয়া কিছু তাই বলিতে পারিতেছেন না, আভাসে ইঙ্গিতে সন্তর্পণের সহিত উপস্থিত ধারণাগুলি ব্যক্ত করিতেছেন। এ-কথা সত্য, অনন্তকে অসীমকে সূক্ষ্মকে একান্তভাবে জানা, ধরা, পাওয়া যায় না—একটা কিছু

না-জানার, না-ধরার, না-পাওয়ার ভাব চরম উপলব্ধিরও সাথে থাকেই। কিন্তু তাহা হইতেছে এই চরম উপলব্ধির, সিদ্ধির—জানার ধরার পাওয়ার—পরের কথা। উপনিষদ যেমন বলিয়াছেন, তাহাকে জানি এ কথাও যেমন বলিতে পারি না, তেমন জানিনা এমন কথাও মুখে আনিতে পারি না। ফলতঃ এখানে দুই রকম না-পাওয়া না-ধরার প্রভেদটি বুঝিতে হইবে। এক হইতেছে যখন পাইতে ধরিতে পারিতেছি না তখন যে না-পাওয়ার না-ধরার অনুভব হয়, তখন পাইতে ধরিতে চাই না বলিয়া যে একটা অভিমান বা ভাণ বা সেই রকম একটা কিছু করি। মিস্‌টিকগণের মধ্যে এই দিকটাই যেন বিশেষ প্রবল। আর এক রকম হইতেছে যখন পাইয়াছি ধরিয়াছি তখন সেই পাওয়ার ধরার জন্যই যে অনুভব করি উপলব্ধি করি এক না-পাওয়ার না-ধরার অসীম অবকাশ।

সে যাহা হউক, এ কথাও যদি স্বীকার করি মিস্‌টিকগণ সমুচ্চের প্রতি শুধু আকাঙ্ক্ষা নয় কিন্তু তার পূর্ণ উপলব্ধি দিয়াই সৃজন করিয়াছেন তবুও সে উপলব্ধি হইতেছে ভাব-গত। কিন্তু আর এক উপলব্ধি আছে যাহা জোর দিয়া দাঁড়াইয়াছে জ্ঞানের উপর। একজন যদি আদি-প্রাণের গতিতে, সঙ্গীতে, বর্ণে তাঁহার আলেখ্যখানি চিত্রিত করিয়া থাকেন, আর একজন করিয়াছেন এই প্রাণের পিছনে বা অন্তরে আছে যে চিন্ময় সৎ-বস্তু তাহারই স্থৈর্য্যে, স্থাপত্যে, রেখায়। ভাবের ধর্ম্ম যদি হয় উধাও হইয়া চলা, সব মিলাইয়া মিশাইয়া ছায়াময় করিয়া তোলা, জ্ঞানের ধর্ম্ম হইতেছে টানিয়া ধরা, সুঠাম, সুস্পষ্ট করিয়া তোলা। আমরা বলি, অন্যান্য কলার যে ধর্ম্ম যে ভঙ্গীতেই সার্থকতা থাকুক না কেন, কাব্যের সার্থকতা এই শেষোক্ত ধরণে। কারণ, বাক্য সুতরাং অর্থ হইতেছে কাব্যের মূল উপাদান, প্রতিষ্ঠা। অনন্তের অসীমের সূক্ষ্মের কথা যদি বলি তবে তাহাদিগকেও প্রকাশ করিতে হইবে বাক্যের নিটোল নিথরতায়, অর্থের পরিপূর্ণ রেখা সমূহতে। শুধু কথা এই, এই যে জ্ঞান তাহা বিচার-বুদ্ধি-জাত নয়। এই যে বাক্য অর্থ তাহা বাহিরের অনুভূতির প্রতিলিপিমাত্র নয়। এই জ্ঞান যে বিশেষ রূপ, বিশেষ নাম দেয়, সুস্পষ্ট উপলব্ধির যে সুসংহত সুবিন্যস্ত আকার দেয়, তাহা অনন্তেরই আপনার নাম রূপ, তুরীয়েরই নিজের আকার। বুদ্ধির কাটাছাঁটা রূপ, স্থূলের ধরাবাঁধা গড়ন যে দেখি তাহা একটা সমুচ্চের নিগূঢ়ের রূপ ও গড়নেরই ছায়া মাত্র। এই ওপারের রূপ ও গড়নের মধ্যে এপারের রূপ ও গড়নের সঙ্কীর্ণতা, খণ্ডতা নাই; তাহার মধ্যে আসিয়া ধরা দিয়াছে তাহারই জোরে ফুটিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে যাহা অনন্ত অসীম অবাঙ্‌মনসগোচর।

আমাদের মতে, এ ই জ্ঞানপন্থীরাই আরও বড় মিস্‌টিক। এ ই, ইট্‌স্‌ অধ্যাত্ম জগতের, ওপারেরই রহস্যের কথা বলিয়াছেন—কিন্তু তাঁহারা ঠিক চক্ষু মুদিয়া ভাবের আবেগে মুগ্ধ হইয়া সত্যকে সৌন্দর্য্যকে আলিঙ্গন করেন নাই, তাঁহারা যেন স্থির-নেত্রে চাহিয়া দেখিয়াছেন সত্যের সৌন্দর্য্যের

তেজোময় বিগ্রহ। শুধু আভাসে ইঙ্গিতে দূর হইতে তাঁহারা অনন্তকে নিগূঢ়কে দেখাইয়া দিতেছেন না—কিন্তু অনন্তকে নিগূঢ়কে সাক্ষাৎ পাইয়া ধরিয়া এমনভাবে তাহার মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, যে সেই সাক্ষাৎ পাওয়ার ধরার ফলেই কেমন সহজে অনন্তের নিগূঢ়ের যত আভাস ইঙ্গিত অফুরন্ত অভিব্যঞ্জনা সেখানে ফুটিয়া উঠিতেছে, ছুটিয়া পড়িতেছে। এ ই'র

Like winds or waters were her ways:
They heed not immemorial cries ;
They move to their high destinies
Beyond the little voice that prays—

অথবা ইট্‌সের

In all poor foolish things
that live a day,
Eternal Beauty wandering
on her way—

যে একটা রূপ সৃষ্টি করিয়াছে, মনে হয় নির্ণিমেষ সাক্ষাৎ দৃষ্টি যেন তাহাকে পাথর হইতে কুঁদিয়া বসাইয়া দিয়াছে—এমন স্ফুট, সুষীম, নিথর ; অথচ ভাবপন্থী মিস্‌টিকগণ যে বিপুলতর জগতের অসীম অভিব্যঞ্জনা, সমুদ্রের অনন্ত ইঙ্গিত, যে একটা 'শেষ নাই শেষ নাই' ভাবই চাহিয়াছে তাহারও কিছু অভাব কি আছে ?

ইহার পরে যখন শুনি পল ভেরলেন'এর

L'atmosphére ambiante
a des baisers de sœurs (৩)

অথবা

Et pour sa voix lointaine,
et calme, et grave, elle a
L'inflexion des voix chéres
qui se sont tues— (৪)

কিম্বা আমাদের রবীন্দ্রনাথের

কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে :—

তখন জ্ঞানের স্থিরতপোদৃষ্টির দিকটা আমাদের উদ্‌বুদ্ধ হয় না—কবি সেদিকে জোর দেন নাই, দিতে চাহেন নাই, কবি ভাবে ভোর হইয়া অনন্তকে স্পর্শ করিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া উধাও হইয়া চলিয়াছেন। ইহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আছে—কিন্তু মনে হয় মানুষের একটা দিকের উপরই কবি বড বেশী চলিয়া পড়িয়াছেন, অর্দ্ধপথ মাত্র আসিয়াই থামিতে চাহিলেন। কবি passive ভোক্তারূপেই বেশী আনন্দ পাইতেছেন কিন্তু মানুষ, বিশেষতঃ কবি শুধু ভোক্তা নহেন তিনি যে active কর্ত্তা, স্রষ্টা—সৃষ্টিতেই রূপগড়নেই যে তাঁহার তপঃশক্তির পরিচয়। ভেরলেন তাঁহার

L'inflexion des voix chéres qui se sont tues

এই কথায় দূর হইতে কেমন ইঙ্গিতে মাত্র দেখাইয়া দিতেছেন মাত্র একটা নিগূঢ় উপলব্ধি, আর এক জগতের চক্রবাল। কিন্তু ইটসের

(৩) তরঙ্গিত বাতাসে মাখামাখি হইয়া গিয়াছে, যেন ভগিনী ভগিনীর চুম্বন।

(৪) তার সে স্বর কোন সুদূরের, আর কি প্রশান্ত, কি গম্ভীর—তাহাতে শুনিতে পাই যেন সেই সব প্রিয় কণ্ঠস্বরের মূর্চ্ছনা যাহারা নীরব হইয়া গিয়াছে।

Eternal Beauty wandering on
her way

সেই অতীন্দ্রিয় জিনিষটিই যেন একেবারে আমাদের গোচর করিয়া সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছে, হাতের মধ্যে তুলিয়া দিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রাচীন কবিগণ দিয়াছেন শুধু স্থূলের কর্ম্ম-জগতের চিত্র, মানুষের বিচার-বুদ্ধির মধ্যে তাহা যে রকমে প্রতিফলিত হইয়াছে, সেইরূপে সেই ভঙ্গীতে। ইহা সত্য, অনেকখানিই সত্য হইতে পারে—তবুও সব সত্য নয়। প্রাচীনের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ কবি—শেক্সপীয়র বা কালিদাস—তাঁহারা স্থূলের কর্ম্ম-জগতের কথা শুধুই যে বস্তুজগতের ভঙ্গিমায় বুদ্ধির খোলসে পরাইয়া দেখাইয়াছেন, ইহা ঠিক নয়। তাঁহারাও জ্ঞানপন্থী আধুনিক কবিদের মতই জ্ঞানের দেওয়া বিশেষ রূপ, তপঃশক্তির সুষীম রেখাবদ্ধ সৃষ্টিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাই উভয়ের মধ্যে পাই একটা সাদৃশ্য—বস্তুগত না হইলেও, ভঙ্গীগত একটা সাদৃশ্য। উভয়েই রূপ দিয়াছেন, তবুও রূপের মধ্যে উভয়েরই আছে একটা অরূপের আভাস। শেক্সপীয়র যখন বলিতেছেন

On such a night
Stood Dido with a willow in
her hand
Upon the wild sea-banks,
and waved her love
To come again to Carthage—

অথবা সেই

Look how the floor of heaven
Is all inlaid with patines of gold—

তখনও সেখানে শুধু পাই কি বস্তু-জগতেরই কথা, বুদ্ধির নৈপুণ্য কারুমো—সেখানে কি অনির্ব্বচনীয়, অনির্দ্দেশ্য রহস্য—মিস্টিক কিছু পাই না? বস্তুতঃ মিস্টিকভাব অর্থে যদি বুঝি একটা অনন্তের, অনির্দ্দেশ্যের আভাস, তবে সে জিনিষটি সকল কবিত্বেরই মর্ম্মগত—উহা ছাড়া কবিত্ব, প্রকৃত কবিত্ব নাই।

তবে প্রাচীন আর আধুনিক সে জিনিষটিকে বিভিন্ন দিক হইতে দেখিয়াছেন, বিভিন্ন আকারে গড়িয়াছেন। আধুনিক মিস্টিক—তিনি জ্ঞানতন্ত্রীই হউন, আর ভাবতন্ত্রীই হউন—প্রাচীন অপেক্ষা আপনার সম্বন্ধে বেশী সচেতন (self-conscient), তাঁহার জ্ঞানে বিশ্লেষণের প্রভাব অধিক, তাঁহার অনুভূতি উপলব্ধি বস্তু সম্বন্ধে যতখানি নয়, তত্ত্ব (principles) সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশী সজাগ। প্রাচীনের দৃষ্টিতে বাহিরের জগৎটাই বড় হইয়া দেখা দিত, আর সে জগতের মধ্যেও পৃথক পৃথক ঘটনার বিশেষ বিশেষ বস্তুর উপরই তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইত। যেটি যখন তাঁহার চোখে পড়িত, সেটিরই রূপ, রূপের ভিতর দিয়া সেটিরই অন্তরাত্মাকে তাঁহারা উপলব্ধি করিতে করাইতে চাহিতেন। আধুনিক কিন্তু যখন এই রকম পৃথককে বিশেষকে একককে দেখেন, তখন তিনি সেটিকে আর সকলের সহিত ধরিয়া মিলাইয়া তুলনা করিয়া আর একটা বৃহত্তর উদারতর সাধারণ সত্য বস্তুকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন, সে সাধারণকেও ছাড়াইয়া, আরও একটা বেশী সাধারণে উঠিতে তাঁহার প্রয়াস—এই রকমে তিনি যতক্ষণ অনন্তে শাশ্বতে অজানায়,

ভগবানেরই মধ্যে না যাইয়া পড়িতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার তৃপ্তি নাই। তাই বিশেষ বস্তু, বিশেষ ঘটনা, বিশেষ নাম, বিশেষ রূপ তাঁহার কাছে তেমন সত্য, আপনার সত্বায় আপনি পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় না—এ সব যেন আশ্রয়মাত্র, বাহিরের আবরণ মাত্র, ভিতরের চারিদিকের বিপুলতর নিগূঢ়তর তথ্যটির ব্যাখ্যার জন্য যতটুকু যেভাবে প্রয়োজন ততটুকু মাত্র সেইভাবে বাহিরের এই সকলের উপর দৃষ্টি দিলেই যথেষ্ট।

প্রাচীন বাহিরকে এপারকেই ফলাইয়া দেখাইয়াছে, অনন্ত রহস্য যাহা, মিস্‌টিক যাহা কিছু তাহা সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে গৌণত, তাহা আছে কেমন অলক্ষিতে ছায়ার মত। আধুনিক এই বাহিরকে এপারকে সরাইয়া ফেলিয়া, দেখিতেছেন ভিতরের কলকব্‌জা, ওপারের ভাব প্রেরণা অনুভূতি—স্থূল সত্যের সহায়ে সাধারণভাবে অতীন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করা নয় কিন্তু সূক্ষ্ম জগতের তথ্যের মধ্যে উঠিয়া অনন্ত অনির্দ্দেশ্যের কিছু নিকটস্থ হইতে,তাহাকে হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিতে। প্রাচীন মিস্‌টিক কবি তুরীয়ের প্রেরণায় গড়িয়াছেন আমাদের স্থূল জগৎ—সেখানে মাঝের জগতের বিশেষ খবর পাই না, তুরীয়ও সেখানে তাই রহিয়াছে কেমন অন্তরালে। আধুনিক মিস্‌টিক এই মাঝের জগৎ—আমরা বলিতে পারি এই missing linkকে ধরিতে চাহিতেছেন—তুরীয়ের প্রেরণায় তিনি গড়িতে চাহিতেছেন সূক্ষ্ম জগৎ; বস্তু বা ঘটনা যাহার প্রধান কথা নয় কিন্তু যেখানে খেলিতেছে বড় বড় ভাব, নিবিড়তর উদারতর অনুভূতি। অনন্তকে নামাইয়া একেবারে সান্তের বিগ্রহে ইঁহারা ধরিতে চাহেন না—সে বিগ্রহের চারিদিকে অনন্তের অভিব্যঞ্জনা যতই ছড়াইয়া পড়ুক না কেন; ইঁহারা চাহেন অনন্তকে অসীম-কিছুর মধ্যে ধরিয়া দেখাইতে—তাহা ইট্‌স বা এ ই'র মত সুধীম তাত্ত্বিক জ্ঞানের রেখার মধ্যে হউক আর রবীন্দ্রনাথ বা ভেরলেনেরই মত তাত্ত্বিক ভাবের তরঙ্গায়িত রংএর খেলার মধ্যেই হউক।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

বেচারীর বেচাল্

পাড়ার মেয়ে-মহলের তাসের আসর হইতে মোহিনী যখন ফিরিয়া আসিল, সেনেদের বাড়ীতে তখন একটা খণ্ড-কুরুক্ষেত্রের প্রচণ্ড অভিনয় হইতেছিল।

বাড়ীতে ঢুকিতে-না-ঢুকিতে মোহিনীর কাণে প্রথমেই ঢুকিল, উপর হইতে সেন-গিন্নীর চড়া গলার কড়া ধমকি! তারপর দেখিল উঠানের একপাশে পা-দুটো সটান ছড়াইয়া বসিয়া বুড়ী থাক-ঝী, মুখের কথায় ছিঁচ্-কান্নার নাকী সুর লাগাইয়া বলিতেছে, "অ-গ, আমার কপালে কি এ্যাই ছিল গ—!"... ... তারপর দোতালায় উঠিয়াই দেখিল, বাড়ীর

কর্ত্তা ব্যজার-মুখে তাহার সুমুখ দিয়ে তাহাকে না-দেখিয়াই আপনমনে বকিতে-বকিতে চলিয়া গেলেন, "দূর হোক্-গে, দূর হোক্-গে ছাই! গিন্নীর বুদ্ধি-সুদ্ধি কি সব লোপ পেয়েচে! ও করচে কি এ? ছি ছি!"

মোহিনী ভাবিল, 'গিন্নীর সঙ্গে কর্ত্তার আজ খুব-এক-হাত হয়ে গেছে দেখ্‌চি!'

কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকিয়াই সে একেবারে থ! তাহার সাম্‌নেই বিরাটবপু লইয়া সেন-গিন্নী, অচল মৈনাকের একটি ছোটখাটো সচল সংস্করণের মত ছুটোছুটি করিতেছেন,—আর ঘরের চারিদিকে সমস্ত জিনিষ-পত্তর লণ্ডভণ্ড, ওলট্-পালট্ হইয়া ছড়ানো!

মোহিনীকে দেখিয়াই গিন্নী ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া, হাঁস্‌ফাঁস্ করিতে-করিতে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

মোহিনী অবাক হইয়া দেখিল, তার প্যাট্‌রাটাও খোলা পড়িয়া রহিয়াছে! ব্যাপার কি?

এমনসময় খুকীর ঝী আসিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল।

মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে খুকির ঝী, কি হয়েচে রে?"

খুকির ঝী দুইগালে দুইহাত রাখিয়া, মাথা নাড়িতে-নাড়িতে চোখ পাকাইয়া বলিল, "মা, মা, মা! এমন কাজের মুখে সাত ঝাড়ু, সাত ঝাড়ু! অ্যাঃ! বলে কিনা আমরা চোর? হ্যাঁ বামুনমেয়ে, তুমিই বল বাছা, এ কি সহ্য করা যায় গা?"

মোহিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "চোর? কে চোর?"

—"আমরা গো আমরা! গিন্নীর বালা নাকি পাওয়া যাচ্ছেনা, সব্বাইকে তাই চোর বলা হচ্চে! আমাদেরও যাই মরতে ঠাঁই নেই, তাই—"

—"বালা চুরি গেছে ত আমার ঘর হাঁট্‌কানো হচ্ছিল কেন?"

—"সকলকার ঘরেই খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে! আমার ঘরও বাদ পড়ে-নি—আমার আঁচলের খুঁটটি পর্য্যন্ত খুলে দেখা হয়েচে! সাত ঝাড়ু, সাত ঝাড়ু,—অমন কাজের মুখে সাত ঝাড়ু! আমাদেরও যাই ঠাঁই নেই মরতে, তাই—"

মোহিনী আবার বাধা দিয়া আশ্চর্য্য স্বরে বলিল, "কিন্তু আমার ঘর হাঁট্‌কানো হচ্ছিল কেন?"

—"বল্‌চি ত বাছা, গিন্নীর বালা চুরি গেছে! তাই তোমার ঘরে বালা লুকনো আছে কিনা দেখা হচ্ছিল। তা তোমার আর ভয়টা কিসের? তুমি ত আর চুরি করতে যাও-নি?"

লজ্জায় ঘৃণায় মুখ রাঙা করিয়া নিশ্বাস চাপিয়া মোহিনী বলিল, "ছিঃ ছিঃ! আমার জিনিষে হাত দেবার উনি কে? আমি চোর!"

খুকির ঝী দীর্ঘশ্বাস টানিয়া বলিল, "আর বাছা, পরের প্রাণে কি দরদ থাকে? তুমি ভদ্দরলোকের মেয়ে হ'লে কি হবে মা! তুমি যখন পরের চাকরি করচ তখন এ-সব লাঞ্ছনা মুখ বুঁজে সহ্য করতে হবে বৈকি!"

খুকির ঝী চলিয়া গেল। মোহিনী হাঁপাইতে-হাঁপাইতে মাদুরের উপরে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। তার জীবনে এমন

অপমান এই প্রথম। ভদ্রঘরের মেয়ে সে, গরিব বলিয়াই তাকে পরের বাড়ীতে চাকরি স্বীকার করিতে হইয়াছে, আর তার উপরেই কিনা এই কুৎসিত সন্দেহ! হয়ত এখনি ধরিয়া আনা হইবে, পুলিস হয়ত চাই সন্দেহ করিয়া থানায় টানিয়া লইয়া যাইবে!... ... হায়, গরিব হওয়ার কত জ্বালা! দেশে তার বুড়ো অথর্ব্ব বাপ আছেন, তাঁর জন্যই তার এই কষ্টস্বীকার। সে এখন যদি চাকরি ছাড়িয়া দেয়, তাহাহইলে বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া কাহার আশ্রয়ে গিয়া দাঁড়াইবে? অল্প-বয়সেই সে বিধবা, শ্বশুরবাড়ীতেও এমন কেউ নাই, যে তাদের দুঃখে মুখ তুলিয়া চাহিবে।

বসিয়া-বসিয়া অকূল-পাথার ভাবিতেছে, এমনসময় বাহির হইতে ডাক আসিল, "ওগো বামুন-মেয়ে, উনুনে আগুন দেওয়া হয়েচে, উনুন যে জ্বলে যাচ্চে!"——

তাড়াতাড়ি গা ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া মোহিনী রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকিল।

রান্নাঘরের জানলা দিয়া সে দেখিতে পাইল, দালানের উপরে একখানি পশমের আসনে বসিয়া কর্ত্তা জলখাবার খাইতেছেন, আর খানিক তফাতে বসিয়া গিন্নী, থাকিয়া থাকিয়া অগ্নিপাতউন্মুখ আগ্নেয় গিরির মত গুমরাইয়া উঠিতেছেন।

কর্ত্তা খুব আস্তেআস্তে বলিলেন, "হ্যাগা, একজোড়া বালা হারিয়েচে বলে তুমি এত-বেশী হাঁকপাঁক করছ কেন?"

গিন্নী খনখনে গলা তুলিয়া বলিলেন, "মরে যাই! কথার ছিরি দেখনা! ঘরের ভেতর থেকে বালা গেল চুরি, আর আমি কিনা চুপ করে' নিশ্চিন্তি হয়ে বসে থাকব! কোন্ বিধাতা তোমায় গড়েছিল গা? তার বুদ্ধিকে বলিহারি!"

কর্ত্তা খানিকক্ষণ আর-কিছু উচ্চবাচ্য করিতে ভরসা পাইলেন না। তারপর বেলের-পানার শ্বেতপাথরের বাটিটি মুখের উপরে তুলিয়া, তাহার আড়ালে মুখ ঢাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু তুমি মোহিনার ঘরে গিয়ে জিনিষ ঘাঁটছিলে কেন? সে বেচারী ভদ্দরলোকের মেয়ে, কি মনে করলে বল দেখি?"

গিন্নী খ্যাক্ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "চুলোয় যাক্! ভদ্দর-অভদ্দর কারুকে আমি বিশ্বাস করিনা। বরং, বলতে গেলে বলতে হয়, ছোটলোকের এত-বড় বুকের পাটা হয় না! ঐ বামনী-ছুঁড়ি আবার লেখাপড়া জানে, ও সব করতে পারে!"

—"চুপ চুপ, শুনতে পাবে যে!"

—"শুনুক-গে! ঝী-বামুনকেও আবার ভয় করে' চলতে হবে নাকি?"

—"ছিঃ, এ-সব তোমার অন্যায় হচ্ছে!"

—"থামো, থামো! আধ চিবুচ্ছ, আধ চিবোও! চিবিয়ে-চিবিয়ে ফের যদি কথা কইবে ত টের পাইয়ে দেব মজাটা!"

এক ধমকেই কর্ত্তার মুখে রা হারিয়া গেল। দুর্দ্দান্ত গুরুমহাশয়ের উদ্যত বেতের সামনে দুষ্ট ছেলের মুখ যেমন হয়, ঠিক তেমনিধারা মুখ করিয়া কর্ত্তা হেঁট-মাথায় মাটির দিকে ক্যাল্‌ফেলে চোখ মেলিয়া রহিলেন।

....

সে রাত্রে মোহিনী আর চোখ মুদিতে পারিল না। গিন্নীর নিষ্ঠুর কথাগুলো কাঁটার মত পটুপটু করিয়া তাহার বুকের মাঝখানে বিঁধিতে লাগিল। সে বেশ বুঝিল, গিন্নীর সন্দেহ সব-চেয়ে বেশী তাহার উপরেই। রাগে অপমানে ঘৃণায় ভয়ে মোহিনীর প্রাণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে মনে-মনে পণ করিল, না-খাইয়া মরিবে তাও ভালো, তবু এ-বাড়ীতে আর এক-রাতও থাকিবে না। ... ...

ভোরবেলা উঠিয়াই সব-আগে মোহিনী তার প্যাট্‌রা গুছাইয়া পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি বাঁধিতে সুরু করিল। এ-ঘরে আর এক-দণ্ড তিষ্ঠিতেও তার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল।

এমনসময় তাহার ঘরের সুমুখ দিয়া যাইতে-যাইতে তাহাকে দেখিয়া কর্ত্তা হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সব কি হচ্চে, মোহিনী?"

মোহিনী নতমুখে, মৃদুস্বরে বলিল, "গিন্নী-মা কাল আমায় যে অপমানটা করেছেন, তারপরেও এ-বাড়ীতে আমার আর থাকা পোষায় না। তাই আমি জিনিষ-পত্তর্ গোছাচ্ছি।"

কর্ত্তা একবার ভয়ে-ভয়ে চারিদিকে চাহিলেন। কেউ কোথাও নাই দেখিয়া, আস্তে-আস্তে তিনি ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপরে কাতর স্বরে বলিলেন, "আমি সব বুঝেছি মোহিনী! ওদের যা-খুসি করুক, তাবলে তুমি কেন চলে যাবে?"

মোহিনী মুখে কিছু বলিল না—আপন-মনে যেমন জিনিষ গুছাইতেছিল, তেম্‌নি গুছাইতে লাগিল।

কর্ত্তাও খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিলেন, কী যে বলিবেন সেটা যেন তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।... ... তারপর ধীরে-ধীরে বলিলেন, "গিন্নীকে জান ত, তার মাথা একটুতেই অম্‌নি গরম হয়ে ওঠে। সে পাগ্‌লীর কথায় কি আর রাগ কর্‌তে আছে?"

মোহিনী কোন উত্তর দিল না।

—"মোহিনী, গিন্নীর যে দোষ হয়েচে, এ আমি মেনে নিচ্ছি। লক্ষীটি, তুমি কিছু মনে কোরো না!"

মোহিনী এবারেও জবাব দিল না;—পোঁট্‌লাটা আরো ভালো করিয়া বাঁধিতে লাগিল। সে বুঝিল, কর্ত্তার কাকুতি-মিনতির মূল্য কিছুই নাই—এই ভীতু ভালোমানুষ লোকটিকে এ বাড়ীতে কেহই ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না—এমন-কি ঝী-চাকররা পর্য্যন্ত! তাঁহাকে প্রতিপদে সকলেরই মুখ চাহিয়া চলিতে হয়,—এ সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা হইতেছেন গৃহিণী! সুতরাং কর্ত্তার কথায় কেমন-করিয়া সে এ-বাড়ীতে থাকিবে?

মোহিনীকে তখনো নীরব দেখিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "হুঁ!... ...এত করে' বল্‌চি, তবু তুমি কথা কইলে না! আচ্ছা, কি-কর্‌লে তুমি তুষ্ট হও? আমাকে মাপ চাইতে বল? বেশ, যা হয়েচে, তার জন্যে তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। ক্ষমা! বুঝলে? আমি ক্ষমা চাইছি!"

কর্ত্তা ঘরের এদিকে-ওদিকে একটু

বেড়াইয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "শুন্‌ছ মোহিনী? আমি ক্ষমা চাইছি!"

মোহিনী প্রাণের আবেগ চাপিয়া, কর্ত্তার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, "আপনার কোন দোষ নেই, আমি জানি আমার জন্যে কেন আপনি কষ্ট পাচ্ছেন?"

—"না মোহিনী, তোমার জন্যে আমি কষ্ট পাচ্ছি না!…‥কিন্তু, কিন্তু, তুমি এখান থেকে চলে যেও না! বল, থাকবে?"

মোহিনী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

কর্ত্তা শূন্যদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চাহিয়া, কোঁচার খুঁট্‌টা লইয়া আঙুলে জড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ দেখিলে বোঝা যায়, তিনি যেন একমনে কি ভাবিতেছেন।

মোহিনীর পোঁট্‌লা গুছানো শেষ হইল।

কর্ত্তা ভাঙা-ভাঙা গলায় বলিলেন, "মোহিনী, তুমি জাননা, তোমার ব্যবহারে আমার কি কষ্ট হচ্ছে! তুমি কি আমাকে জোড়হাত করতে বল?—কিসে তোমার মন ফিরবে? যে কথা আমি কারুকে বলি-নি, কারুকে বলবও না ভেবেছিলুম, তুমি কি তবে সেই কথাই শুন্‌তে চাও? বেশ, শোনো।"

মোহিনী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

—"গিন্নীর বালা নিয়েছি আমিই। কেমন, এইবার তুমি তুষ্ট হ'লে ত? কিন্তু সাবধান, এ-কথা যেন আর কেউ শুন্‌তে না পায়!"

মোহিনী যেন নিজের কাণকেই বিশ্বাস করিতে পারিল না! এ কী কথা! এও কি সম্ভব?

—"আমার এক বন্ধুর অত্যন্ত টাকার দরকার হয়েছিল। ঐ বালা বাঁধা রেখে তাকে আমি টাকা দিয়েছি। কি করব, এ ছাড়া আমার আর উপায়ও ছিল না। গিন্নীর কাছে হাত পাত্‌লে আমি সিকি পয়সাও পেতুম না!"

মোহিনী থামিয়া থামিয়া বলিল, "কিন্তু—তাহলে চুরি—"

—"না, আমি চুরি করি-নি। ও বালা দিয়েচে কে? আমিই দিয়েচি! কিন্তু গিন্নী ত ভুলেও তা ভাবেন না—তিনি আমার সর্ব্বস্ব দখল করে' বসে আছেন, একটা পয়সার দরকার হ'লে আমাকে তাঁর কাছে হাত পাত্‌তে হয়। কিন্তু কি করব বল—এজন্যে ত আমি নিজের স্ত্রীর নামে আদালতে নালিস করতে পারি না!… যাক্‌ সে কথা। এখন তুমি ত আর আমাকে ছেড়ে যাবে না?"

—"না, এখানে আমার আর থাকতে ইচ্ছে নেই!"

কর্ত্তা হতাশ, দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "বেশ, তবে যাও। এখান থেকে গেলে তুমি সুখী হবে বটে, কিন্তু এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে আমার দিকে মুখ তুলে চায়, এমন আর কেউ থাকবে না! যতদিন তুমি এসেচ, তোমার কাছ থেকে আমি মায়ের আদর, মেয়ের যত্ন পেয়েচি। তুমি চলে গেলে আমার বাঁচা-মরা দুই সমান হবে!"

বাহির হইতে গিন্নীর গলা শোনা গেল—"খুকির ঝী, অ খুকির ঝী! কর্ত্তাকে ডেকে দে ত রে!"

বেচারী কর্ত্তা! গিন্নীর গলা শুনিয়াই

তাঁহার পেটের পিলে যেন চম্‌কাইয়া গেল—তাড়াতাড়ি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। যাইবার সময়ে করুণ মিনতি-ভরা চোখে মোহিনীর দিকে চাহিয়া, চুপিচুপি সুধু বলিয়া গেলেন, "যাস্‌-নে মা, যাস্‌নে!"

…… …… .. আঁচলে চোখের জল মুছিয়া মোহিনী, পোঁটলা-পুঁটুলি সব আবার খুলিয়া ফেলিল। বাহিরে গিয়া খাঁক-ঝীকে ডাকিয়া বলিল, "অ খাকী! বেলা হোলো যে, আজ কি আর উনুনে আগুণ দিতে হবে না না?"*

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বক্রোক্তি

'রাঘব-পাণ্ডবীয়' কাব্যে কবিরাজ সগর্ব্বে বলিয়াছেন—

> সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ো
> বক্রোক্তি-মার্গ-নিপুণাশ্চতুর্থো
> বিদ্যতে ন বা॥ (১)

সুবন্ধু বাণভট্ট ও কবিরাজ এই তিনজন কবি বক্রোক্তি-মার্গ-নিপুণ; ইঁহাদের চতুর্থ আছে কি না সন্দেহ। প্রাচীন কবিগণের আত্মরচনার এরূপ প্রশংসা সংস্কৃত-সাহিত্যে বিরল নহে, কিন্তু 'বক্রোক্তি' শব্দটি এখানে কি অর্থে ব্যবহার করিয়া কবিরাজ আত্ম-কবিত্বশক্তির গরিমা প্রচার করিয়াছেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। সুবন্ধু ও বাণভট্ট, কবিরাজের ন্যায়, স্বরচনার বহু স্তুতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু 'বক্রোক্তি'-মার্গের কথা কোথাও বলেন নাই। বরং বাণভট্ট শ্লেষ ও শ্লিষ্ট রচনার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন (২) এবং সুবন্ধুও 'বাসবদত্তা'র কোন প্রসিদ্ধ শ্লোকে স্বীয় শ্লেষপ্রয়োগ-চাতুর্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন (৩)। সুতরাং কবিরাজের এই 'বক্রোক্তি' যে আধুনিক আলঙ্কারিকগণের নির্দ্দিষ্ট শ্লেষ-সম্পৃক্ত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যমূলক অলঙ্কার বিশেষ তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং তাঁহার সময় এই 'শ্লেষ-বক্রোক্তি' ও 'কাকু-বক্রোক্তি'র প্রয়োগ-চাতুর্য্য কবিবর্গের গর্ব্ব-গৌরবের বিষয় ছিল বলিয়া বোধ হয়।

আধুনিক আলঙ্কারিকগণ বক্রোক্তির দ্বারা যে বিশিষ্ট অলঙ্কারের নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার লক্ষণ 'কাব্যপ্রকাশে' (৪) এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—

> যদুক্তমন্যথা বাক্যমন্যথাঽন্যেন যোজ্যতে।
> শ্লেষেণ কাকা বা জ্ঞেয়া সা বক্রোক্তিস্তথা দ্বিধা॥

* লেখকের অনুসরণে।

(১) রাঘবপাণ্ডবীয়, ১।৪১

(২) কাদম্বরী (Ed. Peterson)—'নিরন্তরশ্লেষঘনাঃ (কথাঃ)' পৃঃ ১২ ইত্যাদি

(৩) 'প্রত্যক্ষরশ্লেষময়প্রপঞ্চবিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধিং প্রবন্ধম্।
সরস্বতী-দত্ত-বরপ্রসাদশ্চক্রে সুবন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ॥ (বাসবদত্তা, শ্রীবাণীবিলাস সংস্করণ পৃঃ ২৫৭-৮)

(৪) কাব্যপ্রকাশ, ৯।১

রুয্যকও তাঁহার 'অলঙ্কারসূত্রে' (১) বলিয়াছেন —অন্যথোক্তস্য বাক্যস্য কাকুশ্লেষাভ্যামন্যথা-কথনং বক্রোক্তিঃ। সাহিত্যদর্পণকারও (২) ইঁহাদের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন

অন্যস্যান্যার্থকং বাক্যমন্যথা যোজয়েদ্ যদি
অন্যঃ শ্লেষেণ কাক্বা বা সা বক্রোক্তিস্ততো দ্বিধা ॥

সুতরাং কাব্যপ্রকাশের পরবর্ত্তী আলঙ্কারিক-গণের মধ্যে বক্রোক্তি সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ নাই (৩)। যদি কেহ কোনও বিশিষ্ট অর্থে কোনও কথা বলেন এবং অন্য লোক ইহাকে অন্য অর্থে গ্রহণ বা প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই অলঙ্কারের নাম বক্রোক্তি। এরূপ অন্যথা-গ্রহণ দুই প্রকারে হইতে পারে —শ্লেষের দ্বারা এবং কাকু বা উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। সুতরাং ইঁহাদের মতে বক্রোক্তি কথার এক প্রকার ব্যাজ বা কপট প্রয়োগ (pretended speech) এবং ইহা প্রধানতঃ শ্লেষ (paronomasia) বা কাকু (intonation) এই দুয়ের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য রুয্যক ইহাকে গূঢ়ার্থপ্রতীতি মূলক (based on the understanding of a secret sense) এবং 'একাবলী'কার অপহ্নবমূলক (based on concealment) অলঙ্কার বলিয়া ধরিয়াছেন। ইহা এক প্রকার বাক্‌চাতুর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং ইহাকে crooked speech বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ইহার উদাহরণস্বরূপ রুয্যক (৪) এই শ্লোকটি দিয়াছেন—

'ত্বং হালাহলভৃৎ করোষি
মনসো মূর্চ্ছাং মমালিঙ্গিতো
হালাং নৈব বিভর্মি নৈব চ
হলং মুগ্ধেঽস্মি কিং হালিকঃ।
সত্যং হালিকতৈব তে সমুচিতা
সক্তস্য গোবাহনে
বক্রোক্ত্যেতি জিতো হিমাদ্রিসুতয়া
স্মেরোঽবতাদ্ বঃ শিবঃ ॥'

গৌরী মহাদেবকে বলিতেছেন—'তুমি কালকূটধারী ('হালাহলভৃৎ'), তোমার আলিঙ্গনে আমার মন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।' মহাদেব, 'হালাহলভৃৎ' বাক্যটির উপর শ্লেষ ধরিয়া, উত্তর দিলেন—'আমি হালা (সুরা) সেবন করি না, হলও ধারণ করি না। হে মুগ্ধে, আমি কি হালিক

(১) অলঙ্কারসূত্র, ৭৭ (Triv. Ed.) পৃঃ ২১৭

(২) সাহিত্যদর্পণ, ১০।৯

(৩) যথা হেমচন্দ্র, কাব্যানুশাসন, পৃঃ ২৩৪—'উক্তস্যান্যেনান্যথা শ্লেষাদ্ধক্তি র্বক্রোক্তিঃ'। বাগ্‌ভট, কাব্যানুশাসন, পৃঃ ৪৯—'পরোক্তস্য শ্লেষেণ কাক্বা বান্যথোক্তি র্বক্রোক্তিঃ'। বিদ্যাধর, একাবলী, পৃঃ ৩২৬ (Bombay sansk. ser. ed)—'বাক্যং যদান্যথোক্তং কেনাপ্যন্যেন যোজ্যতেঽপরথা। তৎকাকুশ্লেষাভ্যাং যদি বক্রোক্তিস্তদা স্ফুরতি॥' বিদ্যানাথ, প্রতাপরুদ্রীয়, (Bombay sans. ser. ed.) পৃঃ ৪১১—'অন্যথোক্তস্য বাক্যস্য কাক্বা শ্লেষেণ বা ভবেৎ। অন্যথা যোজনং যত্র সা বক্রোক্তি র্নিগদ্যতে॥' তথা অপ্পয় দীক্ষিত, কুবলয়ানন্দ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ), পৃঃ ১৬৩ ইত্যাদি।

(৪) রত্নাকর কবির 'বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা'য় (কাব্যমালা ১) এইরূপ বক্রোক্তিমূলক শ্লোকের যথেষ্ট নমুনা পাওয়া যাইবে।

(চাষা)?' গৌরী জবাব দিলেন—'সত্যই তোমায় হালিক বলা উচিত, কারণ তুমি গোবাহন (এক অর্থে বৃষবাহন, অন্য অর্থে গোবহনপ্রযোজক)। এইরূপ হিমাদ্রিতনয়ার বক্রোক্তির দ্বারা পরাজিত স্মিতানন শিব তোমাদের মঙ্গল করুন। ইহা শ্লেষ-বক্রোক্তির উদাহরণ। এইরূপ কাকুবক্রোক্তি যথা—

'গুরুপরতন্ত্রতয়া দূরতরং
দেশমুদ্যতো গন্তুম্।
অলিকুলকোকিলললিতে নৈষ্যতি সখি
সুরভিসময়েঽসৌ॥'

গুরুজনের অধীন বলিয়া ইনি দূরতর দেশে যাইতে উদ্যত; হে সখি, অলিকুল-কোকিলললিতে বসন্ত-সময়ে ইনি আর আসিবেন না। এস্থলে এই 'নৈষ্যতি' বাক্যটি উচ্চারণ-প্রভেদে নায়িকার মুখে 'আসিবেন না' এই অর্থ বুঝাইবে; সখীর মুখে 'আসিবেন না?' অর্থাৎ 'অবশ্যই আসিবেন' এইরূপ অর্থ বুঝাইবে।

আধুনিক আলঙ্কারিকগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিলেও, ভামহ দণ্ডী প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ যাহাকে 'বক্রোক্তি' বলিয়াছেন তাহা শুধু এই সংকীর্ণ অর্থজ্ঞাপক বাগ্‌বৈদগ্ধতা নহে।

ভামহ এই শ্রেণীর কৃত্রিমরচনার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না কারণ তাঁহার মতে 'রহিতা সৎকবিত্বেন কীদৃশী বাগ্‌বিদগ্ধতা'। (১) তিনি বলেন কাব্য যদি শাস্ত্রের মত দুর্ব্বোধ্য ও ব্যাখ্যাগম্য হয়, তবে পণ্ডিত-গণেরই আনন্দ অপণ্ডিত লোক মারা পড়ে—

কাব্যান্যপি যদীমানি ব্যাখ্যাগম্যানি শাস্ত্রবৎ।
উৎসবঃ সুধিয়ামেব হন্ত দুর্মেধসো হতাঃ॥ (২)

ইহার জবাবে পাণ্ডিত্যাভিমানী ভট্টিকাব্য-রচয়িতা ভামহকে উপহাস করিয়া স্বরচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া॥ (৩)

কিন্তু বিদ্বৎপ্রিয় হইলেও এরূপ কাব্য লোকচিত্তানুরঞ্জনে অসমর্থ। সেইজন্য ভামহের মতে, সৎকাব্য 'নাতি-সমস্তার্থ' 'মধুর' 'শ্রব্য' এবং 'আবিদ্বদঙ্গনাবাল-প্রতীতার্থপ্রসাদবৎ' হইবে। (৪) কিন্তু এরূপ সকল-লোক-বোধগম্য, বিশদ, ও স্বচ্ছ হইলেও, তাহা উন্নত ও বৈচিত্র্যযুক্ত হওয়া আবশ্যক। 'গতোঽস্তমর্কো, ভাতীন্দু, র্যাতি বাসায় পক্ষিণঃ' প্রভৃতি বাক্য দণ্ডী (৫) প্রশংসা করিলেও, ভামহ সুখ্যাতি করেন নাই; (৬) কারণ এই সকল উদাহরণে বৈচিত্র্য বা 'বক্রতা' (happy turn) নাই। ইহা মোটামুটি সাধাসিধে কথা; ইহা, তাহার মতে, 'বার্ত্তা' মাত্র। সুতরাং ইহার কাব্যত্ব কিছুই নাই; কারণ 'বক্রোক্তি' (imaginative speech) ভিন্ন শুধু স্বভাবোক্তির (natural speech) দ্বারা কাব্যত্ব নিষ্পন্ন হয় না।

ন নিতান্তা দিমাত্রেণ জায়তে চারুতা গিরাম্।
বক্রাভিধেয়শব্দোক্তিরিষ্টা বাচামলঙ্কৃতিঃ॥ (৭)

(১) ভামহালঙ্কার, ১।৪
(২) ভামহালঙ্কার, ২।২০
(৩) ভট্টিকাব্য, ২২।৩৪
(৪) ভামহালঙ্কার, ২।৩
(৫) কাব্যাদর্শ, ২।২৪৪
(৬) ভামহালঙ্কার, ২।৮৭
(৭) ভামহালঙ্কার, ১।৩৬

বাক্যের চারুত্ব-নিষ্পত্তির জন্ত 'বক্রোক্তি'র প্রয়োজন। সেইজন্য ভামহ কবিসম্প্রদায়কে 'বক্রবাক্' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (১)। এই বক্রবাক্যতা, তাঁহার মতে, কবিপ্রতিভাব অনুবদ্ধি; কারণ 'কাব্যং তু জায়তে জাতু কস্যচিৎ প্রতিভাবতঃ'। (২) অন্যত্র কাব্যের কথা আখ্যায়িকা প্রভৃতি ভেদনিরূপণ করিয়া ভামহ বলিয়াছেন—'যুক্তং বক্রস্বভাবোক্ত্যা সর্ব্বমেবৈতদিষ্যতে।' (৩) সুতরাং এই 'বক্রস্বভাব' উক্তির প্রয়োজন সকল কাব্যেই আছে। এইজন্যই অন্য আলঙ্কারিকগণ যাহাকে স্বভাবোক্তি বলিয়াছেন ভামহ তাহাকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; এমন কি তাহাকে অলঙ্কার হিসাবেও স্থান দিতে রাজি নহেন। (৪)

এই বক্রোক্তির স্বরূপ কি তাহা ভামহ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৮১—৮৬ শ্লোকে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমে 'অতিশয়োক্তি'র কথা বলিয়াছেন।* এই 'অতিশয়োক্তি' পরবর্ত্তী আলঙ্কারিক-বর্ণিত সংকীর্ণ অলঙ্কারমাত্র (hyperbole) নহে; ইহা অলঙ্কাররূপে লক্ষিত হইলেও, একপ্রকার heightened speech বা উৎকর্ষোক্তিমাত্র; কারণ ইহা 'নিমিত্ততো বচো যত্তু লোকাতিক্রান্ত-গোচরম্' (৫)। তৎপরে ইহার উদাহরণ দিয়া ভামহ বলিয়াছেন—

সৈষা সর্ব্বৈব বক্রোক্তিরনয়াঽর্থো বিভাব্যতে।
যত্নোঽস্যাং কবিনা কার্য্যঃ
কোঽলঙ্কারোঽনয়া বিনা॥ (৬)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত (৭) বলিয়াছেন—'যাতিশয়োক্তি র্লক্ষিতা সৈব সর্ব্বা বক্রোক্তিঃ' সুতরাং অতিশয়োক্তি এখানে বক্রোক্তির নামান্তরমাত্র এবং অতিশয়োক্তির মধ্যে যে লোকাতিক্রান্তগোচরতা আছে তাহাই বক্রোক্তির বিশিষ্টতা। 'বক্রতা'র অর্থে অবিনব-গুপ্ত বলিয়াছেন (৮)—'শব্দস্য হি বক্রতা অভিধেয়স্য চ বক্রতা লোকোত্তীর্ণেন রূপেণাবস্থানমিতি'।

সুতরাং পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ অতি-শয়োক্তি ও বক্রোক্তির যাহা লক্ষণ ধরিয়াছেন তাহা ভামহের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উদ্ভট, ভামহের অনুবর্ত্তী হইলেও, বক্রোক্তির কথা কিছুই বলেন নাই; এবং অতিশয়োক্তির বর্ণনায়, ভামহের অনুকরণে, 'নিমিত্ততো যত্তু বচো লোকাতিক্রান্তগোচরম্' (৯) বলা হইয়াছে বটে, তথাপি তাঁহার ধারণায়

---

(১) ভামহালঙ্কার, ৬।২ (২) ভামহালঙ্কার, ১।৫
(৩) ভামহালঙ্কার, ১।৩০ (৪) ভামহালঙ্কার, ২।৯৩-৯৪
(৫) ভামহালঙ্কার, ২।৮১ (৬) ভামহালঙ্কার, ২।৮৫
(৭) ধ্বন্যালোক, লোচন-টীকা, পৃঃ ২০৮
(৮) উদ্ভট, কাব্যালঙ্কার-সংগ্রহ, (নির্ণয়-সাগর সংস্করণ), পৃঃ ৪০; প্রতিহারেন্দুরাজের টীকা, পৃঃ ৪০-৪১ ও দ্রষ্টব্য।
(৯) রুয্যক, বিশ্বনাথ প্রভৃতি (১) ভেদেঽপ্যভেদঃ (২) অভেদেঽপি ভেদঃ (৩) অসম্বন্ধে সম্বন্ধঃ (৪) সম্বন্ধেঽপ্যসম্বন্ধঃ এবং (৫) কার্য্যকারণয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যাত্যয়ঃ এইরূপ অতিশয়োক্তির পাঁচটি ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন।

মধ্যে পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকদের 'অতিশয়োক্তি' (hyperbole) ও তাহার কয়েকটি ভেদের স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এ সমস্ত সূক্ষ্ম ভেদ-নিরূপণ ভামহে নাই। অতিশয়োক্তিকে ভামহ কেবল বিশিষ্ট অলঙ্কারমাত্র বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ইহাকে সমস্ত অলঙ্কারের আধার বা মূল-স্বরূপ (basal principle) ধরিয়াছেন (১); কারণ কোঽলঙ্কারোঽনয়া বিনা'। সেইজন্য ইহাকে বক্রোক্তি (imaginative speech) এই বিশিষ্ট সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভামহ-নির্দ্দিষ্ট এই অপরূপ বক্রোক্তিকে আমরা কাব্যের 'গুণ' কি 'অলঙ্কার' হিসাবে ধরিব ? এ বিষয়ে ভামহ স্পষ্ট কিছু বলেন নাই। প্রথমতঃ ভামহ গুণ ও অলঙ্কারের বিশেষ পার্থক্য করেন নাই; 'ভাবিক'কে তিনি গুণও বলিয়ছেন, অলঙ্কারও বলিয়াছেন। এমন কি ভামহানুকারী উদ্ভটও গুণ ও অলঙ্কারের সাম্যেরই সূচনা করিয়াছেন। (২) গুণ ও অলঙ্কারের প্রভেদ, দণ্ডী ইঙ্গিত করিলেও, বামনই সর্ব্বপ্রথম স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৩)। দ্বিতীয়তঃ ভামহ অতিশয়োক্তির কথা অন্যান্য পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিদিগকে অনুসরণ করিয়া (৪) অলঙ্কারের প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু যাহাকে বক্রোক্তি বলিয়া অতিশয়োক্তির সহিত সমান করিতেছেন তাহার স্বরূপ কি, সে কথা সেখানে কিছুই নির্দ্দেশ করেন নাই। প্রথম পরিচ্ছেদে কাব্যের ভেদাদিনিরূপণ করিয়া ভামহ বলিয়াছেন যে বক্রোক্তি না থাকিলে ইহাদের কাব্যত্ব নিষ্ফল (৫)। তৎপরে এ কথা আরও বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছেন যে এই 'বক্রাভিধেয়শব্দোক্তি' সর্ব্বত্র কবিগণের অভীষ্ট কাব্যসম্পৎ (৬)। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে, মাধুর্য্য ও প্রসাদের প্রশংসা করিয়া, 'অন্যৈরুদাহৃতাঃ' (৭) এই কথা বলিয়া অনুপ্রাস যমকাদির উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে 'অপরাঃ' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, আক্ষেপ অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি ছয়টি অধিক অলঙ্কারের কথা বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অতিশয়োক্তিরও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভামহ অতিশয়োক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, দণ্ডীও (৮) প্রায় অনেকটা তাহাই বলিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে তৎকাল-প্রচলিত বা কালক্রমাগত ধারণা এবং ভামহের নিজস্ব মত নহে, তাহা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এই অতিশয়োক্তির কথা বলিয়াই ভামহ, 'সৈষা সর্ব্বৈব বক্রোক্তিঃ' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া ইতিপূর্ব্বে যে বক্রোক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা এই চিরন্তন অতি-

(১) ধ্বন্যালোকে আনন্দবর্দ্ধন ও লোচনটীকায় অভিনবগুপ্তও এই কথা বলিয়াছেন, পৃঃ ২০৭-৮

(২) রুয্যক, অলঙ্কারসূত্র, (Triv. Ed), পৃঃ ৭,—"উদ্ভটাদিভিস্তু গুণালঙ্কারাণাং প্রায়শঃ সাম্যমেব সূচিতম্।"

(৩) বামন, কাব্যালঙ্কারসূত্র, ৩।১।১-২

(৪) ভামহালঙ্কার, ২।৪, ২।৬৬

(৫) ভামহালঙ্কার, ১।৩০

(৬) ভামহালঙ্কার, ১।৩৬,

(৭) ভামহালঙ্কার, ২।৪

(৮) কাব্যাদর্শ, ২।২১৪

শব্দোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে এই কথা দেখাইয়াছেন। সুতরাং বক্রোক্তিকে তিনি যে শুধু অলঙ্কারমাত্র বলিয়া ধরিয়াছেন তাহা এ স্থল হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায় না। আবার ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে ভামহ 'হেতু' 'সূক্ষ্ম', 'লেশ' প্রভৃতি অলঙ্কারের অলঙ্কারত্ব স্বীকার করেন নাই, কারণ ইহাদের মধ্যে বক্রোক্তি নাই ('বক্রোক্ত্যনভিধানতঃ')। সুতরাং বক্রোক্তিকে যদি তিনি শুধু অলঙ্কার হিসাবে ধরিতেন, তবে বক্রোক্তি-যুক্ত যে সমস্ত অলঙ্কার তিনি উদাহৃত করিয়াছেন সেগুলিকে 'সংসৃষ্টি' বা 'সংকীর্ণ' (mixed) অলঙ্কার বলিয়া অভিহিত করিতেন। এরূপ সংসৃষ্টির কথা ভামহ বলেন নাই। বক্রোক্তিযুক্ত হইলে কোনও অলঙ্কার 'সংসৃষ্ট' হয় না কারণ বক্রোক্তি অলঙ্কার নহে। ইহা সমস্ত অলঙ্কারের মূলস্বরূপ (basis)।

গ্রন্থের অন্যান্য স্থলে যেখানে বক্রোক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, ভামহ কোথাও ইহাকে অলঙ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। বরং একস্থলে ইহাকে 'বক্রাভিধেয়া শব্দোক্তিঃ' (১) বলিয়াছেন। আর একস্থলে আছে—'তদেভিরঙ্গৈ র্ভূষ্যন্তে ভূষণোপবনস্রজঃ। বাচাং বক্রার্থশব্দোক্তিরলঙ্কারায় কল্পতে।' (২) এখানে 'অলঙ্কার' শব্দের অর্থ 'ভূষণ' বা 'প্রসাধন'; সুতরাং বক্রোক্তি শব্দোক্তির ভেদমাত্র (variety of speech)। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় ভামহ কবিগণকে কেন বক্রবাক্ বলিয়াছেন

কিন্তু এই বক্রোক্তির ধারণা ভামহের নিজস্ব বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বক্রোক্তির কথা সমগ্র গ্রন্থে কোথাও বিস্তারিত ভাবে পরিস্কার করিয়া বলেন নাই। এই ধারণা তাঁহার সময়ে বোধ হয় এত সুপরিজ্ঞাত ছিল যে তিনি ইহার উল্লেখমাত্র যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহা প্রচলিত থাকিলেও, ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা বোধ হয় ভামহ করিয়াছেন; কারণ অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট যথেষ্ট ঋণ স্বীকার করিলেও, এ বিষয়ে অন্য কোনও অলঙ্কারিকের উল্লেখ করেন নাই।

ভামহের পরবর্ত্তী দণ্ডী কোথাও বক্রোক্তির লক্ষণনির্দ্দেশ করেন নাই, কেবল একটিমাত্র শ্লোকে বলিয়াছেন—'দ্বিধা ভিন্নং স্বভাবোক্তি র্বক্রোক্তিশ্চেতি বাঙ্ময়ম্।' (৩) অর্থাৎ 'বাঙ্ময়' (poetical speech) দুই ভাগে বিভক্ত—স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি। প্রথম পাঠে বোধ হয় যে দণ্ডী এখানে, ভামহের ধারণা অনুসরণ করিয়া, স্বভাবোক্তি (natural speech) ও বক্রোক্তি (imaginative speech) এই দুই প্রকার বাক্যের ভেদ করিতেছেন। কিন্তু দণ্ডী কি প্রসঙ্গে এই শ্লোকাংশ বলিয়াছেন তাহা না বুঝিলে ইহার প্রকৃত অর্থ বোঝা যাইবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অলঙ্কারলক্ষণ-প্রসঙ্গে দণ্ডী প্রথম 'স্বভাবোক্তি'র এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'নানাবস্থং পদার্থানাং রূপং সাক্ষাদ্বিবৃণ্বতী। স্বভাবোক্তিশ্চ জাতিশ্চেত্যাদ্যা সালঙ্কৃতি র্যথা॥ (৪) সুতরাং এই জাতি বা

(১) ভামহালঙ্কার, ১।৩৬

(২) ভামহালঙ্কার, ৫।৬৬

(৩) কাব্যাদর্শ, ২।৩৬৩

(৪) কাব্যাদর্শ, ২।৮

স্বভাবোক্তি, তাঁহার মতে, 'আদ্যা অলঙ্কৃতিঃ'। তৎপরে অন্যান্য স্বতন্ত্র কাব্যালঙ্কারের বর্ণনা করিয়া এবং ৩৫৯ হইতে ৩৬২ শ্লোকে সংসৃষ্টি অলঙ্কারের কথা বলিয়া, তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে তিনি বলিতেছেন—'শ্লেষঃ সর্ব্বাসু পুষ্ণাতি প্রায়ো বক্রোক্তিষু শ্রিয়ম্। দ্বিধা ভিন্নং স্বভাবোক্তি র্বক্রোক্তিশ্চেতি বাঙ্ময়ম্॥' এখানে বক্রোক্তির অর্থে, আদ্য-অলঙ্কার স্বভাবোক্তি ভিন্ন, অন্য সমস্ত অলঙ্কারের সমবায় বুঝাইতেছে; কারণ, সংসৃষ্টির কথা বলিয়া দণ্ডী বলিতেছেন যে শ্লেষ (স্বভাবোক্তি ভিন্ন) সমস্ত অলঙ্কারের শোভাবিধান করিয়া থাকে। অর্থাৎ এই হিসাবে স্বভাবোক্তি ভিন্ন (ইহার মধ্যে শ্লেষের প্রসর নাই) অন্য সমস্ত অলঙ্কারকে শ্লেষসংযুক্ত বলিয়া সংসৃষ্টি-অলঙ্কার পর্য্যায়ে গণ্য করা যাইতে পারে। তাহা হইলে বক্রোক্তি শব্দ এ স্থলে অলঙ্কার-সমুচ্চয়ের একটি সংজ্ঞামাত্র (collective name)। বক্রোক্তি বলিলে স্বভাবোক্তি ব্যতীত সমস্ত অলঙ্কার-সমষ্টি বুঝায়। সুতরাং বক্রোক্তির এখানে একটি নূতন অর্থ পাওয়া গেল। ইহা ভামহ-বর্ণিত অলঙ্কারের মূলতত্ত্বস্বরূপ (basal principle) সোচ্ছ্রায়-উক্তি (heightened speech) নহে; অলঙ্কার সমূহের সমবায় সূচক নামমাত্র। সুতরাং বক্রোক্তি এখানে 'অলঙ্কৃত উক্তি' (rhetorical speech)।

এই অর্থ গ্রহণ করাই যে সমীচীন এবং দণ্ডী যে এখানে ভামহের ধারণার উল্লেখ করেন নাই, তাহা প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের আধুনিক টীকায় পরিস্ফুট না হইলেও, কাব্যাদর্শের প্রাচীনতর হৃদয়ঙ্গমাখ্য টীকায় স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; যথা - 'শ্লেষ ইতি। শ্লেষো ন কেবলমর্থান্তরন্যাসে এব, সর্ব্বাসু বক্রোক্তিষ্বপি, শ্রিয়ং জনয়তি। বাঙ্ময়ন্তু দ্বৈবিধ্যং দর্শয়তি ভিন্নমিতি। স্বভাবোক্তিরাদ্যালঙ্কারঃ, বক্রোক্তিশব্দেন উপমাদয়ঃ সঙ্কীর্ণপর্য্যন্তা অলঙ্কারা উচ্যন্তে।' (১) তরুণবাচস্পতি ইহার অন্য অর্থ করিয়াছেন—'শ্লেষ ইতি। স্বব্যাখ্যানব্যক্তিরিক্তা সর্ব্বালঙ্কৃতিঃ বক্রোক্তিরিতি উচ্যতে।' (২) তথাপি তিনিও দণ্ডীর বক্রোক্তি এবং ভামহের বক্রোক্তিকে এক করেন নাই। ভামহ বক্রোক্তি বলিয়া যাহা বুঝিয়াছেন তাহা দণ্ডীর 'কান্তি' গুণ ও 'অতিশয়োক্তি' অলঙ্কারের মধ্যে কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। দণ্ডীর ও ভামহের অতিশয়োক্তির মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য নাই* তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সমস্ত অলঙ্কারান্তর্ভূত হইলেও, দণ্ডী অতিশয়োক্তিকে কোথায় পৃথক্ অলঙ্কার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা প্রেমচন্দ্র তাঁহার টীকায় এইরূপ বুঝাইয়াছেন—'এবং সর্ব্বত্রৈবাতিশয়োক্তিসত্ত্বেঽপি বৈচিত্র্যান্তরেণালঙ্কারান্তরব্যপদেশাঃ, বৈচিত্র্যান্তরাভাবে ত্বতিশয়োক্তিব্যপদেশ ইতি বোধ্যম্।' (৩)

দণ্ডী যে কেন শ্লেষের কথা বক্রোক্তির

(১) কাব্যাদর্শ (রঙ্গাচার্য্য সংস্করণ) পৃঃ ২০২

(২) কাব্যাদর্শ (রঙ্গাচার্য্য সংস্করণ) পৃঃ ২০১

(৩) কাব্যাদর্শ (প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ সংস্করণ) পৃঃ ২২৩

মধ্যে আনিয়াছেন তাহা এখন বোঝা গেল। তাঁহার মতে শ্লেষ সমস্ত অলঙ্কারের বা বক্রোক্তির শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকে; সেই জন্য তাঁহার গ্রন্থে সংকীর্ণ অলঙ্কারের পর ইহার উল্লেখ সমীচীন। রুয্যক প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণের যে 'শ্লেষবক্রোক্তি'র ধারণা এবং বক্রোক্তির সহিত শ্লেষের যে সম্পর্ক-স্থাপন তাহা ভামহ বা দণ্ডীতে পাওয়া যায় না।

বামনের বক্রোক্তির ধারণা ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি সূত্র করিয়াছেন—'সাদৃশ্যাল্লক্ষণা বক্রোক্তিঃ' (১) এবং ইহার বৃত্তিতে বলিয়াছেন—'বহূনি হি নিবন্ধনানি লক্ষণায়াম্ তত্র সাদৃশ্যাল্লক্ষণা বক্রোক্তিঃ'। অর্থাৎ লক্ষণা (indication) বহুপ্রকার, তন্মধ্যে যে লক্ষণা সাদৃশ্যমূলক তাহাই বক্রোক্তি। শব্দের কোনও বিশিষ্ট শক্তির নাম লক্ষণা; সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহা এই বুঝায়—শব্দের মুখ্যার্থ যেখানে বিরোধী সেখানে লক্ষণা-শক্তির দ্বারা তদ্‌যুক্ত অন্য অর্থ প্রতীয়মান হয়। যথা 'কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ এই বাক্যে কলিঙ্গশব্দের মুখ্যার্থ (কোনও দেশবিশেষ) অসঙ্গত, সুতরাং লক্ষণাদ্বারা এখানে কলিঙ্গঅর্থে কলিঙ্গ-দেশবাসী পুরুষ বুঝাইতেছে। এখানে অভিধেয়ের সহিত সম্পর্ক হইতে লাক্ষণিক অর্থের প্রচার। এইরূপ বৈপরীত্য হইতেও লক্ষণা হয় যেমন—'বৃহস্পতিরয়ং মূর্খঃ'। যেখানে এই লক্ষণা সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে, সেখানে ইহা বক্রোক্তি। যথা—'উন্মিমীল কমলং সরসীনাং কৈরবং চ নিমিমীল মুহূর্ত্তাৎ'; এখানে উন্মীলন ও নিমীলন চক্ষুর ধর্ম্ম হইলেও সাদৃশ্য-হেতু লক্ষণাদ্বারা বিকাস ও সঙ্কোচ বুঝাইতেছে। সেইরূপ কালিদাসের—'প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ'। ইহাই বামনের বক্রোক্তি। ইহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকদিগের বক্রোক্তির কোনও সম্পর্ক দেখা যায় না। অনেকগুলি কাব্যালঙ্কার লক্ষণা-মূলক, তন্মধ্যে বামন রূপক-কল্প কোনও বিশিষ্ট অলঙ্কারকে বক্রোক্তি বলিয়াছেন। সুতরাং বামনের মতে বক্রোক্তি একপ্রকার সঙ্কীর্ণ metaphorical mode of speech বা উপচার-মূলক উক্তি। (২)

রুদ্রটের 'কাব্যালঙ্কারে' সর্ব্বপ্রথম আধুনিক বক্রোক্তির ধারণা পাওয়া যায়। রুদ্রট, মম্মট ও রুয্যকের ন্যায়, বক্রোক্তিকে অন্যোক্তির অন্যথা-যোজনরূপ অলঙ্কারমাত্র বলিয়া ধরিয়াছেন এবং ইহার শ্লেষ ও কাকুদ্বারা উপপত্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন। (৩)। তাঁহার গ্রন্থে ভামহ, দণ্ডী, বা বামনের বক্রোক্তির চিহ্ন নাই। রুদ্রটের সময় হইতেই বক্রোক্তির আধুনিক অর্থের উৎপত্তি ধরা যাইতে পারে।

(১) কাব্যালঙ্কারসূত্র, ৪।৩।৮ ও বৃত্তি।

(২) ধ্বন্যালোকে ইহাতে ধ্বনির ভেদস্বরূপ ('অবিবক্ষিতবাচ্য') ধরা হইয়াছে; মম্মটের সংজ্ঞায় (৪।১) ইহা 'লক্ষণামূলগূঢ়ব্যঙ্গ্যপ্রধান' ধ্বনি।

(৩) রুদ্রট, কাব্যালঙ্কার, ২।১৪-১৭।

কিন্তু 'বক্রোক্তিজীবিত' (১) গ্রন্থের রচয়িতা কুন্তক তাঁহার গ্রন্থে ভামহের বক্রোক্তিকেই পুনর্জীবিত করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। জয়রথের মতে বক্রোক্তিজীবিতকার ধ্বনিকারের পরবর্ত্তী (২) কিন্তু তিনি 'ব্যক্তিবিবেক'রচয়িতা মহিমভট্টের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ মহিমভট্ট, কেবল আনন্দবর্দ্ধনকে নহে, অনেকস্থলে কুন্তককেও যথেষ্ট আক্রমণ করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকার কুন্তকের মতখণ্ডনের সময় বলিয়াছেন যে কুন্তকের মতে 'বক্রোক্তিই কাব্যের আত্মা' ('বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতমিতি বক্রোক্তিকারোক্তমপি পরাস্তম্') (৩)। কিন্তু দর্পণকার এ স্থলে বক্রোক্তিকে যে স্বমতানুযায়ী সামান্য অলঙ্কার রূপে ধরিয়াছেন ('বক্রোক্তেরলঙ্কারত্বাৎ') তাহা বোধ হয় বক্রোক্তিজীবিতকারের অভিপ্রায় নহে। কারণ মহিমভট্টের (৪) উল্লেখ হইতে ইহার বিপরীতমতই অনুমিত হয়। রুয্যকও বলিয়াছেন (৫)—'বক্রোক্তিজীবিত কারস্তু বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিস্বভাবাং বাহুবিধাং বক্রোক্তিমেব প্রাধান্যাৎ কাব্যজীবমুক্তবান্'। ইহার টীকায় সমুদ্রবন্ধ বলিয়াছেন—'বৈদগ্ধভঙ্গীত্যাদি। তদুক্তম্-উভাবেতাবলঙ্কার্য্যৌ তয়োঃ পুনরলঙ্কৃতিঃ। বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্য ভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে॥ ইতি উভৌ শব্দার্থৌ। 'বৈদগ্ধ্যং বিদগ্ধভাবঃ কবিকর্ম্মকৌশলং, তস্য ভঙ্গী বিচ্ছিত্তিঃ, তয়া ভণিতিঃ বিচিত্রৈবাভিধা বক্রোক্তিঃ। ... ... তথোক্তম্-বাক্যস্য বক্র-স্বভাবোঽন্যো ভিদ্যতে যঃ সহস্রধা। যত্রালঙ্কার বর্গোঽয়ং সর্ব্বোপ্যন্তর্ভবিষ্যতি॥ ইতি।' সুতরাং বক্রোক্তিজীবিতকার ভামহের বক্রোক্তিকে আরও বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার মধ্যে সমস্ত ধ্বনির (suggestion) ধারণা অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ('সমস্তো ধ্বনিপ্রপঞ্চঃ স্বীকৃত এব')। ইহা একপ্রকার বৈদগ্ধভঙ্গীভণিতি; এবং যদিও কাব্য ব্যাপারপ্রধান, অলঙ্কার-প্রধান নয়, এইরূপ ধরা হইয়াছে তথাপি সমুদ্রবন্ধের ব্যাখ্যানুসারে কুন্তক, দণ্ডীর ন্যায়, বক্রোক্তির মধ্যে সমস্ত অলঙ্কারবর্গ অন্তর্ভূত করিয়াছেন এইরূপ বোধ হয়। কিন্তু ইহা অনুমানমাত্র

(১) এই গ্রন্থকার সর্ব্বত্র 'বক্রোক্তিজীবিত'কার (রুয্যক, পৃঃ ৭; সাহিত্যদর্পণ, পৃঃ ১৪ ইত্যাদি) বলিয়া উল্লিখিত হইলেও, মহিমভট্ট 'ব্যক্তিবিবেকে' ইঁহার নাম কুন্তক ও ইঁহার গ্রন্থের নাম 'কাব্যলক্ষণ' এইরূপ বলিয়াছেন (পৃঃ ৫৮ ও 'ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যান' পৃঃ ৩২)। কুন্তকের মতে 'বক্রোক্তিই কাব্যের জীবিত'; সেইজন্য 'বক্রোক্তিজীবিতকার' এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

(২) অলঙ্কারসর্ব্বস্ব, জয়রথটীকা, পৃঃ ১২ (কাব্যমালা সংস্করণ)

(৩) সাহিত্যদর্পণ, (নির্ণয়সাগর সংস্করণ), পৃঃ ১৪

(৪) ব্যক্তিবিবেক, পৃঃ ২৮

(৫) অলঙ্কারসূত্র (Triv. Ed.), পৃঃ ৭-৮ ও সমুদ্রবন্ধটীকা, পৃঃ ৮-৯। অলঙ্কারবিমর্শিনী টীকায় জয়রথ বলিয়াছেন (পৃঃ ৮) যে ভামহ (২।৮৬) যে কারণে 'যথাসংখ্যকে' অলঙ্কার বলিয়া ধরেন নাই, কুন্তকও সেই কারণে ইহায় অলঙ্কারত্ব স্বীকার করেন নাই। ইহা হইতে বোঝা যায় যে কুন্তক ভামহকে মুখ্যতঃ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

বক্রোক্তিজীবিতকারের লুপ্ত গ্রন্থ পাওয়া না যাইলে কোনও কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

সুতরাং মম্মট হইতে আধুনিক আলঙ্কারিকগণ, রুদ্রটকে অনুসরণ করিয়া, বক্রোক্তিকে শ্লেষ ও কাকুমূলক বিশিষ্ট অলঙ্কার হিসাবে ধরিলেও, ভামহ প্রভৃতি পূর্ব্বচার্য্যগণ 'বক্রোক্তি' শব্দ বিভিন্নার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং এই শেষোক্ত বিস্তৃত অর্থের জের বক্রোক্তিজীবিতকার পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। কিন্তু ভামহ বা তদনুযায়ী বক্রোক্তিজীবিতকারের ধারণা পরবর্ত্তী সময়ে সুগৃহীত হয় নাই বরং যথেষ্ট আক্রান্ত হইয়াছিল। ভামহ বক্রোক্তিকে বৈচিত্র্য-মূলক বা লোকাতিক্রান্ত কল্পনামূলক শব্দোক্তি (imaginative or heightened speech) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দণ্ডী ইহাকে অলঙ্কার সমবায়ের সংজ্ঞা বলিয়া ধার্য্য করিয়া বক্রোক্তি অর্থে অলঙ্কৃত উক্তি (figurative speech) এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। বামন ইহাকে উপচার-মূলক উক্তিমাত্র (metaphorical mode of speech) বলিয়া আরও সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। রুদ্রট হইতে ইহার অর্থ আরও সীমাবদ্ধ হইয়াছে; ইহা শ্লেষ বা কাকুসমুৎপন্ন অলঙ্কার (figure of speech) বুঝাইতেছে। এই ধারণাই পরবর্ত্তী (বক্রোক্তিজীবিত ভিন্ন) সমস্ত অলঙ্কার-গ্রন্থে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই কয়েকটি বিভিন্ন ধারণা পরস্পর সম্পর্কবিহীন। বক্রোক্তিপ্রসঙ্গে দণ্ডী যে শ্লেষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সহিত, আধুনিক গ্রন্থে বক্রোক্তির ও শ্লেষের যে সঙ্গতি দেখা যায়, তাহার কোনও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই। এই সকল বিভিন্ন ধারণার প্রথম উৎপত্তি কোথায়, তাহা বলা যায় না; কারণ ভামহ ও দণ্ডীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও আলঙ্কার-গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। তবে ইহা হইতে এইটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় যে ইহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র মতবাদ অনুসরণ করিতেছেন, এবং এইরূপ স্বতন্ত্র মতবাদ অবলম্বন করিয়া যে বহুকাল হইতেই অলঙ্কারের বিভিন্ন শাখা (schools) বা সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

ভামহাদি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বিশিষ্টার্থজ্ঞাপক বক্রোক্তি শব্দটী পরবর্ত্তী অলঙ্কারসাহিত্যে লুপ্ত হইলেও বক্রোক্তির ধারণা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। মম্মটাদির গ্রন্থে ইহা কিরূপে 'প্রৌঢোক্তি' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা প্রবন্ধান্তরে দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুশীলকুমার দে।

বর্ষ-মঙ্গল

মিশ্র—তেওরা

ঐ বিশ্ব লোকে আনন্দ-রাগিণী বাজিছে !
নূতনে পুরাতনে শুভ মিলন আজি যে,—
হের—মহাকালে নব কালিকা-কন্যা প্রেমরূপে কিবা সাজিছে !

মহাউৎসব সমারোহ ভুবনে !
কিরণে কিরণে বরণ-বরণা ঝলকে গগনে গগনে !
রাশিচক্রে ধ্বনিত ভেরী, গ্রহ প্রদক্ষিণকারী,
শুক্র পড়িছে পুণ্য মন্ত্র, ঊষা আলপনা আঁকিছে ।

ধরণী দেবী চরণে ঢালিছে শান্তি,
পবনে পবনে মধুর জীবন ফুলে ফুলে নব কান্তি !
দিগঙ্গনাগণ গানে বাদনে, বাঁধিছে দোঁহারে এক বাঁধনে,
অনুরাগের ঘন স্পন্দনে, কালে কাল হের মিশিছে !

উঠগো নরনারী, জাগ মুছিয়া অশ্রুজল,
এ উৎসবে গাও তোমরাও সবে কল্যাণ মঙ্গল ;
ব্যর্থ যাইতে দিও না লগ্ন, প্রীতি-সাগরে হও নিমগ্ন,
একটিও দিন ভুলিয়া রহগো বিরোধ দ্বন্দ্ব ছল ।
জয় মঙ্গল, গাও মঙ্গল, দিক মঙ্গলে ভাসিছে !
নূতন বর্ষে পুণ্য হর্ষে নিখিল জগত হাসিছে !

কথা ও সুর—শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী । স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী ।

১´ . ২ ৩ ১´
। সা -া II রা -মা মা । মা -া । পা -া I র্সা -া -া ।
ঐ ০ বি ০ শ্ব লো ০ কে ০ আ ০ ০

২´ ৩ ১´ ২ ৩
। ণা -ধণা । পা -া I পা -ধা মা । পা -া । -া -া I
ন -০০ ন্দ ০ রা ০ গি ণী ০ ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I রা -মজ্ঞা রা । সা -া । -া -া I র্রা -া র্রা । র্রা -া । র্রা -া I
বা ০০ জি ছে ০ ০ ০ নূ ০ ত নে ০ পু ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I র্রা -র্মর্জ্জা র্রা। র্সা -া। -া -া I র্সা রা র্সা। ণা ধপধা। নর্সা -র্রসা I
রা ০০ ত নে ০ ০ ০ শু ভ মি ল ন০০ আ০ ০০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I না র্সা -া। -া -া। মা পা I পা না -া। না -র্সা। র্সা র্সর্রা।
জি যে ০ ০ ০ হে র ম হা ০ কা ০ লে নব

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I ধা র্সা ণা। ধা -ণধা। পা -া I র্সা -া ণা। ধা -া। পা মপা।
কা লি কা ক ০০ ন্যা ০ প্রে ০ ম রূ ০ পে কিবা

১ ২ ৩
I রা -মজ্জা রা। সা -া। "সা -া" II
সা ০০ জি ছে ০ ঐ ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
II মা জ্জা -া। রা -া। রা রা I রা মজ্জা -া। রা -া। সা -া।
ম হা ০ উৎ ০ স ব স মা০ ০ বো ০ হ ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I রা পা মা। পা -া। -া -া। ধা ধা ধা। ধা ধা। ধা -া I
ভু ০ ব নে ০ ০ ০ কি র ণে কি র ণে ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I ধা র্সা ণা। ধা ধা। পা -া I মা মা জ্জা। রা রা। সা -া I
ব র ণ ঝ র ণা ০ ঝ ল কে গ গ নে ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I রা -মজ্জা রা। সা -া। -া -া I মা -া পা। না -া। না র্সা I
গ ০০ গ নে ০ ০ ০ রা ০ শি চ ০ ক্রে ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I র্সা র্সা র্রা। র্সনা -া। র্সা -া I র্সা র্সা র্সা। র্সা -া। না না।
ধ্ব নি ত ভে০ ০ রী ০ গ্র হ প্র দ ০ ক্ষি ণ

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I র্সা -র্রা -র্সা। র্রা -া। -া -া I র্রা -র্জ্জা র্জ্জা। র্জ্জা র্জ্জা। র্জ্জা -র্মা I
ক্ষা ০ ০ রী ০ ০ ০ শু ০ ক্র প ড়ি ছে ০

I র্রা -র্মজ্ঞা জ্ঞা। র্রা -া। র্সা -া I র্সা ণা -া। ধপা -া। মা পা I
পু ০০ ণ্য ম ০ ন্ত্র ০ উ ষা ০ আল্ ০ প না

১ ২ ৩
I রা -মজ্ঞা রা। সা -া। "সা -া" II,
আঁ ০০ কি ছে ০ ঐ ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
II র্সা র্রা র্সণা। ণা -া। ণা -া I ধা র্সা ণা। ধা -ণধা। পা ধা I
ধ র ণী০ দে ০ বা ০ চ র ণে ঢা ০০ লি ছে

২ ৩ ১ ২ ৩
I না -া -া। র্সা -া। -া -া I ণা ণা ণা। ধা ধা। ধা -া।
শা ন্তি ০ ০ প ব নে প ব নে ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I ধা র্সা ণা। ধা -া। পা পা I মা মা মা। জ্ঞা -া। মা পা I
ম ধু র বী জ ন ফু লে ফু লে ০ ন ব

I রা -মজ্ঞা -রা। সা -া। -া -া I মা পা পা। না -া। না না।
কা ০০ ০ ন্তি ০ ০ ০ দি গ ঙ্গ না ০ গ ণ

I র্সা -া র্সা। র্সা -া। র্সা র্সা I র্সা র্রা র্সা। ণধা পা। ধা -া I
গা ০ নে বা ০ দ নে বাঁ ধি ছে দোঁ০ হা রে ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I না -া না। র্সা র্রা। র্সা র্রা I র্সা র্সা র্সা। না -া। র্সা র্সা।
এ ০ ক বাঁ ০ ধ নে অ নু রা ০ ০ গে র

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I র্রর্সা ণা -ধা। পা -া। ধা -া I না -া না। র্সা -া। -া -া I
ঘ০ ন ০ ০ ০ ০ ০ স্প ০ ন্দ নে ০ ০ ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I র্সণা -া ধা। পা -ধা। মা পা I রা -মজ্ঞা রা। সা -া। সা -া II
কা০ লে কাল্ ০ হে র মি ০০ শি ছে ঐ ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
II মজ্ঞা -া জ্ঞা। রা -া। রা রা I রা মজ্ঞা -া। জ্ঞা -া। রা সা I
উ০ ০ ঠ গো ০ ন র না ০০ ০ রী ০ জা গ

I রা পা পা। মপা -ধা। পা -মা I পা -া -া। -া -া। -া -া I
মু ছি য়া অ০ ০ শ্রু ০ জল্ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I রা ধা ধা। ধা -া। ধা -া I ধা র্সা ণা। ধা -া। পা পা I
এ উৎ স বে ০ গা ও তো ম রা ও ০ স বে

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I মা -া জ্ঞা। রা -া। পা -া I মজ্ঞা -া -া। রা -া। সা -া I
ক ০ ল্যা ণ ০ ম ০ ঙ্গল্ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I মা -পা পা। না না। না -া I র্সা র্সা র্সা। র্সা -া। র্সা -া I
ব্য ০ র্থ যা ই তে ০ দি ও না ল ০ গ্ন ০

I র্সা -র্রা র্সা। র্রা -া। র্সা র্সা I না র্রা র্সা। ণা -ধা। পা -া I
প্রী ০ তি সা ০ গ রে হ ও নি ম ০ গ্ন ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I ণা -া ণা। ধা -া। পা -া I মা ধা পা। মা মা। জ্ঞা -া I
এক্ ০ টি ও ০ দিন্ ০ ভু লি য়া র হ গো ০

I রা মা জ্ঞা। রা -া। রা -া I সা -া -া। -া -া। -া -া I
বি রো ধ দ্ব ০ ন্দ ০

I র্রা র্র -া। র্রা -া। র্রা র্রা I র্রা -র্মজ্ঞা জ্ঞা। র্রা -া। র্সা র্সা I
জ য় ০ ম ০ ঙ্গ ল গা ০০ ও ম ০ ঙ্গ ল

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I র্সা -র্রা র্সা। -ণা -ধা। পা ধা I না -া না। র্সা -া। -া -া I
দিক্ ০ ম ০ ০ ঙ্গ লে ভা ০ সি ছে ০ ০ ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I র্সা র্রা র্সা। ণা -া। ণা -া I ধা -র্সা ণা। ধা -া। পা -া I
নু ত ন ব ০ র্ষে ০ পু ০ ণ্য হ ০ র্ষে ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I র্সা ণা ধা। পা -া। মা পা I রা -মজ্ঞা রা। সা -া। "সা -া" II
নি খি ল জ ০ গ ত হা ০০ সি ছে ০ শ্রী ০

ভারতের আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ

দারিদ্র্যের সমস্যা একপাশে রাখিয়া, এখন দেখা যাক্, ভারতের লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি-সত্বেও, রাজ্যের বিস্তার সত্বেও, শান্তি ও সুশাসনসত্বেও, যতটা হওয়া উচিত, এক শতাব্দী হইতে কি কারণে ভারত ধনশালী হইয়া উঠিতে পারিল না।

আমরা দুইটি প্রশ্ন পৃথক্ করিয়া দেখিব :

—ধনোৎপাদন।

—ধন-বণ্টন।

* *

ধনোৎপাদন।

এই প্রশ্নটি ভাল করিয়া আলোচনা করিতে হইলে, ধনের প্রধান উৎস কোনগুলি তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

শ্রম-শিল্প।

প্রাচীন ভারতে কেবল দুইপ্রকার শ্রম-শিল্প ছিল :—

সৌখীন শ্রম-শিল্প ;—যথা কাশ্মিরী কাপড়, মস্‌লিন্, সোণা-রূপার দ্রব্য, খোদাই-কাজ-করা কাষ্ঠ ইত্যাদি।

লোক-ব্যবহার্য্য শ্রম-শিল্প।—ভারতে, সভ্যতার সকল ধাপ্‌ই পূর্ব্বে দেখা যাইত, এখনো দেখা যায়। পার্ব্বত্য বা আরণ্য প্রদেশের জাতিদিগের মধ্যে, পরিবারের লোকেরা অথবা স্ত্রী কাপড় তৈয়ারী করে এবং স্বামী ঘরকন্নার দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত করে।

আরও উন্নততর প্রদেশে, গ্রাম্য-জীবনে যে-সকল জিনিস আবশ্যক সমস্তই গ্রামেই তৈয়ারী হয়।

পরিশেষে যে সকল প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, সেখানকার গ্রামবাসীরা যে সকল জিনিস নিজেদের জন্য আবশ্যক তাহা ছাড়া এমন কোন-একটা শিল্প-সামগ্রী নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয় যাহা হইতে তাহারা কিছু লাভ আদায় করিতে পারে।

আজিকার দিনে সৌখীন শিল্প প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, লোক-ব্যবহার্য্য শ্রমশিল্পও প্রায় যাইবার দাখিল হইয়াছে।

কি ধনীদের গৃহে, কি গরিব-লোকের গৃহে সর্ব্বত্রই এখন য়ুরোপের দ্রব্য-সামগ্রীই দেখিতে পাওয়া যায়।

একজন ভারতবাসী লেখকের লেখা হইতে একটা অংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"প্রথমে খুব সামান্য লোকের গৃহের কথা ধর। সেখানে দেখিবে, রন্ধন-কার্য্যের জন্য কতকগুলা ধাতব হাঁড়ী ও কড়াই; আলোর জন্য কিরোসীন বা খনিজ তৈল ও দেশলাই; পরিবারের জন্য মোটা দেশী বস্ত্র তৈয়ারী করিতে যাহা আবশ্যক সেই সব—তুলা, হাড়ের বা ধাতুর বোতাম, আলপিন, আঁকড়া, ছুঁচ, সুতো ইত্যাদি। তারপর অনেক গৃহে ছোট পেরেক, বড় পেরেক, সুতলী দড়ী, হাতুড়ী এবং অবস্থার হিসাবে দুই এক ধাপ উর্দ্ধে অন্যান্য হাতিয়ার। এই

সমস্ত জিনিসই বিদেশী। আর এক গৃহস্থের গৃহে একবার উঁকি দিয়া দেখ—দেখিবে, য়ুরোপীয় শ্রমজীবীর যাহা দৈনিক ব্যবহারের জিনিস,—সেই সমস্ত:—রান্নার প্রায় সমস্ত জিনিস, ল্যাম্প, মোমবাতি, সাবান, কাগজ, কালী, কলম, পেন্‌সিল—ইহার মধ্যে এমন একটা জিনিসও নাই যাহা ভারতে তৈয়ারী হয়। তাহার গৃহ বিদেশে-প্রস্তুত রং-এ রঞ্জিত, তাহার কাপড়-চোপড় বিলাতী। আর এক ধাপ্ ঊর্দ্ধে উঠা যাক্: ডাক-হরকরা, পাঠশালার সামান্য শিক্ষক বা কেরাণী —ইহাদের গৃহের ⅞ অংশ জিনিস এবং যাহা সে ও তাহার স্ত্রী-পুত্র অঙ্গে ধারণ করে সমস্তই বিদেশী। তাহার পর, বড় মধ্যাবৎ শ্রেণীর গৃহস্থ, কৃতী ও সচ্ছল অবস্থার দোকানদার, বণিক ও ব্যবসাদারের গৃহ। সেখানে এবং লক্ষপতি ও রাজাদের গৃহে আরও বেশী পরিমাণে এই সকল বিদেশী জিনিস দেখিতে পাইবে। আমি খুব চেষ্টা করিয়াও মনে করিতে পারিতেছি না, এই সব গৃহে দেশী কারিগরের তৈরী কোন বিশেষ জিনিস আছে কিনা। আমার মতের বিরুদ্ধবাদী কেহ হয়ত ঘরের আসবাবের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিবেন। যাঁহারা শুধু উপর-উপর দেখেন তাঁহারা ইহাকে একটা ব্যতিক্রম-স্থল বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, নিতান্ত রূঢ় ধরণের আস্‌বাব ছাড়া যাহাকে আমরা দেশী আসবাব বলি তাহার অধিকাংশই দেশীয় লোকের তৈয়ারী নহে। কৌচ কিংবা কেদারার দম্-গদি (spring), আস্তর (lining), বোতাম, সুতো, বাক্‌স কিংবা আলমারীর কব্‌জা, প্যাঁচ, পেরেক, তালা, এবং যে-সব হাতিয়ারের দ্বারা এই-সব জিনিস জোড়াতাড়া দিয়া প্রস্তুত করা হয় সেই-সব হাতিয়ার পর্য্যন্ত বিদেশে তৈয়ারী হয়। অতএব যাহা-কিছু অবশিষ্ট রহিল তাহা কাঠ ও মজুরী।" (Sir M. M, Bhownaggree (Industries in India. British Empire Series. P. 319.)

বৃহৎ শ্রম-শিল্প।

পাট ও তুলার ২০০ কল-কারখানা, ২৮ মদের ভাটি, কতকগুলি কাগজের কল-কারখানা—ইহাই সমস্ত। ভারত তাহার উৎপন্ন কাঁচা মাল বিদেশে পাঠাইয়া দেয়, এবং সেখান হইতে জিনিস তৈয়ারী হইয়া আসিলে ভারত তাহাই আবার ক্রয় করে।

১৮৯৪-৯৫ অব্দে চাম্‌ড়ার রপ্তানি: ২,১৭৯,৫৭৬ টাকা; শোধিত চর্ম্মের (ইহার অন্তর্ভুক্ত জুতা নহে) আমদানি ১৭৮,৫৯৭ টাকা। কাঁচা মাল পশমের রপ্তানি: ২,০১৬ ০৮৬ টাকা; পশমের তৈয়ারী জিনিসের আমদানী: ১,৫৪১,৬০৯ টাকা। তৈলজ শস্য-দানার রপ্তানী:—১৪,২০৬,০৪২; এই সকল শস্যদানা হইতে তৈয়ারী তৈলের আমদানী: ২,১২২,৯৯৯ টাকা। কাঁচা-মাল চিনির রপ্তানি:—১,২৩০,৯০৩ টাকা; মার্জ্জিত চিনির আমদানি:—২,৮৭৫,২৯৭।

১৮৯৯-১৯০০ অব্দে কাঁচা-মাল তুলার রপ্তানী:- £ ৬,৬১৬,২০; তুলা হইতে তৈয়ারী কাপড়ের আমদানি: £ ১৮,০০১, ৪০৯। কাঁচা-মাল রেশমের রপ্তানি: £ ৪৭৭, ২০১; রেশম হইতে তৈয়ারী কাপড়ের আমদানী:—£ ৭৫৩, ২২১।

৩০ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে, বৃহৎ শ্রমশিল্পের কার্য্যে নিযুক্ত শ্রমজীবী সম্ভবত দশ লক্ষও নহে।

মোটকথা : সৌখীন শিল্প অন্তর্হিত; ছোটখাট শ্রমশিল্প মুমূর্ষু এবং বৃহৎ শ্রমশিল্প এখনও দোলায়িত-চিত্ত।

কৃষি।

কৃষির অবস্থা যেরূপ দেখা যায় তাহা শ্রম-শিল্পের অবস্থার উল্টা। একপক্ষে রপ্তানী আদৌ নাই, কিন্তু কারখানায় তৈয়ারী মালের প্রচুর আমদানী। অপর পক্ষে, আমদানী প্রায় কিছুই নাই, কিন্তু কাঁচা মালের প্রচুর রপ্তানী।

এই কাঁচা মালের আমদানি ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, এইখানে উল্লেখ করা আবশ্যক :—

ভারত খাদ্য-সম্বন্ধীয় উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে অথচ ভারতের জন-সংখ্যার ১/৩ পরিমাণ লোকে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না;

কৃষকেরা যে বেতন পায় তাহা অত্যন্ত নিম্ন হারের;

বড় বড় কৃষিক্ষেত্রসকল ইংরাজ কোম্পানীর হাতে; তাহারা তদুৎপন্ন শত-করা-লভ্যাংশ বিদেশে বণ্টন করিয়া থাকে;

কৃষির কতকটা আয় ভূমি-করের ভুক্ত হইয়া যায়, এবং ভারতীয় বজেটের চতুর্থাংশ ভারতের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়।

* * *

বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতের যেরূপ অবস্থা সেই অবস্থার মধ্যে যে-চারিটি লক্ষণ দেখা যায় তাহা সমস্তই ভারতের প্রতিকূল :

আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর ভাগ খুব বেশী—মূল্যবান ধাতুর দ্বারা এই ক্ষতিপূরণ করা হয় না (অবশ্য এই রপ্তানীর আধিক্যের কারণ—ধার-করা টাকার সুধ দিতে হয় এবং দেশের বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্যই টাকা ধার করিতে হয়);

যে-সব উৎপন্ন দ্রব্য ভারত হইতে রপ্তানী হয় তাহা খাদ্যের জন্য ভারতের খুবই দরকার;

কারখানায় তৈয়ারী মাল যাহা ভারতে আমদানী হয় তাহা ভারত নিজেই তৈয়ারী করিতে পারিত;

ভারত নিজ-উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কমাইয়া দেয়, কেন না, ভারত এত দরিদ্র যে সেই সব দ্রব্য ধরিয়া রাখিতে পারে না; ঐ মাল-পত্রে বাজার পরিপ্লাবিত হয়, কারণ, দেশের যথেষ্ট উন্নতি বা পরিপুষ্টি না হওয়ায়, খুব অল্প উৎপন্ন দ্রব্যই ভারত বিনিময়-স্বরূপ বিদেশের নিকট চাহিতে পারে (১)। ভারতের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ পরে বিবৃত করা যাইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

(১) লাঙ্কেশিয়ারে তুলার শ্রমশিল্প যে এত পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ, ভারত হইতে ইংলণ্ডে যে মালের রপ্তানী হয় তাহার ক্ষতিপূরণ বা বিনিময় স্বরূপ উৎপন্ন সামগ্রী ভারতে পাঠাইতে হয়।

বিভ্রান্ত চিত্ত

(২১)

পণ্ডিত-মহাশয়ের ও কুন্দবালার গল্পও বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। রাজকুমারী পড়িতে না আসায় দুজনের কেহই ক্ষতি বিবেচনা করেন নাই।—ব্যায়াম-উৎসবে কুন্দ উপস্থিত না থাকায় ষোল আনা উৎসবই যে শাস্ত্রী-মহাশয়ের পক্ষে বৃথা গিয়াছে এই কথাই তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন। এই পৌনরুক্তিতে অসহিষ্ণু-স্বভাব কুন্দবালার যে ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছিল না—ইহাই আশ্চর্য্য।

পণ্ডিত-মহাশয় তাঁহার বিলম্বিত দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে শতবারের পর আর একবার বলিলেন— "সত্যি বলছি কুন্দ, তুমি ছিলে না—আমি দুই চক্ষে অন্ধকার দেখেছি।"

কুন্দ বলিল, "কিন্তু এতে আপনি দুঃখ করছেন কেন? দুঃখ করবার কথা ত আমারি। এমন মহাসমারোহ আমি চর্ম্ম-চক্ষে দেখতে পেলাম না! আপনি বরঞ্চ সেদিনের বিবরণ বেশ খুঁটিনাটি ক'রে বর্ণনা করুন—আমি কানে শুনেও তৃপ্তিলাভ করি।"

"তা যদি বল,—এমন নতুন কিছু বলার কথা নেই,—সবই গতানুগতিক অনুবৃত্তি; অভিনন্দন,—অভিভাষণ,—ব্যায়াম আর বাহবা প্রদান,—এই চতুর্ব্বিধ বিধানেরই আবর্ত্তন বিবর্ত্তন;—তবে—"

"থামলেন যে—? বলুন না।"

"একটি মাত্র আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছিল।"

"বলুন না। আগ্রহে যে দম ফেটে উঠলো! দেখবেন শেষে নারীবধের পাতক লাগবে আপনাকে।"

"আহা! ও কি কথা কুন্দ! শোন, আগেই বোধহয় শুনেছ,—রাজকুমারী শরৎ ডাক্তারকে মাল্যদান করেছিলেন—"

"এই কথা। কিছু ত আশ্চর্য্য হলুম না। যে জেতে তাকে মাল্যদান করাই ত আমাদের দেশের সনাতন পদ্ধতি।"

"হ্যাঁ স্বয়ম্বরা হওয়াও আমাদের সনাতন পদ্ধতি,—এস্থলে ফাঁকা মাল্যদানটাই কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।"

"সোজা লাঠি গাছটাকেও এমন সহজে আপনারা বাঁকিয়ে—ধনুক করে তোলেন,—আশ্চর্য্য!

"আরে সংসারটাই এই রকম—লোকের মুখ তুমি ত চেপে রাখতে পার না।"

"বেশ,—লোকে যা বলে বলুক,—আপনিও এ নিয়ে মাথা ব্যথা করেন কেন?"

"রামঃ! মোটেই না। আমি কেবল তোমাকে বলছি।—দেখ কুন্দ, তোমাকে কোন কথা না ব'লে আমি থাকতে পারিনে,—তুমি ত কই আমাকে কিছু বল না?"

"কিছু ত বলার নেই আমার।"

"তা ত সত্যি! বিশেষ এবার যে রকম গম্ভীর দেখছি তাতে মনে হয়—যেন মৌন-ব্রত গ্রহণ করেছ।"

কুন্দ হাসিয়া বলিল—"জীবনটা কি হেসে খেলে কাটাবারই জিনিষ পণ্ডিত-মশায়?"

"জীবনটা কাজ করবারই জিনিস,—কিন্তু হেসেখেলেই কাজ ভাল হয়।"

"ভিন্ন মতও থাকতে পারে?"

"অবশ্যই। পৃথিবী যে বিপুলা,—তাতে সন্দেহ নেই।"

পণ্ডিত-মহাশয়ের হস্তে—তাঁহার বিপুল শ্মশ্রু প্রবল ভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

কুন্দ তাহা দেখিতে দেখিতে হাসিমুখে বলিল,—"রাজকুমারী ত এখনো এলেন না,—একবার খোঁজ নিয়ে আসি।"

"দরকার কি কুন্দ! তাতে তুমি শুদ্ধ অন্তর্ধান হয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে—"

কুন্দ সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেল,—কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত-মহাশয়ের অন্ধকার মুখ পুনরায় হাস্যোজ্জ্বল করিয়া কহিল—"রাজকুমারী ঘরে নেই। বোধ হয় রাজাবাহাদুরের কাছে গেছেন।"

"পাশের ঘরও বেশী দূরে নয় কুন্দ।"

"দেখুন পণ্ডিত-মশায় এ রকম ঠাট্টাঠুট্টি করলে আমি কিন্তু চলে যাব।"

"আরে ঠাট্টা কে করছে? আমি জন্মে কখনো কোন বিদূষকের পাঠ অভিনয় করিনি। কখনো তা পারব ব'লে কল্পনাও ছিল না মনে; তবে আজ তোমার প্রশংসাবাদে প্রাণের মধ্যে হঠাৎ একটা আশাতীত আশার উদ্রেক হয়ে উঠছে বটে! কে জানে হয় ত বা কোনদিন গোপাল ভাঁড়ের আসনও অধিকার করে বসতে পারি। কিন্তু আপাততঃ যা বলছি এটা পরিহাস নয়। রাজকুমারীর মনের গতিক বড় ভাল মনে হচ্ছে না—। পড়া-শুনা ত বন্ধ হয়েইছে,—সমিতিটা কবে বন্ধ হয়—এখন এই ভয়।"

"রাজকুমারীকে আমি এই কথা বলব।"

"রক্ষা কর—ক্ষেপলে কুন্দ?"

"না ক্ষেপিনি,—আমি বলব—তিনি যে পথে চলেছেন—সেটা প্রকৃত দেশোন্নতির পথ নয়। এ কাজে গুরুর উপদেশ চাই।"

"আঃ তাই বল। তা কুটুমির মত গুরু পেলে মন্দ হয় না বটে। পেয়েছ নাকি?"

"মনে ত হচ্ছে।"

"সর্ব্বনাশ! গুরুদেব তোমার স্কন্ধে ভর করলে আমরা দাঁড়াই কোথায়? কিন্তু ব্রাহ্মেরা ত আমি জানি গুরু মানেন না।"

"কেন মানবেন না? এতদিন ত আপনাকেই গুরু বলে মেনেছি।"

"তবু ভাল, কিন্তু গুরু ত জীবনে একজনই হয়। তবে তোমাদের রীতি স্বতন্ত্র হতে পারে,—তোমরা একাধিক স্বামীও গ্রহণ করে থাক।"

"দেখুন পণ্ডিত-মশায়, ও-রকম রসিকতা করবেন না—আমার ভাল লাগে না।"

কুন্দের নয়ন ক্রোধদীপ্ত হইয়া উঠিল—সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। পণ্ডিত মহাশয় কাতর অনুনয় করিয়া কহিলেন—"ক্ষমা কর কুন্দ, এটা যে দোষের কথা তা আমি বুঝতে পারিনি;—স্বামী-গ্রহণে দোষ হয় না আর বল্লেই দোষ হয়? বস বস কুন্দ, রাগ কোরো না,—।"

কুন্দ বসিয়া কহিল—"আপনার যে আজ কি হয়েছে—সব কথাই বিকৃত ক'রে বলছেন;—সত্যি কিন্তু আমার বড় রাগ ধরছে।"

"রাগ কোরো না কুন্দ—তা হলে মরে

যাব।—তোমাদের অভিধানে কোন্ কথা যে শ্লীল এবং কোন্ কথাই বা অশ্লীল সমস্ত পাণিনী শাস্ত্র উল্টে তা আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় র'য়ে গেছে। এ সম্বন্ধে আমি একেবারেই গণ্ডমূর্খ;—একটা গল্প করব কুন্দ?"

কুন্দ চুপ করিয়া রহিল,—তাহার আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন —"দেখ একবার আমি একটি ব্রাহ্ম-বাড়ীতে পুরাণ-ব্যাখ্যা করতে যাই।"

"ঐটেই যা আপনার আসে,—কিন্তু সমিতি হওয়া পর্য্যন্ত পুরাণ-পাঠও ত আপনি ছেড়ে দিয়েছেন।"

"তবু ভাল,—আমারও একজন মল্লিনাথ আছে; কিন্তু তুমি যাই বল, মেমসাহেব সেদিন আমাকে বড়ই অপদস্থ করেছিলেন?"

কুন্দ তাঁহার কথার ভঙ্গীতে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। হাসিয়া কহিল— "তাঁহার কি আর কোন নাম নেই?"

পণ্ডিত-মহাশয় উৎসাহিত হইয়া কহিলেন —"সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তাঁর বা তাঁর স্বামীর আসল নাম যে কি তা আমি ঠিক বলতে পারব না। যে বন্ধুটি আমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি পরিচয় করিয়ে দেবার সময় মিসেস বটব্যাল বা ঘটকাল এই রকম কি একটা নাম যেন শিরিঠাকরুণের বলেছিলেন, কিন্তু সে নামটা আমার মাথা থেকে কর্পূরবৎ একেবারেই উপে গেছে। মনে আছে কেবল এইটুকু যে, তাঁর বাড়ীর চাকর-বাকররা মেমসাহেব বলে তাঁকে সম্ভাষণ করেছিল।"

"আচ্ছা বেশ! এখন আসল গল্পে আসুন।"

"সে লজ্জার কথা আর কোন্ মুখে বলি! অভিমন্যুবধ ব্যাখ্যার ভূমিকায় যেমন বলেছি যে, অভিমন্যু যখন গর্ভে ছিলেন তখন পিতা মাতার আলাপ প্রসঙ্গে তিনি ব্যূহপ্রবেশ নিয়ম শিক্ষা করেছিলেন,—অমনি মেমসাহেব ত্রস্তভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের সেখান থেকে উঠিয়ে দিলেন,—আমার সহসা বাক্‌রোধ হয়ে গেল, কি না জানি অজ্ঞানকৃত মহাপাপে এরূপ ঘটলো বুঝে উঠতে পারলাম না। ছেলেরা চলে যেতে মেমসাহেব বল্লেন—'ওরূপ খারাপ কথা ছেলেদের কাছে বলা ঠিক নয়।' আমার তখন কণ্ঠতালুকা শুষ্ক হয়ে উঠলো,—মনে করতে চেষ্টা করলুম খারাপ কথাটা কি বলেছি। কিন্তু মস্তিষ্ক তখন শূন্য, কিছুতেই তা বোধগম্য হোলনা। পুরাণ পাঠ ঐ-খানেই শেষ ক'রে আমার সেদিন চলে আসতে হোল। তাই তোমাকে বলছি—তোমাদের শ্লীলা ভাষার অভিধানখানা আমাকে তুমি পড়াবে কুন্দ?"

"কি যে বলেন পণ্ডিত-মশায়?"

"না আমি ঠিকই বলছি। আমি তোমার গুরু হতে চাইনে তুমিই আমার গুরু হও।"

পণ্ডিত-মহাশয়ের অনুরাগরঞ্জিত স্বর কুন্দের খারাপ লাগিলনা। এই শ্মশ্রুবহুল বিজ্ঞ ব্যক্তিরও যে তাহা হইতে গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়াছে ইহাতে যে বেশ-একটু গর্ব্ব বোধ করিল। পণ্ডিত-মহাশয় তাহার মৌনতায় সাহস পাইয়া আবার বলিলেন, "আমি প্রাণের কথা বলছি কুন্দ, তুমি আমার মনো-আসনে দেবীরূপে অধিষ্ঠিত হও, নইলে আমার জীবন ব্যর্থ হবে।"

নিজের এই উচ্ছ্বসিত বাগ্মীতায় পণ্ডিত মহাশয় নিজেই অবাক হইয়া গেলেন, কুন্দও অসন্তুষ্ট হইলনা, কিন্তু তুষ্টির ভাব গোপন করিয়া তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া কহিল "কি বলছেন আপনি ?"

"বুঝতে পারছ না কুন্দ! তুমি বিনা আমার জীবন বৃথা।"

কুন্দ হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"আমি যে ব্রাহ্ম পণ্ডিত-মহাশয়,—আপনার জাত যাবে যে ?"

"তোমারি পাদপদ্মে জাত ধর্ম্ম অনেকদিন মনে মনে অঞ্জলি দান করেছি কুন্দ।"

"কিন্তু আমি ত তা করি নি। আমি যে জাতে থাকতে চাই।"

হরি হরি! পণ্ডিত-মহাশয় এতক্ষণ নিজের দিকটাই দেখিতে ছিলেন, কুন্দের তরফ হইতে এ-রকম আপত্তি উঠিতে পারে তাহা মনেও করেন নাই!

তাঁহার বিস্মিত মনের আবেগ হস্তের সাহায্যে শ্মশ্রুরাশিকে ঘন ঘন দোল দিতে লাগিল। কিছু পরে বলিলেন—"ঠাট্টা করছ কুন্দ ?"

"না ঠাট্টা নয়। দেখুন পণ্ডিতমশায়, এরূপ কথা শোনা আমাদের অভ্যাস নাই, লজ্জা করে, অন্য কথা বলুন।"

পণ্ডিত-মহাশয় হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, আপাততঃ দাড়ী-বেচারীও নিষ্কৃতি পাইল। তাঁহার পুরাতন কথা স্মরণ হইল। লজ্জা ভাঙ্গাইতে অনেকটা সময় লাগিয়াছিল বটে, তার চেয়ে তবু এটা সহজ মনে হইতেছে। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন—"কিন্তু অনভ্যাস-কেও অভ্যাসে আনা চাই ত।"

"দরকার দেখি না।"

কিন্তু পণ্ডিত-মহাশয় নাছোড়বান্দা,—বলিলেন—"কিসের দরকার নাই ? প্রেমানুরাগের ?"

কুন্দ হাসি চাপিয়া কহিল—"ধরুন তাই ?"

"আরে বিশ্বসংসার যে প্রেমে চলছে, তোমার আদেশ ত সে মানবে না কুন্দ।"

"কিন্তু নীরব ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ভালবাসা, 'প্লেটনিক' প্রেমই পবিত্র প্রেম। প্রকাশে তার মাহাত্ম্য চলে যায়।"

"তুমি কি সৃষ্টিলোপ করতে চাও কুন্দ ? এই বিশ্বসংসারই যে প্রেমের প্রকাশ।"

"কিন্তু নীরবতায় কি প্রকাশ নেই ?"

"থাকতে পারে—কিন্তু—কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি মানব এখনো সে পাঠ শেখেনি। সেইজন্যই ভাব ভাষা চায়,—অনুরাগ মিলন চায়, আর জীবজগতে এই মিলনের পরিণতিই বিবাহ!"

এমন মুক্তকণ্ঠ কোর্টসিপ কুন্দের ভাল লাগিল না। যে সময় বিবাহের নামে বেথুন স্কুলের মেয়েরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিত—সেই সময়ে কুন্দ সে দলের মধ্যে একজন প্রধানা ছিল অবস্থাচক্রে, বয়সে, জ্ঞানে, তাহার এইমতের হাস্যকারিতা সে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে—তবুও সে ভাব তাহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। পণ্ডিত-মহাশয়ের অনুরাগ প্রকাশে তাহার মন আপত্তি বোধ করিতেছিল না কিন্তু প্রকাশের পথটা একটু বাঁকা হইলেই তাহার মনঃপুত হইত। সে বিরক্তির স্বরে কহিল—"পণ্ডিত-মশায়, ও-সব কথা বলবেন না, আমি বিরক্তি করছি।"

"কেন ? এতেও কি দোষ আছে ?"

"আছে।"

"কিন্তু তোমার বাপ-মাও ত বিবাহ করেছেন; তাঁরা ত দোষ বিবেচনা করেন নি।"

কুন্দ এ কথায় সত্যসত্য রাগিয়া গেল,—বলিল "যাঁরা দোষ মনে করেন না তাঁরা ত বিবাহ করছেনই এবং করবেনই। আমি দোষ মনে করি,—আমি করব না।"

পণ্ডিত-মহাশয় হতাশ ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কি করবে তুমি?"

"আমি দেশের কাজ করব।"

"আমিও ত সেই পথের পথিক।"

"কিন্তু আপনারা ভুল পথে চলেছেন,—আমাকে গুরুদেবের আজ্ঞা মেনে চলতে হবে।"

পণ্ডিত-মহাশয় প্রমাদ গণিলেন। কুন্দের স্বরে—তাহার ভাবে-ভঙ্গীতে তিনি একটা দৃঢ়তা দেখিলেন। তাঁহার মন বলিতে লাগিল—কুন্দ কি একটা বিপদ-চক্রের মধ্যে পা দিতে বসিয়াছে—তিনি কোটনীতি ভুলিয়া গিয়া বলিলেন—"তুমি কি করে জানলে যে তাঁদের পথ ঠিক?"

"ঠিক জানি আমি। আমার ভাই বলেছে।"

তিনি বুঝিলেন, কুন্দকে এ-পথ হইতে দূরে রাখা এখন তাঁহার সাধ্যাতীত, তাহাদের দলে প্রবেশ করিয়াই তাহাকে রক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। বলিলেন—"বেশ, আমিও তোমার গুরুর শিষ্য হব। গুরুর দেখা পাব কোথায়? কি করতে হবে?"

কুন্দ আহ্লাদের সহিত বলিল,—"গুরু এইখানে শীঘ্র আসবেন বলেছেন। তখনই বুঝবেন কি করতে হবে, না হবে—আমি আর কিছু বেশী বলতে পারব না।"

এই সময় দাসী আসিয়া বলিল—"রাজকুমারী আজ পড়বেন না। আপনি বাড়ী যাও গো।"

পণ্ডিত-মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে কুন্দকে বলিলেন, "চল্লেম তবে, গুরুদেব এলে যেন খবর পাই।"

(২২)

রাজা বাড়ী ফিরিয়া কিছু পরে টেলিগ্রাম পাইলেন যে ম্যানেজার আজ আসিতে পারিবেন না। তিনি নবপ্রাসাদে আসিয়া আজ আর লেখার ঘরে গেলেন না। গীতগৃহে প্রবেশ করিয়া ঢালা বিছানায় বসিলেন। ভৃত্য দস্তুরমত সেতারা তানপুরা প্রভৃতি নিকটে আনিয়া রাখিল। জ্যোতির্ম্ময়ী মন্দির হইতে ফিরিয়া প্রাসাদ-প্রবেশকালে দূর হইতেই গীত-বাদ্যধ্বনি শুনিয়া এমন নিঃশব্দে পিতার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল,—যে তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না; আত্মহারাভাবে মুদ্রিত নয়নে তিনি গাহিতে লাগিলেন—

বড় একেলা গো বড় একেলা—!
দুপুর সন্ধ্যা সকালবেলা—
তার অমৃত-কিরণ-মাখা
আকাশ-ভরা চোখের দেখা
ধরার পানে ফিরলো না ত হায়রে!
একটি বারও একটি বেলা!

মূলতান রাগিণীতে তাঁহার ভাববিহ্বল কণ্ঠোত্থিত পুনঃ পুনঃ গীত এই কয়েকটি ছত্র গৃহে একটি মধুর বিষাদতান বর্ষণ করিতে লাগিল,—শুনিতে শুনিতে জ্যোতি-

শরীর নেত্র অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল, নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হইল। সে যে পিতার নিকট হইতে দূরে পড়িয়াছে এই গানটি যেন ভাল করিয়া তাহাকে এই কথা বুঝাইয়া দিল। ইহার সুরতান-ভরা প্রত্যেক শব্দটি কি তাহার প্রতি ভর্ৎসনা নহে! সে একরূপ মোহাচ্ছন্ন ভাবেই নতজানু হইয়া পিতার পৃষ্ঠে মুখ রক্ষা করিল রাজা চমকিয়া গান বন্ধ করিয়া কহিলেন—"রাণি!" সে স্বর কি স্নেহানন্দপূর্ণ! এই কণ্ঠ হইতেই কি মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে অমন বুকফাটা বিষাদ বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল!

রাণী কোন উত্তর করিল না, পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া রহিল; উত্তপ্ত অশ্রু বিন্দুতে রাজার স্কন্ধদেশ ভিজিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার দুঃখের গানে বালিকা ব্যথা পাইয়াছে। তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক ভুলাইবার ছলে সহাস্যে বলিলেন,

"কে মেরেছে রাণীরে মোর,কে কোয়েছে মন্দ,
তার সঙ্গে কোমর বেঁধে করব গিয়ে দ্বন্দ্ব।"

রাণী তখন হাসিল। রাজা বলিলেন—"অনেকদিন সেতার বাজাস নে—রাণি—বাজা দেখি।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর সেতার তানপুরাও ভৃত্য সেইখানে আনিয়া রাখিয়াছিল—রাজা সেতারটি তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী সেতার ধরিয়া একটু বিষন্ন হাসি হাসিয়া কহিল—"বাবা—"

"কেন রাণি?"

"ও গানটি কি তুমি সম্প্রতি রচনা করেছ?"

রাজা তাহার মনের ভাব বুঝিলেন,—বুঝিয়া বলিলেন—"না রাণি—অনেক দিন।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আর কোন প্রশ্ন করিল না, সেও বুঝিয়া লইল—এই অনেকদিনের অর্থ কি! একটু তখন যেন সে সুস্থবোধ করিল। সেতারটার পরদাগুলা ঠিক করিতে করিতে কহিল—"বাবা, আমি তোমার পুরাণ গানের খাতা থেকে একটি গান পেয়েছি—ঠিক আমার মনের মত।"

রাজা কহিলেন,—"আমার কোন গানটি তোর মনের মত নয়—সেইটে বল দেখি, রাণি?"

"এ গানটি বাবা—সব-চেয়ে আমার মনে বসেছে। যেন আমারি মনের কথা তুমি প্রকাশ করেছ। একটি সুর বসিয়ে নিয়েছি,—শুনবে বাবা, গানটি?"

রাজা তাহার পৃষ্ঠে সাদর হস্ত বুলাইয়া কহিলেন—"বেশ, গাও হে তুমি গুণী—আমার গানটি তোমার তানে ভাল করে শুনি।"

সেতারের পরিবর্ত্তে তানপুরাটা হাতে তুলিয়া লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিয়া বালিকা গান ধরিল—

বড় সাধ, বড় আশা, বড় আকিঞ্চন,
পরাতে, জননি, তোরে রত্ন আভরণ!
জানি দীন-হীন অতি, ক্ষুদ্রবল, ক্ষুদ্র মতি,
অপার আকাঙ্ক্ষা তবু না মানে বারণ!
বাসনার বশে বশ্য, কেবলি আপনা ছলি
অসাধ্য-সাধন-তরে প্রয়াস যতন!
শ্রান্ত ক্লান্ত প্রতিদিন, নিরাশায় আশাক্ষীণ
তবুও দুরাশা মনে নহে সম্বরণ!
এ দুর্ব্বল বাহু জোরে বিদারি ভূধর বক্ষে
তুলিবারে চাহি হীরা মাণিক রতন!

মাটী তুলি ফেলি আর উঠে কাচ-শিলা ভার
তাহাই চরণে আনি করি সমর্পণ।
মাগো এ জীবন সারা কাটিবে কি এই ধারা!
প্রাণের বাসনা আশা শুধু কি স্বপন?

গান শেষ করিয়া তানপুরাটা যখন জ্যোতির্ম্ময়ী নামাইয়া রাখিল, তখন তাহার নজরে পড়িল,—বিছানার এক প্রান্তে শরৎ ও অনাদি আসিয়া বসিয়াছেন। রাজাও সেইদিকে চাহিয়া আহ্লাদ-সহকারে বলিয়া উঠিলেন—"আরে, ডাক্তার যে।" শরৎ হাসিয়া বলিলেন--"গান শোনার লোভ সম্বরণ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিলো---ক্ষমা করবেন।"

"ক্ষমা! আজ আমাদের গানের মজলিস যথার্থই সার্থক। কতদিন তুমি আসনি, বল দেখি। ওঃ কি ভাবনাটাই লাগিয়ে দিয়েছিলে হে!"

শরৎকে দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিল, কিন্তু মেঘগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়—সে আনন্দ সহসা নিরানন্দের মধ্যেই ঢাকিয়া পড়িল।

শরৎ যখন বলিলেন—"রাজকুমারি আর একবার গানটি গাবেন।"

তখন রাজকুমারী কহিলেন—"শ্রান্ত মনে হচ্ছে ডাক্তার-দা, গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে না আর।"

শরৎ আর কিছু বলিলেন না। রাজা তখন মকদ্দমা-সম্বন্ধে কথা পাড়িলেন। কিছু পরে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল- 'আহারের সময় হয়েছে—মহারাণী সংবাদ পাঠিয়েছেন।'

নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ব্যতীত অন্য সকল দিনই প্রায় রাজাবাহাদুর অন্তঃপুরে গিয়া মাতার নিকট বসিয়া ভোজন করিতেন। ভৃত্যের কথায় সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। সেদিনকার মত এইখানেই গানের মজলিস ভঙ্গ হইল।

* * * *

সে রাত্রি জ্যোতির্ম্ময়ীর অনিদ্রায় কাটিল। সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা কখনো সংলগ্ন ভাবে কখনো অসংলগ্ন ভাবে তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল। কালীমূর্ত্তি আর শ্যামসুন্দর ও রাধারাণীর যুগলমূর্ত্তি, শরতের সুন্দর রূপ আর পিতার বিষাদপূর্ণ কণ্ঠধ্বনির মধ্যে তাহার বিভ্রান্তচিত্ত কখনো আনন্দে কখনো নিরানন্দে আত্মহারা হইয়া ফিরিতে লাগিল। পাশের পালঙ্কে কুন্দ যে শুইয়া আছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া মৃদু গুণগুণ কণ্ঠে সে একবার গান ধরিল—

বড় সাধ, বড় আশা, বড় আকিঞ্চন—

দুই চারি লাইন গাহিবার পর তাহার মনে পড়িয়া গেল—কুন্দ জাগিয়া উঠিতে পারে। তাহার গান থামিয়া গেল, কুন্দ তখন ডাকিল—"রাজকুমারি।"

জ্যোতির্ম্ময়ী এতক্ষণ বিছানায় শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিয়া বলিল "তোমাকে জাগিয়ে দিলুম কুন্দ?"

"না রাজকুমারি, আমারও ঘুম হচ্ছে না, গানটি ভাল করে গান না, শুনি।"

"না কুন্দ, কি হবে গেয়ে? গানে ত আমার বাসনা পূর্ণ হবে না।"

কুন্দ বুঝিল--কতখানি নৈরাশ্যে তাহার মর্ম্মদাহ হইতেছে। সে কহিল—"একটি কথা বলব রাজকুমারি? কিছু মনে করবেন না?"

"বল ভাই, বল! কিছুতে আর কিছু

মনে করব না, মনে করবার বলটুকুও হারিয়েছি কুন্দ!"

কুন্দ ব্যথিতচিত্তে কহিল—"আপনি যে পথে মুক্তি চাচ্ছেন সে পথে দেশের মুক্তি নেই রাজকুমারি।"

"বল কুন্দ, কোন্ পথ ধরব তবে?"

"আমরা জানিনে সে কোন্ পথ। আমরা অন্ধ, গুরু সে পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। গুরুর ইঙ্গিতে আমাদের চলতে হবে।

জ্যোতির্ম্ময়ীর ক্ষুব্ধ বায়ু-তরঙ্গিত অশান্ত হৃদয়ের উপর দিয়া সহসা আশার মৃদুহিল্লোল বহিয়া গেল,—সে প্রশান্তভাবে কহিল—"তেমন গুরু কোথায়?"

উত্তর হইল—"আছেন, আছেন!"

"পেয়েছ তুমি?"

"পেয়েছি।"

"আমিও কি পাব?"

"পাবেন, পাবেন। অন্তর থেকে যে যাহা প্রার্থনা করে—ভগবান তাকে তা মিলিয়ে দেনই দেন।"

"কবে পাব?"

"আপনার কথা শুনেছেন তিনি—তিনি এখানে আসবেন। তিনিও এই পথের পথিক।"

"কোন্ পথের পথিক?"

"দেশ-উদ্ধার তাঁদের ব্রত। তাঁরা পথ চিনেছেন—তাঁদের নেতৃত্বে আমরাও পথ পাব।"

অধীর বালিকা নিজের শয্যা ত্যাগ করিয়া কুন্দের শয্যায় আসিয়া আবেগভরে জিজ্ঞাসা করিল—"ঠিক বলছ কুন্দ? বাসনা সফল হবে আমার—পারব কুন্দ—পারব—আপনাকে দিতে পারব?"

বালিকা আর পারিল না—তাহার হৃদয়ের বিপ্লব অশ্রুধারে উথলিয়া উঠিল, কুন্দের পাশে শুইয়া সে রোদন করিতে লাগিল। কুন্দ রাজকুমারীর বাক্যের মর্ম্ম, অশ্রুধারায় অর্থ ঠিক বুঝিল না, সস্নেহে মাতার ন্যায় তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে কহিল—"নিশ্চয়, নিশ্চয়,—আশ্বস্ত হোন্ রাজকুমারি!"

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

আলোর ফুল্‌কি

১

দূরে একটা মহাবন, সেখানে বসন্ত-বাউরী বৌ কথা কও বলে থেকে-থেকে ডাক দেয়; কাছে পাহাড়তলির আবাদের পশ্চিমে, ঢালু মাঠের ধারে, পুরোনো গোলাবাড়ীর গায়ে মাচার উপর কুঞ্জলতার বেড়া-দেওয়া কোঠা-ঘর; সেখানে একটা ঘড়ি বাজবার আগে পাপিয়ার মত পিয়া পিউ শব্দ করে। যার বাড়ী তার পাখীর বাতিক;—পোষা পাখী, বুনো পাখী, এই গোলাবাড়ীর আর কোটা বাড়ীর ফাঁকে-ফোঁকে কত যে আছে ঠিক নেই, কেউ দরজা-ভাঙা খাঁচায়, কেউ

ছেঁড়া ঝুড়িতে, চালের খড়ে, দেয়ালের ফাটলে বাসা বেঁধে সুখে আছে। ও-পাড়ার ডালকুত্তো তম্মা মাঝে-মাঝে মুরগীর ছানা চুরি করতে এদিকে আসে, কিন্তু পাখীদের বন্ধু পাহাড়ী কুত্তানী জিম্মার সাম্‌নে এগোয়, তার এমন সাহস নেই। বাড়ী যার, সে যখন বাইরে গেল, পাহারা দিতে রইলো জিম্মা, আর রইলো মোরগ-ফুল-মাথায়-গোঁজা কুঁকড়ো,—সে এমন কুঁকড়ো যে সবার আগে চোখ খোলে, সবার শেষে ঘুমে ঢোলে!

এই কুঁকড়োর চার রঙের চার বৌ। সাদী—মেমসাহেবের মতো গোলাপি ফিতে মাথায় বেঁধে সাদা ঘাঘ্‌রা পরে ঘুর-ঘুর্ কচ্ছেন; কালী—চোখে কাজল আর নীলাম্বরী-সাড়ী-পরা, মাথায় সোনালি-মোড়া বেনেখোঁপা, যেন কালতে ঠাকরুণ; সুরকী—তিনি ঠোঁটে আল্‌তা দিয়ে, গোলাপি সাড়ি পোরে যেন কনে-বৌটি; আর খাকি—তিনি ধুপছায়া রঙের সাল্লা জড়িয়ে বসে রয়েছেন, যেন একটি আয়া।

বেলা পড়ে আস্‌ছে, গোলাবাড়ীর উঠোনে বিকেলের রোদ এসেছে। সফেদী, সিয়াজী, সুরকী, খাকি, গুলবাহারি সব মুরগী মিলে জটলা করছে। বাচ্ছারা একদিকে একটা কেঁচো নিয়ে টানাটানি মারামারি চেঁচামেচি বাধিয়ে দিয়েছে; ঘরের মধ্যে ঘড়ি সাড়া দিলে—"পিয়া পিউ।" সফেদী বলে উঠলো—"ওই পাপিয়া ডাকৃল।" খাকি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বল্লে—"পাপিয়া গো কোন্ পাপিয়া? বনের না ঘরের? ঘড়ির ভিতরে যার বাসা, সে কি ডাক দিলে?" সফেদী তখন ধান খুঁটে-খুঁটে গালে দিচ্ছিল; এবার খুব দুর থেকে শব্দ এল—"পিউ পিউ।" সফেদী বল্লে—"এ যেন বনেরই বোধ হচ্ছে শুন্‌চিস, কত দুর থেকে ডাক দিয়ে গেল?"

ঘড়ির মধ্যে থেকে যে পিয়া বলে থেকে-থেকে দিনে রাতে অনেকবার ডাক দেয়, খাকি একবার আড়াল থেকে তার চেহারাখানি দেখে নেবার জন্যে থাকে-থাকে কুটিবাড়ির দিকে ঘুরে আসে; পিউ বলে যেমন ডাকা, অম্‌নি সে সোনার মন্দিরের মতো সেই ঘড়িটার কাছে ছুটে যায়, খুট করে দরজা বন্ধ হবার মতো একটা শব্দ শোনে, তখন চক্ষুশূল দুটো ঘড়ির কাঁটাই সে দেখতে পায়! পাখী—যে 'পিয়া পিউ' বলে ডাক্‌লে, তার আর দেখা পায়না—এম্‌নি নিত্য ঘটে, বারে বারে। ঘড়ির মধ্যে যে পাখী, সে এখনো ডাকেনি, ডেকে গেল বনের পাখীটা। শুনে খাকি বল্লে—"আঃ, তবু ভালো, এই বেলা গিয়ে ঘুলঘুলিতে আড়াসী পেতে বসে থাকি, আজ সে পিউ-পাখীর দেখা নিয়ে তবে অন্য কাজ, রোজই কি ফাঁকি দেবে!"

খাকি কেন যে ঘন-ঘন ঘড়ি দেখে আসে, সফেদির কাছে আজ সেটা ধরা পড়ে গেল। খাকির মন-পাখী যে কোন্ পাখীর কাছে বাঁধা পড়েছে, সবার কাছে সেই খবরটা জানিয়ে দেবার জন্যে সফেদি চলেছে, এমন সময় চালের উপর থেকে কে একজন ডাক দিলে—"সাদী, ও দিদি, ও সফেদি!" "কে রে, কে রে!"—বলে সাদী চারিদিক চাইতে লাগল। উত্তর হল—"আমি কবুত্ গো কবুত্!" সফেদী রেগে বল্লে—"আরে তাতো জানি। কোথায় তুই?"

"ছাতে গো ছাতে!"

সাদী দেখলে, এক গাঁ থেকে আর-এক

গাঁয়ে নীল আকাশের খবর বয়ে চলে যে নীল পায়রা, তারি-একটা একটুখানি জিরোতে আর একটু গল্প করে নিতে কোটাবাড়ীর আল্‌সেতে বসেছে।

গোলাবাড়ীর কুঁক্‌ড়োকে একটিবার চোখে দেখতে, তার একটুখানি খবর শুনে জীবনটা সার্থক করে নিতে পায়রা অনেকদিন ধরে মনে আশা করে আসছে; সাদা মুরগীর কাছে ঠিক খবর পাবে মনে করে পায়রা তাকে শুধোতে যাবে, এমন সময় উঠোনের কোণে একটা মাসকলাই চোখে পড়তেই সাদী সেদিকে 'রও' বলেই দৌড়ে গেল। সাদীকে কলাই খুঁটতে দেখে সুরকী ছুটে এল, কালী বালি গুলজারী সবাই এসে সাদীকে ঘিরে শুধোতে লাগলো—"দেখি, কি পেলি? দেখি, কি খেলি? দেখি দেখি, কি কি।" সাদী টুপ্ করে মাসকলাইটা গালে ভরে ফিক্ করে হেসে বল্লে—"কট্ কট্ কলাট্,মা-স ক-লা-ই!" বলেই সাদী কোটাবাড়ীর ঘুলঘুলির ধারে যেখানে খাকি চুপটি করে বসেছিল, সেখানে চলে গেল।

সাদী বল্লে—"ওলো ঘুলঘুলিটা খোলা পেলি কি?"

খাকি সাদীকে দরমার ঝাঁপে একটা ইঁদুরের গর্ত্ত দেখিয়ে বলছে—"যেম্‌নি ঘণ্টা পড়বে, আর অম্‌নি সে ঐ গর্ত্তটায় চোখ দিয়ে—"

এমন সময় পায়রা ডাক দিলে, খুব নরম করে, মিষ্টি করে—"তুখি-ভাতি সাদী সাহাজাদী, ও সফেদী!"

এবার সাদী সাড়া দিলে—"নীলের বড়ি, নীল পোখরাজ! কি বলবে, বলো?"

পায়রা খুব-খানিক গলা ফুলিয়ে গদগদ সুরে বল্লে—"যদি একবার—একটিবার—বল্‌ব তবে—শুধু একটিবার যদি দেখাও......"

খাকি, সুরকী, গুলজারী সব মুরগী ইতিমধ্যে সেখানে জুটেছিল। তারা সবাই সাদীর সঙ্গে বলে উঠলো—"কি, কি, কি, কি দেখাবো?"

পায়রা অনেকখানি ঢোক গিলে বল্লে—"তাঁর মাথার মোরোগ-ফুলটি যদি একটিবার..."

সব মুরগী হেসে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে বল্‌তে লেগেছে—"চায় লা, চায় লা, দেখ্‌তে চায়, দেখ্‌তে চায়!"

পায়রা বলছে—"দেখবই দেখব, দেখবই দেখবো!"—আর আল্‌সের উপর গলা-ফুলিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

সাদা মুরগী তাকে ধম্‌কে বল্লে—"অত ব্যস্ত কেন? আল্‌সেটা ভাঙ্‌বে নাকি?"

পায়রা ডানা চুলকে বল্লে—"না, না, তবে কি না আমরা তাঁকে ছেরেদ্ধা করে থাকি..."

সাদী বুক ফুলিয়ে বলে উঠলো—"ছেরেদ্ধা কে না করে?"

খোপ ছেড়ে আসবার সময়, কবুত্‌রীকে সে ফিরে এসে যে জগৎবিখ্যাত পাহাড়তলীর কুঁকড়োর রূপ-বর্ণনা-শুনিয়ে দেবে, দিব্যি করে এসেছে—সাদীকে পায়রা সে-কথা বলে নিলে। সাদী ইতিমধ্যে আবার ধান-খুঁটতে লেগেছিল, সে পায়রার কথার উত্তর দিলে—"চমৎকার—দেখতে চমৎকার- এ-কথা সবাই বল্‌বে!"

পায়রা বলছিল—কতদিন খোপের মধ্যে বসে তারা ছুটিতে তাঁর ডাক শুনেছে, নীল

আকাশ ভেদ করে আসছে, সোনার সুঁচের মতো ঝক্‌ঝকে সেই ডাক, আকাশ আর মাটিকে যেন বিনি-সুতোর মালাখানিতে বেঁধে এক-করে দিয়ে।

কুঞ্জলতার আড়ালে বেড়ার গায়ে ভাঙা খাঁচায় তাল-চড়াই এদিক-ওদিকে করছিল, হঠাৎ বলে উঠলো—"ঠিক, ঠিক, সবারি প্রাণ তার জন্যে ছট্‌ফটায়।"

এক মুরগী বলে উঠলো—"কার কথা হচ্ছে? আমাদের কুঁকড়োর নাকি?"

চড়াই বলে উঠলো—"কুঁকুড়ো কি শুধু তোদের? না, তোরাই শুধু তার? তুই মুই সেই, তোরা মোরা তারা, তোদের মোদের তাদের, সবাই তার, সে সবার।"

কিছু দূরে গোবদামুখো পেরু বসে-বসে এই-সব কথা শুনছিল, এখন আস্তে-আস্তে পায়রার কাছে এসে, কুঁকুড়ো যে এল-বোলে এবং এখনি যে সে তার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে কুঁকুড়োকে দেখে জীবন সার্থক করতে পারবে—এই কথা খুব ঘটা করে জানিয়ে দিলে। পায়রা বল্লে—"পেরু-মশায়, আপনিও তাঁকে চেনেন?"

পেরু গলার থলিটা দুলিয়ে বলে উঠলো—"আমি চিনিনে! কুঁকুড়োকে জন্মাতে দেখলেম, সেদিন!"

কুঁকুড়োর জন্মস্থানটা দেখবার জন্যে পায়রা ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠলো। পেরু তাকে একটা পুরোনো বেতের পেঁট্‌রা দেখিয়ে বল্লে—"এইখানে কুঁকুড়োর জন্ম হয়, কর্কট রাশিস্থে ভাস্করে, মুক্তোর মতো এক ডিম থেকে!" যে মুরগী এই ডিমে তা দিয়েছিলেন, তিনি এখনো বর্ত্তমান কিনা—শুধোলে পেরু পায়রাকে বল্লে—"এই পেঁটরার মধ্যেই তিনি আছেন, এখন বৃদ্ধা হয়েছেন, বড়-একটা বাইরে আসেন না, কেবলি ঝিমোচ্ছেন, কুঁকুড়োর কথা হলেই যা এক-একবার চোখ মেলেন!"—বলেই পেরু সেই পেঁট্‌রার কাছে মুখ নিয়ে বল্লে—"শুনচ গিন্নি, তোমার কুঁকুড়োর এখন খুব বাড়্‌-বাড়ন্ত"—বলতেই পেঁট্‌রার ডালা ঠেলে বুড়ি মুরগী হেঁয়ালিতে জবাব দিলে—"পুরোণো চাল ভাতে বাড়ে গো, ভাতে বাড়ে!"—জবাব দিয়েই বুড়ি পেঁট্‌রার মধ্যে মুড়িশুড়ি দিয়ে লুকিয়ে পড়লো।

পেরু বলে উঠলো—"আমাদের গিন্নি হেঁয়ালি বলতে খুব মজবুৎ, মুখে-মুখে হেঁয়ালি জুগিয়ে বলতে এঁর মত দুজন দেখা যায় না। কলির বিষ্ণুশর্ম্মার অবতার কিম্বা চাণক্য পণ্ডিতাও বলতে পার!" অম্‌নি পেঁট্‌রার মধ্যে থেকে জবাব হল—"ময়ূর গেলেন লেজ গুড়িয়ে. পেরু ধরলেন পাখা!"—'দেখলে, দেখলে'—বলতে-বলতে পেরু সেখান থেকে সর্‌লেন।

পায়রা সাদা মুরগীকে শুধোলে—"শুনেছি নাকি, সুখেও যেমন দুখেও তেম্‌নি, শীতে বর্ষায় কালে-অকালে তাঁর গলার সুর সমান মিঠে?"

মুরগী উত্তর দিলে,—"ঠিক, ঠিক!"

—"শুনেছি তাঁর সাড়া পেলে শিকরে বাজ আর একদণ্ড আকাশে তিষ্ঠে থাকতে পায় না, সবার মন আপনা-হতেই কাজে লাগে!"

—"ঠিক, ঠিক!"

—"শুনেছি, ডিমের মধ্যে যে কচি-কচি পাখী তাদেরও রক্ষে করে তাঁর গান,

বেজি আর ভাম বাসার দিকে মোটেই আসেনা!"

অম্‌নি চড়াই বলে উঠলো—"তাওয়ায় চড়ানো ডিম-সিদ্ধ খেতে!"

—"ঠিক, ঠিক!"

পায়রা এবার আল্‌সে থেকে একেবারে মুখ ঝুঁকিয়ে বল্লে—"আর শুনেছি নাকি তিনি কি গুণগান জানেন, যার গুণে তিনি নাম ধরে ডাক দিলেই পৃথিবীর রাঙা ফুল, তারা শুনতে পায়, আর অম্‌নি চারিদিকে ফুটে ওঠে, রাজ্যের অশোক শিমুল পারুল পলাস জবা লাল পারিজাত গোলাপ আর গুল্‌-আনার?

—"এও ঠিক সত্যি, ঠিক সত্যি!"

—"আর নাকি যার গুণে এমন হয়, সে মন্তর জগতে তিনি ছাড়া আর কেউ জানেনা!"

সাদা মুরগী উত্তর দিলে—"না! শুনেছি, তার পিয়ারী যে পাখী, সেও জানেনা, কি সে মন্তর।"

—"তাঁর পিয়ারী পাখীরা জানেনা বল"
—সাদা মুরগী উত্তর কল্লে।

পায়রার একটিমাত্র পিয়ারী কপোতনী; কাজেই কুঁকুড়োর অনেক পিয়ারী শুনে সে একটু চম্‌কে গেল। চড়াই বলে উঠলো—"অবাক হলে যে? কুঁকুড়োর পিয়ারী অনেক হবেনা তো কি তোমার হবে? তুমি তো বল কেবল ঘু-ঘু, আর তিনি যে নানা ছন্দে গান করেন!"

পায়রা বল্লে—"কি আশ্চর্য্য! তাঁর সব চেয়ে পিয়ারী মুরগী, সেও জানেনা তবে, কি সে মহামন্ত্র!"

অম্‌নি সুরকী খাকি কালি সাদী গুল্‌জারী যে যেখানে ছিল, সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো—"না গো না, জানিনা তো, জানিনা তো!"

এই-সব কথা হচ্ছে, ইতিমধ্যে দেখা গেল, একটি মনুয়া কুঞ্জলতার পাতার উপরে এসে বসেছে আর-একটা সরু আটাকাটি আস্তে আস্তে মনুয়াটির দিকে বেড়ার ওধার থেকে এগিয়ে আসছে—কাঠির মাথায় সাপের চক্করের মতো দড়ির ফাঁস।

তাল-চড়াই মনুয়াটিকে দেখছে কিন্তু সেই একটুখানি মনুয়াকে ধরবার জন্যে অত বড় ফাঁস-লাগানো আটাকাটিটা যে এগিয়ে আসচে, সেটা তার চোখে পড়েনি। সে আপনার মনেই বকে যাচ্ছে—"মন-মনুয়া, বনের টিয়া!" হঠাৎ দূর থেকে কুঁকুড়োর সাড়া এল—খবরদারি...! অম্‌নি চম্‌কে উঠে মনুয়া পাখী ডানা মেলে উড়ে পালালো, আটা-কাটিটা সা করে একবার আকাশ আঁচড়ে বেড়ার ওধারে আস্তে-আস্তে লুকিয়ে পড়লো।

চড়াইটা অম্‌নি ব্যঙ্গ করে বলে উঠলো—"দেখলে কুঁকড়োর কীর্ত্তি! এইবার কর্ত্তা আসছেন।"

কুঁকুড়ো আসছেন শুনে সবাই শশব্যস্ত! পায়রা এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে, তাল-চড়াই সেটা সইতে না পেরে বল্লে—"এম্‌নি কি অদ্ভুত কুঁকুড়োর চেহারাখানা! পাকা ফুটিতে দুটি সজনে-খাড়া গুঁজে দাও, মাথার দিকে একটা বিটপালং কিম্বা কতকটা লাল-পুঁইশাক, চোখের জায়গায় দুটো পাকা কুল, কানের কাছে ঝোলাও লাল দুটো পুলি-বেগুন, ল্যাজের দিকে বেঁধে

দাও আনারসের মুকুটি—বস্, জল্‌জ্যান্ত কুঁক্‌ড়োটা গোড়ে ফেল।”

পেরু এই কুঁক্‌ড়োর রূপ-বর্ণনা খুব মন দিয়ে শুনছিল, আর তাল-চড়াইয়ের বুদ্ধির তারিফ করছিল। পায়রা গলা ফুলিয়ে বল্লে—“চড়াই ভায়া, তোমার কুঁক্‌ড়ো যে সাড়া দেয়না, দেখি!” চড়াই বল্লে—“ওই ডাকটুকু ছাড়া আর সবখানি ঠিক কুঁক্‌ড়ো হয়েছে না?”

পায়রা রেগে গলা ফুলিয়ে বলে উঠলো—“বোকো না, বোকো না, মোটে না, মোটে না, বোকো না!” ঠিক সেই সময় বেড়ার উপরে ঝুপ্ করে এসে কুঁক্‌ড়ো বসলেন! পায়রা দেখলে মাণিকের মুকুট আর সোনার বুক-পাটায় সেজে যেন এক বীরপুরুষ এসে সাম্‌নে দাঁড়িয়েছেন। সন্ধ্যার আলো তাঁর সকল-গায়ে পলকে-পলকে রামধনুকের রং ধরে ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করছে, দৃষ্টি তাঁর আকাশের দিকে স্থির! মিষ্টি মধুর সুরে তিনি ডাকলেন—“আ-লো! আ-লো! আ-লো!” তারপর তাঁর বুকের মধ্যে থেকে যেন সুর উঠলো—অতু-ল্ ফু-উ-ল!—আলোর ফুল! আলো,—প্রাণের ফুল্‌কি আলো, চোখের দৃষ্টি আলো, এস ফুলের উপর দিয়ে—শিশির মুছে দিয়ে, এস পাতায়-লতায় ফুলে ঝিক্‌মিক্! আলোতে ঝিকমিক্—দেখা দিক্, সব দেখা দিক্, ভিতরে যাক্ তোমার প্রভা, বাইরে থাক্ তোমার আভা, একই আলো ঘিরে থাক্ শত দিক্ শতধারে, অনেক আলোর এক আলো, অনেক ছেলের এক মা! তোমার স্তুতি গাই আলোকবাদিন্, আলোকের স্তোতা! তোমায় দেখি ছোট হতে ছোট, বড় হতে বড়, নানাতে, নানা কালে,—কাচে, মাণিকে, মাটিতে, আকাশে, জলে-স্থলে; সকালে জলজল, সন্ধ্যায় ঝিলমিল্, মন্দিরে, কুটীরে, পথে বিপথে! ভিখারীর কাঁথার শোভা, রাজার পতাকায় প্রভা—আলো! বনের তলায় সোনার লেখা, সবুজ ঘাসে সোনার চুম্‌কী, আলোর ফুল্‌কি, আল্‌পনা অ-তু-উ-ল অমূল আলো!”

আর-সব পাখী যে-যার কাজে ব্যস্ত ছিল, কেউ ধান খুঁটছিল, কেউ গা ঝাড়ছিল। গুলজারী করছিল কিচ্‌মিচ্, সুরকী মাখছিল ধুলো, খাকি ঘাঁটছিল ছাইপাঁশ, কালী খুঁড়ছিল গর্ত্ত, সাদী মাজছিল গা, পেরু বকছিল বকবক, চড়াই বল্‌ছিল ছি-ছি, কেবল সেই আকাশের মতো নীল পায়রা অবাক হয়ে শুনছিল—

জয় জয় আলোর জয়!

পায়রা আর স্থির থাকতে পাল্লে না, গলা কাঁপিয়ে দুই ডানা ঝট্‌পট্ করে বলে উঠলো—“সাধু সাধু!” কুঁক্‌ড়ো আঙিনায় নেমে পায়রাকে দেখে বল্লেন—“ধন্যবাদ হে অচেনা পাখী, এখনি কি যাওয়া হবে?”

পায়রা বল্লে—“আপনার দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি, এখন ঘরে গিয়ে কপোতীকে আপনার আশীর্ব্বাদ দিয়ে চরিতার্থ হই!” কপোতনীর প্রবালের মতো রাঙা পায়ে নমস্কার জানিয়ে কুঁক্‌ড়ো কবুতকে বিদায় করলেন। পায়রা তাল-চড়াইয়ের ভাঙা খাঁচায় ডানার এক ঝাপ্‌টা মেরে গাঁয়ের দিকে উড়ে গেল!

চড়াইটা গজ্ গজ্ করতে লাগলো—“‘সুঁড়ির জয় মাতালে কয়’!”

কুঁকড়ো ডাক দিলেন—"কাজ ভুলোনা, কাজ ভুলোনা!" আর অমনি রাজহাঁস সে আর চুপচাপ বসে রইলো না, পাতিহাঁস, চিনে হাঁস, সব হাঁসগুলোকে দিঘির পাড়ে জল খাইয়ে আনতে চল্লো। কুঁকড়ো হুকুম দিলেন, যত কুড়ে হাঁসের ছানা সবাইকে, বেলা পড়বার আগে অন্ততঃ বত্রিশটা করে গুগ্‌লা সংগ্রহ করে আনা চাই! একটা বাচ্ছা মোরগ, তাকে পাঠালেন কুঁকড়ো বেড়ার উপর দাঁড়িয়ে চারশোবার 'ককুর-কু' বলে গলা সাধতে, এমন চড়া সুরে, যেন ওদিকের পাহাড়ে ঠেকে তার গলার আওয়াজ এদিকের বনে এসে পরিস্কার পৌঁছয়।

বাচ্ছা মোরগ গলা-সাধতে একটু ইতঃস্তত করছে দেখে কুঁকড়ো তাকে আস্তে এক ঠোকর দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, তার বয়েসে তাঁকেও প্রতিদিন ঠিক এমনি করেই গলা সাধতে আর পড়া মুখস্থ কণ্ঠস্থ সবি করতে হয়েছে। বাচ্ছা মোরগের মা গুলজারী ছেলের হয়ে কুঁকড়োর সঙ্গে একটু কোঁদল করবার চেষ্টা করতেই—"যাও, জালার মধ্যে ডিম-গুলোতে তা দাও সারারাত!"—গুলজারীর উপর এই হুকুম-জারি করে আর-সব মুরগীদের সবজী বাগানে যে-সব পোকা শাক-পাতা কেটে নষ্ট করছে, তার সব কটিকে বেছে সাফ করতে পাঠিয়ে দিয়ে কুঁকড়ো পেঁটরার মধ্যে তাঁর মায়ের কাছে উপস্থিত। কুঁকড়োর মা তাঁকে ধমকে বলে উঠলো—"এইটুকু বয়েসে তোর এই বিদ্যে হচ্ছে! কেবল টো টো করে ঘুরে বেড়ানো?" কুঁকড়ো একটু হেসে বল্লেন—"মা, আমি যে এখন মস্ত এক কুঁকড়ো হয়ে উঠেছি!"

—"যাঃ, যাঃ, বকিসনে। 'বেঙাচি বলাতে চান্ তিনি কোলা ব্যাং, ওরে বাপু সময়েতে সব হয়, চিল্ হন্ চ্যাং আজ না হয় হবে কাল।"—বলেই কুঁকড়োর মা পেঁটরার ডালাটা বন্ধ করলেন।

সাদা, কালি, সুরকী, খাকি কুঁকড়োর মার চার বৌ। কুঁকড়ো আসতেই তারা বলে উঠলো—"ঘরে কুঁড়োটি নেই যে,—তার কি করছ?"

—"চরে খাওগে' বলেই কুঁকড়ো গা-ঝাড়া দিয়ে বসলেন। একজন বসে বসে খাবে আর পরচর্চা করবে, আর অন্য দল তাদের খোরাক জোগাবার জন্যে খেটে মরবে, কুঁকড়োর পরিবারে সেটি হবার জো নেই, তা তুমি উপোস কর, আর না-খেয়েই মর। কাজেই কালি সাদা সবাই যেখানে যা পায়, দুমুঠো খেয়ে নিতে চল্লো। কিন্তু খাকি—সে নড়তে চায় না, সাদীকে চুপিচুপি বল্লে—"তোরা যা না, আমি সেই ঘড়ির মুখোকার পিউ পাখীর সন্ধানে রইলেম!"—বলে খাকি একটা ঝাঁপির আড়ালে লুকোলো। আর-সব মুরগী গেছে, কেবল সুরকী বসে-বসে নখে মাটি খুঁড়ছে মুখ ভার করে—দেখে কুঁকড়ো শুধোলেন—"তোর আজ হল কি?"

সুরকী ভয়ে-ভয়ে ঢোক গিলে বল্লে—"কুঁ-কু বলি—"

কুঁকড়ো গম্ভীর মুখে বল্লেন—"বলেই ফেলনা। বনিতার ভনিতার কবিতার কোন্‌টা বাকি?" উত্তর হল—"বল ত ভালোবাসো, কিন্তু—"

—"কথাটা চেপে যাও ছোট বৌ, চেপে যাও!"—কুঁকড়ো উত্তর কল্লেন।

ছোটবৌ ছাড়বার পাত্রী নয়, কান্না ধরলে—"না আমি শুনবোই।" কুঁকড়ো বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন—"আর ছাই শুনবে কি-ই-ই!" কুঁকড়োকে সুরকী একলা পেয়ে কিছু মতলব হাসিলের চেষ্টায় আছে, সব মুরগীই সেটা এঁচেছিল। তারা খাবারের চেষ্টায় কেউ যায়নি। এখন সাদী এক-কোণ থেকে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এসে বল্লে—"তোমার পাটরাণী আমি, সাদী।" কুঁকড়ো বিষম গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"কে—বল্লে—না!" সাদী একটু গলা চড়িয়ে বল্লে—"আমায় বলতেই হবে!" ইতিমধ্যে একদিক থেকে কালি এসে বলছে, খুব বিনিয়ে বিনিয়ে—"কও, আমি তোমার সু-ও-রা-ণী!" কুঁকড়ো ঠিক তেম্‌নি সুরে উত্তর কল্লেন—"কি—না—বল-গা!" কালি সুর ধরলে—"বলনা, বলনা"... অম্‌নি সাদী বলে উঠলো—"মন্তরটা কি? যার গুণে তুমি গুণীর মতো গান গাও?" কাছে ঘেঁসে সুরকীও সুর ধরলেন—"হ্যাঁগা, শুনেছি তোমার গলার মধ্যে একটা পিতলের রামশিঙে পরানো আছে, আর তাতেই নাকি লোকে তোমার নাম দিয়েছে—রাম-পাখী।"

কুঁকড়ো ব্যাপার বুঝে খুব-খানিকটা হেসে মাথা-হেলিয়ে বল্লেন—"আছে তো আছে! এ-ই গলার একেবারে টুঁটির ঠিক মাঝখানে খুব শক্ত জায়গায় সেটা লুকোনো আছে, খুঁজে পাওয়া শক্ত!" বীজমন্তরটা মুরগীদের কানে দেবার জন্যে কুঁকড়ো মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না, তবু খুব চুপিচুপি তাদের প্রত্যেকের কানের কাছে মুখ নিয়ে নিয়ে বল্লেন—"দেখ, মাঠের মধ্যে যখন চরতে যাচ্ছ, তখন খবরদার ঘাসের ফুল মাড়িও না, ফুলের পোকা খেও কিন্তু ফুল যেন ঠিক থাকে! খবরদার, যা-ও!"

মুরগীরা চলে যাচ্ছিল, কুঁকড়ো তাদের ডেকে বল্লেন—"জানো, যখন যাবে চরতে—"

এক মুরগী পাঠ বল্লে—"বাগিচায়।" কুঁকড়ো বল্লেন—"পয়লা মুরগী—"ইস্কুলের মেয়েদের মতো সব মুরগী একসঙ্গে বলে উঠলো—"আগে যায়।" কুঁকড়ো হুকুম দিলেন—"য'—ও।" মুরগীরা যাচ্ছিল, কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি তাদের ডেকে সাবধান করে দিলেন—"সড়ক পার হবার সময় রাস্তায় কি আছে, তা খুঁটে নেবার চেষ্টা করা ভুল, গাড়িচাপা পড়তে পার।"

মুরগীরা ভালোমানুষের মতো বেড়ার ফাঁকটার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালো। কুঁকড়ো চারিদিক দেখে বল্লেন—"দুই তিন চার! সিধে হও পার!" ঠিক সেই সময় দূরে মটর-গাড়ির ভেঁপু বাজ্‌ল—হাউ-মাউ খাউ! কুঁকড়োর অম্‌নি সাড়া পড়ল—ভেঁপুর চেয়ে জোর আওয়াজ—স-বু-উ-উ র! বেড়ার ধার দিয়ে সাঁ-করে খানিক ধুলো আর ধোঁয়া গড়াতে গড়াতে চলে গেল। মিনিট-কতক পরে যখন সব পরিষ্কার হল, তখন কুঁকড়ো মুরগীদের যাবার পথ ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন। একে একে মুরগীরা চল্লো,—সাদী খাকি গুলজারি। সুরকী সব-শেষে। সে কুঁকড়োকে বলে গেল—"কাব্যাৎ, যা-খাই তাতেই আজ তেল-তেল গন্ধ করচে—যেন তেলাকুচোর তেল-ফুলুরি!" ঝাঁপির আড়ালে খাকি মুরগী—সে মনে-মনে বল্লে—"রক্ষে, তিনি আমাকে দেখেন-নি, বাঁচলেম বাপু!" (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাজরী

অণিমার কথা

১

২৭শে বোশেখ। তারিখটা মাণিকের মতই বুকের মধ্যে জল-জল্ করছে। ভোরে ঘুম ভাঙল, বাহিরে নবতের সুর বাজছিল, ভারী মিষ্টি! চোখ যেন আর খুলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। সমস্ত দেহে-মনে যেন কিসের ঢেউ খেলে যাচ্ছিল! হঠাৎ নবৌদির গলা শুনলুম। ন'বৌদি এসে গালে চুমু দিয়ে বললে, "ওগো অনিরাণী, ওঠো গো, ওঠো, আজ আর বিছানায় পড়ে থাকে না। উঠে দেখবে এসো, আকাশে কেমন নতুন সূর্য্যি উঠেছে!" নবৌদির গলা জড়িয়ে ধরে বিছানায় উঠে বসলুম, বললুম, "এসেছো রাণী! কাল সেই রাত বারোটা অবধি তোমার জন্যে জেগে বসে থেকে শেষ হতাশ হয়ে শুয়ে পড়েছি।" নবৌদি বললে, "কি করবো বল ভাই, হাবড়ায় এসে একখানি গাড়ী পাই না! তোমার ন'দা একটা কুলি পাঠায়, সে পুল পেরিয়ে এসে একঘণ্টা দু'ঘণ্টা বাদে গাড়ী আনে, তবে আসতে পাই। এসেই আমাব অনুরাণীর খোঁজ নিয়েছিলুম গো। দেখি, রাণী আমার সুখস্বপ্নে বিভোর।"

বিছানা ছেড়ে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ালুম। সেই ভোরেই উঠানে ঝাড়লণ্ঠন খাটানো হচ্ছিল। বেলোয়ারি ঝাড়ে গায়ে-গায়ে লেগে টংটাং শব্দ হচ্ছে! আহা, সে কি মধুর, মধুর! অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে চারিদিক যেন ভরে গেছে! বাড়ীতে লোকজনও অমনি একেবারে গম-গম করছে!

নবৌদির সঙ্গে কতদিন পরে যে দেখা হল! তার উপর ছোটদি এসেছে,—তবেগে ভুতুদি, শৈল, টেঁপি, টুনি, নন্তু, মণ্টুরাণী সব্বাই এসেছে। নবৌদি বলেল, "বরের নামটি কি ভাই?" আমি বললুম, "যাও, আমি তার কি জানি!"

"বটে, জানো না—ওরে আমার লক্ষ্মী-সোনা, ভাজামাছটিও উল্টে খেতে জানো না—না?" বলে আমার গালটা খুব জোরে টিপে দিলে। এমন সময় সেজ মাসিমা এসে বললেন, "অনি, একবার এসো ত মা, তোমার মেসোমশাই তোমায় ডাকছেন। মুক্তোর ব্রেসলেটটা তোমার হাতে হবে কি না, দেখবেন। নাহলে এখনি আবার জহুরীর কাছে ছুটতে হবে।"

নবৌদি বললে,—"হ্যাঁগা মাসিমা, বরের নামটি কি?" সেজ মাসিমা বললেন, "সুনীল।"

আমার বিয়ে! কিন্তু সেই জন্যেই কি আমার আজ এত সুখ, এত আনন্দ! তা জানিনা। কোন্ ছোট বেলা থেকেই ত বিয়ে আর বরের কথা শুনে শুনে ও দুটো জিনিষের উপরই পক্ষপাতিতা খুবই জমে ওঠে, কিন্তু আজ ঠিক সেই জন্যেই যে

এতখানি আনন্দ হচ্ছিল, তা মনে হয় না। এতগুলি সাথীকে, বড়-আপনার জনকে কাছে পেয়েছি বলেই মনে যেন আর আনন্দ ধরছিল না!

সারাদিনটা আমায় নিয়ে সকলে মত্ত! আমায় যেন কি পেয়েছে সব! সেই ত চিরদিনের আমি,—আজ একেবারে কি রাজত্ব লাভ করলুম যে আমার এত আদর! আমায় নানাভাবে সাজিয়ে-গুজিয়ে কারো আর তৃপ্তি নেই! আমার এই মুখখানিই দশবার দশরকমে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চোখে দেখেও কারো যেন আর আশ মিটছে না। এ-সব ভারী ভাল লাগছে কিন্তু! মেয়ে-জন্মে এত আদর পাওয়া, এ কি কম সৌভাগ্য! বিশেষ আমাদের বাঙালীর ঘরে!

সন্ধ্যা হল। সারা আকাশ আলোয় মাতিয়ে চাঁদ উঠল,—পূর্ণিমার চাঁদ। সামিয়ানা-খাটানো ছাদের এককোণে বেল-জুঁইয়ের টবগুলো রাশীকৃত করে রাখা হয়েছে! কি চমৎকার গন্ধ ভেসে আসছিল! মন্টুরাণী আর নবৌদি আমাকে সকলের কাছ থেকে টেনে এনে সেইখানে বসিয়ে আমার চুল বেঁধে দিচ্ছিল। বারবার খোঁপা বাঁধে, আর বারবার খুলে দেয়—নবৌদির কিছুতেই আর পছন্দ হয় না! কেবলি বলে, "না ভাই, এ মুখখানির সঙ্গে খাপ-খাইয়ে খোঁপা বাঁধতে পাচ্ছিনা।"

মন্টু বলে উঠল, "ফুলের তোড়া বাঁধা কি যে-সে মালীর কাজ! ঠিক ফুলটির পিছনে ঠিক পাতাটি বসাতে হবে!"

নবৌদি বললে, "তুমি ত নিপুণ মালিনী আছ ভাই,—বেশত, দেখ না, এ মুখের বাহার বাড়িয়ে খোঁপা বাঁধতে পার কি না!" মন্টুরাণীর বরের নিউমার্কেটে ফুলের কারবার আছে, তাই তাকে মালিনী বলে রসিকতা করাটা সমবয়সীদের মধ্যে খুব চলতি ছিল! মন্টু বললে, "বেশ।" তারপর আমার মাথাটা নিয়ে দু'জনে এমন বিপদ বাধিয়ে তুললে যে, ওঃ, রাঙাদি এসে শেষ মুক্তি দেয়! রাঙাদির স্বামী-সোহাগিনী বলে ভারী যশ আছে,—বয়স চল্লিশ ছাড়িয়েছে, তবু যেন রূপের প্রতিমাখানি! কি রঙ, কি গড়ন! আর রাঙাদা একেবারে তাঁর—থাক্ সে কথা।

রাত আটটা। বাহিরে পথে ঝমর-ঝম শব্দে ব্যাণ্ড বেজে উঠল। বাড়ীর ফটকে ন'বতওয়ালা সুরের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে। আল্‌পনা দেওয়া পিঁড়ির উপর আমায় বসিয়ে দিয়ে সেজ মাসিমা বললেন, "খবরদার, উঠিস্‌নে যেন পাগলী। বর দেখতে ও ছুঁড়ি-গুলোর সঙ্গে তুইও যেন ছুটে যাস্‌নি—" সেজ মাসিমা চলে গেলেন—নবৌদি আমায় জড়িয়ে ধরে আমার গালে চুমু দিয়ে বললে, "শেষ চুমু খেয়ে নি ভাই, আর ত ক'-ঘণ্টা পরে অধিকার থাকবে না—" আমি বললুম, "যাও—"

বাজনার শব্দ ক্রমে কাছে এল। ক্রমে আরো কাছে! বাড়ীতে ঘন ঘন শাঁখ বাজতে লাগল। বাড়ী-শুদ্ধু সকলে দুড় দাড় শব্দে বাহিরের দিকের বারাণ্ডায় ছুটল। নবৌদি অবধি! মাগো মা, আর আমি ঠিক মাটীর পুতুলটির মত সেই কাঠের পিঁড়ির উপর

আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। বুকটা তখন এমনি কাঁপছিল!

খানিকপরে নবৌদি এসে বললে, "ভারী সুন্দর বর, ভাই। রঙে রঙ মিশে যাবে একেবারে—দেখিস।"

আমি কিছুতেই হাসিটুকু চেপে রাখতে পারলুম না। কেন এ হাসি—কে জানে!

ষ্টীমার চলে গেলে ছোট-বড় জলের ঢেউ যেমন কূলে ধাক্কা দেয়, আমার মনে তেমনি নানা ভাবের ঢেউ ছোট-বড় ধাক্কা দিতে লাগল। তারপর পিঁড়িতে বসিয়ে দোতালার বারাণ্ডা পেরিয়ে ছাদে আমায় নিয়ে এলো—এমনি তখন ভয় করছিল। আমি ত আর খুকী নই—ভয়ে পিঁড়িটা আঁকড়ে বসে রইলুম—হুলু, বরণ,সাতপাক-ঘোরানো—সে এক ভারী গোলমালের পালা চলল। তারপর পিঁড়ি-শুদ্ধ আমায় তুলে ধরলে মাথার উপর একটা চাদর খাটিয়ে দিলে, আর- তারপর সুরু হল, চারিধার থেকে কি সে আগ্রহ আর অনুরোধ, "এইবার চেয়ে দেখ অনি, বেশ করে চেয়ে দেখ দিদি, লজ্জা করো না, —দেখ দাদা, তুমিও দেখো, সোনার দৃষ্টিতে আমাদের অনিরাণীর পানে চেয়ে দেখো, ভাই।"

চোখের পাতা কে যেন আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে—খুলতে আর চায় না! কাঁপতে কাঁপতে অনেক কষ্টে চাইলুম—এ কি! কে যেন বুকের উপর পাথর ছুড়ে মারলে! চারিদিক অন্ধকার দেখলুম—মাথা কেমন ঘুরে গেল! এই নবৌদির রঙে রঙ মেশা? একটা কালো শুকো মুখ—বিশ্রী! মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল।

রাত্রে বাসরের গান-বাজনা একটুও ভাল লাগছিল না—নতুন অতিথিটি দু-একটা কথা কচ্ছিল—ভারী মিষ্টি লাগছিল,—কোন রকম বাচালতা নেই, বেশ নম্র শান্ত সুরটুকু! আহা, আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, সুরটির মত মানুষটিও মিষ্টি হল না কেন! দুষ্টুমি করলে ছেলেবেলায় বাবা খেপাতেন, "কালো বর হবে"—তখন রেগে বলতুম, 'কখ্খনো না! কালো বরকে মারবো না, দুম্ দুম্ করে—' হায়রে, বাবা কি শেষে সত্যই কালো বর ধরে দিলেন! কেন, আমি কি দোষ করেছিলুম? এত টাকা খরচ করেও কি—?

শেষরাত্রে বাসর নিস্তব্ধ। সবাই ঘুমিয়েছে, —অবশ্য মার তাড়ায়! মা বাইরে থেকে বকে গেছল, ওদের সারা রাত জাগাস্‌নে রে—ঘুমোতে দিস্! সারাদিন সব কষ্ট-টষ্ট গেছে,—না হলে অসুখ করবে! হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল—বাতির ঝাড়ে বাতিগুলো নিঃশেষ হয়ে এসেছে—বেশ একটা স্নিগ্ধ আলোয় ঘরখানি ভরে আছে,—ফুলের রাশি ম্লান বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। জরি-মোড়া মখমলের বিছানায় ভারী বেনারসী কাপড়ের একটু পাশ ঠেলে খুব সন্তর্পণে কোনমতে একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখলুম—এ কি ভুল? না, সুন্দর মুখখানি ত! নবৌদির কথাই ঠিক! চমৎকার রূপ! পুরুষ মানুষ এত সুন্দর হয়! এই আমার বর! বাঃ, চমৎকার বর! আহ্লাদে মন ভরে উঠল! শুভদৃষ্টির সময় একে দেখে আমি দুঃখ করেছিলুম? আমার চোখে কি হয়েছিল?

তারপর ভোর হল, ন'বতে সুর জাগল, —পায়ের সুতাখোলা নিয়ে তার অত্যন্ত নম্র শান্ত কথাবার্ত্তা,—লজ্জার হাসিটুকু— প্রাণ আমার জুড়িয়ে গেল—রাতের অনিদ্রা-কষ্ট সব ভুলে গেলুম! এই বরের কাছে আমি বেশ থাকব, সুখে থাকব! কারো জন্য আমার মন কেমন করবে না—এমন ভাল মানুষ, এমন কথাবার্ত্তা! না, কোন ভয় নেই, কোন ভয় নেই!

কিন্তু যাবার বেলায় চোখের জল হু-হু করে ঝরে পড়ল। ওরে আমার আজন্মের ঘরের কোণ, ওরে আমার আদরের ধুলো-মাটি, সোণার পুতুল, খেলার সাথী, ওগো আমার বাবা মা ভাই-বোনগুলি,—না, না, তোমাদের ছেড়ে কোন্ নতুন ঘরে কিসের আশায় আজ এ চলেছি আমি! এত মায়া, এদের এত টান! ওগো নাগো না, আমি চাইনা বিয়ে, চাইনা বর, আমায় আমার এই ঘরের কোণটি জুড়ে একপাশে পড়ে থাকতে দাও, ওগো আমায় পরের ঘরে পাঠিয়ো না গো, পাঠিয়োনা -আমি তোমাদের কাকেও ছেড়ে থাকতে পারব না! মরে যাব সেখানে গেলে—ওগো, তোমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে চাইনে আমি!

বাবার চোখ ছল-ছল করছিল—মা চোখে আঁচল দিয়ে জল মুচ্‌ছিল। ঘটি, বুড়ী একেবারে ডাক ছেড়ে কাঁদছিল। বাবা ভারী গলায় বললেন, "কাঁদিস্‌নে মা, আমি আজই রাত্রে গিয়ে তো'ক দেখে আসব'খন। তারপর রোজ রোজ দেখতে যাব'খন। আবার ত দু'চার দিন বাদেই আসবি এখানে—" মা বললেন, "ছি মা, কাঁদতে নেই! আশীর্ব্বাদ করি, জন্ম-জন্ম ঐ ঘর কর, এখানে যেন তুমি আস্‌তে না চাও কখনো—"

ঝমর-ঝম্ শব্দে ব্যাণ্ড বাজছিল। ন'বতের করুণ সুরে প্রাণের মধ্যে অসহ্য বেদনা আথালি-পাথালি করতে লাগল। শাঁখের আওয়াজ, মানুষের চীৎকার, হাঁক-ডাক, কান্না, কাঙালী-ভিখিরীর আবেদন—চারধারে কেমন একটা বেতালা কোলাহল তুলে দিলে,— তারি মাঝখান দিয়ে কম্পিত প্রাণে বরের চাদরে গাঁটছড়া-বাঁধা আমি তাঁরই গতির টানে এক পা এক পা করে এসে গাড়ীতে উঠলুম। চোখের জলে চারিদিক অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা হয়ে এলো—গাড়ী চলতে আরম্ভ করলে। ভয়ে-দুঃখে আমি একেবারে সন্ত্রস্ত কুণ্ঠিত হয়ে গাড়ীর এক পাশ ঘেঁসে বসে রইলুম।

২

অজানা ঠাঁই—অজানা লোক-জন। আদরের কিন্তু ধুম বেধে গেল। বরণ-টরণের পর খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে একটা জানলার ধারে বসে ছিলুম, পাশে ছিল, কাত্তী ঝী। খোলা জানলার পাশে একটা চাঁপা গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে, পাশে ছোট একটু বাগান। ইচ্ছে হচ্ছিল, উঠে বাগানটা দেখি, কিন্তু ভরসা পাচ্ছিলুম না—যদি কেউ নিন্দে করে! মা বলে দিয়েছে, "লোকের কথায় সেখানে চলবি-ফিরবি, খবরদার, যেন নিজে থেকে কিছু করিস-নি"। এমন কি, পরবার কাপড়খানি পর্য্যন্ত নিজে পছন্দ করে বাক্স থেকে বার করে পরতেও মা মানা করে দিয়েছিল! তারা বাক্স থেকে যেখানি বার করে দেবে, সেইখানি পরতে

হবে! না হলে সবাই ভারী নিন্দে করবে! মা পই-পই করে সাবধান করে দিয়েছিল,—কাজেই এ অবস্থায় উঠে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাগান দেখবার কৌতূহল মনের মধ্যে দমন করতে হল। ভারী কষ্ট হচ্ছিল। কত লোক এসে ঘোমটা খুলে মুখ দেখে যাচ্ছে, যার যেমন-খুসি মন্তব্য প্রকাশ করছে—আমার মনে হচ্ছিল, একবার তাদের দেখি। এই যে নানা গলায় নানা মুখের কথা—প্রাণের মধ্যে রকমারি সুরের ফোয়ারা খুলে দিয়েছিল। তাদের মুখগুলি দেখবার জন্য বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল। আহা, কেমন মুখগুলি—কেমন এরা! চোখ দুটি মেলে তাদের যে একবার দেখব, তাতে অবধি মানা। আমি কনে-বৌ,—কনে-বৌ মুখ খুলবে না, চোখ খুলবে না। বুক ফেটে আমার কান্না আসছিল! হঠাৎ এমন সময় চার-পাঁচ বছরের একটি ছেলে আমার কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবারে টেনে সব ঘোমটাটা খুলে দিলে,—যেন বসন্তের এক ঝলক পাগল বাতাস কোথা থেকে ছুটে এসে শীতে-মলিন ফুলের বনে নতুন প্রাণ জাগিয়ে তুললে। গন্ধে চারিধার ভরে গেল! সে ঘোমটাটা খুলে দিয়ে গলা জড়িয়ে আমার মুখের উপরে মুখ দিয়ে বললে, "টাটিমা—আমাড় ডাঙ্গা টুটটুটে টাটিমা—"

দিব্যি ছেলেটি! আহা! আমার ঘটি বুড়োর কথা মনে পড়ল। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলুম।

ছেলেটি বললে, "আমাড নাম বুবড়ি—টুমি আমার টাটিমা, আমাড় টাটিমা,—আড় টাড়ো না—"

ইচ্ছে হচ্ছিল, ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে তার ঐ ডালিমের মত রাঙা ঠোঁটদুটিতে চুমু খাই—কিন্তু সাহসে কুলোল না। আমি তার ডাগর চোখের পানে চেয়ে বসে রইলুম। হঠাৎ ছেলেটি ঝাঁকি মেরে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "অই, চড়বে টাটিমা, আমি ডুড ঠাব না, টুটুঠোনো ঠাব না।" চোখ তুলে দেখি, মোটা কালো এক ঝী, দুধের বাটি হাতে রণমূর্ত্তি ধরে সাম্‌নে এসে হাজির।

সে বললে, "খাও বাবু, এই কাজের বাড়ী, সব কাজ পড়ে-ঝড়ে রয়েছে—আমার আজ এট্টু সময় নেই। দুষ্টুমি না করে দুধটুকু খেয়ে ফেলো "

বুবড়ি বললে, "না, আমি ডুড ঠাব না।"

ঝী ঝঙ্কার দিলে, "না, খাবে না! এই রোসো ত, গাছ থেকে জটে বুড়োকে ডেকে দি অরে অ জটেবুড়ো, আয় ত রে—"

বুবড়ি অভিমানের সুরে বললে, "ড্যাটোনা টাটিমা, ভয় ড্যাটাচ্ছে! যাঃ—আমি টাটিমার টাচে ডুড ঠাব।"

আমি বললুম, "দাও, আমি খাইয়ে দি।"

ঝী মহাখুসি—দুধের বাটি রেখে চলে গেল।

এই বিচ্ছেদের বেদনার আঁধারে এক-রত্তি ছেলে ঐ বুবড়ি আমার প্রাণে কি বাতিই জেলে দিলে। তারি আলোয় এই অজানা পুরীর খানিকটা আমার নজরে পড়ল,—সেটুকু স্নেহ-আদরে ভরপুর, জল্-জল্ করছে! বুবড়ি নানা কথা গড়গড় করে বলে গেল আমাকে—কি করে মোটরগাড়ী চালাতে হয়, আকাশ-গাড়ী কেমন করে ওড়ে,—আলিপুরের চিড়িয়াখানায় কতরকম

জানোয়ার আছে,—সেই জানোয়ারদের মধ্যে একটা দুষ্ট বনমানুষ কেমন করে একদিন তার বাবার হাত থেকে একটা লাঠি কেড়ে নেছল, আর বনমানুষের চাকরটা খাঁচার মধ্যে থেকে কি কষ্টে যে সেই লাঠিটা আদায় করে আনে,—এমনি-সব ঘটনাব পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় সে আমায় তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছিল। গল্পের আর তার অন্ত ছিল না—দুটি দিনে আমি যেন তার কতকালের-চেনা আপন-জন! তার খাওয়া-বসা, চলা-ফেরা, মনের যা-কিছু খেলাধুলো, সাধ-আহ্লাদ, সব আমার সঙ্গে, আমায় নিয়ে!

শাশুড়ী বললেন, "ছেলেটা বৌমাকে পেয়ে বসেছে।"

একজন বললেন, "ওরে, ও একে নতুন বৌ তায় ছেলেমানুষ, তোকে সামলাতে পারবে কেন? অমন করে ঘাড়ে পড়িস নে।"

বুবড়ির ডাগর চোখদুটি ছলছল্ করে উঠল। অভিমানে চোখ ফিরিয়ে সে বললে, "ডাও—"

আমি বললুম, "থাক্ মা, আমার ঘাড়ে পড়ুক,—আমার কিছু লাগছে না ত!"

ছেলেবেলা থেকেই দিদি, মাসি, পিশি—এ সব ডাক ত শুনে আসছি—সে ডাক খুবই মিষ্টি লাগে! কিন্তু এখানে প্রথম এসে এই যে 'কাকিমা' ডাকটি—আহা, সে ডাক আমায় একেবারে মাতিয়ে তুললে—এমন মিষ্টি ডাক ত কখনো শুনিনি! এ-ডাকে বাপের বাড়ীর বিচ্ছেদের সব দুঃখ আমার চকিতে কোথায় উবে গেল!

৩

ফুলশয্যার রাত্রি। পরের ফুলশয্যার রাতে আড়ি পেতে আনন্দে কত অধীর হয়ে উঠেছি—কিন্তু আজ নিজের ফুলশয্যার রাতে সন্ধ্যা যত ঘনিয়ে আসছিল, ততই গা ছম-ছম করছিল! শুধুই কি ভয়! এই অজানা পুরীতে পাঁচজনে একবার আমার এ জামা খুলে আবার তখনি ও জামা পরিয়ে, মুখে একবার পাউডার ঘষে—আবার তোয়ালে দিয়ে তা মুছে ফেলে, ভিজে গামছা মাথায় চেপে ধরে পাতা কেটে চুল বেঁধে—সে একেবারে এমন ধূম বাধিয়ে তুলেছিল যে, সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছিল! লজ্জায় যেন আমি মরে যাচ্ছিলুম। আমি কি একটা জিনিষ, না, আমায় এগ্‌জিবিশনে পাঠাতে হবে—যে তারি জন্যে চারিধার থেকে কোথায় কি খুঁত, কি চুক্ আছে, তা পাউডারে ঘষে মেজে ঢেকে দর্শকের মুখ থেকে বাহবা আদায় করতে হবে! মনে হচ্ছিল, মুখ ফুটে একবার বলি, ওগো, আমি মানুষ গো, মানুষ! এমন করে ঘষা-মাজা করো না গো, গা ছিঁড়ে যাবে! আমি তৈজস নই, আসবাব নই, আমার যা দাম, তা আমার এই কটা চামড়াটাতেই লেগে নেই—আর এই চামড়াখানার জন্যেই আমায় এখানে আনা হয়নি! কিন্তু বলি কি করে? আমি যে কনে-বৌ!

রাত প্রায় দশটা-এগারোটা অবধি বাবার দেওয়া ফুলশয্যার তত্ত্বের অজস্র সুখ্যাতি চলতে লাগল। জিনিষের চাপে আমার রূপের প্রশংসাও ঢের বেড়ে গেল—সেটা

অবশ্য বুঝতে পাচ্ছিলুম, বাহিরকার নিমন্ত্রিতা-দের তরফ থেকে! তাঁরা যে অনুপাতে মিষ্টান্ন ও নমস্কারী কাপড় পাচ্ছিলেন, সুখ্যাতিটাও তাঁদের মুখ থেকে ঠিক সেই মাপেই বেড়ে উঠছিল! আমার শাশুড়ী যিনি—তাঁকে প্রথম দেখা অবধি ভারী চমৎকার লেগেছিল। বিধবা—শান্ত সুন্দর মূর্ত্তি! আমাদের বাড়ীতে বাবার এক বন্ধুর আঁকা গণেশ-জননীর প্রকাণ্ড ছবি ছিল—অমন স্নেহ-ভরা, দুঃখ-হরা সুন্দর মুখ, মানুষের আঁকা কোন ছবিতে আর কখনো দেখিনি, কোথাও দেখিনি! আমার শাশুড়ীকে দেখবামাত্রই আমার মনে হল, এ কি, এ যে অবিকল সেই ছবির মুখ! মুখখানিতে কে যেন অজস্র স্নেহ ঢেলে রেখেছে,—আর রূপও তেমনি। জানিনা, দেবতাদের ভগবতী সত্যিই দেখতে কি রকম, কিন্তু তিনি যদি আমাদের বাড়ীর সেই আঁকা ছবি কি আমার এই শাশুড়ীর মত দেখতে হন, তাহলে মানব বলে, হাঁ, সত্যই তিনি সুন্দর, সত্যই তিনি দেবী, আর এই নিখিল বিশ্বের মা তিনি! যাক্—এসব গভীর কথার প্রয়োজন নেই—আমার ছেলেমুখে ভারী বেমানান্, বিশ্রী স্পর্দ্ধার মত শোনাবে!

ঘুমে আমি ঢুলছিলুম! সেই অবস্থায় এনে আমাকে আসনে বসানো হল— দুজনে ধরে আমার হাত দিয়ে খাবার তুলিয়ে বরের মুখে দেওয়ালে—আমারও দুই ঠোঁটে মিষ্টান্ন এবং আরও বিচিত্র স্বাদের কত কি খাবার এসে চমক দিয়ে যাচ্ছিল! মালা পরানো প্রভৃতি ছোট-বড় আরো কতকগুলো কি কাজ ছিল—অস্পষ্ট আব্ছায়ার মত শুধু মনে পড়ছে সব। ঘুমে আমার তখন চেতনা ছিল না ত!

তারপর যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, অর্থাৎ স্পষ্ট একটু জ্ঞান হল, তখন দেখি, একটা রুদ্ধ-দ্বার ঘরের মধ্যে খাটের উপর আমি বসে আছি। নতুন খাট্, নতুন শয্যা—মশারির লেশ-দেওয়া ঝালর, লাল পরীর ডানার মত খাটের গায়ে মেলানো! ঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলছে—আর পাশে বসে সে,—আমার বর। চকিতে চেয়েই আমি চোখ নামিয়ে নিলুম। বড্ড লজ্জা হচ্ছিল,—ভয়ও করছিল। ছি-ছি—এই বয়সে অজানা [illegible]ন পুরুষমানুষের কাছে কখনো ত এগুতে পারিনি! আর আজ এত কাছে—এত—

বর আমাকে একেবারে দুইহাত দিয়ে জড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। আমি তার জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলুম না—তার ঘুমের ঘোর—আমি তার গায়ের উপর ঢলে পড়লুম—তারপর আমাকে এক মুহূর্ত্তও ব্যাপারটা বোঝবার অবকাশমাত্র না দিয়েই সে সজোরে আমার মুখের ঘোমটা খুলে আমার মুখ অজস্র চুমায় ভরে দিলে। আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল, লজ্জায় আমি কেঁপে উঠলুম, ভয়ে বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করে কি যেন আছাড় খাচ্ছিল। অস্পষ্ট একটা শব্দও মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল,—আঃ—

বর হঠাৎ চমকে উঠল,—তাড়াতাড়ি আমায় মুক্তি দিয়ে আমার দুই গালে হাত বুলিয়ে সস্নেহে বললে, "তোমার ব্যথা

দিয়েছি, আমি? বল, বল, অণি, বল হৃদয়-রাণী আমার—"

কি বলব! আমার ভারী লজ্জা কচ্ছিল! মুখের ঘোমটাটা প্রকাণ্ড করে টেনে আমি কাঠ হয়ে বসে রইলুম।

সে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, বললে, "রাণী, আমায় মাপ কর—" সে স্বরে কি যে বেদনা! আমার কষ্ট হল। সে আবার বললে, "বল, তোমায় ব্যথা দিয়েছি আমি? বল, লক্ষ্মী রাণী আমার—"

আমি অপ্রতিভ হয়ে পড়লুম, ভাবলুম, বলি,—'না'—কিন্তু গলাকে চেপে ধরলে। স্বর ফুটল না—শুধু ঘাড় নেড়ে জানালুম, না।

সে একটা নিশ্বাস ফেললে। স্ব... নিশ্বাস মনে হল, যেন বড্ড আরাম পেলে! তারপর আমার মুখখানি নিজের বুকে চেপে ধরলে—খুব চাপা গলায় বললে, "বড্ড ঘুম পাচ্ছে তোমার,—না?"

আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, হাঁ।

আমার মুখ ছেড়ে দিয়ে সে চুপ করে খানিকটা বসে রইল, তারপর এক নিশ্বাসে অনেক কথা বলে গেল—তার সবগুলো ঠিক ধরতে পারলুম না—কতকগুলো বেশ শক্ত শক্ত কথা ছিল, মানে বুঝতে পারলুম না—কটা কথা আজও মনে আছে। নতুন জীবন, অসহ্য সুখ, বিরাট সূচনা—এমনি কত কি! কথাটা বলে বর জবাবের প্রত্যাশা করলে! কিন্তু কি জবাব দেব আমি? যেমন কাঠের মত বসেছিলুম, তেমনি বসে রইলুম—আমার মনটা তখন যেন শূন্যে ঝুলছিল,—কোথায় দাঁড়াবে, থই পাচ্ছিল না! কি বলব, কি করব, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিলুম না। তারপর হঠাৎ সে একরাশ বই বিছানার উপর দড়াম করে এনে ফেললে এবং অনর্গল তা থেকে পদ্য পড়তে লাগল। আমার কাণে খালি কতকগুলো ছন্দের ঝঙ্কার এসে লাগছিল—কিন্তু ঐ কানের পাশ থেকেই ঝরে পড়ছিল, মনে কিছু পৌঁচুচ্ছিল না! এমনি অগ্নি-পরীক্ষায় কতক্ষণ কাটল, জানিনা, তবে ভোরের দিকে একটা ফুরফুরে হাওয়া এসে গায়ে লাগল—সে বললে, "ইস্—তাইত, সারা রাত তোমায় জাগালুম! বড় কষ্ট দিলুম ত রাণী! মাপ কর আমাকে —ঘুমোও এখন একটু—" বলে আদর করে আমায় বিছানায় শুইয়ে দিলেন—এবং নিজেও বইগুলো রেখে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লে—শুয়ে আমার গলার নীচে হাতটা দিয়ে বুকের মধ্যে আমাকে টেনে নিলে— আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল! এ কি আদর, না—? কি করব! কাছেই কে গান গাইছিল,

"কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে,
মিলন-যামিনী গত হলে!"

গান শুনতে শুনতে কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়লুম, কিছুই বুঝতে পারিনি।—যখন ঘুম ভাঙল, তখন চেয়ে দেখি, ঘরে এক-ঘর লোক—ননদ-ভাজের দল। সবাই ঠাট্টা করছে, "এমনি করেই কি সারারাত জাগতে হয় গো রাণী?"

লজ্জায় আমি ঘাড় হেঁট করলুম। ছি-ছি!

এমনি করে আরো দু'তিন রাত্রি কাটল। সত্যি বলতে কি, দিনের বেলাটা মন্দ লাগত না—কিন্তু রাত্রে তার ঐ-সব কি যে কথা, কিছুই বুঝতে পারতুম না!—আমার কেমন

লাগত—অস্বস্তি? তাও বলতে পারি না—তবে কেমন যেন জড়সড় হয়ে পড়তুম,—ভারী ভয় হত!

সেদিন সন্ধ্যার সময় বাবা এসে বললেন, "কাল সকালে আমি এসে তোকে নিয়ে যাব রে—কেমন, এবার মন-কেমন সারবে ত?"

আহ্লাদে আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললুম, "খুব সকালে এসো বাবা--লক্ষ্মীটি,—আমার ভারী মন-কেমন কচ্ছে তোমাদের জন্যে।"

বাবা বললেন, "পাগলী মেয়ে!"

সে রাত্রে তিনি কিন্তু একটুও ঘুমুতে দিলেন না—কেবলি দুঃখ করতে লাগলেন,—"আমি কেমন করে তোমায় ছেড়ে থাকব রাণী? মোটেই পরিচয় ছিল না, আর এ ক'দিনে তুমি এ কি করে গেলে আমার! কখন রাত্রি হবে, তোমায় বুকে নেব,সারাদিন শুধু তাই ভাবি!" বলতে বলতে তাঁর চোখে জল দেখা দিলে। তা দেখে আমারও কিন্তু ভারী কান্না পাচ্ছিল

তিনি বললেন, "তোমার কি একটুও মন কেমন করবে না, আমার জন্যে? বল রাণী বল, বল-

কি বলব? আমি চুপ করে রইলুম—কিন্তু বার বার তাঁর ঐ এক কথা—"বল, বল—তুমি কি একবারও আমার কথা ভাববে না?" আহা, বেচারী! চক্ষুলজ্জা হল আমার—আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, হুঁ।

তখন আবার সেই আদরের ঘটা! আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

তিনি বললেন, "রোজ আমায় চিঠি লিখবে?"

বড় ঘুম পাচ্ছিল। ঘুম ভাঙ্‌লেই সকাল হবে, সকাল হলেই বাড়ী যাব,—তাই তাড়াতাড়ি ছুটি পাবার আশায় ঘাড় নেড়ে আবার জানালুম,—হাঁ।

সকালে বাড়ী এলুম—জোড়ে। দু'একটা নিয়ম-পালা সারা হবার পর গাঁটছড়ার বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। একেবারে তেতলার ছাদে ছুট দিলুম—সেখান থেকে ছুটে একেবারে একতলায় রান্নাঘরের মধ্যে—তারপর সারা বাড়ীটা ছুটোছুটি করে এতদিনকার বন্দীত্বের ক্ষোভ দূর করে একেবারে এসে ঘন্টিটাকে চেপে ধরে তার গালের উপর ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিলুম—সে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল! সেখান থেকে অমনি একদৌড়ে চল্লুম দোতলার ছাদে—বিনি সেখানে দাঁড়িয়ে একটা আঁব খাচ্ছিল। তার হাত থেকে আঁবটা কেড়ে নিয়ে তাতে এক কামড় বসালুম—সে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। মা ঠাকুরঘর থেকে কুলো-বরণডালা সব নিয়ে বেরিয়ে আসছিল—দেখতে পেয়ে বকে উঠল, "শ্বশুর-বাড়ী থেকে ও কি ধিঙ্গি হয়ে এলিরে তুই? এ্যাঁ! ছেলে-মেয়েগুলোকে ঠেঙ্গিয়ে কাঁদিয়ে ও কি ও ন্যাকরা হচ্ছে তোর?" জামাই রয়েছে না বাড়ীতে! কি মনে করবে?" দারুণ অভিমানে মার উপর একটা তীব্র গর্জ্জন হেনে সজল চোখে একেবারে

বাবার বসবার ঘরে এসে দোলা চেয়ারটার উপর থপ্ করে বসে পা-মুড়ে দোল খেতে লাগলুম। কিন্তু এখানেও কি ছাই নিস্তার আছে? কোথা থেকে তখনি বাবা এসে হাজির, নতুন জামাইটিকে সঙ্গে নিয়ে। আমি ত মাথায় আঁচল টানতে টানতে ওদিককার দরজা দিয়ে ভোঁ দৌড়। দৌড় দিয়ে একেবারে রান্নাঘরে এলুম। ছোট পিশি কাটলেট ভাজছিল,—থালা থেকে একখানা তুলে নিয়ে তাতে কামড় বসিয়ে দিলুম।

৪

বরটি চলে গেলে সেই মুহূর্ত্ত থেকে আবার যে-আমি সেই-আমি! বাপের বাড়ীর মেয়ে, খোলা প্রাণে খোলা মনে নবৌদিদের সঙ্গে আমোদে মেতে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। কিন্তু হায়রে, সে কতক্ষণের জন্যেই বা! বরটি যেদিন চলে গেল, তার ঠিক পরদিন বিকেল বেলা—তখন বেলা প্রায় পাঁচটা—আমি বাথরুমে যাচ্ছিলুম গা ধুতে, এমন সময় অন্দরের দালানে মহা হাসির লহর ফুটে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বিরাট কলরব, "এ অনির চিঠিরে, অনির চিঠি,—গন্ধ-ওলা খাম—দেখছিস্‌নে! নতুন জামাই চিঠি দিয়েছে, নিশ্চয়। ওরে ও অনি—" শুনে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠল। আচ্ছা মানুষ ত! দেখ দেখি, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এমনি করে এত লোকের সামনে চিঠি দিয়ে আমায় অপ্রস্তুত করা! কেন বাবু, কে তাকে চিঠি দিতে বলেছিল? কে তার চিঠির জন্যে হাঁ করে বসেছিল? ছি ছি। লজ্জায় পা আমার অবশ হয়ে গেল—এগুতে পারি না, পেছুতেও পারি না, এমন অবস্থা! সে যে কি বিপদ, তা কি বলব।

বাথরুমের দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালুম, কাণ খাড়া করে,—ওধারের দালানে হাস্য-পরিহাসটা গড়ায় কোথায়, শোনবার জন্যে;—এমন সময় নবৌদি ছুটে এল, হাতে এক চৌকো রঙিন খামে মোড়া চিঠি। নবৌদি এসে একেবারে আমায় জড়িয়ে ধরে বললে, "লক্ষ্মী ভাইটি, আমি চিঠিখানা খুলি—?" আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, নবৌদির মুখের পানে চেয়ে। সত্যি বলতে কি, চোখে আমার জল এসেছিল। নবৌদি বললে, "ওরা খুলতে গেছল, আমি খুলতে দিইনি—আমায় কিন্তু ভাই পড়তে দিতে হবে—দিবি না?" নবৌদি আমায় টেনে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিলে—অমনি বাহিরে থেকে দোরে ঘন-ঘন ঘা পড়তে লাগল—"ও ভাই নবৌদি, লক্ষ্মীটি ভাই—আমাদেরও দেখতে দিয়ো—"

"যাঃ, যাঃ, ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করতে হবে না" —বলে একটা তীব্র ঝঙ্কারে বাহিরের উৎসুক প্রাণীগুলিকে একদম দমিয়ে দিয়ে নবৌদি আমার মুখের পানে চাইলে। আমার তখনো সে ভাবটা কাটে নি—চোখ তখনো এমনি যে, জলটুকু ঝরে' পড়ে আর কি! নবৌদি বললে, "কাঁদছিস্ রাণী? না ভাই, তবে থাক্, তোর চিঠি আমি পড়ব না,—এই নে—" দেখলুম, নবৌদির সেই হাসি-ভরা চোখদুটিতে কোথা থেকে একটা ম্লান ছায়া এসে পড়ল। আমি বললুম, "ও কি ভাই, আমি ত তোমায় দেখতে মানা করছি না—"

"তবে?"

"দেখ দেখি ভাই, কি রকম অন্যায়। চিঠি লিখে এত লোকের সামনে আমায় অপ্রস্তুত করা—!" বলে আমি নবৌদির বুকে মুখ লুকোলুম।

নবৌদি বললে, "ওলো নেকি! বর চিঠি লিখবে না ত কে লিখবে! সকলকার বরই লেখে। এতে আবার অপ্রস্তুত হওয়া কি লো। আয়, দুজনে দেখি, কি লিখেচে

সত্যি বল্‌তে কি—আমারও সেদিকে কৌতূহল যে কম হচ্ছিল, তা নয়। বেশ একটা মজাও লাগছিল। বরের চিঠি—। শুনেচি, সে নাকি ভারী মিঠে জিনিস, ভারী যত্নের, ভারী সোহাগের ধন সে! পরের বরের চিঠি দেখবার জন্যে আগে কি রকম যে মনটা ছোঁক ছোঁক করত—কিন্তু নিজের বরের চিঠি এলে যে এত লজ্জা হয়, তা তখন কে জানত! তবে কিনা, কেবলি মনে হচ্ছিল, ছি, ছি, বাবার সামনে মার সামনে মুখ দেখাব কেমন করে? ডাকওলাটা হয়ত চিঠিখানা বাবার হাতেই দিয়ে গেছে—মা হয়ত ভাববে, কি মাথামুণ্ডুই না জানি লিখেচে! এই সেদিন বিয়ে হল, এর মধ্যে একেবারে—ছি-ছি! নিজেকে কেমন একটা ভয়ঙ্কর অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। দুঃখ কি শুধু তাই! তার উপরে এই এক-বাড়ী লোক—না হয়, তারা চলে গেলে চুপি চুপি লিখত! নবৌদি বললে, "তাহলে খামটা ছিঁড়ি—?"

কোনমতে ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে আমি বললুম, "ছেঁড়ো—" নবৌদি খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করলে—আমি একটু পাশ থেকে আবডালে দেখতে লাগলুম—সেই ত নবৌদি, তার কাছে কোন কথাই ত আমার কোনদিন গোপন নেই, তবু এমন লজ্জা হচ্ছিল! নবৌদি চিঠিখানা খুলে এক লাইন পড়েই হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল। তারপর আমায় জড়িয়ে ধরে বললে, "পড়গো রাণী, পড, শুধু কি আমিই? এই ছাখো ভাই, তোমার বি-এ পাশ বরটিও তোমায় দুদিন দেখেই কি মজায় মজে গেছে! সম্বোধনটা দেখচ, একবার—?" বলে নবৌদি চিঠিখানা আমার চোখের সামনে ধরলে—প্রথমেই সম্বোধনটা চোখে পড়ল,—প্রকাণ্ড সম্বোধন সে—

"আমার চিরজীবনের সঙ্গিনী, প্রিয়তমা, হৃদয়-মণি, অনিরাণীটি—"

দেখেই ত আমার বুক দুড় দুড় করে উঠল! লজ্জায় কাণদুটো গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। আমি চোখদুটো সরিয়ে নিলুম। নবৌদি গালে একটু ঠোনা মেরে বললে, "আবার! চোখ ফেরালি যে বড়! নে, আয়, পড়ি আয়—"

অগত্যা পড়তে হল—কিন্তু মনের মধ্যে তখন যে কি হচ্ছিল, তা আমার অন্তর্যামীই শুধু জানছিলেন। চিঠিটা এই—

"তোমার সঙ্গে বিদায়ের মুহূর্ত্ত থেকে আমার আর একদণ্ড স্বস্তি নেই। এ আমার কি করলে রাণী? দুদিন আগে কে তুমি, কোথায় ছিলে—কোন্ অজানা ঘরের কোণে, কোথাকার অচেনা মানুষ,—আর এক পূর্ণিমার শুভলগ্নে কোমল করের স্পর্শে আমার প্রাণে এ কি নেশা আজ জাগিয়ে তুললে! সমস্ত মনখানি তুমি আজ কেমন

করে এমনভাবে জুড়ে বসলে, মণি! আজ আমার কেবল মনে হচ্ছে,—

তোমাতে আমাতে কত সে কালের চেনা,—
যুগে যুগে সখি এ হৃদয়ে মোর, তোমারি যে
আনাগোনা!

যুগ-যুগান্তের পরিচয় না হলে একদিনে এমন কখনো হয়, রাণী? আমার স্থির বিশ্বাস, তুমি আমার জন্ম-জন্মান্তরের প্রেয়সী।

কাল সন্ধ্যার সময় বাড়ী এসে যখন ঘরে ঢুকলুম, দেখি, টেবিলের উপর ফুলদানীতে ফুলশয্যার সেই মালা গাছি,—আমার গলায় যেটি তুমি পরিয়ে দিছলে, শুকিয়ে ম্লান হয়ে পড়ে আছে! কেন, জানো? তোমারি বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর হয়ে। দেখে আমার বুকটা হু-হু করে উঠল।

এখানে কিছুই আমার ভাল লাগছে না। বন্ধুরা এল,—ভদ্রতার খাতিরে তাদের সঙ্গে দেখা করলুম—ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তাও হল। কি কথা, শুনবে? শুধু তোমার কথা! সত্যি অনি-রাণী, আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। তুমি আমার চিত্তকে কতখানি নাড়া দিয়েছ, তাকে কতটা বিকল করে দেছ—তা তুমি জান? আমি এখন,

"নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি,—
তুমি আছ মোর জীবন-মরণ হরণ করি!"

বিছানায় শুয়ে পড়লুম। তোমার মাথার বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম! তোমার চুলের গন্ধে বালিশ ভরে আছে! আহা, সে গন্ধে মনে শান্তি এল—সেই বালিশে মুখ ঘষে মাথা রেখে বিহ্বল হয়ে পড়লুম—সে গন্ধে চিত্ত আমার অবশ হয়ে এল!

রাত্রে ঘুম ভাল হয়নি—একটু তন্দ্রা আসে আর কোথা থেকে তোমার ঐ মধুর মূর্ত্তি মনে জেগে ওঠে, অমনি তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়!—সারারাত্রি শুধু তোমারি কথা ভেবেছি। আবার কবে তোমায় দেখব? কখন তোমায় বুকে নেব? কবে তুমি আমার পাশটিতে বসে আমার সমস্ত বেদনা মুছিয়ে দেবে?

রাত যখন নটা, তখন এক মজা হল। বৌদি এসে বললে, "কি ঠাকুরপো, অন্ধকারে একলাটি পড়ে আছ যে।" আমি কথা কইতে পারলুম না—চোখে জল এল। কেবল বললুম, "মাথাটা বড্ড ধরেছে—" বৌদি বললে, "আমি একটা ওষুধ জানি মাথা-ধরার, দিচ্ছি" বলে বৌদি কি করলে, জানো? একখানা কাগজ এনে আমার মাথায় গায়ে বুলিয়ে দিলে। আমি বললুম, "কি ঠাট্টা করছ বৌদি?"

"ঠাট্টা নয় মশাই—মস্ত ওষুধ—একেবারে স্বপ্নপ্রাপ্ত—প্রত্যক্ষ ফল। বিশ্বাস না হয়, এই আলো জ্বালছি, দেখ—" বলে বৌদি হেসে ইলেকট্রিকের সুইচ্‌টা টিপে আলোয় কাগজখানা আমার চোখের সামনে ধরে দিলে। দেখি, তাতে কালি দিয়ে লেখা আছে,—"শ্রীমতী অণিমা দেবী।" মাণিকের মত গোটাগোটা অক্ষরগুলি জ্বল্‌-জ্বল্‌ করছে!

আমি উঠে বসে বললুম, "এ আবার কি?"

বৌদি বললে, "অনুর লেখা কেমন, দেখব বলে তাকে দিয়ে লিখিয়েছিলুম—তার পরে ভেবে দেখলুম, তোমার ত সম্বল কিছু চাই, বিরহের দারুণ দুর্দ্দিনে—" সত্যি, যদিও বৌদির ঠাট্টাটা কিছু উগ্র লাগছিল, তবু তা সহ্য হল—কারণ বৌদি সে লেখাটি আমায় দান

করলে। সেই লেখাটি বুকে নিয়েই কাল রাত্রি কাটিয়েছি।

সকালে বুবড়ি এসে মহা হৈচৈ বাধিয়ে দিলে—বললে, "টাটিমা টোটায়—আমার টাটিমা! আমি টাটিমার টাচে ডাবো।" তখন আমার অন্তরাত্মা হা-হা করে উঠল! তাকে কোলে নিয়ে মুখে চুমু দিলুম—সে কান্না জুড়ে দিলে। একটা শিশু—তাকেও এমনি বশ করেছ রাণী? দুর্দ্দান্ত বুবড়ি, সে কারো তোয়াক্কা রাখে না—! তুমি কি কুহক জানো, বলতে পারো?

তুমি এসো রাণী, এসো এখানে, লক্ষ্মীটি—আমি আর থাকতে পারছি না। সেই কি একটা গল্পে পড়েছি—এক যাদুকর ছিল—সে একটা শুকনো গাছে তার মায়া-ছড়ি ঠেকিয়ে দিলে, আর অমনি সে গাছ অজস্র ফুলে পাতায় অপূর্ব্ব শোভায় ভরে উঠল! জানো সে গল্প? আমারও ঠিক তাই হয়েছে। শূন্য মন নিয়ে দুনিয়ার একধারে পড়েছিলুম, আর আজ! তোমার ললিত চরণস্পর্শে অজস্র সাধে আমার হৃদয়-মন ভরে গেছে। হৃদয়ের কুঞ্জটি অমল শোভায় তুমি সাজিয়ে তুলেছ! এসো কুঞ্জের রাণী, সে কুঞ্জ যে তোমার বিরহে ম্লান নির্জীব হয়ে আছে, সে কুঞ্জ আলো করে বসবে, এসো।

আমি পারছি না—সত্যই পারছি না—একদণ্ড তোমার বিচ্ছেদ-যাতনা সহ্য করতে পারছি না। এই চিঠি লিখতে বসে কেবলি মনে হচ্ছে, যদি আমার পাখীর মত ডানা থাকত, তাহলে উড়ে গিয়ে দেখে আসতুম, আমার মণিরাণী কি করছে!

তুমি কি আমার জন্য একতিলও ভাবছ না, রাণী? বল, বল। যদি আমার জন্য তোমার প্রাণ একটুও কাতর হয়ে থাকে, শুনি, তাহলে আমি বুঝব, আমার মত সুখী দুনিয়ায় আজ কেউ নেই!

লক্ষ্মী-মাণিক আমার, চিঠিখানির জবাব দিয়ো—বেশী না পারো, নিদেন একছত্র। শুধু জানিয়ো, তুমি ভাল আছ—সেই খবরটুকু তোমার নিজের হাতের লেখায় পেলে আমি কৃতার্থ হব।

আমার প্রাণের অজস্র প্রীতি-ভালবাসা সোহাগ-আদর জেনো। আর—? আর? বলব কি? রাগ করবে না? হাজার চুমু এই চিঠিতে পাঠালুম। ইতি

তোমারি—

চিরজীবনের সুনীল।"

চিঠিখানা পড়া যখন শেষ হল, তখন আমার কপালে বিন্ বিন্ করে ঘাম দেখা দিয়েছে। আমি আর নবৌদির মুখের পানে চাইতে পারলুম না। নবৌদি বললে, "তোর বর, চুই, কবি, নিশ্চয় কবি। তুই বরং জিজ্ঞেস করে দেখিস। এমন চিঠি যে-সে লিখতে পারে না। কি চিঠিই লিখেছে—আহা—"

আমি বললুম, "পছন্দ হয় নাকি? বল, না হয় তোমাকেও একটা লিখতে বলি।"

নবৌদি হেসে বললে, "তখন সহ্য করতে পারবি না লো, সরোবরের জল খুঁজবি!"

৬

গা ধুয়ে সন্ধ্যার সময় দোতলার খোলা বারাণ্ডায় একটা মাদুর বিছিয়ে এসে শুয়ে পড়লুম। গুণ গুণ করে একটা গানও ধরেছিলুম। হঠাৎ নবৌদি এসে আমার মুখে

পান গুঁজে দিয়ে বললে, "এখন আর গান গায় না—আয় দেখি, তোর বরের চিঠিখানার জবাব লিখে ফেলবি।" বলেই আমায় কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে একেবারে মার ঘরে টেনে নিয়ে এলো। তারপর আমার আঁচল থেকে চাবির রিং নিয়ে কাঠের বাক্সটা খুলে আসমানী রঙের চিঠির কাগজ আর খাম বার করে, টেবিলের উপর রেখে আমার বললে, "নে, লেখ্—"

আমি বললুম, "কি লিখব ?"

নবৌদি বললে, "আহা নেকি। জানেন না। জবাব লো জবাব।"

আমি বললুম, "সত্যি ভাই, কি লিখতে হবে, তা জানি না,—আমি ও পারবও না। অভ্যাস ত নেই। তা-ছাড়া বুঝচই ত, একেবারে নতুন লোক,—অচেনা—ছি—ছি—! লোকে বলবে কি ?"

নবৌদি বললে, "সত্যিই ত! ওলো, তুই যে অবাক করলি? জানিস না, গান আছে,—" বলে সুর ধরলে; "অচেনায় চিনিয়ে দিয়ে, মন আমার কে ছিনিয়ে নিল—"

আমি বললুম, "আহা, গাও, গাও, থামলে কেন ?"

নবৌদি বললে, "আর তামাসা নয় ভাই, নে, লেখ্ দেখি, তুই কি লিখিস্, আমি দেখি। অমন চিঠিখানা পেয়ে সত্যিই কি আর মনটা তোর ছট্‌ফট্ করছে না!"

আমি বললুম, "কি বল ভাই নবৌরাণী, করছে না? একেবারে সেই কি বলে, কাটা ছাগলের মত—"

"আবার ন্যাকরা। নে লেখ্—" বলে কলমটি আমার হাতে তুলে দিলে, তারপর বললে, "লেখ্ না—" নবৌদি বাহিরের পানে চেয়ে কি ভাবতে লাগল—আমি চুপ করে বসে রইলুম। সত্যি কথা বলতে কি, চিঠির জবাব কি তার লেখক, কোন কথাই ভাবছিলুম না। আকাশে একটা, দুটো, তিনটে—রাশি রাশি নক্ষত্র ফুটে উঠছিল, আমি তাদের পানে চেয়েছিলুম। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ নবৌদি বললে, "লিখলি? ওমা, বসে আছিস্। লিখিস্‌নে কিছু ?"

আমি বললুম, "বা রে, তুমি বল, তবে ত লিখব—"

"আমায় মাষ্টারী করতে হবে—তবে তুমি লিখবে...বেশ।" বলে নবৌদি একটা ঢোক গিলে বললে, "আমি ভাবচি, সম্বোধনটা কি লেখা যায়! কি লিখলে ঠিক মনের ভাবটি বোঝানো যায়! অথচ তোর বরও খুসি হয়।" নবৌদি আবার ভাবতে বসে গেল। নবৌদির সে গম্ভীর ভাব দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। খানিকপরে নবৌদি বললে, "আচ্ছা, যদি লিখিস,—আমার চিরারাধ্য দেবতা..."

আমি বললুম, "বাঃ, বেশ হবে'খন। তুমি লেখ ভাই, আমি লিখতে পারব না, লজ্জা করে।"

নবৌদি বললে, "আমি লিখব কি লো? দুর, তা কখনো হয়! তোকে পারতেই হবে যে—ভাই, না হলে সে রাগ করবে। বুঝিস না ত কিছু, তুই।—আমার কথা শোন্, লেখ্।"

নবৌদির জেদে অগত্যা তখন লিখতে হল। লিখলুম, "আমার চিরারাধ্য দেবতা—"

তারপর নবৌদি আবার ভাবতে বসে গেল। আমি মুক্তি পেয়ে আবার একটু আশ্বস্তও হলুম। একটা পাখী ডাকছিল গাছে --তার সুরটুকু প্রাণটাকে জুড়িয়ে দিলে! মনে অস্বস্তি হল, ভাবলুম, পাখীটা কি সুখী! চিঠি লেখার কোন ধার ধারে না ক। বাঃ। কেমন স্বাধীন মুক্ত ও।

এমন সময় বুড়ি এসে বললে,—"ছোটদি,—মা বললে, তোমরা খাবে এসো—সব থিয়েটারে যাবে।"

আঃ, বাঁচলুম। আমি একলাফে দাঁড়িয়ে উঠলুম। বললুম, "নবৌদি এখন থাক্ ভাই—"

নবৌদি ভারী বিরক্ত হয়ে বললে, "আর থিয়েটারে যায় না! লেখ্, এ কাজটা আগে।"

আমি বললুম, "ও হবে'খন, হবে'খন। থিয়েটার থেকে ফিরে, সত্যি বলছি—লিখব ভাই, দেখো।"

নবৌদি গম্ভীর মুখে আমার দিকে চাইলে। সে বিরক্ত হল, বুঝলুম। আমি তা গায়ে না মেখে চিঠির কাগজটাগজগুলো সব বাক্সে তুলে ফেললুম। নবৌদি তখনও পাথরের মত বসে রইল। আমি তার হাত ধরে বললুম,—"নাও, এসো—চন্দ্রশেখর দেখবে না? চমৎকার কিন্তু, ভাই—গোড়াতেই সেই গানটা, আহা,—কালো জল নাচে তালে তালে,—কালো জল—" বলেই নবৌদিকে আর-কিছু বলবার অবসর না দিয়েই তাকে একেবারে হিড়্‌হিড়্ করে ধরে টেনে নিয়ে এলুম।

চিঠিটা তখন আর লেখা হল না।

ক্রমশ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মানবদেহের আদর্শ

মানুষ নিজেকে গঠন করিবার জন্য, আপনার পরিবেষ্টনের ভিতর হইতেই আদর্শ বাছিয়া লয়, এবং নিজেকে আদর্শ-অনুসারে চালাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। অধুনা নিজের নির্ব্বাচিত আদর্শ অপেক্ষা আমরা সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান প্রভৃতিতে জীবন-গঠনের জন্য উচ্চ আদর্শ পাইতেছি, আবার সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-পুস্তকেও মানবতার অতি উচ্চ আদর্শ নিরন্তর দেখিতে পাইতেছি। যে সকল মহাত্মা জন্ম-গ্রহণ করিয়া নিজেদের অদ্ভুত প্রতিভাবলে জগতের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আদর্শ জগতে চিরপূজ্য হইয়া থাকিবে। ঈশ্বরকেই আমরা একমাত্র পূর্ণপুরুষ বলিয়া মানি, কিন্তু যাঁহারা শরীরে ও মনে সেই বিরাট সম্পূর্ণতার সমীপবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাও আমাদের আদর্শস্থানীয়।

মানসিক প্রতিভার জন্য যাঁহারা জগতের আদর্শস্বরূপ তাঁহারা দেবতার অংশবিশেষ। শারীর জগতে যাঁহারা আদর্শস্থানীয়, তাঁহারা যাহা-কিছু সুন্দর তাহারই প্রতিমূর্ত্তি হইয়া

অ্যাপলো

মানব-সমাজের আনন্দ-বিধান করিয়াছেন। বহু পুরাতন কাল হইতে মানবজাতির এই "শোভা-সুন্দর দেহ-মন্দিরের" পূজা চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন ভারতে ভাস্করেরা কঠিন শিলার বুকে মানবদেহের শিল্প-সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়া দেবমন্দির-গুলিকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মহিমময় করিয়াছিলেন। এখন আমরা ভাস্কর্য্যের সেই আবয়বিক বাহ্য-রেখার (contour) চরম পরিণতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। "ঈশ্বরের মন্দির"—এই মানবদেহের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শিল্পী কঠিন প্রস্তরকে প্রাণবন্ত করিয়া অমর করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের এই ললিতকলা, যাহা মানব-সৌন্দর্য্যকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছিল, বোধ করি হিন্দু-স্বাধীনতার সঙ্গেই তাহা লোপ পাইয়াছে। য়ুরোপের প্রাচীন ভাস্করেরাও প্রস্তরের রেখায় মানুষকে অমর করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন রোমক ও গ্রীক ভাস্কর্য্যে মানব-দেহের নগ্ন সৌন্দর্য্যই সম্যক বিকাশলাভ করিয়াছিল। মাইকেল এঞ্জিলো আদি-পুরুষ আদমের মূর্ত্তিতে চরম সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া ঈশ্বরের প্রথম

সৃষ্টিকে অমর করিয়া গিয়াছেন। গ্রীক ভাস্কর্য্যেও ভেনাস, অ্যাপলো, মারকরি, হারকিউলিস্ প্রভৃতি অতি-মানুষের মূর্ত্তি ফুটাইয়া গ্রীকেরা দেহের চরমোৎকর্ষের একটি অতি-উচ্চ মাপকাঠি (standard) চিরকালের জন্য বাঁধিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন সভ্যতার ললিতকলা য়ুরোপের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আধুনিক চিত্র ও ভাস্কর্য্য প্রাচীনকালের মত উৎকর্ষলাভ করিয়াছে কি না বলা কঠিন। তবে, য়ুরোপীয় চিত্রকলার ইতিহাস ভারতের মত অসমাপ্ত নহে; সেখানে চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে সেই উচ্চ মাপকাঠিই অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে চিত্রকলাকে পুনঃ-সঞ্জীবিত করা হইতেছে, রেনেসাঁসের দিনেও ভারতবর্ষকে কয়েক শতাব্দী পশ্চাদগামী হইয়া পুরাতন 'খেই' ধরিতে হইয়াছে। হিন্দু সভ্যতার দিনে ভাস্কর্য্য যে একটি অতি-উচ্চ স্থানে উঠিয়া ছিল, তাহার বহু প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। কিন্তু উত্তর কালের মস্লেম সভ্যতার সময়ে মুসলমানেরা স্থাপত্যশিল্পে অধিকতর যত্নবান হওয়ায় ও মানবমূর্ত্তি চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে গঠন করিতে ধর্ম্মের নিষেধ থাকায়, ভারতবর্ষের একদিক দিয়া লাভ হইলেও উৎসাহের অভাবে পুরাতন একটি পরিপুষ্ট শিল্প হারাইয়া গেল। আধুনিক আর্টপ্রধান নবযুগে চিত্রকলার উদ্ধার-চেষ্টা খুব প্রতীয়মান হইলেও, ভাস্কর্য্যের প্রতি উৎসাহের অভাব এখনও পূর্ব্বের মতই অনুভব করা যায়। সুতরাং মানব-শরীরের পরিপূর্ণতার আদর আমাদের দেশে এখনও তাই সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছে না। য়ুরোপে মানবদেহের আদর অগস্ত্ রোঁদা (Augustine Rodin) প্রমুখ নিপুণ ভাস্কর-গণের শিল্পে সম্যকরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

রূপরাণী ভেনাস

চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে সুপুরুষদিগের দেহ-সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া চিত্রাগারগুলিকে আধুনিক শিল্পী পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী করিতেছেন। রোদাঁর "চিন্তাশীল" প্রভৃতি মূর্ত্তি তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। অন্যান্য আধুনিক শিল্পীর The Sleeping Faune, Discus Thrower, The Girl at the Fount, Ideal Parents and Child প্রভৃতিও মানবদেহের পরিপূর্ণতার আদর্শ মূর্ত্তি। য়ুরোপীয় আধুনিক চিত্রকলাতেও বিখ্যাত ব্যায়ামকারীরা অমর হইয়া রহিয়াছেন। রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ও সাধারণের সৌন্দর্য্য-স্পৃহা য়ুরোপের প্রত্যেক বড় সহরে শিল্পাগার প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ। তন্মধ্যে প্যারিস আর্ট-গ্যালারী অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী এইজন্য যে, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইতালী-জয়ের সহিত প্রাচীন রোমক শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি লুঠিয়া আনিয়া ফ্রান্সে তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইতালী নিজেকে রিক্ত করিয়া ফরাসী-শিল্পের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

চিন্তাশীল

অন্য কথা ছাড়িয়া, শিল্প-জগতে ব্যায়ামকারীর স্থান ও তাহার আদর্শের আলোচনা করা যাক্। ভারতবর্ষে পরিপুষ্ট দেহ চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে স্থান পাইয়াছে কি না তাহা আমি জানি না, তবে স্যর রবীন্দ্রনাথের শিষ্য দেবলের নির্ম্মিত আদর্শ মাতা-পিতা ও শিশুর প্রস্তরমূর্ত্তি আধুনিক তক্ষণ-শিল্পের ও মানব-দেহের এক-একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। প্রাচীন ভাস্কর্য্যে মানবদেহের মন-গড়া সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইয়াছে কি না বলা কঠিন, কিন্তু আধুনিক মানবের নগ্ন সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি যে জীবিত আদর্শেরই নকল, তাহা বলা বাহুল্য: যে সকল ব্যায়াম-কারীর মূর্ত্তি য়ুরোপের

বিখ্যাত আর্ট-গ্যালারী-গুলিতে স্থান পাইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে ইউজিন স্যাণ্ডোর নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি Dresden Art Galleryর এবং Aubery Hunt অঙ্কিত "রোমক গ্ল্যাডিয়েটর বেশে স্যাণ্ডো" নামক বিখ্যাত চিত্র Rome Art Galleryর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। Munich আর্ট গ্যালারীতে অন্য এক বিখ্যাত জার্ম্মান ব্যায়ামকারীর মূর্ত্তি স্থান পাইয়াছে। এই ব্যক্তি—Munich—শরীরের উপর চর্চ্চার পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে অতুলনীয় হইয়া আছেন। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামকারী এডওয়ার্ড অ্যাষ্টনের (Ed Aston) প্ল্যাষ্টারের প্রতিমূর্ত্তি বিলাতের রয়েল অ্যাকাডেমীতে স্থান পাইয়াছে। তাহার শরীর গ্রীক-আদর্শের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হওয়াতেই এই সম্মান পাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। বলা বাহুল্য রয়েল অ্যাকাডেমী ইতিপূর্ব্বে এমন সম্মান আর কাহাকেও প্রদান করেন নাই। Lionel Strongfort নামক এক বিখ্যাত আমেরিকানের শরীরোৎকর্ষে মুগ্ধ হইয়া বর্ত্তমান জার্ম্মান সম্রাট তাঁহার প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি বার্লিন-আর্ট-গ্যালারীতে স্থাপন করিয়াছেন। অপর পক্ষে, বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর গষ্টেভ কার্টিস (Gustave Curtois) মরিস ডিরিয়াজ (Maurice Deriaz), নামক বিখ্যাত সুইস ব্যায়ামকারী ও কুস্তীগীরের সুন্দর মূর্ত্তিটিকে তিনখানি চিত্রে ফুটাইয়া, প্যারিস-আর্ট-গ্যালারীতে আধুনিক ব্যায়ামকারীর দেহ-সৌন্দর্য্যের

এই ছবির পুরুষ-মূর্ত্তিটির আদর্শ মরিস ডিরিয়াজ

গ্রীক ব্যায়ামকারীর মূর্ত্তি

সুপুরুষকে কার্ত্তিক ও শক্তিমানকে ভীমের সহিত তুলনা করিয়া আদর করা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগকেও লক্ষ্মীর আদর্শের সহিত তুলনা করা হয়। ইংলণ্ড শক্তিমানের দেশ। সেখানে যথার্থ শক্তিমান ও শক্তিমানের যোগ্য আদরও আছে। কিন্তু আমাদের দেশে কার্ত্তিক প্রভৃতি বল-বীর্য্য ও সৌন্দর্য্যের দেবতাকেও, আমরা আধুনিক বিংশ শতাব্দীর জামাইবাবুরই রাজসংস্করণ বলিয়া জানি; ভীমের আদর্শ অথবা শক্তিমানের আদরও আমাদের বুদ্ধির দোষে যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। জাতীয় শক্তির অনুপাতে আমাদের আদর্শও সেইরূপ বিকৃত হইয়াছে। যাহারা ক্ষমতাবান, তাহাদের আদর্শ যেমন স্বভাবতই অতি উচ্চ, দুর্ব্বলের আদর্শও যে তেমনি খর্ব্বতা লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিবাহের সময় স্ত্রীলোকদিগকেও আদর্শের মাপকাঠিতে আমরা মাপিয়া দেখি; কিন্তু সে পরীক্ষা একান্ত বৃথা হয় এইজন্য যে, আধুনিক বিবাহের বয়সে রমণী অথবা বালিকার শরীর কোনপ্রকারেই পূর্ণতা লাভ করে না। এবং অচির-মাতৃত্বে নারীদেহে মাতৃত্বের সে পূর্ণ-সৌন্দর্য্যেরও বিকাশ হয় না। নারীদের যে লক্ষ্মীস্বরূপিনী বলিয়া আদর করা হয়, তাহা তাঁহাদের লক্ষ্মীর মত শারীরিক সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, তাহা শুধু

অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই তিনখানি চিত্রের মধ্যে Deriaz as Sleeping Bacchus এবং Deriaz as Perseus in Perseus and Andromeda নামক চিত্র দুইখানি পৃথিবীবিখ্যাত হইয়া গিয়াছে। বিখ্যাত নারী-সন্তরণ-বিশেষজ্ঞ ও গ্রীক নারী-আদর্শের নিতান্ত অনুরূপা বলিয়া বিখ্যাত অ্যানেট্ কেলারম্যান্‌ও (Anette Keller-man) চিত্রে অমর হইয়া গিয়াছেন।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সুন্দর পুরুষকে অ্যাপলো ও শক্তিমানকে হারকিউলিস্ বলিয়া আদর করা হয়। আমাদের দেশেও

মানসিক সৌন্দর্য্যের জন্যই। দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের দেশে রমণীর শরীর কখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার অবকাশ পায় না, তাই নারীর যৌবন এদেশে এমন ক্ষণপ্রভার মত ক্ষণস্থায়ী। শারীরিক পরিপূর্ণতার এই অভাবে দেশের সন্তান-সন্ততিও দুর্ব্বলের দল পরিপুষ্ট করে। অন্যান্য জাতির রমণীদের সহিত এ দেশের রমণীর তুলনা করিলে দেখা যায় যে, একজন জার্ম্মান স্ত্রীলোক সাতটি, রাসিয়ান ছয়টি, অষ্ট্রিয়ান পাঁচটি, ফরাসী চারটি, স্কচ তিনটি, ইংরাজ দুইটি ও ইতালীয় একটি পরিপূর্ণাঙ্গ আদর্শের অনুযায়ী সন্তান প্রসব করিতে পারে।* কিন্তু ভারতবর্ষীয় রমণীর মাতৃত্ব সন্তানের আদর্শ হিসাবে বৃথাই থাকিয়া যায়, কারণ, এদেশের মেয়েরা একটিও আদর্শ সন্তান প্রসব করিতে পারে না। জন্ম-মুহূর্ত্তে শিশুর ওজন ২২ পাউণ্ড য়ুরোপেই হয়, আমাদের দেশে সাধারণতঃ ৮ হইতে ১২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত শিশুর ওজন দেখা যায়; ১৪।১৫ পাউণ্ডের ভারতবর্ষীয় শিশু কদাচিৎ জন্মে। কাজেকাজেই আমরা নিতান্ত স্বল্পায়ু হইয়া সমস্ত জাতিটাকে মরণোন্মুখ করিয়াছি। দেশের আবহাওয়া, পরিবেষ্টন প্রভৃতি নানা অসুবিধার উপর বাল্যবিবাহ

গ্রীক ভাস্করের গড়া বুধগ্রহের মূর্ত্তি

* Health and Strength পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

পালোয়ান গামা

ভারতবর্ষীয় পালোয়ানদিগের ভিতর হারকিউলিস্ অথবা ভীমের আদর্শ সমধিক আদৃত, অন্তত তাহারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বৃহৎ শরীর তৈয়ার করিবার অত্যন্ত পক্ষপাতী। তাহারা একেবারেই এ-কথা জানেনা বা মানেনা যে মধ্যম ওজনেই (middle weight) শরীর আদর্শের অনুযায়ী হইতে পারে। রামমূর্ত্তি, গামা, কাল্লু প্রভৃতি ভারী-ওজনের ব্যায়ামকারী, সুতরাং তাহাদের শরীরে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ নাই। ভারতবর্ষের সমস্ত বিখ্যাত পালোয়ানদের ভিতর ইমামবক্সের দেহটি অনেকটা গ্রীক আদর্শের অনুরূপ। ভারী-ওজনের ব্যায়ামকারীরও গ্রীক আদর্শ আছে, কিন্তু মধ্যম ওজনে শারীরিক সৌন্দর্য্য যত বিকশিত হয়, ভারী-ওজনের ব্যায়ামকারীর শরীর ততটা মনোমুগ্ধকর হয় না; সেইজন্যই গ্রীক আদর্শের অ্যাপলো ও Discus Thrower এবং আধুনিক আদর্শের ডেভিড ও "চিন্তাশীল" প্রভৃতি প্রস্তর-মূর্ত্তির দেহ এতটা সমাদৃত। সকল ব্যায়ামকারীরই এই সকল আদর্শ-চিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যায়ামানুশীলন করা কর্ত্তব্য;

বাঙালীর অস্থিতে অস্থিতে যে "ঘুণ" ধরাইয়া দিয়াছে, সে রোগ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণতা-প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইতে বাঙালীর যে কত বিলম্ব আছে, কে জানে!

শরীরের সমতা (symmetry), আবয়বিক বাহ্যরেখা (contour) প্রভৃতি ঠিক আদর্শের অনুরূপ পরিপুষ্ট হইলে, সুধুই যে মানুষের সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধিত হয়, তাহা নহে;

পরন্তু, তাহারা শরীরের উপর মানুষের প্রভুত্বের কথাই প্রচার করে। ভগবানের জগতে কোন বস্তুই সমতা-বিযুক্ত নহে। মানবদেহ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ শিল্প, যাহাতে তাহা সর্ব্বতোভাবে আদর্শের মত দেখিতে হয়, সেদিকে সকলেরই সতর্ক দৃষ্টি ও সচেতন চেষ্টা থাকা উচিত।

শ্রীশচান্দ্রনাথ মজুমদার।

তোর্‌মান্

ঝিলম নদীর মোহানার কাছাকাছি জল-করের একটা মামলা চলেছে—আমি রাজ-সরকার থেকে সেটা নিষ্পত্তির হুকুম নিয়ে বোটের উপরে কাছারি বসিয়ে কাজও করছি, আরামও করছি। এমন সময় কাশী থেকে অনেক দিনের পরে বাল্যবন্ধুর পত্র পেলেম। বন্ধু লিখেছে—সে উকিল হয়েছে এবং কাশী-নরেশের দপ্তরে একটা মোটা মাইনের তার হয়ে যায়, যদি এই সময় একটি প্রাচীন কাশ্মীরের 'তোর্‌মানি' টাকা কাশী-নরেশকে উপহার দেবার জন্ম তাকে আমি পাঠাতে পারি। আমার পাশে পণ্ডিতজী বসেছিলেন; কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে তিনি একেবারে পাকা। আমি তাকে 'তোর্‌মানির' কথা শুধোলেম, তিনি পাকা দাড়ি চুম্‌ড়ে বল্লেন—কাল খবর পাবেন। সে-রাত্রের মতো বোট কিনারায় লাগালেম; পণ্ডিতজী বিদায় হলেন।

জলে-স্থলে ধানি-রংএর আভাটি দিয়ে সন্ধ্যা হচ্ছে, জলের কিনারায়-কিনারায় সবুজ ছায়ার শিহরণটি জানিয়ে দিচ্ছে, ওপারের বাগিচায় রাতের হাওয়া এসে পৌঁছবার খবর। দিনের কায শেষ করে বসেছি, সাদা জামাজোড়ার উপরে লাল কম্বলটি মুড়ি দিয়ে; পণ্ডিতজী হাজির। আমি আমার কাশ্মীরে চাকরটাকে পাণ্ডতের জন্ম কিছু ফল আনতে হুকুম করে শুধোলেম - তোর্‌মানি টাকাটার কিছু সন্ধান হল কি, পণ্ডিতজী? তিনি ঘাড় নেড়ে বল্লেন --এদেশে তো পাওয়া দুষ্কর। কাশীতে পেলেও পেতে পারেন।

কাশ্মীরের মুদ্রা একেবারে দেশ-ছাড়া হয়ে কাশীবাস করছে কেন?—শুধোলে পণ্ডিতজী উত্তর কল্লেন, ইতিহাসটা বলি, শুনুন।

কোমল প্রকৃতি তুঞ্জিন ত্রিশ বৎসর কাশ্মীর শাসন করে পরলোকে গমন করলে পর, তাঁর দুই পুত্র হিরণ্য আর তোরমান রাজপদ এবং যুবরাজের পদ পূর্ণ করে বসলেন। রাজা হিরণ্য ওয়ালাহৎ নামে অষ্টধাতুর পয়সা সমস্ত কাশ্মীর-খণ্ডে প্রচলিত করলেন। বহুদিন এইভাবে যায়; তোরমান এক সময় নিজের নামে তোরমানি টাকা চালিয়ে, দেশের ওয়ালাহৎ গালিয়ে অষ্টধাতুর এক তোপ প্রস্তুত করতে হুকুম দিলেন। রাজার চর গোপনে একটি তোর্‌মানি টাকার সঙ্গে এই রাজদ্রোহের খবরটা হিরণ্যের কাছে পৌঁছে দিতে বিলম্ব করলে না, তারপরেই তোর্‌মানি টাকা রাজকোষে জব্দ হল, আর তোর্‌মান বন্দী হলেন, নগরের

ওই যে দেখছেন ওপারে ওই বাগিচাটা, ওইখানে — ।

তোর্‌মানের কারাগার নদীর উপরে, বাগিচার মধ্যে। সেখানে যুবরাজ রাণীকে নিয়ে সুখেই রইলেন, কিন্তু ফুলবাগানে ঘেরা হ'লেও সেটা যে কারাগার, এটা তোরমান কিছুতে ভুল্লেন না! তাই কুমার প্রবরসেন যেদিন ভুমিষ্ঠ হলেন, সেদিন তোর্‌মান রাণী অঞ্জনাকে বল্লেন—হায়, এক কারাগার থেকে আর এক কারাগারের বন্দী, একে কে মুক্তি দেবে? রাণী সেই রাত্রে সবার অসাক্ষাতে কুমারকে বাগিচার মালিনীকে দান করলেন। তোর্‌মান যখন শুনলেন—যে এসেছিল, সে রইলো না, মুক্তিদাতা তাকে নিজের হাতে মুক্তি দিয়ে গেলেন, তখন যুবরাজ নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—মরেছে, না, বেঁচেছে? অঞ্জনা চোখ মুছে বল্লেন—বেঁচেছে বাছা আমার। যুবরাজ তোর্‌মানের ফুলবাগিচার কারাগার যেমন কচি মুখের হাসিতে আলো করে দিলে না, তেমনি রাজা হিরণ্যেরও রাজপ্রাসাদ হাজার হাজার সোনার প্রদীপেও আলো হলো না—একটি শিশুর অভাবে।

দুই রাণীর প্রাণে দুটি ছেলের স্বপ্নই জেগে রইলো, আর দুই ভাইয়ের প্রাণ ফুলবাগিচা আর রাজপ্রাসাদে অন্ধকারে মরতে থাকলো পলে-পলে।

হায়, আঁধার বুঝি আর ঘুচলো না, এই বলে দুই দিকে দুই ভাইয়ের মন যখন বেদনা জানাচ্ছে কেবলি, সেই সময় বিদ্রোহের মশাল হাতে যুবা প্রবরসেন একদিন কাশ্মীরের সিংহ-দ্বারে এসে হানা দিলেন। দেখতে দেখতে দিকে দিকে আগুন জলে উঠলো। কারাগারের অন্ধকার সে আগুনের আভায় সূর্য্যোদয়ের মতো রাঙা হয়ে উঠলো, আর সোনার রাজপুরী তার উত্তাপে গলে গেল। হিরণ্য তোর্‌মান দুই ভাই রক্তের আবিরে রাঙা হয়ে পাশাপাশি চল্লেন কুমারকে দেখতে—বীর যেমন করে চলে বীরের দিকে! তারপর সেইদিন সন্ধ্যা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের রক্তরাগের সঙ্গে সঙ্গে দুই রাণীর ললাটের সিন্দুর মুছে দিয়ে কাশ্মীর দেশের উপর থেকে ধীরে ধীরে পশ্চিম সমুদ্রের পরপারে চলে গেলেন। রাণীদের হুকুমে বিদ্রোহীর পথ আগ্‌লে রাজপুরীর সিংহ-দ্বার ঝন্‌ঝনা দিয়ে বন্ধ হল। বিদ্রোহীর শাস্তি নিয়ে প্রবরসেন নির্ব্বাসনে চলে গেলেন, অঞ্জনার কোল, কাশ্মীরের সিংহাসন দুই শূন্য রইলো!

আমি শুধোলেম, আর তোর্‌মানি টাকার কি হলো? পণ্ডিতজী বল্লেন—সেই অভিশপ্ত টাকা কাশ্মীরের আর কেউ চালাতে সাহস পেলে না। রাণীদের হুকুম নিয়ে রাজমন্ত্রী সেই টাকায় কাশীতে একটা স্নান-ঘাট বানিয়ে দিলেন। সে ঘাটও প্রস্তুত হবার ঠিক পরেই সহসা একদিন রসাতলে প্রবেশ করেছিল, শোনা যায় লোকমুখে, ইতিহাসে কিন্তু তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না—বলে পণ্ডিতজী চুপ করলেন। আমি তাঁকে কিছু ফল উপহার দিয়ে বল্লেম,—কাল আবার গল্প বলতে হবে, আসবেন। পণ্ডিত ফলের ঝুড়িতে কম্বল ঢাকা দিয়ে বল্লেন—কাল আপনাকে মাতৃগুপ্তের ইতিহাস শোনাবো, আজ বিদায় হই।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্যাকরণ-বিভ্রাট*

চরিত্র

ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী—নিবাস রামনগর, সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, বিপত্নীক, যৌথকৃষি সভার সভাপতি, পূর্ব্বে সেগুণ কাঠের ব্যবসা করিতেন।

মাণিকলাল সিদ্ধান্ত-রত্ন—বাটিকামারি শাখা সাহিত্য-প্রত্ন-সঙ্ঘের সভাপতি।

পশুপতি চাকী—পশু-চিকিৎসক (পরীক্ষোত্তীর্ণ)

রামা—ঘনশ্যাম বাবুর ভৃত্য। (আহ্লাদে)

হেমাঙ্গিনী—ঘনশ্যামবাবুর কন্যা (সুশিক্ষিতা)।

প্রথম দৃশ্য

পল্লীগ্রামের বৈঠকখানা। বাগানের দিকে তিনটি জানলা খোলা। বাহিরদিকে দরজার কাছে কাঁচ-বসান গা-আলমারি —উপরে তাক্। ডান দিকের দ্বারের সম্মুখে একটি ছোট টেবিল—পার্শ্বে তক্তা-পোষের উপর ফরাস পাতা—ঘরের ভিতরে পিছন দিকের দরজার কাছে লম্বা বেঞ্চ।

রামা। (গা-আল্‌মারির সম্মুখে দাঁড়াইয়া চীনামাটির ও শ্বেত পাথরের সৌখীন বাসন সাজাইতে সাজাইতে) বাসন-কোষণ ধুয়ে মুছে সাজিয়ে গুছিয়ে যতই রেখে দাও, আবার উলটো-পালটা নোংরা-টোংরা হয়ে যে-কে সেই! এই জন্যেই ত কাজ-কর্ম্ম কর্ত্তে ইচ্ছে হয় না। (একখানা ঝিনুক-বসানো শ্বেতপাথরের বেকাবি মুছিতে মুছিতে অসাবধানে হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল)

পশুপতি পশ্চাৎ হইতে প্রবেশ করিয়া—ঐ যাঃ!

রামা। আরে মলো—শেষে ভাঙ্গলো কি না, দিদি-ঠাকুরুণের অত-সখের জয়পুরী বেকাবিখানা!

পশু। তুই যে কর্ম্মিষ্টি লোক!

রামা। (স্বগত) সেই গোবদ্যিটে রে! (প্রকাশ্যে) তা বাবু আপনি হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমাকে একেবারে চম্‌কে দিছলেন যে।

পশু। তুই যে সব ভেঙ্গেচুরে করতাল গড়াতে আরম্ভ করেছিস, দেখি! তোর মনিব কিছু বলবে না?

রামা। (ভাঙ্গা টুকরাগুলি কুড়াইয়া লইয়া) টের পেলে তো? এখনি বাগানে গিয়ে পুঁতে ফেলবো এখন। বাগানের পেছনদিকে—বাদাম-তলায় খাসা একটি গর্ত্ত আছে, ঘাসে ঢাকা—

হেমাঙ্গিনী। (ডানদিকের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া) ওরে রামা, শুন্‌ছিস? (পশুপতিকে দেখিয়া) ডাক্তারবাবু যে—নমস্কার।

রামা। (ঢোঁক গিলিয়া) কি বল্‌ছো দিদি ঠাকুরুণ?

হেমা। হাঁরে, সেই জয়পুরী বেকাবি-খানা দেখেছিস্?

---

* (লা বিশ প্রণীত La Grammaire নামক এক অঙ্কে সমাপ্ত মূল ফরাসী-কৌতুক-নাট্য অবলম্বনে)

বামা। (গামছা দিয়া ভাঙ্গা টুকরাগুলি ঢাকিয়া) না, কৈ দেখিনি ত।

হেমা। আমি ফল সাজিয়ে দেব বলে খুঁজছি যে সেখানা।

বামা। তাইত! তা যাবে আর কোথায়? খাবার ঘরের কুলঙ্গিতেই ত ছিল।

হেমা। যাই, একবার দেখে আসি। যত সুন্দর সুন্দর সৌখীন বেলোয়ারি আর পাথরের জিনিসগুলো—কোথায় যে যায়।

বামা। কি করে বল্‌বো, কেউতো আর ভাঙ্গেনা।

(হেমাঙ্গিনী বাঁ দিকের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বামা ও পশুপতি।

পশু। বামা, তোর সাহসতো বড় কম নয়।

বামা। আজ্ঞে, উনি যদি একবার রেকাবি ভাঙ্গার কথা টের পেতেন, তা হলে কি ওঁর দুঃখটা কম হত। মনিবের মনে দুঃখ দিতে আছে কি? পাপ হবে যে।

পশু। ইস্, ব্যাটার আবার নিষ্ঠে আছে! সে যাক্‌গে, এখন বল্, গরুটার কি হয়েছে?

বামা। সে যা হবার হয়ে গিয়েছে।

পশু। সে কি রে?

বামা। কাঁচের গেলাসের একটা টুক্‌রো খেয়ে ফেলেছিল—ভাল করে পোঁতা হয়নি কি না। তা সে অনেকক্ষণ নিকেশ হয়ে গিয়েছে! তোমার আর কষ্ট পেতে হবে না।

পশু। তাই নাকি রে? গর্ত্তটা একটু বেশী করে কর্ত্তে হয়!

বামা। তা আমার নেয়ায্য কথা। এ-মাসে যে গরম পড়েছে—অত পেরে ওঠা যায় না।

পশু। বাঃ, বাঃ! এমন না হলে আর কাজের লোক! তা আজ আর তোর মনিবের ফুরসৎ নেই দেখ্‌চি—না? আজ অনেক হাঙ্গাম?

বামা। হাঙ্গামটা কিসের?

পশু। তোদের বাবু যে আজ ঐ চাষাদের সভার সভাপতি হবে রে।

বামা। এবারও কর্ত্তাকেই তারা মোড়ল কর্‌বে নাকি?

পশু। তা আর বলতে—তোর বাবুর কল্যাণে আজ কিছু-কম করে হোক্, ৪।৫ গ্রাস পেটে পড়েছে।

বামা। তাই নাকি? তা তোমায় দেখে ত কিছু বোঝা যাচ্ছে না বাবু।

পশু। আমি তোর মনিবের জন্যে চারিদিকে তদ্বির করে বেড়াচ্ছি কি না। আমি যে বাবুর বাড়ীর বাঁধা ডাক্তার, এটুকু না কর্‌লে চল্‌বে কেন?

বামা। এবার কিন্তু কর্ত্তাকে একটু বেগ পেতে হবে। যে গজেন্দ্র মল্লিক দাঁড়িয়েছে—পাকা ঝানু লোক, বাবু, মোক্তারী করে চুল পাকিয়েছে। মাসখানেক থেকে শুধু চাষাদের দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পশু। শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে! তার ফন্দী কত!...গেল রবিবারে নাকি কল্‌কাতায় গিয়েছিল—দেখি, গোটা পঞ্চাশেক লাল টক্‌টকে রবারের বেলুন কিনে এনে চাষাদের ছেলেদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। ওই যে সেই লম্বা লম্বা ফানুস্‌গুলো রে, দেখিস্ নি?

তোর বাবুর সঙ্গে ত কল্‌কাতা বেড়াতে গিয়েছিলি—সেই যে লেডি বাগিচার রাস্তার ধারে ফিরিওলারা যেগুলো সুতো বেঁধে বেঁধে বিক্রি করে। কতই বা দাম! হুঁঃ!

রামা। ব্যাপার বড় শক্ত হয়ে দাঁড়াল ত দেখছি।

পশু। হোক্‌না মোক্তারের বুদ্ধি, আমিও কম যাইনে, এক হুজুগ তুলে দিয়েছি যে ও-সব ফানুষ উড়োলে এমন ঝড় আর শিল হবে যে গাছে একটিও আঁব থাক্‌বে না। মুরুব্বিরা তাই সেগুলো কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

রামা। (স্বগত) বাবা, গো-বদ্যির পেটে এত গো-বুদ্ধি!

পশু। গজেন্দ্রটাকে এবার ফেল করাবই করাব, বেটা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে!—মনে করেছে, তার ফন্দী কেউ টের পায় না! ব্যাটা কি না রাধাকান্তপুর থেকে নিজের লোককে এনে এখানে পশুডাক্তারী করাতে চায়।

রামা। ও বুঝেছি, এই জন্যেই এত রাগ?

পশু। আমরা চাই ঘনশ্যাম বাবুর মত লোক—যাঁর ধারে-ভারে সমান কাটে, পণ্ডিত লোক বলে' দশের কাছে পরিচয় দেওয়া যায়,—মানুষের মত মানুষ।

রামা। তা পড়াশোনাটা কর্ত্তার আমাদের খুবই আছে। ৪।৫ ঘণ্টা ঘরের মধ্যে বই হাতে করে বসেই আছেন। চোখে পলক নেই, বল্‌লে না পেত্যয় যাবে গো বাবু, হাঁ, মাথাটি পর্য্যন্ত নাড়ে না,—যেন হতভম্ব হয়ে গেছে।

পশু। শুধু চেঁচালে হয় না রে, ভাবতে হয়—বুঝতে হয়।

রামা। পড়াতো নয়—মা সরস্বতীর পায়ে মাথা খোঁড়া! ঐ দেখুন না, বই হাতে করেই রয়েছেন। (রেকাবির ভাঙ্গা টুকরা কয়টা কুড়াইয়া লইয়া) যাই, আমিও একটু খুঁড়ে খেঁড়ে আসিগে।

(বাঁদিককার গলি-দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

(ঘনশ্যামবাবু একতলার ডান দিক্‌কার ঘরে আপন-মনে পড়িতেছেন)

পশুপতি। (স্বগত) রামা বেটা ঠিক বলেছে—মাথা খোঁড়াই বটে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, তা একবার চেয়েও দেখচে না।

ঘনশ্যাম। (অনুচ্চস্বরে আবৃত্তি করিতে-ছেন)

"আপণ, বিপণি, পণ্য, বণিক, নিপুণ
কঙ্কণ, মাণিক্য, গুণ, স্থাণু, অণু, তূণ,
লবণ, লাবণ্য, বেণী, বাণী, বেণু আর
স্বভাবতঃ ণত্ব বলি আছয়ে প্রচার।"

এই সব স্বাভাবিক মূর্দ্ধণ্য 'ণ'র উদাহরণ মনে রাখাও মুস্কিল দেখছি—আপণ, বিপণি, পণ্য লবণ, লাবণ্য, বেণী—না আর পারিনা, মাথা ধরে উঠলো।

পশু। যে রকম করে কপ্‌চাচ্ছে, এ সংস্কাকড়ি না হয়ে যায় না—হয় সংস্কৃত—না হয় লাটিন না হয়—এম্‌নি-একটা কিছু বিদ্‌খুটে পণ্ডিত লোকের ভাষা-টাষা কিছু হবে! আর কতক্ষণই বা দাঁড়াব? (গলা ঝাড়িতে লাগিল)

ঘন। তাইতো হে পশুপতি, তুমি যে!

পশু। আপনাকে বিরক্ত কর্‌ছি না ত?

ঘন। না, না, বিরক্ত কি, আমি একটু পড়ছিলুম বৈ ত নয়—তা তুমি গরুটা দেখতে এসেছিলে বুঝি?

পশু। আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু এসে শুন্‌লুম, সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

ঘন। আহা, চার বছরের গাইটা হে,—কি আশ্চর্য্য, শেষ কি না একটুক্‌রো কাঁচ গিলে মারা গেলো!

পশু। মশাই বুঝচেন না, বেটা গরু যে—জানোয়ারের কি আর বুদ্ধি আছে! ওদের আর কাঁচ গিলতে কতক্ষণ! আমি জানি, একটা ছ' সাত বছরের ধাড়ি গরু গাড়ী-মোছা মস্ত একখান ঝাড়নই খেয়ে ফেলেছিল—শেষকালে ওর নাম কি, তার দরুণই মারা গেল।

ঘন। এইতো আমাদের জীবন! এর জন্যে এত! হুঁঃ—বলে,

যেন পদ্মপত্রে জল
সদা করে টলমল
এই আছে,—এই নাই!

পশু। তা আর বলতে! যাক্, এখন একবার ইলেক্‌সনের কথাটা শুনিয়ে যাই। যোগাড়-টোগাড় বেশ ভাল-রকমই চলছে।

ঘন। সত্যি নাকি? আমার সেই 'ভোটারগণের প্রতি নিবেদন'টা লেগেছে কেমন? বেশ যুৎসই হয়েছে তো?

পশু। চমৎকার। সমঝদার লোকে যে কত তারিফ করছে, তা আর বল্‌বার নয়। অমন পাকা বাঁধুনি—পড়ে সকলেই ভারী খুসী হয়েছে। আমাদের জিত! এবার আর আট্‌কায় কে?

ঘন। বেশ, বেশ, তা হলে কিছু কাজ হয়েছে, বল। আমি ভাবছিলুম, আর কিছু না হোক, ও-পক্ষের কর্ত্তাটির চোখে একবার পড়লে রাগে গস্‌গসিয়ে মরবে।

পশু। আপনার কি মনে হয়, তা জানিনা, আমার কিন্তু খুব বিশ্বাস, যে আপনি এবার যৌথ কৃষি সমিতির সভাপতি হয়ে শুধু এইখানেই থেমে থাকৃতে পারবেন না, আপনাকে আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে হবে।

ঘন। কি বলছো হে, আমি আবার গ্রাম ছেড়ে যাব কোথায়?

পশু। গ্রাম ছেড়ে যাবেন বল্‌ছিনে ত। ক্রমশ গণ্ডী ছেড়ে বাইরে বেরুতে হবে আপনাকে, তাই বলছি। এখান থেকে লোকাল বোর্ডের মেম্বর, তার পর দেখতে দেখতে ভাইস চেয়ারম্যান,—বুঝলেন কি না!

ঘন। আমার বাপু ও সব চিন্তে মাথাতেই আসে না। একে ত আমার বড় হওয়ার ইচ্ছেই নাই—তারপর দেখ, আবু মহম্মদ মিঞা—অনেকদিন থেকে ভাইস চেয়ারম্যান্ রয়েছেন—কম্ করে নাহোক বছর পঁচিশেক হবে।

পশু। সেইজন্যেই তো বদ্‌লানো উচিত—তিনি একলাই মৌরসী করে রাখ্‌বেন কি বলে? সকলেরি এক-একবার হাত-ফিরতি হয়ে আসুক। এতদিন ধরে একজন লোকের একই জায়গায় কায়েমী থাকা ভাল দেখায় না। তা ছাড়া আপনাকে গোপনে বল্‌ছি—লোকটা কোন কাজের নয়—তেমন বিদ্যে-সাধ্যিও নেই।

ঘনশ্যাম। সে যাহোক—

পশু। প্রথম ধরুন, মৌলবী মানুষ হয়েও ফার্সী যে ফার্সী তাও ভাল জানে না।

ঘন। তা লোক্যাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হতে গেলে ফার্সী জানাব দরকারটাই বা কি? সেটা আমাকে বুঝিয়ে দাও তো।

পশু। আহা, বলি, একটা বিদ্যে— জান্‌লে তো আব লোক্‌সান নেই! দেখুন, আমি দশ জনের সঙ্গে মিশে থাকি, অনেক কথাই আমাব কাণে আসে। আপনার দিকে সবাইকার টান। আমি বল্লুম, আপনি ঠিক দেখে নেবেন, বড় বড় সাহেব-সুবোদের সব আগমন হলে আপনাকেই মাথায় পাগ্‌ড়ী বেঁধে দববারে বেরুতে হবে।

ঘন। আমি বাপু, ও সব চাই না। উচ্চ আশা অনেকদিন ত্যাগ করেছি—তবে এটা অবশ্য বল্‌তে দোষ নেই যে, ভাইস চেয়ারম্যান হলে দশের আর দেশের সামান্য কিছু উপকারও আমি যে না কর্ত্তে পারি, তা ভেবো না।

পশু। তা আপনি ভাইস চেয়ারম্যান হলে চিরকাল কি লোকাল বোর্ডেই পড়ে থাক্‌বেন, মনে করেন?

ঘন। তবে দু' একবার ভাইস চেয়ার-ম্যানি কর্‌তে পেলে—

পশু। আপনি নিশ্চয়ই জেলা বোর্ডে যাবেন,—এ আমি লিখে দিচ্ছি—তখন মিলিয়ে নেবেন।

ঘন। আমি সাদাসিধে লোক—অহঙ্কার ঠ্যাকার জানি না—তবে কি না দশের কাজ করতে যদি জেলা বোর্ডেও যেতে হয় তাহলে সেখানেও লোকে নেহাৎ অনুপযুক্ত ঠাহর কর্‌তে পার্‌বে না—। তা—না হয় জেলা বোর্ডেই গেলুম, ধর—তার পর—

পশু। সেখান থেকে কাউন্‌সিলে যাবেন মশায়—লেজিস্‌লেটিভ কাউন্‌সিলে—যাকে বলে, লাট সাহেবের মন্ত্রী সভা!

ঘন। সে সব কি আর এ অদৃষ্টে আছে বাপু?

পশু। কে বল্‌তে পারে, বলুন? কথায় বলে 'পুরুষস্য ভাগ্যং'—কার ভাগ্যে কি আছে, দেবতারাই তা বল্‌তে পারেন না, আমরা তো ছার মানুষ!

ঘন। আচ্ছা, লাট সাহেবের কাউন্সিল পর্য্যন্ত না হয় পৌঁছুনো গেল! তারপর?

পশু। তারপর রাজমন্ত্রী অর্থাৎ একজি-কিউটিভ্ কাউন্‌সিলেরও মেম্বর হতে পারেন। ভারত মন্ত্রী-সভায় যেতে পারেন।

ঘন। তা হলে তো লাট সাহেবের কাছাকাছিই পৌঁছুনো গেল। তা হলে আর বাকী রৈল কি?

পশু। বাকী ত কিছুই দেখি না, মশায়। তার পর খেতাব যদি ধরেন তো রায় বাহাদুর, দেওয়ান বাহাদুর, রাজা বাহাদুর—আরো যে কি হতে—না হতে পারেন—আমাদের ছোট বুদ্ধিতে সে সব মোটেই আসে না।

ঘন। (স্বগত) রাজমন্ত্রী, ভারতমন্ত্রী-সভার সভ্য! না, না. এ সব যে হবার নয়—মিছে আশায় মন ভোলালে চল্‌বে কেন?

পশু। তা—মন্ত্রীই হতে চান্ আর লাট সভার সভ্যই হতে চান্, গোড়া বেঁধে কাজ আরম্ভ না কর্‌লে ত কিছুই হবে না। আমি ত এদিকে হোমরা-চোমরা ভোটারগুলোর

সঙ্গে এক-একবার সব দেখা করে ফেলেছি, তারা এখন ফুটন্ত ভাতের মত টগ্‌বগ্ করছে। এই সময় আপ্‌নি একটু নাড়াচাড়া দিলে সহজেই কাজ হাসিল হয়ে যায়! শুধু একটু দর্শন দেওয়া আর কি।

ঘন। কেন হে, হঠাৎ আমার দর্শন পাবার জন্য তাদের এত ধড়-ফড়ানি আরম্ভ হল কেন? আমার অপরাধটা কি?

পশু। আজ্ঞে, যা বলেছেন—অপরাধই বটে!—তা ও বেটাদের কাছে অপরাধ তো কথায় কথায়। এই ধরুন না মধু-সর্দ্দার—আপনি ত তাকে বাবা-বাছা ছাড়া কথাটি বলেন না, অথচ সে কি না আপনারি নিন্দে করে বেড়ায়।

ঘন। কেন হে—আমি তার করেছি কি?

পশু। ব্যাটা বলে, আপনার ভারী অহঙ্কার—এত গুমুরে যে, কারুর সঙ্গে নাকি ভাল করে কথাই কন না।

ঘন। কি করে বল্লে এত বড় মিথ্যে কথাটা! এ্যাঁ! দেখা হলেই আমি কোথায় তার ছেলে-পিলের খবর—তার পরিবারের খবর, এমন কি তার গরু-বাছুরের খবর পর্য্যন্ত না জিজ্ঞাসা করে ছাড়ি না! ঘোর কলি! ঘোর কলি!

পশু। আপনি না হয়—তার ছেলে-মেয়েরই খবর নিয়েছেন, কিন্তু তার কপি ক্ষেতের তো আর কোন তত্ত্ব-তালাস করেন নি।

ঘন। এ সব কি আবল্-তাবল্ বকুছো হে! সে আবার কপির চাষ করলে কোথায়?

পশু। তা জানেন না? সে গরু-বাছুরের খাবারের জন্যে দে'ধান আবাদ করবে বলে কাঠা দুই জমি ঘেরে;—তারই এক কোণে গোটা পাঁচ-সাত ফুলকপির চারা এনে লাগিয়েছিল। যেমন কপি, তার তেমনি ব্যবস্থা। পেকে গাছ হয়ে গিয়েছে, একটিও মানুষের পাতে উঠ্‌বে না, ভাবনায় সঙ্গে গরুর ভোগেই লাগ্‌বে। বেটা বলে কি না, আপনি সেই জমির সাম্‌নে দিয়ে দশবার গিয়েছেন, তা একবারও চোখ্ তুলে তার সাধের কপির পানে চান্‌নি! না জিজ্ঞাসা করেছেন একটা কথা—না দিয়েছেন একটা পরামর্শ! কৃষি সমিতির সভাপতির পক্ষে এটা কি কম অপরাধ! একবার যদি বল্‌তেন, "ওহে মধু, এমন জাতের কপি তো কোথাও দেখিনি—" তা হলেও তার কপি ক্ষেতের মানটা রক্ষা হতো।

ঘন। তোমার দিব্যি—সে কপি যে কোন্ থানটায় দিয়েছে, তা একদিনও আমার নজরে পড়ে নি!

পশু। ঐ ত দোষ মশায়—আপনারা তো আর চোখ তাকিয়ে চল্‌বেন না, এইজন্যেই তো আপনাদের অপযশ হয়। দেখুন দেখি, গজেন্দ্র মোক্তারের বুদ্ধি—ভোরে গিয়ে মধুর বাড়ী হাজির—বলে কি না, 'সর্দ্দার দাদা, বাহবা কপি করেছ, এমন আবাদ জান্‌লে কল্‌কেতার উড়ে মালী বেটারা বড় মানুষ হয়ে যেতো।'

ঘন। বুড়োটাতো ঘোঁট পাকাতে বড় কম মজবুত নয়। এম্‌নি করে বুঝি আমার লোক ভাঙ্গাচ্ছে?

পশু। আমার কথা যদি শোনেন তো, একবার বলি, এই পাড়াপড়শী হিসেবে—

বেড়াতে বেড়াতে মধুর বাড়ীর দিকে চলুনই না। চাষাভূষো মানুষ, কপির কথাটা একবার তুল্‌লেই গলে' যাবে 'খন—তা বলে কিন্তু ইতরের কাছে খাটো হওয়া চল্‌বে না—তা হলেই বেটার ল্যাজ মোটা হয়ে উঠ্‌বে।

ঘন। শুধু একবার তো ও পাড়ায় যাওয়া—তা আমি এখনি বেরুচ্ছি। (ভৃত্যকে ডাকিলেন) ওরে রামা, রামা—একবার এদিকে আয়তো।

রামা। ডাক্‌ছেন কর্ত্তা ?

ঘন। যা তো, শীগ্‌গির আমার হাঁসিয়াদার নতুন শালখানা নিয়ে আয় ত। দেখিস্, দেরী করিসনে যেন। একবার বুনো পাড়ার দিকে যেতে হবে।

(রামা ডান দিকের পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল)

পশু। তা চলুন, আমিও নয় আপনার সঙ্গে সঙ্গেই যাই। আপনি ত আর চাষার মর্ম্ম জানেন না—তাদের সঙ্গে বুঝে চলা কি কম ঝকমারী! ভাববেন না, আমি চুপে চুপে হদিশ বাৎলে দেব এখন।

রামা। (শাল আনিয়া) এই যে কর্ত্তা, এনেছি। এই শালখানার কথাই বল্‌ছিলেন তো ?

ঘন। (পশুপতির প্রতি) একটা মতলব ঠাহর করেছি। চল, তাকে গিয়ে বলিগে, তোমার কপির খুব খোশনাম শুনে চারটি বীজ চাইতে এলুম। একবার নিজের বাগানে লাগিয়ে দেখবো, ফলনটা কেমন হয়।

পশু। বাঃ, বেশ বুদ্ধিটি বার করেছেন তো!

সমস্বরে গান

(কোরাস)

পল্‌কা ভোটারের ভোট
অম্‌নি জোটে না।
পয়সা ঢালো, মিলবে তবে,—
নইলে মোটে না!
উঠে পড়ে যাও লেগে,
ছুটোছুটি কর বেগে,
(এখন) মানের গোড়ায়
ছাই না দিলে,—
মান ত ফোটে না!

(পশুপতি ও ঘনশ্যামবাবু পিছনের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

রামা।

রামা। (স্বগত) অবাক কাণ্ড! কর্ত্তা বাবু যাবেন কি না বুনোপাড়ায়, কপির বীজ খুঁজতে! তা নতুন শালখানা না হলে চলবে না! হুঁঃ! না হেসেও পারি না!

(সিদ্ধান্তরত্ন ব্যাগ হাতে সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া)

সিদ্ধান্ত। ঘনশ্যাম বাবু বাড়ী আছেন ?

রামা। (স্বগত) অচেনা লোক দেখছি। ভিনগাঁ থেকে আসছে, বোধ হয়!

সিদ্ধান্ত। (রামাকে দেখিয়া) ওহে, তোমার বাবুকে একবার খবর দাওতো, বল, বাটকেমারী সাহিত্য-প্রত্ন-সজ্জতের সভাপতি মাণিকলাল সিদ্ধান্তরত্ন মশায় এসেছেন।

রামা। বাবু এই এখনই বেরিয়ে গেলেন যে। তা তাঁর ফিরতে বড় দেরী হবে না।

সিদ্ধান্ত। তা হলে একটু অপেক্ষাই করা যাক্। ব্যাগটা এক জায়গায় একটু রেখে দাওতো বাপু।

রামা। (সিদ্ধান্তরত্নের হাত হইতে ব্যাগ লইয়া ঘরের কোণে একখানা চেয়ারের উপর রাখিয়া দিল) তা বাবু যে এই-খানেই স্থান-টান হবে?

সিদ্ধান্ত। দেখা যাক্, সেই ব্যবস্থাই ভালো হবে বোধ হয়।

রামা। ভালো জ্বালা--আবার একখানা ঘর সাজাতে হবে দেখছি—ফের সেই ঝাঁট-পাট, আর ঝাড়ামোছা।

সিদ্ধান্ত। কি আপশোষ! বাড়ী এসেও ঘনশ্যামবাবুর দেখা পেলুম না! ভেবে-ছিলুম, পৌছেই বন্ধুবরকে একটা সুসংবাদ দেব—তা আর ঘটলো না।

রামা। কিসের খবর বাবু?

সিদ্ধান্ত। তুমি তা বুঝবে না। তা ঘনশ্যামবাবুর মেয়েটি ভাল আছেন তো?

রামা। আজ্ঞে, আপনকার আশীর্ব্বাদে তিনি ভালই আছেন।

সিদ্ধান্ত। তিনি যখন বাটুকেমারী বেড়াতে গিয়েছিলেন, সে সময় আমি প্রত্ন-অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকায় আমার সঙ্গে তেমন ভালরকম আলাপ-পরিচয় হয়-নি। তা আমারও তো বড় কোথাও যাওয়া-আসা ঘটে না, তবে এবার আর সংবাদ পেয়ে স্থির থাকৃতে পার্‌লাম না। এ রকম বহুমূল্য সে-কালের জিনিস তো আর যেখানে-সেখানে যখন-তখন পাওয়া যায় না, কম করে প্রায় পুরোপুরি একটা বাক্স-ভর্ত্তি—সুপ্রাচীন মৃৎভাণ্ড ও সরাবাদি আর কতকগুলি বৌদ্ধ যুগের লৌহ কীলক। গুপ্ত রাজগণের এমন মূর্ত্তিমন্ত স্মরণচিহ্ন বহু-অনুসন্ধানেও আর কোথাও পাওয়া যায় নি।

রামা। (স্বগত) এ আবার কি বলেরে! এ যেন পাঠশালার পোড়োদের মত কেতাব দেখে কি-সব আউড়ে যাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত। যাক সে কথা। তা তোমার দিদিমণি খুব ভালমানুষ, কেমন হে? যেমন দেখতে, তেমনি স্বভাবটিও? না?

রামা। আজ্ঞে হ্যাঁ—দিদিমণির সবই ভাল, তবে কিনা বাসন-কোষণের উপর বড় খর নজর—কোথায় কাঁচের গেলাসটা, কোথায় পাথরের বাটিটা, কেবল তাই নিয়েই আছেন।

সিদ্ধান্ত। (অস্ফুটস্বরে) তাহলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার সুবিধা ঘটবে বলেই বোধ হয়।

রামা। আজ্ঞে, কি পূর্ণ বলছেন?

সিদ্ধান্ত। তোমার সে কথা শুনে কাজ নেই। বরং আমি যা জিজ্ঞাসা করি—বল দেখি। এখানকার চাষী লোকেরা মাঠে কাজ কর্‌বার সময় কিছু পায়-টায়? বলি, কোন জিনিস?

রামা। কোথায়?

সিদ্ধান্ত। মাঠে, লাঙ্গল চালাবার সময়, ফালের মুখে?

রামা। ও, তাই জিজ্ঞেস কর্‌ছেন! তা মাঠে আর পাবে না? বিশেষ ফালের মুখে?

সিদ্ধান্ত। পায়! কি! কি! বল ত বাপু—আমার আসা তাহলে সার্থক হল! বল ত, বল ত, কি পায় তারা?

রামা। আজ্ঞে, কেঁচো, ঘুগ্‌রো, এই সব—আর কি!

সিদ্ধান্ত। আহা, নাহে না, কেঁচো-টেঁচো নয়—সে কালের প্রাচীন জিনিস কিছু পাওয়া যায় কি না বল্‌তে পারো, বাপু? এই—বৌদ্ধ যুগের মূর্ত্তি, তাম্র-শাসন, এই-সব?

রামা। আজ্ঞে, আমরা মুকখ্যু মানুষ, ও সব কাকে বলে, তা'তো জানি না।

সিদ্ধান্ত। যাকৃগে, এখানে যখন ২।৪ দিন থাকৃতেই হবে—তখন ভাল করে কয়েক জায়গায় নিজেই খুঁজে দেখ্‌বো। আমি সমতটের যে মানচিত্র প্রস্তুত করেছি, তা দেখ্‌লে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, গুপ্তযুগের হাজার দেড়হাজার বছরের রাজপথ—এই গ্রামের মধ্যেই ছিল।

রামা। (অবাক্ হইয়া) বল নাকি বাবু? আমাদের গাঁয়ে হাজার বছর আগে পাকা সড়ক ছিল?

সিদ্ধান্ত। হাঁরে, হাঁ। আমাকে ত তুই চিনিস্ না। আমার ভাবা ক্ষমতা আছে—কোথায় কি সেকালের জিনিস পাওয়া যাবে—তা আমি এক পলকে গন্ধে-গন্ধে বার করে দিতে পারি। গুপ্ত যুগেরই হোক্ কি পাল রাজাদেরই হোক্—একবার জায়গাটা দেখতে যা দেরী—কোথায় কি পাওয়া যাবে, অমনি ঠিক্-ঠাক্ বলে দেব। এ তো বড় যার-তার কর্ম্ম নয় বাপু।

রামা। (বিরক্ত হইয়া) আজ্ঞে, তা আর বল্‌তে! (স্বগত) কেমন-ধারা ভদ্দরলোক। এসে-ইস্তক খালি বক্‌বক্ করছে।

হেমাঙ্গিনী। (ডান দিকের দ্বার দিয়া ঘরে ঢুকিয়া)—কৈ, এত খুঁজলুম—জয়পুরী রেকাবিখানা, তা কোথাও পাওয়া গেল না ত!

রামা। এই যে দিদি ঠাকরুণও এসে পড়েছেন। (ঘরের পিছন দিকে বাসন রাখিবার তাকের নিকট গিয়া দাঁড়াইল)

হেমাঙ্গিনী। (নমস্কার করিয়া) আপনি। সিদ্ধান্তরত্ন মশায়। আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

সিদ্ধান্ত। এখানকার সব মঙ্গল তো মা?

হেমাঙ্গিনী। আপনার পায়ের ধূলো পড়েছে শুন্‌লে বাবা কতই খুসী হবেন।

সিদ্ধান্ত। আমিও একটা জরুরী খবর নিয়ে এসেছি।

হেমাঙ্গিনী। সুধীরবাবু আপনার সঙ্গে আসেন নি?

সিদ্ধান্ত। না। তার আজ ক'দিন থেকে উঠে হেঁটে বেড়াবার যো নেই—পা মচকে গিয়ে ভয়ানক বেদনা হয়েছে।

হেমাঙ্গিনী। আহা, বড় দুঃখিত হলুম শুনে—তা হঠাৎ এ রকমটা হলো কি করে?

সিদ্ধান্ত। দোষটা কতক আমারই বল্‌তে হয়, আমি কাকেও কিছু না বলে বাগানের সীমানার কাছে ক' জায়গায় গর্ত্ত খুঁড়িয়েছিলাম। সুধীর সন্ধ্যার সময় অন্ধকারে বুঝ্‌তে না পেরে সেই খানার ভিতর পা দিয়ে ফেলেছিল, তাই পড়ে যায়,—বড্ড চোট লেগেছে। তা ছেলেটা ক'দিন কষ্ট পাচ্ছে বটে, কিন্তু আমার খানা-কাটাও বড় ব্যর্থ হয় নি—আমি ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুন্দর একখানি ছোরার বাঁট পেয়েছি।

হেমাঙ্গিনী। আপনি তো একখান ভাঙ্গা বাঁট পেলেন, কিন্তু আমাদের নাচ দেখা যে বন্ধ হয়ে গেল।

সিদ্ধান্ত। নাচ কি রকম?

হেমাঙ্গিনী। সুধীর বাবু যে খুব ভাল

নাচতে পারেন, তা বুঝি আপনি জানেন না? সেই সেবার গ্রামের ছুটীর সময় আপনাদের গ্রামে বেড়াতে গিয়ে—বাবার সঙ্গে ক'দিন সন্ধ্যাবেলায় আপনাদের সখের থিয়েটারের অভিনয় দেখে এসেছিলুম যে। সুধীর বাবু একলাই ত নাচে গানে মাতিয়ে রাখ্‌তেন—তা পায়ের ব্যথাটা শীগ্‌গির সেরে যাবে তো?

সিদ্ধান্ত। সামান্য বেদনা, দিন দুইয়ের মধ্যেই সেরে যাবে।

হেমা। বেদনা না হয় সেরে গেল, পরে পায়ের কোন রকম দোষ থেকে যাবে না তো? চল্‌তে-ফিরতে খোঁড়াতে হলেই না মুস্কিল!

সিদ্ধান্ত। না, সে সব কোন ভাবনা নেই—ভাগ্যিস পা'টা জখম-টখম হয়নি, নৈলে দুদিন বাদেই বিয়ে হবে, মহা হাঙ্গাম হতো।

হেমা। যাক্, তবু রক্ষে।

তা মা, তোমাদের বাড়ীতেও বোধ হয় ঘটকী আসা সুরু হয়েছে।… বল—

হেমা। (লজ্জাবনতমুখে)—কি জানি! (স্বগত) উনি কি সুধীরের সঙ্গে সম্বন্ধটা পাকাপাকি করার জন্যেই এসেছেন নাকি?

সিদ্ধান্ত। মা, আমি তোমাকে গোপনে একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌বো?

হেমা। (স্বগত) যা ভয় করেছি, তাই! এখন কি জবাব দি?

সিদ্ধান্ত। মাঝে মাঝে তোমাদের বাগানের ভেতর খোঁড়াখুঁড়ি হয় তো—খুঁড়ে কি পাওয়া যায়, বল দেখি?

বামা। (স্বগত) আবার সেই পাগ্‌লামী সুরু করেছে বে—এর রীতিমত ছিট আছে, দেখ্‌চি।

হেমা। বাগান খুঁড়ে আর কি পাওয়া যাবে? মাটি, পাথরের নুড়ি, এই সব।

সিদ্ধান্ত। তা নয়, তা নয়,—বলি, খোদিত ফলক, তাম্র শাসন, এই রকম কিছু পাওয়া যায় না?

হেমা। কৈ, সে সব তো কোনদিন দেখিনি।

সিদ্ধান্ত। তা হলে একবার বসে-বসে পরীক্ষা করে দেখ্‌তে হবে ত।

হেমা। এখন একটু বিশ্রাম কর্‌বেন না? চলুন, ঐ দিককার ঘরে—জিরুবেন'খন।

সিদ্ধান্ত। (ব্যাগ উঠাইয়া লইয়া) তা বেশ তো—চল, যাওয়া যাক্।

হেমা। ঘরটা নেহাৎ মন্দ নয়—দক্ষিণ-দুয়োরী জান্‌লা, খুল্‌লেই দেখ্‌বেন, নীচে বাগান।

সিদ্ধান্ত। আহা বেশ হবে'খন—ঘরে বসেই ঢিবি-ঢাবিগুলো সব নজরে পড়বে—(জোরে নিশ্বাস টানিয়া) তাই তো—এ যে গুপ্ত যুগের ঘ্রাণ পাচ্ছি।

(বাঁদিকের দ্বার দিয়া হেমাঙ্গিনীর সহিত চলিয়া গেল)

বামা। (স্বগত) পাগলাটাতো এইখানেই রাত কাটাবে, দেখ্‌চি,—নাঃ, মহা ভাবনায় ফেল্‌লে। প্রস্থান।

ক্রমশ

শ্রীগুরুদাস সরকার।

ঢেউ

উঠ্‌তি বেলা পড়্‌তি বেলা খেল্‌ছে খেলা দুই পাথায়,
কাজের খেলা নেইকো সুরু-শেষ।
আঁক্‌ছি ছবি আকুল প্রাণে বুলিয়ে তুলি ভুল-রেখায়,
আলো-ছায়ার আব্‌ছা নিরুদ্দেশ!
অন্ধকারে ধাক্কা দিয়ে দ্বারের আগল খুল্‌ছে কে?
যায় পুরাতন নতুন ঊষায় মরা সোনার দাগ রেখে।

হরিদ্বারে গঙ্গাসাগর উথ্‌লে ওঠে জান্‌ত কে?
ডুব দিয়ে আজ দেখ্‌ছি সুদূর-দূর।
লুকিয়ে দেখে' লুকিয়ে শুনে' আমায় কেন যায় ডেকে,
মৃত্যু-জীবন-সমান-করা সুর?
চল্‌ছি পথে নতুন বাঁকে ঘোরালো বন-অন্ধকার,
এ কি গহন জীবন-কুহক, কতটুকুন সত্য তার?

পথ দেখিয়ে যায় রে নিয়ে একটি তারা অস্তমান,
বিদায়-করুণ দীর্ঘশ্বাসের রেশ;
ঘুম-কুহেলির মধ্য দিয়ে চাঁদের কালি দেখ্‌ছি ম্লান,
উজল করে দিগন্তরের দেশ।
চোখের জলের যূঁই-চামেলি এমন করে' ঝরায় কে?
পারের বাসর-বরণ-মালা আমার গলায় পরায় কে?

দুঃখ-মিলন দোলক দোলে, উতল গতি-ছন্দ-তাল,
অনন্তেরি প্রান্ত দুটির মাঝে,
মাপ-কাঠিতে বারেবারে স্পর্শে তারে অবাধ কাল,—
সেই পরশে অমৃত রাগ বাজে।
শুক্ল বোঁটায় কোটায় কলি পুরানো সেই রস নূতন,
রূপ ধরে সেই সারা যুগের চির-অচিন্‌ চিরন্তন।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা-সংস্কার

(শেফিল্ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে, এ, গ্রীনের বক্তৃতার মর্ম্ম)

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা শুভলক্ষণ নয়। এ বিষয়ে যত আলোচনা, সমালোচনা,—এমন-কি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ হয় ততই মঙ্গল।

শিক্ষা-সংস্কারের কথা উঠলেই অনেকের মনে হয়, শিক্ষা-বিভাগের আইন-কানুন, শাসন পরিদর্শনই চিন্তার বিষয়। প্রধান সংস্কারের ক্ষেত্র স্কুল,—ব্যবস্থা-কর্ত্তাদের প্রধান কাজ, শিক্ষাদানের যত বাধা আছে তা দূর করা এবং যাতে কাজ ভাল হয় এমন শিক্ষক ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করা। বর্ত্তমান সময়ের প্রধান বাধা—ছোট ছোট ঘরে বড় বড় ক্লাস। ৬০০ বর্গ ফিট একটি ঘরে, যাটজন ছেলের ভার, একজন শিক্ষকের হাতে দেওয়া হয়—এ অবস্থায় ছেলেদের মনে স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাব রক্ষা করা কঠিন এবং শিক্ষকের পক্ষেও ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং এ-স্থলে রুটিন-বাঁধা কাজ ব্যতীত আর কিছু হ'তে পারে না। এইজন্যেই আমাদের সমস্ত প্রয়াস বিফল হচ্ছে।

কিন্তু, সব অপরাধ শিক্ষাবোর্ডের নয়। তাঁরা বলেন, একজন শিক্ষক যাটজনের বেশী ছেলে পড়াবেন না এবং প্রত্যেক ছেলের জন্যে কমপক্ষে কতখানি জায়গা চাই তা দেখা দরকার। কোন কোন স্থানীয় শিক্ষাসমিতি উক্ত নিয়ম কেবল সীমা-নির্দ্দেশক বলেই ধরেছেন এবং তাঁদের স্কুলগুলির আমূল পরিবর্ত্তনের সূচনা করেছেন। প্রস্তাব হয়েছে, লণ্ডনের স্কুলগুলিতে প্রতি শ্রেণীতে যাট জন ছাত্রের পরিবর্ত্তে চল্লিশ জনের ব্যবস্থা করা হবে,—ঘর সেই পূর্ব্বের মত বড়ই থাকবে ;—এজন্যে ৭,৫০,০০,০০০, টাকা ব্যয় হবে এবং প্রায় পনেরো বৎসর সময় লাগবে।

এইরকম পরিবর্ত্তন সাধন করার পক্ষে টাকার অভাবই গুরুতর বাধা। সকলেই আশা করছেন, রাজকোষ হ'তে আরও বেশী পরিমাণ অর্থ এইজাতীয় কাজের জন্য দেওয়া হবে। তখন অন্যান্য স্থানের শিক্ষাসমিতিও লণ্ডনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারবেন।

কিন্তু এই যে ঘরবাড়ীর আকার বাড়ানো এবং ছাত্র-সংখ্যা কমানোর ব্যবস্থা, এ অতি চমৎকার ব্যবস্থা হ'লেও ব্যর্থ হ'তে পারে। এখনই আমাদের শিক্ষকের সংখ্যা অধিক নয়। শিক্ষক-ট্রেণিং কলেজের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে ;—১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ৬,৬১২ জন ছাত্র ট্রেনিং কলেজে ছিল, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১২,০০০ ছাত্রের স্থান করা হয়েছিল,—কিন্তু পরে ছাত্র-সংখ্যা কমে গিয়েছে। ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে ১১,৯০১ জন শিক্ষক-ছাত্র ছিল, এখন তার অর্দ্ধেকেরও কম আছে। যাটজন ছাত্রের পরিবর্ত্তে চল্লিশজনের ভার এক-একজন শিক্ষিত শিক্ষকের হাতে দিতে হ'লে, প্রয়োজন-মত যথেষ্ট শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাবে, তা চিন্তার বিষয়।

এ বিপদ হতে পরিত্রাণের একটা উপায় বার করতে হবে। উপযুক্ত যুবক-যুবতীদের বাধ্য ক'রে শিক্ষক করা যায় না। শিক্ষকদের পদ আরও লোভনীয় করলেই, শিক্ষকের অভাব দূর হতে পারে। সেজন্যে দুটি উপায় অবলম্বন করা উচিত। প্রথম—যোগ্যতা-অনুসারে উন্নতির পথ উন্মুক্ত করতে হবে। সাধারণ শিক্ষকদের খুব অল্প-সংখ্যকই হেডমাষ্টার পর্য্যন্ত হতে পারবেন, কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষকই কিছুকাল কাজ করার পর এমন অবস্থায় যেন যেতে পারেন, যাতে-করে' বিবাহের পর তাঁরা স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয়—শিক্ষকদের পুরস্কারের সংখ্যাবৃদ্ধি ও সুব্যবস্থা করা উচিত। একজন যুবক-শিক্ষক যখন জানে যে, সে যতই ভাল করে' কাজ করুক না কেন, তাকে কুড়ি বছর ধরে সেই নিম্ন-বিভাগেই থাকতে হবে—তখন এ-কাজে তার বিশেষ উৎসাহ হওয়ার কারণ থাকা সম্ভব নয়। শিক্ষকগণ যাতে উচ্চতর বিষয় সকল অধ্যয়ন ক'রে, তার পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ডিপ্লোমা পেতে পারেন, তারও ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

ভবিষ্যতে যিনি হেডমাষ্টার হবেন, তিনি কেবল সুদক্ষ শিক্ষক হলেই চলবে না, আরও কিছু হওয়া চাই। এবং যৌবনের প্রভাব চলে যাওয়ার আগেই তাঁর এ-কাজের ভার পাওয়া উচিত। শিক্ষকগণের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির ব্যবস্থা করতে যে অর্থ ব্যয় হবে, শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যয়ের তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহ'তেই দেশের সব-চেয়ে বেশী কল্যাণ হবে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি শিক্ষকগণের উপরই নির্ভর করছে। সকল উন্নতির মূলেই মানুষ।

ভাল আইন-কানুন বিধি-ব্যবস্থার দ্বারাও অনেক উন্নতি করা যায়। প্রত্যেক স্কুলকে আরও বেশী স্বতন্ত্র করা তার প্রধান উপায়। প্রত্যেক স্কুলের লক্ষ্য ও প্রণালীর কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব আছে; কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ সেই বিশেষত্ব অগ্রাহ্য ক'রে সকল স্কুলকেই একপ্রণালীর মধ্যে টানতে চান; কারণ, একপ্রণালীর অন্তর্গত করলে কল বেশ চলে। কোন নূতন বিষয় শিক্ষা দিবার প্রারম্ভে কয়েকটি স্কুলকে একত্র করে' কয়েকটি কেন্দ্র করে' কম-খরচে বেশ শিক্ষা দেওয়া যায়। এইরকম করে ছুতোর, ধোপা এবং [illegible]ীর কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। একটা 'সার্কুলার' গেল হেডমাষ্টারের কাছে, —নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কয়েকজন ছাত্র পাঠাতে হবে। অফিস-হিসাবে এর-চেয়ে ভাল কাজ আর নাই। কিন্তু শিক্ষা-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখন বদ্‌লে গিয়েছে—কয়েকটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিষয়ের সমাবেশ করে' একটা 'কোর্স' ঠিক করার নামই শিক্ষা নয়। এ কেবল শিক্ষার জোড়াতালি। প্রত্যেক স্কুল স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।—তার প্রত্যেক কাজের চালক হবেন হেড-মাষ্টার, তিনি ছেলেদের অবস্থা-অনুসারে শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্দেশ করবেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক মেয়ে বাড়ীতেই ঘরকন্নার কাজ শেখে। কোন ছেলে যদি স্কুলের কারখানায় কোন কাজ শেখে, তাহলে সে কি শিখবে এবং কেমন করে' শিখবে [illegible] নির্দ্দেশ করবেন তিনি, যিনি তাকে জানেন—তাঁরা নন যাঁরা দেশের

সমস্ত ছেলের সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা অনুসারে কোন কার্য্য-প্রণালী নির্ণয় করেন।

স্কুল হওয়া চাই স্বতন্ত্র এবং হেডমাষ্টার হবেন স্বাধীন। স্বাধীনতা এবং প্রকৃত দায়িত্ব-ভার পেলেই মানুষ প্রাণ-মন দিয়ে কাজ করতে পারে। সে অবস্থায় গেলে প্রতি স্কুল নিজের নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে পারবে। কি-রকম কাজ চল্‌ছে, তার পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এখন সে-রকম পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই,—সেজন্য অনেক ক্ষতি হ'লেও শেষে পরীক্ষার আয়োজন ব্যর্থ হয় এই ভয়ে সংস্কারকগণও সে আয়োজনে করতে তওটা ব্যগ্র নন। কিন্তু যে সব ছেলে-মেয়ে লেখা-পড়া সাঙ্গ করে' স্কুল থেকে বাহির হয়, তারা যাতে নিভু লরূপে লিখতে পড়তে এবং হিসাব করতে পারে—যা সংসারের সাধারণ কাজের জন্যে সর্ব্বদা দরকার,—তা তো আমাদের বিশেষরূপে জানা দরকার।

কেবল লিখতে পড়তে এবং হিসাব করতে শেখানোই স্কুলের কাজ নয়। আরও উচ্চতর কিছু কাজ আছে—সে কাজ কতদূর হয় তার পরীক্ষা ঐ একইভাবে হয় না। সে কাজের জন্যে শিক্ষকগণের উপরই নির্ভর করতে হবে—এবং তাঁদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে। সুশিক্ষিত নর-নারীর হাতে এ কাজের ভার দিলে, তাঁরা অনেক ভুল-ভ্রান্তি হ'তে আত্মরক্ষা ক'রে চলতে পারবে। সাধারণ মানুষের জীবনে পুঁথিগত বিদ্যার তেমন বেশী-কিছু কাজ হয় না, কার্য্যগত অভিজ্ঞতা এবং লক্ষ্যে নিষ্ঠার দ্বারাই বিশেষ কাজ হয়—কিন্তু শিক্ষা-বিভাগে এ-সব গুণের তেমন সমাদর নাই। আশ্চর্য্য!

শিক্ষকগণকে কঠিন বাঁধা-ধরা ধারায় (Routine) আবদ্ধ থাকতে হয়। সে 'রুটিন' তাদের সমস্ত সময়কে দশ হতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের নানা ভাগে ভাগ করে দেয়,—তাতে শিক্ষক এবং ছাত্রগণ এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা,যে কখন্ কি করতে হবে তার ব্যাতিক্রম হওয়া সহজ নয়। এ-রকম বাঁধাবাঁধি অনেক সময় অত্যন্ত কষ্টকর। কোন ক্লাসে গিয়ে শিক্ষক কিম্বা ছাত্রদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—তারা কি করছে, এবং কেন তা করছে?—তাহ'লে শতকরা নিবনব্বই জন বলে 'রুটিনে' আছে ব'লে। এ রকম খাপছাডা কাজ কর'কে শিক্ষা বলে না। কাজের বিধি-ব্যবস্থা (plan) চাহ বটে, কিন্তু তার মানে এ নয়, যে 'রুটিন'ই যথাসর্ব্বস্ব।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন্ পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক,—এবার তাহ দেখা যাক্। ইংরেজদের শিক্ষার উপর একবারে আস্থা নাই। অবশ্য তারা যে শিক্ষা প্রচলিত রেখেছে, তাতেই তাদের অনাস্থা—এবং এখন আমরা বুঝতে পারছি, সে অনাস্থা একেবারে যুক্তিহীন নয়। স্কুলে যে-রকম শিক্ষা-প্রণালী চ'লে আসছে, তার সঙ্গে আমাদের জীবনের কোন মিল নাই;—জীবতত্ত্ববিদ্‌রা বল্‌ছেন—এটা হ'ল গোড়ার গলদ। স্কুলের সঙ্গে প্রকৃত জীবনের এই পার্থক্য দূর করতে হবে! বাণিজ্য-বিদ্যালয় এবং মৌখিক শিক্ষালয়ের জন্য চারিদিকে যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যেও উক্ত ভাবহ সুস্পষ্ট। শিক্ষা সম্বন্ধে

এই নূতন আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করতে হবে,—অবশ্য যাতে লঘুতার সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও চোখ না রাখলে চলবে। এই ব্যাপারের মধ্যে একটা সত্য খুব স্পষ্ট,—সেটা হচ্ছে এই, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে প্রকৃত জীবনের স্থান থাকা চাই।

অনেক অভিভাবক তাঁদের বাল্যকালের প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর পক্ষপাতী।—কিন্তু এই শিক্ষা-ব্যবস্থার কোথায় প্রাণের অভাব আছে,—সেই অভাব অনতিক্রম্য, না, চেষ্টা করলে তা দূর করা যায়—সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। সংস্কারকের দল শিক্ষা বিভাগ বা শিক্ষকদের উপর দোষারোপ করছেন না,—তাঁরা যে নূতন আলো সামনে ধরছেন তা অনেকেই স্বীকার করছেন।

ব্যাপারটার মূলে যাওয়া যাক্। শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে একটা ভাব দেখা যায়, যে বাল্যকাল কেবল শাসন ও গঠনের জন্যে। স্কুলের ব্যবস্থা-কর্ত্তাগণ চিন্তা করেন সুধু ছেলেরা বড় হ'লে কি কি বিষয় তাদের কাজে লাগবে,—অথচ তাদের জীবন কিসে পূর্ণতর এবং সত্যতর হবে, তাঁদের সেদিকে দৃষ্টি নাই। স্কুলের কাজ—জীবনের পথে চলতে শিক্ষা দেওয়া,—এবং চ'লে-চলেই চল্‌তে শেখা যায়। কিন্তু ক্রমাগত অন্যের চালনায় চলা জীবন নয়। ক্রীতদাস ঠিক জীবন্ত নয়,—ছেলেরাও স্কুলে ঠিক জীবন্ত থাকে না। তারা চলতে পায় না, কেবল পরিচালিত হয়। এমন করে' স্বাধীন, জীবন্ত হওয়া যায় না।

এখন আমরা স্কুল বললে যা বুঝি, ভবিষ্যতের স্কুল তা থেকে অনেক স্বতন্ত্র বস্তু হবে। সে স্কুলে ছাত্রগণ কেবল বই পড়তে যাবে না—তারা আমাদেরই মত স্কুলে গিয়ে বিশ্রাম করবে, আমোদ করবে, এবং সেই নূতন সত্য ও তথ্য সংগ্রহ করবে, গভীর চিন্তায় মগ্ন হবে। সে স্কুলে ছাত্রগণ দায়ে ঠেকে রচনা লিখবে না,—অন্তরের উদ্দীপনায় এবং বাহিরের আকর্ষণে তা লিখবে। সে স্কুলের আসল গুণ হবে "কাজ করা।" তার অনেক শ্রেণী হবে কারখানার (workshop) মত, জেলখানার মত নয়, এবং সেখানকার শিক্ষনীয় বিষয়গুলিই জীবনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সকল দিক দিয়ে সার্থক হয়ে উঠবে।

আমরা যত তাড়াতাড়ি সংস্কার চাই, তা হবে না। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের ব্যয়বহুল ঘর-বাড়ীর প্রতি অনুরাগ, উন্নতির একটি প্রধান অন্তরায়। তাদের দুটো কথা মনে রাখতে হবে—প্রথম, শিক্ষা ঘর-বাড়ী বা কোন-একটা প্রণালীর উপর একান্ত নির্ভর করে না এবং দ্বিতীয় সেই ঘর-বাড়ীই সব-চেয়ে ভাল, যে ঘর-বাড়ীর পরিবর্ত্তন প্রয়োজন অনুসারে সম্ভব

সব চেয়ে বড় চিন্তার বিষয় হচ্ছে শিক্ষকের কথা। চরিত্রবান সুযোগ্য শিক্ষকের উপর শিক্ষা-সংস্কার ও প্রকৃত শিক্ষা নির্ভর করে। কি ক'রে নরনারীকে সুযোগ্য শিক্ষক এবং কি-ক'রে শিক্ষকতা তাদের পক্ষে স্পৃহনীয় করা যায়—এই কঠিন সমস্যার সমাধান করবার জন্যে সমস্ত জাতীয় শক্তি প্রয়োগ করা উচিত।

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

স্বপ্নের মতন

স্বপ্নের মতন তবে গেল ভেসে তোমার প্রণয়,
আকাশের বর্ণচ্ছটা, দেখিবার, লভিবার নয়।
ফুলের সুরভি শ্বাস, ক্ষণিকের ক্ষীণ অনুভূতি,
ভ্রমরে ভোলাতে পথ নিমেষের বনেয়র স্তুতি।
সায়াহ্নের সন্ধিক্ষণ, এ আলোক হইল না পার,
আনি চন্দ্রকর স্নাত নক্ষত্র-খচিত অন্ধকার।
জন্ম নাহি দিল ফলে, বন্ধ্যা ব্যর্থ এহ পুষ্পপ্রাণ,
আনন্দের মিলনের জন্ম জন্ম রাখিয়া সম্মান।

অকাল বসন্ত শুধু? পল্লবের অবান্তর কথা,
অশক্ত বাহুতে বক্ষে দীর্ঘদাহ নিদাঘের ব্যথা,
বর্ষারে বরণ করি সম্বরিয়া ক্লিষ্ট পুষ্পদল
শরতে করিতে দান মধুস্বাদ বীজগর্ভ ফল।
হেমন্তের মধ্য-পথে পথভোলা মলয়ের মত,
বনানীরে সহসা উদ্‌ভ্রান্ত করি পুনঃ দূরগত॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সমালোচনা

ভক্ত-চরিত-মালা। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ ও ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, তুকারাম প্রভৃতি সপ্তেরোজন ভক্ত সাধকের জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। সাধকগণের জীবনের মোটামুটি কথা বেশ সংক্ষেপে সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণিত হইয়াছে—রচনাও হৃদয় গ্রাহী। প্রত্যেক সাধকেরই জীবনের বিশেষ ধারাটি, চরিত্রের বিশেষ সূত্রটি লেখকের রচনার গুণে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। রচনায় সংযম আছে—কোথাও উচ্ছ্বাসের বাহুল্য নাই। ভাষা প্রাঞ্জল, সরল। বহিখানির ছাপা বাঁধাইও বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে।

বিধি-নির্ব্বন্ধ। শ্রীযুক্ত কালবরণ ঘোষ প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ১৭৬ নং রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি উপন্যাস সচিত্র। প্লট মামুলি, আজগুবি ধরণের, চরিত্র নির্জীব, লেখায় কোন বিশেষত্ব নাই। তিনখানি ছবি আছে—ছবিগুলি জ্যাবড়া।

রাতিকা। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ১৯০ নং অপার চিৎপুর রোড বাগবাজার মাধুরী কার্য্যালয় হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য রাজসংস্করণ এক টাকা, সাধারণ সংস্করণ আট আনা। এখানি কবিতার বহি, অনেকগুলি খণ্ড কবিতা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলির ছন্দ, ভাব ও মিল—সবই বিশেষত্বহীন।

প্রবাহ। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। চট্টগ্রাম সরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা গ্রন্থ প্রায় শতাধিক খণ্ড কবিতা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন কবিতায় মাঝে মাঝে ভাবের একটু ক্ষীণ সাড়া পাওয়া যায়—তবে অধিকাংশেই ভাব-দৈন্য—এবং পঙ্গু ছন্দ লক্ষিত হয়।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, বাসন্তী প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রসাধ

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় অঙ্কিত চিত্র হইতে।

৪৩শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ [২য় সংখ্যা

ভারতী

আলোর ফুল্‌কি

১

সাদা, কালী, গুলজারী—এরা সবাই সেটা জানবার জন্যে ধরা-ধরি করছে। পায়রা থেকে চড়াই এমন-কি টিকটিকি পর্য্যন্ত পাহাড়তলীর এ-পাড়া ও-পাড়ার ছেলে-বুড়ো যে যেখানে আছে, সবাই যে লুকানো জিনিষের কথা বলাবলি করছে, কুঁকড়ো সেই লুকানো জিনিষের খবরটা বুকের মধ্যে নিয়ে বসে আছেন; কিন্তু মুখ-ফুটে কাউকে বলতে পারেন না, অথচ না বল্লেও বুক যে ফেটে যায়। অতি গোপনীয় বীজমন্ত্রটি যার কানে চুপিচুপি বলে দেওয়া চলে, এমন উপযুক্ত পাত্র—সে কোথা? এ যে অতি গোপন কথা, অতি নিগূঢ় রহস্য! মেয়েরা তো এ-কথা একটি দিন চেপে রাখতে পারবে না। বিশেষতঃ সাদী কালী সুরকী আর খাকি এম্‌নি সব গুলবাহারী গুলজারী—যাঁদের মুখ চলছেই, তাঁদের এ কথা একেবারেই বলা যেতে পারে না,—শোনবার জন্যে তাঁরা যতই ইচ্ছুক থাকুক না কেন! নাঃ, বুক ফেটে যায়, যাক্‌, মনের কথা মনেই থাক্‌, গুপ্ত মন্তর, অন্তরের ভাবনা মন থেকে দূর কোরে যেমন আর সবাই, তেমনি আমিই বা কেন না থাকি—দিব্বি আরামে, পাহাড়তলীর রাজবাহাদুর কুঁকড়ো। এইটুকুই যথেষ্ট, আর এইটুকুতেই আমার আনন্দ,—কিমধিকমিতি! মনে-মনে এই তর্ক-বিতর্ক করতে-করতে বুক-ফুলিয়ে কুঁকড়ো ধানের মরাইটার চারদিকে পা'চালি করছেন, আর এক-একবার নিজের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নিজেকে নিজে তারিফ কচ্ছেন—ক্যা খপ্‌-সু-র-তি-[illegible]। [illegible] মাথার মোরগ-ফুলটা আর

চোখের কোল থেকে ঝুলছে যে দাড়ি, তার মেহেদী রংটা যে বনের টিয়া থেকে আরম্ভ করে লাল তুতির লালকেও হার মানিয়েছে, এটা কুঁকড়োকে আর বুঝিয়ে দিতে হলনা। তিনি খড়ের গাদার উপরে বুক-ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে একবার, মাঠের দিকে একবার, তাকিয়ে দেখলেন—সোনা আর মাণিকের আভায় জল-স্থল-আকাশ রাঙিয়ে সন্ধ্যাটি কি চমৎকার সাজেই সেজে এসেছে! "আজকের মতো দিনের শেষ কাজ সাঁঝি-আলপনা দেওয়া হল, আজ করবার যা, তা সারা হয়েছে, কালকের চিন্তা কাল হবে, এখন আর কি, ডুমুঠো যা জোটে, খেয়ে নিতে ছু-টি-ই-ই।"—বলেই কুঁকড়ো একটিবার ডাক দিয়ে চালা-ঘরের মটকা থেকে নেমে বাসার দিকে দৌড়ে যাবেন, ওদিক থেকে শব্দ এল, 'রও-ও-ও'। উঠানের মধ্যে শুকনো ঘাসের বোঝাটা একবার খস্‌খস্‌ করে উঠলো, আর তার তলা থেকে জিম্মা কুত্তানী খড় আর ধুলোয় ঝাঁকড়া মাথাটা বের করে জুলজুল করে কুঁকড়োর দিকে চাইতে লাগলো।

কুঁকড়ো আর কুকুরের চেহারায় মিল না হলেও নামে-নামে যেমন কতকটা, কাজেও তেমনি অনেকটা মিল ছিল। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন দুজনেরই জীবনের ব্রত কাজেই দুজনে যে ভাব খুবই হবে, তার আশ্চর্য্য কি? তাছাড়া সূর্য্য আর মাটি দুয়েরই পরশ দুজনেরই ভালো লাগে। এই আকাশের আলো আর পৃথিবীর উপর ভালোবাসা এই দুটি জীবকে যেন একসূত্রে বেঁধেছে। সূর্য্যের দিকে মুখ করে মাটির কোলে দুই পা রেখে না দাঁড়ালে কুঁকড়োর গান মোটেই খোলে না, আর কুকুর তার আনন্দই হয় না—রোদে মাটির উপরে এক-একবার না গড়িয়ে নিলে। জিম্মা প্রায়ই বলে—"সূর্য্যকে ভালো-বাসে বোলেই না সে চাঁদ দেখলেই তাড়া করে যায়, আর মাটিকে ভালোবাসে বোলেই না সে গর্ত্ত খুঁড়ে তার মধ্যে মুখটি দিয়ে চুপটি করে থাকে।" ভালোবাসার বশে জিম্মা বাড়ীর বাগানটায় এত গর্ত্ত করে রাখতো যে এক-একদিন বুড়ো ভাগবৎ মালি কর্ত্তার কাছে কুকুরের নামে নালিশ জুড়তো। কিন্তু জিম্মার সব দোষ মাপ ছিল,- গোলাবাড়ীর সব জানোয়ারের খবরদারি, ক্ষেতে না গোরু বাছুর ঢোকে তার দিকে নজর রাখা, এমনি সব পাহারার কাজে জিম্মার মতো আর তো দুটি ছিল না তাছাড়া জিম্মার জিম্মায় অমন যে কুঁকড়ো এমন কি তাঁর অত্যাশ্চর্য্য সুরটি পর্য্যন্ত রাত্রে না রাখলে চলে না; কাজেই কুকুর হঠাৎ যখন বল্লে—'রও' তখন যে একটা বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেটা জানা গেল। কিন্তু এমন কি বিপদ হতে পারে? কুঁকড়ো দেখলেন, অন্যদিন যেমন, আজও সন্ধ্যাবেলা ঠিক তেমনি চারিদিক নিরাপদ বোধ হচ্ছে, অন্ততঃ তার এই গোলাবাড়ীর রাজত্বের বেড়ার মধ্যে কোনো যে শত্রু আছে, তাতো কিছুতেই মনে হয় না। সে যে মিছে ভয় পাচ্ছে, সেটা তিনি জিম্মাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা কল্লেন। ভয় কাকে বলে, কুকুরের জানা ছিল না; কিন্তু মিথ্যুক আর মিছে নিন্দে রটাতে গোলাবাড়ীতে আর পাড়াপড়সীর ঘরেতে যারা, তাদের সে ভালোরকমই জানতো। কুঁকড়ো না জানলেও ঐ বোঁচা-ঠোঁট চড়াই

আর ডিগ্‌ডিগে-পা ময়ূর যে কুঁকড়োর দুই প্রধান শত্রু, সেটা জিম্মা কুঁকড়োকে জানিয়ে দিতে বিলম্ব করলে না। তালচড়াই—যার নিজের কোনো আওয়াজ নেই, হরবোলার মতো পরের জিনিস নকল করেই চুল্‌বুল্‌ করে বেড়ায়, পরের ধনে পোদ্দারি যার পেশা,—আর এই ময়ূর—জরী-জরাবৎ আর হীরে-মাণিকের ঝক্‌মকানি ছাড়া আর-কোনো আলো যার ভিতরে-বাহিরে কোথাও নেই, দর্জ্জি আর জহুরীর দোকানের নমুনো-ঝোলাবার আল্‌না ছাড়া আর-কিছুই যাকে বলা যায় না, এই অদ্ভুত জানোয়ার তাঁর প্রধান শত্রু শুনে কুঁকড়ো একেবারে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। জিম্মা বল্লে—"কারো সঙ্গে খোলাখুলি শত্রুতা কর্‌বার সাহস আর ক্ষমতা না থাকলেও এরা সবাইকে হেয় মনে করে, এমন-কি কুঁকড়োর নিন্দেও সুবিধা বুঝে করতে ছাড়ে না। এবং খাওয়া-পরা সাজ-গোজের দিক দিয়েও এরা পাড়ার মধ্যে নানা সব .চাল ঢোকাচ্ছে। এদের দেখাদেখি অন্যেরাও বেয়াড়া বেচাল বে-আদব হয়ে ওঠবার জোগাড়ে আছে। সাদাসিধে ভাবে খেটে-খুটে পাড়াপড়সীকে ভালোবেসে আনন্দে থাকতে চায় যে-সব জীব, তাদের এই-সব সাজানো-পাখীরা বলে, 'ছা-পোষার' দল। আর নিষ্কর্ম্মা বসে-থাকা পালকের গদীতে কখ্যা মাথায় পালক গুঁজে হাওয়া খেয়ে ঘুরঘুর করাকেই এরা বলে চাল। সেটা রাখতে চালের সব খড় উড়ে গেলেও এরা নিজের বুদ্ধির প্রশংসা নিজেরাই করে থাকে, আর অনেক সুবুদ্ধি পাখীর মাথা ঘুরিয়ে দেয় দুর্ব্বুদ্ধি এই দুই অদ্ভুত জানোয়ার—কথা-সর্ব্বস্ব হরবোলা আর পাখা-সর্ব্বস্ব চালচিত্র!"

কুঁকড়ো কাজে যেমন দড়, বুদ্ধিতে তেমনি; চড়াই আর ময়ূরের চেয়ে অনেক বড়,—দিলদরিয়া, কাজেই পৃথিবীতে অন্ততঃ এই গোলাবাড়ীতে যে তাঁর কেউ গোপনে সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছে, এটা বিশ্বাস করা কুঁকড়োর পক্ষে শক্ত। তিনি বল্লেন—"জিম্মা নিশ্চয়ই একটু বাড়িয়ে বলছে, অন্যের সামান্য দোষকে সে এত যে বড় করে দেখছে, সে-কেবল তাঁকে সে খুবই ভালোবাসে বোলে। চড়াই হল তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু, আর ময়ূরটা লোকতো খুব মন্দ নয়! আর যদিই বা তাঁর শত্রু সবাই হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? তিনি তাঁর গান এবং মুরগীদের ভালোবাসা পেয়েই তো সুখী, নেই বা আর-কিছু থাকলো!"

জিম্মা অনেকদিন এই গোলাবাড়ীটায় রয়েছে, এখানকার কে যে কেমন, তা জানতে তার বাকী ছিল না। কুঁকড়োর উপরে মুরগীদেরও যে খুব টান নেই, তারও প্রমাণ অনেকবার পাওয়া গেছে। "বিশ্বাস কাউকে নেই।"—বলেই জিম্মা এম্‌নি এক হুঙ্কার ছাড়লো যে, পাঁচিলের গায়ে চড়াইপাখীর খাঁচাটা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো। "ব্যাপার কি?" বলে চড়াই কুঞ্জলতার মাচা বেয়ে নীচে উপস্থিত। জিম্মা চড়াইকে সাফ জবাব দেবার জন্যে চেপে ধরলে।—আড়ালে একরকম আর কুঁকড়োর সাম্‌নে অন্যরকম ভাব দেখানো আর চলছে না। বলুক সে-চড়াইটা সত্যিই কুঁকড়োকে পছন্দ করে কিনা, না হ'লে আজ আর ছাড়ান নেই। চড়াই মনে-মনে বিপদ গুন্‌লে। কিন্তু

কথায় তার কাছে পারবার জো নেই। সে অতি ভালোমানুষটির মতো উত্তর করলে —"কুঁকড়োকেও টুক্‌রো-টুক্‌রো করে দেখলে বাস্তবিকই আমার হাসি পায়; আর তার খুঁটিনাটি এটি-ওটি নিয়েই আমি তামাসা করে থাকি! কিন্তু সবখানা জুড়িয়ে দেখলে কুঁকড়োকে আমার শ্রদ্ধাই হয় বলতে হবে। শুধু তাই নয়, কুঁকড়োর খুঁটিনাটি নিয়ে আমি যে ঠাট্টা-তামাসাগুলো করে থাকি, সেগুলো সবাই যে অপছন্দ করে না, সে তো তুমিও জানো জিন্মা!"

জিন্মা ভারি বিরক্ত হয়ে বলে উঠল—"শোনো একবার, কথার ভাঁওরাটা শোনো! বাইরের বনে সোনার আলো, ফুলের মধু থাকতে যে-পাখীটা দরজা-ভাঙা খাঁচায় বসে বাসি ছাতু খেয়ে পেট ভরাচ্ছে, তার কাছে পরিস্কার জবাব আশা করাই ভুল।"

চড়াই বলে উঠলো—"সাধ করে কি আমি খাঁচায় বাসা বেঁধেছি? বাইরে সোনার আলো আর সোনালী মধু সময়ে-সময়ে যে সীসের গরম-গরম ছর্‌রা গুলি হয়ে দেখা দেয়, দিদি!"

জিন্মা ভারি চটেছিল, উত্তর কল্লে—"আরে মুখ্‌খু, কোন্‌দিন কবে একটা-আধটা কার্তুজের খোলা ঢেলার মতো ক্ষুরে লাগল বলে বনের হরিণ—সে কি কোনোদিন বনের থেকে তফাৎ থাকতে চায়, না, আকাশে বাজ আছে বলে কেউ আকাশের আলোটা আর আকাশে ওড়াটা অপছন্দ করে? ভাঙা খাঁচার পুষ্যিপুত্তুর—হরবোলা! ফুলে-ফলে আলোতে-ছায়ায় অতি-চমৎকার বনে-উপবনে যে মুক্তি, তুই তার কি বুঝবি!"

চড়াই উত্তর দিলে—"বেঁচে থাক্‌ আমার ভাঙা খাঁচার দাঁড়খানি! কাজ নেই আমার মুক্তিতে! রাজার হালে আছি, পরিস্কার কলের জল খাচ্ছি, মস্ত সাবান-দানিতে দুবেলা গরমের দিনে নাইতে পাচ্ছি, দোলনা চৌকি, চানের টব—বনে এ-সব পাই কোথা, বলতো দিদি!"

জিন্মা এমন রেগেছিল যে গলার শিকলিটা খোলা পেলে সে আজ চড়াইটার গায়ের একটি পালকও রাখতো না, মেরেই ফেলতো!

এই ব্যাপার হচ্ছে, এমন সময় বাড়ীর মধ্যে ঘড়ি বাজলো—পি-উ!

যেমন পিউ বলা, অম্‌নি খাকি-মুরগী ঝুড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে সেদিকে দৌড়! গর্ত্তের মধ্যে মুখ দিয়ে সে কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেনা; এবারও তার আশাপুরলোনা, সময় উৎরে গেছে, পিউ-পাখী পালিয়েছে!

চড়াই খাকিকে বল্লে—"কি দেখছো গো! এক-পহরের ঘড়ি পড়লো নাকি?"

কুঁকড়ো খাকিকে গোলাবাড়ীতে দে... অবাক হয়ে বল্লেন—"তুই যে চরতে যাস্‌নি?"

খাকি চম্‌কে-উঠে ঘাড় ফিরিয়ে ডানার ঘোম্‌টায় মুখ ঝাঁপলে।

কুঁকড়ো শুধোলেন—"গর্ত্তটার মধ্যে মুখ গুঁজড়ে হচ্ছিলো কি, শুনি?"

খাকি আম্‌তা-আম্‌তা করে বল্লে—"এই চোখ আর ঘাড়টা টন্‌টন্‌ করছিল—"

"কাকে দেখবার জন্যে?"—কুঁকড়ো শুধোলেন।

খাকি বল্লে—"কাকে আবার!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"হাঁ, শুনি, কাকে?"

থাকি কান্নার সুর ধরলে, "তুমি বল কি গো ?"

কুঁক্‌ড়ো ধমকে বল্লেন—"চোপরাও, সত্যি কথা বল্‌!"

থাকি বিনিয়ে-বিনিয়ে বল্লে, "পিউ পাখীকে।"

কুঁক্‌ড়ো থাকির দিক থেকে একেবারে মুখ ফেরালেন; থাকি আস্তে-আস্তে পগার-পাড়ে দৌড় দিলে।

কুঁক্‌ড়ো কুকুরকে বল্লেন—"একটা ঘড়িকে ভালোবাসা,—এমন তো কোথাও শুনিনি! এ বুদ্ধি থাকিকে দিলে কে, বলতো ?"

"ওই ছিটের মেরজাই-পরা চিনে-মুরগিটার কাজ!"—কুকুর উত্তর দিলে।

কুকড়ো শুধোলেন—"কোন্‌ মুরগিটি, বলতো ? ওই যেটা বুড়ো-বয়েসে ঠোটে আল্‌তা দিয়ে বেড়ায়,—সেইটে নাকি ?"

কুকুর উত্তর কল্লে—"হাঁ, হাঁ, সেই বটে! তিনি যে আবার সবাইকে বৈকালি পার্টি দিচ্ছেন!"

"কোথায় সেটা হচ্ছে ?"—কুকুড়ো শুধোলেন।

চড়াই উত্তর দিলে—"ওই কুল-গাছটার তলায়—যেখানে পাখী তাড়াবার জন্যে একটা খড়ের সাহেবী-কাপড়-পরা কুশোপুতুলের কাঠামো মালী খাড়া করে রেখেছে, সেই-খানে! খুব বাছা-বাছা নামজাদা পাখীরাই আজ যাবেন। কাঠামোর ভয়ে ছোটখাটো পাখীরা সেদিকে এগোতেই সাহস পাবেনা।"

কুঁক্‌ড়ো আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—"বল কি, চিনে-মুরগীর বৈকালি!"

চড়াই ঠিক তেম্‌নি সুরে উত্তর দিলে—"হাঁ মশায়, প্রতি সোমবার পাঁচ হইতে ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত মুরগী-গিন্নির ঘোরো মজ্‌লিস্‌ হইয়া থাকে।"

"তাহলে আজ বৈকালে—" কুঁকড়ো আরো কি শুধোতে যাচ্ছিলেন, চড়াই বলে উঠলো—"না, আজ ভোরবেলায়।"

"ভোরবেলায় বৈকালি তো কখনো শুনিনি হে!" কুঁক্‌ড়ো আশ্চর্য্য খুবই হলেন। চড়াই তখন কুঁক্‌ড়োকে বুঝিয়ে দিলেন—"ভোর পাঁচটায় বাগানে মালী তো থাকেনা, তাই বিকেল ৫টা না করে সকাল ৫টাই ঠিক হয়েছে।"

"এ কি বিপরীত কাণ্ড!"—বলে কুঁক্‌ড়ো হো-হো করে হেসে উঠলেন। চড়াই অম্‌নি বলে উঠলো—"বিপরীত বলে বিপরীত!" জিম্মা তাকে ধমকে বল্লে—"তোমার আর খোসামুদিতে কাজ নেই, তুমি নিজেতো কোনো সোমবারে পার্টিগুলো কামাই দাওনা, দেখি!"

চড়াই উত্তর কল্লে—"সত্যি যাই বটে, সবাই আমাকে খাতির করে কিনা!"

জিম্মা গজ্‌গজ্‌ করে খানিক কি বকে গেল। জিম্মা কি বক্‌ছে শুধোলে কুঁক্‌ড়োকে সে জবাব দিলে—"কোন্‌দিন হয়তো তোমাকেও কোন্‌-এক মুরগী এই পার্টিতে নিয়ে হাজির করেছে, দেখবো!"

কুঁক্‌ড়ো হেসে বল্লেন—"আমাকে হাজির করে দেবে, চা-পার্টিতে, কোনো এক মুরগী!"

জিম্মা বল্লে—"হাঁ মশায়, এম্‌নি হাজির করা নয়, মাথার ঝুঁটিটি ধরে টান্‌তে-টান্‌তে না হাজির করে!"

কুঁক্‌ড়ো একটু চটেই জিম্মাকে বল্লেন—"এ সন্দেহটা তোমার করবার কারণটি কি ?"

জিম্মা জবাব দিলে—"কারণ নতুন মুরগীর দেখা পেলে মশায়ের মাথা সহজেই ঘুরে যায় এখনো।"

চড়াই বলে উঠলো—"জিম্মা-দি ঠিক বলেছে—নতুন মুরগী যেমন দেখা, অম্‌নি কুঁক্‌ড়ো-মশায় এমনি করে ঘাড় বেঁকিয়ে-বেঁকিয়ে কুক্ কুক্ বলে নৃত্য করতে থাকেন, মুরগীটির চারিদিকে !" বলে চড়াইটা একবার কুঁক্‌ড়োর চলন-বলন হুবহু দেখিয়ে দিলে।

কুঁক্‌ড়ো হেসে বল্লেন—"আচ্ছা বেকুফ্ পাখী যাহোক্ !"

চড়াইটা তখনো ডানা কাঁপিয়ে লেজ দুলিয়ে কুঁক্‌ড়োর মতো তালে-তালে পা ফেলে মোরগ-মুরগীর নকল দেখাচ্ছে, ঠিক সেই সময় ওদিকে দুম্ করে বন্দুকের আওয়াজ হল। চড়াই অম্‌নি কাঠের পুতুলের মতো এক পা তুলেই দাঁড়িয়ে গেল। কুঁক্‌ড়ো গলা উঁচু করে আর কুকুর কান খাড়া করে নাক ফুলিয়ে শুন্‌তে লাগলো। আর-এক গুলির আওয়াজ ! চড়াইটা গিয়ে মুরগী-গিন্নির ভাঙা পেঁট্‌রার আড়ালে লুকিয়েছে, এমন সময় উক্ক-উ-উ-উ বলতে বলতে সোনার টোপর সোনালিয়া বন-মুরগী কুঞ্জলতার বেড়ার ওপার থেকে ঝপাং করে উড়ে এসে উঠোনের মধ্যে পড়লো।

কুকড়ো বলে উঠলেন—"এ কি ! এ কে ?—কে এ ?"

সোনালিয়া কুঁক্‌ড়োর কাছে ছুটে গিয়ে বল্লে—"পাহাড়-তলীর 'সা মোরগ' ! আপনি আমায় রক্ষে করুন।" আবার দুম্ করে আওয়াজ ! সোনালিয়া চম্‌কে উঠেই অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়লেন, পালাবার আর শক্তিই ছিলনা। কুঁক্‌ড়ো অম্‌নি একখানি ডানা বাড়িয়ে সোনালিয়াকে তুলে ধোরে আর-এক ডানার ঝাপ্‌টা দিয়ে গাম্‌লা থেকে জলের ছিটে আর বাতাস দিতে থাকলেন,—খুব আস্তে-আস্তে। তাঁর ভয় হাচ্ছলো পাছে পাতার সবুজ, ফুলের গোলাবী, সোনার জল আর সন্ধ্যাবেলার আলো দিয়ে গড়া বাসন্তী সাড়ি-পরা এই আশ্চর্য্য পাখীটি জল পেয়ে গলে যায়, কি বাতাসে মিলিয়ে যায় ! একটু চেতন পেয়ে সোনালিয়া আবার কুক্‌ড়োকে মিনতি করতে লাগলো—"ওগো একটু আমায় লুকোবার স্থান দাও, আমাকে পেলে তারা মেরেই ফেলবে !"

চড়াই সোনালিয়ার গায়ে টক্‌টকে লাল সাটিনের কাচুলী দেখে বল্লে—"এতখানি লালের উপর থেকে শিকারীর বন্দুকের তাগ কেমন করে যে ফস্‌কালো, তাই ভাবছি—"

সোনালিয়া বলে—"সাধে কি গুলি ফস্‌কেছে, চোখে যে তাদের ধাঁধাঁ লেগে গেল। তারা মনে করেছিল, ঝোপের মধ্যে থেকে ছাই-রঙের একটা তিতির-মিতির কেউ বার হবে, কিন্তু আমি সোনালী যখন হঠাৎ বেরিয়ে গেলুম—সাম্‌নে দিয়ে, তখন শিকারী দেখলে খানিক সোনার ঝল্‌কা, আর আমি দেখলেম একটা আগুনের হল্‌কা ! গুলি যে কোন্‌দিকে বেরিয়ে গেল, কে তা দেখবে ? কিন্তু ডালকুত্তোটা আমায় ঠিক তাড়া করে এল ! কুকুরগুলো কি বজ্জাত !"—এমন সময় জিম্মাকে দেখে—

"অন্য কুকুর নয়, ওই ডালকুত্তোগুলোর মতো বজ্জাত দেখিনি, বাপু!" এই বলে সোনালিয়া একটু লুকোবার স্থান দেখিয়ে দিতে কুঁক্‌ড়োকে বার-বার বল্‌তে লাগলো। কুঁক্‌ড়ো একটু মসিস্যায় পড়লেন। আগুনের ফুল্‌কি এই সোনালিয়া পাখী, একে কোন্ ছাই-গাদায় তিনি লুকোবেন? তিনি দু-একবার এ-কোণ ও-কোণ দেখে এখানটা-ওখানটা দেখে বল্লেন—"না, এঁকে আর রামধনুককে লুকোতে পারা কঠিন।"

জিম্মা বল্লে—"আমার ওই বাক্সটার মধ্যে লুকোতে পারা যেতে পারে, ইনি যদি রাজি হন।"

"ভালো কথা!"—বলেই সোনালী গিয়ে বাক্সে সেঁধোলেন, কিন্তু অনেকখানি সোনালি আঁচল বাক্সের বাইরে ছড়িয়ে রইলো, জিম্মা সেটুকু ঢেকে চেপে গম্ভীর হয়ে বসলো।

জিম্মা বেশ বাগিয়ে বসেছে, এমন সময় বেড়ার ওধার থেকে ঝোলা-কান গাল-ফুলো ডালকুত্তো 'তম্মা' উঁকি দিলেন। জিম্মা যেন দেখতেই পায়-নি এইভাবে রুটিই চিবোচ্ছে, তম্মা বল্লে—"উঃ, কিসের খোস্‌বো ছাড়চে?" জিম্মা সাম্‌নের থালাখানা দেখিয়ে বল্লে—"আজ একটু বন-মুরগীর ঝোল রাঁধা গেছে!"

ডালকুত্তো এবার পষ্ট করে শুধোলে—জিম্মা এদিকে একটা সোনালিয়া পাখীকে আস্‌তে দেখেছে কি না! কুঁক্‌ড়ো সে কথা চাপা দিয়ে বলে উঠলেন—"তম্মার মুখটা কেমন গোম্‌সা দেখাচ্ছে না, জিম্মা?"

জিম্মা ধীরে-সুস্থে উত্তর করলে—"একটা সোনালি টিয়ে মাঠের উপর দিয়ে উড়ে গেল দেখিছি, ঐ ওদিকে—" তম্মাটা আকাশে নাক তুলে কেবলি শুঁকতে লেগেছে,—বনমুরগীর গন্ধটা সত্যিই জিম্মার থালা থেকে আসছে কি না! কুঁক্‌ড়োর বুকের ভিতরটা বেশ একটুখানি গুরগুর করছে, এমন সময় দূর থেকে শিকারী সিটি দিয়ে তম্মাকে ডাক দিলে। তম্মা চল্লো দেখে কুঁক্‌ড়ো আর জিম্মা "রাম বল" বলে হাঁফ ছাড়তেই চড়াইটা ডাক দিলে—"বলি তম্মা।"

"কর কি?"—বলে কুঁকড়ো তাকে এক ধমক দিলেন, কিন্তু চড়াইটা আরো চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"বলি, ও তম্মা!" তম্মার গোম্‌সা মুখটা আবার বেড়ার উপর দিয়ে উঁকি দিলে। কুঁক্‌ড়ো রেগে ফুলতে লাগলেন, চড়াই তম্মাকে বল্লে—"খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তারি।"

তম্মা শুধোলে—"কি খুঁজে দেখি, বলতো ভাই?"

"চট্‌পট্ তোমার ফোঁগলা গালের চিড়-খাওয়া দাঁতটি!" বলেই চড়াই সট্ করে নিজের খাঁচায় ঢুকলো; 'চোপরাও' বলেই তম্মা সে তল্লাট ছেড়ে চোঁচা চম্পট!

ক্রমশঃ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেদমাতা

বেদে সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মের বীজাবস্থা

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলংহি।" মনু ॥

হিন্দুর বেদমাতাকে কেন বিশ্বমানবের বেদমাতা বলা যাইবে? এজন্য জগতে আজ পর্য্যন্ত যত রকম উচ্চস্তরের ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, বীজের ভিতরের বৃক্ষের ন্যায়, সে সমস্তেরই পূর্ব্বাভাস আমরা বেদের ভিতরে লাভ করিতেছি। যতই বেদের আলোচনা করিব, সাক্ষাৎভাবে বেদমাতার স্তন্য পান করিব, ততই দেখিতে পাইব যে শ্রীমদ্ভাগবতে নারদের নিকট ভগবানের প্রকাশের ন্যায়, "সকৃৎ যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তে নঘ," মানব-জাতিকেও যেন, ভগবান্ তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিবার জন্যই, বৈদিক ঋষির মধ্য দিয়া, মানব-জাতির শৈশবেই, মানব-শিশুর নিকটে আপনার পূর্ণস্বরূপের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়াছিলেন। আবার মানব ব্যক্তি-সম্বন্ধে যেরূপ, মানব জাতি-সম্বন্ধেও সেইরূপ—"অবিপককষায়ানাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাং।" যত দিন না "অশ্ব ইব রোমানি বিধূয় পাপং, চন্দ্রইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য" (ছান্দোগ্য)—মানবজাতি যতদিন না হিংসা-অভিমান এবং লোভ হইতে মুক্ত হইতেছে, ততদিন মানব-জাতির ভিতরেও বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রকাশ হইতে পারে না,—প্রকৃত বিশ্বপ্রেমের আন্তর্জাতিক সম্মিলন—"League of Nations"—হইতে পারে না। বেদের আলোকে যখন জগতের ধর্ম্ম-প্রবাহ-সকলের গতি আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করি, তখন আমাদের সিদ্ধান্ত হেগেলীয় ন্যায়ের ছাঁচে—(Hegelian dialectics) ঢালিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়,—যে বেদে পূর্ণধর্ম্মের বীজাবস্থা বা Thesis নিহিত আছে। ধর্ম্ম-প্রবাহের এই প্রথম সোপানে, ভ্রূণের ন্যায় অস্ফুট অবস্থায় (Implicit), ধর্ম্মের সকল অঙ্গই বেদে দৃষ্ট হয়। কালে কালে এবং দেশে দেশে সেই ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়া বিরোধের ভিতর দিয়া (Antithesis), এক-একটী অঙ্গ বিকাশ করিয়াছে (Explicit)। তাহাই দ্বিতীয় সোপান। পরিশেষে এই বিংশ শতাব্দীতে জগৎ তাহার ধর্ম্মাঙ্গের বিকাশের যেন এক নূতন স্তরে নূতন সোপানে আরোহণ করিতেছে। সে স্তর সমন্বয়ের স্তর (Synthesis)। হিন্দুর বেদমাতা আদিতেই এই অন্ত্যস্তরেরও আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন:—"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্তু তে মনো যথা বঃ সুসহাসতি" ॥ (ঋ ১০-১৯১-৪) "হে জনগণ, তোমাদের সঙ্কল্প এক হউক, তোমাদের হৃদয় সকল এক হউক, তোমাদের মনের গতি এক হউক, যেন তোমাদের সমিতি সকল সুফলপ্রদ হয়।" এজন্য বলিতেছি, হিন্দুর বেদমাতা মানবজাতির বেদমাতা। "বেদের বিচিত্র শক্তিযুক্ত, অগ্নিদেব সর্ব্বব্যাপী এবং সকল মানুষের সমান হিতকারী—"চিত্রং বিভুং বিশে বিশে" (যজুর্ব্বেদ ৩-১৫), এজন্য বলিতেছি হিন্দুর বেদমাতা মানব জাতির বেদমাতা।

এজন্য বলিতেছি, হিন্দুর বেদমাতা বিশ্বমানবের বেদমাতা, যে বেদই সেই "কল্যাণী বাক্" যাহা ভগবান "সকল মানবের কল্যাণের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন"—"ইমাং বাচং কল্যাণী মা বদানি জনেভ্যঃ" (যজুর্ব্বেদ ২৬-২)। কেহ মনে করিবেন না যে আমরা বেদকে "অভ্রান্ত" বলিতেছি। সকল সত্যই ঈশ্বর-প্রেরিত "বস্তুতন্ত্র" সত্য (Objective reality), এবং এই অর্থে—"অপৌরুষেয়", অর্থাৎ "পুরুষতন্ত্র" বা পুরুষবুদ্ধির অধীন "নয়। এই অর্থে বেদেরও প্রকাশিত সত্য সকল অপৌরুষেয়—"কর্ত্তুং অকর্ত্তুং অন্যথা বা কর্ত্তুং অশক্যং কেবলং বস্তুতন্ত্রমেব" (সূ-ভা ১-১ ৪) এজন্য সাধারণভাবে বেদকে "অপৌরুষেয়" বলিলেও দোষ হয় না। কিন্তু অপৌরুষেয়ই হউক, আর যাহাই হউক, যাহা মানুষের অন্তরে প্রেরিত, মানুষের মধ্য দিয়া আমাদের হস্তগত. এবং সেহ পরিমাণে, যাহা কিছু অন্ততঃ কতক পরিমাণে পুরুষতন্ত্র, (Subjective only) তাহাকে যদি আমি "অভ্রান্ত" বলি, তবে হয় আমি মূর্খ, না হয় আমি কপট ("either a fool or a knave")।

অপর সকল মানবীয় ব্যাপারের ন্যায় বেদেও অনেক ভ্রম-প্রমাদ আছে সত্য, এবং যাঁহার ইচ্ছা হয় তিনি তাহার চর্চ্চা করুন। ধর্ম্মার্থীর তাহাতে ফললাভের আশা অল্প। মাতার দোষ উদ্‌ঘাটনে সন্তানের গৌরব-বৃদ্ধির কোন আশা নাই। যাহা-কিছু দেশ-কালের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয়, যাহা-কিছু মানুষের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি বা বুদ্ধির অধীন, বা পৌরুষেয় বা পুরুষতন্ত্র, বেদেই হউক, আর বাইবেলেই হউক, অথবা কোরাণেই হউক, তাহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যাহা-কিছু বস্তুতন্ত্র, অপৌরুষেয়, ভাগবতী, নিত্য, এবং অপরিবর্ত্তনীয় সত্য, তাহাই আমাদের মাতৃস্তন্য স্বরূপ আদরণীয়, এবং বেদেই হউক, বাইবেলেই হউক, অথবা কোরাণেই হউক, তাহাই জীবাত্মার জীবনের অন্নজলস্বরূপ। সর্ব্বত্র তাহাই ধর্ম্মবিচারের 'মানদণ্ড' বা মাপকাটি হওয়া উচিত। আমরাও সেই মাপকাটির দ্বারা, নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের নিক্তি-দ্বারাই আমাদের বেদমাতার বিচার করিব।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা বেদ-সম্বন্ধে কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান রাখেন না,—অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, সমস্ত বঙ্গবাসীই প্রায় সেই শ্রেণীভুক্ত,—তাঁহারা হয়ত কল্পনা করেন, যে বৈদিক সময়ের লোক মাত্রেই যোগীঋষি ছিলেন—"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ" অথবা আমাদের মত গুণধর "সংশয়াত্মা" তখন কেহ ছিল না। আবার অনেক বেদাচার্য্য বেদের ভিতরে—যুদ্ধকালে "স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদা" "শত্রু দমনে তোমাদের আয়ুধ সকল স্থির এবং দৃঢ় হউক," ইত্যাদি বৈদিক ঋষির প্রার্থনা-বাক্যের ভিতরে 'শতঘ্নী (তোপ)' 'ভুশুণ্ডী (বন্দুক), দেখিয়া থাকেন, * অশ্বিগণের ত্রিচক্ররথের মধ্যে "অর্বাঙ্ ত্রিচক্রো মধুবাহনো রথঃ"

* "বজ্রং ঘনা দধীমহি (ঋ ১-৯-৩) স্বামী দয়ানন্দ এই বেদবাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন— "(বজ্রং) শত্রুনাং বলচ্ছেদকং আগ্নেয়াদিশস্ত্রাস্ত্র-সমূহং (ঘনা) শতঘ্নী-ভুশুণ্ড্যসিচাপবানাদীনি দৃঢ়ানি যুদ্ধ সাধনানি গৃহ্ণীমঃ"।

(ঋ ১-১৫৭-৩) "সাইকল" (cycle), এমন কি "পুষ্পক" (air-ship) রথও দেখিয়া থাকেন। আবার আমরাও, বেদ যখন ইন্দ্রকে বলেন, "বধৈরুগ্রেভিরীয়সে অপুরুষঘ্ন অপ্রতীত শূর" (ঋ ১-১৩৩-৬) "হে মহা-শক্তিমান, তুমি সর্ব্বত্র উগ্র শাসন-দণ্ড পরিচালন কর, কেহ তোমার প্রতিকূলে দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু তুমি পুরুষত্বশালী বীরকে নষ্ট কর না", আমরাও তাহার ভিতরে ক্রমবিকাশবাদের এক নবতর উচ্চতম কল্যাণতর স্তর * দেখিতে পাই,—পাশব বলের জয় নয়, পাশব যোগ্যতার জয় নয়, কিন্তু প্রকৃত পুরুষত্বের বীরত্বের জয় দেখিতে পাই, এক "নবতর কল্যাণতর' শ্রেণীর মহামানুষের "Superman"এর আভাস পাই ; অথবা বেদ যখন ত্বষ্টা সম্বন্ধে বলেন, "ত্বষ্টা রূপানি হি প্রভুঃ পশূন্ বিশ্বান্ সমানজে" (১-১৮৮-৯) "ত্বষ্টা গর্ভস্থ ভ্রূণের রূপেরও প্রভু হইয়া, রেতঃ (germ-plasm) হইতে সমস্ত প্রাণীর রূপ-সকল ব্যক্ত করেন" আমরা তাহার ভিতরে বীজের "স্বতঃপ্রবৃত্ত রূপান্তর" ("Spontaneous variation" of the germ) অপেক্ষাও এক উচ্চস্তরের মেণ্ডেলিজম (Mendelism) এবং মিউ-টেশনবাদ (Mutation) দেখিতে পাই।† ডি ব্রাইজের (De Vries) বিবর্ত্ত (Mutation) বাদের তুলনায় বেদের ভিতরে আমরা তাহা হইতেও এক উন্নত স্তরের বিবর্ত্তবাদ দেখিতে পাই। বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী-বিদ্যার ভাষায় আমাদের বৈদিক বিবর্ত্তবাদকে "Mutation Theory" এইরূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়—"যঃ রেতসি (Germ-plasm) তিষ্ঠন্ রেতসো-ঽন্তরো, যং রেতো ন বেদ, যস্য রেতঃ শরীরং, যঃ রেতসোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্য মৃতঃ" (বৃ ৩-৭-৩)—"যিনি শুক্র শোণিতে আছেন, শুক্র-শোণিতের অন্তরস্থ শুক্র-শোণিত যাঁহাকে জানে না, শুক্র-শোণিত যাঁহার শরীর, যিনি শুক্র-শোণিতের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে ইচ্ছামত রূপান্তরিত করেন, তিনিই তোমারও অন্তর্য্যামী আত্মা। তিনি মরণ রহিত।" এ-সকল পর্য্যালোচনা করিয়া মনের আবেগে বেদ-সম্বন্ধে আমাদের৺ বলিতে ইচ্ছা হয়—"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি তন্ন কুত্রচিৎ।" কিন্তু অনুরাগে অন্ধ হওয়া মার্জ্জনীয় হইতে পারে,—সমীচীন হইতে পারে না। চক্ষু খুলিয়াই আমাদিগকে বেদেরও বিচার করিতে হইবে।

"নসত্যাদ্বিদ্যতে পরং"। সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে, বেদের সময়েও অনেক অজ্ঞানী,—তোমার আমার মত অজ্ঞানী, তাস পাসা-নিরত সুরাপায়ী অজ্ঞানী অনেক ছিল,—"সুরামন্যুর্বিভীদকো অচিত্তিঃ" (ঋগ্বেদ ৭-৮৬-৬), 'সুরা-ক্রোধ এবং অক্ষাদিজনিত অজ্ঞানতা' বৈদিক সময়েও ছিল। সে সকলকে লক্ষ্য করিয়াই দীর্ঘতমা ঋষি বলিতেছেন :—

"যস্তন্ন বেদ কিংঋচা করিষ্যতি" (১-১৬৪-১৩৯),—"ঋক্-প্রতিপাদ্য পরম আকাশে

* Survival, not of the strongest or fittest, but of the manliest.

† "The germ-plasm is both spontaneously variable and highly resistant to the direct action of the environment." Dr Ried

অবস্থিত অক্ষর পুরুষকে ("ঋচো অক্ষরে-পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ") যে না জানে, ঋক্ দ্বারা তাহার কি ফল লাভ হইবে? বেদের সময়েও উদরপরায়ণ পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী অনেক অজ্ঞানী লোক ইতস্ততঃ বিচরণ করিত,—"নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাস-শ্চরন্তি" (ঋগ্বেদ ১০-৮২-৭)। অগস্ত্য ঋষি "দক্ষিণার" প্রসারের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন: "পৃণতো ন দক্ষিণা পৃথুজ্রয়ী"—এবং সায়ন তাহার অর্থ করিতেছেন—"পৃণতো দাতুর্ধনিকস্য দক্ষিণেব সমৃদ্ধকারী শীঘ্রগামিনী" (১-১৬৮-৭), ধনবান্ দাতার দক্ষিণার ন্যায় সমৃদ্ধকারী এবং শীঘ্রগামী। শোভরি ঋষি রাজা চিত্রের নিকট দান পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া দাতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—"সহস্রম-যুতোদদৎ" (৮-২১-১৮)। বশ ঋষি রাজা কণীতের নিকট হইতে সহস্র সহস্র অশ্ব, উষ্ট্র, গো, রথ ("রথংহিরণ্যয়ং") এবং সেই সঙ্গে একটি রাজপ্রদত্তা সুন্দরী স্ত্রী—"যোষণাঃ মহী" (৮-৪৬-৩৩)—পাইয়া কত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন কি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই দেখা যায়, ঋষি কক্ষীবান্ দক্ষিণার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, "দক্ষিণাবতামিদিমানি চিত্রা দক্ষিণাবতাং দিবি সূর্য্যাসঃ" (১-১২৫-৬) "দক্ষিণাদাতা-দিগের জন্য এই সকল বিচিত্র ভোগ্যবস্তু। স্বর্গস্থ সূর্য্যাদিলোকও তাহাদেরই জন্য"। তিনি আহ্লাদের সহিত তাঁহার প্রাপ্ত দক্ষিণার তালিকাও প্রদান করিতেছেন "শতং রাজ্ঞো নাধমানস্য নিষ্কান্, শতমশ্বান্, শতং গোনাং বধূমন্তো দশরথাসো" ইত্যাদি "সেই দানশীল রাজার প্রদত্ত শত নিষ্ক (স্বর্ণালঙ্কার বিশেষ), শত অশ্ব, শত গো, এবং বধূযুক্ত দশখানি রথ ইত্যাদি" মুখে ভগবান্ বলিতেছেন—"ধর্ম্মবিরুদ্ধঃ কামোঽস্মি"। বৈদিক ঋষিগণও যে একালের ন্যায় "ধর্ম্মবিরুদ্ধ" বিষয়ভোগে বীতস্পৃহ ছিলেন না,—লোপামুদ্রা-অগস্ত্যের সূক্তটিই (১-১৭৯) তাহার প্রমাণ। ঋষি দীর্ঘতমা যেন সক্রেটিসের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন নাই,—তাই বলিতেছেন, "অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি, বিদ্মনে অবিদ্বান্" (১-১৬৪-৬)। "আমি অজ্ঞানী, তাই যাহারা বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই কবিগণকে জিজ্ঞাসা করি।" কেহ মনে করিবেন না যে আজকালের ন্যায় বৈদিক সময়েও শ্রদ্ধাহীন সংশয়াত্মা লোকের অভাব ছিল। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই আমরা দেখিতে পাই, কুৎস ঋষি লোক-সকলকে ইন্দ্রের বীর্য্যে শ্রদ্ধা করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন,—"শ্রৎ ইন্দ্রস্য ধত্তন বীর্য্যায়" (ঋগ্বেদ ১-১০৩-৫) দ্বিতীয় মণ্ডলে গৃৎসমদ ঋষি বলিতেছেন:—"সেই শত্রুসংহারক ইন্দ্রকে না দেখিয়া—("অপশ্যন্তো জনা"—সায়ণ) লোকে তাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছে, কোথায় তিনি? তাহারা বলে, "তিনি নাই"—"যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহসেতি ঘোরমুতেমাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনং" (২-১২-৫)। ষষ্ঠ মণ্ডলে ঋষি ভরদ্বাজ (সায়ণ বলিতেছেন অনেক স্তব করিয়াও ইন্দ্রকে না দেখিতে পাইয়া—"ইন্দ্রং যদা-নাত্রাক্ষীৎ তদা তস্য বীর্য্যসদ্ভাবে বিচিকিৎ-

সমানঃ”) তাঁহার বীর্য্য সম্ভাবে সন্দিহান হইয়া বলিতেছেন; “হে ইন্দ্র, আমাদের কথিত সামর্থ্য কি তোমার আছে, না নাই”— “অস্তি স্বিৎ নু বীর্য্যংতত্তে ইন্দ্র ন স্বিদস্তি” (৬-১৮-৩)।

এ-সকল সত্ত্বেও আমরা বলিতেছি, “বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলংহি।” সর্ব্বাঙ্গীন সত্য ধর্ম্মের বীজাঙ্কুর বেদেতেই প্রথম দৃষ্ট হয়। আমরা কপট বা মেকি ধর্ম্মের কথা বলিতেছি না, এবং বেদেও যে “মেকি” ধর্ম্ম ছিল, যজ্ঞ-দক্ষিণার বাহাড়ম্বরই তাহার প্রমাণ। আধুনিক জগতের প্রচলিত ধর্ম্ম-সকলের নিক্তি দ্বারা, “Critical philosophy” দ্বারা বেদকে পরীক্ষা করিয়া লও, টাকার ন্যায় বেদকে বাজাইয়া লও, মনু যে ধর্ম্ম-নিক্তির কথা বলিতেছেন, “হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মঃ” (২-১), তাহা দ্বারা বেদমাতাকে পরীক্ষা করিয়া লও, তোমার হৃদয়ও মনুবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিবে, “বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলংহি।”

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

ব্যাকরণ-বিভ্রাট

(নাটিকা)

পঞ্চম দৃশ্য

ঘনশ্যাম; তাহার একহাতে একটি বড় ফোটা ফুলকপি ও অপর হাতে একটি বিট-পালং ও প্রকাণ্ড একটি পালংশাকের গোড়া।

ঘনশ্যাম। যাক্, মধু সর্দ্দারকে তো একরকম করে ঠাণ্ডা করা গিয়েছে—গিয়ে বল্লুম,—সর্দ্দার খুড়ো, তোমার ক্ষেত থেকে ফুলকপি একটা না দিলেই নয়। দেখেছো তো মহকুমায়—মিনাবাজারের মেলায় কেমন সব ফলমূল সাজিয়ে রেখেছিল—তোমার কপি তেম্নি করে বৈঠকখানায় সাজিয়ে রেখে দেব। ও যে একটা পাঁচজনকে দেখাবার জিনিস!—মধুর অম্নি একগাল হাসি! তাড়াতাড়ি প্রকাণ্ড মাটির চাপড়াশুদ্ধ এই কপিটা তুলে দিলে। তারই ঠিক পাশের ক্ষেতে দেখি, একজন বড় বড় গোড়াওয়ালা পালংশাকের সঙ্গে গোটা কয়েক বিটপালং লাগিয়েছে—আমাকে এই পাঁচ-সেরী কপিটা তুলে বগলদাবা কর্ত্তে দেখে সে মুখ টিপে হাস্‌তে লাগ্‌লো, আমিও ছাড়্‌বার পাত্র নই—বল্লুম, মুরুব্বি, দেখ্‌চো কি, তোমার ওই বোম্বাই বিট আর জাহাজী পালং-এর এক-একটা নমুনা না নিয়ে ছাড়চি না—কপির পাশে সাজিয়ে রাখ্‌লে মানাবে ভালো! চাষা-ভুষো ইতর-সাধারণকে মিষ্টি কথা না বল্‌লে চলে না—তাদের সঙ্গে ঠিক ব্যবহারটি কর্ত্তে জানা চাই। (কপি ও বিট পালং প্রভৃতি মাটিতে রাখিয়া) আপদগুলো ভারীও তো কম নয়। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে রামা—

রামা। (প্রথম ঘরটির ডান দিকের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে করিতে) আজ্ঞে কর্ত্তা—

ঘন। এ ক'টা নিয়ে যাতো। পালংটার চচ্চড়ি করতে বলিস, আর এই কপি আর বিটটা ডালনায় দেয় যেন—এ বেলা যদি রান্না না হয় তা হলে কপিটা ফুলগাছের খালি টবটার উপর বসিয়ে রেখে দিস্।

রামা। (মাঝের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে) কর্ত্তা দেখ্‌ছি এখন নিজে-নিজেই বাজার করা সুরু করচে—শেষে দস্তুরিটাও গেল।

ঘন। (জনান্তিকে) কপিটা বয়ে আন্‌তে আন্‌তে কেবল পশুপতির কথাগুলোই ভাবছিলুম। কে বল্‌তে পারে, কার অদৃষ্টে কি আছে! হয়তো কোন্‌দিন প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট—জেলা বোর্ডের চেয়ার-ম্যান সবই হতে পারি—তারপর ভাগ্যে যদি থাকে তা হলে লাটসভার সভ্য—বড় লাটের খাস-মজলিশের সদস্য, ও কিছুই হওয়া আট্‌কাবে না। কে জানে? দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বিষন্ন ভাবে) - না, আমার এ পোড়া অদৃষ্টে এ সব নেই। দু পয়সা আছে—সমাজে প্রতিপত্তিও আছে—লোকে খাতিরও করে যথেষ্ট, সবই মানি, কিন্তু এক বিন্দু গোরোচনা পড়েই যে সব দুধটা মাটি করেছে। কি ইংরিজী কি বাংলা কোনটাই আদপে যে আমি লিখ্‌তে পারিনা। বানান আর ব্যাকরণের সূত্র-নিয়ম আমার ত কিছুতেই মনে থাকে না। ইংরিজী না হয় ছেড়েই দি, কিন্তু কি বিদ্‌ঘুটেই করেছে বাংলা ভাষাটাকে—সে কালে লোকে যাহোক একরকম করে কেটে যার হতো, এখন বাংলা না জানলে বি, এ, পরীক্ষাও পাশ করা যায় না, শুনি। এখন হলো সবই বাংলা নিয়ে কাণ্ড, খবরের কাগজে, মাসিক পত্রিকায় বাংলায় প্রবন্ধ লিখ্‌তে হবে, বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হবে—তা বাংলা লিখ্‌তে হলেই তো আমার মাথা ঘুরে যায়। (চকিতভাবে চারিদিকে চাহিয়া) আর লিখ্‌বই বা কোত্থেকে—হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ঈ, তালব্য-শ, দন্ত্য-স মূর্দ্ধণ্য ষ বাবা, সবগুলোই যে গোলমেলে! তারপর ণত্ব-বিধান ষত্ব-বিধান ও তোমার সমাস-সন্ধি, কত রকম হাঙ্গাম যে ঢুকে আছে ভাষাটার মধ্যে, -মাথা গুলিয়ে যায়! তারপর ঐ সূত্রটূত্র—না! অসম্ভব! এ সব কি করেই বা মানুষ মনে রাখে? কাজেই বা বাগায় কি করে। যদি এক আধ জায়গায় হয় ত নয় কালী ফেলে ধ্যাবড়া থোবড়া করে সারা যায়—লোকে না হয় মনে কর্‌লে—কলমটা ভাল করে ঝেড়ে লিখিনি। কিন্তু আগাগোড়াই কালী ঢাল্‌তে হলে আর চলে কি করে? বক্তৃতা দেবার সময় এ সব হাঙ্গাম পোহাতে হয় না—একরকম করে সাদা কথায় আসল বিষয়টা গুছিয়ে বল্‌লেই চলে। সন্ধি-সমাসে বাঁধা বড় বড় কথা লাগাতে গেলে পাড়াগেঁয়ে লোক চটেই যায়, মনে করে, তাদের কাছে বিদ্যে জাহির করা হচ্ছে। জমাখরচ হিসেব-পত্র এগুলো যে কি করে এত তাড়াতাড়ি শিখেছিলুম, তা তো ভেবেই পাই না। অঙ্ক-টঙ্ক কস্‌তে ত আটকায় না, যা গোলমাল ঐ লিখতেই। ইস্কুল ছেড়েই সেগুন কাঠের ব্যবসায় লেগে গেলুম—রোজ

খাতা রেখেছি, একদিনও একটি ভুল হয় নি। এই যে সভা-সমিতিতে এত প্রবন্ধ পাড়— এ অঞ্চলের লোক ও হাঁ করেই তা শোনে, বিদ্বান বলে একটা নামও বেরিয়েছে— কিন্তু সে সব কার গুণে? বাড়ীতে আমার মা সরস্বতী যদি না থাকতেন, তা হলেই তো সব ফক্কে ছিল।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ঘনশ্যাম, হেমাঙ্গিনী।

হেমাঙ্গিনী। বাবা কোথায় গেলেন?

ঘন। এই যে মা! মা আমার সরস্বতী,— এই বুড়ো ছেলের তত্ত্ব না নিয়ে থাকতে পারেন না।

হেমা। (ঘনশ্যামকে কতকগুলি লেখা কাগজ দিয়া) কাল যে আপনাকে কৃষি মহাসভায় প্রবন্ধ পড়তে হবে—তা বুঝি ভুলে গেছেন? বাঃ! আপনাকে এগুলো দেখাবার জন্যে এ-ঘর ও-ঘর করে তখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ঘন। শুনেছিস্ মা—আমাকে এবারও সভাপতি করেছে—তা প্রবন্ধটা ভাল করে দেখা হয়েছে তো?

হেমা। আপনি কিযে বলেন—তার ঠিক নেই! আমার তো ভারী বিদ্যে—শুধু নকল করে দি—বইতো না।

ঘন। (মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া) আশীর্ব্বাদ করি, রাজরাণী হও—তা তোমার এ বুড়ো বাপের হিজিবিজিগুলো অন্যবারের মতই নকল করে দিয়েছো তো? মা, তুই আমার চোখের মণি—তুই একদণ্ড না থাকলে (প্রবন্ধের ভাঁজ) কেমন? গোড়াটা কেমন লাগলো বল্ দেখি?

হেমা। বেশ হয়েছে, বাবা।

ঘন। (পড়িতে আরম্ভ করিলেন) বন্ধুবর্গ ও সভা মহোদয়গণ, মনুষ্য জাতিকে জীবন-ধারণের জন্য সংসারক্ষেত্রে যে সকল বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, তাহার কোনটিই কৃষির সহিত তুলনিয় নহে। যেদিন আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ—'কেমন মা, 'তুলনীয়' 'ন' এ দীর্ঘ-ঈকার হবে তো।

হেমা। নিশ্চয়।

ঘন। বেঁচে থাক মা—আমি ভুল করে হ্রস্ব 'ই' দিয়ে ফেলেছিলুম। (পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন)—"আর্য্য পূর্ব্ব পুরুষগণ হস্তে হল ধারণ করিয়া—উদাত্তস্বরে সামগান করিতে করিতে দেবগণের লীলা নিকেতন এই ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, একবার সেই শুভদিনের কথা স্মরণ করুন! দেশের প্রকৃত সম্পদ-বিষয়ে উদাসীন এমন কোন্ হীন-প্রাণ ব্যক্তি আছে, যার সঙ্কীর্ণ হৃদয় হলচালনা-দর্শনে আনন্দে স্পন্দিত হয় না?"—ভাল কথা মা! 'স্পন্দিত' দন্ত্য 'স' য়ে 'প' য়ে—না, মূর্দ্ধণ্য 'ষ' য়ে 'প' য়ে? কি হবে? বোধ হয় দন্ত্য স—হবে, কেমন?

হেমা। হ্যাঁ বাবা।

ঘন। (পুনরায় কন্যার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া) সুখে থাক—আমার মাথার চুল যত, তত তোমার পরমাই হোক। কোথায় 'ষ' হবে, কোথায় 'স' হবে মনে হয় যেন কত সোজা, কিন্তু কিছুতেই তো স্মরণ করে রাখতে পারি না। (পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন)—'জাতীয় দারিদ্র্য

দূর করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ"—'ক্ষণ' দন্ত্য ন', না, মূর্দ্ধণ্য 'ণ' ?

হেমা। (হঠাৎ বাধা দিয়া) বাবা—বাটুকেমাবিধ সিদ্ধান্তরত্ন মশায় এসেছেন—আপনাকে কেউ কি বলে নি ?

ঘন। কে ? মাণিকলাল সিদ্ধান্তরত্ন ? হ্যা একজন পণ্ডিত লোক বটে! তা ভদ্রলোককে কোথায় বসিয়ে রেখে'ছস্ ? (ইতিমধ্যে সিদ্ধান্তরত্ন স্বয়ং তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।)

সপ্তম দৃশ্য

ঘন। (সিদ্ধান্তরত্নের হাত ধরিয়া) কি শুভদিন আজ। এতকাল পরে গরীব বন্ধুকে মনে পড়েছে ?

সিদ্ধান্ত। পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক অনুসন্ধান করবো বলে অনেকদিন থেকেই আপনাদের এ অঞ্চলে আসবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু করি কি, একলা মানুষ, অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও ঘটে ওঠে না।

ঘন। আপনি তো কেবল ঐ সব নিয়েই আছেন। যেখানকার যত টুকরো-টাকরা ভাঙ্গা চোরা জিনিস। ওগুলো কি এখনও ভাল লাগে ?

সিদ্ধান্ত। ও সব চিরদিনই সমান আদরের। (চারিদিকে চাহিয়া) তা আপনার সঙ্গে বিশেষ একটা প্রয়োজনীয় কথা আছে।

হেম। (স্বগত) এই—এইবার বুঝি বুড়ো বিয়ের কথাটা পেড়ে বসলো। (প্রকাশ্যে) বাবা, তা হলে আমি একটু বাড়ীর ভিতর কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখে আসি। (সিদ্ধান্তরত্নের প্রতি) জ্যাঠা মশায়, আপনাকে কিন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যেতে দিচ্ছিনা—

সিদ্ধান্ত। আগে থেকেই ত মা কোন কথা দিতে পারছিনা। তোমাদের দেশে মাটী খুঁড়ে কোথাও যদি সেরকম কিছু আবিষ্কার করতে পারি, তা হলে দু'চারদিন দেরী কর্ত্তেই হবে।

হেম। আপনি নিশ্চয়ই কিছু পাবেন—আমার তো খুব মনে লাগছে।

(ডান দিকের ঘরের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া গেল)

অষ্টম দৃশ্য

ঘন। কেমন, আমার মা-লক্ষ্মীকে দেখলেন তো! আজকালকার লেখা-পড়া জানা মেয়েদের মধ্যে অমন ঠাণ্ডা আপনি বেশী দেখতে পাবেন না।

সিদ্ধান্ত। খাসা মেয়ে। যেমন নরম-সরম, তেমনি মিষ্টি কথাবার্ত্তা!—তা আমাদের আরও কথা সব মিটে যাক, তারপর আমার সেই জরুরী খবরটা শুনিয়ে দেব, এখন।

ঘন। কি, কোন বিশেষ সংবাদ আছে নাকি ?

সিদ্ধান্ত। আছে বৈকি! আপনি আমার প্রস্তাব-মত আমাদের শাখা-প্রত্ন-সঙ্গতের সহায়ক সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন। আপনার এ অঞ্চলের পুরাতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যা-কিছু সংবাদ সব আপনাকে পত্র দ্বারা জানাতে হবে।

ঘন। কি সর্ব্বনাশ! আমাকে আবার ওর মধ্যে টানছেন্। যে-রকম দেখছি—

পণ্ডিতদের দলে ঢুকিয়ে আমাকেও একটা পণ্ডিত না বানিয়ে ছাড়্‌বেন্ না!

সিদ্ধান্ত। কেমন, একটা নূতন খবর পেলেন তো?

ঘন। তা বটে, তবে কিনা জানেন, আমরা পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু মানুষ, সদস্য পদের মত বিদ্যাসাধ্যি কোথায়? না বুঝে-সুঝেই এত বড় একটা দায়িত্ব স্বীকার করে ফেল্‌বো?

সিদ্ধান্ত। এর জন্যে আর এত ভাবনা কেন? এখন আগামী মাসিক অধিবেশনে কি প্রবন্ধ পাঠ কর্‌বেন, সেইটা ঠিক্ করে ফেলুন।

ঘন। গোড়াতেই প্রবন্ধ! তা হলেই তো মুস্কিল বাধালেন দেখ্‌ছি--তাইতো—আমার মা সরস্বতী গেলেন কোথায়?

সিদ্ধান্ত। আমি কি না ভেবে-চিন্তেই আপনাকে সদস্য প্রস্তাব করেছি? আপনার সাহায্য পেলে আমাদের সভার যে কত উপকার হবে, তা আর বল্‌বার নয়।

ঘন। আমি যে আপনাদের কি উপকারে লাগ্‌বো, তাতো আমি জানি না।

সিদ্ধান্ত। প্রত্ন-অনুসন্ধানের জন্য আমি আপনাদের দেশে যে সকল স্থান খনন করার ব্যবস্থা কর্‌বো—আপনি সেই সব তত্ত্বাবধান করবেন—যদি কোন সংস্কৃত কি পালি ভাষায় লিখিত প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া যায়, আপনিই সেগুলির পাঠোদ্ধার করে আবিষ্কারের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত সভার সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

ঘন। এ সব বিবরণও কি, সংস্কৃত ভাষায় লিখতে হবে?

সিদ্ধান্ত। (কোনও নিতান্ত গোপনীয় কথা বলার ভঙ্গী করিয়া) একদম্ চুপ্! দেখবেন্, যেন কারুর কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ কর্‌বেন না—আপনাদের এই গ্রাম-সীমানার মধ্যেই পরম ভট্টারক পরম সৌগত মহারাজ শ্রীহর্ষভট্টের মহানায়ক শুচিপালিত তাঁহার জয়স্কন্ধাবার সংস্থাপন করেছিলেন। আপনাদের এই প্রাচীন রাজ-বর্ত্ম অবলম্বন করেই গুপ্তবংশ-প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শ্রীগুপ্ত সমতটে আগমন করেছিলেন—এ ধারণা আমার কাছে জাজ্বল্যমান সত্য বলেই মনে হয়।

ঘন। কি বল্‌লেন—শচী পালিত! কৈ নামটা তো তেমন সেকেলে সেকেলে শোনাচ্ছে না। তা আপনার এ-সব কথা আর পাঁচজনে নেবে তো?

সিদ্ধান্ত। নিশ্চয়ই—কিন্তু দেখবেন, যেন আগে থেকে কারুর কাছে কিছু প্রকাশ না হয়ে যায়।

ঘন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কাক পক্ষীতেও টের পাবে না।

সিদ্ধান্ত। আপনার এখানে আস্‌বার আমার আরও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সেই যে-বার আপনি আপনার মেয়েটিকে সঙ্গে করে—আমাদের গ্রামে বেড়াতে যান, তখন থেকে আমার পুত্র শ্রীমান সুধীর কুমার হেমাঙ্গিনীর প্রতি বড়ই অনুরক্ত হয়েছেন— তা এ পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক প্রস্তাবটির সঙ্গে সঙ্গে আমি সে কথাটিও উত্থাপন কর্‌বার লোভ সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লাম না।

ঘন। আপনার মত লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা! সে ত আমার পরম সৌভাগ্য!

কিন্তু আমার মেয়েটিও বয়স্থা হয়েছে, তার মতামত না জেনে আমি 'হাঁ', কি 'না' কিছুই স্থির করে বল্‌তে পার্‌ছিনে ত

সিদ্ধান্ত। অবশ্য, অবশ্য—আপনার কন্যার মত না জেনে আপনিই বা কথা দেবেন কি করে! আমার সুধীরকুমার ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু কোনও রকম বদখেয়াল নাই—নেশা ভাঙ্ কাকে বলে, জানেনা—নেশার মধ্যে আছে শুধ, ঐ সখের থিয়েটার।

ঘন। আপনাদের গ্রামের সেই আর্য্য সারস্বত নাট্যসমাজ না?

সিদ্ধান্ত। আপনার মেয়েতো তাদের অভিনয় দেখে এসেছেন। তা সে কথা যাক্— আমিও মা-লক্ষ্মীকে অম্‌নি ঘরে তুল্‌ছিনে। গহনা এবং সাজ-সরঞ্জাম বাবৎ নগদ ১০০০৲ টাকার যৌতুক দেব।

ঘন। আমিও এর চাইতে কম দিচ্ছিনে আমারও তো ঐ একটি মেয়ে।

সিদ্ধান্ত। আমি ছেলের বাপ বটে কিন্তু কোন কথা গোপন কর্‌বো না। আমার অভ্যাসই তা নয়। সুধীরকুমারের কিন্তু একটি মস্ত ত্রুটির বিষয় বলা হয় নি—তা সেটা ত্রুটি কি,—ভয়ঙ্কর দোষ বল্লেই হয়—সে কথা আপনাকে—

ঘন। সে কি মশায়। দোষ ত্রুটি এ সব কি বল্‌ছেন?

সিদ্ধান্ত। আপনার কাছে বলিই বা কি করে? বাটকেমার সাহিত্য-প্রত্নসঙ্গতের সভাপতি হয়ে সে কথা আপন-মুখে প্রকাশ কর্‌তে আমার মাথা কাটা যায়। (ঘনশ্যামের হস্তে একখানি পত্র দিয়া) মুখে আর বল্‌ব কি—আপনি পড়েই দেখুন।

ঘন। এ আবার কি?—আপনার প্রত্ন-সঙ্গতকে ঠাট্টা করে ছড়া বেঁধেছে নাকি?

সিদ্ধান্ত। না, সে সব বাঁদরামি কিছু নয়। দিন-আষ্টেক হলো—সুধীর আমাকে এই চিঠিখানা লিখেছে—তা কি করি, লজ্জায় মাথা খেয়ে আপনাকে দেখাতে হলো।

ঘন। আপনি যে কেবলই ভয় দেখাচ্ছেন দেখি দিকি একবার পড়ে। বাবাজী কি লিখেছেন। (পড়িতে লাগিলেন।)

"শ্রীচরণেষু

বাবা, আজ আপনার কাছে একটা গোপন কথা প্রকাস না করে পার্‌ছিনা। আমার জীবনের যা কিছু সুখ-সচ্ছন্দ সবই এর উপর নির্ভর কর্‌ছে—"

সিদ্ধান্ত। (স্বগত) বেটা বেল্লিক,—'স্বাচ্ছন্দ্য' না লিখে "সচ্ছন্দ" লিখেছে। আবার 'প্রকাশ' বানান করেছে দন্ত্য 'স' দিয়ে।

ঘন। (পড়িতে লাগিলেন) "শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসি, তাকে দেখে অবধি আমার আহার-নিদ্রা একবারেই ত্যাগ।"

সিদ্ধান্ত। (স্বগত) বেটা ক্রিয়া-পদটাও সম্পূর্ণ কর্‌তে পারেনি। বে আহাম্মক—

ঘন। (পড়িতেছেন) "ঘুমাইয়াও আমার শান্তি নাই, শুধু তাকেই সপন দেখি—"

সিদ্ধান্ত। (স্বগত) 'স্বপন' না লিখে লিখেছে 'সপন'—একেবারে 'ব' ফলাই লোপ! না, এ মূর্খতার আর মার্জ্জনা নাই—(প্রকাশ্যে) কি বলেন ঘনশ্যাম বাবু, এমন

অকাল-কুষ্মাণ্ডকে পুত্র বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয় না?

ঘন। তা এত রাগ কর্‌ছেন কেন? এরা হল আজকালকার ছেলে-ছোকরা—সেকেলে কেতায় বাপ-খুড়োর পছন্দের উপর নির্ভর করে থাক্‌তে চাহবে কেন?

সিদ্ধান্ত। আমার যা কর্ত্তব্য, আমি অবশ্য তা কর্‌লাম, এখন আপনার কি বিবেচনা হয়, বুঝে দেখুন!

ঘন। তা বাবাজী, দেখছি, আমার মা লক্ষ্মীর উপর বড়ই অনুরক্ত হয়েছেন।

সিদ্ধান্ত। আরে, সে কথা হচ্ছে না ত! শুধু অনুরাগ প্রকাশ কর্‌লেই তো হয় না। চিঠি লিখতে বানান ভুল করেছে কত। সেই কথাটাই বলছি আমি! ব্যাকরণের সব নিয়ম-টিয়ম আছে ত—এই বানানের ব্যবস্থা—তা এ-সব বিধি-নিষেধ মান্‌তে হবে তো—নইলে ব্যাকরণ, অলঙ্কার-শাস্ত্র, এ সব থাকে কোথায়? তা ছেলেটা এমনি মূর্খ, আপনি একটু ধীরভাবে বিবেচনা করুন, আমি একবার আপনার বাগানের ভিতরটা দেখে আসি—এক জায়গায় ঢিবির মত কি একটা রয়েছে—আমার তো বৌদ্ধ স্তূপ বলেই মনে হয়।—তা এখন এই পর্য্যন্ত,- পরে আবার এ বিষয়ে কথা হবে'খন।

নবম দৃশ্য

ঘন। (চিঠিখানি পকেটে রাখিয়া) সিদ্ধান্ত কি দোষের কথা বল্‌তে চেয়েছিল তা ত কৈ বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। (হেমাঙ্গিনীকে প্রসাধনান্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিতে দেখিয়া) মার আমার এর মধ্যেই চুল বাঁধা, কাপড় ছাড়া সব হয়ে গিয়েছে, দেখ্‌ছি—কেন, আজ কি কোথাও বেড়াতে যেতে হবে নাকি?

হেম। (ঘরের দক্ষিণধারের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া) হ্যাঁ—বাবা, অনেকদিন থেকে ভাদুড়ীদের বাড়ী একবার যাব-যাব কচ্ছি—তা হয়ে ওঠে না—ওদের বড় গিন্নী কত করে একবার যেতে বলেছে। তা ওদের হাতে অনেক লোক—ও পাড়ার ভাদুড়ীদের বেশ নাম-ডাক্‌ও আছে। মনে কর্‌ছি, ভোটের কথাটাও একবার বলে আসবো। তা আমি পাল্কী-গাড়ীটা নিয়ে যাব?

ঘন। যাও—তা মা, যাবার আগে শুধু একটি কথার জবাব দিয়ে যাও। তোমার বুড়ো ছেলেকে ছেড়ে যে শ্বশুর ঘর কর্ত্তে যেতে হবে, সেটা কি কোন দিন ভেবে দেখছ?

হেমা। (লজ্জিতভাবে) না বাবা, আপনি ভারী দুষ্টু হয়েছেন—ও-সব কথা আমার মনেও আসে না।

ঘন। সে যাক্‌, আমি বল্‌ছিলুম কি, যে যদি ভাল ঘরের ছেলে পাওয়া যায়—এই অবস্থা ভাল, দেখ্‌তে-শুন্‌তে ভাল—বয়সও খুব বেশী নয়—স্বভাব-চরিত্রেও কোন দোষ নাই—নেশা-ভাঙ্‌ কিছু করেনা—বড় জোর এক-আধটা চুরুট-টুরুট খায়—তা হলে...

হেম। (স্বগত) নিশ্চয়ই সুধীর বাবুর কথা হয়েছে!

ঘন। তাই বল্‌ছিলুম, এ রকম সম্বন্ধ যদি আসে, তা হলে কি তোমার আপত্তি হবে না?

হেম। আমার আর মতামত কি বাবা? আপনার যা আদেশ হবে, তাই আমি মাথা পেতে নেব।

ঘন। তোমাকে সুখী দেখ্‌লেই আমার সব সাধ মিটে যায়—তুই তোর বুড়ো বাপের জন্যে যা করিস্ মা, তা মনে করলে—

হেম। আপনি কি যে বলেন বাবা! আমি আবার করেছি কি?

ঘন। বেশ বলেছ মা। (চারিদিকে চাহিয়া) চিঠিপত্র, বক্তৃতা, প্রবন্ধ—

হেম। সেগুলো শুধু আমি নকল করে দি বইতো না।

ঘন। আচ্ছা, তাই স্বীকার—তুমি যখন বল্‌তেই দেবে না, তখন সে কথা আর তুলে কাজ নেই। (ললাট স্পর্শ করিয়া) এখন আয় মা। শীগ্‌গির করেই ফিরে আসিস্ কিন্তু।

(হেমাঙ্গিনী মাঝের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল)

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুদাস সরকার।

লীলাময়ী

ওগো, একবার রাখো, তব ছলনা রাখো,
আর আমায় এমন করে ভুলিয়োনাকো।
তব পায়ের ধ্বনি
শুনি দিন-রজনী।
হায় ধরা দিতে এসে কেন নিজেরে ঢাকো।
কেন গোপন থাকো?

দেখ, তোমারি মায়ায় ভুলে হে কল্যনে,
কত ঘুরেছি, খুঁজেছি, আহা, আপন মনে।
কত সোনার প্রাতে,
কত ফাগুন রাতে,
কত ঘন বরষায় দেখা তোমার সনে!
দেখা ফুল-কাননে!

সুখে বিহর যখন লঘু নৃত্য-ভরে,
তব নৃত্য-লীলায় মম চিত্ত হরে।
রাঙা অশোক ফোটে,
পিক কুহরি ওঠে।
ভেজে শুষ্ক হৃদয় সুধা-সিক্ত স্বরে।
ক্ষুধা তৃপ্ত করে।

মরি যে সুর কাঁদিয়া বাজে তব নূপুরে,
মোর সেতারে সে সুর যবে দাও গো পূরে,
আমি ক্ষ্যাপার সমান
গাহি সারাদিনমান!
মন না জানি নিয়ত কোথা বেড়ায় ঘুরে,
কোথা কোন্ সুদূরে!

তুলি গোপনে নীরবে সদা বুলাও প্রাণে,
বল কি ছবি আঁকিতে চাও তুলির টানে!
আমি বুঝিনা কিছু,
চেয়ে হঠাৎ পিছু
দেখি রঙের ছোঁয়াচ্ লাগে সকলখানে।
লাগে সকল গানে!

ওগো তোমায়-আমায় চেনা না জানি কবে।
কেন এটুকু আড়াল হায়, রেখেছ তবে?
ওগো হিয়ার মণি,
ওগো কাজের শনি,
বল তোমার সকল কবে আমার হবে!
আমি রব নীরবে।

হায় সেদিনের কথা সখি মনে কি পড়ে,—
সেই দুজনের চোখোচোখি নিমেষ-তরে।
সেই হিয়া উথলে,
মন পুলক-ছলে!
যে সে বিঁধিল মোদের দোঁহে কুসুম শরে।
দেহে সুখ না ধরে।

মম মানস-লোকের অয়ি তিলোত্তমা!
ভুলে বেসেছি তোমায় ভালো, করিয়ো ক্ষমা।
ভুলে কাছে এসেছি,
ভুলে ভালো বেসেছি,
তুমি না-যদি বসো, দিয়ো ওই সুষমা,
মনে রাখিতে জমা!

ভালো বাসিলে কাহারে, যদি নিন্দা রটে,
নেই সুনাম নেহাৎ তবে আমার ঘটে।
এই কাঙাল হিয়া
বাঁচে ভালোবাসিয়া
শুধু রতন চুনিয়া ফেরে সাগর-তটে।
ফেরে দূরে নিকটে।

শ্রীনিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়

সুকৃতির ভোগ

(গল্প

সেদিনের কথাটি আজও মনে আছে। তার বাবার পায়ের কাছটিতে অন্ধকারে নিজেরে লুকিয়ে সে বসেছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই আস্তে আস্তে উঠে এসে পা ছুঁয়ে আমায় নমস্কার করলে, তারপর গলাটিকে খাটো করে নতশিরে বললে, "আমি অতসী।"

নামটা একটুও পরিচিত মনে হলোনা, তবু চোখদুটোকে একটু বড় করে বললুম, "ওঃ।"

তার বাবা বললেন, "আমার মোটে ঐ একটি মেয়ে, তা ত জানই। ছোটটিকে আসামের নির্জ্জন উপত্যকায় এবার রেখে এসেছি, ছোট একটি পাহাড়ে নদীর ধারে। সেখানে সে হয়ত বেশ আছে ....."

একটুখানি অতর্কিত অশ্রু গোপন করবার জন্য অতসী মুখ ফিরিয়ে আবার তার অন্ধকারের আশ্রয়টিতে ফিরে গেল। চকিতের মতো তাকে যতটুকু দেখা গেল, তাতে করেই এমন স্নিগ্ধ, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এই মেয়েটিকে আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার যে আমার আছে, এই ভেবে আমার গর্ব্ব হলো।

তার বাবা অনেক দিন থেকে হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাচ্চেন। ছোট মেয়েটি মারা যাওয়ায় তাঁর যে আঘাত লেগেছে, তাকে কারে

ব্যামোটা এক ঝটকায় অনেকখানি বেড়ে গেছে। ডাক্তারিতে আমার পসার তেমন ত নেই, বাপ-মা-হারা ছোট বোনটিকে ছেড়ে বড় কোথাও একটা যাই না। তাকে ইস্কুলে অবধি দিই নি, নিজের মনের মতো করে গড়ব বলে। তবু বন্ধুবর অনিমেষ এসে জোর করে আমায় ধরে নিয়ে গেল। তাকে কত করে বললুম, "ওহে, হৃদয়ের চর্চাই ত ঢের কতক করেছি,—হৃদ্‌রোগের ত কিছু করিনি।"—সে কোনো ওজর শুনলে না।

ওদের বাসায় দুবেলাই অনিমেষের যাওয়া আসা তা জানতুম। ফিরে আসবার পথে তাকে বললুম, "কি ভায়া, জমাট হচ্ছে বুঝি?"

সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বললে, 'পাগল।'

একদিন আমায় ভিজিটের টাকা দিতে এসে অতসীর হাত কেঁপে গেল। মনে পড়ল, কবে শুধু শুধু অন্তরালে তার আঁচলের চাবি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এমন ত হয় না। দিনমান ধরে নিঃশব্দে তার ঘরকন্না, ঘর-ঝাঁট দেওয়া, কাপড়-কাচার ভিড়ের মধ্যে আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছায় অত সুর এসে লাগল কেমন করে?

বাড়ী ফেরবার পথে মনে হলো, অতসী যেন ধরা পড়েছে। কিন্তু নিজের কাছে তখনও অত সহজে আমি ধরা দিলুম না। কেবল হিম রাতের শিরশিরে হাওয়ার স্পর্শে সেদিন যখন আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, তখন তার মধ্যে করে কার একটুখানি অতি-মৃদু করস্পর্শের দুঃসহ পুলকের শিহরণকে আমি যেন পলকের মতো অনুভব করলুম। চিরকালের স্মৃতির মাথায় সেদিনকার শীতের সন্ধ্যা মণির মতো গাঁথা হয়ে রইল।

আমার আসবার সময়টিতে বিছানা, টেবিল, আসবাব ঘর-মেজে পরিষ্কার করে, ঘরে ঘরে আলো দিয়ে, গোধূলির ছায়াটিরই মতো অতসী তাদের গেটের কাছেকার একতলার খোলা ছাদটিতে এসে দাঁড়াত। বেরিয়ে যাবার সময় দেখতে পেতুম, সে তেমনি করেই সেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। আমার আসতে যেদিন দেরী হয়ে যেত, সেদিন দূর থেকেই দেখতে পেতুম, চকিত দৃষ্টিতে একটুখানি স্নিগ্ধ তিরস্কার আমার উপর বর্ষণ করে, মুখটিকে ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি সে ফিরে চলেছে।

সেদিন সে রোজকার মতো একতলার ছাদটিতে এসে দাঁড়ায়নি। তাদের গেটের দরজাটিকে দেবদারু পাতায় আর ফুলের মালায় অতি বিচিত্র করে সাজানো হয়েছে। ভিতরে দস্তুর-মতো লোকের ভিড় জমে গেছে, তার মধ্য দিয়ে পথ করে, পাড়ার মেয়েরা রেকাবিতে জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে মহাব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করচে।

দরজায় দাঁড়িয়ে কি করা উচিত, তাই ভাবচি, এমন সময় একজন অচেনা ভদ্রলোক একমুখ হাসি নিয়ে চটি চটচট করে এসে আমায় খুব সমাদর করে উপরে নিয়ে গেলেন।—বড় ঢালা বিছানায় অতসীর বাবা আর চার-পাঁচজন মোটা ভুঁড়ি-ওয়ালা ব্যক্তি গোল হয়ে বসেছিলেন। রূপোর ডিপেয় স্তবকে স্তবকে পান দেওয়া হয়েছে, অম্বুরি তামাকের ধোঁয়ার জোর বাতাস যেন বইতে

পারছে না। দেখলুম, অনিমেষও এদের মাঝখানে একটুখানি জায়গা করে কাঠ হয়ে বসে আছে। চোখে ইসারা করে সে আমায় বসতে বললে। আজকের দিনে মুখ ফুটে কিছু বলতে যাওয়া ত দূরের কথা, নড়বার-চড়বারও যেন তার হুকুম নেই।- অগত্যা সেই ভুঁড়ির ভিড়ের মধ্যে, নিজের নগণ্য দেহটুকুর লজ্জা নিয়ে জড়সড় হয়ে বসে পড়লুম।

একটু পরে একজন সুবেশা মহিলা ঠোটের কোণে একটুখানি হাসি টেনে, অতসীর হাতখানি ধরে আসরে এসে অবতীর্ণ হলেন। অভ্যাগতদের মধ্যে কারো কারো চোখে ঘুম জড়িয়ে এসেছিল, তাঁরা সচকিত হয়ে উঠে বসলেন। অতসীকে সকলের মাঝখানে একরকম জোর করে এনে বসিয়ে দেওয়া হলো।

তারপর তার রূপের যাচাই আরম্ভ হলো। এ-সব কাজে যাঁরা পাকা, তাঁরা সমঝদারের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে, মিট্‌মিটে চোখের কলুষিত দৃষ্টি হেনে আজকের এই নতুন পণ্যটিকে নির্ভুলভাবে ওজন করতে বসে গেলেন। চোখের কোণে কালো-দাগ-ওয়ালা একটা লোক অতসীর মাথার খোঁপাটাকে টান্ মেরে খুলে ফেলে দিলে, সে 'উঃ' করে উঠ্‌ল!—এই পর্য্যন্ত দেখে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে নেমে চলে এলুম।

অতসী ছাড়া পেয়ে যখন ফিরে এল, নীচে সিঁড়ির গোড়ায় তখন তাকে দেখলুম। বেশভূষার সজ্জায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে সে কেবল একটু হাসল। কান্নার চেয়ে হাসি যে বেশী করুণ হ'তে পারে, সেদিন তা জানলুম। উল্কা ত জ্বলে না, অন্ধকার তার ঐ আলোটুকুর ফাঁকে মুখ বার করে হাসে। মনে হলো, তার হাসির পাপ্‌ড়িগুলো ছড়িয়ে পড়ার মুখে কি এক অলক্ষিত বেদনায় থরথর করে কেঁপে উঠ্‌ল।

নিজেকে যতটা পারা যায় বাঁচিয়ে অনিমেষকে বললুম, "বাসনার হাটে পণ্য হয়ে বস্‌তে বাংলার মেয়েদের এতটুকু আপত্তি হয় না কেন? ঘৃণায় কেন তাদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে না? নারীত্বের এত বড় অপমানকে কেন তারা যুগের পর যুগ মাথা পেতে সয়ে আস্‌চে?"

অনিমেষ বললে, "বিয়ে ত হওয়া চাই,—এ সব সেন্টিমেন্টকে চেপে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?"

উপায় নেই...উপায় নেই...কেবল স্বপ্নে যদি তার সঙ্গে দেখা হ'ত, তবে যে-কথা কোনদিন বলা হবে না...

অনিমেষকে এর পর আর কিছুই বললুম না। ও এমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, যেন ফাঁদ পেতে আছে! ওর কাছে ধরা পড়া নয়। নিজের কাছে ত আরো আগেই ধরা পড়েছি। অতসীর বাবার ব্যামো যত না বাড়ছে, দুবেলা আমার আনা-গোনাটা তার বেশী বেড়ে চলেছে। হৃদ্‌রোগ এবার আমার। তাকে পাবনা জানি, তবু মন ত মান্‌ছে না; ছুটে যাই, একটু কুড়িয়ে-পাওয়া হাসি, চকিত চোখের একটুখানি আগুন, তাই দিয়ে অন্তরের নিভৃতে সহস্র প্রদীপে দীপালি ধরিয়ে দিই;—অবুঝ আমার এই মনকে নিয়েই আমার গর্ব্ব। কেবল দিচ্ছি, দিচ্ছি, দিচ্ছি। যাকে দিচ্ছি, সে যে

জানছে না!—তবুও এই দেওয়াকে নিয়েই আমার গর্ব্ব!

লতিকা একদিন বললে, "আমার জিয়োগ্রাফির সেই চাপ্টারটা আর শেষ হয়ে উঠবে না, দেখ্‌চি। একদিনও যদি তোমার একটুখানি সময় হয়! এ তোমার হলো কি দাদা?"

তাকে বললুম, "কেবল জিয়োগ্রাফি নিয়ে থাকলে ত খেতে পাওয়া যাবে না, লতিকা!"

সে বললে, "কেন, এতদিন ত যেত। আর অতসী আমায় বলেছে, তুমি তাদের কাছ থেকে ফী বড়-একটা নাকি নাও না!"

বললুম, "সে তোমায় এ-সব কথা বলেছে, বুঝি? আর কি বলেছে, শুনি?"

কিন্তু তখনি ধরা পড়ে যাবার ভয়ে কাণের কাছটা এত বেশী দপ্‌দপ্‌ করে উঠ্‌ল যে, তাকে এ কথার জবাব দেবার অবকাশ না দিয়েই, সেখান থেকে তাড়াতাড়ি আমি পালিয়ে এসে বাঁচ্‌লুম।

মনে করেছিলুম, এমনি লুকোচুরি করে বেড়িয়েই চিরকালটা কাট্‌বে। ছোট্ট পরিচ্ছন্ন বাড়ীটি, ছোট বোন্ লতিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবসর,—এই সব নিয়ে জীবনটা এক অপরূপ রসে ভরপুর হয়ে উঠবে? অভাব যে কিছু আছে, এ কথাটাকে ভালো করে বুঝতে কিছুদিন যাবে!

কিন্তু একদিন জান্‌লুম, আর মাস দুই পরে অতসীর বিয়ে! বর অনিমেষেরই জ্ঞাতি-সম্পর্কের ভাই এবং অনিমেষই তাকে ধরে বেঁধে এই হাঙ্গামায় এনে ফেলেছে।

অনিমেষকে ক'দিন থেকেই বড় একটা দেখিনে, দেখা হলেও সে পাশ কাটিয়ে সরে যায়। ও হঠাৎ এমন পালিয়ে বেড়াতে আরম্ভ করলে যে কেন, সে কে কথা বল্‌বে? অতসীর বাবা বললেন, "ও ছেলেটির মনের মধ্যে যে কি আছে!—সব গোছগাছ করে-টরে,—তারপর যখন সে না দাঁড়ালে কিছুই হয়ে উঠবে না, তখন এমন সাফ্ সরে পড়া, এটা কি তার উচিত হলো?"

একদিন অনিমেষকে তার শোবার ঘরে গিয়ে পাকড়াও করলুম, বললুম, "তোমার জ্ঞাতি ভায়ের সঙ্গে অতসীর বিয়ে হচ্ছে, এ কথা সেদিন আমায় বলনি কেন?—অনেক কষ্ট কথা তখন তোমাদের আমি বলেছি, কিছু মনে করে রেখো না।"

খাসা মানুষ।—দুদিনেই কিসের থেকে কি। ওর মতো অকেজো, কুড়ের হদ্দ দুনিয়ায় আর দুটি আছে কিনা, জানিনে;—আজ দেখ্‌চি, কাজের চাপে পড়ে নিঃশ্বাস নেবারই তার অবকাশ নেই। সে বললে, "ল-এগ্‌জামিনটা এবারই দিয়ে ফেলতে চাই। কটা বছর শুধু শুধু বসে কাটালুম, তুমি কি বল?"

তাকে অনেক করেও অতসীদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারলুম না। সে কিছুতেই যাবে না, গোঁ ধরে রইল। সেদিন পথে আস্‌তে আস্‌তে হঠাৎ সব কথা স্পষ্ট হয়ে গেল। বুঝলুম, এতদিন আবছায়ার মতো যে-কথাটা আমার মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মেরেছে,—তা বাস্তবিক সত্য। তখন সে আমায় পাগল বলে উড়িয়ে দিয়েছিল, এখন আর কি ভুলি?

নিজে অতসীকে পাবে না জেনেই, আরেকজনকে তাড়াতাড়ি মাঝখানে এনে ফেলে হারানোটাকে সে সহজ করে নিয়েছে।

ভেবেছে, হার যদি মানতেই হয় ত, নিজের কাছে মানবে, নিয়তির কাছে নয়।—বেচারা!

অতসীদের বাড়ী যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলুম। বাসনার নিবৃত্তিই যে জীবনের চরম চরিতার্থতা নয়, অনিমেষ সে কথা আমায় শিখিয়েছে। দিনান্তে যখন ছাদে গিয়ে দাঁড়াই, কান্না তখন আর বাধা মানে না। ওগো দেবতা, ভাবিনে, আমার বেদনায় তুমিও লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদ,—নিরুপায়তার বুক-ফাটা কান্না,—আমার চেয়েও বুঝি বেশী! আমার কান্নাকে তুমি যে তুচ্ছ করনি, এ সান্ত্বনাই আমার যথেষ্ট হোক!

এমনিভাবে দেবতার সঙ্গে বনিবনাও চলেছে।

অনিমেষ একদিন এসে সারাটা দিন আমার এখানে কাটিয়ে দিয়ে গেল। মনে হলো, গল্পগুজবের মধ্যে তার মনটা যেন ছাড়া পাচ্চে।—অতসীর কথা কেউ একটি বার তুললুম না, কেবল সে যাওয়ার সময় শুধু শুধু ভয়ানক লাল হয়ে উঠে আমার কাণে কাণে বললে, "আমার ভায়ের সঙ্গে অতসীর বিয়ের কথাটা যদি চাপা পড়ে যায়, তাহলে বেশ হয়।"

আমি বললুম, "তুমিই-না ছিলে এ ব্যাপারের সব-চেয়ে বড় পাণ্ডা, আজ আবার—"

সে তাড়াতাড়ি বললে, "সে তুমি বুঝবে না, বুঝবে না।" তারপর আর কোনো কথা না বলেই সে নেমে বেরিয়ে চলে গেল।

তারপর তার 'ল' এগ্‌জামিনের যখন আর মাসেক বাকী, তখন হঠাৎ শুনলুম, সে হাওয়া বদ্‌লাতে নৈনিতাল চলে গেছে!

তারপর অনেকদিন আর তার কোনো খোঁজ-খবর পাইনি।

অতসীদের বাড়ীর সামনেকার পথটি দিয়ে রোজ আনাগোনা করে বেড়াই। ঘরকন্নার কাজ নিয়ে তার দিন দিব্যি কেটে চলেছে, আমার দিন যে কাটে না, কি করি! মাঝে মাঝে কাপড় রোদে দিতে সে তাদের একতলার ছাদটিতে নেমে আসে; চোখের চাওয়া দিয়ে তাকে সেখানে তখন জড়িয়ে বেঁধে রাখ্‌তে ইচ্ছে করে; কিন্তু চোখ তুলে তার দিকে চাইতেও পারিনে, তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়ে আসি।—কি জানি, যদি চোখো-চোখি হয়ে যায়, যদি ধরা পড়ে যাই।—এমনি বিড়ম্বনা!

লতিকাকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে একদিন তাদের বাড়ী বেড়াতে পাঠালুম। কিন্তু লাভ হলো না কিছুই; সে ফিরে এসে এমন চুপ করে গেল, যে তাকে ধরতে ছুঁতে পাবে, কার সাধ্যি? রাত্রে খেতে বসে অন্য কথার মাঝখানে হঠাৎ বলে বস্‌লুম, "অতসী মেয়েটি কিন্তু বেশ!"

লতিকা বললে, "কি করে বুঝ্‌লে?"

আমি বললুম, "এমন শান্ত সুন্দর প্রকৃতি, মুখে কথাটি নেই!"

সে বললে, "কথা কইবার জো থাকলে ত! ঘোর পাড়াগেঁয়ে, মুখ্যুর হদ্দ…"

তাকে ধমকে দেওয়া হয়ত উচিত ছিল, কিন্তু পারিনি

এর পর থেকে ওকে কাছে বসে অতসীর কথা ভাব্‌তেও আমার ভয় হ'ত। তার মধ্যে আমার যে আদর্শকে সারা জীবনের

অক্লান্ত চেষ্টায় একটু একটু করে আমি পরিণত করে তুলেছি, আমার এই চরম পরীক্ষার বেলায়, আমাকেই আঘাত করতে সে ফণা তুলে উঠেছে।

একদিন আর না পেরে একটা দরকারি জিনিষ হারাবার ছুতো ধরে আবার অতসীদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম।—আগে যখন যাওয়া-আসা ছিল, তখনো অতসীর সঙ্গে বড় একটা কথা হতনা। আমি যতক্ষণ থাকতুম, সে একটা না-একটা কাজের অছিলায় এ-ঘর সে-ঘর করে পালিয়ে বেড়াত। -কিন্তু এবার সে নিজে থেকে আমার সঙ্গে কথা কইতে এল — সব যে হারাতে বসেছে তার আবার লজ্জা সঙ্কোচ! আমার বুঝতে বাকী রইল না, এত বড় নিরুপায়তার তাড়নায় তার আজন্মের সমস্ত সংস্কারকে সে আজ কাটিয়ে উঠেছে।

তারই দিন দুই পরে খবর পেলুম, তারা দেশে ফিরে চলেছে বিয়ে সেইখানেই হবে। তাছাড়া তার মা কলকাতায় আসেন নি,—প্রাণ ধরে তাঁর ঐ একটি মেয়েকে তিনিই বা আর কতদিন সুদূর বিদেশে ফেলে রাখবেন?

শেষ।—এত শীগ্‌গির। আর হয়ত দেখা হবে না! না দেখে কি বাঁচব? তার সঙ্গে মোটে দুটি দিনের জানা-শোনা, তবু কেন মনে হচ্ছে, এই দুটি দিনকে বহন করে আসছে বলেই আমার চিরকাল কত যুগ যুগান্তরের বুকের মধ্য দিয়ে এতদিন পথ করে এসেচে।

যেদিন তারা যাবে, সেদিন সকাল বেলা মন-ভরা আশ্চর্য্য পরিতৃপ্তি নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলুম, আজকের এই ভোরের আলোর সহস্র ধারা কেমন করে তার ছোট্ট, সুন্দর মনটিকে অভিসিঞ্চিত করেছে। আমার ব্যথাতুর মনকে তার আনন্দের তীর্থজলে আমি স্নান করিয়ে নিলুম।

সমস্ত দিন তাদের বাড়ী গেলুম না। তার বাবা বিকেলের দিকে এক টুকরো কাগজে লিখে পাঠালেন,—"অনিমেষ যেমন আমায় ভুলেছে, তুমিও তেমনি ভুলেছ, দেখছি। আমার এই আনন্দের দিনে তোমাদের হারিয়ে কিছু ভালো লাগেনা। আমার কিছু কি অপরাধ হয়েছে?—নিশ্চয় এসো।"

বলে পাঠালুম—অসুখ।

কিন্তু গাড়ী ছাড়তে যখন কয়েক মিনিট আর বাকী, তখন তাড়াতাড়ি একটা চাদর কাঁধে ফেলে, লতিকাকে কিছু না বলেই ষ্টেশনে চলে গেলুম। গাড়ীর জানালার কাছটিতে স্তব্ধ হয়ে অতসী বসেছিল, বাতির আলো তার শুভ্র মৃণালের মতো গ্রীবাটির এক পাশে এসে পড়েছে, পরিধানে গাঢ় কালো শাড়ী। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে, কলের পুতুলের মতো আড়ষ্ট গলায় বললুম, "কিছু মনে করে রেখোনা, অতসী।"

তার নিবিড় কালো চোখদুটিকে শেষ আরতির আলোর মতো করে সে আমার দিকে তুলে ধরলে,—কি কথাটি বল্‌বার জন্য তার পাৎলা ঠোট দুখানি একটিবার ধরা যায় বা-না-যায় এমনিভাবে কেঁপে উঠল, তারপর নীরবে দুহাতে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে—

গাড়ী প্লাটফরম্ ছেড়ে যখন চলে গেল, সেইখানে নিঃস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে, তার তাড়া-

তাড়ি চোখের আড়াল হয়ে যাওয়ার রকম দেখে ভাবলুম, আমার কী সম্পদ্ নিয়ে সে চলেছে, কতখানি নিয়ে চলেছে, ও যেন তা জানে! প্রাণহীন জড়বস্তু বলে তখন আর তাকে মনে হলো না।

একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ফিরতে গিয়ে দেখি, আমার ঠিক পাশটিতে দাঁড়িয়ে অনিমেষ তার দুটি চোখের সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তন্ন তন্ন করে আমায় দেখ্‌চে।

বললুম, "তুমি এখানে, এমন অকস্মাৎ!"

সে বললে, "আজকেই মোটে এসেচি! অত তাড়াতাড়ি করেও ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে উঠ্‌লনা, এই যা ক্ষোভ। আমাকে ওঁদের পাছু নিতেই হবে, যেমন করে হোক।"

তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে এলুম। সমস্ত রাত্তিরটা সে আমার সঙ্গে গল্পগুজবে কাটিয়ে দিলে।—আর কেবল অতসী!

একদিন সে বললে, "আমার জ্ঞাতি-ভায়ের সঙ্গে তার যে বিয়ে হচ্চে, সে কথা • কই আর বলছ না।"

আমি বললুম, "এ বিয়েকে মনে মনে আমি স্বীকার করেছি। বল্‌বার ত আর কিছু নেই।"

সে বললে, "লুকোচ্চ।"

তারপর বলা নেই, কওয়া নেই, আচম্‌কা সে কথা পেড়ে বস্‌ল, "তুমিই তাকে বিয়ে কর, আমি কথাটা তুলি। এখনো আমরা সময় হারাই নি।"

—চম্‌কে উঠলুম। তার সঙ্গে অত বড় একটা সম্পর্ক দাঁড়াবার পথ যে খোলা পড়ে আছে, এই আকস্মিক উদ্ভাবনাটা আমাকে অভিভূত করে দিলে। তাকে চাই, এইটুকু কেবল জেনেছি, কতটুকু চাই, তা তো ভাবিনি!

একটু একটু করে এই বিশ্বাস সেদিন আমার মনে জাগ্‌ল, আমার সমস্ত দেহ-মন দিয়ে আমি যেন তাকে চাইনি। চাইছি, কিন্তু এই চাওয়াটার সঙ্গেই আমার বিরোধের যেন আর শেষ নেই এর হাত থেকে নিস্তার পেলে যেন বাঁচি।

এই এক নূতন সমস্যা আমার জীবনে একটু একটু করে আজ এসে পড়েছে, একটা নূতনতর বেদনা। কত আর সহ্য হয়? অভাবকে কেন হাত বাড়িয়ে ডেকে আনলুম? আলোর সঙ্গে এ পরিচয় কেন হল? জন্মান্ধ থাকতুম যদি ত, তাতে কোন গোল থাকত না।

তাছাড়া, আমার আশৈশবের বন্ধু অনিমেষ, তার মুখের দিকে চাইলে চোখ ফেটে কান্না আসে। আমার নিজের জন্যে বুঝি তত কষ্ট নয়, যত তার জন্য। তাকে বঞ্চিত করে অতসীকে নিয়ে আমি কি সুখী হতে পারব?

মনটাকে প্রস্তুত করে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলুম। বললুম, "তুমি দুঃখ কোরো না অনিমেষ, অতসীকে বিবাহ করা আমার উচিত হবেনা। খুব চেষ্টা করেও পরিপূর্ণভাবে তাকে আমি চাইতে পারিনি।"

চোখে একটা প্রশ্ন নিয়ে কিছুক্ষণ সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তার পর বললে, "তাই যদি হয়, তবে তোমায় আমি দোষ দেবনা। মন ত কারো হাত-ধরা নয়। তোমার মন যদি না চায়, তুমি কি করবে?"

সে চুপ করে আছে দেখে বললুম, "তবু কেন ভাবচ?"

সে বললে, "বুঝবে না।"

বুঝি গো, বুঝি। বুঝি বলেই ত—

সেইদিনই কি এক কাজে সে অতসীদের দেশে চলে গেল।

হাত না পেতেও যদি পাওয়া যেত, পৃথিবীতে ভিখিরী তাহলে বোধ হয় আর থাকত না। হাত পাতবার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়েই একটু একটু করে আবার ভাবতে সুরু করলুম, পৃথিবীতে ঠকতে হয় বুঝি সবাইকেই, কেউ বেশী ঠকে, কেউ কম। মানুষ ত চিরকাল হায় হায় করেই মরছে, বলছে, পেলুমনা, পেলুমনা। গোড়াতেই কি পাব, সে কথাটাকে কেন এত বেশী করে ধরাচ?

যতদিন কিছু পাবার আশা থাকেনা, মানুষ দিয়ে-দিয়ে ফতুর হয়ে যায়, যেই প্রতিদানে একটু কিছু জুটতে সুরু হয়, অমনি সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া ব্যবসা হয়ে ওঠে আর পদে পদে সেই নিয়মে ফাঁকির পর ফাঁকি চল্‌তে থাকে।—ভাব্‌চি, অত-বড় ফাঁকি আমার নিজেকে আমি দিলুম কি করে?

এমনি দো-মনার মাঝখানে পড়ে যখন দোল খাচ্চি, তখন একদিন খবর পেলুম, অনিমেষের জ্ঞাতিভায়ের সঙ্গে অতসীর বিয়ের সম্বন্ধ ফেঁসে গেছে, তাকে বিয়ে করবে অনিমেষ্ নিজে! লতিকা শুনে যে মন্তব্য প্রকাশ করলে, তাতে করে মোটেই বোঝা গেলনা, অনিমেষ এবং অতসী—এ দুজনের ভেতর কার উপর তার অশ্রদ্ধাটা বাস্তবিক বেশী। আমি কি করলুম? আমি আমার ঘরের নিভৃত কোণটিতে একান্তে দেবতাকে ডেকে বললুম, তোমার দানকে যখন পাই, সেও আমার সান্ত্বনা, তোমার দণ্ডকে যখন পাই, সেও আমার সান্ত্বনা। তোমার দানকে তোমার বলে পাওয়ার মতো অত-বড় পাওয়া আর নেই, এ কথা যেন না ভুলি। তোমার দণ্ডকে তোমার বলে পাওয়ার মত অত-বড় নির্ভাবনা আর নেই, এ কথাও যেন না ভুলি।

গ

আবার লতিকাকে নিয়ে পড়লুম। কিন্তু ওকেও আমি বুঝে উঠতে পারবনা। বললুম, "কই, নিয়ে আয় তোর জিয়োগ্রাফি।"

সে ঠোট উল্টে বললে, "পড়তে শুনতে আর ভালো লাগেনা ছাই,—এখন ক'টা দিন একটু জিরোব।"

উন্মনা হয়ে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তার আবদারের জ্বালায় যে স্থির থাকা যেত না। কিছুদিন ধরে সে নিজে যেচে আমায় অবসর দিচ্চে।

কিন্তু তার সঙ্গে খেলে, বেড়িয়ে, ছেলে-মানুষি করেও দিনগুলোতে আগেকার সেই সহজ স্বভাবিক গতিটি আমি দিতে পারছিনে। কলকাতার এই বাসাটার ভিতরে আমার দুরন্ত মনটাকে আর একটি মুহূর্ত্তও ধরে রাখা যায়না। লতিকার পরামর্শ নিয়ে, বাঁধাছাঁদা করে এক দিন দেশ বেড়াতে বেরিয়ে পড়লুম।—অতসীদের খবর তার পর থেকেই আর পাইনে। হয়ত এতদিনে ঘটা করে অনিমেষের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে।—সে খোঁজেই বা আমার কাজ

কি? আমি জানি, অনিমেষ তাকে সুখী করতে পারবে। যাকে সুখী করবার অধিকার নেই, তার সুখ চাইবার অধিকারও ত কিছু আর খোয়া যায়নি। তা' কেন চাইবনা? সে সুখী হোক।—আমার এই অ-গোছালো জীবনের একটি গ্রন্থিও যেন তার পায়ে না জড়িয়ে থাকে। তার কাছে যদি ভুলেও নিজেকে কোনদিন এতটুকু প্রকাশ করে থাকি, আমার সে পাপের যেন ক্ষমা থাকে না, কেবল তার মন থেকে সেই স্মৃতির প্রতি রেণুকণা নিঃশেষ হয়ে ধুয়ে মুছে যাক্।

পূরো একটি বৎসর পশ্চিমের নানা সহর ঘুরে শীতের শেষাশেষি আবার আমরা বাংলায় ফিরে এলুম। কল্‌কাতায় তবু যেতে ইচ্ছে হলো না, আমার এক পিস্‌তুত ভাই কার্শিয়াংএর কাছে খুব বড় একটা চা বাগানের মালিক, তার ওখানে শীতের বাকী কটা দিন কাটিয়ে দিয়ে, কলকাতা ফিরব ঠিক করলুম।

এখানে আস্‌বার আগে আমার ধারণা ছিল, সবই বুঝি পাহাড় দেখব। এখন দেখচি, তা' নয়। বাড়ী ঘর, আপিস, কাছারি সবই একেবারে খোলা সমান জমির ওপরে, পাহাড়-টাহাড় সব আশে-পাশে দূরে দূরে।—সে সব জায়গার দৃশ্য নাকি খুবই চমৎকার!

একটা মস্ত মাঠ, তার একদিকে আমাদের বাংলা, অন্যদিকে চা-বাগানের বাবুদের আর বেঙ্গারদের বাড়ী-ঘর।—ইটের বাড়া একখানাও নেই, সবগুলোয় মাটির দেওয়াল, সাদা ধবধবে চুনকাম করা। দূরে দূরে এখানে-সেখানে উঁচু জমির উপর সাহেবদের বাংলোগুলি ঘন গাছপালার আড়াল দিয়ে ভাব্‌ছা' আব্‌ছা' চোখে পড়ে।

আমাদের মাঠের পরেই রেলের রাস্তা, তার ওপাশে কয়েকটা দোকান আর ডাক ঘর। ষ্টেশনটা হচ্চে এখানকার সভ্যভব্য বাবুদের বিকেলে বেড়ানোর জায়গা।—আমি কিন্তু ভুলেও সেদিক মাড়াইনে। চোখে কয়লার গুঁড়ো নাকে ধোঁয়া আর কাণে হাজার লোকের কলরব বয়ে নিয়ে আসতে আমার একটুও সাধ হয়না। ছোট একটা বগিতে করে আমি আর লতিকা দূরে বনের দিকে চলে যাই মাঝে মাঝে দু-একটা হাওয়াগাড়ী ইংরেজ স্ত্রী পুরুষে বোঝাই হয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। ধূলো-কাঁকর-ভরা অসমতল পথের উপর দিয়ে ওদের এই আনাগোনা ভারী করুণ মনে হয়।

একদিন বেড়িয়ে ফিরে আস্‌চি, হঠাৎ লতিকা এমন ভয়ানক চেচামেচি করে উঠ্‌ল যে ঘোড়াটা আর একটু হলেই ক্ষেপে গিয়ে বেগতিক বাধিয়েছিল আর কি! তাড়া তাড়ি সাম্‌লে নিয়ে লতিকাকে ধম্‌কে বললুম, 'হয়েছে কি?"

দাঁড়িয়ে উঠে আঙুলে ইসারা করে সে বললে, "দেখ্‌তে পাওনি?—অনিমেষ বাবু!"

দেখ্‌লুম, আমাদের ডানপাশে একটা সরু মেঠো পথ ধরে অনিমেষ হন্‌ হন্‌ করে হেঁটে চলেছে। চেঁচিয়ে ডাক্‌লুম, "অনিমেষ!"—একটিবার সে ফিরে তাকালে, তারপর মাথা গুঁজে একটা ঘন ঝাউবনের মোড় ঘুরে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

পরদিন ভোরে উঠেই মাঠ-ঘাট, গলি খুঁজি খুঁজে, তন্ন তন্ন করে তার খোঁজ করে বেড়ালুম, কিন্তু তার আর দেখাও নেই। বিকেলে পথে হেঁটে বাবুকের সেই জায়গা-টাতে ফিরে গিয়ে হতাশ হয়ে বসে পড়লুম। বেটু একটু অন্ধকার হয়ে এসেছে, কুয়াসা আশেপাশেকার চেতনার সাড়াটাকে মুখে যেন চাপা দিয়ে নিঃসাড় করে ফেলে রেখেছে, কেবল কোথা থেকে কে জানে দুটো একটা ঝিঁঝিঁপোকা তাদের একতারার এক পর্দায় ঘন্টার পর ঘন্টা ছড় টেনে চলেছে। আকাশ পাতাল কত-কি ভাবছিলুম, হঠাৎ মাথা তুলে দেখি, আমার ঠিক সুমুখেই ওই রাস্তার উপর একটা মোটা বল্কলে গাছ থেকে অবাধ ঢেকে কে একজন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। লাফ দিয়ে উঠে বললুম, "হ্যালো অনিমেষ, তুমি! ভালো লুকিয়ে চলতে জানো, যাহোক।"

ঠোঁটে আঙুল চেপে সে আমায় তার কথা কইবার অক্ষমতা জানালে, তারপর আমাকে আস্তে ইসারা করে কালকের মত পথটি ধরে ফিরে চল্ল। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ করে, কুয়াসার ভিড় ঠেলে, আঁকাবাঁকা বনের বাসা ধরে তার পিছনে পিছনে অনেক দূর গেলুম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা জায়গায় এসে হুঁস হলো, আমি একলা আছি। বার তিন-চার চাপা গলায় অনিমেষকে ডাকলুম, কেউ সাড়া দিলে না। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলুম, বাঁ'পাশে ড্রেণের ওপারে, ঘন বনের আড়ালে ছোট একটি মেটে ঘর,—তার খোলা জানালা দিয়ে খুব একটু আলো সুমুখের আঙিনাটিতে এসে পড়েছে।—পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলুম।—ঘরের দরজায় পা ছড়িয়ে বসে একটা হিন্দুস্থানী আপন মনে 'সুখা' টিপ্‌ছে, আমার সাড়া পেয়ে কাণ খাড়া করে বলে উঠ্‌ল, "কে?"

তার কাছ থেকে জানবার যা ছিল, সবই জানলুম—আমরা কল্‌কাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরই কি একটা অপরাধে অনিমেষ জেলে গিয়েছিল, সেখান থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মাস পাঁচেক ধরে এইখানে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে।

পরদিন অনেক হাঙ্গাম করে অনুমতি নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। আমায় টেনে তার বিছানায় বসিয়ে সে প্রথমটা খুব একচোট হেসে নিলে, হাস্‌তে হাস্‌তেই বললে 'বাচা গেল বাবা! অনেকদিন পরে প্রাণ খুলে একটু হাসা গেল। কাল্‌কে আমায় দেখে তুমি মুখের যে চেহারাখানা করেছিলে, ইচ্ছে হয়েছিল,তখনি আকাশটাকে চৌচির করে দিয়ে হাসি।"

তার রকম সকম দেখে আমার কিন্তু কাদতেই সাধ হচ্ছিল, বেশী কিছুক্ষণ নানা গল্প-গুজবে কাটিয়ে, আস্তে আস্তে তার কাঁধে হাত রেখে ডাকলুম, "অনিমেষ!"

আমি কি বলব, সে যেন বুঝতে পারলে, তার মুখখানি কালো হয়ে উঠ্‌ল বললে, "কি?"

আমি বললুম, "আমি জানি, তুমি আমাকে কিছু লুকোবে না। বল, সত্যি সত্যি কি তুমি অপরাধী?"

সে মুখে জোর করে একটুখানি হাসি এনে বললে, 'বাজার সঙ্গে আমার জ্ঞাতি

বিরোধ নেই ত যে, শুধু শুধু আমায় এখানে এনে পুরবে।"

আমি বললুম, "রাজা মানুষ ত, তারও ভুল হতে পারে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, "তুমি আগে প্রতিশ্রুতি দাও, এই নিয়ে একটা হৈ-চৈ বাধাবে না? এ-সব কথা কাকেও বলবার নয়।"

আমি বললুম, "সে পরে দেখা যাবে।"

আমার সুমুখ থেকে একটুখানি সরে বসে, আরেক দিকে মুখ করে সে বল্‌তে আরম্ভ করলে :—

"অপরাধ আমি করিনি। তোমার কি তা সম্ভব মনে হয়?

—তবু যে আমাকে এখানে এনে পোরা হয়েছে, সে অন্যায় করেও হয়নি, ভুল করেও হয়নি। আমি স্বেচ্ছায় এ শাস্তিকে গ্রহণ করেছি।

জেলে যখন ছিলুম, আমার চোখদুটো তখন কেবল বিদ্রোহ করত। বন্ধনকে আমি ত স্বীকারই করেছিলুম, আমার চোখদুটো তা করত না।—অন্ধকার! প্রাণটাকে সে অন্ধকারে খুঁজেই পাওয়া যায় না, আছে কি নেই,—কেবল একটা মৃত্যুর শিখরে বসে নিঃশ্বাসগুলো যেন পাহারা জাগত।

দিনের বেলা কপাটের ফাঁকে একটু যা আলোর আভাস পাওয়া যেত, আমার সমস্ত দেহখানি দিয়ে সেটুকুকে আমি পান করতুম।- রাত্রে তাও জুটত না। সমস্ত রাত ঠায় বসে জাগতুম। তন্দ্রার ঘোরে চোখদুটি যতবার নুয়ে নুয়ে পড়তো, ততবার তার ওপর দিয়ে খানিকটা করে রাত গড়িয়ে চলে যেত। ভোরের পাখী একটা দুটো ডেকে উঠতেই সচকিত হয়ে উঠে বসতুম, এইবার বুঝি রাত ফুরোল, আসচে আমার আলো-বন্ধু, আমাদের সেই খোলা নীল আকাশখানির খবর নিয়ে,—তাকে ডেকে কাছে বসাতে সমস্ত মন আথালি-পাথালি করে উঠ্‌ত।—কিন্তু দিনের সাড়া পেয়ে রাত তার ফিরিয়ে-আসা-পথখানিকে হামা দিয়ে চলে উপভোগ কর্‌ত… সে কি অসহ্য উৎকণ্ঠা।

ছমাস সেখানে ছিলুম। মনটাকে সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছিনে মনে হচ্চে ছ' যুগ। অন্ধকারে সময়টা হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে, তার সত্যিকার চেহারা ধরা যায় না।।

একেবারে গোড়া থেকে আমি বল্‌ব। অতসীর কথা তোমার মনে আছে?—একই দেশে আমাদের মামারবাড়ী। সেইখেনেই খুব ছেলেবেলায় তাদের সঙ্গে আমার জানা শোনা। আমার মা নেই, মায়ের স্নেহ-যত্ন যদি কারো কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব হয়, তবে তার মার কাছ থেকে আমি পেয়েছিলুম।

এককালে ওদের অবস্থা খুবই ভালো ছিল। অতসীর বাবা অনাদিবাবুর অসুখ একটা না একটা সর্ব্বদাই লেগে থাক্‌ত, সমস্ত জীবনে দুশো টাকাও সুনিয়মে তিনি রোজকার করেছেন কিনা জানিনে, এদিকে ওষুদে-বিষুদে অনেক টাকা বেরিয়ে গেল, অতসীর বিয়ের বয়স যখন হলো, তখন সংসার এক রকম অচল হয়ে পড়েছে।

এমনি সময় ডাক্তার দেখাতে কল্‌কাতায় এসে অনাদি বাবু আমায় ধরে পড়লেন,

বললেন, "মেয়েটার একটা যাহোক গতি তোমাকেই করে দিতে হবে।"

দুটো দল আছে, জানো? একদলের মত হচ্চে,—সংসারে প্রতিষ্ঠা হলে, অভাব-অভিযোগ সব চুকিয়ে তবে বিয়ে করাটা ঠিক। আরেক দল তর্ক তুলে বলে,—অভাবই যদি চুকে গেল, তবে আর বিয়ে করতে গেলুম কেন? টাকা করে তারপর বিয়ে, এতো ঠিক কথা নয়, বিয়ে করে টাকা—এই হলোগে ঠিক কথা।—বেশীর ভাগ বাঙালীর ছেলে এই শেষের দলে পড়ে, দেখলুম। কেবল আমার জ্ঞাতি-ভাই রমেশ অতসীকে দেখে, পছন্দ করে, একটি পয়সাও না নিয়ে তাকে গ্রহণ করতে রাজি হলো। সে সদ্য-সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেচে, চালাক-চতুর ছেলে, দিব্যি পরিপাটী চেহারা।—আমাদের সকলেরই খুব মনে ধরে গেল। তার সঙ্গেই অতসীর বিয়ের কথাবার্তা এক রকম পাকাপাকি হলো,—এর প্রধান উদ্যোগী হলুম আমি।

তার কিছুদিন পর দেশে জমি জমার দখল নিয়ে রমেশদের তরফের সঙ্গে আমাদের তরফের খুব বড় রকম একটা ঝগড়া হয়ে গেল, মারপিটও দুটো একটা হলো।—দেশের লোক জানলে, এই দু-ঘর পরস্পরের শত্রু, এদের সদ্ভাব আর কোনো কালেই হয়ে উঠবে না। আমি রমেশকে গিয়ে বললুম, দেশে যা ঘটেছে, তা নিয়ে আমাদের মধ্যে বিরোধ রাখাটা ঠিক হবে না; বরং আপোষ যাতে হয়, আমরা দুজনই একজোট হয়ে তার চেষ্টা করব।—সে আমার কথায় কর্ণপাত করলে না।

কিছুদিন গেল। এরই মধ্যে একটু একটু করে আমি জানলুম, রমেশ লুকিয়ে মদ ধরেছে। আরো জানলুম—সে অনেক কথা। খুলে না বললেও তুমি সবই বুঝতে পারবে। অতসীকে নিজের বোনের মতো চিরকাল দেখে এসেচি, জেনে শুনে ওকে একটা দুশ্চরিত্র মাতালের হাতে তুলে দিতে আমার খুবই বাধবার কথা,—নয়? তাছাড়া এ বিয়ে প্রধানতঃ আমারই জন্য হচ্ছিল, দেবতার কাছে এ অপরাধের জবাবদিহি আমাকেই করতে হবে।

কয়েকটা দিন বসে বসে ভাবলুম। তারপর আর পথ না পেয়ে অনাদিবাবুকে গিয়ে বললুম, "আপনি রমেশের চাইতেও ভালো একটি ছেলের খোঁজ করে অতসীর বিয়ে দিন। এ বিয়ে হতে পারবে না।"

অনাদিবাবু চড়া মেজাজের লোক, গরম হয়ে উঠে বললেন, "এ তোমার অন্যায় স্বার্থপরতা, তা যাই বল। তুমি এ গরীবের ওপর দিয়ে তোমাদের জ্ঞাতি শত্রুতার শোধ তুলতে চাও। অত চেষ্টা-চরিত্রের পর যা'ও একটা ভালো সম্বন্ধ ভগবান্ জুটিয়ে দিলেন, তোমার মুখের কথাতে সেটাকে আমি হারাতে পারিনে।"

আমি বললুম, "জ্ঞাতিশত্রুতার শোধ নেবার পথ অগুণতি রয়েছে, সেজন্যে আপনাকে এ অনুরোধ করতে আমি আসিনি। তাছাড়া এ সম্বন্ধ ভগবান আপনাকে জুটিয়ে দেননি, আমিই জুটিয়ে দিয়েছি।—এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারবেনা।"

কিন্তু তাঁকে এত করেও বোঝাতে পারলুমনা। রাগে ঘুম কাকে বলে, সে

ব'দিন তা' পারিনি। অসহ্য সে যন্ত্রণা – উঃ। কিছুদিন তা' ভুগে নৈনিতাল চলে গেলম, ভাবলুম, সেখানে গিয়ে ভুলব।

ভোলা কি যায়? অংসার মুখখানি সর্ব্বদাই চোখের সামনে ভেসে বেড়াত। ওর মতো ভালো মেয়ে বড় ও চোখে পড়ে না। স্নিগ্ধভাব প্রতিমা। কুমারী-জীবনটা ত কষ্টে কষ্টেই কাটিয়ে গেল, বিবাহিত জীবনও কি ভয়ানক দুর্ভাগ্য তার জন্য বহন করে আসছে। আর এ জন্য আমিই দায়ী, আমিই।

চোখ বুজে আর ঠোঁটের পাশে সেদিনের তিরস্কারের বাণী ছায়ায় আমায় তাড়া করে বেড়াত। শ্মশানের প্রেত লোককে যেমন করে তাড়া করে নিয়ে বেড়ায়।—এমন হলে পাগল হয়ে যাব মনে করে আবার দেশে ফিরে এলুম।

সেদিন তোমাকে ষ্টেশনে দেখে মনে করলুম, অতসীকে তুমি ভালোবাসো। তোমার মুখের দিকে চেয়ে কেন আমার এ কথা মনে হলো তা' জানিনে, আশা মানুষের চোখে কত বিচিত্র রঙীন কাচই না পরিয়ে দেয়। ভাবলুম, তোমাকে পেলে অনাদিবাবু রমেশকে ছাড়তে একটি দিনও সবুর করবেন না।—জীবনে তেমন নিশ্চিন্ত আরামের নিঃশ্বাস কেবল আর এক দিন ফেলেছি,— সই যেদিন আমার জেলের হুকুম হলো।—মুক্তি, মুক্তি। কিন্তু সে মুক্তির স্বাদ একটি দিনও তুমি আমায় উপভোগ করতে দাওনি। তুমি বললে, তোমার মন অতসীকে চায়না।"

—এখানটায় আমি উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, "এ সব কথা তখন তুমি আমায় বলনি কেন?'

অনুযোগের স্বরে সে বললে, "এ সব শুনলে তুমি হয়ত দ্বিরুক্তি না করে তাকে নিতে রাজী হতে। কিন্তু তোমার মন যাকে চায় না, নিজে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে তাকে ধরে বেঁধে তোমার গলায় আমি ঝুলিয়ে দিই কি করে?"

দুঃখ, অত ক্ষোভের মধ্যেও হাসতে সাধ গেল অসহায়ের মতো বসে পড়ে বললুম, "তারপর?'

সে আবার বলতে লাগল –

তারপর যখন কোনো উপায়ই আর রইল না, তখন আমি তাকে নিজে বিয়ে করতে রাজী হলুম। তাকে যদি বিয়ে করতে হত, সেটা যে আমার কত বড় প্রায়শ্চিত্ত হত, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। নিজে ত সুখী হতুমই না, তাকেও সুখী করতে পারতুম কি না, কে জানে। আমি যে তাকে ভালোবাসিনি।

একবার ভাবলুম, প্রণয় এবং পরিণয়ের দেবতা যে একজনকেই হতে হবে, তার কোন অর্থ নেই। স্ত্রীকে স্বামীর সহধর্ম্মিণীই বলা হয়েছে, এবং যুক্তের তারা দুজন পুরোহিত, তাদের মধ্যে ধর্ম্মের যোগ থাকলেই হলো, কর্ম্মের যোগ, ধর্ম্মের যোগ থাকলেই হলো, প্রাণের যোগ আছে, কি নেই, তাতে কিছুই এসে যাবেনা।—কিন্তু মন সে কথা মানলে না।

আজ মনে হচ্ছে, হয়ত তাকে অন্তরঙ্গ ভাবেই আমি ভালোবাসতুম, মায়ের পেটের বোনকে লোকে যেমন ভালোবাসে,

দম্পতী যে জায়গাটিতে আদম এবং ঈভ, সে জায়গাটিতে যে ভালোবাসা এক মুহূর্ত্তও টিঁকতে পারেনা।

অনাদিবাবু খুব খুসী হয়েই রাজী হলেন। কিছুদিন নানা অজুহাতে তাদের ভুলিয়ে রেখে, মনটাকে তৈরি করে নিতে উঠে পড়ে লাগলুম।—রমেশের বিয়ের ভাবনা ছিল না। খুব ভালো জায়গাতেই ধুমধাম করে তার বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু শুনলুম, আমার ওপর সে মহা খাপ্পা হয়ে আছে, সুবিধা পেলেই এ অপমানের শোধ তুলবে।

কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও মনটাকে আমি বোঝাতে পারলুম না।—দিন যত যাটে, ভয়েতেই অস্থির হয়ে পড়ি। আর ক'টি দিন আলোয় আমার অধিকার, তারপর সব কালো,--সে কতখানি কালো? --কতরকম করে ভাবতে চেষ্টা করলুম, এই যে বজ্র, এ তো আমার দেবতারই বুকের কোটি করুণা-কণা চুয়ানো, সুকৃতির এমন শাস্তি বা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? - কিছুতেই কিছু হয়ে উঠলনা।

নেই, নেই, পথ নেই। যেদিকে চাই, কেবলি হতাশার নিবিড় অন্ধকার, নিয়তির ক্রূর পরিহাস।

একদিন বিকেলে বেড়িয়ে ফিরে এসে দেখি, ওপরে আমার শোবার ঘর থেকে রমেশ তাড়াতাড়ি নেমে আসচে। সিঁড়িতে তার সঙ্গে দেখা হলো, আমার মুখের দিকে না চেয়েই সে বললে, "তোমার জন্যে সেই তিনটে থেকে বসে আছি,—তা তোমার আর দেখাই নেই। আজকে কোনো কথা হবেনা, সময় নেই।—কাল্ আবার আসব।" বলেই তাড়াতাড়ি সে নেমে চলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তার পথের দিকে উতলা হয়ে চেয়ে রইলুম, তারপর আস্তে আস্তে উপরে এসে উঠলুম।

নিজের দুরদৃষ্টের কথা, রমেশের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লুম। জান্‌তুম না, অদৃষ্ট এত শীগগির এমন প্রসন্ন হয়ে উঠবে, আমার মুক্তি এত কাছে।—ভোরে উঠে দেখি, সারা বাড়ীটা পুলিশ এসে ঘেরাও করেছে, চাকর-বাকররা আনাচে-কানাচে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস করে কথা কইছে। আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিল না, আস্তে আস্তে উঠে দরজা খুলে দিলুম।

আমার বাক্স-তোরঙ্গ উজাড় করে জামা কাপড়ের ভাজ খুলে, চিঠির তাড়া ঘরময় ছড়িয়ে, দু'ঘণ্টা ধরে খোঁজাপাতা করে নিরাশ হয়ে যখন তারা ফিরে যাবে ভাবচে, তখন কেমন করে আমার খাটের নীচেকার একটা ভাঙা বেতের বাক্সে ছেঁড়া কাগজ-পত্রের নীচে থেকে গোটা পাঁচছয় টাটকা 'মসাবের' টোটা বেরিয়ে পড়ল। রমেশ কি কাজে কাল এসেছিল, সেটাও খুব ভালো করেই বোঝা গেল। দুহাতে টোটাগুলো নিয়ে খেলতে খেলতে খুব হাবার মতো মুখ করে, পুলিশের একটি লোক দুষ্টুমি করে আমায় বললে "এগুলোকে কি বলে, মশাই?"

নীচে গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, তারা তাতে আমায় উঠিয়ে দিলে। গাড়ী যখন ছাড়ল, দেখলুম, আমার গেটের কাছে

দাঁড়িয়ে, দুটি হাত জোড় করে, হাসতে হাসতে রমেশ আমায় নমস্কার জানাচ্ছে।

আমার একটি বন্ধু ব্যারিষ্টার হাজতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলে। সে খুব ভরসা দিয়ে আমায় বলে গেল টোটা-ফোটার কথা তুমি কিছু জান্‌তে? সাফ্‌ 'ডিনাই' কোরো। পিনাল্‌কোডের সাধ্য নেই, তোমার একটি কেশাগ্রও স্পর্শ করে

কিন্তু বিচারের দিন আমি কোনো কথাই কইলুম না,—শুধু বললুম, আমার কিছু বলবার নেই, যে শাস্তি হয় হোক্‌।

বিচারে ছ'মাসের জেল হয়ে গেল।-

মুক্ত, মুক্তি,—এই পরিপূর্ণ বন্ধনের মধ্যে আজ পরিপূর্ণ মুক্তি আমার।"

—গভীর বেদনায় আর্ত্তনাদ করে আমি বলে উঠ্‌লুম "আর অতসী, তার কথা ভাবলেনা একটু?—তোমার মনে কি দয়া নেই?"

দুহাতে মুখ ঢেকে সে বললে "হয়ত নেই। সে বিচারের ভার ভগবানের হাতে রইল। আমি কেবল একটি কথা জানি,—রমেশের হাত থেকে তাকে আমি বাঁচাতে পেরেছি।'

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী।

তরুকুমারী

Now begins the tale of Hamadryad

W S Landor

যেথা হ'তে দেখা যায় দূরে অতি দূরে
উঠিয়াছে 'কারিয়া'র রত্নসিঁথী যেন
'নিডস্‌'-নগরী, সেই দূর গিরিদেশে
জন্মেছিল রাইকস্‌। নিকটে তাহার
ফেন-পুষ্প শিরে ধরি' সাগরোর্ম্মিদল
খেলিতে খেলিতে দূরে মিলাইয়া যায়
আরক্তিম জলনীলে। উৎসবের দিনে
গীত-বাদ্য মুখরিত যাত্রীর জনতা
দেখা যায় সেথা হ'তে; দেশোয়ালী যারা-
কপালের চারিপাশে গোলাপের সাথে
পরিয়াছে শ্যাম-লতা; বাড়ী যাহাদের

পা ওয়নে' (বিরাজেন সিন্ধুকূলে যার,
বিরাট মন্দিরে, দেবী ভৈরবী 'এথেনী')
তা'রা পরে ভায়োলেট, বড় পরপাটী,
গোছা-করা, জলপাই পাতার সহিতে।
নানান্‌ জাতির নানান্‌ ধরণ তাজ,
কিন্তু এক পূজাবিধি—ভক্তি সবাকার
এক দেবী পদে।—বিধি তাঁর[১] সর্ব্বমান্য,
হাসিতে তাঁহার কোষে অসি ফিরে' যায়
দেব-সেনানীর, বজ্র তুলে' রেখে দ্যায়
স্বর্গরাজ; বন্দে তাঁরে সাগর-অধিপ
অতি সে চঞ্চলমতি দেব 'পসীডন্‌',

১। আফ্রোদিতি বা ভিনাস্‌—রতিদেবী।

শীতল গহ্বরে বসি' অতলের তলে।
প্রেতরাজ[২] 'ডিস্'—এত যে কঠিন প্রাণ—
তিনিও করেন স্তুতি, যদি কৃপা করি'
বধূর বিমুখ মুখ ফিরাইয়া দেন
ওষ্ঠে তাঁর চুম্বন-পিয়াসী,—বলে চরি'
যা নলা যাহারে[৩]; শুধু তাই নয়, শেষে
ভাষণ সে বৈতরণি-স্রোতঃ সাক্ষী করি'
জানাইলা পণ এই, বাসনা পূরিলে
নিত্য যোগাবেন ফুল, 'এনা'র উদ্যানে[৪]
বধূর অঞ্চল টানি' ফেলেছিলা যত—
তারো বেশী, সুরভি ও মনোহরতর।

দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি' পিতার ভবনে
চেয়ে আছে রাইকস্। উপত্যকাবাসী
সকলে চলেছে ধেয়ে নগরীর পানে,
দীর্ঘ জনস্রোত, যেন আলোক-পুলকে
বাহিরিছে উৎসমুখে গিরিনদী ধারা,
উর্ম্মির উপরে উর্ম্মি। যেতে মানা তার,
পারবে না করিবারে একটি মানসা,
লভিবে না করস্পর্শ, কে জানে কাহার।—
ভবে প্রাণ কাঁদে। পিতা ডাকি কহিলেন
'পুত্র রাইকস্, বয়স হয়েছে মোর,
আমি জানি ও সকল নিরর্থ আমোদ।

একটি নিঃশ্বাস ফেলি' থেমে গেল বুড়া,
বুড়াদের ধরণ যেমন; বোধ হয়
অন্তর-অন্তরে বোঝে কত নিরর্থক।
রাইকস্ কহে মনে মনে 'আমি কিন্তু
থামিনি এখনো,' শপথ করিতে তাই
বাসনা তাহার।

"তার চেয়ে যাও তুমি
—এরিয়ন গেছে চলে'—পাহাড়ের ধারে,
বল্কল তুলিয়া ফেল' ওক-বৃক্ষটার,
শাখাগুলো কেটে আনো, পরে একদিন
গোড়াটার চারিপাশে বেশী করে' খুঁড়ে'
চালাবে কুঠার,—শীত এলে কোরো সেটা

গেল রাইকস্। দাঁড়াইল যেথা আসি',
সেথা হ'তে ভালো করি', বহুদূর ধরি'
চোখে পড়ে চলে যারা নগর তোরণে।
দেখিল তথায় রহিয়াছে এরিয়ন,
—কালোচুল, নগ্নবাহু, দৃঢ়পেশী তরু,
কোন্‌খানে প্রথমে যে করিবে আঘাত
ঠিক নাহি পেয়ে, তুলিয়া কুঠারখানা
থমকি' দাঁড়ায়ে আছে যেন দ্বিধাভরে।
হোর' তারে ডাকি' কহে সাবধানী বুড়া—
'হ্যাদে দেখ, হেথা আসি থালিনস-সুত,

২। পাতাল বা মৃত্যুপুরীর ঈশ্বর।

৩। ডিস্ বা প্লুটো—'সিরিস'-দেবীর কন্যা 'পার্সিফনি'কে হরণ করিয়া পাতাল পুরীতে লইয়া যান ও সেখানে বিবাহ করিয়া, তাঁহাকে আপনার রাণী করেন। সিরিস-দেবী কন্যার পিতা স্বর্গরাজ "জ্যুস্"কে অভিযোগ জানাইলে, তিনি, মৃত্যুপুরী হইতে ফিরাইয়া আনা কঠিন বলিয়া, সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই; অবশেষে সিরিস দেবী একান্ত অধীর হওয়ায়, পৃথিবীতে শস্যহানির সম্ভাবনায়, (সিরিস-দেবীই পৃথিবীকে শস্যশালিনী করেন) এই ব্যবস্থা করিলেন যে 'পার্সিফনি' ছয়মাস পাতালে ও ছয়মাস পৃথিবীতে বাস করিবেন। সেইরূপ তদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে—পৃথিবী ছয়মাস শস্যবতী থাকেন, বাকী ছয়মাস সিরিস দেবী কন্যাবিরহে মুহ্যমানা।

৪। ডিস্ যখন 'পার্সিফনি'কে হরণ করেন, তখন উক্ত দেবকন্যা 'এনা' অধিত্যকায় পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। সেকালে অঞ্চল বিস্রস্ত হওয়ায় ফুলগুলি পড়িয়া গিয়া থাকিবে।

মউমাছি আছে নাকি নিকটে কোথা'ও ?
—না ও ভীমরুল ?'

যুবা কর্ণ ফিরাইয়া
আবরিল করপুটে, সুদূর উদ্দেশে,
অবহিত হয়ে। অতি মৃদু কলশব্দ
শুনিল প্রথমে ক্রমে সে গুঞ্জন হ'ল
স্ফুটতর, আরো সুমধুর ; তারপর
বোধ হ'ল পরিচ্ছিন্ন যেন সুর-লয়ে,
শেষে ভাসে ভাষা—মধুর মিনতি যেন।
কহিল ফিরিয়া, 'কাজ নাই, এঁকিয়ন,
কাটিয়ো না, সব ফাঁপা ; দেবযোনি কেহ
ভিতর হইতে যেন কহিছেন কথা !
আবো কাছে এস দেখি'—দুইজনে পুনঃ
ফিরিল গাছের দিকে ; হেনকালে ও কি !
ভূমিতলে বসি' এক কুমারী-রতন,
জীবন্ত প্রতিমা, দুই করে দুই দিকে
শেহালার মখমল্ চেপে ধরে' আছে।
নয়ন-পল্লবে তার দীর্ঘ পক্ষ্মরাজি
অবনত, ইন্দুপাণ্ডু কপোলের বিভা,
কিন্তু সে নিখুঁত দুটি অধর-পাতার
কি রঙ্গিমা ! বিম্বফল বর্ণে হারি মানে।
অলকে দুলিছে যেই 'আনিমণি' ফুল—
নহে তত ঢলঢল পেলব কোমল,
তলে তার মুখখানি যেমন, আমরি !

'কি করিছ হেথা একা ?' কহে এঁকিয়ন
কিছু ভয়ে কিছু ক্রোধভরে। দুটি আঁখি
তুলিয়া চাহিল বালা, কিছু কহিল না।
রাইকস সচকিতে দাঁড়াইল সরে'
এক পা' পিছায়ে, ভয় তবু বেশী নহে ;
বক্ষ ঘন দুলে উঠে, শ্বাস রুদ্ধ হয়—
কি কথা বলিবে তবু কথা না জুয়ায়।

'বিরস বুড়ারে ত্বরা কর না বিদায় !'
কহে বালা ; কোনো কথা প্রভুপুত্র-মুখে
শুনিতে সে দাঁড়াল না, চলে গেল বুড়া,
সে তখন ভয়ে সারা, পলাইলে বাঁচে।
ঝকিয়া উঠিল তার পিঠের কুঠার
দুজনারি চোখে !
ত-কু। 'তুমি ও তাহলে চাও
নির্দ্দোষীর রক্তপাত ! কেন বল না গো ?
নাহি ত' মানত কিছু—কোনও দেবতা
মাগিছে না বলি ওই ওক-তরুটিরে ?
রা। 'কে তুমি ? কোথায় থাকো ?
কেন বা হেথায় ?
কোথা যাবে বল শুনি ? শুভ্র-পীত-বাস,
অথবা সে আকাশের মতন নির্ম্মল
ঊষাসম ভূষা যাঁহাদের, হেরি নাই
তাহাদেরো অঙ্গে কভু এ হেন বসন !
কি সুন্দর শ্যামল নিচোল অঙ্গে তব
রয়েছে নিলীন ! শৈবাল শিলার গায়ে,
বৃক্ষে পত্র যথা ; হের তবু তারি তলে
উঠিছে পড়িছে তব উরস-যুগল,
মৃদুমলয়পরশে পল্লব যেমতি
নদীতীরে, সুভঙ্গিম পুন্নাগ-পাদপে।'

●

ত-কু। বড় ভাল লাগে বুঝি পিতৃগৃহখানি ?
রা। ভাল লাগে, বড় ভাল লাগে ; তবু তারে
ছাড়িয়া আসিতে পারি তব গৃহ লাগি',
যেখানেই হোক্ ; যদিও দুয়ারে সেথা
আছে চিহ্ন আঁকা,—তৃতীয় বরষ হ'তে
প্রতি জন্মদিনে ক্রমে কত বাড়িয়াছি
তারি নিদর্শন ; আছে সেথা শয্যাপাশে
আমার মায়ের হাতে কত কি যে বাঁধা,
কুদৃষ্টি লাগে বা পাছে তাই কাটাবারে।

আর আছে ধনু মোর—দেখাব তোমায়—
জিনিয়াছি গত চৈত্রে ছুটাছুটি খেলি'।
ত-কু। ভেবে দেখ কত কষ্ট ছেড়ে চলে আসা
হেন গৃহ, একদিন একরাত্রি তরে
ছেড়ে কভু থাকনি' যাহারে।
বা। ওগো বালা,
কষ্ট নহে, জন্মগৃহ ছেড়ে চলে' আসা
কষ্ট কেন হবে?—যদি এই পৃথিবীতে
বেসে থাকি ভালো একজনে, সেই আদি
সেই শেষ, চিরতরে; সেও যদি বলে,
'ভালো আমি বাসিব তোমারে চিরযুগ'—
শুধু এইটুকু বলা, মুখে বলা শুধু,
তা' হলেই হবে, কম সে কি! সেই সাথে
প্রাণ যদি সায় দেয় প্রেমের বিশ্বাসে।

ত-কু। কে শিখা'ল এ বয়সে এত বাতুলতা?
বা। দেখেছি প্রণয়ীজনে, তাই শিখিয়াছি।
ত-কু। বাঁচাবে না বৃক্ষটারে?
বা। পিতা শুধু চান
বল্কল উহার; বৃক্ষ কিছুকাল আরো
রহিবে যেমন আছে।
ত-কু। কিছুকাল আরো।
পিতা তব দিন মোর গণিছেন তবে?
বা। আর কোনো বৃক্ষ হেথা নাই? তলে যা'ব
এমনি কোমল ঘন শেহালার দল?
কে তোমারে পাঠাইবে দূরে? কেবা তোমা'
বিলম্বিলে শুধাইবে কেন দেরী হল?
মেঘ তব চরে বুঝি নিকটে কোথা'ও?

ত-কু। মেষদল নাহি মোর যত ক্ষুদ্র হোক্—
আছে যার চেতন স্পন্দন, সূর্য্যালোক
বায়ু আর সুস্নিগ্ধ শিশির ভুঞ্জে যারা—
হিংসা নাহি করি! যে জন সুন্দর, আহা,
(তুমি ও সুন্দর কত!) কেন ব্যথা দেয়
সকল সৌন্দর্য্যমূলে? শোন নাই কথা
তরুকুমারীর, পূর্ব্বে কভু কারো মুখে?
বা। কিছু শুনিয়াছি বটে, কহ তবু শুনি
তাদের কাহিনী কোনো। বাসব কি হাঁগো
তোমার চরণমূলে? ক্লান্ত নহ তুমি?
হেথাকার তৃণলতা বড়ই কোমল!
না-না, তুমি ব'সো ওইখানে, ভয় নাই,
খুব কাছে আসিব না—কোরো না সংশয়!
একটু দাঁড়াও দেখি, গত বছরের
বীজকণা বৃক্ষতলে যদি পড়ে' থাকে!
এত সূক্ষ্ম বসন তোমার—বীজটিও
বাজিবে বরাঙ্গে তব, যত ক্ষুদ্র হোক্।
নাই তবে, বাঁচা গেল। যবে ইচ্ছা পরে
আমারে বিশ্বাস কোরো, তত্দিন শুধু
বসিবারে পাই যেন সম্মুখে অদূরে।

ত-কু। এই বসিলাম, তুমি বোসো, শান্ত হও!
রা। কি দেব-দুর্লভ রূপ। ওগো মর্ত্ত্যবাসী
পূজা কর,—এ যে আফ্রোদিতি! স্বর্গে তিনি?
না, এই এখানে বসি'! বসেছিলা আসি'
পূর্ব্বে যথা সেই এক রাখালের পাশে
সাগর বিম্বিত ছায়া পর্ব্বত-শিখরে,
ঘটাইল বংশে তার সে কি সর্ব্বনাশ![৫]

৫। ট্রয় রাজকুমার 'পারিস' রতিদেবীর প্ররোচনায় মেনেলস-পত্নী হেলেনকে হরণ করিয়া সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন বাল্যে পিতৃপরিত্যক্ত হইয়া রাখালদের সঙ্গে বাস করিতেছিলেন তখন 'আইডা' পর্ব্বতে সুবর্ণ আপেল ঘটিত বিবাদের মীমাংসা-সূত্রে আফ্রোদিতির মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হন। এই কাহিনী টেনিসনের 'ইনোনি'-কবিতায় বড় সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ত-কু। ভক্তি রেখো দেবতায়, কেন অবিশ্বাস
প্রার্থিজনে? পাবে প্রতিদান—কতখানি
জানিতে চেয়োনা, জেনো শুধু—খুব বেশী।
বস, বস, না, না,—উঠিওনা বাহকস্!
প্রেম যে অবৈধ বিনা পাণিগ্রহণ।
বল আগে কভু তব অধর-আস্বাদ
পাইবে না মর্ত্ত্যকন্যা কেহ, তবে লহ
চুম্বন আমার; আগে বল, তবে পাবে।
বা। স্বর্গদেবতারা। হেরাদেবী। আফ্রোদিতি।
সাক্ষী থাকো সবে, তোমাদের নামে
এ বন্ধন হোক তবে সুবিধি-সম্মত,
এস তবে লয়ে যাই পিতৃগৃহে মোর।
ত-কু। না, মোর ঘরে ররে তুমি—তা'ও হবেনা।
বা। সে কোথায়?
ত-কু। এই বৃক্ষমাঝে।
বা। ঠিক বটে।
তরুকুমারার কথা শুনি একবার।
ত-কু। অনুনয় করিও পিতারে, বৃক্ষ মোর
নষ্ট নাহি হয়; বোলো তারে ভালো করে',
বছর বছর দিব মধু, মূল্য যার
ন'টি বড় মেষ; মোম দিব যত লাগে
জ্বালাইতে বারোমাস সকল পূজায়,
—তারো বেশী। ওকি। মুখ কেন নুয়ে পড়ে।
কাঁটা লেগে কেটে যাবে চপল যুবক।
ওঠো, ছি।
বা। কি লজ্জা। কেমনে দেখাই মুখ।
ওগো দয়া কোরো। বলিবনা 'ভালবাসো',
তা' বলে কোরো না ঘৃণা। আর একবার
দেখি তোমা—না না, প্রতিদিন দিও দেখা।
তুমি ভালোবাসিওনা, আমিই বাসিব।
বড় উচ্চে লক্ষ্য করেছিনু, শর তাই
ফিরে আসি' ভেদিয়াছে আমারি মাথায়।

ত-কু। 'ভালোবাসি' না বলা'য়ে ছাড়িবে না?
—যাও।
বা। সুখ যদি হয় আহা অমৃত-নিদান
(নাহলে ত্রিদশগণ ভুঞ্জবে কেমনে।)
আমিও অমর তবে; দেবতা শুনেছে
পণ মোর। বামে চাও, ফিরায়ো না মুখ।
আমার চুম্বন কই?
ত-কু। পুরুষের রীতি বুঝি
আগে পেয়ে চায় পিছে, স্বভাব এমন।

রুদ্ধ হ'ল অধরে অধর, বক্ষ'পরে
নুয়ে প'ল মাথা। সেই কালে বনমাঝে
দিকে দিকে হাস্যধ্বনি হয়েছিল নাকি,
কার হাস, কেন হাসে, কেবা শোনে তায়।

মধ্যাহ্ন অতীত হয়ে গেছে বহুক্ষণ,
থালিনস্। গৃহে তব সুগন্ধ সঞ্চরে।
মকরক পুদিনা তুলসী আদি কত
সুগন্ধি বনজ-মিশ্র ছাগমাংসভাগ
সুদগ্ধ, সাজানো আছে বাহকস্ তরে।
অবশেষে আসিল যুবক; ক্ষুধা নাই,
তবু ভাণ করি' বসিল সে টানি' লয়ে
চিনিটাই আগে; তা' হোর কহেন পিতা—
'বৎস রাইকস্, বহুক্ষণ রৌদ্রে থাকি'
দৃষ্টি তব গেছে ঝলসিয়া; বৃক্ষটারে
কাটিতে হয়েছে কষ্ট? রস আছিল না?
এত শুষ্ক হ'ল কিসে। হইবারি কথা—
আমার মতন বৃদ্ধ, বড় পুরাতন!
বাহকস্, মুখে তার গ্রাস বেড়ে যায়
চিবাতে চিবাতে, মাংস হিম হয়ে এল,
বিরস বিস্বাদ, অবশেষে সুবর্ণ মদিরা
বারেক করিল পান, তাও ভুলেছিল

এত পিপাসায়। পিতা নিজে দিল ঢালি
পাত্র ভরি', কহিলেন 'জল ঠিক নয়,
ছাগমাংস সাথে কর মদিরা সেবন,
ভেবোনা এ প্রথামাত্র, শাস্ত্রের বিধান!

হেন মতে চিত্ত দৃঢ় করি' কহিল সে
আধেক সাহসভরে আধেক লজ্জায়—
'পিতা, বৃক্ষটি যে দেব-বৃক্ষ। বর্ষে বর্ষে
মোম মধু দিবে তোমা বহু পরিমাণ;
দেবগণে ভয় করে— দেবতার প্রিয়
আছে একজন; সেইজন (কহিল না
কেবা সেই, মুখ লাল হ'ল) বলিয়াছে
দিবে সব, পরে আরো করিতে সে পারে।
বেশী নহে, দুই চারি পূর্ণিমার পরে
কি করে দেখি, তার পরে যদি
নাহি পাও মধু কিম্বা মোম, কেটে ফেলো।'
'দাদ তোরে দিয়াছে দেবতা!' কহে পিতা
খুসী হয়ে, 'সদা চোখ রাখিবি সেথায়,
উপরে ও নীচে, সকল ফাটল হ'তে
আরো বেশী পাই যেন, কে রাখে হিসাব?'

রাইকস্ যায় প্রতিদিন; বনদেবী
দেখা নাহি দেয় বেশী; প্রেম নিয়ে খেলা
জানে সে অপ্সরী। বড় মৃদু বাজে যবে—
বাঁশীখানি না বাজায়ে শ্বাস চেপে ধরা
আরো যে মধুর! প্রণয়ীর হা হুতাশ
বড় ভালো লাগে,—যবে অলক কাঁপায়ে
গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়িত কপোলে,
সুখ উপজিত, শীতল করিত যেন
নীল ধমনীর তাপ, প্রেমের প্রদাহ।
বিরহের কালে তার উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ
লাগিত মধুর। ভালো যারা খুব বাসে,
—হোক্ দেবী অথবা মানবী— কোন্ বালা
সুখ চেয়ে দুঃখ দিতে ভালো নাহি বাসে?

একদিন রাইকস্ বন হ'তে ফিরে'
চলিয়াছে দুঃখ ভরে; দেখে দুঃখ হ'ল,
ডাকি' কহে 'ফিরে এস', এত বলি' তার
স্কন্ধবাস' পরি আপনার দুইহাতে
বিনাইল করাঙ্গুলি, পাশে দাঁড়াইয়া।
নিয়ে গেল তারে যেথা এক স্রোতস্বিনী
শীতলসলিলা, সমতল বালু দিয়ে
বয়ে যায় লতাপাতা ফুলের মাঝার।
সেথা বসি' ধুয়ে দিল পা'দুখানি তার,
কোলে তুলি' মুছিল আপন দুই হাতে।
তখন সাহস হ'ল রাগ করিবারে;
ভালোবাসা বেশী পেলে পরে বেড়ে যায়
সাহস সবার,—তবু কহিল মধুরে,
'ওগো চির চঞ্চল প্রতিমা! একি শাস্তি
নিয়তির? অথবা সে তোমার খেয়াল
সুকঠিনতর? বল তবু বল মোরে,
জেনে রাখি কবে মোর প্রেম-লতিকায়
সে ফল ফলিবে প্রিয়তমে, ফলে যাহা
শুধু এইখানে—'এত বলি' তুলি' নিল
ফল তার নম্র শাখা হ'তে।

'কি অধীর!'

কহে বালা, 'উত্তর কেমনে দিই বল,
এমন করিলে! যতনে-পালন-করা
আছে এক মধুমাছি মোর, সে আমার
মন জানে, যা' বলিব পালিবে তখনি।
দূত করি পাঠাইব তারে; যদি কভু
অপরার প্রেমে মোরে ভুলে যাও সখা,
কহিওনা কিছু, শুধু মাছিটিরে তুমি
দিও তাড়াইয়া—তা'হলে জানিব মোর

কপাল ভেঙেছে ; তুমিও করিও শোক—
জানি আমি তোমারো সে কম কষ্ট নহে !
এ মোর হৃদয় যবে ওই হৃদি সাথে
সমান স্পন্দনে চাবে ব্যথা ভুলিবারে,
পাঠাইব দূত মোর, সন্ধ্যায় প্রভাতে,
যখনি এ বন হবে নির্জ্জন নিরালা।'

তারপর, দিন পরে দিন যায় চলি' ;
ঋতু হোরাগণ সকলেই দেখিয়াছে
সুখ তাহাদের ; বর্ষ পরে বর্ষ গত,
তবু সুখী তারা। যে বলে, প্রণয় মধু
তিক্ত হয় অতিরিক্ত হ'লে—সে কখনো
তরুকুমারীর প্রেম জানে না কেমন।

ক্রমে রাত্রি দীর্ঘ হ'ল ; তরুকুমারার৷
বোধ হয় হেন কালে একাকী নির্জ্জনে
বড় নিরানন্দে থাকে অরণ্য-ভবনে।
এমনি যাপিছে নিশি একজন হায়,
শেষে ডাকিল সে অনুগত মাছিটিরে ;
তখন সকল মাছি ঘুমায়ে পড়েছে,
সেই শুধু জাগে। তারে এবে যেতে হ'ল
সেই আলো আনিবারে, যে আলো কখনো
বৃষ্টি বা তুহিন-পাতে নিবিয়া না যায় !
সে আলো যে প্রেমিকের দুই আঁখি হ'তে
বরষে কিরণ-ধারা আর দুটি 'পরে—
তেমনি প্রণয়-ভরা—শেষে দুঁহু দোহা
দেখিতে না পায়।

সেথা, অগ্নিকুণ্ড পাশে
বসে আছে রাইকস্ পিতার আগ্রহে।
একখানি মেজ, পিতা পুত্র দুইদিকে ;
শরতের সুপ্রচুর ফলভার তাহে
ছিল না সাজানো—মৌরীর পিঠা কিম্বা
সুরভি মদিরা। আসন পড়েছে আজ
সতরঞ্চ-খেলা তরে ; বৃদ্ধ থালিনস্
জিতিছেন বারবার ; পুত্র অপ্রতিভ,
ভাবিয়া না পায় কিছু, বিরক্ত বিরস।
হেনকালে ভন্ শব্দ কাণের নিকটে,
হস্ত দ্রুত উঠে গেল, আর শব্দ নাই !
চলে' গেল মাছি, তবু যতক্ষণে আবো
না ফুটিল ঊষালোক, ফিরিল না বনে।
তখনো তেমনি হাতে মাথাটি রাখিয়া
ব্যথিত প্রকোষ্ঠে আহা তরুসুন্দরীর !
দেখাইল অর্দ্ধ-ভগ্ন একখানি পাখা,
অন্যটির ছিঁড়ে গেছে সূক্ষ্ম পক্ষজাল,
আরো কত কাট-ছেঁড়া। তরু-কন্যারাই
সে সব দেখিতে পায় ভালো।

হেরি' তায়
ঝুঁকে প'ল অবশ মাথাটি. হাত দুটি
পড়ে' গেল। ধ্বনি এক অতি সকরুণ
সহসা পশিল দূর থালিনস-পুরে ;
বৃদ্ধ শুনিল না, পুত্র শুনি' ত্রস্ত হ'য়ে
তখনি ছুটিয়া গেল বনের ভিতরে।
বৃক্ষে আর নাহিক বল্কল, পাতাটিও
সবুজ নাহিক শাখে, বিদীর্ণ হয়েছে
তরুদেহ একেবারে ! সেই দিন হ'তে
কোনো কথা, কোনো মৃদু গোপন আলাপ
জুড়ায় না কর্ণ তার, আর শোনে না সে
পতঙ্গের পক্ষধ্বনি কভু ; দিনে-রাতে
একটি বছর ধরি' ক্রন্দনের রোল
শুনেছে রাখাল আর বনচর জনে।
রাইকস্ কিছুতেই গেল না ত্যেয়াগি'
তরুমূল, মৃত্যু শেষে জুড়াল যাতনা। *

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

* Walter Savage Landorএর ইংরাজি হইতে।

বসন্ত-শেষ

এখন নতুন পাতা গজাবার দিন, পত্রহীন রিক্ত গাছগুলি কাঙালের মত হাত বাড়িয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। যতদিন তাদের পাতার সম্পদ ছিল, ততদিন আন্দোলন আস্ফালনের অন্ত ছিল না, দিবারাত্রই বাক্য-স্রোত বয়ে চলত—এখন সে মজলিশি ভাব নেই, নিতান্ত নিরীহ, চাঞ্চল্যের সম্পূর্ণ অভাব আস্তে আস্তে পাতার কুঁড়ি ডালপালার গায়ে একে একে দেখা দিচ্ছে। বাদামের পাতা যখন বুড়ো হ'য়ে ঝরে পড়ে, তখন তার গায়ের রং লাল, খানিকটে শুষ্ক রক্তের মত, মাঝে মাঝে কালোর ছিট থাকে কিন্তু কাচা পাতা যখন গজায় তখন বাইরের দিকটা থাকে লালচে—আর ভিতরে নতুন কাচা পাতার রং সবুজ। প্রথমে লালটিই চোখে পড়ে, কেননা যখন তারা জন্মায় তখন বাচ্চা পাখীর ছানার ছোট্ট মাংস-পিণ্ডের মত ডাল পাকিয়ে থাকে, নড়ে না চড়ে না, কিছুই করে না, তারপর আস্তে আস্তে মুখের কাছটা খুলে আসে, যেন ঠোঁট খুলে পাখীর ছানারা মায়ের কাছে আধার চাইছে। সূর্যদেব নিজের হাতে প্রতিদিন তাদের সোণার আলো খাইয়ে দেন, যারা ছিল একেবারে পঙ্গু অচল, অনির্দ্দিষ্ট আকার, তাদের ক্রমে গড়ন হয়, রং ফোটে, তারপর হঠাৎ একদিন নতুন পালক-গজানো শুক পাখীর মত ছোট ছোট ডানা মেলে ঝুলতে থাকে, মুখের কাছটি তখনও রাঙা। ক্রমে কল-কাকলি শোনা যায়। ডানা ছড়িয়ে উড়তে চায়, কেবলি ডানা কাঁপায়, অধীরতা প্রকাশ করে, ওড়া আর হয় না, গাছের ডালেই নাড়ীর টানে বাঁধা পড়ে থাকে। তখন তারা একেবারে সবুজ। সারাদিন ধরে কত কল্পনা-জল্পনাই চলে, তবু মুক্তি পায়না। পরে জরা একদিন এসে শিথিল বৃন্ত হতে তাদের খসিয়ে নিয়ে যায়। অশ্বত্থের পাতার কুঁড়ি, একটি মোড়া পানের খিলির মত কিম্বা চাঁপার কলির মত একেবারে শক্ত করে' জড়ানো, তারা যেন ডালের গায়ে মোটা মোটা কাঁটার মত লেগে থাকে। নড়েনা একেবারে, তার পর যখন খুলে যায়, তখন পানের পাতার মত দেখতে হয় আর সে সময় যে নৃত্য আরম্ভ হয়, তেমন উদ্দাম উচ্ছ্বাস অকারণ হতে পারেনা। শুনেছি এদের পাতার শিরায় শিরায় কিছু অধিক পরিমাণে তড়িৎ-সঞ্চয় আছে, তাই এত উৎসাহ। বাদামের পাতার কুঁড়ি যেমন ছোট্ট পাখীর অপোগণ্ড ছানার মত থাকে, অশ্বত্থ পাতার কলি কোন কীট-শিশুর মত গতিশক্তিহীন, কঠিন, তারপর যখন তার সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট হয় হাত পা ছড়াতে পারে, তখন একেবারে লাফিয়ে অস্থির। দেবদারুর পাতা দেখা দেয় শুধু, পাকে মোড়ানো, আস্তে আস্তে খুলে যায়। বেশী আয়োজন আড়ম্বর নেই। কাঁচা বুড়ো একই ডালে বসবাস করে, বুড়োরা ঠাঁই ছেড়ে সরলেই কচিরা এসে জুড়ে বসে।

দেবদারু কখনো একেবারে রিক্তপত্র দেউলে-যাওয়া কাঙালের মত দেখতে হয় না—তার শূন্য ডাল-পালায় নতুন পাতা পুলক-সঞ্চারের মত উদ্গত হয়না—পুরাণ পাতা যেমন সরে যায়, অমি নতুন পাতা দেখা দেয়। ঠিক মনে হয়, তারা পাশেই চুপচাপ বসেছিল, যেই আসন পেয়েছে অমি সরে বসেছে।

কলার কাচ পাতা, কাগজের দিস্তার লম্বা মোড়কের মত, কিম্বা ফনা-লুকোনো সাপের শরীরটার মত দেখ্তে থাকে, তার পর যখন খুলে যায়, তখন হাতির কাণের মত দোলে। এরা নাগ-পর্য্যায়ের। লতায় পাতা দেখা দেয় শুঁয়ো পোকার মত, কেউ বা থাকে গুটিপোকার মত গুটিসুটি হয়ে, তারপর প্রজাপতির মত বিচিত্র ডানা মেলে উড়তে চায়, পারেনা। পাতার সূচনা কত অদ্ভুত আকারেই প্রকাশ পায়, কেউ কুণ্ডলী পাকানো সরীসৃপ, কেউ পতঙ্গম জাতীয়, কেউ বা বিহঙ্গ-শিশুর মত। মানব-ভ্রূণ যেমন প্রথম অবস্থায় জরায়ুতে সমস্ত জীব-পর্য্যায়ের গঠনের মধ্যে দিয়ে ক্রমে স্তন্য-পায়ী দ্বিপদ জীবের আকৃতিতে এসে পৌঁছয়, তেম্‌নি কি গাছের পাতাও মৎস, সরীসৃপ, পতঙ্গম ও বিহঙ্গ শৈশবের অনুকরণ করে?

* * * *

বৎসর শেষ হয়ে আসছে, চৈত্র যায় যায়, তবু যেন সময়টাতে সমাপ্তির ভাব নেই, এই সময়ের স্বাভাবিক উত্তাপ এখনও আসে-নি, যে-সব ফুল এই মাসের, এখনও তাদের দেখা নেই। সবে কুঁড়ির সবুজ মোড়কে আমদানি হচ্ছে—তাও ভারি ধীরে সুস্থে।

এতদিনে অন্য বৎসরে বলরাম-চূড়ায় রাঙা রাঙা প্রজাপতির মত, অসংখ্য ফুল ফুটে ওঠে, দুলে দুলে ডানা নাড়ায়, রেণু কেশর ছড়িয়ে পড়ে, পথ লালে লাল হয়ে যায়। সমস্ত গাছ, পথের দু-ধারে সারি সারি ডাল-পালা খুব উৎসাহের সঙ্গে আন্দোলন করে হোরি খেলে। এবারে তার কোন চিহ্নই নেই। এই চৈত্র শেষে বং কোথাও নেই। করবী, স্থলপদ্ম বলরাম-চূড়া, শিরীষ, সোঁদাল, জাপানী গোলাপী ফুল, কারো শীত-নিদ্রা ভাঙেনি। বাতাস এখনও ঠাণ্ডা, রাতে শীত করে, সূর্য্যালোক তেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি, শীতের দীর্ঘ রাত্রির ঘুমের অভ্যাসে, চোখে এখনও যেন তন্দ্রাবেশ আছে। কোকিল মাঝে মাঝে এক একবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে কিন্তু নিবিষ্ট মনে পঞ্চম রাগের আলাপে রত হয়-নি। আমাদেরও মনে হচ্ছে বসন্ত আসেনি, আসবে, আমাদের মনও বর্ণের সাধনা করতে রাজি হচ্ছেনা, কথা দিয়ে ছবি আঁকবার উৎসাহ নেই। বসন্ত যদি মত্ত উৎসাহে, সোণালি উত্তরীয় উড়িয়ে, পথে পথে ফুলের হরির লুট দিয়ে, গন্ধে গন্ধে সমস্ত আকাশ উতলা করে, গানে গানে ধরণীর শিরায় শিরায় আনন্দ সঞ্চার, তার সমস্ত অঙ্গ সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, নিবেদনের আগ্রহে আকুল করে এসে দেখা দিত, তবে আমরাও নিয়ম-ভোলা শিকল-ছেঁড়া ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে উঠতাম, যা রোজ করি তা একেবারে নিরর্থক হয়ে যেত, যা করবার কল্পনাও

একসময় অসম্ভব বলে মনে হয়েছে, তাই শুধু সম্ভব কেন, তা ছাড়া আর-কিছু করার নেই, এই কথাই স্থির বিশ্বাস হয়ে যেত। "লভিয়াছি বিরহের স্বর্গ-লোক"—এমনি একটা সৃষ্টি-ছাড়া ধারণায় পূর্ণ-কাম, আনন্দ-রত, উদ্যম-তৎপর হতাম। জীবনের ছন্দই বদ্‌লে যেত। তাল, ফাঁক, ওলট-পালট হ'ত। ক্ষেপা আকাশে চোখ রেখে, সাগর-বেলায় পরশ-পাথরের অন্বেষণে সারাদিন আর সারাটি রাত ঘুরে বেড়াত।

* * * *

আকাশ জুড়ে মেঘ দেখা দিয়েছে—ঘন নয় হাল্কা, পাৎলা ধূসর পর্দ্দার আড়াল হতে আলো যখন আসে, তখন তার মুখে আর রং থাকেনা, একেবারে ফ্যাকাসে দেখায়, ঠিক তেম্নি আলো চারিদিকে ছেয়ে গিয়েছে, বাতাস উঠেছে, মেঘ উড়ছে, গাছ-পালা ডাল দুলিয়ে নৃত্য আরম্ভ করেছে, লাস্য পরিত্যাগ করে, এতক্ষণে তাণ্ডব সুরু হ'ল। একি মাতামাতি, একি বিপুল ছন্দের আন্দোলন! কোথায় তাল আর কোথায়ই বা ফাঁক কিছুই ধরা যাচ্ছেনা, প্রচণ্ড খেয়াল বটে, রাগ নটনারায়ণ, সমে পৌঁছবে কি করে জানিনে, কেবলি তানের পর তান কথনো একটানা, কথনো ছাড়া ছাড়া, কাটা কাটা, কথনো শুন্‌ছি নিরন্তর সোঁ সোঁ শব্দ, আবার কখনো কাণে আস্‌ছে ডাল-পালার আছ্‌ড়ে পড়া! পাতা-গুলো একেবারে মূর্চ্ছনায় ঘুর পাক খাচ্ছে। আবার কখনো গুম্‌রে ওঠা গমকের সুরে অন্তরাত্মা ব্যথায় পীড়িত হচ্ছে। ঘর বন্ধ করতে হয়-নি, কেননা বেশী বৃষ্টি এখনও পড়ছেনা। ধূসর মেঘের ধারে আলোর লুকোচুরি-খেলা চল্‌ছে। বিদ্যুৎ মেঘ ফুঁড়ে এধার থেকে ওধারে ছিট্‌কে পড়ছে—মুখে তার হাসির টিট্‌কারী, ভাবখানা,—কৈ গো ধরতে পারলে কৈ? বজ্র গুরুগম্ভীর সুরে পাল্টা গাইছে, তারপর বায়ুরথের শিঙা বেজে উঠছে ভোঁ ভোঁ, কখনো বা অমানুষিক পৈশাচিক চীৎকার মেঘ ভেদ করে, পৃথিবীর কাণের মধ্যে তীক্ষ্ণ শব্দের শলাকা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, তাকে একেবারে বধির করে দিলে! কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, ধারা-বর্ষণে ধরণীর তাপ শান্ত হ'ল না, আকাশের মেঘ মালিন্য কাটলনা, চারিদিক ভার, অন্ধকার হয়ে রইল। পথে যেখানে ছিল শুধু ধূলো, সেখানে জম্‌ল কাদা! স্বচ্ছ নিরাময় প্রসন্নতা আকাশকে সুন্দর করল না, আলোকের নির্ম্মলতা, ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেলেনা, গাছপালা নেয়ে ধুয়ে সতেজ সরস সজীব হ'ল না। অবসাদ দূর হ'ল না, বরং বাড়লই কেবল খানিকক্ষণ নিরর্থক মাতামাতি চল্‌ল!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভারতের আর্থিক দুরবস্থার কারণ

পূর্ব্ব প্রবন্ধে, যে শোচনীয় অবস্থার কথা বিবৃত হইয়াছে তাহার কারণ দুইপ্রকার।

একপক্ষে, ভারতের ইতিহাস এবং ভারতের সামাজিক গঠন-পদ্ধতি। সৌখীন শিল্প যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহার কারণ, কারিগরগণ গোলাম হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা কেবল মোগল-সম্রাট ও সামন্ত রাজাদের জন্য কাজ করিত; সাম্রাজ্য বিনষ্ট এবং আমীর-ওমরাও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলে, এই সকল কারিগরের আর কোন কাজ বা প্রয়োজন রহিল না। গ্রামের শিল্পগুলি যে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার কারণ, ভারতীয় শ্রমজীবী, নিজের জাত ও চিরপ্রথার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় বিলাতী-তৈয়ারী মালের বিরুদ্ধে নিজগ্রামেও যুঝাযুঝি করিতে অসমর্থ। পরিশেষে, বৃহৎ শিল্প যে এত আস্তে আস্তে পরিপুষ্ট হইতেছে তাহার কারণ, ভারতের সমস্ত প্রতিষ্ঠানই উহার প্রতিকূল। অবিভক্ত পারিবারিক স্বত্ত্বাধিকার-প্রথা মূলধনের অবাধ নিয়োগে বাধা দেয়; কুলপতি-তন্ত্র বা পিতৃতন্ত্র প্রচলিত থাকায় পুত্রগণ কোন লাভজনক কাজের চেষ্টায় স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে পারে না; জাতের কঠোর নিয়ম-বশতঃ কারিগর কিংবা কৃষক স্বকীয় কৌলিক ব্যবসায় ছাড়িতে পারে না। এমন কি এই বর্ণভেদ প্রথা ও গ্রামের সাধারণ-স্বত্ত্বাধিকার প্রথার দরুণ, কৃষি-প্রণালীর উন্নতি কিংবা কৃষকের অবস্থার উন্নতি একেবারেই অসম্ভব।

পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের সহিত যোগ সংঘটিত হইয়া ভারতের একটা অভূতপূর্ব্ব অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ভারতে সুশৃঙ্খলা শান্তি ও সুশাসন স্থাপন করিয়া ইংলণ্ড, তাহার পর রেল-পথ, খাল, টেলিগ্রাফ্, ডাকঘর স্থাপন করিয়াছেন; টাকা ধার দিয়াছেন; ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যকুঠী, কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; খনি উদ্ঘাটন করিয়াছেন, নূতন নূতন চাষ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, বিভিন্ন শ্রমশিল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন, নানাপ্রকারে দেশকে সংবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু ভারতের জনসাধারণ উন্নতির দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়ায়, দেশের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তাহারা বহুদিন যাবৎ অনভিজ্ঞ ছিল; ভারতের ইংরেজ ও ইংলণ্ডের ইংরেজদের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিত, কিন্তু ভারতবাসী সেই লাভের খুব অল্পঅংশই পাইত; দেশীয় শ্রমশিল্পগুলি বিলুপ্ত হইল; কারিগরেরা ভূমিকর্ষণ করিতে বাধ্য হইল, এবং লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকেরা পূর্ব্ব হইতেও দৈন্যদশাগ্রস্ত হইয়াছিল।

তথাপি, এই অবস্থা দেখিয়া আমাদের মনে চারিটি চিন্তাধারার উদয় হয়।

প্রথম চিন্তাধারা:—ভারতের অবস্থার বিচার করা বড়ই কঠিন।

প্রথমতঃ,—ভারতের ধন-ঐশ্বর্য্যের কতটা অংশ ইংরেজের ও কতটা অংশ ভারতবাসীর, তাহা ঠিক্ গণনা করিবার পক্ষে যে সকল গোড়ার তথ্য জানা নিতান্ত আবশ্যক, সেই-সব তথ্য হইতে আমরা কার্য্যতঃ বঞ্চিত।

তাহার পর কার্য্যত যাহাই হউক, বিচারের হিসাবে দেখিতে গেলে,—অন্য দেশের লোক হইতে কোন দেশের লোক বৈষয়িক সভ্যতা লাভ করিলে, ঐ দেশের লোকের অবস্থা, আমাদের সম্মুখে একটা জটিল সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করে। ভারতের ইতিহাস, আয়র্লণ্ডের ইতিহাসকে মনে করাইয়া দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উভয় দেশই ইংলণ্ডের অনুসৃত আর্থিক-রাষ্ট্রনীতি হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর দুই দেশের অবস্থা সমান নহে। আয়র্লণ্ড পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; এখন Belfast পৃথিবীর শিল্পপ্রধান নগরগুলির মধ্যে অন্যতম। ইংলণ্ড অবাধ বিনিময় অনুসরণ করিয়া থাকেন; এদিকে ভারত বিলাতী মালের উপর খুব অল্পই শুল্ক স্থাপন করে।

যদি সত্যসত্যই কোন কোন বিষয়ে ইংলণ্ড ভারতের বৈষয়িক উন্নতিসাধনে বাধা দিয়া থাকে,—সে তাহার নিষ্ঠুরতার দরুণ নহে, তাহার ইচ্ছাকৃত নহে, একপ্রকার অজ্ঞাতসারেই এইরূপ বাধা দিয়াছে। কিন্তু এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে, কেবল ইংলণ্ডই ভারতকে সভ্যতা দিয়া, শান্তি দিয়া, প্রচুর মূলধনের যোগান দিয়া এই উন্নতির একটা উদ্দীপনা দিয়াছে।

দ্বিতীয় চিন্তাধারা। স্বদেশের সমৃদ্ধি-সাধনে এখন দেশের লোকের অনেকটা হাত আছে:—প্রায় সমস্ত চাষের ক্ষেত এবং পাট-তৈয়ারীর, এবং তুলা-তৈয়ারীর অনেকটা অংশ তাদের হাতে। (১৮৯৯-১৯০০) ঋণের মধ্যে, ৪৭২, ৫২৯, ১৮৪ টাকা ভারতবাসীদিগের অংশ এবং ৬৫২, ৬৯৮, ৪৯৪ টাকা য়ুরোপীয়দিগের অংশ। ১৮৯০-৯১ অব্দে ভারতবাসীদিগের ২৯১, ৫২৭, ৯৫০ টাকা মাত্র, এবং ১৮৮০—৮১ অব্দে ১৪৭, ৫৩৪, ৪০০ টাকা মাত্র ঋণ ছিল। সরকারের বিরুদ্ধপক্ষীয় লেখকগণ এইরূপ উল্লেখ করেন যে, ভারতবাসীদের যে আয় তাহা বেশীর ভাগ আদালতকর্ত্তৃক স্থাপিত অপ্রাপ্তবয়স্ক-দিগের ধনসম্পত্তির আয়। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক-দিগেরই হউক বা অপ্রাপ্তবয়স্কদিগেরই হউক, উহা ভারতবাসীদেরই ধন-সম্পত্তি ত বটে।

তৃতীয় চিন্তাধারা। গ্রাহক বা খাদক-দিগের লাভ। একদিকে যেমন বিলাতী শ্রমশিল্প, দেশীয় শ্রমশিল্পকে উচ্ছেদ করিয়াছে, সেইরূপ আবার বিলাতী মাল সস্তা দরে পাওয়া যাইতেছে। ইহা নিশ্চিত, কারখানার তৈয়ারী মাল যে-দেশ হইতে রপ্তানী হয় না, সেই দেশের শ্রমশিল্প বিদেশের প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট হইলে, গ্রাহক বা খাদকের হিসাবে সেই দেশের যে লাভ হয় সেই লাভ, উৎপাদকের হিসাবে তাহার যে ক্ষতি সেই ক্ষতি পূরণ করে কি না—এইকথা বলা, বড় শক্ত। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যায় $\frac{5}{6}$ম অংশ নিরবচ্ছিন্ন কৃষি-কার্য্যেই ব্যবহৃত; সুতরাং ভারতের $\frac{5}{6}$ অংশ লোক বিলাতী মালের গ্রাহক, উহারা আদৌ উৎপাদক নহে। অতএব এই $\frac{5}{6}$ অংশ

লোক, সস্তাদরে মাল কিনিতে পাওয়ায় সম্পূর্ণরূপে লাভবান হইয়া থাকে। (১)

চতুর্থ চিন্তাধারা।— যে সকল দেশ বৈদেশিকদিগের কর্ত্তৃক হঠাৎ সভ্য হইয়া উঠিয়াছে, ভারতের অবস্থা সেই সকল দেশের ন্যায়। কোন বিজেতৃজাতি লোক-হিতের জন্য বাজার খোলে না। প্রথম প্রথম সেইজাতি বলপ্রয়োগ করে এবং বলের দ্বারা লাভ আদায় করে। তাহার পর কোন দেশের আর্থিক জীবনে হঠাৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া এমন একটা চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও বিক্ষোভ উপস্থিত হয় যে, কেহ তাহা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিতে পারে না কিংবা নিবারণ করিতে পারে না। যখন য়ুরোপীয়েরা প্রথমে জাপানে আসিয়াছিল, তখন সোণার মূল্য রূপা অপেক্ষা পাঁচগুণ বেশী ছিল: সেইজন্যই জাপান হইতে সোণার রপ্তানী হয়—যাহার মূল্য ছিল ২২ মিলিয়ান ফ্র্যাঙ্কেরও অধিক। ১৮৬০-৬১ এই এক বৎসরের মধ্যেই ৫৪০,০০০ 'কিলো' (কিলো =২·২০৫৫ পৌণ্ড) রেশম আসল মূল্য অপেক্ষা অনেক কম দরে কিনিয়া বিলাতে চালান দেওয়া হয়। আরও কিছুকাল পরে, যখন বিনিময়ে ঘাটতি বাড়তি ঘটিয়া বাণিজ্য-বিভ্রাট্ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার পর যখন মুদ্রা চলাচলের স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল সেই সময় দেউলিয়ার সংখ্যা (১৮৮০ অব্দে) ১,২৮২,৩৪৪ হইতে ৪,৭১৩,৯০৪ পর্য্যন্ত (১৮৮৪) উঠিয়াছিল; আত্মহত্যার সংখ্যা (১৮৪২) ৬১ ৯৮০ হইতে ৬১,৯৪০ (১৮৮৫) পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, ১৮৭৫ অব্দে অপরাধের সংখ্যা ৯,৪০৫, ১৮৮৬ আরম্ভ হইতে অপরাধের সংখ্যা ৪০ ০। এই সকল বাণিজ্য-বিভ্রাট যতই শোচনীয় হউক না কেন, উহা দেশের সমৃদ্ধি সাধন নিবারণ করে না; বরং উহা ঐ কার্য্যকে সত্বর আগাইয়া দেয়: জাপানের দৃষ্টান্ত হইতেই এই কথা সপ্রমাণ হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাজরী

চিঠি না লিখে ছাড়ান পাবার জো কি!

সেই অত রাত্রে থিয়েটার থেকে ফিরে বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই নবৌদি বললে, "চল্ ভাই, আমরা তেতলার ঘরে শুইগে।" তারপর আমার হাতটা টিপে একটু চাপা গলায় বললে, "এই বেশ সময়! মনে আছে ত, চিঠি লিখতে হবে। চিঠি না লিখে তুমি ঘুমোও দেখি, কেমন ঘুমোবে!"

আমি বললুম, "বড্ড ঘুম পেয়েছে, ভাই—"

---

(১) একথা সত্য, এইরূপ কথিত হয় যে, বাণিজ্যের অতিবৃদ্ধি, মূল্যবান ধাতুদিগের মূল্য কমাইয়া দিয়াছে এবং তাহারই ফলে সমস্ত জিনিষের দর চড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে ত কৃষকদিগেরই সুবিধা, কারণ তাহারা নিজ ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যাদিই আহার করে; আহারের অবশিষ্ট অতিরিক্ত যাহা থাকে তাহাই অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যে উহারা বিক্রয় করে।

"পাক্ ঘুম! চিঠি না লিখে ঘুমোতে পাবে না—" বলে নবৌদি এক ঝঙ্কার তুললে! আমি হতাশ হয়ে পড়লুম—না, ছাড়ান নেই, কিছুতেই নেই। তখন কাগজ কলম কালি সব জোগাড় করে তেতলার ঘরে উঠলুম। তেতলার ত্রিসীমায় কারো সাড়া নেই—খুব নিজ্জন, নিরিবিলি জায়গা। ঘুমে চোখ চুলে আসিছিল। কাজেই কোন কথায় কোন রকম ওজর-আপত্তি না জানিয়ে নবৌদির কথা-মত চিঠি লিখতে বসলুম। চিঠিতে কথা লেখা হল বিস্তর—কথাগুলো সব নবৌদি বলছিল, আমি গণেশটির মত শুধু লিখে যাচ্ছিলুম। চিত্ত-চকোর, প্রেম-সুধা, উদাসিনী, কুঞ্জ-কানন, মলয়ানিল, জ্যোৎস্নার হাসি—কোন কথাই বাদ পড়েনি! চিঠির শেষের দিকে আমার নিজেরও দু'ছত্র ছিল—সেটা বুবড়ির সম্বন্ধে। সত্যি, তার সেই থোলো থোলো কোঁকড়া কালো চুলের মাঝখানে পাতা-ঢাকা পদ্ম ফুলটির মত ছোট্ট টুকটুকে মুখখানি আমার মনের সায়রে এমন সুন্দর ছোট ছোট ঢেউ তুলে নেচে নেচে ফিরছিল! চিঠিখানা পাওয়া-অবধি মনটা তার জন্য হু-হু করছিল। আহা, আমাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে! থিয়েটারে গিয়েছিলুম—দোতলার বক্সে একটি ভদ্রলোক বসেছিলেন—তাঁর সঙ্গে একটি ছোট ছেলে ছিল। কখনো সে কোলে উঠে বসছিল, কখনো বা রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল—সেই ছেলেটিকে দেখে আমার কেবলি বুবড়ির সেই ঢলঢল মুখখানি, তার সেই চঞ্চলতা, সেই তার আধ-আধ মিষ্টি কথাগুলি মনে পড়ছিল, তাই থিয়েটারে বসে একবার ভেবেও ছিলুম, জবাব যদি লিখতেই হয়, তাহলে লিখব, "যখন এখানে আসবে, বুবড়িকে সঙ্গে নিয়ে এসো। তার জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করে।" কিন্তু ঐ আসতে বলাটা আর চিঠিতে লেখা হয়ে উঠল না। কেমন করে হবে! নিজে থেকে কি করে ও কথা লিখি—নবৌদি ভাববে কি? ঠিক ঠাট্টা করবে, বলবে, বরের জন্যে একেবারে—না, না, সে হয় না। নবৌদি কি বুঝবে, বরের জন্য একটুও নয়,—বুবড়ির জন্যই আমার মন কেমন করছে! কখনো না! নবৌদিও ত আচ্ছা মজার লোক। চিঠি লেখাতে বসেছে! তা চকোর টকোর অত বড় বড় কথা সব লিখিয়ে দিলে—কৈ, আসবার কথাটা ত একবার ভদ্রতার খাতিরেও লেখাতে হয়,—তা সে কথা তার মনেও এল না! একবার তা লিখতে বললেই ত আমি সেই ফাঁকে বুবড়িকে সঙ্গে আনার কথাটা লিখে বসতুম! তা যখন হলো না, তখন নবৌদির বিনা-অনুরোধেই একছত্র নিজে থেকে লিখে দিলুম—"বুবড়ি কেমন আছে? সে বোধ হয় আমায় ভুলে যায় নি। তার জন্যে আমার ভারী মন কেমন করে।" নবৌদি বললে, "ও কি লো? ওখানটা খাপছাড়া হয়ে গেল যে। হঠাৎ দুম্ করে বুবড়ির কথা পেড়ে বসলি কেন?"

আমি বললুম, "হোক্‌গে ভাই ন'—, খাপছাড়া—আমি ত আর কবি নই—" বলে নবৌদিকে তাড়া দিলুম, "আর পারিও না—এইবার শেষ কর ভাই, তোমার পায়ে পড়ি। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে—ভালো লাগছে না—" তখন নবৌদি বললে, "দাঁড়া—এবার

শেষ করি। কিন্তু ভাবছি, শেষে কি লিখব,—বল্ দেখি, তুইই বল্ না!" আমি বললুম, "তা আমি কি জানি। তুমি বেদব্যাস আছ,"

"তুই জানবি না ত কে, আমি জানব?"

"তা না ত কি।"

"আহা, এটা বুঝচিস্ না, সে লিখেচে, তোমারি চিরজীবনের সুনাম—তুই তার পাল্টা কি লিখলে ওর সঙ্গে বেশ মানায়, তাই আর কি জিজ্ঞেস কর্‌ছি—"

আমি কপালটা কুচ্‌কে বললুম "আমি ভাই ও-সব জানি না—"

নবৌদি বললে, "আচ্ছা,—জীবনে-মরণে তোমারি—এ কথা লিখলে কেমন হয়?"

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে বুক রেখে আমি চিঠি লিখছিলুম। নবৌদির কথা শুনে হেসে একেবারে ঠিক্‌রে উঠে বসলুম, বললুম, "য্যাঃ—একেবারে বটতলা হয়ে যাবে—"

নবৌদি যেন চমকে উঠল বললে, "বটতলা কি লো?"

আমি বললুম, "নয়?"

নবৌদি বললে, "তোর ভারি দেমাক্ দেখ্‌ছি—যে না। স্ত্রী জীবনে-মরণে স্বামীর নয় ত কার আবার? বল্ না—ওরে আমার পণ্ডিত্‌নী!"

আমি বললুম, "তা বেশ ত ভাই, জীবনে-মরণে হতে ত দোষ নেই আমার—তাতে ত আমি 'না' বল্‌ছি না—তা বলে কাগজে ওটা লিখলে কেমন গা শিউরে ওঠে না কি। ওঠে না তোমার—? আমার ত ভাই ওঠে। এই যে সেদিন লাইব্রেরী থেকে একটা বই এসেছিল, "কমলে কণ্টক"—বাড়ী-শুদ্ধু সকলে একেবারে বইটা নিয়ে ক্ষেপে গেল—বলে, চমৎকার—চমৎকার—সব নাওয়া খাওয়া ছাড়বার জো। আমি কিন্তু সে বই ছুঁতেও পারলুম না, খালি তার ঐ নামটার জন্যে—"

নবৌদি বললে, "মরণ আর কি। নে, লেখ্—জীবনে-মরণে তোমারই—"

আমি আর তর্ক না তুলে তাই লিখে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম। নবৌদি খামে ঠিকানা-টিকানা সব লিখে গুছিয়ে গাছিয়ে তুলে বিছানায় শুতে এল।

৭

মনটা সারাদিন ভারী খারাপ রয়েছে। নবৌদি, শৈল, টেঁপি, নন্তু যারা-যার এসেছিল, সবাই আজ চলে গেছে। হাসি তামাসায় গল্পে গুজবে বাড়াটা কেমন গুলজার হয়ে ছিল, আর এখন সব ফাঁকা।

তুপুর বেলা ঘণ্টি-টণ্টি সব মার কাছে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, আমিও সেখানে একপাশে পড়ে গড়াচ্ছিলুম—হঠাৎ পাশের বাড়ী থেকে হার্ম্মোনিয়মের সুরের ঝঙ্কার এসে আমাকে একেবারে উতলা করে তুললে। আমি এসে পূব্‌দিকের ছোট ঘরটায় যে পুরানো একখানা পায়া-ভাঙা কৌচ ছিল, সেটার উপর বসে পড়লুম। সাম্‌নে খড়খড়িটা খোলা ছিল, তা দিয়ে অনেকখানি আকাশ দেখা যাচ্ছিল—রোদের হল্‌কা তার নীল রঙের উপর এমন একটা লাল্‌চে আভা ফুটিয়ে তুলেছে—ভারী তরল, ভারী হাল্কা মনে হচ্ছিল। আভাটা কাঁপছিল ঠিক সেই জাফরাণ রঙের ফড়িঙের

পাৎলা পাথার মত। দুটো পাখী অনেক উঁচুতে উড়ে বেড়াচ্ছে—ঠিক যেন কালো কালির দুটি ফোঁটা! তাদের ওড়বার গতি এত মৃদু যে দেখলে প্রথমটা মনে হয়, তারা বুঝি উড়ছেই না, স্থির হয়ে আছে! আমি সেই সুদূর আকাশের পানে চোখ মেলে চুপ করে পড়ে রইলুম—কাণে এসে লাগছিল শুধু হার্মোনিয়মের ঝঙ্কার। সুরের যে হাওয়া বয়, তা কখনো জানতুম না, আজ বুঝলুম। এ যেন সুরের পর সুর হাওয়ার মতই বয়ে চলেছে,—কখনো গভীর বেদনায় আছড়ে কেঁদে কেঁদে, আবার কখনো উল্লাসে মেতে একেবারে পাগল হয়ে। আমার শূন্য মনটা নিমেষে সে সুরের স্পর্শে ভিজে উঠল। তারপর হঠাৎ কখন যে হার্মোনিয়মের সুরের ফাঁকে ফাঁকে গানের পাপড়ি ঝরে পড়েছে, কিছুই ঠাওরাতে পারিনি! কৈ, কিছুই ত ভাবছিলুম না আমি! অথচ কখন যে গানের প্রথম পাপড়িটি ঝরে পড়ল, তা ঠাওর করতেও পারিনি। গান তখন ভেসে চলেছে—

"আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো।
তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়,
এ নহে, এ নহে, নয় গো।"

আমার সমস্ত প্রাণটা যেন এক নিমেষে ঝড়ে তোলপাড় হয়ে দুলে উঠল। আমারও কেবল মনে হতে লাগল, ঠিক, ঠিক, আমারও

আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো!

কিন্তু সে কে? সে কে? সে কে?
গান তখনো ভেসে চলেছে, ভেসেই চলেছে,

"কোন্ স্বপনের দেশে, আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।
আজি কোন্ উপবনে, বিরহবেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়।"

আমি নিশ্চল পাষাণের মত পড়ে রইলুম—আর গানের ঝরা পাপড়িগুলো গন্ধে বর্ণে আমার মনটাকে কখনো মাতিয়ে, কখনো তাতিয়ে, কখনো ভিজিয়ে, একশা' করে দিতে লাগল।

কতক্ষণ এইভাবে পড়েছিলুম, জানি না—হঠাৎ শুনি, হার্মোনিয়মে একটা বেতর বেয়াড়া সুর বেজে উঠেছে—সমস্ত মনটায় যেন কিসের জ্বালা ছুটিয়ে দিয়ে—কি সে বিশ্রী তড়বড়ে সুর, পলকা নাচের ভঙ্গীতে! মনের মধ্যে সুরের হাওয়ায় স্বপ্নের যে মিহি জালখানি বোনা হচ্ছিল, সেটা যেন ফ্যাস্ করে কে ছুরি চালিয়ে ছিঁড়ে দিলে! সেখান থেকে উঠে এলুম। দালানে আসতেই মা বললে, "নে, আয় দেখি, তোর চুলটা ভালো করে বেঁধে দি। তারপর বেশ করে গাটা ধুয়ে কাপড় কেচে নে—বেশ সাফ্-সুৎরো হ'—ধুলোকাদা মাখিস্‌নে। আজ সন্ধ্যার সময় সুনীল আসবে।"

ছেলেবেলায় গল্পে পড়েছিলুম, এক রাজার মেয়ে চঞ্চল হাওয়ার মত মুক্তির আনন্দে বেশ নেচে ছুটে বেড়াত—হঠাৎ আকাশ থেকে মন্ত্রপড়া ফুল গায়ে পড়তেই সে পাষাণ হয়ে গেল! মার কথায় আমার ভিতরটা একেবারে ঠিক তেমনি পাষাণের মতই নিস্পন্দ অসাড় হয়ে উঠল। কিন্তু সে শুধু একমিনিট! তারপর হঠাৎ চমক ভাঙতেই সেখান থেকে সরে এলুম।

মনটায় কি যে হচ্ছিল, দুল্‌ছিল খুব। কি জানি কেন, আজ তাঁর আসবাব খবর পেয়ে ভারী আহ্লাদ হল! নিজেকে বড্ড একলা, মনটাকে ভারী ফাঁকা মনে হচ্ছিল—এতক্ষণ এই যে কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল—মনটাও ভার হয়েছিল—হঠাৎ যেন সেই মনের মধ্যে কোথা থেকে ফুরফুরে হাওয়া বয়ে এল। ভারটা কেটে যাচ্ছিল, অস্বস্তিটাও হাল্কা হয়ে আসছিল। দু'তিনবার ফাঁকে ফাঁকে সবার অলক্ষ্যে ঘড়িটা দেখে এলুম। রাগ ধরছিল—বেলা আর পড়ে না। মনে হচ্ছিল, ঘড়ির কাঁটাদুটোকে দু'হাতে ঠেলে আগিয়ে দি! এখনই সন্ধ্যা হোক্‌!

সন্ধ্যা হলে ভাল কাপড়-চোপড় পরে রান্নাঘরে এসে বসলুম। সেখানে ভারী ধুম চলেছে। পোলাও চড়েছে, মাংস রান্না হচ্ছে, ও বাড়ীর স্বরোপিশি পটলগুলোর বীচি বার করে তাতে মাছের পুর ঠেসে দিচ্ছিল! কি করে এখন সময়টা কাটাই? আমি ত আর রান্নার কাজে এগুতে পাবি না—লোকে বলবে কি! কাজেই রান্নাঘরে এটা-ওটা চেখে দেখতে সুরু করলুম। হঠাৎ মা এসে বললে, "ও কি হচ্ছে তোর? এখনো তোর ছেলেমানুষী গেলনা! এখনি কাপড়-চোপড় নোংরা করে ফেলবি। এই আগুনতাতে আর ধোঁয়ায় ভরে গে রান্নাঘরের এই জল-কাদার মধ্যে তুই এসে বসলি কেন? যা বাপু, উঠে যা!"

"বারে, একটু খেয়েচি বলে এত কথা! বেশ, বেশ, তোমার পোলাও-কারি একটুও আমি মুখে দিতে চাই না—দেখো, কক্‌খনো খাবো না ত! আমি ত তোমার কেউ নই। তোমার আদরের জামাইটিকেই সব খাইয়ো—"বলে দুম্‌-দুম্‌ করে সেখান থেকে এসে দোতালার বারাণ্ডায় বসলুম। ঘণ্টি, বুড়ী, তারা সব ভর্ত্তুর সঙ্গে বেড়াতে গেছলো, তখনো ফেরেনি।

একলাটি চুপ করে বসে থাকতেও ত ভাল লাগে না! তখন বাবার বসবার ঘরে গিয়ে এ বইটা নেড়ে, ও কাগজখানা পেড়ে বেড়াতে লাগলুম—শেষে জানলার ধারে এসে দাঁড়ালুম। বাতিওলা মই ঘাড়ে নিয়ে ছুটে ছুটে রাস্তার গ্যাস জ্বেলে দিয়ে যাচ্ছে, কত লোক কত ভঙ্গীতে পথে চলেছে। বেশ দেখতে! হঠাৎ গড় গড় করে একটা গাড়ী এসে দোরে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে নামল বাবা,—আর—আর—

ছুটে এসে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়লুম। এমনি আহ্লাদ হচ্ছিল যে পাছে কেউ তা দেখে ফেলে, এই ভাবনায় সারা হয়ে উঠলুম। একটু পরেই নীচে মহাকলরব বেধে গেল। "ওরে এই ভর্ত্তু, এই রামদীন—ওগো—" তারপরই সিঁড়িতে বাবার জুতোর দুপ দুপ -যদি এই ঘরেই সব আসে? আমি যে কোথায় লুকোব, কোথায় পালাব, তার আর হদিশ না পেয়ে খাটের কোণে গিয়ে একেবারে দেওয়ালে মিশে বসে রইলুম।

রাত দশটা। আমার ত বড় বোন-টোন কেউ নেই, কাজেই মা আমায় দরজার পাশ থেকে ঠেলে ঘরে পাঠিয়ে দিলে। ঘরে ঢুকব কি, রাজ্যের লজ্জা যেন কোথা থেকে আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়ল। পা

অবশ হয়ে এল, সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হল! কোনমতে ঘরে ঢুকলুম। ঘরে ঢুকতেই কাতী ঝী বাইরে থেকে দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিলে। আমি দরজার দিকে মুখ ফিরিয়েই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

একটু পরেই তিনি এসে পিছন থেকে আমায় জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন; একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে দরজার খিল বন্ধ করলেন। তারপর আমার দুই হাত ধরে টেনে এনে মেঝেয় কার্পেট-পাতা বিছানার উপর বসিয়ে দিলেন। প্রকাণ্ড ঘোমটায় আমার মুখ ঢাকা ছিল। তিনি বললেন, "ছি, এতটুকু ঘোমটায় মুখ ঢেকে কি বরের কাছে আসতে আছে! আমারই লজ্জা করচে যে—আর-একটু ঘোমটাটা টেনে দাও—" বলে আমার পিঠের দিককার কাপড় আরো একটু টেনে ঘোমটাটি আরো বাড়িয়ে দিলেন।

আমার হাসি পাচ্ছিল—ভারী হাসি পাচ্ছিল।

আমি মাথাটা কাত্ করে ঘোমটার বহর কমিয়ে নিলুম।

তারপরই তিনি আমার ঘোমটাটা একটানে সরিয়ে দুই হাতে মুখখানি তুলে ধরে বললেন, "দেখি গো দেখি, আমার রাণীর মুখখানি লজ্জায় কতখানি রাঙা হয়ে উঠেছে—দেখি, চিনতে পারি কি না। তুমি ঠিক সেই ত, না, আর কেউ?"

ভারী দুষ্টু ত! কথা শোন একবার!

আমি খুব ক্ষিপ্রভাবে তার মুখের উপর দিয়ে আধ-খোলা দুইচোখের আধ-দৃষ্টি বুলিয়ে নিলুম। মুখে আমার হাসির লহর বিদ্যুতের মত খেলে গেল। সেটাকে চাপবার শত চেষ্টা আমার ব্যর্থ হল। তিনি বললেন, "এই যে, ঠিক চিনেছি, ঠিক! বলি, ও আমার গোলাপ-বালা, ও আমার গোলাপ-বালা,—তোল মু'খানি, তোল মু'খানি, আমার হৃদয়-কুঞ্জ কর আলা—" বলে আমার দুই ঠোঁটের উপর চুমুর ছাপ এঁকে দিলেন। আমার চোখের চাউনি আবার তেমনি বাঁকারেখায় তাঁর মুখের উপর নিমেষের জন্য ছুটে উঠে গড়িয়ে পড়ল। "যাওঃ—" বলে আমি একেবারে লজ্জায় মাটীর সঙ্গে যেন মিশে গেলুম।

ফুলের গন্ধে ঘরের মধ্যকার বাতাস আকুল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, আমার কাপড়েও এসেন্সের গন্ধ ভুর ভুর করে অনেকখানি খোস্‌বু বিলুচ্ছিল—খাটের ছত্‌রিতে জুঁইয়ের মালা দোল্ খেলে নাচ্‌ছিল। আমার প্রাণের মধ্যে কিসের যে স্পন্দন উঠেছিল,—সমস্ত শরীর-মন কিসের হাওয়ায় এমনি কাঁপছিল!

তিনি বললেন, "ওগো রাণী, শোনো, একবার আমার পানে চেয়ে দেখো।" আমি ধনুকের মত বেঁকে লুটিয়ে ছিলুম, তিনি আমায় সোজা করে বসিয়ে দিলেন, বললেন, "আমি এসেছি বলে তোমার আহ্লাদ হয়েছে, রাণী?"

আমি কোন কথা কইলুম না। তিনি বললেন, "চিঠিতে অত আদর ঢেলে দেছ—আজ মুখের কথায় তার একটুখানি দাও ." আমি আবার তাঁর মুখের পানে চোখ তুলে চাইলুম,—চাওয়ার আর সাধ মেটে না। যত চাই, দৃষ্টি আর কিছুতেই এক

জায়গায় দাঁড়াতে চায় না! তবুও দেখার সাধ! পোড়া চোখের এ হল কি—সে মুখের পানে চেয়ে চেয়েও তার যে আর সাধ মেটে না—অথচ দুদণ্ডও ত চেয়ে থাকতে পারে না! এ কি আপদ!

তিনি বললেন, "তোমার কোন কথা বল্‌বার নেই, রাণী? আমাকে তবে চাও না বুঝি! আমি এমন ব্যাকুলভাবে ছুটে এলুম তোমার কাছে, দুটি মুখের কথা শুনব বলে—তা কোন কথাই নেই! কৈ, তোমার বুবড়ির কোন কথা জিজ্ঞেস করলে না ত! সে তোমাকে কেবলি খোঁজে, মাঝে মাঝে কাঁদে আর বলে,—টাটিমার টাচে যাব—তার কথা ত জিজ্ঞেস করলে না!"

সত্যি! আমি যেন কি! সব কথা ভুলে গেলুম কি করে? অপরাধীর মত আকুল চোখের দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে চাইলুম। বললুম—"বুবড়ি কেমন আছে?" গলার স্বর কে চেপে ধরেছিল। তিনি বললেন, "ভালো আছে।"

আমি বললুম, "তাকে নিয়ে এলে না কেন?"

তিনি বললেন, "নিয়ে এলে তুমি খুব খুসী হতে?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ।"

তিনি বললেন, "সে আজ তার মার সঙ্গে তার মামার বাড়ী গেছে

আমি বললুম, "কবে আসবে?"

তিনি বললেন, "কালই বিকেলে আস্‌বে। বেশ, এবার যখন আসব, তাকে সঙ্গে করে আনব,—কেমন? তুমি তাকে রাখতে পারবে?"

আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, হাঁ।

তিনি বললেন, "আমি এসেছি বলে কৈ, তুমি কেমন খুসী হয়েছ, তা ত বললে না।"

কি করে বলব! ওগো, খুসী আমি হয়েছি, সত্যি—কিন্তু মনের সে আনন্দ কি করে খুলে জানাব? আমি মুখে কিছু বল্‌তে পারলুম না।

তিনি বললেন, "তুমি খুসী হয়েছ, আমি এসেছি বলে?"

আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, হয়েছি।

তিনি বললেন, "চল, শোবে চল।"

আমি উঠে দাঁড়ালুম—তিনি উঠে আমায় বুকের মধ্যে পুরে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। মুখের ঘোমটা টেনে সরিয়ে বললেন, "আমার পানে চাও—চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো, একবারটি চাও—"

আমি কোনমতে চোখদুটোকে তুলে ধার, চোখ আবার তখনি নেমে পড়ে। চাওয়া কি যায়!

তিনি বললেন,

"বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল,
সে কি আমার পানে ভুলে পড়িবে না?"

আমি ঠোঁটের কোণে হাসির ঝাপ্‌টাটা খানিক সামলে নিয়ে তাঁর পানে চাইলুম—তিনি তন্ময় চিত্তে দেখতে লাগলেন! আমারও সে দৃষ্টিতে কেমন মূর্চ্ছার মত মনে হল, আমিও অপলক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলুম।

অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন, "চল, শোবে চল। আর রাত্রি জাগে না। ফুলশয্যার রাত্রে সারারাত জাগিয়ে তোমায় ভারী অপ্রস্তুত করেছিলুম—না?" বলে তিনি

হাত ধরে আমায় খাটের কাছে নিয়ে এলেন। দুজনেই শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুমের কি আসবার জো আছে—শুধু গল্প আর গল্প। কিসের এত গল্প, কোথায় যে জমেছিল। তারও কি ছাই কোন নিয়ম আছে, না, শৃঙ্খলা আছে। বাঙলা সাহিত্যের সমালোচনা থেকে সুরু করে চা খাওয়া ভালো, না কোকো এ অবধি, কোন বিষয়ই বাদ পড়েনি। অথচ প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁর কি সে আগ্রহ,—ঘুমোতেই হবে এবার, আর না। আমারও সেই এক চিন্তা, ঠিক, আর জাগা নয়, কাল ভাবী লাগা পেতে হবে না হলে। কিন্তু এত কড়াক্কাড়ির মধ্যেও রাত্রিটা যে কেমন করে তেজী ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাফাতে লাফাতে একেবারে ভোরের দোরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল,—কিছুই বুঝতে পারলুম না। ওদিককার ঘর থেকে ঘন্টি বুড়ার মামুলি আব্দারের সুর সাড়া দিয়ে উঠল। আমিও গায়ের কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক্ করে আলগা চুলগুলোকে একটু সামলে টেনে বেঁধে খাট্ থেকে নামলুম। বড় আর্শিতে মুখের যে ছায়া পড়ল, তা দেখে শিউরে উঠলুম। যেন কতকাল ঘুমের সঙ্গে পরিচয় নেই, মুখ এমনি শুকিয়ে উঠেছে। তার উপর ঠোঁটের আগায় পাণের রঙ টুকুও শুকিয়ে এমনি দেখাচ্ছে যেন এই শুষ্ক মলিনতাটাকে কে কালো কালির মোটা লাইন টেনে আরো ক্যাট্-কেটে করে তুলেছে! গা টলছে—রাত্রে যে-ঘুম একটিবার উঁকি দেবারও পথ পায়নি, কোথা থেকে সে একেবারে ভারী বোঝার মত এখন দুই চোখকে জড়িয়ে চেপে ধরেছে। বিছানায় তাঁর পানে চেয়ে দেখলুম, তাঁরও মুখ বিশ্রী শুকিয়ে উঠেছে। ঠিক সেই ভোর বেলাকার বাসি ফুলের মত। আমি দরজা খুলতে যাব, এমন সময় তিনি ডাকলেন, "রাণা—" আমি সরে এলুম। তিনি বললেন, "আবার কবে দেখা হবে রাণী? একটু পরেই ত চলে যাব, সুখের রাত্রি এমনি শীঘ্র পুইয়ে গেল।" তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল, গলার স্বরেও এমন বেদনা ঝরে পড়ল যে আমার বুকটা হু হু করে উঠল। তিনি বললেন, "যাবার আগে আর-একটিবার দেখা দিয়ো—"

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে দোর খুলে বেরিয়ে পড়লুম। বাবা নীচে নেমে যাচ্ছিল। আমি থমকে দাঁড়ালুম, সামনে যেতে লজ্জা হচ্ছিল, এই শুক্‌নো মুখ নিয়ে—ছিঃ।

বাবা নীচে নেমে গেলে আমি মার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। ঘন্টি বললে, "দামাই বাবুর কাছে নিয়ে তলো দিদি।" মা আমার পানে তাকিয়ে বললে, "সুনীল উঠেছে রে?"

"আমি কি জানি?" মা বললে, "এমন মেয়েও ত দেখিনি—তুই তবে এর মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এলি কেন?" সে কথার জবাব দেব কি—আমি ছাদে উঠে গেলুম। ছাদের মাঝখানে বসে পড়লুম। দিব্যি ফুর্‌ফুর্ করে বাতাস বইছিল—হাতে মাথা রেখে আমি ছাদেই শুয়ে পড়লুম। একবার মনে হল, হায়, হায়, এর মধ্যে কেন বেরিয়ে এলুম! মা ত বললে,—কিন্তু আবার যাই কি করে? মা ত যেতে বললে না, তবে—? যাওয়া আর হয় কি করে? নিজের উপর রাগ হল। তারপর শুয়ে থাকতে থাকতে কখন্

যে বেশ ঘুমিয়ে পড়লুম, কিছু জানতেও পারলুম না।

যখন ঘুম ভেঙে নীচে নামলুম, তখন বেলা প্রায় আটটা। খুব একটা সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে এ ঘর ও ঘর ঘুরলুম। ভর্ত্তু আমাদের বিছানা ঝেড়ে ঝুড়ে তুলে রাখচে—ফুলের মালাগুলো খাটের ছত্রী থেকে খুলে নামিয়ে মেঝেয় জড়ো করচে। উৎসব-নিশির শেষে যেমন একটা ভাঙ্গা চোরা হায়-হায় ভাব চারিদিকে দারুণ জীর্ণতা নিয়ে প্রাণটাকে দুঃখে ছেয়ে ফেলে, আমারও সেইরকম হল। মা এসে বললে, "ভর্ত্তু, বালিশগুলো রোদ্দুরে দিয়ে তুলে রাখিস্ তবে—বুঝলি?" তারপর আমার পানে চেয়ে বললে, "কোথায় ছিলি তুই? সুনীল চলে গেল, তা একবার—" এইটুকু বলেই মা আমার পানে চেয়ে থেমে গেল; আর কিছু বললে না। আমার বুকে কে যেন পাথর ছুড়ে মারলে। চলে গেছে! এর মধ্যে! দেখা হলোনা আজ আর! কিন্তু মার চোখের সামনেও আর দাঁড়ানো যাচ্ছিল না। মা বললে, "নে, মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় কেচে ফেল্, তারপর মুখে কিছু দে। দুধ যে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল—না হয় যা, একেবারে নেয়ে এসেই খাবার খা—"

আমি দুড়্ দাড়্ করে নীচে বাথরুমে নেমে গেলুম।

৮

সারা দিনটা ভারী অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কারো সঙ্গ ভালো লাগে না। একটু আরাম পাই, শুধু নিরালায় নিরিবিলিতে দুদণ্ড চুপ করে বসে ভাবতে। রাত্রের অত আদর, অত সোহাগ, সে কি সত্যি? সেই সব কথা ভাবতে ভাবতেই মন যেন কি স্বপ্নের দোলায় দুলতে দুলতে কোথাকার অপূর্ব্ব মায়ার রাজ্যে উধাও হয়ে ভেসে চলেছিল। কাতী এসে বললে, "একটা চিঠি এসেছে, দিদিমণি—"

বুকটায় যেন ঝড় উঠল—চিঠিখানা হাতে নিলুম। হাতটা কেঁপে গেল! কাতী বললে, "জামাইবাবু পৌঁছুনো খবর দিয়েছে বুঝি—"

"পালা, বলচি" বলে তাকে ছোট একটা চড় দেখালুম; সে একমুখ হেসে সরে গেল।

তাঁরই চিঠি। খামটা ছিঁড়ে ফেললুম,—ছোট্ট চিঠিখানি; লেখা আছে—

"প্রাণের অণিবাণী,

আসবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হল না বলে বড় কষ্ট হয়েছে আমার। কেন একটিবার দেখা দিলে না, রাণী? রাগ করেছ? লক্ষ্মীটি, রাগ করো না।

আমার কিছুই ভাল লাগছে না। যেমন করে পারি, শীঘ্র একদিন লুকিয়ে গিয়ে দেখা করে আসব। বাড়া থেকে বোধ হয় শনিবারের আগে ছুটি মিলবে না। দেখো, এর মধ্যে লুকিয়ে যদি যাই, সে কথা এখানে যেন প্রকাশ না হয়। তাহলে বড় লজ্জায় পড়ব। বৌদিকে ত জানো! যাই হোক—বৌদি এখনো ফেরেনি। ফিরলে বৌদির সঙ্গে পরামর্শ করব, যাতে শীঘ্র তোমাকে এখানে আনা হয়। আসবে ত মাণিক? আজ এই অবধি থাক। কেমন? তুমি রাগ করেছ কি না, একছত্র লিখে জানালে বড় আরাম পাব আমি। ইতি

তোমারি সুনীল।"

কেমন ছোট্ট চিঠিখানি! অথচ কি মিষ্টি! কোন আড়ম্বর নেই,—কিছু নেই—আঃ! চিঠিখানা একবার, দু'বার, তিনবার, বার-বার পড়লুম। মুখস্থ হয়ে গেল সবটা। আমার চিঠি! আমার, আমার, আমার! কি যে আরাম হল!

রাত্রে সকলে শুলে জবাব লিখলুম। শুধু লিখলুম—

"প্রিয়তম,

আমারও বড্ড মন কেমন করছে। আমি কেন রাগ করব? স্বামীর উপর কি রাগ করতে আছে! তাছাড়া তুমি কি করেছ যে আমি রাগ করব?

যেদিন তোমার ইচ্ছা হবে, সেই দিনই তুমি এসো। তুমি এলে আমার খুব আহ্লাদ হবে। আমি ভাল আছি। এ বাড়ীর সকলে ভাল আছে ও আছেন।

তুমি কেমন আছ, লেখনি কেন? বেশ সাবধানে থাকিবে। মাকে দিদিকে আমার প্রণাম দিবে। বুবড়ি কেমন আছে? তাকে আমার ভালবাসা জানাইবে। ইতি

তোমারি অণিরাণী!"

৯

দুপুর বেলা তেতলার ঘরে বসে বাবার জন্য রুমালে সুতো দিয়ে নাম তুলছিলুম। মা নীচেয় ছিল। হঠাৎ ভর্ত্তুর গলা শুনলুম, "মা, জামাইবাবু এসেছেন"—

আমি উঠে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালুম! মা বললে, "এসো বাবা, উপরে এসো"

আমি সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে রইলুম। ঘন্টি ডাকলে, "দিদি, দামাইবাবু দাকুচে—"

মা বকে উঠল, "ভারী ফাজিল হয়েছিস্ ত! চোপ্!"

হতভাগা ছেলে, দেখ না ডাকবার শ্রী! সত্যিই ভারী ফাজিল হয়েছে। দাঁড়াও না, ধরে পিটে দেব'খন!

একটু পরেই মা বললে, "কাতী, অণিকে ডেকে আন্ ত তেতালার ঘর থেকে—"

আমি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে এসে একটা রুমাল হাতে তুলে নিলুম। ধরা পড়া হবে না!—আমি যেন কিছুই জানিনা! কাতী এসে ডাকলে, "দিদিমণি, নেমে এসোগো, জামাই বাবু এসেছেন—"

"ইয়ার্কি পেয়েছিস্, পোড়ারমুখী—"বলে কাতীর পিঠে দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিলুম। সে বললে, "বেশ, সুখবর নিয়ে এলুম, কোথায় টাকাটা সিকেটা বকশিস্ পাব, তা না কিল!"

"আবার, পোড়ারমুখী!"

"নাও, এসো বাবু—সত্যি গো সত্যি,—দেখবে এসো। মা ডাকছেন।"

নীচেয় নেমে এলুম।

মা বললে, "হাতে মুখে একটু সাবান দিয়ে তোর ঐ জবিপেড়ে কাপড়টা শীগ্গির পর্ দেখি।"

আব্দারের সুরে বললুম, "আমি পারব না।"

"না, পারবে না! যা, কথা শোন্, শীগ্গির নে। সুনাল ওঘরে বসে আছে, দুষ্টুমি করিস্নে, যা—

মার কথামত সাজ-সজ্জা করলুম। মার ঘরে এসে দেখি, মা নেই। ও ঘরে কথা কচ্ছে। আমি দরজার চৌকাঠে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

একটু পরে মা এল, বললে, "নে, ঐ পাণগুলোয় গোলাপ জল দিয়ে রেখেছি, একটা ডিপের তুলে নিয়ে ওঘরে সুনীলের কাছে যা। তাকে পান দিস্,- বুঝলি। আমি জলখাবার নিয়ে যাই -"

পাণের ডিপে হাতে নিয়ে আমি ঘরে এলুম। তিনি একটা ইজি চেয়ারে বসে ছিলেন আমি ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তাঁর পানে চাইলুম। চোখে-মুখে হাসি একেবারে উছলে পড়ছিল।

তিনি বললেন, "এমনি করেছ—যে, দেখ, আজই ছুটে এলুম!"

আমি বললুম, "কেন এলে?"

তিনি বললেন, "অন্যায় করেছি না? তোমার খুব লজ্জা হচ্ছে?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ।"

তিনি বললেন, "তবে চলে যাই?" বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর পানে একবার চেয়ে দেখে চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি সরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন— তারপর আমায় ধরে ইজি চেয়ারটায় বসিয়ে দিলেন; নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি বললুম, "জানলা খোলা রয়েছে, কে দেখতে পাবে।"

তিনি বললেন, "কোন ভয় নেই মোদ্দা শোনো, আমি যে এখানে এসেছি আজ, এ কথা আমাদের বাড়ীর কেউ যেন না জানতে পারে! আমি কলেজ যাবার নাম করে বেরিয়ে এসেছি। তোমার মাকে বলো। বলবে ত?"

আমি বললুম, "বলব।"

তারপর পকেট থেকে কাগজে মোড়া কি-একটা বার করে বললেন, "এটা কি, বল দেখি?"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কি?"

"আমার ফটো। তুমি নেবে?"

আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, নেব।

ফটোখানা তিনি আমায় দিলেন— আমি টেবিলের উপর বাবার ব্লটিং প্যাডের তলায় সেটা রেখে দিলুম।

তিনি বললেন, "তিনটে অবধি আমার মেয়াদ, তারপর যেতে হবে।" তারপর ডিপে থেকে একটা পাণ নিয়ে মুখে তুলে, আমার মুখের মধ্যে তিনি আর একটা পূরে দিলেন।

তারপর গল্প আর গল্প,—কথার আর অন্ত নেই! তিনি কি রকম আকুল অধীর হৃদয় নিয়ে বাড়ীতে পড়ে থাকেন, আমায় চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখবার জন্য কতখানি তাঁর আগ্রহ—তারি ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে আমায় ছেয়ে ফেললেন।

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলুম না, তাঁর এত আকুলতা কেন! মনে ভারী গর্ব্ব বোধ হচ্ছিল—আমায় একজন এত ভালোবাসে, তার মনে আমি এতটা আধিপত্য বিস্তার করেছি, ভারী মজার কথা ত! তারপর কত কথাই যে হল! আর-তার মধ্যে কোথা দিয়ে যে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে বেজে গেছে, কারো হুঁস ছিল না। ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল, তখন তিনি চম্‌কে বলে উঠলেন, "এ কি! পাঁচটা! আশ্চর্য্য ত! এখনি আমায় যেতে হবে যে—"বলে একেবারে তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। আমি বললুম, "একটু বসো, মা জলখাবার দেবে, খেয়ে যেয়ো—"

"বড্ড দেরী হয়ে যাবে, বাণী—"

আমি বললুম, "না, না—মা দুঃখ করবে—আমি এখনি দিতে বলছি।"

বলে আমি দরজাটা খুলে বেরিয়ে পড়লুম। মার কাছ যেতে পারলুম না, একেবারে ছাদে চলে গেলুম। ছাদে থাকতে পারা গেল না, তেতলার সিঁড়ির চাতালে বসে রইলুম।

মার কথা কাণে গেল—মা বলছে, "এই রকম করে এসো বাবা। লজ্জা-টজ্জা করোনা। আজ তুমি আপনিই এসেছ বলে খুব খুসী হয়েছি—"

তিনি আম্‌তা আম্‌তা করে কি বলছিলেন,—সব কথাগুলো শোনা গেল না, শুধু একটু কাণে গেল। তিনি বললেন,—'এধারে ঐ মোড়ের উপর একটা কাজে এসেছিলুম, ভাবলুম, আপনারা কেমন আছেন, একবার দেখা করে যাই—"

আমার হাসি পেলে। আহা, বড্ড কাজ ছিল। না? আমি সব বুঝি গো, সব বুঝি। আমায় দেখবার জন্যেই আসা। এখন আবার কাজ দিয়ে তা ঢাকা হচ্ছে।

মা বললে, "বেশ করেছ বাবা। যখনি এধারে আসবে, এসো এখানে। তোমার শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হলোনা, তিনি বেরিয়েছেন—বাঁচিতে একটা বাড়ী কেনবার কথা হচ্ছে, তার জন্যেই গেছেন।" তার পরই মা একটু দ্রুত স্বরে বললে, "তোয়ালেটা কোথা রাখলিরে? ওরে ও রামদীন, জামাই বাবুকে তোয়ালে এনে দে শীগ্‌গির।"

তিনি বেরিয়ে পড়লেন। নীচে যাবার সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পেলুম। কাণ খাড়া করে রইলুম—শব্দটা সদর দোর অবধি এল—আমি ছাদে উঠে আলসের ফাঁকে চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। দাঁড়িয়েই আছি, দাঁড়িয়েই আছি—কৈ, আসে না ত।—কোন্ দিকে গেলেন? ওদিক দিয়ে নয় ত? তাড়াতাড়ি ছাদের ও কোণে গিয়ে দাঁড়ালুম, কৈ, এদিকেও দেখা যাচ্ছেনা ত! এর মধ্যে চলে গেলেন। কিন্তু কোন্‌দিক দিয়ে গেলেন—হাওয়ার পিঠে এ যে ভেসে যাওয়ার মত। বাঃ।

নীচে নামলুম। নামতেই বাবার গলার আওয়াজ পেলুম। বাবা বলছে, "গোপাল ভোগ আঁব এনেছি, দুটো খেয়ে যাও বাবা, এসো।"

তিনি বাবার সঙ্গে উপরে এলেন। তাঁর মুখখানি দেখলুম, শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। আহা, বেচারী গো, বেচারী—তিনটের সময় যাবার কথা। বাবাকে ত আর সে কথা বলতে পারেন না—কাজেই ফিরতে হয়েছে। আঁব টাঁব খেয়ে বাবার সঙ্গে দুটো কথাবার্ত্তা কইতে বেশ দেরী হল—আমি একবার ছাদে, একবার তেতলার ঘরে, আবার সিঁড়িতে, এমনিভাবে বন্দীর মত ছট-ফট্ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম—নীচেয় নামতে পা সরছিল না।

তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে আমি নীচেয় এসে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলুম,—সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। আমার এমনি হাসি পেলে। কোথায় তিনটে, না, একেবারে সাড়ে ছ'টা! ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ইলেকট্রন বা তড়িতকণা

রসায়ন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বন্ধুবাবু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি নিমন্ত্রণ রাখিতে তাঁহার খাস্‌-কামরায় আসীন। অসময়ে তিনি একটি ডিমভরা পেঁটো ইলিস্‌ মাছ পাইয়াছেন। "একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীয়াৎ" বচন-প্রভাবে আমার নিমন্ত্রণ। অসময়ের ইলিস মাছ বলিয়া দেবী, শান্ত, অমিয়া প্রভৃতি বালক-বালিকাদের মুখে আর হাসি ধরে না। বিশেষ আনন্দ শ্রীমতীর। তিনি লাল সেমিজের উপর "বেলের পানা"-খানি পরিয়া টুকটুকে মেয়েটাকে ফুট্‌ফুটে হাতে ধরিয়া ঝিকে বলিতেছেন যে, "এতবড় সংসারটা, সবাইকে ত একখানা করে দিতে হবে ঝি। তুমি আর-একটু পাতলা পাতলা করে মাছটাকে কেটো"। ঝি মনে মনে জানে যে বড় মাছই আসুক, আর ছোট মাছই আসুক, তার ভাগ্যে একখানির বেশী দুখানি জোটে না। কাজেই সে মোটা মোটা দাগা রাখিতে চায়। শ্রীমতীর কথা শুনিয়া ঝি একটু নরমে-গরমে বলিল "এর চেয়ে ছোট আর কি করবো গা! মাছ কুট্‌তে এসে হাতটা কাটবো নাকি?" বন্ধু-পত্নী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আজকাল পণ্ডিতেরা পদার্থকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশে ভাগ করে' 'অণু'তে (molecule) গিয়ে পৌঁছান, আর তুমি মাছটাকে আর একটু পাতলা করে' কুট্‌তে পার না?" এই বলিয়া একগাল হাসিয়া আড়চোখে পিছন দিকে চাহিতে চাহিতে কোলের মেয়েটিকে একটি চুমো খাইলেন। গিন্নির পশ্চাতে কর্ত্তার খড়মের শব্দ পাইয়া ঝিও হাসির মর্ম্ম বুঝিল; এবং মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া ঘাটে মাছ ধুইতে চলিয়া গেল।

বন্ধুপত্নীর কথাটা বড় মিথ্যা নয়। রাসায়নিক বাস্তবিকই পদার্থটীকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সেই অবিভাজ্য 'অণু'তে (molecule) গিয়া পৌঁছিয়াছেন। (পাঠক মনে রাখিবেন উপরি-উক্ত "অবিভাজ্য" শব্দটী রাসায়নিকের মতানুযায়ী প্রয়োগ করা হইয়াছে। পরে দেখাইব অণু অবিভাজ্য নহে, বিভাজ্যই বটে।) এক-একটী দুষ্ট ছেলে আছে, পুতুল পাইলেই ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। আমাদের রাসায়নিকেরাও তদ্রূপ। জিনিস পাইলেই ভাঙ্গিতে বসেন। বিশ্লেষণই তাঁহাদের প্রধান অস্ত্র। পদার্থকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে শেষটা তাঁহারা এমন-একটা স্থানে আসেন যে, আর সূক্ষ্মতর অংশে ভাঙ্গিতে পারেন না। পদার্থের এই সূক্ষ্মতর অংশের নামই 'অণু' (molecule)। রাসায়নিক 'অণু'তে আসিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা আরও সূক্ষ্মতর অংশ খুঁজিতে আরম্ভ করেন। 'অণু' পরমাণু সমষ্টিতে গঠিত। একটী অণুর মধ্যে একাধিক পরমাণু (atom) আছে। রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যার্থ পদার্থের যে অংশটুকু কার্য্যকরী হয়, সেই সূক্ষ্ম অংশের

নাম পরমাণু। পরমাণু অণুগঠনের উপাদান মাত্র। 'অণু'র অস্তিত্ব আছে, পরমাণুর পার্দথিক অস্তিত্ব নাই; অর্থাৎ পরমাণু আলাদা আলাদা থাকিতে পারে না, অণু'র আশ্রয়ে বাস করে। যেমন বঙ্গনারী পিতা পাত বা পুত্রের অধীনে বাস করে, সেইরূপ পরমাণু 'অণু'র অধীনে অবস্থিত। স্বাধীন অবস্থা তাহার নাই। অণু-পরমাণুর সম্বন্ধ কি-রকম জানেন? ঠিক যেন ইলিস মাছের এককোষা ডিম। ডিমটি হচ্ছে অণু। আর ডিমের দানাগুলি হচ্ছে পরমাণু। সকল দ্রব্যের পরমাণু এক আকারের নয়। কোন দ্রব্যের পরমাণু ছোট, কোন দ্রব্যের পরমাণু অপেক্ষাকৃত বড়। অণু বা পরমাণু চক্ষে দেখিয়া স্থির করিতে পারা যায় না; এত সূক্ষ্ম যে অনুবীক্ষণ সাহায্যেও ইহার কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।

রাসায়নিক এইখানে আসিয়া দাড়াইয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি এইখানেই শেষ। পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম অংশে পদার্থকে ভাগ তিনি আর করিতে পারিলেন না।

এখন তোড়যোড় করিয়া সাঙ্গপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া পদার্থ-বিৎ আসরে নামিতেছেন। দেখা যাক্‌ তাঁহার কেরামতি আবার কতখানি! তিনি পদার্থকে পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম অংশে ভাগ করিতে পারেন কিনা, এখন আমরা তাহাই দেখিব।

Sir W. Crookes, J. J. Thomson, Sir O. Lodge এ আসরে প্রধান গায়ক। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে যখন বিরলীকৃত বায়ুর মধ্যে তড়িত মোচন (discharge) হইতে থাকে, তখন পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কণার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই কণাগুলি বিয়োগ-তড়িতে যুক্ত। একটী কণাস্থ তড়িতের পরিমাণ ৩.৪ × ১০—১০ সে-গ্রাঃ সেঃ (C. G S. Unit)। এই যে কণাস্থ তড়িত, ইহারই নাম ইলেক্‌ট্রন্‌ বা তড়িতকণা। যে-কোন পদার্থের পরমাণু সাম্য অবস্থায় সমসংখ্যক যোগ ও বিয়োগ তড়িত কণায় গঠিত। বিয়োগ-তড়িতকণা সাধারণ পদার্থ হইতে অতি সহজে সামান্য তড়িত-বল দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। এবং এই বিচ্ছিন্ন বিয়োগ-তড়িত-কণা (electron) বায়ুহীন দেশে বা শূন্য দেশে অতি দ্রুতপদে দৌড়াইতে পারে। অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৬২,০০০ মাইল চলিয়া যাইতে পারে। ইহাই নব্য বিজ্ঞানের আধুনিক মত। যোগ-তড়িত-কণা (positive electron) পদার্থ হইতে সহজে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না। বিয়োগ-তড়িত-কণার ব্যাস প্রায় ১০—১৩ সেন্টিমিটার। পদার্থের পরমাণু বিয়োগ-তড়িত-কণা অপেক্ষা একলক্ষ গুণ বড়। তবেই দেখ, পদার্থবিৎ পরমাণু অপেক্ষা কত সূক্ষ্ম অংশে যাইতে পারিয়াছেন।

রাদারফোর্ড (Rutherford) একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। পদার্থ-গঠন (Constitution of matter) সম্বন্ধে কিছুদিন আগে তিনি কতকগুলি নূতন কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতে বিজ্ঞান-জগতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান তথ্যগুলি রাদারফোর্ডের মতানুসারে বেশ বুঝা যায়। এখন তাঁহার জগৎ-বিদিত মতটা সাদা কথায় একটু বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্‌। একটী ক্ষুদ্র যোগ-তড়িত-

কণা (positive electricity) দুই স্তর বিয়োগ-তড়িত-কণায় আবৃত। ভিতরস্থ স্তরকে "অন্তরস্তর" ও বহিরস্থ স্তরকে "বাহির স্তর" বলা যাক্। এই দুই স্তরেব কেন্দ্রে যোগ-তাড়িত-কণাটী "যক্কা বুড়ার" মত বসিয়া আছে। ছেলেবেলাকার একটা কথা মনে পড়িল। না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রে ঠাকুরমাকে ছাতের মাঝখানে বসাইয়া আমবা প্রায় কুড়ি-পঁচিশটা ভাইবোনে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাব চারিদিকে ছুটা-ছুটি করিতাম। আমরাও দুই দল বাধিতাম। প্রথম দলে বোনেবা থাকিত; দ্বিতীয় দলে আমবা (অর্থাৎ ছেলেরা) থাকিতাম। প্রথম দল ঠাকুবমাব কাছে কাছে ঘুবিত; আমরা (দ্বিতীয় দলটা) একটু দূবে দূবে ঘুরিতাম। এখানেও সেইরকম যোগ-তড়িত-কণাটি ঠাকুরমাব মত ঘট হইয়া বসিয়া আছে; আর বিয়োগ-তড়িত-কণাব দুই স্তর ছেলে-মেয়ের দুই দলেব ন্যায় যোগ-তড়িত-কণার চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। যোগ-তড়িত-কণাটি স্থানু অচলবৎ বসিয়া থাকে; আর বিয়োগ-তড়িত-কণাব দলেবা তাহার চারিদিকে দুই স্তরে ছুটাছুটি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এই দুই বিয়োগ-তড়িত-কণাব স্তর ও কেন্দ্রস্থ যোগ-তড়িত কণাকে লইয়া যে সমবায় গঠিত হইল, তাহাব নাম পরমাণু (atom)।* কেন্দ্রস্থ কণার উপব বহিঃস্তর অপেক্ষা অন্তর-স্তরটার একটু বেশী টান। বহিঃস্তরের ইলেকট্রণ বা তড়িত কণাগুলি কেন্দ্রস্থ কণার সহিত একটু আলগা ভাবে বাঁধা থাকে। ইহাদিগকে সহজেই কেন্দ্রস্থ কণা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পাবা যায়। এই দুই স্তরের বিয়োগ-তড়িতেব পবিমাণ একটীমাত্র কেন্দ্রস্থ যোগ-তড়িত-কণাব যোগ-তড়িত পরিমাণের সহিত সমান। পবমাণুব আকাব-গত ধর্ম্ম ও রাসায়নিক গুণ বহিঃস্তরেব ইলেকট্রণ সংখ্যার উপর ও তাহাদেব পারস্পরিক অবস্থিতিব প্রকার-ভেদের উপব নির্ভব কবে। পদার্থেব সক্রিয় অবস্থা (radio activity) অন্তব-স্তরস্থ ইলেকট্রণ-সংখ্যা ও তাহাদের অবস্থিতির প্রকার-ভেদেব উপর নির্ভর করে। পরমাণুস্থ ইলেকট্রণ-সংখ্যা পবমাণু-ওজনেব (atomic weight) সহিত সমান বা তাহাব ছোটখাটো কোন গুণিতক সংখ্যার (multiple) সহিত সমান, অথবা তাহার কোন sub-multipleএব সহিত সমান।

কঠিন পদার্থের 'অণু'গুলির মধ্যে ফাঁকা স্থান আছে। এই ফাঁকা স্থানকে "অণু-অন্তব" (inter moleculer space) বলা যাইতে পারে। এই অণু-অন্তরে কতকগুলি ইলেকট্রণ থাকে। তাহাবা কাহারও সহিত বাঁধা-ধবা নহে। উত্তাপ (Heat) বা বেগুণাতীত আলোকের দ্বারা (ultra-violet light) তাহাদিগকে কঠিন পদার্থ হইতে বাহির করিতে পারা যায়। সেইজন্য ইহাদিগকে মুক্ত

* পরমাণু ও ইলেকট্রণের পরস্পরের আকারগত সম্বন্ধ কি-রকম জানেন? ঠিক যেন জগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে একটি মাছি। পুরীর বিশাল মন্দিরটি হইল পরমাণু। আর তাহার মধ্যস্থ মাছিটি হইল ইলেকট্রণ। অথবা ঘরের মধ্যস্থিত ধূলিকণা; ঘরটী হইল পরমাণু, আর ভাসমান ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ধূলি-কণাটি হইল ইলেকট্রণ।

ইলেকট্রণ বলে। যেমন পুকুর হইতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিয়া লইলে পুকুরের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ কঠিন পদার্থ হইতে মুক্ত (free) ইলেকট্রণগুলি তাপ বা আলোক-রূপ জাল দ্বারা ধরিয়া বাহির করিয়া লইলে কঠিন পদার্থের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

জড়ের ইলেকট্রণ-বাদ সরল মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

চক্রান্ত

(২৩)

শ্যামাচরণের কনিষ্ঠা কন্যা অণুভার সহিত বর্ষাধিক কাল হাসির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রের বিবাহ ঠিক হইয়া আছে,- কিন্তু কার্য্য সমাধার জন্য কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত কোনদিনই তাগিদ আসে নাই। বরপক্ষ (অর্থাৎ মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী,) তাহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট নহেন,—মনে করিতেছেন, 'সে ভালই, হাসির বিবাহটা আগে হইয়া যাক্ না।'

অণুভা ষোড়শী—অথচ পিতা কেন যে এ সম্বন্ধে নীরব,—তাহা পাঠক অবগত আছেন। তিনি মনে আঁচিয়া আছেন,—আরও দুই বৎসর কাল এজন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে,—কারণ শরৎ বিলাত হইতে ফিরিয়া না আসিলে তিনি বিবাহের ব্যয়-ভার বহনে সক্ষম হইবেন না। কিন্তু মানবের এবং দেবতার সঙ্কল্প যে এক নহে ইহা পুরাণ-প্রবচন।

রাজভবনে শরতের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া শ্যামাচরণ হাওয়ার গতি বুঝিয়া লইয়াছেন। রাজার নিকট হইতে এমন চিঠি আসে না—যাহার মধ্যে শরতের বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা না থাকে। রাজকন্যার মাল্যদান বিবরণও ইতিমধ্যে বিচিত্র ছন্দোবন্ধে তাঁহার কর্ণ-গোচর হইয়াছে। অতএব, তাঁহার পুত্রতুল্য প্রিয় ভাগিনেয় যে অবিলম্বে রাজা অতুলেশ্বরের জামাতা হইবে,— ইহাতে তিনি সংশয়-রহিত চিত্ত। এই বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয়-মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যে শক্তিরূপ ঘটক পুরুষ এইরূপ অসম্ভাবিত যোগাযোগ ঘটাইয়া, সংসারের কণ্টকসঙ্কুল পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, শ্যামাচরণের 'পজিটিভিজম্' আপনার অজ্ঞাতে তাঁহার দিকে মস্তক অবনত করিল।

এতদিনে অণুভার পিতা—অণুভার বিবাহের কথা ভাবিবার অবসর পাইলেন। এতদিনের পর কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা আবিষ্কার করিলেন যে—"তাইত অণুভা যে বড় হইয়া উঠিয়াছে!" ইহার পর একদিন গাঙ্গুলি মহাশয় বেশ খোস মেজাজে—মনের প্রস্তাব . মুখে প্রকাশ করিবার জন্য মুখোপাধ্যায়-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নরেন্দ্র কলিকাতায় থাকে না। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিবার পর সে বোম্বাই সহরে টাটা মিলে কাজ লইয়াছে। এখন

নরেন্দ্র সেখানে হেড ওভারসিয়ার,—কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে আগামী জানুয়ারিতেই মোটা বেতনে আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের পদে তাহাকে উন্নীত করিবেন। গত আশ্বিনে ১০।১২ দিনের ছুটিতে যখন নরেন্দ্র বাড়ী আসিবে—খুব সম্ভব তখনই এই নিয়োগ-পত্র সঙ্গে আনিতে পারিবে, বাড়ীর পত্রে সে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। এ সংবাদ শ্যামাচরণও পাইয়াছেন।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীই বাড়ীর প্রকৃত কর্ত্রী। তাঁহার ইচ্ছাতেই মুখুয্যে-সংসার কেন্দ্রে ধৃত এবং কক্ষে ঘূর্ণ্যমান। দিদিমা আপনার তপ-জপ, পুরাণাদি পাঠ, এবং হাসিকে লইয়াই থাকেন, সংসারের কোন কথায় পারত পক্ষে যোগ দেন না। আর কর্ত্তা, এ বাড়ীর বরেণ্য যিনি,—প্রয়োজনে মাত্র তিনি শরণ্য—অন্য সময় সাক্ষীস্বরূপ নগণ্য মধ্যে গণ্য।

তবে বাহিরের লোক ঘরের কথা অত-শত কি জানে; শ্যামাচরণ সর্ব্বাগ্রে গেলেন দিদিমার নিকট, হিন্দু-বাড়ীর প্রথানুসারে কর্ত্রীর সম্মান সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই ত প্রাপ্য। দিদিমা তখন প্রাতঃস্নানান্তে—তপজপ শেষ করিয়া নিরামিষ হেঁসেলে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার হাতে জলে-ভেজান বাদাম পেস্তার একটি বাটি,—আর তাহার দাসীর হাতে তালের মাড়ীসহ একখানা থালা,—উভয়ে দালান পার হইয়া নীচের সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন।—মাসটা ভাদ্র, আজকাল দিদিমার রান্নাঘরে অন্ততঃ দুই তিন দিনও তালবড়া তাল-ক্ষীরাদি হয়। কেন না, ছানার মিষ্টান্ন হইতেও দিদিমার হাতের তাল-মিষ্টান্ন হাসি অধিক তারিফ করিয়া খায়।

সহসা জুতার শব্দ কাণে গেল,—সেই দিকে চাহিয়া দালান প্রান্তে শ্যামাচরণকে দিদিমা দেখিতে পাইলেন, তিনি দাসীকে তখন রান্নাঘরে যাইতে আদেশ করিয়া তাঁহার অপেক্ষায় দালানেই দাঁড়াইলেন। শ্যামাচরণ নিকটে আসিয়া প্রণাম করিলে—তিনি আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহিলেন—

"এত সকালে যে বাবা!" শ্যামাচরণ হাস্যমুখে বলিলেন—

"একটু কাজে এসেছি মা।" দিদিমা অনুমান করিয়া লইলেন, কি কাজ। তিনিও হাস্যমুখে বলিলেন "এস বাবা,—বসবে এস।"

এই বলিয়া দিদিমা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় নিজের গৃহ-বারান্দায় আসিয়া পৌঁছিলেন। এই বারান্দা-ঘর বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দালান। ভোজপর্ব্বের সময় সর্ব্বাগ্রে এখানে আসন পড়ে। কিন্তু অন্য সময় ইহাই দিদিমার বৈঠকখানা। মুখুয্যে-বাড়ীর প্রধান কর্ত্রীপদবাচ্য পরমপূজ্যা মহিলার এই ড্রয়িং রুমের সাজসজ্জা দেখিলে কোন ইংরাজ মহিলা সম্ভবতঃ চমকিয়া উঠিবেন। এই দালানের সর্ব্বপ্রধান আসবাব একখানিমাত্র নাতিবৃহৎ পরীবাহন তক্তাপোষ,—ইহাই দিদিমার রাজ এবং অতিথি সিংহাসন। ইহা ছাড়া আরও যে দুইটি গৃহদ্রব্য এখানে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা হইতেছে—হাসির একটি সেতার এবং বহির ক্ষুদ্র সেল্ফ্। এ দুইটির

কোনটিই মেজিয়া ভুক্ত নহে, দুইটিই দেয়ালে আলম্বিত। হাসি যখন এখানে আসে—তখন দিদিমার ইচ্ছামত কখনও বা সেতার বাজাইয়া, কখনও বা কোন বই পড়িয়া তাঁহাকে শুনায়।

দিদিমার পল্লী-সিংহাসনে বিছাইবার জন্য নিজের হাতে হাসি দুইখানা পশমের গালিচা ও দুইটা রেশমের কুসন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এ সকল দ্রব্য পুঞ্জীকৃত অবস্থাতে তক্তাপ্রান্তের শোভা বর্দ্ধন করে। "ছিঃ, এত বাহারে জিনিষ ব্যবহার করা তোর বুড় দিদিমার কি সাজে লো!" হাসি উপদ্রব করিলে দিদিমা এই শান্তিবাক্যে তাহাকে প্রবোধ মানাইতে চাহেন।—কিন্তু হাসি ত এ কথা মানিবার পাত্রী নহে, সে যখন এখানে উপস্থিত থাকে তখন গালচে এবং বালিশগুলা একটু আরামে হাত পা ছড়াইয়া বাঁচে,—কিন্তু সে চলিয়া গেলেই আবার তাহারা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

অতিথি অভ্যাগত কেহ আসিলে যখন দিদিমা তাঁহার সম্মানার্থ নিজের হাতেই তক্তার উপর গালিচা বিছাইয়া দেন—তখন সুদশার পরিবর্ত্তে তাহাদের দশা সমধিক বিষম হইয়া উঠে। অতিথিকে গালিচার উপর বসিতে বলিয়া নিজের বসিবার স্থানটা যখন তিনি গালিচাশূন্য করিতে থাকেন—তখন অতিথিও তাহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে। উভয় পক্ষের ঠেলাঠেলিতে তখন সেগুলা তক্তার প্রান্ত-দেশের পরিবর্ত্তে মধ্যদেশে পুঁটুলি বাঁধিতে থাকে। যদি ইতিমধ্যে হাসি আসিয়া উপস্থিত হয়—তবেই তাহার হাসির সঙ্গে সঙ্গে এই সব বিশৃঙ্খলা অবিলম্বে শৃঙ্খলায় পরিণত হয়।

সৌভাগ্যবশতঃ আজ তক্তার গালিচা ও কুসন রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছিল—সুতরাং তাহাদের আর ঠেলাঠেলির মধ্যে পড়িতে হইল না। দিদিমার ইচ্ছা ছিল—শ্যামাচরণ তক্তার উপর বসেন আর তিনি পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার বক্তব্য শোনেন,—কিন্তু শ্যামাচরণকে সে আদেশ মানাইতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহার অনুরোধই তিনি মানিতে বাধ্য হইলেন। দিদিমা তক্তায় বসিলে পর শ্যামাচরণও বসিয়া—কন্যার বিবাহের কথা পাড়িলেন।

দিদিমা শুনিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, তোমার মেয়েটি ত বড় হয়ে উঠেছে, অঘ্রাণে বিয়ে হলেই ভাল হয় বই কি। তবে কি জান বাবা শ্যামাচরণ, হাসির বিয়েটাও সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেই যেন ঠিক হোত।"

শ্যামাচরণ বলিলেন—"তাতে আর বাধা কি! শুনেছি ত বিজনের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা হয়ে আছে।"

দিদিমা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "গুজব কথা শ্যাম। দিনকতক বিজনকুমার এখানে যাতায়াত করত—তাই কথাটা উঠেছিল, কিন্তু আজকাল ত তাকে দেখতেই পাইনে। তবে বৌমার সেই ইচ্ছে এখনো চার পোয়া।"

শ্যামাচরণ বলিলেন—"মন্দ ইচ্ছা ত নয়; হলে ত ভালই হয়।"

"হ্যাঁ, আমার এই ইটের বারাণ্ডা যদি সোণার হ'য়ে যায়—তা হলে কি আমি মন্দ বলব। কিন্তু সম্ভব অসম্ভব ত একটা আছে। রাজা-রাজড়াকে মনে পোষা কি আমাদের মত লোকের সাজে! বৌমার যদি এতটুকু

বুদ্ধি আছে। অমন সোণার ছেলে শরৎ। তাকে কি না অগ্রাহ্য করলে। সেই পাপেই এখন এত নিগ্রহ।"

বলিতে বলিতে দিদিমার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

শ্যামাচরণ মাথা চুলকাইতে লাগিলেন,—মনে মনে কথাটার সত্যতা অনুভব করিলেন,—কিন্তু নিজের ভাগনের গুণের কথায় ত আর নিজে সায় দিতে পারেন না।

দিদিমা আবার কাতর অনুনয়-ভরা কণ্ঠে কহিলেন—"এখনো কি তা হয় না বাবা? তুমি যদি বল ত তোমার ভাগ্নে কি সে কথা ঠেলতে পারে?"

শ্যামাচরণ বলিলেন—"আমি যতদূর বুঝতে পারছি, তা হবে না মা। সম্ভবতঃ রাজবাড়ীতেই তার বিয়ে হবে। আর সেইটেই তার পক্ষে মঙ্গল,—আমি ত তাতে নারাজ হতে পারিনে মা।" দিদিমার সদাপ্রফুল্ল মুখকান্তি নৈরাশ্যম্লান হইয়া পড়িল। মনের কোণে তিনি শরৎকেই নাতজামাইরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—এই কথায় আশাহত হইয়া তাঁহার অন্তরতল হইতে বেদনার দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল। কিন্তু সে নিশ্বাস-হাহাকার সবলে চাপিয়া ধরিয়া তিনি প্রশান্ত ভাবেই বলিলেন—"তাই হোক তবে,—আশীর্ব্বাদ করি শরৎ সুখী হোক। আহা পিতৃমাতৃহীন বালক,—ভগবান তার মঙ্গল করুন। চিরদিনই আমি মনে জানি—একদিন সে বড়লোক হবে,—বাছার যেমন বুদ্ধি তেমনি তেজ। এমন হীরের টুকরো ছেলে হাসির অদৃষ্টে হোল না। হায়রে!"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইরূপ দুঃখের উক্তি দিদিমার মুখ হইতে শেষ ভাগে বাহির হইয়া পড়িল। শ্যামাচরণ সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন—"ভাবছেন কেন মা। হাসির ভাগ্যে ভাল বরই মিলবে। সংসারে যোগ্যতর বরও ত ঢের আছে,—দেখবেন একটি জুটে যাবে।"

"সেই আশীর্ব্বাদই কর বাছা। তোমার উপরই এ ভার রইলো, একটি ভাল ঘর বর দেখে দুহাত এক করে দাও। এই কাজটি তোমার করতেই হবে।" বলিতে বলিতে আগ্রহে নিকটে আসিয়া দুই হাতে শ্যামাচরণের হাত ধরিলেন। শ্যামাচরণ ধীরে ধীরে আক্রান্ত হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া যুক্তকরে শিরস্পর্শ করিয়া কহিলেন—"গুরুজনের হাত ছুঁয়ে শপথ করতে ভয় পাই মা, কিন্তু আপনার আদেশ মাথায় রাখলুম।"

শ্যামাচরণ দিদিমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহিণীর মহলে গেলেন। গৃহিণীর তরকারী কোটা তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি বারান্দায় বঁটির উপর বসিয়া বামুনকে থালায় রক্ষিত বিভিন্ন ব্যঞ্জন-বিভাগ বুঝাইয়া দিতেছেন, আর অদূরে তোলা উনুনে ঝি রাবড়ি করিতেছে, তাহারই দিকে বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। শ্যামাচরণ দূর হইতেই হুঙ্কার ছাড়িলেন—"বলি বৌঠাকরুণ গো, ঘরে আছেন ত?"

কৃষ্ণলাল সম্পর্কে শ্যামাচরণের শ্যালক শ্রেণীভুক্ত, তাই তিনি গৃহিণীকে বৌ-ঠাকরুণ বলিয়াই ডাকেন। বামুনকে থালা উঠাইয়া লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া গৃহিণী তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন বলিলেন—"এস ভাই"

তখন শ্যামাচরণের মস্তক তাঁহার পায়ের দিকে অবনত হইয়াছে। গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন—"ঘরে আসবেন বোঠান, কথা আছে একটু।" পাশেই অন্তঃপুরের বসিবার ঘর, ঘরের এক ধারে নীচে পালচে পাতা, অন্যধারে দুইচারি-খানা চৌকি-কৌচের ব্যবস্থা। গৃহিণী শ্যামাচরণকে ঘরে আনিয়া একখানি গদি-আঁটা বড় চৌকিতে বসিতে অনুরোধ করিলেন। শ্যামাচরণ না বসিয়া চৌকির পিঠে একখানা হাত রাখিয়া বলিলেন—"আর বসবনা বোঠান, দাঁড়িয়ে দাঁ'ড়য়েই কথাটা সেরে নেই, বেলা হয়ে গেছে; এখনি যেতে হবে।"

"কথাটা কি শুনি?"

"আপনার হুকুম নিতে এসেছি বোঠান; হুকুম পেলেই আগামী অঘ্রাণেই বিয়ের একটা দিন স্থির করে ফেলতে পারি।' গৃহিণী একহাতে আলম্বিত অঞ্চলের খুঁটটি ধরিয়া অন্য হাতে তাহা পাকাইতে পাকাইতে নতদৃষ্টি হইয়াই কহিলেন, "আর একটু দেরী কর না ভাই, হাসির বিয়েটা হয়ে যাক না আগে।"

শ্যামাচরণ কহিলেন—"পাত্র কি ঠিক আছে?"

গৃহিণী মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; সে দৃষ্টি ক্রোধপূর্ণ। তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন—

"কি ক'রে ঠিক হবে? কতদিন থেকে কর্ত্তাকে বলছি বিজনকুমারের বাপের কাছে একটি বার যাও, গিয়ে বিয়েটা ঠিক করে এস; তা ওঁকে কি বাগাতে পারছি? তুমি ভাই যদি এ ভারটি গ্রহণ কর।" শ্যামাচরণ সর্পভীতের ন্যায় সহসা সবেগে দুইহাত তফাতে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, —"বাস্‌রে তাঁর কাছে কি আমি এগোতে পারি? সে ক্ষমতা আমার নেই, মাপ করবেন বোঠান, আর যা বলবেন—তা বরঞ্চ আমি ঘাড় পেতে মেনে নেব।"

গৃহিণী নিরাশ হইয়া বলিলেন—"কি বল্‌ব আর ঠাকুরজামাই তবে,—হাসির অদৃষ্টে যা আছে হবে। তবুও বলে রাখছি একটি ভাল পাত্রের চেষ্টায় থেকো ভাই।"

"সে কথা আর আমাকে অধিক করে বলতে হবেনা বোঠান, হাসিকে নিজের মেয়ের তুল্যই দেখি।"

এই কথা এইরূপে শেষ করিয়া শ্যামাচরণ নিজের মেয়ের বিবাহ-প্রসঙ্গ তুলিলেন। বলিলেন, "অঘ্রাণে বিয়ে দিতেই হবে বোঠান; আপনারা পাঁজি-পুথি দেখে দিনটা স্থির করে আমাকে বলে পাঠালেই আমি প্রস্তুত হয়ে নেব। নরেন্দ্র আশ্বিন মাসে এখানে ত আসছে,—সেই সময় আমি একদিন এসে আশীর্ব্বাদ করে যাব। এই কথা রইল কেমন?"

এতদিন বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া আছে কিন্তু এ-পর্য্যন্ত আশীর্ব্বাদ পানপত্রাদিও হয় নাই। যথাসময়ে হইবে এইরূপ মনে করিয়া উভয়পক্ষই নীরব ছিলেন।

(২৪)

গৃহিণীর সম্মতি আদায় করিয়া লইয়া শ্যামাচরণ শেষে গেলেন কর্ত্তার নিকট। এ বাড়ী আসিয়া প্রথমে যখন তিনি

কর্ত্তার ঘরে যান তখন তিনি স্নানের ঘরে ছিলেন। শ্যামাচরণ কাজের লোক, তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া ইতিমধ্যে অন্তঃপুর ঘুরিয়া আসিলেন।

এখানে আসিয়া দেখিলেন, কর্ত্তা তাঁহার লেখার টেবিলের নিকট বসিয়া ও শব্দ চিত্রিত একখানি কাগজ হস্তে ধরিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট হাসিকে দর্শন-তত্ত্ব বুঝাইতে ব্যস্ত আছেন।

শ্যামাচরণকে দেখিয়া তিনি অস্বস্তি বোধ করিলেন, তাঁহার নমস্কারটা পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দিতে ভুলিয়া গিয়া অধীর ভাবে বলিলেন—

"একটু কাজে আছি ভাই, বাড়ীর ভিতরটা একবার বেড়িয়ে এস না।"

শ্যামাচরণ হাসিয়া বলিলেন—"বাড়ীর ভিতর থেকেই আসছি। অঘ্রাণেই অণুভার বিয়ে।"

কর্ত্তা কাগজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন—"বিয়ে। নিমন্ত্রণ করতে এসেছ বুঝি। তা বিয়েতে কিন্তু অর্থও আছে অনর্থও আছে।"

হাসি বাবার কথায় হাসিয়া অস্থির হইল; তখন কৃষ্ণলাল মুখ তুলিয়া নিজেও হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শ্যামা-চরণ হাসিয়া বলিলেন—"শুধু নিমন্ত্রণ করতে নয়, নিমন্ত্রণ নিতেও এসেছি। অঘ্রাণে তোমার ছেলের সহিত আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল—বুঝলে ত?"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"এত শীগ্ গির। তা গিন্নি কি বল্লেন?"

"তাঁর মত না নিয়ে কি তোমার কাছে এসেছি?"

কর্ত্তা অধীর অনুনয়ে কহিলেন—"গিন্নি মত দিয়েছেন তাহলেই হোল। আজ একটু ব্যস্ত আছি বুঝলে ভাই, আর একদিন এস, এ-কথা হবে এখন। বোস্ হাসি।"

হাসি ইতিমধ্যে উঠিয়া শ্যামাচরণকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শ্যামাচরণ বলিলেন "বোস, হাসি—তোমার বাবার শাপের পাত্র করোনা আমাকে। আমি চল্লুম—ভাবা, আচ্ছা আর একদিন আসব।"

বলিয়া শ্যামাচরণ দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন, কৃষ্ণলাল নিশ্চিন্তচিত্তে হাসিকে তাহার দর্শন-তত্ত্ব বুঝাইতে লাগিলেন।

শ্যামাচরণ যতই ভাবিতেছেন, যতই শাস্ত্রা-লোচনা করিতেছেন ততই ওঙ্কার শব্দের মাহাত্ম্য তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া বসিতেছে। ঋষদের এই ওঙ্কার প্রতিপাদ্য লুপ্ত জ্ঞান যদি তিনি জন-সমাজে পুনঃ প্রচার করিতে পারেন—তবেই তাঁহার জীবন ধন্য সার্থক। কিন্তু তাঁহার এই মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা বিঘ্ন বিস্তর। প্রথম বাধা, সময়ে অসময়ে বন্ধু-সমাগম, দ্বিতীয় বাধা, বিষয়-কার্য্যের জঞ্জাল, কিছু না করিলেও কাগজ-পত্রগুলাও ত সই করিতে হয়। তৃতীয় এবং চূড়ান্ত বাধা—স্বয়ং তাঁহার গৃহিণী। কর্ত্তা যখনি বেশ সংযত চিত্তে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়-সম্বন্ধে কোন একটি জটীল সমস্যার পূরণ করিতে বসেন—আশ্চর্য্য! তখনই কি গৃহিণীর মাথায় টনক নড়ে। ভূষণ-ঝঙ্কারে অবিলম্বে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা ঘোষিত হইয়া উঠে, আর কর্ত্তার আমূল চিন্তা বিকারগ্রস্ত, বিপর্য্যস্ত, বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে।

একদিন বড় দুঃখে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম—"এমন কার্য্য জীবনে যদি আর কক্ষণো করি ত আমার নামই মিথ্যা।"

আমি সভয়ে সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি কার্য্য করবেন না আর মুখুয্যে-মশায়? এইবার কি তবে লেখনী ছাড়বেন?"

মুখুয্যে-মশায় রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এমন রাগ আমি জীবনে কখনো দেখি নাই;—মুখ লাল করিয়া কহিলেন—"আরে মূর্খ? তা নয়! লেখা ছাড়লে বাঁচব কি নিয়ে?"

"তবে?"—

"তবে কি এইটুকু বুঝিস নে রে নিবর্বুদ্ধি, জীবনে আর কখনো দার পরিগ্রহ করব না।"

উত্তরে বলিলাম—"ধন্য ধন্য! সাধু সাধু! ·তাদিনের পর একটা কথার মত কথা শোনা গেল।"

কিন্তু মনের ভিতরকার সংশয় তবু মিটিলনা। অবস্থান্তরে সর্ব্বদাই ত লোকের মতান্তর ঘটিয়া থাকে। এই ত সেদিন পত্নীপ্রেমগদ্গদচিত্ত আমাদের সদাই ভক্ত নাতির জন্য কনে খুঁজিতে গিয়া নিজে—যাক্ সে কথা!

সকাল বেলাটা কর্ত্তা একরূপ নিরাপদ। কাজকর্ম্ম ফেলিয়া গিন্নি বড় একটা এদিকে ঘেঁসেন না—তাই এ-সময়টা তাঁহার দর্শন-তত্ত্বের মীমাংসায় বুদ্ধিটা বেশ খোলতে থাকে। কিন্তু এই সময়েই তিনি একজন শ্রোতার বড় অভাব অনুভব করেন। কিছুদিন হইতে হাসি তাঁহার এই অভাব দূর করিয়াছে। তাহাকে বেশ একটি সমজদার সহিষ্ণু শ্রোতারূপে তিনি পাইয়াছেন। ইহার নিকট ব্যাখ্যা করিতে করিতে তাঁহার জটিল তত্ত্ব-সূত্রও সহজে উন্মুক্ত হইয়া আসে। তাই প্রাতঃকালটা এ-কার্য্যে বাধা পড়িলে—তিনি বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ওঠেন।

আপাততঃ কাগজে লিখিত ওঁ শব্দটি লেখনীর অগ্রভাগে নির্দ্দিষ্ট করিয়া হাসিকে বলিতেছিলেন—"বুঝলে ত হাসি?" হাসি অক্ষরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিল—"কতক কতক।"

"আচ্ছা, তাহলে আবার গোড়া থেকে বলছি ভাল করে বোঝ মা। শাস্ত্রমতে পরমাত্মার হৃদয়-আকাশ হইতে উৎপন্ন অ, উ, ম্ এই ত্রিবর্ণের সন্ধিজাত ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মবোধক ওম্ শব্দ, বেদের সনাতন বীজমন্ত্র এবং জীবাত্মার হৃদয়ে স্বতঃ বিরাজমান ও স্বতঃ প্রকাশমান।

এখন বিচার করে দেখ অ উ এই শব্দ দুটি কি? স্বরবর্ণ, কেমন?"

"হ্যাঁ।"

"আর ম্?"

"ব্যঞ্জনবর্ণ।"

"আচ্ছা বেশ,—ব্যঞ্জনের কি স্বরবর্ণ ছাড়া পৃথক অস্তিত্ব আছে?"

"না, তাদের আলাদা উচ্চারণ হয় না।"

"সেইজন্য পরমাত্মা স্বর—এবং জীবাত্মা ব্যঞ্জনবাচক এবং পৃথক হইয়াও পরস্পর-সংযুক্ত। অন্য ভাষায়,—বিন্দুর সমষ্টিতেই যেমন এই বিশাল পরিদৃশ্যমান জগৎ সেইরূপ পরমাত্মারূপ বিশ্বকোষে অবস্থিত সৃজনশক্তির বশবর্ত্তী এই জীবাত্মা বিন্দু মানব-দেহে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবামাত্র ওম্ শব্দের উচ্চারণে ভগবানের সহিত আপনার

একাত্মতা প্রতিপাদন দ্বারা তাঁহার বক্তৃতা স্বীকার করে। বুঝলে ত হাসি?"

হাসি হাসিয়া বলিল—"মনে ত হচ্চে এইবার বুঝেছি!"

শ্যামাচরণ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"ওঁ অক্ষরের প্রথম গ্রন্থি বিন্দু পরমাত্মা বা চ ক চিহ্ন, মধ্যবিন্দু পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলনগ্রন্থি চিহ্ন। আর যদি ওকার শব্দের আদ্যোপান্ত এইরূপে মিলিত কর তখন ইহা চক্ররূপ ধারণ করে। এই চক্রান্তের মধ্যে নিখিল বিশ্ব স্থিত, রক্ষিত, ঘূর্ণ্যমান। বুঝলে হাসি?"

"হ্যাঁ বাবা! আমার বড় ভাল লাগছে।"

"আর ও শব্দের মাথার উপর এই যে চন্দ্রবিন্দু এর অর্থ কি জান? জীবাত্মা আমরা যখন পরমাত্মাকে আপনাতে অনুভব করি—তখন তিনি ওঙ্কার পুরুষ—আর যখন তা করিনে তখন আমরা তাঁর অর্দ্ধরূপই দেখতে পাই। তখন তিনি চন্দ্রবিন্দু আকারে সাক্ষীস্বরূপরূপে আমাদের উর্দ্ধে বিরাজিত থাকেন। বুঝলে মা?"

"কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই একাত্মতা অনুভব করব কিরূপে?"

এই প্রশ্নে শ্যামাচরণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন,—কহিলেন, "আঃ সেই ত কথা! গার্গীও ঠিক তোমার মত এইরূপ প্রশ্ন করেছিলেন! আমার ইচ্ছা কি জান—হাসি? তুমি যদি গার্গীর মত—"

ঠিক এই সময় কি গৃহিণী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন! তাঁহার অন্ধকার মুখ দেখিয়া কর্ত্তার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। হাতের কলমটা টেবিলে ফেলিয়া শোচনীয় দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু এ দৃষ্টিতে গিন্নির পাষাণ হিয়া গলিল না। তিনি হাসিকে চলিয়া যাইতে অনুজ্ঞা করিয়া দৃঢ় গম্ভীরস্বরে স্বামীকে কহিলেন—"অঘ্রাণেই নরেন্দ্রের বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল—কিন্তু তার আগে হাসির একটি পাত্র ঠিক করা চাই-ই চাই। সুজন রায়ের ওখানে আজ তোমাকে যেতেই হবে।" কর্ত্তা মুখটি চূণ করিয়া বলিলেন—"সে কথা কি আমার মনে নেই? আমি সেজন্য দিনের মধ্যে পঞ্চাশবারের জায়গায় একশবার হেমকে তাগিদ দিচ্ছি।"

গৃহিণী চড়াস্বরে কহিলেন—"হেমটেম আমি জানিনে—তোমাকেই নিজে আজ সেখানে যেতেই হবে।" যেন কর্ত্তার সুজন রায়ের বাড়ী না যাওয়াতেই বিবাহটা বন্ধ আছে।

"আচ্ছা বেশ, তাই যাব—কিন্তু একটু সময় দাও লক্ষ্মীটি,—একলা ত যেতে পারিনে,—হেম আসুক।"

"আবার বলছি হেম আসবে কি না আসবে—আমি জানিনে—আমি শুধু জানতে চাই তুমি আজ সেখানে যাবে কিনা? বিকাল পর্য্যন্ত আমি সময় দিচ্ছি,—আর যদি না যাও ত—"

কর্ত্তা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—"আর বলতে হবে না—আমি ঠিকই যাব, আজই যাব, নিশ্চয়ই যাব।—শশী—শশে—শশধর, শশাঙ্কলাঞ্ছন—কোথায় তুমি!" কর্ত্তাবাবুর ডাক হাঁকে তাঁহার ভৃত্য শশী আসিয়া উপস্থিত হইল—ক্রুদ্ধ গৃহিণী কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া এই সময় সরিয়া পড়িলেন।—শশীর প্রিয় মুখ দর্শনে তাঁহার

হৃদয়ের রুদ্ধ আলামুখী উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিল; তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন "কোথায় ছিলি এতক্ষণ অজবুদ্ধি-গজানন?"

"এজ্ঞে এইখানেই ত আছি।"

"এইখানেই ত আছিস্, তবে ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না কেন? হেমকে ডেকে নিয়ে আয়!"

"এজ্ঞে তিনি এখনো আসেন নি।"

'এখনো আসেনি! আজকাল ত দেখছি তার বড় গাফেলি হয়েছে। তুই তবে যা--"

"এজ্ঞে চল্লাম—"

"অমনি চল্লাম! কি বলছি আগে শোন্।"

"বলতে আজ্ঞা হোক—"

"এখনি গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আয়,—বুঝলি ত? খবরদার দেরী করিসনে।"

যে আজ্ঞে বলিয়া সে দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং ইহার পর—বার বার—কর্ত্তাবাবুর উচ্চ কণ্ঠনিঃসৃত আদরের এবং অনাদরের ডাকহাঁকেও তাহার সাড়া বা খোঁজ পাওয়া গেল না,—তিনি হতাশচিত্তে দ্রুত নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চৌকিতে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত পূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন হইলেন।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

ভারত-শিল্প ও ভারত-বাসী

ক

ভারতবর্ষে ভারত-চিত্রকলার আদর হয়েছে শ্রেণী-বিশেষের কাছে, দেশের বেশীরভাগ লোকই তাকে কোনরকম আমোল দিতে রাজি নয় ভারতীয় আর্টিষ্টকে সকলে 'প্যোটো' বলে ডাকে, এবং এই শ্রেণীর চিত্রকরদের আঁকা কোন ছবি চোখে পড়লে, প্রকাশ্য ভাবে তাঁদের গালাগাল দিতেও অনেকে লজ্জিত নন। এঁদের ভাব দেখ্‌লে এবং কথা শুনলে মনে হয়, চুরি জুয়াচুরি বাটপাড়ি-দাগাবাজীর মত, ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি-আঁকাও যেন ভারি একটা যাচ্ছেতাই কাজ! কারণ, চিত্রকরদের উপরে সকলে প্রায় এমন-সব ভাষাই প্রয়োগ করছেন —যা-শুনলে চোর-বাট্‌পাড় পর্য্যন্ত বিনাবাক্য-ব্যয়ে চিট্ হয়ে যায়!

খ

জন-সাধারণের মেজাজের সঙ্গে যাঁদের অল্প-বিস্তর জানা-শুনো আছে, এ-সব গালি-গালাজের কারণ বোঝা তাদের পক্ষে বিশেষ-কিছু শক্ত হবে না।

জীবনে, সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে,—এমনি সব বিষয়েই, চলা পথ ছেড়ে অ-চলা পথে চল্‌তে গেলেই, দুনিয়ার হাটে অনেক সচলকেও অচল হ'তে হয়। নূতনত্বের ফ্যাসাদ আছে যথেষ্ট। নূতনের সঙ্গে অচেনার সঙ্গে হঠাৎ একদিনে আলাপ জমানো আদোপেই সহজ নয়। ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, বাপ-মার সঙ্গে একঘরে বসে দিব্য পাঁচরকম কথা-বার্ত্তা কইছ, এমনসময়ে তারি মাঝখানে কোনরকম জানান্ না দিয়ে আচম্‌কা যদি একজন অপরিচিতের আবির্ভাব হয়, তাহলে

সে অপরিচিতের ভাগ্য যে নিতান্ত অপ্রসন্ন, তা বোধহয় আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

প্রতিভার নূতনত্বও ঠিক ঐ অপরিচিত আগন্তুকের মত। সময় অসময়, স্থান-অস্থান, পাত্র-অপাত্র—কোনদিকেই দৃক্‌পাত না-করে' আচম্বিতে তার আবির্ভাব হয়, আমাদের সকলকার দৃষ্টি সচকিত করে', সকলকার ঠিক মাঝখানে! চেনা মুখ, অভ্যস্ত ভাব, মুখস্থ কথা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি চলাচলি করে' দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা বাধা নিয়মে নিশ্চিন্ত প্রাণে আসর জমিয়ে যেখানে বাস করছিল, প্রতিভার নূতনত্ব সেখানে একটা মস্ত উপদ্রবের মত আত্মপ্রকাশ করে' আগাগোড়া সব কিনা উল্টে পাল্টে, ভেঙে চুরে, অদলে-বদলে তছ্‌নছ্‌ করে' দিতে চায়। লোকের তা ধাতস্থ হবে কেন? কাজেই তারা খাপ্পা হয়ে না-বলে থাকতে পারেনা যে, 'বা রে! আবদার ত মন্দ নয়। তোমাকে জানি-নি, দেখি নি, চিনি-নি, কোথায় থাকো, কোন্ জাত্‌ কিছুই তোমার ঠিক নেই, আর তুমি আস কিনা আমাদের ঘাড়ে চেপে বসতে, আমাদের উপরে হুকুম চালাতে! যাও, যাও, ভাগো এখান থেকে!'

গ

মাইকেল যখন প্রথমে অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য লেখেন, তখন দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই তাঁর উপরে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। মাইকেলের নামের মত বহুনিন্দিত নাম তখনকার কালে বোধহয় আর-কারুর ছিল না। মেঘনাদ-বধ যে একেবারে কাব্য হয়-নি, তার ভাষা যে জাহান্নমের জঘন্য ভাষা এবং তার লেখক যে একজন অকালপক্ক নগণ্য লেখক, সে-যুগের অধিকাংশ লোকই এ-কথাটা বারংবার কপচাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন-নি। অথচ সেই মেঘনাদ-বধ-কাব্যকে ঐ জনসাধারণই দুদিন পরে পূজার ফুলের মত মাথায় তুলে নেচেছিল এবং আজও সে

একটি নাক-ভাঙা লোক

নাচ পুরো-দমে সমতালে চলছে। বিজ্ঞেরা এখন ঘনঘন মাথা নেড়ে বলে থাকেন, "হ্যাঁ, 'জিনিয়াস্' বলি বটে ঐ মাইকেলকে।"

বিখ্যাত ভাস্কর ওগস্ত্ রোদাঁ যখন আর্টের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাড়ান, তখন ফ্রান্সের মত কলা প্রধান দেশেও তাঁকে বড় কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় নি। তাঁর প্রথম-গড়া "নাক ভাঙা লোক" নামে মূর্ত্তিটিতে শিল্পীর নিজস্বের পরিচয় আছে আর সেকেলে আর্টের নকল নেই বলে কলা-রসিকরা শিল্পশালা থেকে তাকে বিদায় করে' দিয়েছিলেন। রোদাঁর "ব্যালয্যাক্" দেখেও দেশের লোকে তাঁর অখ্যাতি-রটনা করেছিল যৎপরোনাস্তি। কিন্তু দুদিন যেতে-না যেতেই সেই রোদাঁকেই সকলে "বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর" বলে মেনে নিতে বাধ্য হ'ল। আবার, অদৃষ্টের এম্নি পরিহাস যে, রোদাঁর সেই সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত "ব্যালয্যাক" ও "নাকভাঙা লোক" নামে মূর্ত্তিটি আজ দেশের ও দশের মাঝখানে, অসামান্য ক্ষমতার নিদর্শন বলে বিখ্যাত।

ব্যালয্যাক্

পৃথিবীর অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারককেও প্রথমে যে-জন-সাধারণ নানারকমে অপমান করতে কুণ্ঠিত হয় নি, পরে সেই-জন-সাধারণই আবার 'মহামানব' বলে' তাঁদেরই পায়ে ভক্তির ফুল নিবেদন করেছে। এম্নি সকল বিভাগেই প্রতিভাবানরা সাধারণের কাছ থেকে প্রথমে খেয়েছেন শক্ত শক্ত গালাগাল, তারপরে পেয়েছেন ষোড়শোপচারে পূজা।
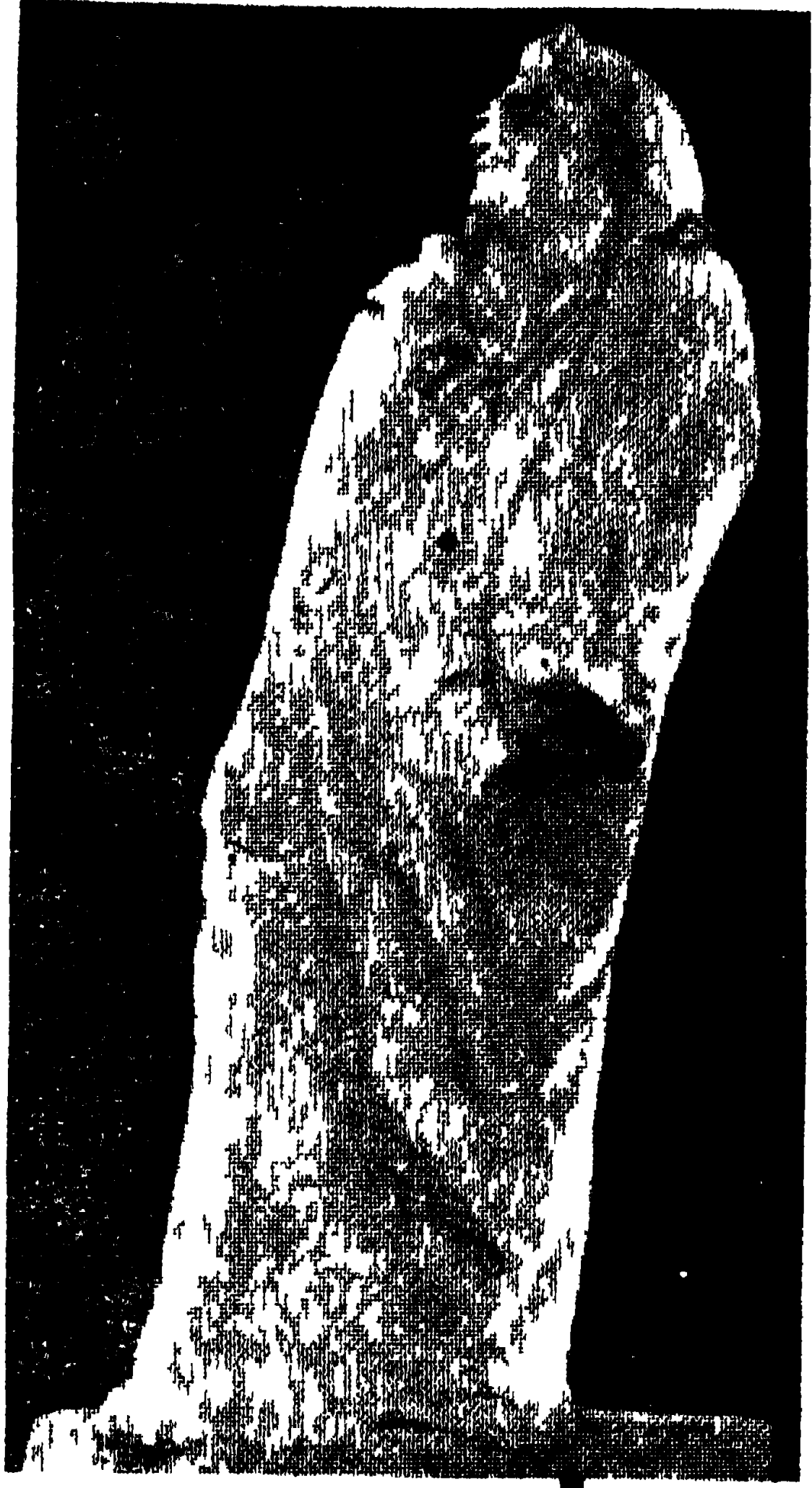
এইজন্যই কেউ কেউ বলে' থাকেন, প্রতিভাবানরা ঠিক মাহেন্দ্রক্ষণে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন না। দুদিন আগে না এসে তাঁরা যদি আর-দুদিন পরে আসেন, তবে সেই অবকাশে সাধারণের মনও তৈরি হয়ে ওঠে এবং তাঁদেরও আর অনেক জ্বালা যন্ত্রণা মিথ্যে পোয়াতে হয় না। এ কথাটায় অনেকটা অত্যুক্তি থাক্‌লেও খানিকটা সত্য নিশ্চয়ই আছে।

দেশীয় চিত্রকলার কপালেও ঠিক এই দশা ঘটেছে তাকে দেখ্‌তে অভ্যস্ত নয় বলে'ই জনসাধারণ তার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক পাতাতে নারাজ। তারপরে, আমাদের

রদাঁ ও তাঁহার গঠিত আদমের মূর্ত্তি

বিকাশ আজ আমরা দেখতে পেতুম না; কেননা ও-সব জায়গায় যে শিল্প-বিচিত্র মন্দিরগুলি গড়া হয়েছে, সেগুলি কেবল জন-কতক কলা-রসিকের জন্যই গড়া হয়-নি,—সেগুলি ছিল সর্ব্ব-সাধারণের সম্পত্তি। সেকালে যে বিশাল জনতার তরঙ্গ ঐ-সব মন্দিরের দিকে ছুটে যেত, বিচিত্র শিল্পের ভাবের বসে তার সর্ব্বাঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত এবং তখনকার লোকের ভক্তি-প্রেম এই শিল্প-মার্গ অবলম্বন করে'ই বিশ্ব পিতার চরণে গিয়ে পৌছতে চাইত।

ভারতের অতীতের সমগ্র কলা-নিদর্শন আজ আর দেখ্‌বার উপায় নেই। চিত্র-কলার নমুনা ত প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেছে, ভাস্কর্য্য আর স্থাপত্যের ধ্বংসাতিরিক্ত কতকগুলি নিদর্শন এখনো কোনরকমে বর্ত্তমান থাক্‌লেও, তাদের পূর্ব্ব শ্রী'র অনেকটা এখন ধুয়ে-মুছে চোখের আড়াল হয়ে গেছে। খানকতক যা ছবি পাওয়া যায়, তার রঙও গেছে জলে—আর বেশীর ভাগই ছেঁড়াখোড়া। কতকগুলো যে পাথরের মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তার কোনটিরই গায়ে আগেকার সে পালিশ নেই, আর চিত্রকলার মধ্যে যে প্রতিভাব নিজস্ব দেখা দিয়েছে, সেটাও তার অনাদরের আর-একটা কারণ হ'তে পারে।

ঘ

তা নইলে, একদিন এই ভারতবর্ষেই যে-কলা-পদ্ধতি সর্ব্ব-সাধারণের আগ্রহ জাগ্রৎ করেছিল, সেই ভারতবর্ষেই, সেই একই কলা-পদ্ধতির প্রতি সকলে এখন উপেক্ষা প্রকাশ কর্‌ছে কেন? জন-সাধারণের ত-বিরুদ্ধ হ'লে কণারক, ভুবনেশ্বর, সাঞ্চী, ইলোরা, অজন্তা, শিগিরি প্রভৃতি স্থানে ভারতের সম্পূর্ণ-নিজস্ব চিত্র-স্থাপত্য-ভাস্কর্য্য

সুজাতা

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু-অঙ্কিত চিত্র হইতে
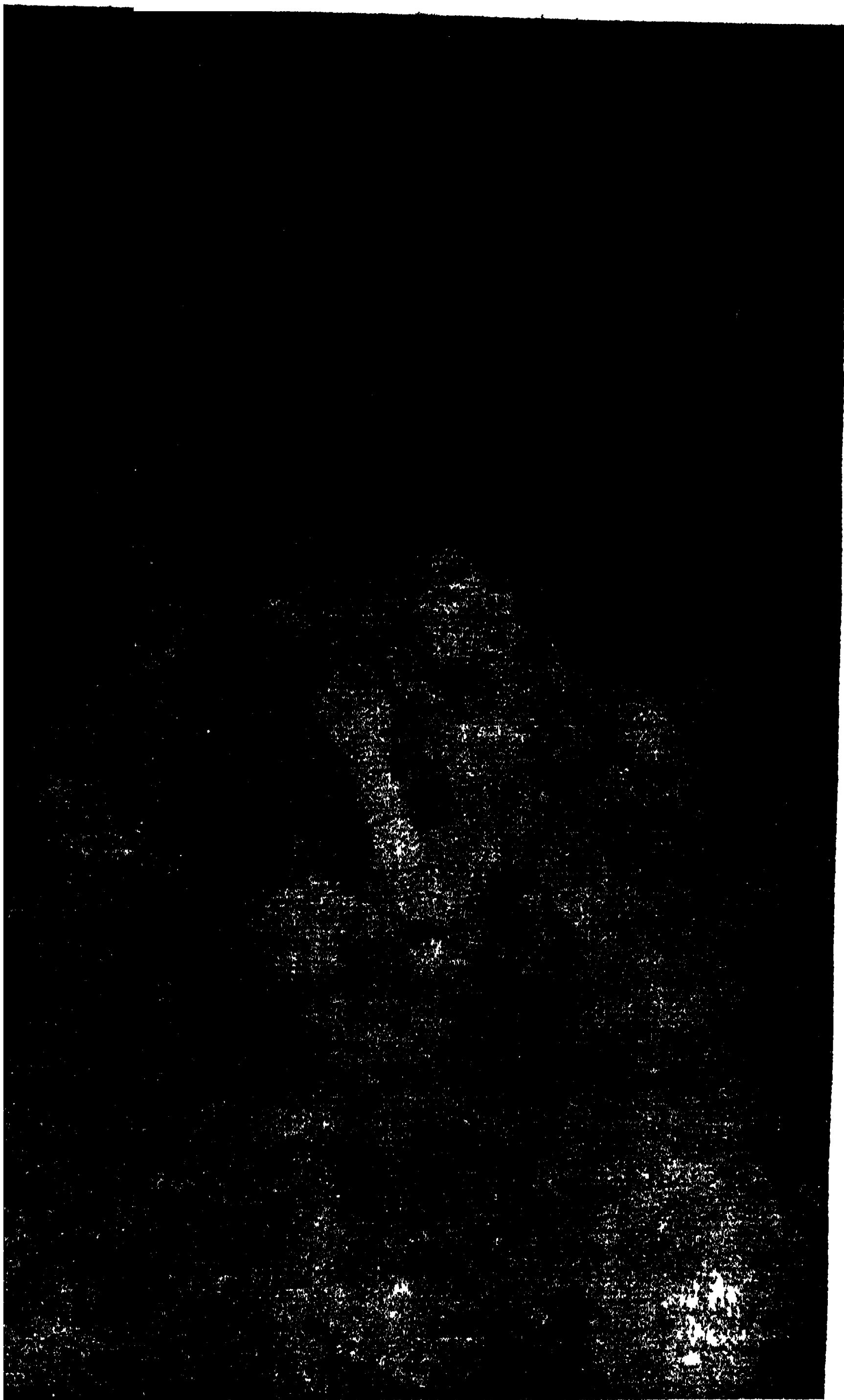
অধিকাংশেরই হাত-পা-মাথা ভাঙাচোরা। স্থাপত্যের দশাও তথৈবচ। কিন্তু এ-হেন দুর্দ্দশা ঘট্‌লেও প্রাচীন শিল্প-ভাণ্ডারে গেলে এত-বেশী প্রতিভাধরের অসামান্য হাতের কাজের নমুনা দেখা যায় যে, দর্শককে একেবারে অবাক হয়ে চেয়ে থাক্‌তে হয়। এথেকেই বেশ বোঝা যায়, সেকাল-কার ললিত কলা ভারতের সর্ব্বত্র—সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শরৎ-প্রভাতের অবাধ আলোর মত ছড়িয়ে পড়েছিল। নইলে যে-প্রতিভার জন্ম হয় 'কোটিকে গোটিক' মাত্র, সেই দুর্লভ প্রতিভার এমন অসংখ্য অধিকারীকে এই নষ্টাবশিষ্ট শিল্পের রাজ্যে দেখ্‌তে পেতুম না! হ্যাঁ,—শিল্পের চর্চ্চা 'ছিল তখন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে! এতে আর একটুও সন্দেহ নেই।

রোদাঁর গঠিত রোমিও ও জুলিয়েট

৬

কিন্তু, তারপরেই অন্ধকারের যুগ! বিদেশীর আক্রমণে আমরা যে শুধু স্বাধীনতা হারিয়েছি তা নয়; আমাদের কলাপটুতাও সেইসঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে। ভারতের যে দেশ যেদিন থেকে পরাধীন হয়েছে, সেই দিন থেকে সে-সব দেশে আর একটিও উচ্চশ্রেণীর ললিত কলার সৃষ্টি হয়-নি। অবশ্য, বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর নূতন মন্দিরের মত আরো-দুয়েকটি ছোট-বড় শিল্পকার্য্যের কথা এখানে আমি ধরছি না। আর, তাজমহল প্রভৃতি শিল্পকার্য্য ভারতের গৌরব হ'লেও সেগুলিকে খাঁটি ভারতীয় বল্‌তেও কেমন-যেন বাধো-বাধো ঠেকে!

এই অন্ধকারের যুগে আমাদের রুচি, শিল্প-বোধ ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞান একেবারে হারিয়ে

গেছে। শিল্পীও আর জন্মান নি, শিল্প জিনিষটা কি তাও আমরা ভুলেছি। পাশ্চাত্য দেশে অতীত থেকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত আর্টের একটা একটানা ধারা বরাবর বয়ে এসেছে। সুতরাং সর্ব্ব সাধারণের রসবোধে সেখানে চর্চ্চার অভাবে মর্চে ধরতে পারে-নি। তাই প্রতীচ্য আর্টের আদর্শ কি য়ুরোপবাসীরা তা বিলক্ষণ বোঝে। দুঃখের কথা বল্‌ব কি; প্রাচীন ভারতের চেয়ে সভ্যতায় খাটো এমন যে জাপান, সেখানকার জন-সাধারণও বেশ জানে, জাপানী কলার যথার্থ আদর্শ কি। কিন্তু ভারত-শিল্পের আদর্শের কথা জিজ্ঞাসা করলে আমরা সুধুই যে তার কোন সদুত্তর দিতে পার্‌ব না, তা নয় উল্টে আমাদের এই শোচনীয় অজ্ঞতা ঢাক্‌বার জন্যে, ভারত-শিল্পের প্রতি চোখা-চোখা এক-রোখা বাক্য-বাণ বর্ষণ করে' এমন ভাব দেখাব যে, আর-পাঁচজনে ভেবে নেবে, আমাদের শিল্প-জ্ঞান দস্তুরমত টন্‌টনে।—অতএব, যথার্থ রসিকদের স্তব্ধ হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কারণ, ঠাট্টার উপরে যুক্তি অচল

এখানে বোঝা গেল, ভারতীয় কলার অনাদরের আর একটি কারণ, আমাদের শিল্প-জ্ঞানের অভাব।

চ

কিন্তু কারণ যাই হোক্—এ অনাদর বরাবর থাক্‌বে না।

অন্যান্য বিভাগে পরিণামে যেমন প্রতিভাধরের জয় হয়েছে, ভারতীয় কলা-পদ্ধতির প্রতিভাবান শিল্পীরাও তেমনি পরিশেষে জন-সাধারণের বিবশ মনকে বশ কর্‌তে পার্‌বেন।

তারপর, আর্টিষ্টরা সমান উৎসাহে যদি এম্‌নি একান্তভাবে শিল্প-সাধনায় নিযুক্ত থাকেন, তবে জন-সাধারণের ভিতরেও সেই সাধনার প্রভাব ধীরে ধীরে সকলের অজ্ঞাতসারে ঠিক মন্ত্র-শক্তির মতই সঞ্চারিত হয়ে যাবে। ফলে, আস্তে-আস্তে ক্রমেই ভারত-শিল্পের চর্চ্চা বেড়ে উঠবে। চর্চ্চার অভাবেই দেশের লোক এখন দেশী ছবির রস ভালো করে' ভোগ করতে পারছেন না। চর্চ্চা বাড়্‌লে সে মুস্কিলও আর থাক্‌বে না।

ভারত-শিল্পের ভক্ত যে দিন-দিন বেড়ে উঠ্‌ছে, তাই দেখেই ভবিষ্যৎ ভেবে আমাদের মনে ভরসা হচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ নূতন করে' প্রথম যে-দিন ভারত-শিল্পের উদ্বোধন করেন, সে বড় বেশী দিনের কথা নয়। ভারত-শিল্পের ভক্ত তখন এদেশে আর কেউ বড় ছিলেন না বল্‌লেই হয়। এ-বিভাগে আর্টিষ্টও ছিলেন তখন একমাত্র অবনীন্দ্রনাথ।

কিন্তু এই সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতীয় চিত্রকরের সংখ্যা-বৃদ্ধি যেমন আশ্চর্য্য-রকম হয়েছে, ভারত-শিল্পের অনুরাগী রসিকের সংখ্যাও তেম্‌নি অগুন্‌তি হয়ে উঠেছে—এখনকার 'প্রাচ্য-চিত্র-কলা'-প্রদর্শনীতে পদার্পণ কর্‌লেই এ সত্য সকলকার প্রত্যক্ষ হবে। এই অল্পদিনের মধ্যেই ভারত-শিল্পের যে মানস-শিশু এত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তার পুনর্জন্ম যে অচিরে অবজ্ঞাত অকাল-মৃত্যুর জন্য হয়-নি, অদূর-ভবিষ্যতে সকলেই তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবেন;—এ-বিষয়ে আমাদের এতটুকু সংশয় নেই।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

রণসঙ্গীত

মিশ্র শঙ্করা—একতালা।

আয়রে ভাই আয়রে চলে, দলে দলে মিলব।

মায়ের ডাকে ভায়ে ভায়ে ঝগড়া বিবাদ ভুলব।

কোরাস—জয় জয় জয় আর কি শঙ্কা, বেজেছে ঐ অভয়-ডঙ্কা,

সমরে আজ অমর হয়ে বিজঃধ্বনি তুলব।

(২)

অন্ধ নয়ন গেছে খুলি, রণের মাঝে কোলাকুলি

মরণ আগে ভ্রাতৃবরণ, পুণ্য শপথ বলব,—

কোরাস—জয় জয় জয় আর কি শঙ্কা, বেজেছে ঐ অভয়-ডঙ্ক

সমবে আজ অমর হয়ে বিজয়ধ্বনি তুলব।

(৩)

বক্ষে লব প্রেমের টীকা, বুকে জ্বালব ক্ষেমের শিখা,

স্বদেশ বিদেশ ন্যায়ের দ্বারে এক ক'রে ভাই ফেলব।

কোরাস—জয় জয় জয় আর কি শঙ্কা, বেজেছে ঐ অভয়-ডঙ্কা,

সমরে আজ অমর হয়ে বিজয়ধ্বনি তুলব।

(৪)

স্মরণ করি নিত্য সত্যে, ঐক্য সখ্যে ধরব চিত্তে

মিথ্যারে আজ করব মিথ্যে, পাপে পায়ে দলব।

কোরাস—জয় জয় জয় আর কি শঙ্কা, বেজেছে ঐ অভয়-ডঙ্কা,

সমরে আজ অমর হয়ে বিজয়ধ্বনি তুলব।

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

+ ৩ ০

II র্সা -া না। -ধা পা -া। পা -া না। ধা না -া I
আ য়্ রে ০ ভা ই আ য়্ রে চ লে ০

১ ২

I পা পা -া। গা পা -া। গা -া -া। সা -া -া I
দ লে ০ দ লে ০ মি ০ ল্

+ ০ ১
I সা সা -া। গা গা -া। পা পা -া। সা সা -া I
মা য়ে র্ ডা কে ০ ভা য়ে ০ ভা য়ে ০

+ ৩ ০ ১
I র্সা -া না। ধা পা -া। পা -মগা -পা। পা -া -া II
ঝ গ্ ড়া বি বা দ্ ভু ০০ ল্ ব ০ ০

কোরাস্

+ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা। র্সা -া র্সা। র্সা -া র্সা I
জ য়, জ য়, জ য় আ র্ কি শং ০ কা

+ ৩ ০ ১
I পা পা -া। পা র্গা -া। র্রা রা র্সা। র্সা -া র্সা I
বে জে ০ ছে, ঐ ০ অ ভ য় ড ০ ঙ্কা

+ ৩ ০ ১
I পা পা -া। গা গা -া। সা গা -া। পা পা -া।
স ম ০ রে, আ জ০ অ ম র্ হ য়ে ০

+ ৩ ০ ১
I র্সা না ধা। পা -া পা। না -পা -া। র্রা -া -া II
বি জ য় ধ্ব ০ নি তু ০ ল্ ব ০ ০

+ ০ ১
II {গা -া গা। পা ধা -া। ধা র্সা -া। র্সা র্সা -া I
{অ ০ ন্ধ ন য় ন গে ছে ০ খু লি ০

I র্সা র্গা -া। র্রা র্মা -া। র্গা র্রা -া। র্সা র্সা -া} I
র ণের ০ মা ঝে ০ কো লা ০ কু লি ০}

I র্সা না -ধা। পা পা -া। পা -া না। ধা না -া I
ম র ণ আ গে ০ ভ্রা ০ তৃ ব র ণ

I {পা -া পা। গা পা -া। গা -া -া। র্সা -া -া]} I
{পু ০ ণ্য শ প থ ব ০ ল্ ব ০ ০ }

কোরাস্—"জয় জয় জয় আর কি শঙ্কা" ইত্যাদি।

+ ৩ ০ ১
II { গা -া হ্মা । পা পা -া । পা পা -হ্মা । পা পা -া I
{ র ০ ক্তে ল ব ০ প্রে মে র্ টী কা ০

+ ৩ ০ ১
I পা না -া । ধা র্সা -া । না ধা -া । পা পা -া I
বু কে ০ জ্বাল্ বো ০ ক্ষে মে র শি খা ০

+ ৩ ০ ১
I গা গা -া । গা গা -া । গা পা -া । বা বা -া I
স্ব দে শ্ বি দে শ্ স্যা যে র দ্বা বে ০

+ ৩ ০ ১
I গা -া গা । পা পা -া । পহ্মা -া ধা । পা -া -া } I
এ ক্, ক রে, ভা ই ফে ০ ল্ ব ০ ০ }

কোবাস্—"জয় জয় জয আব কি শঙ্কা" ইত্যাদি ।

+ ৩ ০ ১
I { গা গা -া । পা ধা -া । ধা -া র্সা । র্সা -া র্সা I
{ স্ম ব ণ্ ক বি ০ নি ০ ত্য স ০ ত্যে

+ ৩ ০ ১
I র্সা -া র্গা । র্বা -া র্মা । র্গা র্রা র্রা । র্সা -া র্সা } I
ঐ ০ ক্য স ০ খ্যে ধ র্ ব চি ০ ত্তে }

+ ৩ ০ ১
I র্সা -না ধা । পা পা -া । পা -া না । ধা -া না I
মি ০ থ্যা বে, আ জ ক র্ ব মি ০ থ্যে

+ ৩ ০ ১
I { পা -া পা । র্গা পা । । গা -া -া । র্সা । -া]} I
{ পা ০ পে পা য়ে ০ দ ০ ল্ ব ০ ০ }

কোরাস্—"জয় জয় জয় আর কি শঙ্কা" ইত্যাদি ।

যে গেল সঙ্গে করে কিছুই নিলনা

যে গেল সে সঙ্গে করে কিছুই নিলনা,
শুধু নিয়ে চলে গেল সঙ্গটুকু তার,
এতবড় এ পৃথিবী, এমন সংসার
কি দিয়ে ভরিয়ে রাখি, কিছু রহিল না !
দুদিনের সাধের খেলনা,
হায় পড়ে রয়েছে সকলি,
তাই শুধু তুলি মেলি, ধুলা ঝাড়ি, নষ্ট হবে বলি,
আর ফেলি নয়ন-আসার !
সাজায়ে রাখিয়াছিলে এ ঘর-দুয়ার
দেখি নাই ভাল করে ছিলে তুমি ঘরে,
আজ শূন্য মরুভূমি আমার এ ভবে,
সকলি তেমনি রাখা সাজায়ে আবার,
সকল কাজের বাড়া হয়েছে আমার !
অন্ধকার রজনীতে যেথায় গৌরবে
পাশে ঘুমাইতে মোর বিষাদে উৎসবে,
সেই মোর দেব-আয়তন
প্রদীপ জ্বালিয়া রাখি নিজ হাতে করিয়া যতন,
ধূপ জ্বালি সন্ধ্যায় নীরবে,
লাবণ্যের স্বপ্ন-ছবি আঁকা ছিল মনে,
শুভক্ষণে দেখা দিলে মুরতি ধরিয়া,
তারপরে পরাণের পাত্রটি ভরিয়া
অমৃত ঢালিয়া দিলে তৃষিত জীবনে ;
অসময়ে কেন গেলে চলে,
যা-কিছু পড়িতেছিলে, সব ফেলে দিয়ে ধূলিতলে,
গৃহদ্বার শ্মশান করিয়া,
কেমনে ফিরিব ঘরে, সন্ধ্যার তিমিরে
শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে, কে মোরে ভুলাবে
দিনের সকল জ্বালা, কে আসিবে বুলাবে
কোমল শীতল কর দগ্ধ এই শিরে ?

কে আমারে নিয়ে যাবে, তোমার সে তীরে ?
চারিদিকে ঘেরিবে আঁধার,
চক্রবাক হৃদয়ের ব্যর্থ হবে সব হাহাকার,
যতক্ষণে, রাত্রি নাহি যাবে !
এখনো সমুখে পড়ে পথ বহুদূর
অয়ি লক্ষ্মি অচঞ্চলা, কল্যাণে তোমার
বৈকুণ্ঠ যে হয়েছিল দীনের সংসার !
একা যাব তোমার সে শিঞ্জিত নূপুর
শুনিবনা পাশে, কণ্ঠ কোমল মধুর
বার বার কত কি কহিয়া,
ভুলাবেনা পথশ্রম, আজ শুধু শুনিতেছে হিয়া,
সমুদ্রের কল্লোল দুর্ব্বার !
সিন্দুর পরিতে ভালে আমারি কল্যাণে,
কাজলে আঁকিতে দুটি আঁখিরে আদরে
মৃণাল-কোমল শুভ্র দুইখানি করে
যতনে বহিতে রত্ন-ভূষণের ভার !
গৃহমাঝে সুমঙ্গল শিঞ্জনে তাহার
বিশ্ব মোর ভরেছিল গানে,
তব অঙ্গরাগ যেন, বর্ণরাগ যা-ছিল যেথানে
আলো আর মেঘে নীলাম্বরে !
ললাটে পরিয়া গেলে শোভন সিন্দুর
প্রকোষ্ঠে কঙ্কণ ; কণ্ঠে কুসুমের হার,
অলক্তে রঞ্জিত করি চরণ তোমার
বধূবেশে একদিন মোহন মধুর,
যে শোভায় করেছিলে গৃহ ভরপুর
আজ পুন গেলে সেইমত,
একদিনে গেল মোর জীবনের শুভ চিহ্ন যত,
হল যাত্রা, বন্ধুর আঁধার ।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।
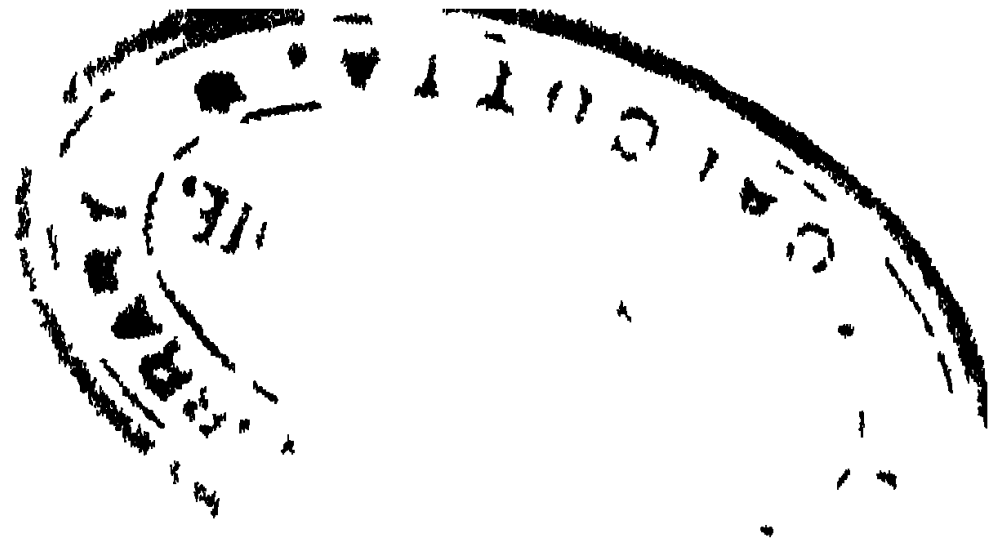
ভারতী

৪৩শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২৬ [৩য় সংখ্যা

আধুনিক ভারতের আর্থিক অবস্থা

ধনের বণ্টন

সর্ব্বোপরি, ধনের অসমান বণ্টন হইতেই ভারতীয় কৃষকের দৈন্য-দশার উৎপত্তি। দেশীয় রাজার রাজ্যে, সমস্ত জমির অধিকারী—রাজা. ও ওমরাওগণ। বাস্তব পক্ষে তত্রত্য কৃষকের অবস্থা দাস-কৃষকের অবস্থা। আমরা দেখিয়াছি, Lord Curzon ব্রিটিশ-ভারতের আয় ধরিয়াছেন—৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা; ভারতের কৃষিজাত এবং শ্রম-শিল্পজাত আয়,—কৃষিজাত আয়ের অর্দ্ধেক;—অর্থাৎ ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। সবসমেত ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

এ-স্থলে দেখা যাইতেছে, এই সমস্ত আয়ের ইনকমটেক্স—£৫০,৬৩০,০০০,—৪৮১, ৪৮২ ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত; তন্মধ্যে ৭১,০০০ লোকের নিকট হইতে শতকরা ৬৩ হারে ইনকমটেক্স আদায় হয়। Class XV (লক্ষ ও ততোধিক টাকার আয় হইতে) ১৮৯৯-১৯০০ অব্দে আদায় হয়:—১,৬৫৭,০৬৩ টাকা। Class XIV (পঞ্চাশ হাজার ও লক্ষ টাকার মধ্যে আদায় হয়:—৬০১,৬১৩ টাকা। Class XIII (৪০ হাজার হইতে ৫০ হাজারের মধ্যে) আদায় হয়—২৮৬,৮৮৮। Class XII (৩০ হাজার হইতে ৪০ হাজারের মধ্যে) আদায় হয়—৫১৮,৪৮৮৮। Class C (২০ হাজার হইতে ৩০ হাজারের মধ্যে)—৭৪২,৪৫১। Class X (দশ হাজার হইতে ২০ হাজারের মধ্যে)—১, ৭৪৯, ৫৬৮। Class IX (৫ হাজার হইতে ১০ হাজারের মধ্যে)—২, ২৭৪, ০৩২। Class VIII (আড়াই হাজার হইতে ৫ হাজারের মধ্যে)—২, ৫৩৪, ৫৯১ ইত্যাদি।

বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী কাহারা?—দেবালয় ও মঠসমূহ;

এবং জাইগীরদার,—বিশেষত বাঙ্গলায় জমিদারগণ। এই প্রদেশে ১১টা ভূসম্পত্তির আয়তন—৪, ৩৭৬৮৫২ acre; প্রত্যেক ভূসম্পত্তির আয়তন গড়-পড়তায় ৩৯৭, ৮৯৬ acre; এবং ভূমিকরের গড়পড়তা ২৭৬, ৫০২ টাকা। ৩৮ টা ভূসম্পত্তির আয়তন গড়পড়তায় ১৯৪, ৯৯৭ acre এবং ভূমিকর ১০৩, ৩৩৩ টাকা।

সরকারী কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে, শতকরা ৩০ টাকা হারে ইন্‌কম টেক্স আদায় হয়।

বণিক-কোম্পানী। কোম্পানীদের আয় হইতে আদায় হয়—১,৩২৯,৫৮৬।

বেঙ্ক ও বণিকদিগের আয় হইতে আদায় হয়—১১, ৩১৮, ৮৩০ টাকা। সাধারণ দোকানদারের নিকট হইতে ৯২৬,৮৫০ টাকা। শষ্যদানার বণিকদিগের নিকট হইতে ৬৭৭, ৬২০ টাকা, কুঠিওয়ালাদিগের নিকট হইতে আদায় হয় ৫১৩, ৭০০ টাকা ইত্যাদি

*
* *

যে-সকল জনসমাজ গড়িয়া উঠিতেছে,—সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠে নাই, তাহাদিগেরই ধন-ঐশ্বর্য্যের বণ্টনে এইরূপ সমধিক অসমতা লক্ষিত হয়। যখন এই সকল সমাজ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে তখন এই অসমতা আরও বর্দ্ধিত হয়।

কৃষিপ্রধান দেশসমূহে, আমরা ইহা দেখিতে পাই। জাপান—যেখানে সুদখোর বেনিয়ারা অধিকাংশ জমি খরিদ করিয়াছে; রুসিয়া, হঙ্গারী, গালিশিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশ, প্রভূত শস্যদানা ভিন্ন দেশে রপ্তানী করে, এবং সেইসঙ্গে কেবল ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ভিন্ন দেশ হইতে আমদানি করে এবং যাহার সংখ্যাঙ্ক জর্ম্মণীর নিম্ন সখ্যাংঙ্কেরই সমান।

এবং শ্রমশিল্প-প্রধান দেশ-সমূহেও আমরা এইরূপ অসমতা দেখিতে পাই। এই সম্বন্ধে ইংলণ্ডের দৃষ্টান্তটা খুবই নজরে পড়ে। ১৭৫০ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তথাপি সাহায্য-সাপেক্ষ দরিদ্রের সংখ্যা, অপরাধের সংখ্যা, আত্মহত্যার সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছিল। ইহার কারণ, সমাজের অনিশ্চিত অবস্থা। আগে যে জনসঙ্ঘ কৃষিজীবী ছিল তাহারা নগরবাসী ও শ্রমশিল্প-জীবী হইয়া উঠিল। প্রাচীন শ্রমশিল্পগুলা বিনষ্ট হইল এবং নূতন শ্রমশিল্পগুলা এক এক দমকে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপই তুলার শ্রমশিল্প: বস্ত্র-বয়ন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইল, কিন্তু সেইসঙ্গে সুতা-কাটার যন্ত্রের উন্নতি সাধন হইল না; সুতরাং একটা প্রধান উপকরণের অভাব উপস্থিত হইল; হাজার হাজার শ্রমজীবীকে জবাব দিতে হইল, আগে যাহারা কৃষক ছিল তাহারা তাড়াতাড়ি আবার চাষের কাজে প্রবৃত্ত হইল। আবার সুতাকাটার শিল্প, বয়ন-শিল্প অপেক্ষা যখন বৃদ্ধি পাইল, তখন মূল-উপকরণের পরিমাণ এত বেশী হইল যে, তাহা কাজে লাগাইতে পারা গেল না। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী হইতে,

অবাধ-বিনিময়, trade-union গুলির ক্রমবৃদ্ধিশীল প্রভুত্ব, শিক্ষা, আধুনিক জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে সাধারণের বুদ্ধির উন্মেষ, এই সমস্ত ক্রমশঃ শ্রমজীবীর অবস্থার উন্নতি সাধন করিল।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে:—প্রতি দশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৩১৩ জন দরিদ্র; ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে—২৫৫ জন (জর্ম্মণীতে ৩৪০)। বাৎসরিক মৃত্যু-সংখ্যা কমিয়া প্রতি হাজারে ১৯ জনে হইয়াছিল (ফ্রান্সে ২২ জন, প্রুসিয়া ২৫ জন, অষ্ট্রীয়ায় ৩০ জন, হঙ্গারীতে ৩২ জন)। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রতি লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ফৌজদারীঅপরাধের সংখ্যা ৬১৮; ১৮৮১ অব্দে—৪৬; ১৮৯২ অব্দে ৩৩। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডেই ফৌজদারী অপরাধের সংখ্যা কমিতেছে; অল্প দেশের মধ্যে ইংলণ্ড একটি দেশ, যেখানে দরিদ্রেরা উত্তমরূপে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। (বাৎসরিক সার্ব্বজনিক সাহায্য—নব্বই লক্ষ পৌণ্ডেরও ।)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোর ফুল্‌কি

[৩]

ডালকুত্তোটা মাঠের ওপারে চলে গেছে। কুঁক্‌ড়ো সবাইকে অভয় দিয়ে ঘরের মট্‌কা থেকে হাঁক দিলেন—"ত-ত-তফাৎ গিয়া।" অমনি সে-সোনালিয়া বাক্সের মধ্যে থেকে বেরিয়ে উঠোন-ময় নেচে বেড়াতে লাগলো—যেন আলোর চর্‌কি-বাজি। কুঁক্‌ড়ো তার সেই ঝক্‌ঝকে রূপ দেখে ভারি খুসি হয়ে মনে-মনে বল্লেন,—"আহা এমন পাখীকেও কেউ গুলি করে! এর দিকে বন্দুক করা, আর একটি মাণিকের পিছনে তাগ করা একই।" সোনালির কাছে আস্তে-আস্তে এসে কুঁক্‌ড়ো শুধোলেন—"সূর্য্যের আলোর মতো কোন্ পুব-আকাশের সোনার পুরী থেকে তুমি এলে সোনালিয়া বন-মুর্গি?"

সোনালি মাখমের মতো নরম সুরে বল্লে—"আমি ওই বনে আছি বটে কিন্তু ওটা তো আমার দেশ নয়!" কুঁক্‌ড়ো তাঁর সব-চেয়ে মিষ্টি সুরে শুধোলেন—"তবে কোথায় তোমার দেশ সোনালিয়া বিদেশিনী?" সোনালি উত্তর করলে, "তাতো মনে নেই।" শুনেছি বরফের পাহাড়ের ওপারে যে-দেশ, সেখানকার মাটি ফুলকাটা গালচেতে একেবারে ঢাকা, সেইখানের কোন্ অশোক-বনের রাণীর মেয়ে আমি। আমার একটু-একটু স্বপ্নের মতো মনে পড়ে—চমৎকার নীল আকাশের তলায় বড়-বড় গাছের ছাওয়ায় সখীদের সঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছি—অশোক বনের দুলালী। আমাদের ঘরের চারিদিকে কত রঙের ফুল ফুটেছে, ভোমরা সব উড়ে-উড়ে পদ্মের মধু খেয়ে যাচ্ছে। কেবল পাখী আর প্রজাপতি আর ফুল! একটাও শিকারী ডালকুত্তো নেই। মানুষেরা পর্য্যন্ত সেখানে আমাদের মতো চমৎকার সব রঙিন সাজে সেজে রাজা-রাণীর মতো বেড়িয়ে

বেড়াচ্ছে। নন্দন-কাননে আনন্দে ঘুরে বেড়াতেই আমি জন্মেছি,—ডালকুত্তোর তাড়া খেয়ে ছুটোছুটি করে মরতে তো নয়! আহা, সেখানকার সূর্য্যের লাল আভা রক্ত-চন্দন আর কুসুম-ফুলের রঙে মিশিয়ে বুকে মেখে রেখেছি, এই দেখ।" বলে সোনালিয়া কুঁকড়োর গা-ঘেঁসে দাঁড়ালো। কুঁকড়ো আনন্দে ডগমগ হয়ে ঘাড় দুলিয়ে ডানা কাঁপিয়ে তালে-তালে পা ফেলে সোনালিয়ার চারিদিকে খানিক নৃত্য করে আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে বল্লেন—"বনো সোনালিয়া! শোনো সোনালিয়া বিদেশিনী বনের টিয়া—" হঠাৎ সোনালি বলে উঠলো—"ইস্!"

কুঁকড়ো একটু থতমত খেয়ে গেলেন। বুঝলেন সোনালিয়া সহজে ভোলবার পাত্রী নয়! যে-কুঁকড়ো তাদের দিকে একটিবার ঘাড় হেলালে সাদি কালি গোলাপি-গুলজারি সব-মুরগীই আকাশের চাঁদ হাতে পায় মনে এম্নি করে সেই জগৎ-বিখ্যাত কুঁকড়োকে সোনালি মুখের সামনে শুনিয়ে দিলে যে, জগতের সবাই যাকে ভালোবাসে এমন কুঁকড়োয় তার দরকার নেই! সে বেছে বেছে সেই কুঁকড়োকে বিয়ে করবে যার নাম-যশ কিছুই থাকবে না; থাকবার মধ্যে থাকবে যার মনমোনালিয়া বনের টিয়া একমাত্র মুরগী!

কুঁকড়ো খানিক চুপ করে থেকে বল্লেন—"একবার গোলাবাড়ির চারদিক দেখে আসবেন চলুন।"—বলে তিনি সোনালিয়াকে খুব খাতির করে সব দেখাতে লাগলেন। প্রথমেই, যেটা থেকে, অজ্ঞান হয়ে পড়লে সোনালিয়ার মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে কুঁকড়ো তাকে বাঁচিয়ে-ছিলেন সেই টিনের গাম্লাটা আর যে কাঠের বাক্সটায় সোনালিয়াকে লুকিয়ে রেখে তস্থার চোখে ধুলো দিয়েছিলেন সেই দুটো জিনিষ দেখিয়ে বল্লেন—"এগুলো নতুন কিনা, কাজেই কুচ্ছিৎ; কিন্তু পুরোনো দেয়াল, ভাঙা বেড়া, ফাটা দরজা, পুরোনো ওই মুরগীর ঘরটি আর কতকালের ওই লাঙল, ধানের মরাই আর ওই শেওলায়-সবুজ খিড়কির দুয়োর আর পানা পুকুর আর ঐ কুঞ্জলতার থোকা-থোকা ফুল,– কি সুন্দর এগুলি!"

সোনালিয়া কোনো দিন তো ঘরকন্নার ব্যাপার দেখেনি, সে কেবলি কুঁকড়োকে শুধোতে লাগলো—"এসব নতুন জিনিষের মধ্যে থাকায় কোনো ভয় নেইতো?" কুঁকড়ো তাকে বল্লেন—"আমরা বেশ নির্ভয়ে আছি—মোরগ মুরগী হাঁস এবং মানুষ। কেননা এ-বাড়ীর কর্ত্তা—তিনি নিরামিষ খান, কাজেই আণ্ডা বাচ্ছা নিয়ে আমাদের সুখে থাকবার কোনো বাধা নেই। ওই দেখুন না, বেড়াল পাঁচিলের উপর ঘুমিয়ে আছে, আর ঠিক তার নীচে আমার সব-ছোট বাচ্ছাটা খেলে বেড়াচ্ছে—গাঁদা গাছটার তলায়।" ইতিমধ্যে চড়াইটা চট্ করে কখন চিনে-মুর্গিকে সোনালিয়ার খবরটা দিয়ে ফুড়ুৎ করে উঠোনে এসে বসলো। সোনালিয়া শুধোলেন—"ইনি?" চড়াই অম্নি উত্তর দিলে—"ইনি এইমাত্র চিনে-মুর্গীকে আপনার শুভ-আগমন জানিয়ে এলেন। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন বলে!" কুঁকড়ো পরিচয় দিলেন—"ইনি তাল-চটকমশায়, সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত!" সোনালিয়া শুধোলে—"কি কাজ!" চড়াই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলে—"বড় কঠিন কাজ, নিজে

ধন্দায় ফিরছেন ইনি, পাছে কেউ উপর-চাল চেলে টেক্কা দেয়।"

সোনালিয়া বল্লে—"হ্যাঁ কাজটা শক্ত বটে, কিন্তু অতি ছোট।"

কুঁকড়ো অন্য কথা পেড়ে সোনালিয়াকে চুণ-খসা দেয়ালের ধারে পুরোনো জাঁতাটা দেখিয়ে বল্লেন—"ঐ পাঁচিলটার উপরে দাঁড়িয়ে আমি যখন গান করি তখন সোনালি রংএর গিরগিটিগুলো দেওয়ালের গায়ে চুপ করে বোসে শোনে। মনে হয় যেন ঐ জাঁতার মোটা পাথর-দুখানাও দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে-বসে আমার গান শুনছে। এইখানটিতে আমি গান গাই, এইখানের মাটি আমি পরিষ্কার করে আঁচড়ে রেখেছি। আর এই যে পুরোনো লাল-মাটির গামলা, গানের পূর্ব্বে ও পরে প্রতিদিন এরি থেকে এক-চুমুক জল না খেলে আমার তেষ্টাও ভাঙে না, গলাও খোলে না।" সোনালিয়া একটু হেসে বল্লে—"তোমার গলা খোলা না-খোলায় বুঝি খুব আসে যায় তোমার বিশ্বাস!"

"অনেকটা আসে-যায় সোনালী!"—গম্ভীর ভাবে কুঁকড়ো বল্লেন।

"কি আসে যায় শুনি?"—সোনালিয়া নাক তুলে বল্লে।

কুঁকড়ো বল্লেন—"ওই গোপন কথাটা কাউকে বলবার সাধ্য আমার নেই।"

"আমাকেও না?" কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে এসে অভিমানের সুরে সোনালিয়া বল্লে—"আমি যদি বলতে বলি, তবুও না!"

কুঁকড়ো কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে সোনালীকে একবোঝা কাঠ দেখিয়ে বল্লেন—"আমাদের 'প্রয়বন্ধু—রান্নাঘরে শ্মশানে চ—ইনি চালা কাঠ।" এ যে আমার বন থেকে চুরি করা দেখছি!"—বোলে সোনালিয়া আবার শুধোলে —"তবে তোমারও একটা গুপ্তমন্তর আছে?"

"হ্যাঁ বন-মুরগী!" এই কথাটা কুঁকড়ো এম্‌নি সুরে বল্লেন যে সোনালিয়া বুঝলে গোপন কথাটা জানবার চেষ্টা এখন বৃথা।

কুঁকড়ো সোনালিকে নিয়ে গোলাবাড়ীর বাইরের পাঁচিলে উঠলেন। সেখান থেকে তিনি দেখালেন—দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে জলের মতো সাদা একটা সরু সাপ কতদিন ধরে যে নামছে তার ঠিক নেই।

সব দেখে-শুনে সোনালিয়া কুঁকড়োকে বল্লে—"এইটুকু জায়গা, তাও আবার নেহাৎ কাজ-চলা-গোছের জিনিষ-পত্তরে ভরা, এখানে একঘেয়ে দিনগুলো কেমন করে তোমরা কাটাও বুঝিনা। আকাশ দিয়ে যখন পাখীরা উড়ে চলে তখন তোমার মন নতুন-দেশ বড়-পৃথিবীটা দেখবার জন্যে একটুও আনচান করেনা?"

কুঁকড়ো বল্লেন—"একটুও নয়। পৃথিবীতে একঘেয়ে দিনও নেই, পুরোনোও কিছু হয়না। আমি এইটুকু জায়গাকেই প্রতিদিন নতুন-নতুন ভাবে দেখতে পাই। কিসের গুণে তা জানো? আলোর গুণে!"

সোনালি অবাক হয়ে বল্লে—"আলোর গুণে! সে আবার কি রকম?"

"দেখ'সে!" বলে কুঁকড়ো একটি স্থল-পদ্মের গাছ দেখিয়ে বল্লেন—"দিনের আলোর সঙ্গে এই ফুলের রং ফিকে থেকে, গাঢ় লাল হবে দেখবে। এই খড়ের কুটিগুলো আর এই লাঙলের ফলাটা আলো পেয়ে দেখ কত

রকমই রং ধরছে। ঐ কোণে মইখানার দিকে চেয়ে দেখ ঠিক মনে হচ্ছে নাকি এটা যেন দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে আর ধানক্ষেতের স্বপ্ন দেখছে? আর মানুষ যেমন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, ঠিক তেম্নি করে ঐ পিঁপড়েগুলো দেখ এই চিনে-মাটির জালাটার চারিদিক প্রদক্ষিণ কোরে আসছে আট পল এক বিপলের মধ্যে। পলকে-পলকে এখানকার সব জিনিষই নতুন-নতুন ভাব নিয়ে দেখা দিচ্ছে—নতুন আলোতে। আর আমিও কুঁকড়ো ঐ মইখানার মতো আপনার কোণটিতে দাঁড়িয়ে রোজ-রোজ কত আশ্চর্য্য ব্যাপারই দেখছি! দেখে-দেখে চোখ আর তৃপ্তি মানছে না;—চোখের দৃষ্টি আমার নতুনের পর নতুন, ছোট এই গোটাকতক জিনিষের অফুরন্ত শোভা, এই ক-টা সামান্য জিনিষের অসামান্য রূপ দেখতে-দেখতে দিন-দিন খুলেই যাচ্ছে, বেড়েই চলেছে,—ডাগর হয়ে উঠছে মহা বিস্ময়ে! ঐ কুমড়লতার কুঁড়িটি ফুটতে দেখে যে আনন্দ পাই, মুরগীর ডিমগুলি যখন ফোটে, বাচ্ছাগুলির চোখ যখন ফোটে তখনো আমি তেম্নি আনন্দ পেয়ে গেয়ে উঠি! এইটুকু জায়গা, এখানে কি যে সুন্দর নয় তাতো আমি জানিনে!”

কুঁকড়োর কথা শুনতে শুনতে সোনালিয়া ক্রমেই অবাক হচ্ছিল। ছোটখাট সব সামান্য জিনিষের উপরে আলো ধরে এমন চমৎকার করে তো কেউ তাকে দেখায়নি! আপনার ছোট কোণটিতে চুপচাপ বসে থেকে ও যে সবই খুব বড় করে দেখা যায় আজ সোনালি সেটি বুঝে অবাক হল।

কুঁকড়ো বল্লেন—“সব জিনিষকে যদি তেমন করে দেখতে পার তবে সুখ-দুঃখের বোঝা সহজ হবে, অজানা আর কিছু থাকবেনা। ছোট একটি পোকার জন্ম-মরণের মধ্যে পৃথিবীর জীবন আর মৃত্যু ধরা রয়েছে দেখো, একটুখানি নীল আকাশ—ওরি মধ্যে কত কত পৃথিবী জ্বলছে নিভছে!”

মুরগী-গিন্নি অম্নি পেঁট্‌রার মধ্যে থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বল্লে—“কুয়োর তলে পানি, আকাশকেই জানি।” পেঁটরার ডালা আবার বন্ধ হবার আগেই কুঁকড়ো সোনালিকে মায়ের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। মুরগী-গিন্নি চোখ-মটকে চুপিচুপি বল্লেন—“বড় জবরদস্ত কুঁকড়ো, না?”

সোনালি মিহি সুরে বল্লে—“হুঁ,—উনি খুব বিদ্বান বুদ্ধিমান।”

এদিকে কুঁকড়ো গিন্নাকে বলছিলেন—“সোনালিয়ার সঙ্গে দুদণ্ড কথা করে আরাম পাওয়া যায়,—সব-বিষয়ে সে কেমন একটু উৎসাহ নিয়ে জানতে চেষ্টা করে দেখেছো!”

এমন সময় কিচ্‌মিচ্ চেঁচামেচি করতে-করতে মাঠ থেকে দলে-দলে হাঁস মুরগী ধাড়ি বাচ্ছা সবাইকে নিয়ে চিনে-মুরগী উপস্থিত। এসেই সবাই সোনালিয়াকে ঘিরে আহা কি সুন্দর—“ক্যাবাৎ! বাহবা! বেহেতর! এম্নি সব নানা কথা বলতে লাগলো। কুঁকড়ো একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে এই ব্যাপার দেখছিলেন। কি সুন্দর দেখাচ্ছে সোনালিয়াকে! তার চলন বলন সবই যেন কেমন-একটু ভদ্দর রকমের! গোলাবাড়ির কোনো মুরগীই এমন নয়। চিনে-মুরগীরও সোনালি-বৌ করবার সাধ একটু

যে না হয়েছিল তা নয়; সে তাড়াতাড়ি নিজের ছেলের সঙ্গে সোনালিয়ার ভাব করে দিতে দৌড়োলো।

কুঁকুড়ো এইবার তাঁর সব মুরগীদের ঘরে যেতে হুকুম দিলেন। সোনালিয়া আরো-খানিক তাদের সঙ্গে গল্প করবার ইচ্ছে করায় কুঁকড়ো বল্লেন—"ওদের সব সকাল-সকাল ঘুমোনো অভ্যেস।" মুরগীরা একটু বিরক্ত হয়ে সব শুতে চল্লো—মই বেয়ে নিজের নিজের খোপে। সোনালিয়া শুধোলে—"কোথায় যাচ্ছ ভাই?"

এক মুরগী বল্লে—"বাড়ী চলেছি: এই যে আমাদের ঘরে যাবার সিঁড়ি।"

মই বেয়ে মুরগীদের উঠতে দেখে সোনালিয়া অবাক হয়ে গেল। বনের মধ্যে তো এ-সব কিছুই নেই!

চিনে-মুরগী সোনালিয়ার সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টায় আছেন, সোনালিয়া তাকে বল্লে যে, এখনি তাকে আবার বনে ফিরে যেতে হবে, গোলাবাড়ীতে সে কেবল দুদণ্ডের জন্যে এসেছে বই তো নয়! ঠিক সেই সময় দূরে গুম্ করে আবার বন্দুকের আওয়াজ হল। এখনো শিকারীগুলো বন ছেড়ে যায়নি, কাজেই সোনালিকে কিছুতেই বনে একলা পাঠাতে কুঁকড়োর একটু ইচ্ছে নেই। গোলা-বাড়ীর সবাই তাকে আজকের রাতটা কোনোরকমে সেখানে কাটাতে অনুরোধ করতে লাগলো। জিম্মা নিজের বাক্সটা রাতের মতো সোনালিকে ছেড়ে দিয়ে বাইরে শুতে রাজি হল। বন্ধ ঘরের মধ্যে সোনালি কোনো দিন শোয়-নি; কিন্তু কি করে? প্রাণের দায়ে তাতেই সে রাজি হল। চিনে-মুরগীর আহ্লাদ আর ধরে না, সে সোনালিকে তার সকালের মজলিসে যাবার জন্যে আবার ধর-পাকড় করতে লাগলো। এমন সময় অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে কুঁকড়ো ডাক দিলেন—'চুপ রহো! চুপ রহো!' তারপর মইটা বেয়ে মট্‌কায় উঠে তিনি চারিদিকটা একবার বেশ করে দেখে নিলেন—হাঁস মোরগ মুরগী কাচ্ছা-বাচ্ছা সবাই আপনার-আপনার খোপে যে-যার মায়ের কোলে ডানার নীচে সেঁধিয়েছে কিনা? চিনে-মুর্গী সোনালির কানে-কানে বল্লে—"মনে থাকবে তো ভাই, ফুল-তলায় ভোর পাঁচটা থেকে ছটার সময়। ময়ূর নিশ্চয় আসবেন, কাছিম বুড়োও আসবেন বোধ হয়, আর সুরকি দিদি বলেছে কুঁকড়োকেও নিয়ে যাবে। কুঁকড়ো একবার সুরকীর দিকে চেয়ে দেখলেন, সুরকী খোপ থেকে আস্তে-আস্তে মুখটি বার করে গিন্নিপনা করে বল্লে—"তুমিও যাবে তো? চিনি দিদির ভারি ইচ্ছে। আমারও ইচ্ছে তুমি পাঁচজনের সঙ্গে একটু মেশো, ছেলে-মেয়ের তো বিয়ে দিতে হবে!"

কুঁকড়ো সাফ জবাব দিলেন—"না।"

সোনালি মইখানার নীচে থেকে কুঁকড়োর দিকে মুখ তুলে খুব মিষ্টি করে বল্লে—"যেতেই হবে তোমায়!"

কুঁকড়ো মুখ নীচু করে বল্লেন—"কেন বলতো?"

সোনালিয়া বল্লে—"সুরকি-দিদির আবদারে তুমি অমন 'না'-করলে যে?"

কুঁকড়ো একটু গল্‌লেন।—"আমি তা—" তারপর খুব শক্ত হয়ে বল্লেন—"না, কিছুতেই

যাবোনা। রাত হ'ল।" বলে কুঁক্‌ড়ো অন্য দিকে চাইলেন। সোনালি একটু বিরক্ত হয়ে কুকুরের বাক্সতে গিয়ে সেঁধোলেন।

রাত্রির নীল অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে এসেছে। একে-একে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। জিম্মা ঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে শুয়েছে। চিনি-দিদি ঘুমের ঘোরে এক-একবার বকতে লেগেছে—"৫টা থেকে ৬টা।"—তাল চড়াইটা তার খাঁচায় এককোণে গুটিসুটি হয়ে ঘুম দিচ্ছে। কুঁক্‌ড়ো তখনো মট্‌কার উপরে খাড়া দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন আর চারিদিক চেয়ে দেখছেন! একটা দুষ্টু বাচ্ছা রাতের বেলায় চুপিচুপি উঠোনে বার হয়েছে দেখে কুঁক্‌ড়ো তাকে এক ধমক দিয়ে তাড়িয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর আস্তে-আস্তে সোনালির বাক্সটার কাছে গিয়ে কুঁক্‌ড়ো বল্লেন—"সোন্!" ঘুম-ঘুম-সুরে সোনালিয়া উত্তর দিল্লে—"কি?" কুঁক্‌ড়ো একবার বল্লেন—"না।" তারপর আবার নিঃশ্বেস ছেড়ে বল্লেন—"নাঃ, কিছু নয়।" বলে কুঁকড়ো মই বেয়ে উপরে চলে গেলেন। উপরে গিয়ে কুঁক্‌ড়ো একবার ডাক দিলেন —"রাত—ভারি রাত।" তারপর কুঁক্‌ড়ো সে-রাতের মতো চোখ বুজ্‌লেন খোপে ঢুকে।

চারিদিক নিশুতি হ'ল আর অম্‌নি কালো বেড়ালের সবুজ চোখদুটো অন্ধকারে ঝক্‌ঝক করে উঠলো। অম্‌নি ভোঁদড় বল্লে —"আমিও তবে চোখ খুলি।" ভাম বল্লে —"আমিও!" দুজোড়া চোখ ছাদের আল্‌সেতে জল-জল করে ঘুরতে লাগলো। ছুঁচো ইঁদুর আর বাদুড় তিনজনেই বল্লে— "আমরাও তবে চোখ খুল্লেম।" কিন্তু এদের চোখ এত ছোট যে খুল্লো কিনা বোঝা গেল না,—কেবল তাদের চিক্ চিক্ আওয়াজ শোনা গেল! একটু পরেই অন্ধকার থেকে তিনটে পেঁচা আগুনের মতো তিন জোড়া চোখ খুলে ফুট্ করে দেখা দিলে। তখন সবুজ-হলদে-লাল—সব চোখ এ-ওর দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকলো আর বলাবলি করতে লাগলো—"আছতো? এসেছো? আছতো—এঁ্যা এঁ্যা এঁ্যা!" বেড়াল পেঁচাকে শুধোলো—"আছতো! পেঁচা ভোঁদড়কে ভোঁদড় বাদুড়কে,—এমনি সবাই সবাইকে শুধোলে—"আছোতো?" ঠিক আছতো? ঠিক আজকে তো? আস্‌ছতো ঠিক?" বেড়াল শুধোলে—"আজই নাকি?" পেঁচা-তিনটে জবাব দিলে—"হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ!" চড়াই খাঁচার মধ্যে জেগে উঠে শুনলে, এক পেঁচা আর এক পেঁচাকে শুধোচ্ছে—"ঘোঁট কিসের?" অন্য পেঁচা বলছে—"কুঁক্‌ড়োর সর্ব্বনাশের ঘোঁটের ঘোঁট্।" ভোঁদড় অমনি শুধোলে— "কো-ও-থায়?" পেঁচারা উত্তর দিলে "পাকুড় তলে, পাকুড় তলে, পাকুড়-পাকুড়-পাকুড় তলে।" ভাম শুধোলে—"ক-খ-ন?" উত্তর হল—"আট্‌টায় ঘুঁট্! আট্‌টায় ঘুঁট্, আট্‌টায় ঘুঁট্! ঘুট্ ঘুটে রাতে! ঘুট ঘুটে রাতে!"

রাতের আঁধারে বাদুড়গুলো যাদুকরের হাতে তাসের মতো একবার দেখা দিচ্ছে আবার কোথায় উড়ে যাচ্ছিল। বেড়াল পেঁচাকে শুধোলে—"বাদুড় তো আমাদের দলে বটে?" পেঁচা বল্লে—"হাঁ নিশ্চয়।"—"ছুঁচো ইঁদুর?"—"হাঁ তারাও।"

বেড়াল বাড়ীর দরজা আঁচড়ে বল্লে

"পিউ পিউ পিউ! দিও পিউ আট্‌টায় ঘড়ি দিও দিও দিও!" পেঁচা শুধোলে—"ঘড়িটাও এনেলে নাকি?" বেড়াল উত্তর করলে—"নি-শ-চ য়! নিশাচর সবাই এ-দলে; তা ছাড়া দিনের বেলারও দুচার জন আছেন!" পেরু আর দুচার জন উঠোনের এককোণে লুকিয়ে ছিল, আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এল। পেরু শোধালে—"ডোবা-চোখ, ঢাকা-মুখ! সব ঠিক তো?" উত্তর হল অন্ধকার থেকে—"হাঃ হাঃ হাঃ। সব ঠিক, ঘুঁটটা ঠিক্‌, এ পাড়া ঠিক, ও পাড়া ঠিক।" তাল-চড়াই মনে মনে বল্লে – 'সেও যাচ্ছে ঠিক!"

কুকুর এমন সময় গা-ঝাড়া দিয়ে বলে উঠলো -"কেও!" অম্‌নি সব নিশাচরগুলো চম্‌কে উঠে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো। বেড়াল তাদের সাহস দিয়ে বল্লে—"ও কিছু নয়, বুড়ীটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বক্‌ছে।" কিন্তু এবার কুঁক্‌ড়ো যেমন একটু গাঝাড়া দিয়ে সাড়া দিয়েছেন—"কি-ই-ও?" অম্‌নি সব নিশাচর—পেঁচা, বেড়াল, এমন-কি পেরু পর্য্যন্ত "ওইগো" বলেই পালাইপালাই করতে লাগলো। পেরু—তিনি পালানোই স্থির করলেন, তাঁর গলার থলি থেকে পা পর্য্যন্ত ভয়ে কাঁপছিল; বেড়ালের যেন জ্বর এসে পড়লো, পেঁচাগুলো চোখ বুজলেই অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে জানে, তারা অম্‌নি থপ্‌ করে চোখের পাতা বন্ধ করে ফেল্লে। একসঙ্গে সব জ্বলন্ত চোখ নিভে গেল। রাত্রি যে অন্ধকার সেই অন্ধকার! কুঁক্‌ড়ো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চড়াইকে শুধোলেন—"কারা যেন ফুস্‌-ফাস্‌ করছিল না?"

চড়াই বল্লে—"শুনছিলেম বটে একটা ঘোঁট চলেছে!" ঘুট ঘুটে অন্ধকারে সব ঘুঁটে গুলো এমন কাঁপতে লাগলো যে রাত্রিটা দুল্‌ছে বোধ হল।

কুঁক্‌ড়ো বল্লেন—"বটে, ঘোঁট চলেছে?"

চড়াই বল্লে—"হাঁ তোমার সর্ব্বনাশের, সাবধান!" "বয়ে গেল!" বলে কুঁক্‌ড়ো আবার গিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

চড়াই আবার ভালোমানুষটির মতো গাঝাড়া দিয়ে বস্‌লো। সে ঠিক-ঠিক কথাই বলেছে কিন্তু কেমন দুদিক বাঁচিয়ে বলেছে! যুধিষ্ঠিরের অশ্বত্থামাহত-ইতি-গজ গোছের! কথাটা চড়াইয়ের মুখে শুনে কিন্তু পেঁচাদের সন্দেহ বাড়লো।—"চড়াই সত্যিই তাদের দলে কিনা?"—শুধোতে অন্ধকারের মধ্যে একটার পর একটা চোখ চড়াইয়ের দিকে চাইতে লাগলো। চড়াই বল্লে—"আমি বাপু কোনো দলে নেই; তবে ঘোঁটটা কেমন চলে দেখতে ইচ্ছে আছে!" পেঁচাতে চড়াই খায়না, কাজেই ঘোঁটে গেলে কোনো বিপদ তার নেই বোলে পেঁচারা চড়াইকে মন্ত্রণা-সভায় যাবার স্থানটি বাৎলে দিয়ে বল্লে—"চোরের মন পুঁই-আদাড়ে—এই শোলোক বল্লেই সে দরজা খোলা পাবে।"

এদিকে ঘরের মধ্যে থেকে সোনালিয়ার হাঁপ ধরছিল; সে একটু ভালো হাওয়া পেতে ঘর থেকে মুখ বার করেই সব নিশাচরকে দেখে 'একি!' বোলে চম্‌কে উঠলো। অম্‌নি সব চোখ একসঙ্গে ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ আর সাড়া-শব্দ নেই। তখন অন্ধকারে একটির পর একটি চোখ খুল্লো আর বলাবলি সুরু হল। সোনালিয়া চুপ করে শুনছে কে-একজন উঠোনের

ওকোণ থেকে বল্লে—"বেঁচে থাক পেঁচা-পোঁচরা!" পেঁচারা শুধোলে—"আমরাতো ওর নামটি পর্য্যন্ত সইতে পারিনে তা জানো, কিন্তু তোমরা তার উপর চটা কেন বলতো?"

দিনের বেলায় যারা দুষ্টবুদ্ধি লুকিয়ে বেড়ায়, রাত্রে তাদের পেটের কথাটা আপনিই যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে। বেড়াল খুব চাপা জন্তু কিন্তু আগেই তার কথা বেরিয়ে পড়লো—"ঐ কুকুরটার সঙ্গে অত তার ভাব বোলেই কুঁক্‌ড়োটাকে দুচক্ষে আমি দেখতে পারিনে!" পেরু বল্লেন—"যাকে সেদিন জন্মাতে দেখলেম, সে আজ কর্ত্তা হয়ে উঠলো,—এটা আমি কিছুতেই সইবোনা! এই জন্তে আমার রাগ ওটার উপর।" রাজহাঁস বল্লে—"ওর পাদুখানা বড় একেবারে হাঁসের মতো নয়! দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে, গোড়ালির ছাপতো নয়, চলবার বেলায় মাটির উপরে বাবু যেন তারা-ফুল কেটে চলে যান—কি দেমাক!" কেউ বল্লে—"কুঁক্‌ড়োর চেহারাটা ভালো বোলেই সে তাকে পছন্দ করেনা। কেন সে নিজে কুচ্ছিৎ হল কুঁক্‌ড়োটা হলনা!"

আর কেউ কেউ বল্লে—"সবক'টা গির্জ্জের চুড়োতে তার সোনার মূর্ত্তি দেখলে কার না গা জ্বালা করে? নিশ্চয়ই ও-পাখীটা কিষ্টান! ওকে জাতে ঠেলাই ঠিক। মোচনমানের সঙ্গে এক-ঘটিতে জল খেতে আমি ওকে স্বচক্ষে দেখেছি। ওর কি বাচবিচার আছে? ওর ছায়া মাড়াতে ভয় হয়।"

ঠিক সেই সময় ঘড়ি পড়লো আর ঘড়ির মধ্যে কলের পাখী বলে উঠলো—পি-পি-পি-পি-রা-আ-আ-লি।

মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ অমনি উঁকি দিলেন। উঠানের এক-কোণে খানিক আলো পড়লো। ছুঁচো আস্তে-আস্তে মুখ বার করে পেঁচাকে বল্লে—"আমার সে পাজিটার সঙ্গে কোনো দিন চোখোচোখিই নেই।"

ঘড়ি-কলের পাখীটাকে আর শুধোতে হল না; সে আপনিই বল্লে—"একটুতে আমার দম ফুরিয়ে যায় রোজ দম না দিলে মুস্কিল, আর কুঁকড়োর দমের শেষ নেই।" বলেই গলা ঘড়-ঘড় করে ঘড়ি-পাখী চুপ কল্লে। টং টং করে আটটা বাজল। পেঁচারা সব ডানা-মেলে বল্লে—"আর আমরা কুঁকড়োকে একটুও ভালবাসিনে, কেন না—কেন না ও কিনা—সে কিনা—" বলতে-বলতে অন্ধকারের মধ্যে পেঁচারা উড়ে পড়লো নীল রাত্রির মধ্যে। একলা সোনালিয়া উঠোনে দাঁড়িয়ে বল্লে—"আর কুঁক্‌ড়োকে আমি এখন খুব ভালোবাসি, কেননা—কেননা—সবাই তাঁর শত্রু!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্যাকরণ-বিভ্রাট

নাটিকা

দশম দৃশ্য

ঘনশ্যাম। (স্বগত) ওই যাঃ,—বাড়ীতে ভদ্রলোক অতিথি! এদিকে খাওয়া-দাওয়ার কি হচ্ছে না হচ্ছে, এখনও পর্য্যন্ত সে খোঁজ ত নেওয়া হলো না। সাহিত্যিক মানুষ, তাতে আবার প্রত্নসঙ্ঘের সভাপতি, ভাল-মন্দ একটু কিছু পাতে দিতে হবে তো! ওরে রামা, কোথায় গেলিরে!

রামা। (পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবেশ করিতে করিতে) এজ্ঞে, কি বলছেন কর্ত্তা!

ঘন। রান্না-বান্নার কি জোগাড় হলো, জানিস?

রামা। জোগাড় তো সবই হয়ে রয়েছে, কর্ত্তা। আপনি ত নিজেই বাজার করে এনেছেন। কপি আছে, পালং শাক আছে, বিট্ আছে—

ঘন। বেটা গাধা কোথাকার, সে কথা তোকে জিজ্ঞেস করছে কে?

রামা। এজ্ঞে, সে তো ভালই কর্ত্তা, আপনি নিজে নিজেই বাজার করছেন—আমাদের তো আর বিশ্বাস হয় না!

সিদ্ধান্ত। (সোল্লাসে প্রবেশ করিলেন—এক হাতে মরিচা-পড়া ভাঙ্গা খুন্তি ও তাওয়ার টুকরা এবং অপর হাতে মাটী-মাখা ভাঙ্গা শিল) দেখেছেন রামসুন্দর বাবু, এসেছি কি, কেল্লা ফতে! যেমন আসা, তেমনি খোঁড়া, অমনি পাওয়া—

ঘন। এ আবার কি আবিষ্কার করলেন?

সিদ্ধান্ত। (ভাঙ্গা তাওয়ার টুকরা দেখাইয়া) এটা চিনতে পারলেন্ না—এ যে বৌদ্ধযুগের অর্দ্ধবৃত্ত উরস্ত্রাণ—

ঘন। বটেই তো—কি আশ্চর্য্য! দেখে কিছু বোঝা যায় না!

সিদ্ধান্ত। তা আপনার তো এ-সব বেশী জানা নাই—আর এ-সব উরস্ত্রাণও এক রকমের নয়—চতুষ্কোণ, গোলাকার, নানা আকারেরই দেখা যায়—

রামা। (ঘনশ্যামের কাণে কাণে) এ যে আমাদের সেই বড় পুরানো চাটুখানা—ভেঙ্গে গেছল বলে দিদি ঠাকরুণ ফেলে দিতে বলেছিল।

ঘন। (মৃদুস্বরে) ঠিক বলেছিস্, আমারো তাই মনে হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত। (ভাঙ্গা খুন্তিখানা দেখাইয়া) দেখুন, এ জিনিসটি সে কালের শূলিকাস্ত্র, গুপ্ত রাজ্যের গৌল্মিকগণ এ আয়ুধ কটিদেশে ধারণ করতো; এ অস্ত্র এ যুগে সহসা পাওয়া যাবে না।

রামা। (নিম্নস্বরে ঘনশ্যামের প্রতি) এটা সেই আর-বছরের ভাঙ্গা খুন্তিখানা—মনে নেই, সেই সেবার মেলা দেখ্‌তে গিয়ে পিসিমা কিনে এনেছিল?

সিদ্ধান্ত। আর এ যে দেখছেন, এটি আবি

'আর্য্য পট্ট' বা 'আয়াগ পট্টের' ভগ্নাবশেষ বলেই স্থির করছি। এমনি একখানা বেরিলী জেলায় পাওয়া যায়, তার একটা কোণের সঙ্গে এর বেশ সাদৃশ্য আছে! ধারে সরল রেখার চিহ্ন, এখনও লক্ষ্য করলে দেখা যায়—তবে মৎস্য-পুচ্ছ ত্রিরত্নটি কাল-বশে একবারেই অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

রামা। এ যে কর্ত্তা-মার আমলের পুরাণো 'শিল'। সেই কুটিয়ে নিতে গিয়ে দুটুকরো হয়ে যায়, এক টুকরো সহিসটা কি করবে বলে আস্তাবলে নিয়ে গিয়েছিল, আর মাথার দিকের টুক্‌রোটা ঝী মাগী বুঝি বাগানে ফেলে দিয়ে থাক্‌বে!

ঘনশ্যাম (জনান্তিকে) সিদ্ধান্তরত্ন মশায় যে-রকম বাহাদুর, দেখ্‌ছি, কোন্‌দিন না দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি কুড়িয়ে এনে বৌদ্ধ যুগের নিদর্শন বলে চালিয়ে দেন!

(সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে তাঁহার সযত্ন-সংগৃহীত দ্রব্যগুলি দেওয়ালের পার্শ্বস্থিত টেবিলে সাজাইয়া রাখিয়া ফিরিয়া আসিলেন)

সিদ্ধান্ত। বন্ধুবর, আজ একটা প্রকাণ্ড আবিষ্কার করা গিয়েছে। আপনার বাগানের কোণে একটা প্রাচীন স্তূপের নিশানা পেয়েছি।

রামা। (স্বগত) সেরেছে রে—খুঁজতে খুঁজতে বাগানের সেই কোণটায় গিয়ে হাজির হয়েছে।

সিদ্ধান্ত। আজ কি স্ফূর্ত্তি—এ যেন সুখ-সাগরে সন্তরণ! এখন 'খনিত্র' খানা একবার পেলেই হয়।

ঘন। রামা, খন্তাটা কোথায় রে?

রামা। নিয়ে আসছি।

(রামা খন্তা আনিয়া দিল)

সিদ্ধান্ত। (রামার প্রতি) ওরে যা তো—এখনি গিয়ে দু'পয়সার চা-খড়ি কিনে আন্। দেখ্, বেশ গুঁড়ো করে চালুনীতে চেলে একখানা মাটির সরায় করে নিয়ে আস্‌বি।

ঘন। এ-সব নিয়ে আবার কর্‌বেন কি?

সিদ্ধান্ত। এই বহু পুরাতন লোহার জিনিসগুলি আজ বেশ করে সাফ্ কর্ত্তে হবে। ভরসা হচ্ছে, খুঁজে-পেতে দেখ্‌তে পার্‌লে দু' একখানা তাম্রশাসনও হয়তো বেরিয়ে পড়্‌বে।

(রামার প্রতি) যা, শীগ্‌গির যা।

রামা। এজ্ঞে চল্‌লুম। (স্বগত) তাহ তো এ বুড়ো কি পুরাণো লোহার ব্যবসা করে না কি?

সিদ্ধান্ত। বল্‌তে ভুলে যাচ্ছিলাম—ভাল কথা মনে পড়েছে। ওখানে একটা আম গাছ থাকাতে আমার বড় অসুবিধা হচ্ছে।

ঘন। কোন্ জায়গাটার কথা বল্‌ছেন্?

সিদ্ধান্ত। ওই আপনার বাগানের পিছন দিকে,—ঐ বাঁ কোণ ঘেঁষে। আপনার অনুমতি পেলে ও গাছটা কেটে দিই।

ঘন। তাইতো তাহলে কি করা যায়! কেবল ওই গাছটিই রয়েছে—আমগুলো ছোট হয় বটে, কিন্তু ভারি মিষ্টি।

সিদ্ধান্ত। কি করি, উপায় নেই। প্রত্ন-তত্ত্বের খাতিরে আপনাকে এ ক্ষতিটা স্বীকার কর্ত্তেই হবে।

রামা। তা যদি বল্লেন, তাহ'লে আর কথা নেই। জ্ঞানোন্নতির জন্য যেটা আবশ্যক, তাতে কি আর আপত্তি করা চলে। (স্বগত) নিজে যে-রকম সরস্বতীর বরপুত্তর,

তাতে বিদ্যে-সাধ্যির উন্নতির জন্ত ক্ষতি স্বীকার কর্ত্তে ইচ্ছে হয় বটে।

সিদ্ধান্ত। ধন্তবাদ! শত-সহস্র ধন্তবাদ! জয়, প্রত্ন-বিদ্যার জয়!—যাই আর সময় নষ্ট কর্‌বোনা—ফিরে গিয়ে আর-একটু সন্ধান করে দেখিগে। (চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া) ভাল কথা! বিবাহের প্রস্তাবটা আপনার কন্যার কাছে উত্থাপন করেছিলেন কি?

ঘন। হাঁ, কথাটা একবার তুলেছিলুম—তা আমার মা-লক্ষ্মীর বিশেষ আপত্তি দেখ্‌লুম না।

সিদ্ধান্ত। সে দোষটার কথাও খুলে বলেছেন তো?

ঘন। ঐ যা, সেটা তা এখনও বলা হয়নি, আচ্ছা, সুযোগ পেলেই বল্‌বো এখন।

সিদ্ধান্ত। দোষ বলে দোষ—না জানিয়েই বা কি করি! যাই, একবার ওদিকটা দেখে আসি। (যাইতে যাইতে) একেই বলে স্থান-মাহাত্ম্য—চারিদিক থেকেই যেন বৌদ্ধযুগের সুরভি ভেসে আস্‌ছে!

একাদশ দৃশ্য

ঘনশ্যাম। (স্বগত) তাইতো, কি একটা দোষ রয়েছে বল্‌ছে—কৈ, মনে ত পড়ছে না। ভাবিয়ে তুল্‌লে, দেখ্‌ছি—শেষে কি একটা কলঙ্ক-টলঙ্কই বেরিয়ে পড়্‌বে? এঁ্যা? যাক্! মিছিমিছি ভেবে আর মন খারাপ কর্‌বো না।

পশুপতি। (ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে বাম দিক দিয়া প্রবেশ করিয়া) ব্যাটার এত বড় আস্পর্দ্ধা! মিছিমিছি এত বড় একটা অপবাদ! আমি এখনি সব ষড়যন্ত্র প্রমাণ করে দেব।

ঘন। এত চট্‌লে কেনহে?

পশু। দেখুন দেখি, মোক্তার বেটার কারসাজি—বেটা আমার নামে বেনাহাক্ একটা বদ্‌নাম রটিয়েছে।

ঘন। বদ্‌নামটা কি, একবার শুনি।

পশু। বেটা সকলকে বলে বেড়াচ্ছে, আমিই নাকি চিকিৎসা করে—আপনার গাই-গরুটাকে মেরে ফেলেছি!

ঘন। এ যে ভয়ানক মিথ্যা কথা—গরুটাতো তুমি আস্‌বার আগেই মরে গিছল।

পশু। তাইতো বল্‌ছি—আপনি এই কথাটুকু শুধু একটুক্‌রো কাগজে লিখে দিন—আমি ওর মাথাটা একবার ভাল করে খেয়ে আসি। বেটা বেহদ্দ জানোয়ার!

ঘন। আমাকে লিখে দিতে বল্‌ছো? (স্বগত) তাইতো, এদিকে—(প্রকাশ্যে) [illegible]া, সব সময় কি রাগ কর্‌লে চলে? এমন [illegible]চের কথা ওঠে,—আত্মসম্মান বজায় রাখ্‌তে গেলে তা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করা চলে কি! এগুলো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেই উড়িয়ে দিতে হয়।

পশু। তা বটে, কিন্তু আমি মশায়, ওদের মুখ বন্ধ করাটাই ভাল মনে করি। চট্ করে দু'কথা লিখে দিন—আমি দেখি একবার।

ঘন। তুমি বুঝ্‌চোনা হে, এ যেন ফরমাসী সার্টিফিকেট দেবার মত দেখাবে।

পশু। আমিও তো তাই চাই।

ঘন। না হে, তা [illegible]? সে ভাল দেখায় না।

পশু। হবে না কেন মশায়? আপনি

তাহ'লে দেবেন না, বলুন—তা হলে আপনি সত্যি কথাটাও বল্‌তে চান্‌না? আর আমি কিনা এই আট-আট দিন সারা দেশময় ঘুরে আপনার জন্যে ভোট জোগাড় করে হায়রাণ হলুম!

ঘন। নাহে, তুমি ন্যায্য কথাই বলছো—তোমাকে একখানা সার্টিফিকেট দিতেই হবে।

পশু। যা হোক, এখন—

ঘন। তা এত তাড়াতাড়ি কিসের? কালই নয় লিখে পাঠিয়ে দেব।

পশু। না, এখনই দিন, ভোটাররা সব জমায়েৎ হয়েছে, এই সময় সকলের সাম্‌নে পড়িয়ে শোনাব।

ঘন। সকলের সাম্‌নে? তা হলেই তো চিত্তির! এদিকে হেমাঙ্গিনাও কৈ এখনো ত বাড়ী ফির্‌লো না!

পশু। বেটারা নিন্দে করে বেড়িয়ে আমার সুনামের হানি কর্‌ছে, আমার—আমার পশার মাটি হতে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে যদি এর বিহিত না করি, তা হলে কি আর রক্ষা আছে? আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না,—মশায়, আমার সর্ব্বনাশ হবে, আমাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। (করুণ স্বরে) আমার বাড়ীর অবস্থাটাও একবার মনে রাখ্‌বেন, ঘরে স্ত্রী, বিধবা বোন, আর পাঁচ পাঁচটি ছেলে।

ঘন। (নরম হইয়া স্বগত) তাইতো, পাঁচ-পাঁচটি ছেলে!

পশু। (টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া) নিন্, এই কাগজ রয়েছে, এক কলমের খোঁচা মেরে দিন্, আপনারা পণ্ডিত লোক, আপনাদের আর মুছত্তর লিখ্‌তে কি?

(ঘনশ্যাম সম্মুখের টেবিলের দিকে অগ্রসর হইলেন)

ঘন। কেবল মুছত্তর?

পশুপতি। লিখুন, "আমি এতদ্বারা জানাইতেছি যে পশুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় আমার বাটী আসিবার পূর্ব্বেই আমার গাভীটি মরিয়া গিয়াছিল"—এ আর দু'লাইনের বেশী কি হবে?

ঘন। তা বটে। (স্বগত) একবার চেষ্টা করেই দেখি। কালি-টালি ছিটিয়ে কোন রকমে যদি পার পাওয়া যায়! (টেবিলের ধারে বসিয়া লিখিতে লাগিলেন) "এ-ত-দ্বা'—দ'য়ে দ'য়ে-আকার—না, 'দ'য়ে ধ'য়ে আকার? নাঃ, 'ব' ফলাগুলো নিয়েই যত গোলমাল। মরুক্‌গে, এই খানে একটু কালি ছিটিয়ে দেওয়া যাক্। (লিখিয়া যাইতে লাগিল)

পশু। এইবার মোক্তার বেটার কতখানি জিব বেরিয়ে পড়ে, দেখা যাবে।

ঘনশ্যাম। (চেয়ার হইতে উঠিয়া তাহার হাতে কাগজখানি দিয়া) এই নাও—এখানে ওখানে একটু আধটু কালি পড়ে গিয়েছে, কলমটা বড় খারাপ।

পশু। তা হোক্ না—এতেই আমার ঢের হবে।

ঘন। (স্বগত) তোমার না হয় মিট্‌লো বাপু, কিন্তু ঐ বানান নিয়ে আমারই যে গোলমাল!

দ্বাদশ দৃশ্য

হেমাঙ্গিনী। বাবা আপনি কি আমার খোঁজ কর্‌ছিলেন? আমি এই আস্‌ছি।

ঘন। তোমার ফিরতে বড় দেরী হয়ে গিয়েছে মা! আমি এইমাত্র পশুপতিকে একখানা সার্টিফিকেট লিখে দিলুম—কি করি, নিজেই লিখতে হলো।

হেম। (ভয়চকিত ভাবে) তাই নাকি?

পশু। (কাগজখানি দেখাইয়া) এই যে আমি সবাইকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। (চিঠিখানি কোটের পকেটে রাখিয়া টুপি আনিতে গেল)

ঘন। (কন্যার প্রতি অনুচ্চস্বরে) তুমি তো মা বাড়ী ছিলে না!

হেমা। (অনুচ্চস্বরে) যে করেই হোক্, চিঠিখানা একবার হাত করা চাই।

ঘন। তা বটে, কিন্তু ফেরত নি কি করে?

হেমা। চিঠিখানা তো ওর কোটের পকেটেই রয়েছে—আচ্ছা,হয়েছে। (প্রকাশ্যে অবিনাশের প্রতি) ডাক্তার বাবু, আপনার যন্ত্র-পাতি· এনেছেন কি? ল্যান্সেটটা সঙ্গে আছে?

পশু। 'আছে—কেন বলুন দেখি।

হেমা। তাড়াতাড়ি একবার আসুন তো—বাড়ী ফিরে আসবার সময় কুমেদ রঙের মাদোয়ানটা সর্দ্দি গর্ম্মি হয়ে পড়ে যাবার মত হয়েছে।

ঘন। সর্ব্বনাশ—সকাল বেলা গরুটা গেল, এখন আবার ঘোড়াটাও বুঝি যায়!

পশু। এই যাচ্ছি। কিন্তু দেখ্‌বেন, আবার যেন এ গরীবের ঘাড়ে দোষ-টোষ না পড়ে। (অবিনাশ বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল)

হেমা। আপনার কোটটা রেখে যান, নইলে কাজের সময় অসুবিধা হবে (অবিনাশ কোট ছাড়িয়া বামদিক দিয়া বেগে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে) যাঃ, দেরী হয়ে গেল, দেখ্‌ছি। আর ভয় নাই।

ঘন। ঘোড়াটার কি ব্যারামের কথা বলছো?

হেমা। ঘোড়া ভালই আছে, তার তো কিছু হয়নি।

ঘন। তবে?

হেম। ডাক্তারকে খুব ফাঁকি দিয়েছি—এইবার কোটটা হাত করেছি—সার্টিফিকেট খানা পকেটে খুঁজে পেলে হয়।

ঘন। বুঝেছি—এই জন্যেই বুঝি অস্ত্র-শস্ত্রের এত খোঁজ হচ্ছিল—কাটাকুটির নাম না শুনলে কি আর ও কোট ফেলে কামিজের হাতা গুটিয়ে দৌড়ুতো!

হেমা। সে যাক্, এখন ফিরে এসে ঘোড়াটার কিছু না হয়েছে বল্লেই বাঁচি।

ঘন। সে দুর্ভাবনা আমার নেই—পশুপতি আর যা হোক নিজের ব্যবসাটা বোঝে ভাল—দেখেছো তো, ও কেমন জানোয়ারগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখের পাতাটা একটু টেনে তুলেই—মচ্‌কে গিয়েছে, কি কি হয়েছে, অমনি পট্‌ পট্‌ বলে দেয়।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

পশু। যাক্, কাজটা সেরে আসা গেল।

ঘন। কি খবর হে?

পশু। শির কেটে খানিকটা রক্ত বার করে দিতে হলো।

ঘন। এখন অবস্থা কেমন?

পশু। বেশ ভালই আছে, কিন্তু আর দু'মিনিট দেরী হলেই ঘোড়াটা গিয়েছিল আর কি!

ঘন। কম আপশোষ! বানানগুলো যদি ঠিক জানা থাক্‌তো তা হলে মিছিমিছি কি আর ঘোড়াটার এই রক্ত-পাত হয়!

রামা। (বামদিক দিয়া খড়ির গুঁড়া লইয়া প্রবেশ করিতে করিতে) এই যে কর্ত্তা, চা-খড়ি এনেছি।

হেমা। বেশ করেছিস্। (অনুচ্চস্বরে রামার প্রতি) দে, সবটা ডাক্তারের গায়ে ফেলে।

রামা। (বিস্মিতভাবে) অাঁ, কি বল্‌ছো দিদি ঠাকরুণ?

হেমা। (অনুচ্চস্বরে) কর্ এখনি—যা বল্‌ছি।

রামা। (জনান্তিকে) আমি কি আর গর্‌রাজী! (ডাক্তার ও ঘনশ্যামের মাঝ দিয়া যাইতে গিয়া খড়ির গুঁড়াপূর্ণ সরাটি পশুপতির কোটের উপর ঢালিয়া দিল)

পশু। আ মলো—কর্‌লি কিরে ব্যাটা?

হেমা। তুই আচ্ছা আহাম্মক তো!

ঘন। বেটা বেকুব!

রামা। দিদি ঠাক্‌রুণ বল্লে যে।

হেমা। আমি কি বল্‌লুম রে?

ঘন। চোপরাও শুয়ার! বেটা জানোয়ার কোথাকার!

রামা। (দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া বেগে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে) যাই, একটা জামা-ঝাড়া বুরুশ নিয়ে আসি।

ঘন। (পশুপতির প্রতি) কোটটা খুলে ফেল হে শীগ্‌গির।

পশু। থাক্‌গে আর খোলা-টোলার দরকার নেই।

হেমা। না খুল্‌তে হবে বৈকি।

ঘন। (নাছোড়বান্দা হইয়া) ওহে, কোটটা খোলই না! (পিতাপুত্রীতে মিলিয়া কোট খুলিয়া লইল)

হেমা। (কোট লইয়া তাড়াতাড়ি অন্দরের দিকে যাইতে যাইতে) আপনাকে আটকে রাখবোনা—একটিবার বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে নিতে যা দেরী—এই এলুম বলে। (বামদিক দিয়া বাহির হইয়া গেল)

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

ঘনশ্যাম, পশুপতি, তৎপরে রামা ও সিদ্ধান্ত-রত্ন।

পশু। আপনাদের অনুগ্রহের সীমা নেই—আপনার কন্যা কি না নিজেই কোটটা ঝাড়্‌বার জন্যে নিয়ে গেলেন!

ঘন। এ আর বেশী কথা কি! বাড়ীর মেয়েরা ত এ-সব করেই থাকে।

পশু। (জনান্তিকে) বোঝা গেছে—আজ যে ইলেক্‌সনের দিন। আজ'তো খাতির হবেই।

রামা। (দক্ষিন ধারের দ্বার দিয়া তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া) এজ্ঞে, বুরুশ এনেছি বাবু—(ব্যস্তভাবে পশুপতির কামিজের উপরই বুরুশ চালাইতে লাগিল)

পশু। যা বেটা—গায়ে যে বুরুশের খোঁচা লাগ্‌ছে।

সিদ্ধান্তরত্ন। (রুমালে করিয়া কতক-গুলি কাচের ও পাথরের বাসনের টুকরা আনিয়া) আজ কি সৌভাগ্য! কার মুখ দেখে

উঠেছিলাম জানিনা—সত্যসত্যই একটা স্তূপ পাওয়া গেছে—ঠিক ওই আম গাছটারই নীচে!

রামা। সর্ব্বনাশ! ঠিক আমার লুকোবার জায়গাটা!

সিদ্ধান্ত। (রুমাল হইতে ধারে-গিল্টি-করা শ্বেত পাথরের একটা টুকরা বাহির করিয়া) এ দ্রব্যটি একবার পরীক্ষা করে দেখুন ত।

রামা। (স্বগত) এ যে সেই জয়পুরী রেকাবিখানারই টুকরো দেখছি!

ঘন। এঁ্যা! (রামার দিকে চাহিয়া) এ যে দেখেই চেনা যাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত। চেনা যাবে না? ওর উপর যে স্পষ্ট একটা 'চ' লেখা রয়েছে।

ঘন। (স্বগত) সখের জিনিস, ফর্মাস দিয়ে ধারে গিল্টি করিয়ে নাম লিখিয়ে নিয়েছিলুম, তা মেড়োর লেখা আর কত ভাল হবে—'চক্রবর্ত্তীর' 'চ'টা উল্টে দিয়েছে।

সিদ্ধান্ত। মশায় দেখচেন না—এ যে গুপ্ত যুগের অক্ষর—চ। নিশ্চয়ই ঘটোৎকচ গুপ্তটুপ্ত কিছু লেখা ছিল, সেদিন বসাঢ়ে ঘটোৎকচের মুদ্রাও পাওয়া গেছে।

ঘন। (রামার প্রতি চোখ রাঙাইয়া) এটা ভেঙ্গেছে কে রে?

সিদ্ধান্ত। নিশ্চয়ই কোন গুপ্তযুগের লোক!

রামা। (স্বগত) গুপ্তযুগ না হাতি! জালিয়ে খেলে বুড়ো—যা-কিছু গেরস্তর লোকসান করেছিলুম, সব টেনে বার করছে গো!

সিদ্ধান্ত। (সাদা ... টুক্‌রা বাহির করিয়া) ... টুক্‌রো দেখুন—এটা কি বু...

পশু। দিন্‌তো, দেখি এ... পিছাইয়া আসিয়া) এ ... কাচ।

ঘন। আমারও বুঝ্‌... (স্বগত) এ-সব আবার কষ্ট করে কুড়িয়ে এনে দেখানো কেন?

সিদ্ধান্ত। এটি মশায় অতি দুষ্প্রাপ্য—রোমকদের Lachrymoire অর্থাৎ অশ্রুজলের আধার। ভারতে রোমক মুদ্রা, ধাতব দীপাধার, রোমক ভাস্ (Vase) বা ভৃঙ্গার প্রভৃতি পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু রোমক সাম্রাজ্যের অবনতি-যুগের এমন সুন্দর শিল্প-নিদর্শন পর্য্যন্ত এদেশে আবিষ্কৃত হয়নি।

ঘন। বটে নাকি? (স্বগত) এর ভুল ভাঙিয়েই বা কি হবে! তন্ময় হয়ে আছে। তবু যা হোক বেচারা এ থেকে একটু আমোদ পাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত। রোমকদের পরিবারস্থ কেউ দেহত্যাগ করলে এই সব আধারেই শোকাশ্রু বিসর্জ্জিত হতো।

পশু। কি আশ্চর্য্য—তারা আচ্ছা অদ্ভুত লোক ছিল তো! (সিদ্ধান্তরত্ন পশ্চাতে টেবিলের নিকট গিয়া—তাকের উপর টুকরাগুলি সাজাইতে লাগিলেন)।

রামা। (বামদিকের দ্বার দিয়া পশুপতির নিকট আসিয়া)—এই আপনার কোট নিন।

পশু। (কোট গায়ে দিতে দিতে)

বাঃ, বেশ ঝাড়া হয়েছে তো! (পরে পকেটে হাত দিয়া) কৈ—কৈ—রেখেছি তো? (বাহির করিয়া) এই যে রেখেছি দেখ্‌চি।

ঘন। (স্বগত) এ আমার ছেমা-মায়ের হাতের লেখা। যাক্‌, এ-যাত্রা খুব রক্ষা পাওয়া গেছে।

পশু। তা হলে আমি এবার রোধ্‌-শোধ হই—ইলেক্‌শানটার কি হচ্ছে, একবার খবর নেওয়া দরকার—ফিরে এসে আপনাকে সব কথা জানাব এখন।

ঘন। (রামার প্রতি—অনুচ্চস্বরে) এইবার ব্যাটা তোকে দেখ্‌চি।

রামা। (ভীতভাবে) এজ্ঞে কর্ত্তা, আমার কোনও অপরাধ নেই।

ঘন। আয় বেটা এদিকে।

রামা। (আগাইয়া আসিয়া) মাপ দেন—কর্ত্তা মাপ দেন।

ঘন। বল্‌ দেখি বেটা, এখন—সোনালি হল্‌-করা রেকাবিখানা—

রামা। এখন মাপ দেন কর্ত্তা—কাঠ ফাঠ কিছুই ফাঁড়া হয়নি- অনেক কাও বাকি আছে আমার।

ক্রমশঃ

শ্রীগুরুদাস সরকার।

কৃষ্ণলালের দৌত্য পরিণাম

(২৫)

হেম কৃষ্ণলাল বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ভ্রাতা—অতএব পূর্ব্ব স্মৃতি এবং সম্পর্কের বন্ধনাস্বরূপ। এক সময় কর্ত্তাবাবু ইহার অভিভাবক ছিলেন—এখন কর্ত্তারই ইনি সর্ব্বেসর্ব্বা দক্ষিণ হস্ত। হেম নহিলে ত তাঁহার বিষয়কর্ম্ম চলেই না, তাহা ছাড়া অন্য অনেক কাজেই হেম তাঁহার নির্ভরস্থল,—এক কথায় হেম তাঁহার সর্ব্ববিষয়ের ম্যানেজার।

লোকটি যেমন কর্ম্মিষ্ঠ তেমনি খাঁটি, হিসাব নিকাশে এক আধলার গরমিল হইলে সেদিন তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হয়। এইরূপ কাজের লোককে কাজে পাইয়া কৃষ্ণলাল কিন্তু একেবারেই অকেজো হইয়া পড়িয়াছেন। চেকের কর্ম্ম পর্য্যন্ত তিনি নিজে লেখেন না, সই করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হন।

বাবুকে বিষয়-কর্ম্মে 'ওয়াকিভ' করিতে হেমের পক্ষ হইতে কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। কিন্তু তাঁহার দর্শন-চিন্তার নিগড়বাঁধা মনের মধ্যে বৈষয়িক চিন্তাকে ঠেলিয়া প্রবেশ করান একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে না আছে,—ভাড়াটে বাড়ীর কোন্‌টার ভাড়া আছে কোন্‌টা বা খালি, ধার দেওয়া টাকার মধ্যে কোন্‌স্থলে কত সুদ বাকী পড়িল—কখন বা কোন্‌টার নালিসের সময় আসিল,—এই সকল খবর জানাইয়া নানা কার্য্য সম্বন্ধে আদেশ ও উপদেশ লইবার জন্য খাতা পত্র এবং চিঠি পত্রাদি সহ যথাসময়ে হেম প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের পর তাঁহার নিকট আসিয়া হাজির হয়—কিন্তু কোনদিনই প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কোন বিষয় শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য ঠিক করিবার অবকাশ তাঁহার ঘটে না।

কোন বিষয়ের আধখানা পর্য্যন্ত না শুনিয়াই—অধীর চিত্তে কৃষ্ণলাল বলিয়া উঠেন—"বুঝেছি বুঝেছি আর বলতে হবে না,—আমার আদেশ এবং উপদেশ এই,—এ সম্বন্ধে তোমার বুদ্ধিতে যা ভাল মনে হয় তাই করো।" হেম হতাশভাবে গোঁপে তা দিতে দিতে,—খাতাপত্রের তাড়াগুলা বহিয়া দপ্তরখানায় পুনঃ পবেশ করে। গোঁপে তা দেওয়াটাই হেমের জীবনের মধ্যে একটা বদ অভ্যাস—ইহাই তাহাকে সুখে উত্তেজিত এবং দুঃখে সান্ত্বনা প্রদান করে। কারণ মদ্যপান বা তাম্রকু সেবনে পর্য্যন্ত সে অনভ্যস্ত।—

কখনো কোন দুঃসময়ে, দুর্দ্দিনে বা দুঃসময়ে সহসা যখন কর্ত্তাবাবুর সুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায় তখন হেমের আরও বিপদ। এই চেতনারূপ আধিভৌতিক ঘটনাকে দুঃস্বপ্ন বোধে, ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তখন সমধিক ব্যাকুলভাবে তিনি হেমের শরণাপন্ন হন। যেন হেমই সে ঘটনার সংঘটক,—এবং ইহার প্রতিবিধানও তাহার হস্তে। আজও গৃহিণীর নিকট কর্ত্তব্য-ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া তিনি দায়ী করিলেন হেমকে!

হেম আসিবামাত্র চীৎকার-ভৎ‍র্সনায় তাহাকে কহিলেন—"কি রকম এ কাণ্ড কারখানা তোমার হে? কতদিন থেকে বলছি বিজনকুমারের সঙ্গে হাসির বিবাহটা ঠিক করে ফেলো,—তা করছ না কেন বলত? সেদিকে ত তোমার এক বিন্দু চেষ্টাও দেখতে পাইনে!" হেম হাসিতে লাগিল। বাবুর ভৎ‍র্সনায় কেহ রাগ করে না,—তাহা নির্ব্বিষ; বরঞ্চ তাহার মধুটুকুই লোকে উপভোগ করে। কৃষ্ণলাল বলিলেন—"তুমি ত হেসে নিশ্চিন্ত—আর এদিকে যে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।" হেম আবার হাসিয়া কহিল—"আমি ইতিমধ্যে দুই তিন দিন সেখানে গিয়েছিলুম,—কিন্তু রায়মশায়ের দেখা পাইনি—শুনলুম তিনি বাড়ী নেই। আবার না হয় আজ খবর নেব।"

"ও সব ওজরে আমি ভুলিনে, তোমার উপর এতটুকুও বিশ্বাস আর আমার নেই! খবর নিলেই বুঝি কার্য্যসিদ্ধি হোয়ে গেল! শরীরটা দিন দিন যেমন সূক্ষ্ম হচ্ছে বুদ্ধিটাও তেমনি সূক্ষ্মতর দাঁড়াচ্ছে। আজই চল,—এই মুহূর্ত্তে,—আমার সঙ্গে তোমায় এখনি সেখানে যেতে হবে—বুঝলে ত?

"আজ্ঞে তাই যাব। কিন্তু এখন ত সকলের আহারের সময় হয়ে এল—এখন ১১টা বেলা,—এখন সেখানে গিয়ে হয়ত শুনবেন—বাবু খেতে বসেছেন,—এখন দেখাই হবে না।"

"তা নাই হোল দেখা! সে জন্য ত তোমাকে ভাবতে বলিনি?"

"তবে চলুন,—আমি প্রস্তুত আছি।"

কৃষ্ণলাল গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিয়া শুনিলেন,—কোচম্যান হাজির নাই সে বাসায় খাইতে গিয়াছে।

এ সংবাদে একটু আরামও বোধ করিলেন; এখনি যাইবেন বলিয়া ফেলিয়া পরমুহূর্ত্তেই অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কিন্তু এ যাত্রা তবুও রক্ষা পাইলেন না, অন্তঃপুরে আহারে যাইবামাত্র আবার এক দফায় গৃহিণীর তাড়া খাইয়া বিকালবেলা অগত্যা কোমর বাঁধিয়া সেনাপতিরূপে রণ-

বাত্রায় নির্গত হইয়া পড়িলেন। তাহা ছাড়া আর গত্যন্তর কি ?

গাড়ীতে বসিয়া সারাপথটা মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন —আজও যেন সুজন রায় বাড়ী না থাকেন। গৃহিণীর নিকট কৈফিয়ৎ দিতে পারিলেই ত তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ।—কিন্তু হায়রে! এমনি অদৃষ্ট! খোলা ল্যাণ্ডোখানা রায় ভবনের কমপাউণ্ডে প্রবেশ করিতে ন' করিতে রায় মহাশয়ের জীর্ণ দেহ শীর্ণ মুখ তাঁহার নেত্রগোচর হইল। সুজন রায় তখন ছাতে রাস্তাঅভিমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কৃষ্ণলালকে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন। "এই যে দাদা, আসতে আজ্ঞা হোক্‌, আসতে আজ্ঞে হোক্‌"—বলিতে বলিতে নমস্কার অভিবাদন সহকারে গাড়ী হইতে নামাইয়া ড্রয়িং রুমে আনিয়া বসাইয়া বলিলেন—"আজ আমার বড় সৌভাগ্য! দাদার পদধূলিতে গৃহ পবিত্র হ'য়ে গেল। বাড়ীর মঙ্গল ত? হেম ভাল আছ ত?" কর্ত্তার এইরূপ সৌজন্য-সমাদরে কৃষ্ণলাল এরূপ মুগ্ধ অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, ইহার প্রতিব্যবহারে তাঁহার মুখ হইতে যেরূপ ভদ্রতার কথা শোভনীয় হইত,—সেরূপ কিছুই এস্থলে বলা হইল না। তবে তিনি এখানে আসিয়া সঙ্কোচের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ বেশ স্থির ভাবই বোধ করিতে লাগিলেন এবং মাঙ্গলিক্‌ শেষ করিয়া সুজন রায় যখন অন্য কথা পাড়িলেন তখন ক্রমশঃ তাঁহার কথাও যোগাইতে লাগিল।

সুজন রায় কহিলেন—"নরেন্দ্র ত বোম্বাই গিয়েছে শুনেছি—শচীন কি করছে এখন।" কৃষ্ণলাল বুঝিলেন—বিজন কুমারের নিকট হইতে সুজন রায় তাঁহার ঘরের অনেক খবরই পান।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহিলেন—"শচীন এবার বি-এ পাশ দিয়েছে"—

"বি-এ পাশ দিয়েছে! তা বেশ বেশ! শুনলেও আহ্লাদ হয়। আমার ছেলেটাত একেবারেই অকালকুষ্মাণ্ড! আমি তাই গিন্নিকে বলি—তোমার ছেলের বৌ মিলবে না।"

হেম এই অবসরটা বৃথা যাইতে দিল না,—বলিল "তার পাশের কি দরকার বলুন? তার বাপের জমীদারীই তার পাশ। বিজন ত আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই যাওয়া আসা করে— বৌঠাকরুণত তার রূপেগুণে মুগ্ধ—তার ভারী ইচ্ছা তাকে জামাই করেন।"

সুজন রায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন—ইহাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি,—সুতরাং তিনি এজন্য প্রস্তুত ছিলেন। হেমের কথার উত্তরে বিনয় সহকারে বলিলেন,—"আমার ছেলে দাদার,—তাঁর মেয়ে আমার আপনার হবে, এর চেয়ে আর কি সৌভাগ্য হতে পারে বল? তবে ছেলেটাকে কোন একটা কাজে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে এ-কাজ করব ভাবছি।" সুজন রায়ের মনোনয়নে তখন জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতিঃ জাগিতেছিল। দাদা ইহাতে সায় দেওয়া ছাড়া আর কি বলিতে পারেন? হেম এই সময় কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল—তৎপূর্ব্বেই সুজন রায় আবার বলিলেন—"আগে ইচ্ছা ছিল ওকে বিলাত পাঠাব—কিন্তু এখন মনে হয় দেশে থেকেও অনেক

কাজ করা যায়। দেশের iudustryর দিকে লক্ষ্য দেওয়াই আপাততঃ আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। একটা দেশলাইএর কাটিও আমাদের বিদেশ থেকে আসছে। বঙ্গবিভাগ নিয়ে দেশের লোক ক্ষেপে উঠেছে,—কিন্তু এসব কার্য্য নিয়ে ক্ষেপছে কজন বলত দাদা? অথচ এই পথই আমাদের দেশের প্রকৃত মুক্তির পথ।"

কৃষ্ণলাল প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিলেন—"সে ত ঠিক কথা!"

"তুমি ত দাদা বল্লে ঠিক কথা; আমাদের জমীদার ভায়ারা এদিকে মোটেই ঘেঁসতে চান না। তারা পলিটিকস্ নিয়েই ব্যস্ত।"

অতুলেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এই কথা বলিলেন।

হেম বলিল—"হ্যাঁ আপনি শুনেছি পলিটিক্সের ভেতর যেতে চান না।"

"আমি মনে করি,—ওসবের মধ্যে যাওয়াটা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা,—লাভ কিচ্ছু নেই, লোকসান সমূহ।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"কথাটা আমি সঙ্গত বিবেচনা করি। আজকালকার ছেলেরা পলিটিক্স্ নিয়ে কেন যে এত মাথা ব্যথা করে বুঝতেই পারিনে। আমরা বল্লেই কি ইংরাজরা ভারতবর্ষ আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে?"

হেম বলিল—"না তা কেউ ত চায়ও না। আমরাত ইচ্ছা করিনে যে ইংরাজেরা যাক; —রাজ্য শাসনে তাদের মত সমক্ষমতা আমরা পেতে চাই,—যে সব অন্যায় রাজনৈতিক নিয়ম আমরা দেখতে পাই—তার প্রতিবিধান চাই,—এই মাত্র।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"হ্যাঁ সে ত হওয়া উচিতই,—তাতে ত ইংরাজদেরও আপত্তি হবার কোন কারণ দেখিনে।"

সুজন বলিলেন—"তোমার মত সরল মন তাদের কি দাদা! তারা ভাবে বেশী ক্ষমতা আমাদের হাতে দিলে ক্রমশ একেবারেই তাদের ক্ষমতা চলে যাবে—তাদের দিকটাও বুঝে দেখ।"

হেম বলিল—"তাদের দিক ত তারা খুব বেশী করেই দেখছে, আমাদের দিক যে একটুও দেখতে চায় না,—"

"কিন্তু বল্লেই কি তারা দেখবে?

"সে কথা পলিটিসান্‌রাই বলতে পারেন, তবে আমাদের মত আনাড়িরা এইটুকু বোঝে যে বলাতেও ত সুখ একটা আছে।"

"আমি বলি ওতে সুখবোধ না হয়ে দুঃখবোধ হওয়াই উচিত। বেশী কথার দরকার কি—কাজেই যোগ্যতা দেখাও না?" হেম একথার সত্যতাটা মনে মনে বুঝিয়া গোঁপে তা দিতে প্রবৃত্ত হইল। সুজন বলিলেন,—"আমি ত আগেই বলেছি যাতে ব্যবসা বাণিজ্য ও শ্রম-শিল্পের বৃদ্ধি হয় এই সব দিকে দৃষ্টি দেওয়াই আমাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য। আর আমার সাধ্যমত শক্তি আমি এই দিকেই অর্পণ করেছি। একটি চা-বাগানে আমি সহস্র সহস্র মুদ্রা ঢালছি—তবুও আশানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি করতে পারছিনে। এ সব কার্য্য ব্যাঙ্কের সাহায্য ব্যতীত চলতে পারে না। কিন্তু বলব কি দুঃখের কথা, একজন একবস্ত্র ইংরাজকেও

তারা যেরূপ সাহায্য করে আমাদের মত লোককে তার শতাংশের একাংশও করে না। আমার চা ব্যাঙ্কের নাম শুনে বোধ হয় দাদা বড় দুঃখে আমি ঐ ব্যাঙ্কের করেছি। কিন্তু দেশের লোকই বা কজন এ সম্বন্ধে আমাকে সাহায্য করছেন?"

হেম বলিল,—"কয়েকবার দেশী ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে কিনা তাই প্রথমটা সবাই ভয় পায়। দিন কতক চালিয়ে যদি সুনাম রক্ষা করতে পারেন—তখন আপনা হতেই কত লোক যেচে এসে আপনার ব্যাঙ্কে টাকা রাখবে। বাস্তবিক এরকম ব্যাঙ্ক একটার বড়ই অভাব আমাদের দেশে। এ সম্বন্ধে আমিও ভুক্তভোগী। রাণিগঞ্জে কর্ত্তা মহাশয়ের একটা সম্পত্তি আছে—জানেন ত? তাতে মাঝে মাঝে কয়লার টুক্‌রাও পাওয়া যাচ্ছে। লাখ খানেক টাকা হলেই আমরা কাজ আরম্ভ করতে পারি কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও কোন ব্যাঙ্কারকে হাত করতে পারছিনে। তারা সকলেই একবাক্যে জ্যয়েন্ট ষ্টক কম্পানি খুলে কাজ আরম্ভ করতে বলে।—আসল কথা কৃতকার্য্য হলে তখন এরা টাকা দেবে।"

সুজন রায়ের লোভ-রসনা লালায়িত হইয়া উঠিল। রাজা অতুলেশ্বরের রাণিগঞ্জে সম্পত্তি আছে আর তাঁহার নাই, এ হীনতাটা তাঁহাকে বড়ই আঘাত দেয়। এই অভাব দূর করিবার জন্য রাণিগঞ্জে দু একবার জমী দেখিতেও তিনি গিয়াছিলেন। কৃষ্ণলালের জমীটা তাঁহার বড়ই পছন্দ হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধান লইয়া জানিয়াছিলেন—ও জমী বিক্রয় হইবে না। হেমের কথার উত্তরে তিনি কহিলেন, "এস্থলে কম্পানি খোলার আমি ত সার্থকতা বিশেষ কিছু দেখিনে। জমী তোমাদের, অথচ লাভ যা হবে—তা পঞ্চ ভূতে মিলে খাবে। তার চেয়ে আমাকে যদি lease দাও ত আমি খনন-ব্যয়-ভার সব বহন করব—তারপর লাভ যখন হবে তখন খরচটা উঠিয়ে নিয়ে আধা আধি আমরা ভাগ নেব।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"বাঃ সে ত বেশ কথা—জমীটাত এখন বলতে গেলে পড়েই আছে তার আয় অতি সামান্য। এ রকম সর্ত্তে দিতে আমি এখনি প্রস্তুত; কি বল হেম?"

হেম বলিল—"এসব কথায় ত এক মুহূর্ত্তে উত্তর দেওয়া যায় না। ভেবে চিন্তে পরে উত্তর দেওয়াই ঠিক।"

সুজনরায় আর অধিক গরজ দেখান বিবেচনাসঙ্গত জ্ঞান করিলেন না,—কহিলেন "হ্যাঁ, হেম ঠিক কথাই বলছেন। তবে আমার বলা রইল—জমীটা যদি বিক্রয় করতে চান বা lease দিতে প্রস্তুত থাকেন ত আমাকে জানাবেন; আপনার সুবিধামত সর্ত্তেই আমি বন্দবস্ত করে নেব।"

কৃষ্ণলাল আবার হেমের দিকে চাহিলেন। সুজনরায় হাসিয়া বলিলেন—"হেমই বুঝি দাদার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন "ভাগ্যিস ওকে পেয়েছি ভাই, তাই ধড়ে প্রাণ আছে নইলে যে আমার কি দশা হোত মনে করতেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়।"

সুজন রায় মনে মনে বলিলেন—"তবেই বিষয় রেখেছ তুমি।" আত্মবৎ মন্ততে

জগৎ! স্বয়ং ধর্ম্মরাজ আসিয়া তাঁহার কর্ম্মচারী হইলেও সুজন তাঁহাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

হেম বলিল--"দর্শনতত্ত্ব চিন্তাতেই উনি সমগ্র আপনাকে ঢেলে দিয়েছেন; আমরা যদি তা থেকে এক মুহূর্ত্তও ওঁকে এদিকে টানি তাহলেও উনি বিরক্ত বোধ করেন।"

সুজন রায় হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ শুনেছি বটে দাদা কি একটা বই লিখছেন,—এখনো শেষ হয়নি?"

কৃষ্ণলাল বলিলেন--"জটিল তত্ত্ব ভাই, সাধারণের বোধগম্য করে লিখতে একটু সময় চাই। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মবাদই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়। আর ঋষিগণ ওঁ শব্দকে বীজমন্ত্র করে যে ইহাই স্বীকার করে গেছেন এইটে আমি বোঝাতে চাই।"

সুজন রায় নেত্র বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "দাদা—তুমি এই মরজগতে অমর কীর্ত্তি রেখে যাবে দেখছি! ঋষিদের আধ্যাত্মিকতা যদি তুমি আবার জাগিয়ে তুলতে পার,—সত্যযুগ ফিরে আসবে!"

কৃষ্ণলাল উৎসাহিত হইয়া কহিলেন "তোমার এ বিষয়ে এমন interest তা আমি জানতুমনা এত আহ্লাদ হচ্ছে আমার! আমি তোমাকে দুকথায় এর মূল তত্ত্বটা এখনি বুঝিয়ে দিতে পারি—একটা কাগজ পেন্সিল যদি আনতে বল?"

সুজন রায়ের প্রশংসার পরিণাম এতদূর গড়াইবে তাহা তিনি বুঝেন নাই। এখন কিরূপে ইহা হইতে নিস্কৃতিলাভ করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় তাঁহাকে রক্ষা করিলেন তাঁহার ম্যানেজার। তিনি এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুজন রায় অনেকক্ষণ হইতে ইঁহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

(২৬)

সুজন রায় বলিলেন—"দেখ দাদা পুণ্য কার্য্যে কত বাধা। এস ডিক্রুজ সাহেব, এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

এই ডিক্রুজ সাহেব আর কেহ নহেন, শরৎকুমার ও অনাদির ট্রেনের বন্ধু। ডিক্রুজ বেশ বাঙ্গলা বলেন- তিনি বাঙ্গালাতেই ইহাদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। হেমের নিকট ইনি অপরিচিত নহেন, অনেকবার ট্রেনে দেখা শুনা হইয়াছে। সুজন রায় কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন—"দেখ দাদা ইনি একজন মস্ত ফিলজফার লোক। প্রাচ্য পাশ্চাত্য সব ফিলজফিই এঁর কণ্ঠস্থ। তোমার দর্শনতত্ত্ব যদি এঁকে দিয়ে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়ে নিতে পার ত মস্ত একটা কাজ হয়।"

এই বাসনা কৃষ্ণলালের মনেও মাঝে মাঝে উদয় হইয়াছে। সহসা সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার উপায় মূর্ত্তিমন্ত রূপে সম্মুখে উদিত দেখিয়া তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন।

ডিক্রুজ বলিলেন--"আপনারা দুজনেই দেখছি born patriot। একজন দেশে ধনাগমের চেষ্টা করছেন—আর একজন জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা করছেন। দেশের পক্ষে দুইই দরকার। আমার সৌভাগ্য যে আজ আপনার সঙ্গে পরিচিত হলুম।"

আরও দুই একটা এইরূপ মিষ্ট সম্ভাষণ করিবার পর সুজন রায়কে তিনি বলিলেন— "আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে, আমায় এখনি আবার একবার ব্যাঙ্কে যেতে হবে।" হেম এই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া কহিল—"তবে আজ ওঠা যাক মুখুয্যেমশায়; সন্ধ্যা ত হয়ে এল।"

মুখুয্যেমশায় আসিবার সময় যেরূপ অনিচ্ছার সহিত গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন; যাইবার সময়ও সেইরূপ অনিচ্ছাতে চৌকি হইতে উঠিলেন। সুজন বলিলেন, "বসুন না আর একটু; এখনি যাবেন?" মুখুয্যে মশায়ের ইচ্ছামত কাজ হইলে তিনি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতে গৃহস্বামী স্বয়ং উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হেম,ডিকুজ সবাই উঠিয়া দাঁড়াইল —সুতরাং কৃষ্ণলালের মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। উঠিয়া দাড়াইয়া সুজন রায় কহিলেন "তুমি তাহলে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হচ্ছ দাদা? এতে ক্ষতি, কিছুই নেই— শুধু নামটা দেওয়া মাত্র। তাহলেই লোকে ব্যাঙ্কের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে।"

কৃষ্ণলাল উত্তর করিলেন—"অবশ্য অবশ্য আমার ত সেটা কর্ত্তব্য কাজ।"

সুজন কৃষ্ণলালকে গাড়ীতে পৌছিয়া দিবার সময় নীচে আসিয়া আবার বলিলেন --"ব্যাঙ্কের কথাটা ভুলো না দাদা! টাকাকড়ি এই ব্যাঙ্কে রেখে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে। আর রাণিগঞ্জের সম্পত্তির সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করেছি সে বিষয়েও ভেবেচিন্তে একবার দেখো। ছেলেটাকে এই রকম কাজে লাগিয়ে দিয়ে তখন ঘরে বৌ আনব- এই মনে ক'রে আছি।"

আশাতীত সফলতা! হাসিকে বৌ করিবেন বলিয়াই তাহা হইলে সুজন রায় কথা দিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট উক্তি আর কি হইতে পারে! কর্ত্তা বলিলেন—"কবে আসবে ভায়া। তুমি বুঝি হাসিকে দেখনি?" "একদিন অবিলম্বে যাব; তোমার দর্শন-তত্বও সেইদিন শুনব, আজ ত আর ভাগ্যে সে আনন্দলাভ ঘটলো না।"

কৃষ্ণলাল আনন্দে গলিয়া গেলেন—তাঁহাদের গাড়ীতে বসাইয়া সুজন শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখন গেলে কথাবার্ত্তার সুবিধা হবে দাদা?"

কর্ত্তা বলিলেন—সকালেই আমি লেখা-পড়া করি, দর্শনতত্ব শুনতে চাও ত সেই সময়ই এস।"

"আর যদি কাজের জন্য যাই?"

"তাহলে বিকালের দিকে আসাই ভাল। হেম আহারান্তে আমার এখানে আসেন; আজ তোমার এখানে সকালেই আসব ভেবে ধরা-পাকড়া করে ১১টার মধ্যেই ওঁকে আনিয়ে ছিলুম—শেষে কিন্তু সকালে আর এখানে আসাই হোলনা।"

শেষ কথা শেষ হইতে না হইতে কোচমান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া কর্ত্তা গৃহিণীকে সুসংবাদ দান করিলেন—গৃহিণী আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন -"দেখলে,—আমি ত বলে-ছিলুম তুমি গেলেই কার্য্যসিদ্ধি হবে! কথা শোননা—এই ত দুঃখ।"

হাসি ছাড়া আর সকলেই জানিল;

বিজনকুমারের সহিত তাহার শীঘ্রই বিবাহ হইবে।

*   *   *   *

কৃষ্ণলালের সৌভাগ্যের সীমা নাই। ২৪ ঘণ্টাও এখনও অতিবাহিত হয় নাই কেবল রাত্রিটা মাত্র কাটিয়াছে আর প্রাতঃকালে ম্যানেজার ডিক্রুজ সাহেব কৃষ্ণলালের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন? অভিপ্রায় কি? না, তাঁহার দর্শনতত্ব শুনিবেন। কৃষ্ণলালের বুঝি এত আনন্দ জীবনে কখনো হয় নাই। তিনি ওঙ্কার শব্দলিখিত কাগজখানি সাহেবের চোখের উপর খুলিয়া রাখিয়া প্রথমে ওঙ্কার শব্দের অর্থ এবং মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেব তাঁহার প্রতি ব্যাখ্যায় বার বার মুগ্ধতাবাচক শব্দের ব্যবহার করিতে লাগিলেন —এবং তর্জ্জমা করিবার অভিপ্রায়ে নোট লইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সহসা ঘড়ি দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আজ আর সময় নাই, অন্য কাজে যেতে হবে এখনি। এমন interesting কথা ছেড়ে যেতে ইচ্ছাও করে না—কিন্তু কি করি! আবার কাল আসব।"

পরে পরস্পরের ধন্যবাদ বিনিময় শেষ হইয়া গেলে বলিলেন, "ব্যাঙ্কে কি টাকা রাখা হবে? মিষ্টার রায় জানতে চেয়েছেন।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"অবশ্যই হবে, আজই হতে পারত কিন্তু হেম ত এখন নেই।"

হেম আসিলে ব্যাঙ্কে যে টাকা দেওয়া হইবেনা তাহা সাহেব বিলক্ষণ জানিত, জানিয়াই সকালে আসিয়াছিল। সে বলিল— "হেম না এলে কি কোন কাজ হয় না— টাকা ব্যাঙ্কে দেওয়া ত কঠিন কথা কিছু নয়। আমাকে যদি একটা চেক সই করে দেন

"তা দিতে পারি—দিতে পারি, কিন্তু চেক বই যে হেমের কাছে,—সে এলে চেক পাঠিয়ে দেব—"

ডিক্রুজ বুঝিল, এ আশাটা ত্যাগ করিতে হইবে। সে বলিল—"বেশ, হেমকে দিয়েই পরে ব্যাঙ্কে চেক পাঠালে চলবে; কিন্তু আপনি ত ব্যাঙ্কের ডিরেকটর হবেন বলেছেন —তাহলে এই কাগজটা যদি সই করে দেন।" কাগজখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া সে তাঁহাকে দিল—তিনি টেবিলের উপর রাখিয়া নাম সই করিলেন,—ডিক্রুজ বলিল, "পড়ে দেখবেন না?"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"পড়ে আর দেখব কি? তোমরা কি আর আমাকে ঠকাবে?" সাহেবের কঠিন হৃদয়ও সহসা একটুখানি করুণার্দ্র হইয়া উঠিল। এই চিত্তবিকারে মনে মনে একটু হাসিয়া তাড়াতাড়ি কাগজখানা লইয়া সে চলিয়া গেল।

হেম পরে আসিয়া এই সংবাদে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ইহার পর ম্যানেজার বা সুজন রায়ের টিকিও আর দেখা গেল না পনেরো দিন না যাইতেই খবর পাওয়া গেল, সুজন রায়ের ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

(মহাবোধি সোসাইটিতে পঠিত)

মৈত্রী-করুণার মন্ত্র দিতে দান
জাগ হে মহীয়ান্! ভারতে মহিমায়;
সৃজিছে অবিচার নিঠুর অবিচার
রোদন-হাহাকার গগন-মহী ছায়।
নিরীহ মরালের শোণিতে অহরহ
ভাসিছে সংসার, হৃদয় মোহ পায়;
হে বোধিসত্ত্ব হে! মাগিছে মর্ত্ত্য যে
ও পদ-পঙ্কজে শরণ পুনরায়॥

মনন-ময় তব শরীর চির-নব
বিরাজে বাণী-রূপে অমর দ্যুতিমান;
তবুও দেহ ধরি' এস হে অবতরি'
হিংসা-নাগিনীরে কর হে হতমান।
জগত ব্যথা-ভরে জাগিছে জোড় করে
এ মহা-কোজাগরে কে দিবে বরদান,
এস হে এস শ্রেয়! এস হে মৈত্রেয়!
ক্রূরতা-মূঢ়তার কর হে অবসান॥

হে রাজ-সন্ন্যাসী! বিমল তব হাসি
ঘুচাক্ গ্লানি তাপ কলুষ সমুদায়;
ক্রোধেরে অক্রোধে জিনিতে দাও বল
চিত যে বিচলিত চরণে রাখ তায়,
নিখিলে নিরবধি বিতর 'সম্বোধি'
মরমী হোক্ লোক তোমারি করুণায়;
ভুবন-সায়রের হে মহা-শতদল!
জাগ হে ভারতের মৃণালে গরিমায়॥

চাঁদের করে গড়া করভ সুকুমার,
ভুবন-মরুভূমে মূরতি চারুতার;
বিরাজো চারু হাতে অমিত জোছনাতে
জুড়াতে জগতের পিয়াসা অমিয়ার।
তোমারি অনুরাগে অযুত তারা জাগে
তৃষিত আঁখি মাগে দরশ আরবার,
ভারত-ভারতীর সারথি চির, ধীর,
তোমারি পায়ে ধায় আকুতি বসুধার॥

মুনির শিরোমণি! হৃদয়-ধনে ধনী!
চিন্তা-মণি-মালা তোমারে ঘিরি ভায়,
বসিয়া ধ্যান-লোকে নিখিল-ভরা শোকে
আজো কি শতধারা কমল আঁখি ছায়?
মমতাময় ছবি! তোমারে কোলে লভি'
ভূষিত হ'ল ধরা স্বরগ-সুষমায়,
করুণা-সিন্ধু হে! ভুবন-ইন্দু হে!
ভিখারী জগজয়ী! প্রণতি তব পায়॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বৌদ্ধ শিক্ষা-পদ্ধতি

(প্রাচীন নালন্দা ও দন্তশীরপুর)

পরবর্ত্তী বৌদ্ধ যুগে বঙ্গদেশ বলিতে বর্ত্তমান মগধ ও পশ্চিম-বঙ্গ বুঝাইত। যে বঙ্গদেশ অশেষ-ভাষাবিৎ মনস্বী বৌদ্ধ শীলভদ্রের জন্মস্থান, যে বঙ্গদেশ সুদূর চীন ও তিব্বতে দেবভাবে-পুজিত বৌদ্ধ সাধক প্রভামিত্র ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মস্থান. যে বঙ্গদেশ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীর মাহিষ্য রাজন্যবর্গের কীর্ত্তিকলাপের লীলাক্ষেত্র,—সেই বঙ্গদেশে যখন আজ বুদ্ধ কিম্বা বৌদ্ধের নাম অপরিজ্ঞাত, তখন অতি প্রাচীন কালের বৌদ্ধ যুগের কাহিনী যে ভারতে উপকথার মত শুনাইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী ভারত-গগনে উড্ডীন হইতেছিল, যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিজয়-দুন্দুভি চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হইতেছিল, তখন বিশ্ব-বিশ্রুত নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় ভারতে শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল! এইখানে সুদূর চীন, জাপান, তাতার, তিব্বত, শ্যাম, আসাম ব্রহ্ম, গোবী প্রভৃতি দিদেশ হইতে বিদ্যার্থীগণ আগমন করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নে রত থাকিতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিদধিক দুইশত পচিশখানি পল্লী বা সেকালের গ্রাম উৎসর্গীকৃত ছিল এবং তিব্বতী ও পালি গ্রন্থ-পাঠে আমরা জানিতে পারি, এই সকল গ্রাম বৌদ্ধ সম্রাটগণ কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে সম্রাট বালাদিত্য ৩০০ ফিট উচ্চ এক সুন্দর বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই সময়ে এইখানে "প্রজ্ঞাভদ্র" নামক এক মহা যশস্বী ধর্ম্ম-যাজক বাস করিতেন; নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দশ সহস্রাধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। অধ্যাপনা-কার্য্য-সম্পাদনের জন্ত পনর-শত দশজন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর দশজন পঞ্চাশত-বিধ সূত্র-গ্রন্থে ও শাস্ত্র-গ্রন্থে অভিজ্ঞ ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল পাঁচশত; তাঁহারা ত্রিশবিধ সূত্রগ্রন্থে ও শাস্ত্র গ্রন্থে সুপণ্ডিত ছিলেন; এবং তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকও এক সহস্র জন ছিলেন; ইঁহারাও ত্রিশবিধ সূত্রগ্রন্থে ও শাস্ত্রগ্রন্থে পারদর্শী ছিলেন। অধ্যাপক ধর্ম্মপালের লোকান্তর-গমনের পর শীলভদ্র সকল শাস্ত্র ও সূত্র গ্রন্থে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া অধ্যক্ষের পদে বরিত হন্। শীলভদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন; পরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করায় "দণ্ডদেব" নামে পরিচিত হন। তিনি জাতিতে বাঙ্গালী ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর তিনি নালন্দা বিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত থাকেন। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন্থসাং নালন্দায় প্রধান অধ্যক্ষ শীলভদ্রের বৌদ্ধ দর্শন-শাস্ত্রে অশেষ পাণ্ডিত্য দর্শনে ও তাঁহার অসাধারণ প্রজ্ঞায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তথায় পাচ বৎসর কাল থাকিয়া

যোগ অভিধর্ম্ম, হেতু বিদ্যা, শব্দ বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শীলভদ্র ভিন্ন ভারতের আরও পঞ্চাশ জন কৃতবিদ্য সন্তান বিভিন্ন সময়ে নালন্দার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যক্ষের পদ সমলঙ্কৃত করিয়া যশঃ-প্রভায় দিগ্‌দিগন্ত প্রভাম্বিত করিয়াছিলেন। মাধ্যমিক দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভাবন-কর্ত্তা নাগার্জ্জুন, সাংখ্য দর্শনের ' তর্ক-যুক্তি-খণ্ডন-কর্ত্তা সুবিখ্যাত গুণমতি, অধ্যক্ষ প্রভামিত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যক্ষের পদ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। প্রভামিত্র বাঙ্গালী ছিলেন এবং তিনি চীনদেশে ধর্ম্ম-চক্র পরিবর্ত্তন করিয়া অদ্যাপি দেবতার মত পূজিত হইতেছেন। নালন্দার অধ্যাপক-বর্গের মধ্যে জিনমিত্র, শীঘ্রবুদ্ধ, চন্দ্রপাল, জ্ঞানচন্দ্র, স্থিরমতি, প্রভাকর, ধর্ম্মপাল ভদ্রসেন, প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিহারে ৮টী প্রশস্ত কক্ষ এবং ৩০০ শত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল। ইহারই একটি বড় প্রকোষ্ঠের মধ্যে রত্ন-দধি নামক এক বৃহৎ গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল; হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়েরই যাবতীয় পুস্তক এই পুস্তকালয়ে রক্ষিত ছিল। জনপ্রবাদ এই যে অষ্টম শতাব্দীতে সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক তৈর্থিক সন্ন্যাসীগণ দ্বারা এই পুস্তকাগার ভস্মীভূত হয়। আমার মনে হয় যে বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধ বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে যেরূপ কঠোর নিয়মাবলী ছিল, তাহাতে এরূপ দুর্ঘটনা কদাপি সাধুদিগের দ্বারা সম্ভাবিত হইতে পারে না।

বক্তিয়ার খিলিজির যবন-বিজয়ের সময় যেমন মগধ প্রদেশ—তথা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের যাবতীয় বৌদ্ধ কীর্ত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং মহারাজ শশাঙ্কের রাজ্যকালে যেমন একদিনে ৮৪ সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণ বিনষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ এই প্রদেশের বৌদ্ধ মঠ, বিহার, সংগ্রাম, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি যাবতায় বৌদ্ধ কীর্ত্তি ও বৌদ্ধগণ ধ্বংস-প্রাপ্ত ও বিনষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয়। নালন্দা, তক্ষশীলা, ব্রহ্মশিবপুর, গুণমতি, শীলাভদ্র, প্রবরাশ্রম, মৃগদার, রমণক প্রভৃতি বৌদ্ধ যুগের বিশেষ আদর ও গৌরবের কীর্ত্তি-সমূহ এই সময় বিজয়ী মুসলমানদিগের দ্বারা প্রনষ্ট হয়। ইহা কেবল বৌদ্ধ দুর্ভাগ্য নহে; নিরপেক্ষভাবে বলিতে হইলে বলিব, এই দুর্ঘটনা সমগ্র সভ্য জগতের পক্ষেই একটা দুর্ভাগ্য।

ভারতে জ্ঞান ও শিল্প-চর্চ্চার ধারা বৌদ্ধ যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া সেকালের সভ্য জগৎকে অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। এই ধারা নির্ণয় করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে সুদূর বৈদিক যুগের দিকে অগ্রসর হইতে হয়; এবং কালের যবনিকা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিতে হয়, জ্ঞানোদ্দীপ্ত প্রাচীন ঋষিগণ কিভাবে তখন জীবন যাপন করিতেন। সুত্তনিপাতের ব্রাহ্মণ ধম্মিক সুত্ত, মহাভারত, কাদম্বরী, শ্রীমদ্ভাগবৎ দশমস্কন্ধ, রামায়ণ, অমরকোষ প্রভৃতি বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠ করিলে আমরা প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-চর্চ্চার আভাষ পাইয়া থাকি। ঐকালে এদেশে দুই শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন, তাপসগণ কোনও এক নির্জ্জন বনপ্রদেশে আশ্রম স্থাপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য

পালন, তত্ত্বানুশীলন ও ফলমূলাহারে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাদের যে কয়েকজন শিষ্য থাকিতেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য এবং শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। শিষ্যগণকে ঋষিকুমার নামে অভিহিত করা হইত। তাপসগণ শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু উভয়ের কার্য্যই সমাধা করিতেন। শিষ্যগণের নিকট হইতে গুরু পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিতেন না; তিনিই বরং শিষ্যগণকে "খোরাক-পোষাক" দিয়া ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন করিতেন; শিষ্যগণ বন হইতে কাষ্ঠ-সংগ্রহ, গোচারণ, ক্ষেত্রকর্ষণ, কৃষিকার্য্য, এবং হল-চালন প্রভৃতি কার্য্য করিতেন। ফল কথা, গুরু আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন এবং শিষ্যগণ শিক্ষা এবং ভরণ-পোষণের বিনিময়ে কায়িক পরিশ্রমে গুরুকে তুষ্ট করিতেন। পালি গ্রন্থ তিত্তিরিয় জাতকে প্রাচীন বিদ্যালয়ের আমরা সুন্দর বর্ণনা পাই।

পরিব্রাজকগণ বর্ষার তিন মাস ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে পর্য্যটন করিতেন এবং যে-যে-স্থানে যাইতেন, তথাকার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের তাপস ও পণ্ডিতগণকে দার্শনিক তর্ক-সমরে আহ্বান করিতেন। তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে পান্থশালা (মন্থাগার) ও উদ্যান-বাটিকা নিরক্ষিত ছিল। পরিব্রাজকগণ আববাহিত থাকিতেন। স্থানে স্থানে আমরা পরিব্রাজিকারও উল্লেখ দেখিতে পাই।

তাপসেরাও অনেক সময় পরিব্রাজক-বৃত্তি অবলম্বন করিতেন। তৎপক্ষে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছিল না।

বুদ্ধদেবের সময়ে ভারতবর্ষে অনেকগুলি ধর্ম্ম ও শিক্ষা-সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে মুণ্ড সাধক, জটিলক, মগণ্ডিত, তেদণ্ডিক, অবিরুদ্ধক, গোতমক, দেবধম্মিক, নিগন্থ, আজীবক প্রভৃতি কতিপয় নাম অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে জটিলক ভিন্ন অপর সকলে ভিক্ষু-নামে অভিহিত হইতেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ "সাক্য পুত্তিয় সমন" নামে পরিচিত ছিলেন।

অতঃপর আমি দন্তশীরপুরের কথা বলিব। আমার গয়ার ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় জানেন, যে এই মঠ গয়া হইতে উনিশ মাইল পশ্চিমে ডুমরা নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল। বাথানী নামক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে মহা গো ও পশুবাথান অবস্থিত ছিল। এইখানে গো-বাথান, গো-হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, ও মঠ অতীত বৌদ্ধযুগে অবস্থিত ছিল এবং তাহাতে ছাত্রগণ নানারূপ চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। মুসলমান-বিজয়ের সময় এই মঠ এককালীন ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার মাল-মসলা ও উপকরণাদি লইয়া নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর ঘাট বাঁধান, মসজিদ ও হিন্দুদেবালয়াদি নির্ম্মাণ হয়। গ্রাম্য হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীগণই এগুলি সংগ্রহ করিয়া ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে। কামন্দকী ও কৌটিল্যের প্রদর্শিত বিধিতে এইস্থানে গো-পালন ও গো-পরিচর্য্যা এবং পরিরক্ষণ সম্পাদিত হইত-তাহা আমরা স্থানীয় জনশ্রুতিতেও অবগত হই। বাথানীর গড় সেই প্রাচীন বৌদ্ধ সংঘারামের ভগ্ন স্তূপের শেষ চিহ্ন—ইহা

আমরা স্থানটি পারদর্শন করিলেই জানিতে পারি। গোতমক, আজীবক এবং নিগন্থ মতাবলম্বী ছাত্রগণ এইস্থানে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, কি বিধিতে এইখানে ঐ-সকল ভিক্ষু ও ভ্রমণশীল পাঠক চিকিৎসা-শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন? কলা-বিস্তা শিল্প-বিদ্যা ও আয়ুর্বিস্তা শিক্ষার এখানে বেশ উত্তম ব্যবস্থা ছিল। দন্তশীরপুর বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণবের তীর্থস্থানে পরিণত। এ বিষয়ে মল্লিখিত গয়ার ইতিহাসে দন্তশীরপুর পর্য্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। এইখানে তথাগত শাক্যসিংহ বাস করিয়া স্বীয় নির্ম্মল ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং চৈতন্য মহাপ্রভুও এইখান হইতেই প্রথম বার ৺কাশীর পথ হইতে বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাই ইহা উভয় সম্প্রদায়ের নিকটই মহাপুণ্যময় স্থান। এই স্থানের প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার আশু কর্ত্তব্য। হিন্দু ও বৌদ্ধমতাবলম্বীগণ এই সৎকার্য্যে মন দিন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

চরক, সুশ্রুত, বাগভটাদি গ্রন্থ ও নকুলভেড়, কৃষ্ণ, মতঙ্গ, পালকাপ্য, হনুমন্ত, সহদেব, ভৃগু, বশিষ্ঠাদি ঋষির গো-বিষয়ক গ্রন্থ হইতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট অধ্যায়ের শিক্ষার এইখানে ব্যবস্থা ছিল। মল্লিখিত গোপাল-বান্ধব পুস্তকে তাহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

কাজরী

১০

পরের দিন, বেলা তখন ঠিক ন'টা—এক চিঠি পেলুম। চিঠিতে অনেকখানি আকুল আবেগ ঢালা;—তার উপর আমার দেবী বানিয়ে স্বর্গে সিংহাসন পেতে বসিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি,—আরো আছে, আমি নাকি বিজয়িনী সম্রাজ্ঞী,—একটা দুরন্ত হৃদয়-রাজ্য একেবারে মুষ্টিগত করেছি, এমনি আমার প্রতাপ! ছি-ছি, দেখ দেখি, এমন পাগলও মানুষ হয়! তারপর লেখা আছে—"কাল বাড়ীতে সবাই কিন্তু সন্দেহ করেছিল যে, আমি তোমাদের ওখানেই গেছলুম। কলেজ থেকে তিন-চারটি বন্ধু এসেছিল, আমার খোঁজে—কলেজ যাইনি কেন—কেমন আছি, তাই জানবার জন্তে! হঠাৎ তাঁদের এ রাক্ষুসে মায়া কেন যে উথলে উঠল, তা বুঝি না। এমন ত কত দিন হয়েছে, কলেজ যাইনি! কৈ, কবে আবার তাঁরা এসে আমার তল্লাস নিয়েছেন! তাও আবার এসে খোঁজ নেওয়া হয়েছে, খোদ কি না দাদার কাছে। দাদা উপরে এসে বৌদিকে জিজ্ঞেস করেছিল, সে কলেজ যায় নি কেন? তার কি কোন অসুখ করেছে? কোথায় সে? বৌদি বলে, অসুখ করবে কি রকম! সে ত কলেজ যাচ্ছি বলেই বেরিয়েছে। তা শুনে দাদা নাকি বলেছিল, তবে সে

শ্বশুরবাড়ী গেছে! অবশ্য, দাদা আমায় এ-বিষয় নিয়ে নিজে কোন কথা বলেনি—বলেছে বৌদি! বৌদি বললে,—ভাই, এ-সব চুরির কাজে একটা মন্ত্রী রাখা ভালো! সবাই এ পথের পথিক ত! কাজেই এ চুরি ভারী সহজে ধরা পড়ে যায়! শুনে আমার এমনি লজ্জা করছিল—আমি কিন্তু কিছুতেই কবুল করিনি। আমি বলেছি, কলেজে একবার ঢুকে হাজ্‌রের ব্যবস্থা করে একজন বন্ধুর সঙ্গে আলিপুরের 'জু'তে গেছলুম। অনেকদিন যাইনি কি না। শুনলুম, একটা নতুন হিপোপটেমস্ না কি এসেছে—তাই দেখতে গেছলুম। বৌদির ভাব দেখে মনে হল না অবশ্য, যে, জু দেখতে যাবার কথাটা বৌদি বিশ্বাস করেছে। নৈলে আমায় যখন-তখন যা-তা জেরা চালাবে কেন! যাই হোক্, তোমাদের ওখান থেকেও কথাটা যেন ফাঁস্ না হয়,—দেখো। এখন তিন-চার দিন যে আর ওদিক মাড়াতে পারবো, এমন মনে হয় না! যেতে রোজই ইচ্ছে হবে, জানি, কিন্তু কি করব? চিঠি লিখেই মনের ক্ষোভ মেটাতে হবে।"

তারপর রোজই চিঠি আসছে। বেলা চারটেয় চিঠি পাই। তিনটে বাজলেই আমার মন চিঠির জন্ত কি-রকম যে অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে। পেলে কতখানি আহ্লাদ হয়! মনে হয়,

"না জানি কারে দেখিয়াছি, দেখেছি কার মুখ
সকালে আজ পেয়েছি তার চিঠি—
পেয়েছি এই সুখে আছি, পেয়েছি এই সুখ,
কারেও আমি দেখাবনা'ক সেটি।"

আহা, কি কথাই কবি লিখে গেছেন! ঠিক কি মনের সঙ্গে খাপ খায়! ভারী আশ্চর্য্যি কিন্তু।

নাঃ,—অবস্থা বেশ হয়েছে। সমস্ত দিন আর রাত্রিটাকে ভাগ করলে দেখি, কাজ শুধু দুটি—এক, রাত্রে চিঠি লেখা—আর, বিকেলে চিঠি পাওয়া। ভোর থেকে বেলা চারটে অবধি ঐ ঘড়ির চারটের কাঁটার উপর নজর রেখেই কাটে! এই সারা সময়টা—চিঠি রে চিঠি! মনে যেন ঝড় বইতে থাকে। আজ আবার কি কথাটি বয়ে আনছে—কি সোহাগ—কি আদর। এ পৃথিবীতে ঐ চিঠিটুকু পাওয়ায় যে সুখ, তা আর-কিছুতে আছে কি!

... ...

বেলা এগারোটা—খেয়ে-দেয়ে খাটের উপর একখানা বই নিয়ে পড়েছি। বইখানা খালি লোকের নজরকে আড়াল করবার জন্ত। পাতাই উল্টে যাই—পাতায় কি আছে, তার এক বর্ণও চোখে পড়ে না! হঠাৎ বাবা এসে বললে, "কিরে বুড়ী, বই পড়ছিস?"

আমি বইটা মুড়ে উঠে বসে বললুম, "কেন বাবা?"

বাবা বললে, "আমার একটা কাজ করবি মা? ঐ আলমারির বইগুলোতে উই ধরেছে। দু' দু'খানা দামী বই কেটে একেবারে তচ্‌নচ্ করে দেছে। তুই মা, দুখ একটা চাকরকে নিয়ে সব বইগুলো ঝেড়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলিয়ে রাখাতে পারিস, দেখ্ দেখি! এ কাজ করে দিলে খুব ভাল প্রাইজ দেবো, কিন্তু।"

বাবা কখনো শুধু-শুধু খাটায় না! বাবার কোন-কিছু কাজ করে দিলে লাভ চির-দিনই হয়! আমি বললুম, "কি প্রাইজ, বাবা?"

বাবা বললে, "কাল তাহলে বায়োস্কোপ দেখতে নিয়ে যাব—সে মিজারেবল্ হবে।"

আমি বললুম, "ঠিক—নিয়ে যাবে ত? দেখো, কথার যেন নড়চড় না হয়। শেষ যেন বলো না, ঐ যা মা,—ভুল হয়ে গেছে—সিট্ রিজার্ভ করা হয় নি ত!"

"নারে পাগলী, না" বলে বাবা বেরিয়ে গেল।

আমি রামদীনকে ডেকে বইয়ের বোঝা নিয়ে পড়লুম। ভারী উৎসাহ লেগে গেল! এ কি ঐ মেড়ো রামদীনটার কাজ! সে হতভাগা কয়লার ঝাঁকার মতই বইগুলো মাথায় তোলে, আর রোদ্দুরে মাদুরের উপর দুড়্ দাড়্ করে ঢেলে দেয়। আমার প্রাণটা রী-রী করে ওঠে! উঃ, এ যে কত যত্নের ধন রে, তা তুই কি বুঝবি - মানুষের কত সুখ দুঃখের কথায় ভরপুর, কত আনন্দ, কত বেদনা ওতে মাখানো আছে! একটা বই দুম করে পড়ে গেল, তার পাতাগুলো অমনি ফ্যার্ ফ্যার্ করে খুলে গেল। আমার বুকে একটা ধাক্কা লাগল। মনে হল, যেন একটা জ্যান্ত মানুষকে ধরে সে আছাড় দিলে! বকে রামদীনকে একখানি একখানি করে বই বয়ে ছাতে নিয়ে যেতে বললুম—তারপর নিজের হাতে আলমারি ঝাড়তে সুরু করলুম, নিজের হাতে, তকতকে করে! একটা সেলফে উইয়ের দল একেবারে এমনি ঘন করে মাটির আলপনা এঁকে দিয়েছে—যে খুব জোরে কাগজ দিয়ে ঘষেও সে দাগ তোলা যায় না। শিশিতে আরক ছিল, তা বেশ করে লাগিয়ে পরে কড়া ব্রুশ দিয়ে মেজে সাফ করে খপরের কাগজ পেতে দিলুম। এইবার বই তোলবার পালা। রামদীন ঝাড়ন দিয়ে বইগুলো মুছে মুছে দিতে লাগল, আমি গুছিয়ে-সাজিয়ে তুলতে লাগলুম। ঘামে সেমিজ কাপড় সব ভিজে গেছে। কপাল দিয়ে টস্ টস্ করে ঘাম ঝরে পড়ছে। আঁচলে ঘাম মুছি, আর বই গুছোই। মাথার খোলা চুলগুলো খালি-খালি পিঠে মুখে ঝরে পড়ে। ভারী জ্বালাতন। ভিজে খোলা চুলগুলোকে সেই থিয়েটারের রাখাল-বালকদের মত চুড়ো করে বেঁধে নিলুম, আঁচলটা কোমরে বেশ করে জড়িয়ে বাঁধলুম। আর্শিতে ছায়া পড়েছিল, সেটা নজরে ঠেকল। বেশ দেখে হাসি পেলে। বাঃ, চমৎকার হয়েছে ত! মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠেছে, তার উপর এই গাছ-কোমর বাঁধা, মাথায় চুড়ো-আঁটা মূর্ত্তি,—ঠিক যেন সেই ছবির রাইরাজা! হেসে ভাবলুম, এই সময় এক-জন যদি এসে পড়ত, এসে এই বেশ দেখত! বেশ হত—না? ঠিক এমনি সময়ে নীচে কাতীর গলা হেঁকে উঠল, "ওগো মাগো, জামাই বাবু এসেছে গো।" আমি হাতে ধরে ছিলুম একখানা মোটা ইতিহাসের বই। কাতীর চীৎকারে চমকে উঠলুম। অমনি বইখানাও দড়াম করে আমার পায়ের উপর পড়ে গেল। 'উঃ' বলে বসে পড়লুম। রামদীন ছুটে এসে বললে, "জল দি দিদিমণি?"

"সরে যা লক্ষ্মীছাড়া" বলে তাকে ধমক দিলুম। রামদীন অবাক! সেবা দিতে গিয়ে এ রকম ধমক খাওয়া, সে বোধ হয় জীবনে কখনো খায় নি,—তার মুখের ভঙ্গী দেখে এমনি মনে হল! হাসিও পেলে! কিন্তু হাসলুম না। পায়ের চেটোটা দু'হাতে চেপে ধরে বসে রইলুম, কাণ খাড়া করে—নীচে থেকে কোন খপর পাওয়া যায় কি না! মাথার শির থেকে পায়ের আঙুল অবধি তখন ঝন্‌-ঝন্‌ করছিল—তাতে ভ্রূক্ষেপও করিনি।

একটু পরেই সিঁড়ি বয়ে পায়ে দুপ্‌ দুপ্‌ আওয়াজ, আর মুখে বিরাট হাসি নিয়ে কাতী এসে হাজির!—"ওগো, শীপ্‌গিরি নেমে এস গো ছোট্ট দিদিমণি—জামাইবাবু এসেছে।"

ভেংচে তাকে এক ধমক দিলুম, "জামাই বাবু এসেছে! তা আমি কি করব, শুনি? দুই বাহু তুলে নাচব! মরচি একে নিজের পায়ের জালায়, উনি এলেন, ঢং করতে—"

"আহা হা, কি হয়েছে গা? পা মচ্‌কে গেছে না কি! একটু তেল মালিশ করে দি, এসো ত" বলে হাতদুটো বাড়িয়ে সে এগিয়ে এল। "যা, যা, তোকে আর সোহাগ করতে হবে না" বলে আবার আমি ঝঙ্কার তুললুম।

"কথা দেখ না—" বলে কাতী মুখে প্রকাণ্ড হাঁ নিয়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল! আমি উঠে দাঁড়িয়ে একটা বই নিয়ে রামদীনকে বললুম, "রামদীন, এ কি বই ঝাড়া হচ্ছে! চোখ নেই? এ কি এ! এ ধুলো কে ঝাড়বে? না পারিস্‌, যা—আমি একলাই সব করব'খন। ঢের গতর আমার আছে!"

রামদীন অপ্রতিভ হয়ে—"না, না দিদি-মণি, দিচ্ছি, আমি ঠিক করে দিচ্ছি—কাতীটা চেঁচিয়ে উঠলো কি না, তাই—"বলে বইটা হাতে তুলে নিলে।

কাতী বললে, "মা বললে, বাপু, তোমার নেমে আসতে। তাই বলতে এনু। এখন তোমার যা খুসি, কর। কে বাবা বকে গাল খাবে, বল! এই রোদে কোথা জামাই বাবু তেতে-পুড়ে এল তোমার জন্যে—"

"দেখ্‌, মার খাবি, বলছি। সরে যা—আমি এখন যেতে পারব না—" কাতী চলে গেল। পাঁচ মিনিট পরে মা এল। মা বললে, "এ কি, বইয়ের পাহাড় নিয়ে পড়েছিস যে, এঁ্যা! ওঠ্‌, ওঠ তুই—রামদীন সব ঠিক করে রাখবে'খন। তুই এখন আয়। মুখ-টুখ বেশ করে ধুয়ে ও-ঘরে যা। যে ধুলো মেখেছিস্‌—মাগো, মূর্ত্তি হয়েছে দেখ না—যেন রণচণ্ডী!"

আমি বললুম, "আমি এ-সব বই না তুলে যেতে পারব না।"

মা বললে, "জামাই চুপ করে বসে থাকবে? উনি শুদ্ধ বাড়ী নেই—কথা কবে কে বসে? আয়, আয়।"

আমি কোন কথা না বলে বই নিয়ে আবার মত্ত হলুম। মা বললে, "শীগ্‌গির, শীগ্‌গির নে—রামদীনকে দিয়ে ধুলো ঝাড়িয়ে তুলে রাখ্‌, আজকের মত। কাল তখন ভালো করে গুছোস্‌—"

আমি বললুম, "আমি অমন যা-তা আধা-খাঁচড়া করে কাজ সারতে পারি না বাপু।" মা দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল।

মা চলে গেল? আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে

উঠল। সত্যিই চলে গেল যে! বাঃ,—যাক্ চলে! আমি ত যাব না, কক্খনো যাব না। কেন, আর দু-বার মা বুঝি জোর করে বলতে পারত না? বেশ বাপু, তোমাদের জামাই ত, তোমরা নিয়ে খাওয়াওগে, দাওয়াওগে, আহ্বান করগে। আমার ভারী বয়ে গেছে যরে যেতে!

কিন্তু বই-ই কি আর এর পর গুছোতে ভালো লাগে? মন যেন জলছে! আর এই রামদীনটাও হয়েছে তেমনি! জড়ভরত! একখানি একখানি করে বই আনা হচ্ছে, দেখ না,—ছাদে নিয়ে যাবার সময় ত বেশ ঝোড়া ভর্ত্তি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল--আর তোলবার বেলা বইগুলো পাথরের মত ভারী হয়ে উঠল! হতভাগা! ওকে নিয়ে আর পারা যায় না। আসুক বাবা, ওটাকে দূর করে দেব।

কাতী আবার এসে হাজির। "বকো না, মেয়োনা গোঁ দিদিমণি—জামাই বাবুর জল খাওয়া হয়ে গেছে, মা বললে, তুমি এসো। লক্ষ্মীটি, এসো, আমি তোমার বই ঝেড়ে মুছে রাখচি। আর ঐ যণ্ডা রামদীনটা রয়েছে, ও পারবে না? এসো—"

আমি ধমক দিলুম, "আবার এসেছিস্ পোড়ারমুখী? বেরো বলছি।"

"বাবাগো, থেতে বললে মারতে আসে!" কাতী চলে গেল।

আর পারা যায় না! হাতদুটো সত্যিই ভেরে গেছে, ব্যথাও হয়েছে! যে ভারী বই! রামদীনকে ডেকে বললুম, "তুই সব বইগুলো এনে আলমারির কাছে জড়ো করে রাখ্,—মা ডাক্‌চে, আমি শুনে আসি। এসে সব আমি তুলব'খন—" বলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলুম। ভিজে গামছা দিয়ে মুখটা গাটা মুছে নিয়ে একখানা লালরঙের শাড়ী পরে দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছি—বারাণ্ডাটা ঘুরে ও-ঘরে যাব—এমন সময় শুনলুম, মা বলছে, "আর একটু বসো না বাবা—এই রোদ্দুরে—"

ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ এল,—কি গম্ভীর আওয়াজ—"না—আমার বড্ড তাড়া আছে। একটি লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সে আবার এই সন্ধ্যার ট্রেণে কল্‌কেতা থেকে চলে যাচ্ছে—" কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দোরের সামনে মূর্ত্তি ছুটে এল—নিমেষের জন্ত চোখে চোখ মিল্‌ল—কি ঝাঁজ! উঃ,—এ কি সেই চোখ! আমি যেন পাথরের মত নিশ্চল নিথর হয়ে পড়লুম—তারপর ঠিক বিদ্যুতের মতই সাঁ করে আমার আঁকা-চোখের সামনে দিয়ে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হল!

সঙ্গে সঙ্গে আমার নিথর শরীরটাকে সে যেন জোরে নাড়া দিয়ে গেল। পায়ের তলায় চৌকাঠটা অবধি কেঁপে উঠল! প্রথমটা অবাক হয়ে গেলুম—তখনই আবার কে যেন আমার টুঁটিটা জোরে টিপে ধরেছে, মনে হল। দম বন্ধ হবার জো! এ-কি রাগ, না দুঃখ, না, কি এ! চোখে জল এল। ঘরে ফিরে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লুম। এত এ—একটু দেরী হয়েছে বলে এমনিভাবে চলে যাওয়া হল! মার সামনে, ঝী-চাকরদের সামনে, এমনিভাবে অপমান করা! কেন, কেন, কেন? কি করেছি আমি? সমস্ত মনটাতে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিলে—দাউ দাউ করে ভিতরটা জলে উঠল। কেবলি

মনে হতে লাগল, চলে গেল! চলে গেল! আমি ঘরে যাচ্ছি—এ দেখেও চলে গেল! বেশ,—যাও চলে! আমারও কি—

মা বললে, "হ্যাঁরে, সন্ধ্যে হয়ে গেল যে, খাবিনে কিছু?"

"না মা, আমার বড্ড মাথা ধরেছে।"

"ধরবে না! বইয়ের গোছা নিয়ে ঐ রোদ্দুরে বসে থাকো! এঁরও যেমন—চাকররা পারত না? নে, উঠে আয়, দেখি একটু কিছু খা—কিছু খেলেই মাথা-ধরা ছেড়ে যাবে।"

মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আঃ—মার হাতদুটো চেপে ধরলুম—কেমন ঠাণ্ডা হাতদুটি! একটা বড় রকমের নিশ্বাস কিছুতেই চেপে রাখতে পারলুম না! আহা মাগো, জননী আমার গো, ভুল, ভুল করেছিলুম! বর—সে ত পর! তার স্বার্থে একটু ঘা লাগলেই সে জলে ওঠে, মিনি-দোষেই রাগ করে, ব্যথা দেয়! আর তুমি, মা,—মাগো, তোমার ওই অমল নির্ম্মল স্বার্থ-লেশহীন অগাধ ভালবাসার পাশে বরের ভালবাসা, বরের সোহাগ! এই বর নিয়ে আমি মেতে উঠেছিলুম—কারো পানে ফিরে তাকাইনি! আমি পাগল হয়েছিলুম! চাইনে আমি বর, তোমার কোলটিতে মা, মাথা গুঁজে থাকতে পেলেই আমার কোন কষ্ট, কোন অভাব থাকবে না!

মা বললে, "সন্ধ্যা হলেই খানকতক গরম গরম লুচি খেয়ে শুয়ে পড়্—ছাদেই না হয় শুস্—"

তাই হল। সন্ধ্যার সময় কিছু খেয়ে ছাদে একখান পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। বেশ ফুর ফুর করে হাওয়া বইছিল, মাথার উপর নীল আকাশ—রাশ রাশ নক্ষত্রে ভরে গেছে। কোথাও এতটুকু মেঘের লেশ নেই—আকাশের সেই এক-কোণে বোসেদের বাড়ীর পিছনের বাগানে যে বড়-বড় নারকোল গাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তারি ঠিক গা ঘেঁসে এতটুকু কালি চাঁদ কঙ্কাবতীর বইয়ের চাঁদাবুড়ীর ছবির মত উঁকি দিচ্ছে! বেশ লাগল। কিন্তু তখনই বুকের উপর বিকেল বেলাকার সেই নিষ্ঠুর অপমানটা পাথরের মত চেপে বসল। সন্ধ্যার এই মাধুর্য্যকে সে যেন আগোগোড়া ছুঁচের মত সরু ডগায় বিঁধে বিঁধে দিয়ে গেল, আর সেই চেরা রেখায় দগ্ দগ্ করে ফুটে উঠল, রক্ত, শুধু রক্ত! আমার সমস্ত মন সেই যে আচম্কা ঘা খেয়েছিল, সে জায়গাটা কৈ, সারেনি ত—অসহ্য ব্যথায় এখনো খুব টন্ টন্ করে যে।

আকাশের পানে চোখ মেলে পড়ে আছি, পড়েই আছি—নীচে থেকে ছেলেমেয়েদের হাসিকান্নার এক-একটা ঝাপটা এসে মনটাকে দোলা দিয়ে যায়, আবার মন যে-কে-সেই,—বিদ্রোহে ফুঁসে ফুঁসে ওঠে! এ যে কিছুতেই ভুলতে পারি না গো—কিসের জ্বালা এ!

হঠাৎ ছাদের কোণে আল্‌সের উপর একটা আলোর রেখা এসে পড়ল—রেখাটা ক্রমেই নড়তে লাগল। আমি সেই দিকে চেয়ে রইলুম। ঠিক যেমন করে জোয়ারের জল আস্তে আস্তে এসে তীরটুকুকে ছেয়ে গ্রাস করে ফেলে, তেমনি করেই আলোর রেখাটা ছাদের কোণের সেই পুঞ্জিত আঁধারকে হটিয়ে ছেয়ে ফেড়ে

উঠতে লাগল। সিঁড়ি দিয়ে কে উপরে আসচে। ঠিক! রামদীন। একটা হারিকেন হাতে সে এসে ডাকলে, "চিঠি—"

আমি চম্‌কে উঠলুম। চিঠি! ও, বেলা চারটের চিঠিখানা এসেছিল—এখন তা দেবার ফুর্‌সুৎ হল! আমি বললুম, "এতক্ষণ দিস্‌নে কেন?" রামদীন বললে, "এই আখন ত দিলুম দিদি, ডাকে-আলা দিয়ে গেল।"

কিন্তু—এ ত চৌকো খাম নয়—দু'পয়সার টিকিটওলা-খামে মোড়া—কার চিঠি? হাতে নিয়ে দেখি, উপরের ঠিকানাটা পেন্সিলে লেখা—এরই হাতের! এ কি রকম চিঠি?

রামদীনকে আলোটা রেখে চলে যেতে বললুম। হাসি পেলে! এই যে সাত-তাড়া-তাড়ি চলে যাওয়া হল, এই ত তারই কৈফিয়ৎ এখনি দেওয়া হয়েছে! যে কৈফিয়ৎই হোক্, আমি শুনচি না, কখনো না! রামদীনকে জিজ্ঞাসা করলুম, "মা কি করছে রে?"

"নীচে খেতে গেছেন।"

"বাবা?"

"বাইরে দু'জন বাবু এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা কচ্ছেন।"

"ক'টা বেজেছে রে?"

"সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।"

"যা তুই।"

রামদীন চলে গেল—লণ্ঠনটা রেখে আমি খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করলুম—পেন্সিলে লেখা, এ কি অক্ষর! কি লেখা এ—

"অণিমাসুন্দরী,

বেশ! চমৎকার! সুন্দর! সুখে থাকো, সুন্দরী অণিমা, সুখে থাকো। নিজের যৌবন-গর্ব্বে দর্পিতা পাষাণ-সুন্দরী, কোথায়, পথে কোন্ অভাগা নিজের মনের দুঃখে মরিয়া পচিয়া যায়, সেদিকে চাহিয়াও দেখিয়ো না। তুমি নিজে সুখে থাকো, তোমার সুখের কোথাও যেন কাহারো বেদনার দীর্ঘনিশ্বাসের ছায়াপাত না হয়!

আজ আমার চোখ ফুটিয়াছে। আর নয়!

অণিমা, তোমায় চিঠি লিখিয়া তোমার অমূল্য অবকাশে অবৈধ প্রবেশ করিয়াছি, সেজন্য আমায় ক্ষমা কর। তোমার সঙ্গে সময়ে-অসময়ে দেখা করিতে গিয়া তোমায় বিরক্ত লজ্জিত অপমানিত করিয়াছি, সেজন্য ক্ষমা কর। তখন মনের আবেগে অন্যরূপ বুঝিয়াছিলাম, তাই গিয়াছিলাম—আর যাইব না, ভুলিয়াও এ দোষ আর করিব না—না বুঝিয়া যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য ক্ষমা কর।

তুমি কি ভাবিয়াছ, আমি পথের কাঙ্গালের মত তোমার প্রেম ভিক্ষা করিব, আর তুমি রূপ যৌবনের গর্ব্বে গরবিনী রাজ-অধীশ্বরী হইয়া দম্ভের সিংহাসনে মাথা উঁচু করিয়া বসিয়া থাকিবে? না—যত দুর্ব্বল-চিত্তই আমি হই না কেন, ভিখারী হইতে পারিব না।

আজ মনের বড় আবেগ লইয়া বড় আগ্রহে বড় সাধে বড় আশায় তোমার দ্বারে গিয়াছিলাম, দেড়ঘণ্টা আমায় বসাইয়া রাখিলে, তবু একবার দেখা দিবার অবসর হইল না? তুমি কি ভাবো, তোমাদের বাড়ী দুইটা মিঠাই খাইবার লোভে আমি সেখানে ছুটিয়া-ছুটিয়া যাই? না সুন্দরী,—ভগবান এতদূর ক্ষুদ্র করিয়া আমায় সৃষ্টি গড়েন

নাই! মিষ্টান্নের লোভ আমার মোটেই নাই। মিষ্টান্ন এখানেও দুই-একটা মুখে দিতে পাই এবং দিয়াও থাকি।

যাক্, এ-সব কলহের কথা তুলিয়া ফল কি! তুমি যে এমন পাষাণী, তাহা কোন দিন ভাবি নাই। আজ আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, তোমায় মুক্তি দিলাম, মুক্তি দিলাম। আর কখনো তোমার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়াইব না। বিদায়—তোমার নিকট চির-বিদায়।

শেষ কথাটা না জানাইয়া যাইতে পারিলাম না। একটা কর্ত্তব্য আছে ত—তাহারই তাড়ায় শুধু আবার বিরক্ত করিলাম—রাগ হয়, এ চিঠি পড়িয়ো না, ছিঁড়িয়া টুকরা-টুকরা করিয়া আগুনে পোড়াইয়ো। না লিখিয়া পারিলাম না। কঠিন কর্ত্তব্য যে!

পোষ্টাপিসে আসিয়া একটুকরা কাগজ চাহিয়া লইয়া পেন্সিলে লিখিলাম—হয়ত পাড়তে চোখে বাধিবে—তাহা হইলে পড়িয়ো না। আমার জন্ত তুমি এতটুকু কষ্ট পাইবে, এমন আমার ইচ্ছা নয়। আমি কে? তোমার চক্ষুশূল, সুখের বালাই বৈ ত নই।

মনের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে, ওঃ, এ যে প্রলয়ের আগুন! চিঠিটা ডাকে দিয়া কোথাও ছুটিয়া পলাইবার ইচ্ছা হইতেছে—বাড়ী ফিরিবার আর ইচ্ছা নাই। ফিরিব না। কি আশায় ফিরিব, অণিমা—কোন্ সাধে? আমার কে আছে—কি আশা আছে? আমার মত হুর্ভাগার আশ্রয়ই বা কোথায়? নিজের স্ত্রী যার মুখের পানে তাকায় না, সে হতভাগার পানে কে-ই বা চাহিবে!

বিদায়, চির-বিদায়। তুমি নিষ্কণ্টকে পিত্রালয়ে বসিয়া সুখৈশ্বর্য্য ভোগ কর, আমি আর তোমার সুখে বিঘ্ন হইব না! বিদায়, বিদায়, আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আজ বিদায় দাও। ভাবিয়ো, সুনীল বলিয়া কেহ কোনদিন তোমার ছিল না—সে শুধু একটা দুঃস্বপ্ন, দুর্গ্রহ মাত্র, অভিশাপের মতই বুকে একদিন বাজিয়াছিল। আজ হইতে তুমি মুক্ত, স্বাধীন!

হতভাগ্য সুনীল।"

এ কি, আলো, আলো— ওগো, কোথায় আলো? আমার চোখের সামনে আকাশের সমস্ত আলো এক নিমেষে যে নিবে গেল! কোনমতে আমি কান্না চেপে রাখতে পারলুম না! তারপর,—তারপর—

মা এসে ডাকলে, "অণি, ও অণি—"

"কে?" বলে চোখ খুললুম।

মা বললে, "এখন সুনীলের চিঠি এল না ওটা? এই ত বিকেলে সে ছিল, তারপর ক'ঘণ্টা বাদেই হঠাৎ চিঠি এল যে,—তাও পেন্সিলে লেখা, পোষ্টাপিসের খাম। এ রকম খামে সে ত কখনো লেখে না,—ব্যাপার কি রে?" আমি মার বুকে মুখ লুকোলুম, চোখে জলও অমনি কোথা থেকে এসে জমল।

মা বললে, "কি লিখেছে?"

মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলুম না। ক্ষমতা নেই! মার হাতে চিঠিটা দিলুম—মা পড়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "আচ্ছা পাগল ছেলে ত! যাই, কাউকে পাঠাই, এখনি খবর নিয়ে আসুক,—বাড়ীতে ফিরল, না, কোথায় গেল—"

"না মা, তুমি বাবাকে বলোনা কিছু—"

"আচ্ছা রে আচ্ছা, আমি চুপি চুপিই লোক পাঠাচ্ছি—"

"তারা কেউ জানে না কিন্তু যে এখানে আসে।"

"তোকে আর শেখাতে হবে না আমায়। আমি ফন্দী করে লোক পাঠাচ্ছি—দ্যাখ্ না—"

"গাড়ী করে যাক্ সে—না হলে ঢের দেরী হবে।"

"তাই যাবে। এর জন্যে ভাবিস্‌নে—ভারী পাগল ছেলে কিন্তু বাপু, এমন করেও চিঠি লেখে—!"

"বাড়ীতে যদি না গিয়ে থাকে?"

"না, বাড়ী যাবে না ত কোথায় আবার যাবে? ও তোর উপর রাগ করে লিখেছে। দোষ ত তোরই বাছা, তোকে আমি অত করে বললুম, নেমে আয়, নেমে আয়, তা তুই বই নিয়ে বসে রইলি! মেয়েমানুষ, অমন গোঁ ধরতে নেই—মেয়েমানুষ অমনি মাটীতে নেতিয়ে থাকবে—বিশেষ স্বামীর কাছে।"

"তুমি কাউকে এখনি পাঠাও মা—আমার জার নামে বরং চিঠি লিখে দাও—বলে দাও, জবাব আনে যেন।"

... ...

ছাদেই শুয়ে রইলুম—আকাশ-পাতাল কত কি ভাবতে ভাবতে কখনো ঘুমিয়ে পড়ি, আবার নানান্ স্বপ্নের ঝড়ে সে ঘুমটুকু ভেঙ্গে যায়! হঠাৎ বাবার গলা পেলুম। বাবা বলছিল, "রামদীনকে হঠাৎ সুনীলের ওখানে পাঠিয়েছিলে কেন গা? রাত বারোটা বাজে—গাড়ী করে এখন এসে হাজির! ব্যাপার কি?"

মা বললে, "সুনীলের শরীরটা ভাল ছিল না,—এখানে এসেছিল, বেশীক্ষণ রইল না—যে দিন-কাল পড়েছে কেমন ভাবনা হচ্ছিল, তাই—"

বাবা বললে, "তা আমাকে বলনি কেন? আমি তাহলে নিজে গিয়ে দেখে আসতুম—একবার যাই, না হয়—"

মা বললে, "ও কিছু নয়, তুমি শোওগে। আচ্ছা পাগল ছেলে বাবু তোমার এই জামাইটি—! অনির সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছিল বুঝি, তাই ওকে ভয় দেখিয়ে গেছল—পুরুষ মানুষ, ও ছেলে-বুড়ো সব কি সমান!"

বাবা হেসে বললে, "থামো, থামো—তা কি খপর এল?"

মা বললে, "কি আবার! জামাইয়ের ভাজ লিখেছে, ঠাকুরপোর ত কিছু হয় নি, ভালই আছে,—সন্ধ্যা থেকে গান-বাজনা করে রাত দশটা বাজলে ঘরে গিয়ে বিছানায় ঢুকেছে—বেশ ঘুমুচ্ছে!"

"এ'ত বোঝাই যাচ্ছিল। তুমি আবার কেলেঙ্কারী করে লোক পাঠাতে গেলে কেন?"

"মেয়েটার ভাব দেখতে যদি—সে একেবারে কেঁদে অস্থির—"

"ছেলেমানুষ—"

আমি কাঠের মত পড়ে পড়ে কথাগুলো শুনলুম। মনে কি যে ভাব হল! বটে,—এমনি করে আমায় ভড়কানো! এমনি করে—কেন, আমি কি করেছি—কি—কি—

মা বললে, "কাল একবার সন্ধ্যার সময়

জামাইকে তুমি নিয়ে এসো। ওদের কি ঝগড়া-ঝাটী হয়েছে বোধ হয়!"

বাবা বললে, "লেখাপড়ার সময় রোজ রোজ আনা সবাই আবার পছন্দ করে না। শেষে তারা যদি বিরক্ত হয়?"

মা বললে, "তোমাদের এক কথা! রাত্রে এসে খেয়ে দেয়ে ঘুমোবে বৈ ত না—এতে আর পড়া কি মাটী হয়ে যাবে!"

"আচ্ছা গো আচ্ছা—" বলে বাবা গুড়গুড়িতে তামাক টানতে লাগলো। আমি নড়ন-চড়ন-রহিত হয়েই পড়ে রইলুম। নানান্ ভাবনা মনের মধ্যে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। আসবে কি? অত রাগ কি পড়বে? তা রাগ না হয় আমার উপরই হয়েছে -বাবা নিজে গেলে বাবার কথা কি ঠেলতে পারবে? না, বোধ হয়......

এলে আমি কি করব? মাপ চাইব? কথনো না। কেন, কি দোষ করেছি আমি? এলে আমি ত কথা কইব না—কিছুতেই না! আমারও কি রাগ হতে নেই? মনে করে, ওরই বুঝি এখানে এসে দেখা করে খুব আহ্লাদ হয়—আমার কিছু নয়!

... ...

রাত্রে মা নানা উপদেশ দিয়ে ঘরে পাঠালে—"খবরদার, রাগারাগি করিস্‌নে। যা বলবে, শুনিস্। স্বামীর কথা না শুনলে পাপ হয়—" এমনি কত কথা! শুনে হাসিও যেমন পাচ্ছিল, লজ্জাও তেমনি হচ্ছিল।

আমি বিছানায় একপাশে বালিশ আঁকড়ে পড়েছিলুম—কালকের চিঠিটার কথা মনে পড়ে ভারী কষ্ট হচ্ছিল। কেন অমন কড়া চিঠি লিখলে? এমন সময় এসে ডাকলে, "অনিরাণী—"

আমি জবাব দিলুম না। আবার ডাক, "অনিরাণী—তুমি রাগ করেছ?" বলেই আমার পিঠের উপর মাথা রেখে বললে, "লক্ষ্মীটি, রাগ করো না।" আমার চোখে জল এল।

বুঝতে পেরে আমার মুখখানা ঘুরিয়ে দুহাতে কোলের উপর তুলে নিয়ে বললে, "কাঁদছ—লক্ষ্মীমাণিক আমার, কেঁদো না।"

আমি বললুম, "কেন তুমি রাগ করেছিলে? কেন তুমি চলে গেলে? কেন তুমি অমন করে চিঠি লিখলে? হুঁ—"

সে বললে, "আমি কতখানি আশা করে কতখানি আগ্রহ নিয়ে এসেছিলুম, ভাবো দেখি। বসেই আছি, বসেই আছি, তুমি আর কিছুতেই আসছিলে না। আমার ভারী অভিমান হল—ভাবলুম, এই আকুলতা নিয়ে আমি অস্থির হয়ে রয়েছি- তার উপর, জানো, আমি এখানে লুকিয়ে আসি, অবসর আমার কত কম—এ জেনেও তুমি বেশ নিশ্চিন্ত আছ ত! ক্রমে মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল—দিগ্বিদিক জ্ঞান হারালুম- একেবারে উঠে দাঁড়ালুম। তোমার মা কত বললেন—কিন্তু তখন আর বসা চলে না। তারপর চৌকাঠে এসে দাঁড়াতেই দেখি, তুমি আসছ! দেখে বুকটা কেঁপে উঠল—তাইত, আর এক মিনিট যদি ধৈর্য্য ধরে থাকতুম! হায় হায়, কি করেছি—"

আমি হেসে বললুম, "আহা, দেখলে যদি ত আর একটু বসলে না কেন?"

সে বললে,—"তখন আর বসি কি করে

বল? তোমার মার কাছে বললুম, ভারী কাজ, একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে—সে ট্রেনে চড়ে বিদেশ যাচ্ছে। তারপর তোমায় দেখে ফিরে বসলে'পর কি মনে করতেন তিনি? তাই একদম বাড়ী ছেড়ে হুড়মুড় করে এসে ট্রামের রাস্তায় দাঁড়ালুম। মনের তখন এমনি অবস্থা যে রাগে একবার নিজের মাথাটাকে পাথরে ঠুকে ছেঁচে ফেল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে—আবার রাগ ধরচে, তোমাদের সকলের উপর, বিশেষ-করে তোমার উপর—আমার এমন সাধ-আশা ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে! সামনেই ছিল পোষ্টাপিস, ওদিকে ট্রামও আসছিল না, রোদ চন্‌চন্ করছে, মাথারও ঠিক ছিল না—পোষ্টাপিসে ঢুকে একখানা কাগজ আর একটা পেন্সিল চেয়ে নিলুম—সেটা একখানা বিজ্ঞাপনের কাগজ—তারই উল্টো পিঠে যা মনে এল লিখে ফেললুম—তারপর চিঠিটা ডাকে দিয়েই দেখি, ট্রাম এসে হাজির। ভাববার সময় ছিল না। ট্রামে উঠে পড়লুম, উঠে ভাবলুম, তাই ত, এ কি করলুম? প্রাণটা কেমন করে উঠল। চোখে জল এল। কিন্তু উপায় কি? হাতের পাশা পড়ে গেছে! সত্যি রাণী, সে চিঠি পড়ে তোমার ভারী কষ্ট হয়েছিল—না? বল।"

"অমনি করে চিঠি লিখে কাঁদাতে হয়!"

"তুমি কেঁদেছিলে?"

"না, কাঁদবে না—কি সব লিখেছিলে, বল দেখি,—বিদায়, চিরবিদায়। তোমায় যদি আমি ঐ-রকম সব কথা লিখি—হুঁ—? বল না, তাহলে কি কর? খুব ভাল লাগে,—না?"

"থাক্—যা হয়ে গেছে, তার ত আর চারা নেই রাণী। আমায় মাপ কর, আজ তোমার বাবা না গেলে, আমি নিজেই থিয়েটার দেখতে যাবার নাম করে বাড়ী থেকে সটান এখানে এসে হাজির হতুম। আমি তোমায় বড় ভালবাসি, অনুরাণী, তাই অত-খানি নৈরাশ্যে—"

"যাও, যাও—তুমি যা ভালবাস আমায়, তা বুঝেছি গো। মা সে চিঠি দেখে তখনি তোমাদের ওখানে লোক পাঠালে—সেই অত রাত্রে।"

"এ্যাঁ, তিনি সে চিঠি দেখেছেন নাকি?"

"দেখেছেন বৈ কি।"

"ছি—ছি—ছি—"

আমি হেসে বললুম, "কেমন হয়েছে,—আর কখনো লিখবে? কেমন জব্দ!"

"ওঃ—তাই বুঝি বৌদি বললে, কাল অনেক রাত্রে এখান থেকে লোক গেছল। সে নাকি বলেছিল,—এখানে এসেছিলুম—মা বলেছিলেন, এ-বাড়ীর খবরটা নিয়ে যাবার জন্যে—খুব চালাক ত তোমাদের সে লোকটি।"

"আমায় ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখে ভারী আরাম করে ঘুমুনো হচ্ছিল বাবুর, আর আমি এখানে কেঁদে মরি!' কেন, যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে গেলে না কেন?"

"যাবার পথে যে তুমি কাঁটা দিয়েছ, না হলে দেখতে—"

"দেখব বৈ কি। যাও না তুমি! আমি ককখনো তোমার সঙ্গে কথা কব না ত। ককখনো না! কাল অমন করে চলে যাওয়া হল, আমার বুঝি দুঃখ হয় না—?"

"আমার মাপ কর রাণী, লক্ষ্মীটি—"

"যাওঃ, ও কি কথা। আমার কাছে বুঝি মাপ চাইতে আছে তোমার? ও-সব কথা বললে আমার পাপ হয় যে—"

মুখের ঘোমটাটা সরে গেছল—জোর করে আমার মুখে চুমু খেতেই আমি ঝট্‌কা মেরে মুখ সরিয়ে নিলুম—"যাও—তুমি ভারী দুষ্টু—"

"এখন—সন্ধি হয়েছে ত?"

"হুঁ—আর কখনো যদি অমন রাগ কর, তাহলে দেখো দেখি, কি হয়—"

"কি হবে?"

"দেখো তখন—"

"লক্ষ্মীটি, বল না—কি করবে? কেরোসিন জেলে কাপড়ে লাগাবে না কি?"

"ধেৎ—! তা কেন?"

"তবে কি?"

"আমি কিছুছু খাব না, দাব না, দুবার তিনবার করে চান করব, মাথার চুল শুকোব না, ভিজে চুলে থেকে খুব অসুখ করব—তখন বেশ হবে, বেশ হবে—"

"না, না। লক্ষ্মীটি, ও-সব কিছু করো না তুমি। আমি আর কখ্‌খনো রাগ করব না তোমার উপর—দেখো—"

তার মুখের পানে চেয়ে চুপ করে শুয়ে রইলুম। মুখে চমৎকার জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল! সুন্দর মানুষ! অত যে রাগ—জল হয়ে গেছে! তার কোন চিহ্নও নেই আর!

"শুনছ, অলি?"

আমি বললুম, "কি?"

"কে ঐ গান গাচ্ছে—"

আমি বললুম, "ও ঐ সামনের বাড়ীতে। রোজ গায়।"

"তা ত গায়, কিন্তু কি গান গাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ?"

ও বাড়ীতে গান হচ্ছিল—কে গাইছিল,—

"আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই,
তুমি তাই গো,—
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই,
কিছু নাই গো—"

"শুনছ ত—" বলেই আমায় একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে—ধরে বললে, "কেমন গানটি, বল দেখি,—আহা!"

"যাও—আমি সব বুঝি গো সব বুঝি! তুমি ভারী দুষ্টু—আমায় রাগ করতে দিলেনা!"

১১

সকালে নবৌদির কাছ থেকে এক চিঠি এসে হাজির। তার চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি বলে কত অনুযোগ করেছে—লিখেছে, "বিয়ে সবারই হয় ভাই, তা বলে বরকে পেয়ে আর-সবাইকে এ-পর্যন্ত কেউ ত্যাগ করেনি!

"হলোই বা তাই, সুন্দর বর! চোখ দুটিকে এক মিনিটের জন্যেও পরের দিকে ফেরালে কি এমন লোকসান হবে! যাই হোক, আশীর্বাদ করি, জন্ম-জন্ম এমনি স্বামী-সোহাগিনী হও, স্বামীময়ী হয়েই চিরদিন থাকো। তবে আমাদেরও ভাব-সাবের কথা জানবার সাধ একটু-আধটু হয় কি না, তাই মাঝে-মাঝে বিরক্ত করি। যদি বারণ কর, তা হলে বেশ,—এই শেষ!"

সত্যি, এ আমার হল কি! দুনিয়ার

যে আর কেউ আছে, কি কোন দিন ছিল—তা যেন ভুলে গেছি। নবৌদিকে চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি! ভারী অন্যায় হয়েছে! কিন্তু কি করব? সেদিন লিখব বলে বসেও ত ছিলুম, এমন সময় সে এসে পড়ল যে! তারপর রোজই লিখি-লিখি করি, কিন্তু তার চিঠি আসে, ভেবে তার জবাব লিখতে হয়, এই-সব গোলমালে—না—তবু লেখা উচিত ছিল! ভারী অন্যায় হয়েছে—!

ঘরের চারদিকে নজর পড়ল। শেলাইয়ের কল্‌টা কতদিন যে খোলা হয়নি। পাশে ঐ বেতের বাক্সয় বালিশের ওয়াড়ের ঝালরগুলো কাটা পড়ে রয়েছে—ওয়াড়-গুলোয় লাগাতে হবে—তা আর হয়ে উঠছে না! মা নিজে সেদিন ঝালর বসাতে গেছল, বারণ করলুম,—তারপর কৈ, নিজেরও মনে পড়ে নি ত! আর তারপর ঐ রাজু পিশি! গরিব তার নতুন নাতিটির জন্যে কতকগুলো ফ্রক্ করে দিতে বলেছিল—আহা বেচারী, তার সেগুলোও পড়ে রয়েছে!

না।—এ'ত ভাল কথা নয়! এ কি—

দিবা রাত্রি যেন কি স্বপ্নের দোলায় দুলছি আমি। রঙের আব্-ছায়ায় রঙিন নেশায় চব্বিশ ঘণ্টাই যেন ভোর হয়ে আছি! হল কি আমার? নাঃ—এবার থেকে সব দেখব। আজই ওয়াড়গুলোতে ঝালর বসাব, রাজু পিশির নাতির ফ্রকগুলো করবো,—নবৌদির চিঠির জবাব,—সব, সব, কিছু আর ফেলে রাখব না।

এই জন্যেই বুঝি বাবা আর—! ঠিক! ছি—ছি! বাবার কাপড়-চোপড় আমিই ত আলমারি থেকে বার করে দি,—পকেটের ময়লা রুমাল বদলে করশা রুমাল দি—তাতে এসেন্স দিয়ে দি, বাবার প্যাণে সেন্‌সেন্ দিয়ে দি—তা এখন কিছুই করি না ত। বাবা কি ভাবে?" একদিনও ত বাবা ডেকে এ-সব বিষয়ে কোন কথা বলে নি।

মা সেদিন বলছিল, ঘড়ির নিকারের সেলাই খুলে গেছে। কোটের বোতামগুলো ছিঁড়ে গেছল—আমায় তা সেলাই করে দিতে বললে না—রামদীন সব সেলাই করে দিলে। না, আমায় কি ভাবচে সব? কেউ কোন কাজ ফরমাসও করে না! কেন, আমি এ বাড়ীর কি আর কেউ নই? দূর, এ'ত ভাল কথা নয়!

ভাত খেয়ে বাবা খাটে বসে গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছিল, মা আলমারি খুলে কাপড়-চোপড় বার করে দিচ্ছিল। আমি বললুম, "বারে, তুমি বের করবে কেন? ভারী ঝগড়া হবে কিন্তু। আমার ছোট্ট ছেলের জামা-কাপড় আমি বের করে দেব।"

মা বললে, "দিলে ত আমি বাঁচি। তুই কি দেখিস্ এ-সব—?"

কি! এ কথা বাবার সামনে—?

আমি কেঁদে ফেললুম। "না,—দেখি না বৈ কি!"

বাবা বললে, "পাগল মেয়ে। আরে, তা কাঁদিস্ কেন? তোকে মা পরের ঘরে দিয়েছি—কবে চলে যাবি। যে ক'দিন থাকিস্, হেসে-খেলে থাক্ মা, সেখানে গিয়ে সেখানকার সব দেখবি-শুনবি—আমার এখানে কোন ঝঞ্ঝাট পেতে দেব না! তাই কিছু বলি না তোকে। তুই কি আর আমাদের আছিস, মা—?"

"বটে, বটে, আমায় পর করে দেছ তোমরা! বেশ, বেশ, দাও, তবে বাড়ী থেকে বের করে দাও। আমি তোমাদের আপদ হয়েছি—না?"

বাবা আমায় কোলে টেনে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, "ছি মা, এই কথাতেই কাঁদতে হয় কি!"

মা বললে, "চোখের জল অমনি ঝরেই আছে! চোখের জল একটু বাঁধতে শেখ্‌ দেখি, পরের ঘরে নাহলে ভারী কষ্ট পাবি।"

"ত্মাখো না বাবা, মা খালি খালি যা-তা বলে—"

"না গো, ও আমার ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। কাল ওর শাশুড়ী আমার কাছে কত ওর সুখ্যাতি করেছে। ওকে নিয়ে যাবে বলছিল, তা আমি বললুম, আর দু-এক মাস থাক্‌ না, বেয়ান্‌।...ভাবে বুঝলুম, জামাইয়ের ইচ্ছে—"

"যাও—কি তুমি! মেয়েটা রয়েছে না—কথা একটু বুঝে-সুঝে বলো" বলে মা বকে উঠল।

বাবা তখন আমার খোলা চুলগুলোকে আঙুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে বললে, "যে ক'দিন তবু কাছে থাকে! ওটা চলে গেলে আমি ঠুঁটো হয়ে যাব আর কি! আমার কত কাজ করে—ও যে আমার ডান হাত—না রে অণি?"

আমি বুরুশ দিয়ে বাবার কোট-টোট ঝেড়ে দিলুম। বাবা আদর করে আমার মাথায় চুমু খেয়ে বললে, "আজ সকাল সকাল ফিরবো,—ফিরে বুঝলি ত! মনে আছে?"

"কি বাবা?"

"মনে নেই তোর—? সে ফিরে! সেই প্রাইজ! বায়োস্কোপে যাওয়া।"

"হ্যাঁ বাবা,যাব, বায়োস্কোপে যাব। চারটে থেকে আমি সেজে তৈরি হয়ে থাকব।" কেমন?"

দুপুর বেলা চিঠির কাগজ নিয়ে বসলুম, মবৌদিকে চিঠি লিখতে। দু'চার ছত্র গেল তোয়াজ করতেই। আমার অভিমানিনী, মান ত তাঁর সহজ নয়! তারপর আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে বসলুম, চিঠিটাকে খুব বড় করা যায় কি করে!...ঠিক,—দাঁড়াও ত! যেমন ভাব-সাবের তত্ত্ব চেয়েছে—তেমনি জব্দ করছি! বরের কথা একটিও লিখব না ত! লিখলুম, "বরের সঙ্গে কেমন ভাব হল, জিজ্ঞাসা করেছ—না? তা আমি বলব কেন? সে কথার কি দাম নেই? অমনি অমনি শুনে নেবে? আমার বন্ধুটিকে তুমি ত দেখেছ ভাই, এমন মানুষ যে, সে আর কি বলব! সে দিন হল কি, কোথাও কিছু নেই, দুম্‌ করে এসে হাজির। আমি তখন রুমালে নাম তুলছিলুম,আমি ত—" এমনি দু'চার কথা লিখতে গিয়ে মনের রাশ কখন্‌ যে ছেড়ে গেছে, খেয়ালও হয়নি! হঠাৎ চারটে পুরো পৃষ্ঠা শেষ করে দেখি, ও মা, এত বড় চিঠি লিখে ফেললুম! এত কি কথা পেলুম যে—! উল্টেপাল্টে দেখি,বাঃ—যে কথাটি, যার কথাটি লিখব না ভেবেছিলুম, সেই কথাতে, তারই কথাতে আগাগোড়া কাগজখানি ভরিয়ে দিছি! কবে এসেছিল—কি-কি কথা বলেছিল, কিছুই বাদ রাখিনি! নাঃ, নিজেকে

নিয়ে আর পারি-ও না। সত্যি, বিয়ে ত সকলেরই হয়, কিন্তু আমার মত এমন তন্ময় কি কেউ কখনো হয়েছে? দুর ছাই! চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেললুম। আর একখানা কাগজ এনে খুব ঘটা করে ফের লিখতে বসলুম। কিন্তু দু'চার লাইনের পরই আর-যে কি লিখব খুঁজেই পাই না। আগে ত নবৌদিকে চিঠি লিখেছি কত,—আর বেশ বড় চিঠিই সব লিখেছি! কি লিখতুম তখন,—এত কথা? ভাবতে বসলুম,—ভাবছি, ভাবছিই। ভাবতে ভাবতে কখন বেশ ঘুমিয়ে পড়লুম।

যখন ঘুম ভাঙ্গল, বেলা তখন চারটে বেজে গেছে। মা বললে, "বায়োস্কোপে যাবি না? উনি এসেছেন, তোদের টিকিট কেনা হয়েছে—"

বায়োস্কোপ! তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে সাজ-গোজ করলুম। তারপর—

বায়োস্কোপ থেকে ফিরে নাচ্‌তে নাচ্‌তে উপরে উঠলুম, এসে শুনলুম,—জামাইবাবু এসেছিলেন, বলে গেছেন, কাছে-পিঠে কোন্ বন্ধুর বৌভাতে নিমন্ত্রণ আছে, যদি সেখানে সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া হয়ে যায়, তা হলে ভালই! না হলে বেশী রাত্রি হলে অর্থাৎ ট্রাম চলে গেলে তাঁকে এইখানে এসেই রাত্রিটা পড়ে থাক্‌তে হবে!

আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। আমি ত জানি, দুষ্টুমি! যত সকাল-সকালই খাওয়া-দাওয়া চুকুক্ না, ট্রাম আজ রাত্রে কখনো মিলবে না ত, কখনোই না,—আজ এইখানেই আসতে হবে। নাঃ—এই পরশু আসা হয়েছিল—তবে সে বাবা কাল নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছিল, এই ভোরেই গেছে, —আবার এই আজই রাত্রে কাছে-পিঠে নিমন্ত্রণ! আহ্লাদ যে না হচ্ছিল, এমন নয়, তবে একটু অস্বোয়াস্তিও বোধ হল! লোকে বলবে কি? আমি যে লজ্জায় কারো সামনে বেরুতে পারব না। ছিঃ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীমন্দির-পরিক্রমা

পুরুষোত্তমে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে প্রধান প্রধান হিন্দুদেব-দেবীর অন্যূন পঞ্চাশটি ক্ষুদ্রতর মন্দির আছে। তাহার মধ্যে পাতালেশ্বর, সূর্য্যনারায়ণ, লক্ষ্মী, ভদ্রকালী, নীলমাধব, বিমলা, গণেশ, ক্ষেত্রপাল, মার্কণ্ডেয়, ইন্দ্রাণী, বটকৃষ্ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উৎকল-খণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ে (বংসং পৃঃ ১৫) রৌহিণ কুণ্ড ও কল্পবটবৃক্ষের সহিত জগন্মাতা লক্ষ্মী, ধর্ম্মরাজ, ক্ষেত্রপাল শিব ও ব্রহ্মস্বরূপ নৃসিংহদেব প্রভৃতি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রস্থ প্রধান বিগ্রহগুলির উল্লেখ দেখা যায়। ধর্ম্মরাজের মন্দির উত্তর দিকে

অবস্থিত। জগমোহন-সান্নিধ্যে অনন্ত বাসুদেবের ক্ষুদ্র মন্দির দেখিলে ভুবনেশ্বরে অবস্থিত ভট্ট ভবদেবের বিখ্যাত মন্দিরের কথা মনে পড়ে। পাতালেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহ মন্দির-প্রাঙ্গণের প্রায় দশ হাত নিম্নে অবস্থিত। বিশেষজ্ঞগণ ইহা হইতে স্থানটির পূর্ব্ব level নিরূপণ করিয়া মন্দিরের প্রাচীনতা-সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। পাতালেশ্বর মন্দিরে দরজার পার্শ্বে একখানি খোদিত লিপি আছে, কিন্তু আর্দ্র, অন্ধকার ও দুর্গন্ধ বাষ্প-সমাচ্ছন্ন বলিয়া তথায় অধিকক্ষণ তিষ্ঠান যায় না। শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিপিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উহা তিন প্রকার বিভিন্ন বর্ণমালায় (in three different characters) রচিত এবং রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের রাজত্বকালে খোদিত।

র—তাঁহার অনুসন্ধিৎসা-ফলে ভুবনেশ্বর মন্দিরে আমরা তেলেগু ও উড়িয়া এই উভয় ভাষায় খোদিত লিপিমালা ঘৃত-প্রদীপ-সাহায্যে দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইহারও একটিতে অনিরুদ্ধ ভীমের নাম আছে। রাজা অনঙ্গভীম ১১৯২ খৃঃ অঃ হইতে ১২০০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে পুরীর সূর্য্য মূর্ত্তিটি রাজা নর-সিংহদেবের (১) রাজত্ব-কালে কোনারক হইতে পুরীতে আনীত হয়। সম্ভবতঃ খৃঃ অঃ ১৬২১—২২ হইতে ১৬৪৪—৪৫ অব্দের মধ্যেই উহা তথায় রক্ষিত হইয়াছিল। (Puri Gazeteer p—291) এই মূর্ত্তিটি প্রাচীন হইলেও ইহার সেরূপ শিল্প-সৌন্দর্য্য নাই। মূর্ত্তির দুই হাতে সনাল পদ্ম-পুষ্প। মৎস্য-পুরাণে সূর্য্য মূর্ত্তির বর্ণনা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—

নানাভরণভূষাভ্যাং ভুজাভ্যাং ধৃতপুষ্করং
স্কন্ধস্থেপুষ্করে চেতু লীলয়ৈব ধৃতে সদা॥

(২৬১ অধ্যায়, ৩ শ্লোক, পৃঃ ৯০৩, বঙ্গবাসী সংস্করণ)

ঐ মূর্ত্তি বিবিধভূষণে ভূষিত হইবেন, হস্তদ্বয়ে পদ্মদ্বয় বিন্যস্ত থাকিবে। তিনি লীলাবশতঃ স্কন্ধদেশেও দুইটি পুষ্কর ধারণ করিয়াছেন।

শাস্ত্র-গ্রন্থে সূর্য্যের চরণদ্বয় উপানৎ অথবা বস্ত্রযুগ্মের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখার নির্দ্দেশ দেখা যায়। শিল্পী এ ক্ষেত্রে মাত্র উরুদেশ পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিম্নে অরুণ ও সপ্তাশ্বের চিত্র আছে। ইহাও পৌরাণিক নজীরের অনুযায়ী (সপ্তাশ্বৈকচক্রঞ্চ রথং তস্য প্রকল্পয়েৎ) সূর্য্যের ধ্যানেও এইরূপ বর্ণনাই দেখিতে পাই। (পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনং) সূর্য্য মূর্ত্তির নিম্ন ভাগে অবস্থিত ক্ষুদ্র অরুণ মূর্ত্তিটির দিকে অনেকেরই নজর পড়ে না। অরুণ কশ্যপের পুত্র, বিনতার গর্ভজাত। ব্রহ্মার উপদেশে তিনি প্রভাকরের রথের সারথিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। দেহ সুপুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই ডিম্বভেদ হইয়াছিল বলিয়া অরুণ উরু-বিহীন ('অনূরু') সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণের এমনি তেজ যে তাহাতে তাঁহার রথবাহী

(১) ১ম নরসিংহদেবে রাজত্বকাল (১২৩৮—৬৪ খৃঃ অঃ, ২য় নরসিংহদেব ১২৭৮—১৩০৬, ৪র্থ নরসিংহ ১৩৭৯-১৪০২

অশ্বগুলিরও পৃষ্ঠদেশ পুড়িয়া যায়। (প্লেট পৃষ্ঠে অংশু পতৈর্ধতি নিকটাত্তয়। ২)

তাই অরুণের কাজের মধ্যে একটি প্রধান কাজ হইতেছে, নিজে মাঝে থাকিয়া মার্ত্তণ্ড-তেজের প্রখরতার উপশম করা। ("La fonction d'Aruna e'tait (৩) d'amortir en s'interposant, les rayons de soleil)। অরুণের সহিত রাহুর নিকট সম্পর্ক; ("par sa mere le cousin et par sa pere l'oncle de Rahu") তাই অরুণের অপর একটি বিশেষ কর্ত্তব্য সূর্য্যকে রাহুর হাত হইতে রক্ষা করা। দেবতারা রাহুর গ্রাস হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই বলিয়া সূর্য্য নিজের প্রচণ্ড তেজ বিস্তার করিয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাই স্বয়ং দেবতারাও সূর্য্যের হাত হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অরুণকে সূর্য্যের রথে স্থাপন করিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। অরুণের দেহ প্রগাঢ় রক্ত বর্ণ। সূর্য্যের উত্তপ্ত রশ্মির প্রভাবেই অরুণের এই অরুণতা। "উদগাঢ়েনারুণিমা দেহরুণস্যারুণতাং"।(৪) পাণ্ডা মহাশয়েরা অবশ্য একটু সিঁদুর লেপিয়া অনায়াসেই শাস্ত্র বজায় রাখিতে পারেন কিন্তু যাত্রীদের এ-সব খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি নাই এবং পাণ্ডা-দিগেরও মূর্ত্তি-পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া মনে হয় না; থাকিলে গরুড় মূর্ত্তিকে একাদশীতে পরিণত করিতে সাহস পাইতেন না (পুরীতীর্থ পৃঃ ৬১)। সিংহ-দ্বারের সম্মুখে স্তম্ভের উপর অবস্থিত অরুণ মূর্ত্তিটি—হনুমানের মূর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। (৫) যাক সে কথা।

কোণারকে একাধিক সূর্য্য মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৫ম স্তূপের ভিতর যে দুইটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে ৬।৭ ফিট উচ্চ একটি মূর্ত্তি ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা যাদুঘরে লইয়া আসেন; সুতরাং কোন্ মূর্ত্তিটি প্রধানতম বিগ্রহরূপে গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা বলা সহজ নহে। শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরী-মন্দিরের এই সূর্য্য মূর্ত্তিটিই কোণারকের প্রধান বিগ্রহ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যে মূর্ত্তিটি ইন্দ্র-বিগ্রহ বলিয়া পরিচিত, সেটি সোমদেবের মূর্ত্তি। প্রবাদ আছে, কোণার্ক মন্দিরে সূর্য্যের সহিত চন্দ্রমাও পূজিত হইতেন। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় ভিন্ন-মতাবলম্বী। তাঁহার মতবাদ কোণার্ক-প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

জগন্নাথের মন্দির ছাড়িয়া দিলে ক্ষুদ্র মন্দির-গুলির মধ্যে লক্ষ্মী-মন্দিরই বৃহত্তম।

---

(২) The Surya-sataka of Mayura (Columbia University Press. verse 45, p. 162)

(৩) La legende de Rahu par M. Feer p 8—9

(৪) The Surya-sataka of Mayura—Ibid p. 117

(৫) A list of the objects of antiquarian interest in the lower provinces of Bengal. 1879. p, 223

সম্মুখের মার্বেল-মণ্ডিত বারান্দায় অনেকেই বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিয়া থাকে। দেওয়ালের খাঁজ বা কুলুঙ্গিতে তিনটি সুন্দর অনতিবৃহৎ স্ত্রী-মূর্ত্তি রহিয়াছে। দেওয়াল হইতে উদগত তাক্ বা ব্র্যাকেটের উপর উপবিষ্ট পদ্মালয়ার সুন্দর মনবিমোহন মূর্ত্তি—মস্তকোপরি হস্তি-করধৃত জলস্রাবী কলস। এ মূর্ত্তি "গজ লক্ষ্মী" নামে পরিচিতা। প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত "কমলাত্মিকা" মূর্ত্তির সহিত এ মূর্ত্তির অভিন্নতার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। (সাহিত্য ১৩২২ পৃ ১৩১-১৩৮)। মৎস্য-পুরাণে কিন্তু দেখিতে পাই—

শ্রিয়ং দেবী প্রবক্ষ্যামি নবে বয়সি সংস্থিতাং।
সুযৌবনাং পীনগণ্ডাং রক্তোষ্ঠীং কুঞ্চিতভ্রুবং।

× × × ×

পার্শ্বে তস্যা স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যাশ্চামর ব্যগ্রপাণয়ঃ।
পদ্মাসনোপবিষ্টাতু পদ্মসিংহাসনস্থিতা ॥
করিভ্যাং স্নাপ্যমানাসৌ ভৃঙ্গারাভ্যাং অনেকশঃ।
প্রক্ষালয়ন্তৌ করিণৌ ভৃঙ্গারাভ্যাং তথাপরৌ ॥(৬)

মৎস্য অধ্যায় ২৬১, শ্লোক ৪১—৪৬, বঙ্গবাসী সংস্করণ পৃঃ ৯০৫।

জৈন খণ্ডগিরি গুহায়, কটকের গুহায়, সাঞ্চী ও ভারহুতের বৌদ্ধ স্তূপে এইরূপ শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সেগুলি অনেকস্থলে দণ্ডায়মান-অবস্থায় পরিকল্পিত। বঙ্গবাসীর নিকট মূর্ত্তিতত্ত্ব এখনও 'নিহিতং গুহায়াং', তাই উঠিতে বসিতে বৈদেশিক পাণ্ডিতদিগের শরণাপন্ন হইতে হয়। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (J. R. A. S. 1918, Pt III & IV, P 531) জনৈক সুবিজ্ঞ লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে সুপ্রাচীন ভাস্কর্য্যাবশেষের মধ্যে যে সকল "লক্ষ্মী" মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহার সকল গুলিই এই "গজলক্ষ্মী" শ্রেণীর। তারপর গুপ্তযুগের মুদ্রাদির উপর যখন পুনরায় শ্রীদেবীর সাক্ষাৎ পাই, তখন হস্তিদ্বয় অন্তর্হিত হইয়াছে। (৭) পরে খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর একটি মুদ্রায় দেখা যায় যে হস্তিদ্বয় পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার মূর্ত্তি-পরিচয় বিষয়ক গ্রন্থে যে আট প্রকার গজলক্ষ্মীর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, (P 187) তাহা সেই পুরাতন প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তি হইতেই উদ্ভূত—সেই একই মূর্ত্তির প্রকার-ভেদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। দুরবগাহ গবেষণার বিষয় ছাড়িয়া দিয়া মোটমাট বলা যাইতে পারে যে "জৈন"ই হউন আর "বৌদ্ধ"ই হউন, প্রাচীন ভারত-

(৬) লক্ষ্মীর মূর্ত্তি যথা :...তিনি নবীনা, সুযৌবনা পীনগণ্ডস্থলা...তাঁহার উভয়পার্শ্বে চামর-ব্যজনকারিণী স্ত্রীগণ বিরাজ করিতেছে। তিনি পদ্মসিংহাসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্টা। হস্তিদ্বয় তাঁহাকে ভৃঙ্গার-বারিদ্বারা অজস্র স্নান করাইতেছে। অপর হস্তিযুগল ভৃঙ্গার-বারি দ্বারা তাঁহাকে প্রক্ষালন করাইতেছে।" (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৯০৫)

(৭) রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তি প্রায়শঃ সিংহাসনে উপবিষ্টা, অথবা পদ্মাসনা। সমুদ্রগুপ্ত হইতে সকল মুদ্রাতেই উপবিষ্টা লক্ষ্মী-মূর্ত্তি দেখা যায়—(শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত প্রাচীন মুদ্রা, ১৩৮, ১৪৫; চিত্র ড)

বাসীরা হিন্দু-ধর্ম্মত্যাগী হইলেও আমাদিগের ন্যায় "লক্ষ্মী"-ছাড়া হইতেন না। লক্ষ্মী মন্দিরে দুইটি ক্ষুদ্র স্ত্রী মূর্ত্তির ভঙ্গী বড়ই সুঠাম। অপর একটি চিত্রে চারি-পায়ার ন্যায় সিংহাসনে পুরুষ মূর্ত্তি ব'সিয়া—সম্মুখে দণ্ড ও গদাধারী তিনটি পুরুষ ও দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। এতদ্ব্যতীত হস্তী ও সৈন্যাদির শোভা-যাত্রা ও দুইটি দ্বার-রক্ষয়িত্রীর চিত্রও আছে। স্তম্ভ-গাত্রে গজসিংহ মূর্ত্তির উপর ঘটকণ নাগ-নাগিনীর মূর্ত্তিও একান্ত চিত্তাকর্ষক

মহাভারতে লিখিত আছে যে দক্ষযজ্ঞ বিনাশার্থ দক্ষ-কন্যার দেহ হইতে ভদ্রকালী দেবী উদ্ভূতা হইয়াছিলেন। (শান্তিপর্ব্ব ২৮৪ অধ্যায়, ৩২ ও ৫৪ শ্লোক)

ভদ্রকালী মূর্ত্তি মার্কণ্ডের পুরাণ-মতে সহস্রভুজা। মহিষাসুর বধে দেবীর যে মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সহস্র-ভুজা মূর্ত্তি 'ভদ্রকালী' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

(স দদর্শ ততো দেবীং......

দিশোভুজ সহস্রেণ
সমন্তাৎ ব্যাপ্য সংস্থিতাং ॥)

ঋষি রুবাচ
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ ॥

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শুম্ভবধের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখিতে পাই, "জ্বালা করাল-মত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্ ত্রিশূলং পাতুনো ভীতে র্ভদ্রকালী নমোঽস্তুতে"। ইন্দ্রাদি দেবগণ অগ্নিদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কাত্যায়নীর স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন, "দেবী তুমি ভীষণ অনল-রূপিণী, অতি-ভয়ঙ্করী, দৈত্যবংশ-ধ্বংসকারিণী, তোমার মহা-ভয়ানক ত্রিশূলের ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। অতএব হে দেবী ভদ্রকালী, তোমাকে নমস্কার।" দক্ষিণ দেশীয় আগম গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত টি গোপীনাথ রাও যে ভদ্রকালী মূর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে দেবী অষ্টাদশভুজা, আসনে দণ্ডায়মানা ও দেহবিশিষ্টা বলিয়া বর্ণিতা। (Elements of Indian Iconography vol I, Pt II P 357) তাঁহার ষোলটি-হস্তে অক্ষমালা ত্রিশূল, খর্গ, চক্র, বাণ, ধনু, শঙ্খ, পদ্ম, স্রুক, স্রুব, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অগ্নি, কৃষ্ণাজিন, ও বারি (water) এবং অপর দুইটি হস্তের মধ্যে একটিতে রত্ন-খচিত পাত্র (jewelled vessel) এবং অপরটী 'অভয়' বা 'শান্তি' মুদ্রায় বিন্যস্ত। তিরুপলত্তরাই নামক স্থানে ভদ্রকালী দেবীর যে ধাতব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা মাত্র চারিহস্ত বিশিষ্ট। শক্তির ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পুরুষোত্তম তীর্থে ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়াছে। ভক্তের চক্ষে দেবী স্মেরাননা, স্মিত হাস্যোৎফুল্লা বলিয়াই মনে হয়। নীল-মাধবের মন্দিরে আমাদের প্রবেশ করার সুবিধা ঘটে নাই—ইহার পরই বিমলা দেবীর মন্দির।

বিমলার মন্দির প্রাচীন বটে কিন্তু ইহাতে সেরূপ কারুকার্য্য নাই। সতীর নাভি এই স্থানে পতিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ থাকায় ইহা অন্যতম পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত। তান্ত্রিকেরা বিমলা দেবীকেই জগন্নাথের শক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন।

তাই বিমলা-পীঠ তান্ত্রিকদিগেরও বিশেষ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। বিমলাদেবীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে যে প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত শার্দ্দূলমূর্ত্তি বসান আছে, বিখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তৎসংক্রান্ত একটী সুন্দর জন-প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫)। উড়িষ্যার কোনও মহাপাত্র রাজাদেশে দেবীর শার্দ্দূল নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সত্যকার সিংহের নকল রাজার মনোমত হইল না। শিল্পশাস্ত্রোক্ত তাল-মান বজায় রাখিয়াও শিল্পী কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শেষে নিজ কন্যা-কর্ত্তৃক দেবীর শার্দ্দূলের ছায়াময়ী অঙ্কিত—ঘণ্টা-চামর ও মুকুট-মণিহার-শোভিত "দেওয়ালের গায়ে আল্পনায় দাগা" সিংহ-মূর্ত্তি আদর্শ করিয়া এই অপূর্ব্ব প্রস্তর শার্দ্দূল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শিল্প শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রসজ্ঞ অবনীন্দ্রনাথ পাকা কারিগরের তৈয়ারী এ মূর্ত্তিটির গঠনের বাহাদুরী দেখিয়া যথার্থই বলিয়াছেন, "শিশুর মধ্যে নির্ভয় কল্পনার যে স্বাধীনতা আছে—পাকাহাতের অভ্রান্ত টান টেনে এসে যখন তাহার সঙ্গে যোগ দেয়, তখন মনোমত মূর্ত্তিটি শিল্পীর কাছ থেকে আমরা লাভ করি।" বিমলা দেবীর মন্দিরের একটি কুলুঙ্গীতে সর্পলাঞ্ছিত যে দক্ষিণী ধরণের (৮) ষড়্ভুজ গণেশ মূর্ত্তি আছে, তাহাও বিশেষত্ব-বর্জ্জিত নহে। মৎস্যপুরাণে বিনায়ক দেব 'ব্যালযজ্ঞোপ—বীতিনাম্' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন বটে কিন্তু সে মূর্ত্তি চতুর্ভুজ। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও সর্পকটি-বেষ্টনী-বিশিষ্ট সর্পযজ্ঞোপবীত-যুক্ত যে ষড়্ভুজ গণেশ মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা "বিঘ্নেশ্বর" নামে উক্ত হইয়া থাকে। পথিমধ্যে সর্প দেখিয়া ইন্দুর বাহনটি গণপতিকে হঠাৎ ফেলিয়া দেওয়ায় তাঁহার পেট ফাটিয়া যায়, তাই সেই সাপ ধরিয়া গণেশ ঠাকুরকে বিদীর্ণ উদর-দেশ বাঁধিয়া লইতে হইয়াছে। (Gopinath Rao Op. cit. P. 50.) শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রথ মহাশয় লিখিয়াছেন, (J. B. O R. S. vol V. Pt I p. 147-148) ওড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেবের কাঞ্চী-কাবেরী-অভিযান উপলক্ষে (J. B. O. ors) সখী গোপাল ও গণেশ মূর্ত্তি আনীত হইয়া যথাক্রমে সত্যবাদী ও পুরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। রথ মহাশয়ের মতে এ অভিযান ঐতিহাসিক ঘটনা এবং মূর্ত্তিদ্বয় এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সুতরাং এ গণেশটি যে একটু দক্ষিণী ছাঁদের হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি!

নগর ও গ্রামাদি অনিষ্টাভিলাষী অপ-দেবতা ও ব্যক্তিগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গ্রাম বা নগরের উত্তরপূর্ব্বাংশে ক্ষেত্রপালমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও মহাশয়ের মতে কপালী, বটুক ও ভৈরবমূর্ত্তি ক্ষেত্রপাল হইতে অভিন্ন। ক্ষেত্রপালমূর্ত্তি ত্রিনেত্র। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মূর্ত্তির বর্ণ ও ভুজ-সংখ্যার তারতম্য হইয়া থাকে।

(৮) শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আবাসে উড়িয়া শিল্পী-নির্ম্মিত এই মূর্ত্তিটির একটি কাষ্ঠ-খোদিত প্রতিরূপ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

সাত্ত্বিক মূর্ত্তি শ্বেতবর্ণ—দুই বা চারিহস্ত বিশিষ্ট, রাজসিক মূর্ত্তি রক্তবর্ণ ও ষড়হস্ত বিশিষ্ট, তামসিক কৃষ্ণবর্ণ ও অষ্টভুজ। ক্ষেত্রপাল সর্ব্বত্র নগ্নরূপেই পরিকল্পিত হইয়া থাকে। ঘণ্টা ও কপাল ব্যতীত তিনি ত্রিশূল, খড়্গ, খেটক, নাগপাশ, ধনু ও শায়ক প্রভৃতি প্রহরণ ধারণ করিয়া থাকেন। অংশুমদ্ ভেদাগম মতে তাঁহার কেশগুলি রক্তবর্ণ ও ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত। কারণাগম গ্রন্থোক্ত বর্ণনা-মতে তাঁহার চক্ষু গোলাকার। তিনি নাগ যজ্ঞোপবীত ও শিরোদেশে মুণ্ডমালা ধারণ করিয়া থাকেন। (Gopi Nath Row. Op. Cit. pp. 495-498)

ক্ষেত্রপাল তন্ত্রোক্ত দেবতা; আবার মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদিগের মধ্যেও ক্ষেত্রপালের পূজা হইয়া থাকে। (Arthur Avalon's Princples of Tantra p xxxvII) সেইজন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে হিন্দুর তন্ত্রাদি মহাযান বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গৃহীত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "তন্ত্রের প্রাচীনত্ব" নামক প্রবন্ধে এ মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। (সাহিত্য সংহিতা, আশ্বিন ১৩১৭)। কৌলাবলী তন্ত্রে (রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সংস্করণ পৃঃ ১৮) ক্ষেত্রপালের নিম্নলিখিত ধ্যান মন্ত্রটি প্রদত্ত হইয়াছে—"নির্ব্বাণং নির্ব্বিকল্পং নিরুপমমকলং নির্ব্বিকারং ক্ষকারং হুঁকারং বজ্রদংষ্ট্রং হুতবহবদনং রৌদ্রমুন্মত্তভাবং। কট্টকারং বদ্ধনাগং ভ্রূকুটিমুখং ভৈরবং শূলপাণিং খট্বাঙ্গং ব্যোমনীলং ডমরুসহিতং ক্ষেত্রপালং নমামি॥"

নির্ব্বাণ, নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিকার প্রভৃতি শব্দ বৌদ্ধ ভাবদ্যোতক কি না, তাহা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন, তবে বৈষ্ণব তীর্থে তান্ত্রিক দেবতার উপাসনা ও জগন্নাথদেবের বিমলা দেবীর "ভৈরব" বলিয়া পরিচয় প্রভৃতি খণ্ড প্রমাণ স্মরণ করিয়াই হয়তো আচার্য্য ব্রক-প্রমুখ পণ্ডিতগণ জগন্নাথের "শৈবত্ব" সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ক্ষেত্রপালের নিকটেই মার্কণ্ডেয় মন্দির। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় মহাপ্রলয়ের সময়েও জীবিত থাকিয়া প্রলয়-পয়োধিজলে সন্তরণ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক বিবরণ-মতে তিনি এই ভাসমান অবস্থাতেই পুরীক্ষেত্রে একটি বটবৃক্ষ দেখিতে পান এবং বৃক্ষের ঊর্দ্ধদেশে বট-পত্রে শায়িত শিশুরূপী ভগবানের মুখে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার উদর-মধ্যে নিখিল সৃষ্ট বস্তু দেখিতে পান। প্রলয়ান্তে মার্কণ্ডেয় মার্কণ্ডেয় হ্রদ (১) নামক তীর্থ রচনা করিয়া মহাদেবের আরাধনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছিলেন। (উৎকল খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়) বিশ্বাসী হিন্দুর চক্ষে সেই বট-বৃক্ষ অদ্যাপিও "অক্ষয় বট"রূপে বিদ্যমান। আবার যে রোহিণ কুণ্ডে প্রলয় জল লীন হইয়াছিল, তাহাও এই মন্দির-প্রাঙ্গণেই অবস্থিত, সুতরাং গোঁড়া খৃষ্টিয়ানের হৃদয়ে আরারাট (Ararat) পর্ব্বতের দৃশ্য ও নোয়া (Noah) নির্ম্মিত অর্ণব-যানের স্মৃতি যেরূপ ভক্তির ভাব আনয়ন করে, প্রাচীন-পন্থী হিন্দুও সেইরূপ পুরী-তীর্থের পৌরাণিক কাহিনী-সংশ্লিষ্ট এই সকল স্থানগুলি দর্শন করিয়া সেইরূপ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকেন।

---

(১) মার্কণ্ডেয় হ্রদ, মন্দিরের পশ্চিমে একটি অপরিসর পথের পার্শ্বে অবস্থিত।

মার্কণ্ডের মন্দিরের পরেই ইন্দ্রাণীর মন্দির। মৎস্য-পুরাণে প্রতিমা-লক্ষণাদি-প্রসঙ্গে সুর-রাজ্ঞীর বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রসদৃশী, বজ্রশূল ও গদাধারিণী, বহু নয়ন-সমন্বিতা এবং গজাসনে উপবিষ্টা। ইঁহার তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ এবং ইনি দিব্য আভরণ-নিচয়ে ভূষিতা।

"ইন্দ্রাণীমিন্দ্রসদৃশীং বজ্রশূলগদাধরাম্।
গজাসনগতাং দেবীং লোচনৈর্বহুভির্বৃতাম্।
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভাং দিব্যাভরণভূষিতাম্॥"
—মৎস্য পুরাণ ২৬১ অধ্যায়। শ্লোক ৩১।

মার্কণ্ডের চণ্ডীতে দেবী কাত্যায়নী সমুজ্জ্বল সহস্রনয়না কিরীট-ধারিণী মহাবজ্রা * ইন্দ্রাণীরূপে বৃত্র-অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। পুরুষোত্তম মন্দিরে দেবরাজও জগন্নাথ প্রভুর আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হন নাই। সূর্য্যদেব এই ইন্দ্র-মন্দিরেই স্থান পাইয়াছেন। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দিরের গাত্রে গজাসনে উপবিষ্ট ইন্দ্রদেবের মূর্ত্তি খোদিত আছে। উহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। ইন্দ্রাণী-মন্দিরের পার্শ্বেই কল্পবট এবং তাহার পরেই বট বৃক্ষের মন্দির। এই কল্পবট বা কল্প-বৃক্ষ কোণারকের অর্কবটের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। (Mitra's Antiquities of Orissa Vol I p. 14) অর্কবটের নিকট প্রার্থনা করিলেই অভীপ্সিত বস্তু লাভ করা যাইত। কথিত আছে, পদ্মক্ষেত্র বা কোণারকের এই মোক্ষপ্রদ বৃক্ষের শাখায় বহু বিহঙ্গম এবং পাদমূলে বহু পবিত্রচেতা মুনি-ঋষি বাস করিতেন। সূর্য্য না কি স্বয়ং এই বট মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন! অর্কবট লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অক্ষয় বট এখনও বিদ্যমান। অপত্য-কামা নারীগণের ইহা অন্যতম উপাস্য দেবতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা পুরী বৌদ্ধ তীর্থ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বলিতে চান যে এটি বোধিদ্রুমের প্রতিনিধি। কল্প-বৃক্ষের স্মৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধগণের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই আদৃত হইয়াছে। জৈন রাজা খারবেলের হস্তী-গুম্ফাস্থ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে তিনি স্বর্ণ-নির্ম্মিত পত্র-সংযুক্ত কল্প-বৃক্ষের আদর্শ নির্ম্মাণ করিয়া দান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কাশী-প্রসাদ জৈশবাল (Mr K. P. Jayswal.) হেমাদ্রি-বিরচিত চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি গ্রন্থের দান-খণ্ড হইতে এই প্রকার দান-বিধির উল্লেখ করিয়াছেন। (J. B. O. R. S. Decr. 1917. p. 463). এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে পুরীর কল্পবৃক্ষ যে বোধিদ্রুম মাত্র এ কথা সহসা স্বীকার করিতে সাহস হয় না। অক্ষয় বটের সন্নিকটস্থ মন্দিরে বটবৃক্ষ বা বট-পত্রে শায়িত শিশু নারায়ণের মূর্ত্তি—"পদাঙ্গুলিং কলয়তি শ্রীমুখে মুরারি"—বড়ই সুন্দর। ইহা স্বতঃই রমণী-হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। এই শিশুর উদর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছিলেন—স্নেহাপ্লুতা মমতাময়ী তীর্থ-যাত্রিণীগণের অনেকেই সে পৌরাণিক উপাখ্যানের কথা বিস্মৃত হইয়া যান। তাঁহাদের নিজ-পরিবারস্থ শিশুগণের প্রতি যে ভাব—

* কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্র নয়নোজ্জ্বলে। বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

দেবতার শিশু-মূর্ত্তি-দর্শনে সেই "মা যশোদার" ভাবেরই আবির্ভাব হয়। শুনিয়াছি, মান্দ্রাজ যাদুঘরে একটি সুরক্ষিত বট-পত্রশায়ী ভগবানের মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত জি, জুভো দুব্রেইল (G. Jouveau Dubreuil) প্রণীত দক্ষিণ ভারতীয় মূর্ত্তি-তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থের ২৩শ সংখ্যক চিত্রে বট-পত্র-শায়িত নারায়ণের একটি সুন্দর আধুনিক মূর্ত্তির আলেখ্য প্রকাশিত হইয়াছে; এবং পর পৃষ্ঠায় ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে। (archcologic du sud de L'Inde Planche XXIII image moderne.) শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী মহাশয় পুরীর চিঠি গ্রন্থে সত্যভামার মন্দির ও 'ছোট ছোট রথের মত ঝুলান' সরস্বতী ও সাবিত্রী দেবীর মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন। সরস্বতী মন্দিরে খোদিত পক্ষীগুলির প্রাণি-বিদ্যা-হিসাবে মূল্য থাকুক না থাকুক, ইহা হইতে তাৎকালীন বিহঙ্গজাতির চিত্র-সম্বন্ধে শিল্পীগণের প্রচলিত প্রথার (convention) সন্ধান পাওয়া যায়। মন্দির-গাত্রে পক্ষী প্রভৃতির চিত্র অবশ্য একটা নূতন কথা নহে। মন্দিরের অংশ-বিশেষে 'মাঙ্গল্য' বিহগাদি ও 'শ্রীবৃক্ষ' প্রভৃতির শোভা সম্পাদন করার কথা বরাহমিহির কর্ত্তৃক বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। (Bombay Ed chap. 55 sl 5.) মন্দির গাত্রস্থ চিত্রাদি সম্বন্ধে অনেকেই কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বিভিন্ন দেব-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত নৃসিংহ বামন কল্কি অবতার প্রভৃতি বিরাট পৌরাণিক মূর্ত্তিগুলির চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য্যের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন; কেহ বা নাট মন্দিরের গাত্রে বৃহদায়তন দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি চিত্রের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভোগমণ্ডপের বহির্গাত্রে অঙ্কিত শেষ-নাগোপরি নারায়ণের মূর্ত্তিটি (১০) ভারতীয় শিল্পকলার আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত না হউক, সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনকল্পে ইহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। "Ideals of Indian Art' (p. 68) নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ই, বি, হেভেল মহাশয় এই মূর্ত্তি পরিকল্পনার যে একটি অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণরূপেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সৌর মতবাদ (Solar theory) সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। তাঁহার মতে আদিম বারিধি-বক্ষে ভাসমান নারায়ণ দিক্ চক্রবাল-রেখার নিম্নে অন্তর্হিত সূর্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। নারায়ণের নাভিদেশ হইতে উদ্ভূত পদ্মযোনি ব্রহ্মা—সূর্য্যোদয়ে যে পদ্মপুষ্প বিকাশ হইয়া থাকে তাহারই দ্যোতনা মাত্র। দেবাসুর-যুদ্ধে অর্থাৎ আলোক ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বে শিব যে চন্দ্রকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে এইমাত্র বুঝাইতেছে যে দেব সহস্ররশ্মি চিরতুষারাবৃত হিমালয়-শৃঙ্গের পশ্চাদ্দেশে অস্তমিত হইলে মহাদেবের ললাটে ইন্দু আসিয়া উদিত হন। ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যস্থ (mediator) স্বরূপ সাম্যাবস্থা-সূচক বিষ্ণু মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যব্যতীত আর কিছুই নহেন। (equilibrium.) শ্রীযুক্ত হেভেল মহোদয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্যের সমন্বয়-জ্ঞাপক চতুর্মুখ লিঙ্গমূর্ত্তিটির কথা

(১০) শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত সেতুবন্ধ-যাত্রা...পৃঃ ৫৩।

উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ লিঙ্গ-মূর্ত্তি কলিকাতায় যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। হেভেল সাহেবের মতে নারায়ণ-বিষ্ণুতে যে দ্বৈত ভাব (dual form) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিষ্ণুর যোগাবস্থা ও সক্রিয় বিশ্বশক্তি (active cosmical powers) জ্ঞাপক। অবশেষে নারায়ণ বিষ্ণুই সূর্য্যদেবের স্থান অধিকার করিয়াছেন। হিন্দুদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের ফলে সূর্য্য ও বিষ্ণুর একীকরণ সংসাধিত হওয়ায় প্রধানতম দেবতা-চতুষ্টয়—মাত্র তিনটিতে পরিণত হইয়াছে। ("The philosophic debates in the orthodox Hindu Schools eventually resolved the four central deities into three by identifying Surya with Vishnu"—Bod p. 69) সূর্য্য-নারায়ণের অভিন্নতায় আস্থাবান হইলেও সনাতন-পন্থী হিন্দুগণ সৌর-ভিত্তিমূলক এই নূতন টীকা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন কি না, জানি না। "শেষ"নাগ ও বিষ্ণুর এইরূপ একত্র কল্পিত মূর্ত্তি নিতান্ত আধুনিক নহে। বাদামীর ৩নং গুহায় খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর যে মূর্ত্তিটি দেখা যায় তাহাতে বিষ্ণু সর্পের উপর উপবিষ্ট—শায়িত নহে। Vichnou assis sur le serpent dans la cave No 3a Badami (VI e Siecle Annales du musee Guimet, Archœlogie du sud de L'Inde par G. Jouveau—Dubreuit) গরুড় স্তম্ভের নিকটবর্ত্তী ভোগমন্দিরের গায়ে যে দুইটি সৈনিক-বেশধারী অশ্বারোহী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে নীলাচলে "শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ" নামক গ্রন্থের রচয়িতা একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। যেটি শ্বেত অশ্বে আরূঢ়, সেটি না কি বলরাম আর কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে সমাসীন মূর্ত্তিটী জগন্নাথ। কাঞ্চী বা কর্ণাটের রাজকুমারী পদ্মাবতীর সহিত উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম দেবের বিবাহ-প্রস্তাব হইয়াছিল। রথ-যাত্রাকালে রাজা স্বয়ং সম্মার্জ্জনী গ্রহণ করিয়া প্রভুর রথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন, এই কথা অবগত হইয়া কাঞ্চীরাজ চণ্ডালের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হন। পুরুষোত্তমদেব এই ব্যবহারে অপমানিত হইয়া ভাবী শ্বশুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রথ মহাশয়ের মতে এ ঘটনা ঐতিহাসিক। (J. B. O. R. S. V. pt VII p. 147—148) কাঞ্চীরাজ যুদ্ধে পরাভূত হন এবং রাজকুমারীকে বন্দিনারূপে উৎকলে আনা হয়। পুরুষোত্তম দেব মন্ত্রীকে না কি আদেশ দিয়াছিলেন যে কোন চণ্ডালের সহিত রাজকুমারীর পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদন করাইতে হইবে। বিচক্ষণ মন্ত্রী রথযাত্রাকালে পুনরায় সম্মার্জ্জনী হস্তে দণ্ডায়মান উৎকলেশের হাতেই কাঞ্চীরাজ-কন্যাকে অর্পণ করেন। পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকাল ১৪৭৯—১৫০৪ খৃঃ অঃ, মতান্তরে ১৪৬৯ হইতে ১৪৯৬ খৃঃ অঃ। দ্বিতীয় কর্ণাট-অভিযানে উড়িষ্যারাজ কাবেরী নদীর তীরদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। যে অশ্বারোহী জগন্নাথ ও বলরাম মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা কাঞ্চী-কাবেরী-অভিযানে পরমভক্ত উৎকল-রাজের সাহায্যার্থে নাকি

সৈন্তাধ্যক্ষরূপে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন-কালে কোনও দধি-বিক্রেত্রীর নিকট দধি ক্রয় কবিয়া তাহার হস্তে একটি অঙ্গুরীয়ক দিয়া বলিয়াছিলেন, এই মুদ্রাটি দেখাইলেই রাজার নিকট মূল্য পাইবে। পরে এই মুদ্রা প্রদর্শিত হইলে জগন্নাথ ও বলরাম দেব যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন, রাজা স্বয়ং এ কথা জানিতে পারেন! (উৎকলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ, পৃঃ ১০৮) দধিবিক্রেত্রীর চিত্রও দেওয়ালের গায়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। গল্পটি ক্ষীরগ্রামেব যোগাগু়া দেবী-সংক্রান্ত একটি প্রবাদের কথা স্মরণ কবাইয়া দেয়। দেবী শাঁখা ক্রয় করিয়া শাঁখারীকে এইরূপে পূজারীব নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবান ভক্তের অধীন, এই বিশ্বাস হিন্দুর মনে কিরূপ বদ্ধমূল, তাহা এই সকল জনপ্রিয় কাহিনী হইতে জানা যায়।

জগন্নাথ-মন্দিরে কারু-কার্য্যের অভাব নাই। মন্দিরের "বিমান" অংশটি আগাগোড়া সিমেণ্ট দিয়া পলস্ত্রা করা। বিমানের গাত্রে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্ত্তি। তাহার প্রায় বিশ হাত নিম্নে বৃক্ষশাখাধারী হনুমান-মূর্ত্তি। (১১) দেখিলাম, নৃসিংহ, হরিহর, ব্রহ্মা, গণেশ, নারদ, রাম, দশানন প্রভৃতি আরও বহু পৌরাণিক মূর্ত্তি রহিয়াছে। একটী চিত্রে রামগতপ্রাণ হনু জানকী-দেবীকে প্রণাম করিতেছে। বামন ও বরাহ অবতারের মূর্ত্তি দুইটি sculptor বা বর্দ্ধকীর শিল্প-নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচায়ক। কটি দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'দানা'র মালা, ঝাঁপা প্রভৃতি অলঙ্কার, এমন কি পরিচ্ছদের ভাঁজগুলিও সুন্দররূপে তক্ষিত হইয়াছে। বামন-মূর্ত্তির মস্তকে টোপরের ন্যায় সূচালো মস্তকাবরণ। মুখাবয়ব সুন্দর, তবে নাকটি যেন অধিক উচ্চ বলিয়া মনে হয়। বরাহ-মূর্ত্তির পদ্মাসনের উপর দণ্ডায়মান। সাধারণ বিষ্ণু মূর্ত্তির ন্যায় এ মূর্ত্তিরও চারিটি হস্ত। ইহাব সন্নিকটে পশ্চিম ধারের একটি niche বা কুলঙ্গিতে নৃসিংহ-মূর্ত্তি চতুর্হস্ত, গদাচক্রধারী; গলায় রুদ্রাক্ষমালা; দুই হস্তে হিরণ্যকশিপুর নাড়ী ছিঁড়িয়া বাহির করিতেছেন।

উৎকল খণ্ডে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নৃসিংহ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যে নৃসিংহ-উপাসনা উৎকলের সহিত কোন সময়ে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। রাজপুতানাস্থ অসিয়া গ্রামের মন্দিরগাত্রেও নৃসিংহ মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। দাক্ষিণাত্যেও নরসিংহ উপাসনা বিশেষ ভাবে প্রচলিত। নরসিংহকে দক্ষিণদেশে 'সিংহপেরুমল' বলে। নরসিংহের রাগান্বিত মূর্ত্তির নাম উগ্রনরসিংহ এবং প্রহ্লাদের স্তবস্তুতিতে শান্তভাবাপন্ন নৃসিংহ মূর্ত্তির নাম লক্ষ্মীনরসিংহ। (South Indian Gods & Goddesses p. 24—30) মান্দ্রাজে ভিজাগাপটমে সিংহাচলম, কর্ণুল জেলায় অহ্রবলম্ এবং ত্রিচিন্নপল্লীতে নমক্কল নরসিংহ পূজার প্রধান কেন্দ্রস্থান বলিয়া বিখ্যাত। দাক্ষিণাত্যের সহিত

---

(১১) শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সুলিখিত গ্রন্থে মন্দিরের এ অংশের বিবরণ বেশ বিস্তারিত ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে। পৃঃ ৪১৩-৪১৫।

উৎকলের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাতে নৃসিংহ পূজা দাক্ষিণাত্য হইতে উৎকলে প্রচারিত হওয়াও অসম্ভব নহে। কেবল দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে-দেখিতে চিত্রে মানব-হৃদয়ের পবিত্র অভিব্যক্তি-দর্শনের জন্য স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। জগন্নাথের মন্দিরে এ শ্রেণীর একটী চিত্র নিতান্ত হৃদয়হীন ব্যক্তিকেও বিচলিত করিয়া তুলে।' এটি হিন্দু-রমণীর মাতৃ-মূর্ত্তির চিত্র। (১২) মাতার কর্ণে সুবৃহৎ কুণ্ডল; বাহু ও প্রকোষ্ঠে অলঙ্কার। পুত্রকে বক্ষে তুলিয়া ধরিয়া তন্ময়ভাবে তাহার প্রতি চাহিয়া আছেন; শিশুও মাতার মুখের দিকে সহাস্য বদনে চাহিয়া রহিয়াছে। পুরী আসিয়া এ চিত্রটি না দেখিলে কারুকার্য্য-দর্শন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভিন্সেণ্ট স্মিথ ভারতবর্ষ ও সিংহলের চিত্রকলা বিষয়ক ইতিহাস-গ্রন্থে এ চিত্রটির বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

জগমোহন হইতে পূর্ব্বদিকের দ্বার দিয়া নাট-মন্দিরে এবং পশ্চিমের দ্বার দিয়া বিমানে যাওয়া যায়। নাট-মন্দিরেরই অনুরূপ ভোগমণ্ডপের কৃষ্ণ ক্লোরাইট প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু একবারমাত্র দেখিলে এগুলির সৌন্দর্য্য সম্যক উপলব্ধি হয় না। মন্দির-পরিক্রমণকালে এগুলি পুনরায় নয়নপথে পতিত হইল। ভোগমণ্ডপের পূর্ব্বদিকের বাম পার্শ্বে দোলযাত্রার চিত্র। দোলনার লোহার শিকল ও ঝাপ্পা প্রভৃতিও অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত খোদিত হইতেছে। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা—কৃষ্ণ রাখাল-বালকদিগের সহিত গরু চরাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন, গোধনগুলি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। তাহার পর রামের রাজ্যাভিষেক, এবং তৎপরে নৌবিহারের চিত্র। ভোগমণ্ডপের উত্তর ধারে সীতার বিবাহ, রামের সিংহাসনারোহণ, ইন্দ্র ও ঐরাবত প্রভৃতির চিত্র বড়ই সুন্দর। ফরাসী পণ্ডিত গুস্তাভ লে বঁ (Gustave le Bon) মন্দিরের এ সকল চিত্রাদির বিষয় বোধ হয় অবগত ছিলেন না; কারণ, মন্দিরে অহিন্দুর প্রবেশ নিষেধ। শুনিয়াছি, ফটোগ্রাফ লওয়া সম্বন্ধেও অনেক রূপ আপত্তি ঘটে। Le Bon (লে বঁ) বলিয়াছেন, "জগন্নাথের মন্দির ভুবনেশ্বরের অনেক পরবর্ত্তী কালে, অনুমান, খৃঃ ১২০০ অব্দে নির্ম্মিত। আর্ট বা ললিতকলার হিসাবে দেখিতে গেলে ইহা এতই অপকৃষ্ট যে, বাস্তবিকই ভুবনেশ্বরের ব্যঙ্গ প্রতিচ্ছবি (veritable caricature) বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের চূড়া ও বিমান প্রভৃতি ভুবনেশ্বরেরই অনুকরণে নির্ম্মিত বটে, কিন্তু প্রস্তরের খোদিত চিত্রগুলি অত্যন্ত স্থূল অসংযত রকমের (grossieres)। পুরীতে যে সকল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলিরও এই দশা। নমুনার চিত্র-দৃষ্টে সকলেই এ উক্তির যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারিবেন।" এই বলিয়া মসিয়ে বঁ নিজ পুস্তকে প্রকাশিত চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

(১২) শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ একটি চিত্র কোণার্ক-মন্দির-গাত্রে দর্শন করিয়া তাহার আলোক-চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। কোণার্ক, ভুবনেশ্বর ও পুরী মন্দিরে কয়েকটি চিত্রের বিভিন্ন প্রতিরূপ নয়ন-পথে পতিত হইয়া থাকে।

সব কয়টি ফটোই গুণ্ডিচা-বাড়ীর চিত্র হইতে গৃহীত। মন্দিরস্থ তরুণী-বাহিত তরণীর চিত্রটি দেখিলে ফরাসী পণ্ডিত অন্ততঃ সেটির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—তবে শুনা যায়, সেটিও নাকি কোণার্ক হইতে আনীত। (১৩) মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মনে হইতে লাগিল যে এই যে প্রদক্ষিণ-পথ, তাঁহা কত না দূরাগত তীর্থ-দর্শকের পাদস্পর্শে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে! সাঞ্চী ও তক্ষশিলার বৌদ্ধস্তূপাদির চারিদিকেও এইরূপ প্রদক্ষিণ বা পরিক্রমণ-পথ দেখা গিয়া থাকে। হেভেল সাহেবের মতে এই প্রাচীন পরিক্রমণ-পথ ও ব্রাহ্মণদিগের সূর্য্যোদয়ে, দ্বিপ্রহরে ও সূর্য্যাস্তে সন্ধ্যাবন্দনা-বিধি সৌরোপাসনার সঙ্কেত জ্ঞাপক। (belong to the ancient symbolism of sun worship—Ideals of Indian Art p. 69) বহির্দৃষ্টে সূর্য্য পৃথিবীকে প্রতিদিন পরিক্রমণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই যে শুধু এ প্রথার উদ্ভব হইয়াছে, এমন মনে হয় না। ভক্ত সর্ব্বস্বরূপ উপাস্য দেবতাকে—সম্মুখে পৃষ্ঠভাগে সকল দিক হইতেই নমস্কার করিতে চাহে ("নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব"—গীতা; একাদশ অধ্যায় ৪০) ভগবান সর্ব্বদেবাত্মক। বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি সকলে তাঁহারই অন্তর্গত, এই ভাব একবার হৃদয়ঙ্গম হইলে চারিদিক হইতে তাঁহাকে সহস্র সহস্রবার প্রণাম করিবার প্রবৃত্তি আপনা হইতেই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আর ইহ-লোকে নাই! গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটের সময়, তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মৃত্যুর কারণ, শোথ ও উদরী রোগ। তাঁহার বয়স হইয়াছিল মোটে পঞ্চান্ন বৎসর।

১২৭১ সালে ৫ই ভাদ্র তাঁহার জন্ম। বিদ্যালয়ে ও কলেজে তিনি আশ্চর্য্য মেধাবী ছাত্র বলিয়া নাম কিনিয়াছিলেন। প্রবেশিকা, বি-এ, এম এ এই তিনটি পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান দখল করিয়াছিলেন। কেবল এফ-এ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় হইয়াছিলেন, —তাহার কারণ পরীক্ষার অল্পদিন পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদীর দেহান্তর ঘটে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। ছাত্র-জীবনের চরম গৌরব অর্জ্জন করিয়া, তিনি প্রথমে রিপণ কলেজে অধ্যাপকরূপে ঢুকিয়া

(১৩) "The representation on that portion of the great temple at Jagannath which is said to have been once a part of the Black Pagoda of Kanaraka..." Dr R. K. Mukerjee. History of Indian Shipping p. 36 (Ed 1912)

পরে অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। রিপণ কলেজকে তিনি এত-বেশী ভালোবাসিতেন যে, টাকায় ও মানে আরো অনেক বড় পদ লাভের সুযোগ পাইয়াও, তাঁহার রিপণ কলেজকে তিনি মৃত্যু না-হওয়া-পর্য্যন্ত ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই।

বিদ্যা-দানের অবকাশে তিনি বাঙ্‌লা সাহিত্যের সেবা করিতেন। সাহিত্যের দিকে ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার একটা প্রাণের টান্ ছিল। তাঁহার নিজের মুখেই প্রকাশ, "শৈশবেই বাঙ্গলা মাসিক-পত্রিকার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আমার যখন আটবৎসর বয়স, আমি যখন গ্রাম্য পাঠশালায়, তখন......লুকাইয়া বঙ্গদর্শন পড়িতাম।.....বয়স হইল, সাহিত্যের রস-পিপাসা বাড়িল।"

রামেন্দ্রসুন্দর প্রকাশ্যভাবে লেখকরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হন, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবনে'র প্রথম বৎসরে। স্বনামে, বেনামে 'নবজীবনে' তাঁহার কয়েকটি লেখা পর-পর বাহির হয়। 'নবজীবনে'র অন্তর্ধানের পর 'সাধনা'য় তিনি আবার নূতন-করিয়া প্রকাশ্য সাহিত্য-সাধনা সুরু করেন। তারপর 'সাহিত্য' ও 'ভারতী'তে নিয়মিত লেখকরূপে দেখা দেন।

'ভারতী'কে তিনি বরাবর শ্রদ্ধা করিতেন, আদর করিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "ভারতী এককালে আমাকে সেবার অধিকার দিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি ঋণী আছি।... ...কয়েক বৎসর ধরিয়া 'ভারতী'র সাধ্যমত সেবা করিয়াছি।"

'ভারতী'র প্রতি তাঁহার অনুরাগ যে কত-বেশী ছিল, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি নিজেই তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতী আয়ুষ্মতী হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করুন—ইহা প্রার্থনা করি।... ..আশা করি আমার বাঁকাল জীবনের বাকি কয়টা দিন ভারতীর পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সাহিত্যের "অম্লমধুর" রসের আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই উপদেশ পালন করিয়া যাইতে পারিব।" রামেন্দ্রসুন্দরের অকাল মৃত্যুতে 'ভারতী' আজ কত বড় একজন বন্ধু হারাইল!

বাঙ্‌লা সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর যে আসনে বসিয়া ছিলেন, সেখানে তাঁহার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী একজনও নাই। সাহিত্যের একদিক তিনি অন্ধকার করিয়া গিয়াছেন। অমন মিঠা হাতে, অমন সোজা ভাষায় অল্প কথায় আর কোন বাঙালী লেখক কঠিন বিজ্ঞানকে এত সহজ ও গল্পের মত হাল্‌কা করিয়া লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধগুলির সর্ব্বত্রই রামেন্দ্রসুন্দরের মৌলিকতা ও নিজস্ব বিশেষত্ব সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। তাঁহার নিজস্ব একটি পরিষ্কার ঝরঝরে লেখার কায়দা ছিল—বেশীর ভাগ বাঙালী লিখিয়ের রচনায় যাহা দেখা যায় না। তিনি অনেকের মত বস্তা বস্তা লেখা রাখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু যতটুকু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অল্প হইলেও, ছোট হীরার টুক্‌রার মত রূপে-গুণে-দামে সবদিকে বড়।

রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্যে চল্‌তি ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। এ-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,

"অকারণে ভাষাকে দুর্গম ও দুর্বোধ্য করিয়া লাভ কি? "তেল" শব্দ অশ্লীলও নহে, অনার্য্যও নহে, ভদ্রসমাজে উহার ব্যবহারে কেহ কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না; সুতরাং আমরা সাহিত্যের ভাষাতেও ('তৈলে'র বদলে) তেলই ব্যবহার করিব।......চণ্ডীদাস অথবা কৃত্তিবাস সাধু সংস্কৃত শব্দ অধিক ব্যবহার করেন নাই। তাঁহাদের ভাষায় যাঁহারা সৌন্দর্য্য দেখিতে অক্ষম, তাঁহাদিগকে আমরা অন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।...... কাজেই অসংস্কৃত শব্দও বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় স্থান পাইতে পারে। সংস্কৃত না হইলেই যে বিশুদ্ধ হয় না, এমন নহে।... ...আধুনিক সাধুশব্দবহুল সাহিত্যের পোনের আনা লুপ্ত হইলে আমরা সবিশেষ দুঃখিত হইব না।......চেষ্টা করিলে বরং 'খাঁটি' সংস্কৃতকে কতক পরিহার করা যাইতে পারে, কিন্তু 'খাঁটি' বাঙ্গলার সম্পূর্ণ পরিহার একেবারে অসাধ্য।......সংস্কৃতজ্ঞের লেখনী যদি নিতান্তই কম্পিত হয়, তিনি সৃষ্টি' লিখুন; অনুগ্রহপূর্ব্বক 'সর্জ্জন' লিখিবেন না।...... অবহেলার অধিকার তোমার নাই। 'অকিঞ্চিৎ-কর' বলিবার অধিকার তোমার নাই। slang 'অপভাষা' বলিয়া নাসিকা-কুঞ্চনে অধিকার তোমার নাই। যদি সেরূপ অবহেলা কর, বা অবজ্ঞা কর, তুমি দয়ার পাত্র; তদপেক্ষা তীব্র বিশেষণ ব্যবহার করিব না।"

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের আর-একটি বড় কাজ, সাহিত্য-পরিষদের সেবা। পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই তিনি কথায়-কাজে মনে তাহার বন্ধু ছিলেন এবং পরিষদের বিপদে আপদে তিনি নিজের বুক পাতিয়া দিয়া, জীবনে অনেকবার অনেক ঝড়-ঝাপটের দাপট হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন। এমন-কি, রোগজীর্ণ শেষ-জীবনেও তিনি পরিষদের ভাবনা ভাবিতে ও কাজ করিতে ছাড়েন নাই। যাঁহাদের জন্য সাহিত্য-পরিষদের আজ এত নাম-ডাক, এত উন্নতি, তাঁহাদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরও প্রধান একজন। একসময়ে তিনি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে হইলেই ভাল হইত।

বাঙলায় অনেকগুলা সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গেল,—তাহার কয়েকটিতে সাহিত্যের সহিত সম্পর্ক অল্পই, এমন কয়েক জনকে প্রধান সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইল, অথচ সাহিত্যের এই একনিষ্ঠ সাধক, জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য্যকে সে আসনে কোনদিন বরণ করা হইল না—সম্মিলনের এ লজ্জা কি কোনদিন ঢাকা পড়িবে!

রামেন্দ্রসুন্দরের হৃদয় ছিল প্রশস্ত, চরিত্র ছিল উদার। জাঁকজমক কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানিতেন না। ঝগড়াঝাঁটি, নিন্দা-গালাগালিকে নির্ব্বিরোধী রামেন্দ্রসুন্দর ভারি ভয় করিতেন, তাই সারাটা জীবন তিনি সাহিত্যের সকলরকম দলাদলি হইতে তফাতে তফাতে থাকিতেন। অত-বড় পণ্ডিত হইয়াও কথাবার্তায়, লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে, আদান-প্রদানে সর্ব্বদাই

তিনি বিনয়প্রকাশ করিয়া চলিতেন, সকল শ্রেণীর লোকই তাই অনায়াসে নির্ভয়ে তাঁহার সঙ্গে মিলিতে-মিশিতে পারিত। যখনই তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার মুখে মৃদু-মৃদু হাসি ছাড়া আর-কিছু দেখি নাই। আজ আমাদের বুক খালি করিয়া তিনি জন্মের মত চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেই শিশুর মত সরল মুখে মৃদু-মিষ্ট হাসিটুকু এখনো আমাদের প্রাণের ভিতরে লাগিয়া আছে। সে সুন্দর হাসি ভুলিবার নয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের একমাত্র পুত্র বাল্যকালেই গত হইয়াছিল। এখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও একমাত্র কন্যাকে রাখিয়া তিনি পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোকে সারাদেশ কাঁদিতেছে। এ কান্নার সময়ে আমাদের আর বেশী কিছু বলিবার নাই। রামেন্দ্র-সুন্দরের শোকতপ্ত পরিবারের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইয়া, বাঙ্‌লা সাহিত্যের এই অন্য-সেবকের অকাল-মৃত্যুর করুণ কথা এইখানেই শেষ করিলাম।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

শুভদৃষ্টি

(আষাঢ় সন্ধ্যায়)

সজল জলদ ছেয়েছে বিমান, বিমানধরণী তিমির-লিপ্ত,
নীরদ চুম্বি বিজলির হাসি, বিশাল বিশ্ব করিছে দীপ্ত।
শ্যামল শস্য করিছে নৃত্য, বহিছে মধুর মারুৎ মন্দ,
'বউ কথা কও' ফুকারে বিহগ, পুলকিত করি কুসুম-গন্ধ।

সহসা খুলিল নন্দন-দ্বার, গগন-আঙন জলদ-মুক্ত,
ত্রিলোক-জোছনা লুটাল ভূলোকে, আঁধার হইল আলোকে যুক্ত।
বাজিয়া উঠিল মঙ্গল শাঁখ, হুলু দিল পুর-রমণীবৃন্দ,
ফুলের কোমল ক্ষণিক বাঁধনে হৃদয়ে হৃদয় হইল বদ্ধ।

অতনুর ধনু অণু-পরমাণু বেঁধে অনুরাগ আকুল বুকে,
এক হয়ে গেল দুইটি জীবন—চিরদিন-তরে দুঃখ-সুখে।
অসীম ভাসিল সীমানার মাঝে, তৃপ্ত, মোহিত নিখিল সৃষ্টি,
মরমের প্রেম নয়নে দোঁহার রচি দিল শুভ-মিলন-দৃষ্টি।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ অধিকারী

যক্ষ্মা

যক্ষ্মার ন্যায় ভীষণ ও মারাত্মক ব্যাধি আর নাই; এ দেশে কথায় বলে, শিবের অসাধ্য রোগ। ইহার প্রকোপে আজ কত ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে! যে কোন ব্যক্তি উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারই আত্মীয়-স্বজন তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে। বঙ্গদেশে ধনীর প্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রের পর্ণকুটীরে পর্য্যন্ত যক্ষ্মা আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। Dr. Bentley ঢাকায় Social Service Exhibition এ বলিয়াছেন যে ভারতের অনেক প্রদেশে সমগ্র মৃত্যু সংখ্যার দশভাগের এক ভাগ মৃত্যু এই রোগে। খুব সম্ভবতঃ বর্ত্তমান সময়ে এই বঙ্গদেশে কম হইলেও প্রায় অর্দ্ধ-লক্ষ লোক এই রোগে ভুগিতেছে, এবং প্রকৃত পক্ষে এই রোগ-নিবারণের জন্য অদ্যাবধি কিছুই করা হয় নাই।

বাস্তবিক আমাদের দেশে ইহার উপযুক্ত চিকিৎসা নাই, এবং সকলেরই বিশ্বাস, এই রোগে আক্রান্ত হইলে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু আমেরিকা যক্ষ্মাকে অতি ভীষণ রোগ বলিলেও ইহার দ্বারা মৃত্যু যে নিশ্চিত ঘটিবেই, তাহা স্বীকার করে না, বরং আমেরিকাবাসীরা উক্ত ব্যাধিকে "preventable and curable disease" বলে; ভারতবাসী বোধ হয় এ কথা বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু বাস্তবিক যদি উক্ত রোগে আক্রান্ত হইবার সূচনাতেই উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়, তবে যক্ষ্মার সর্ব্বগ্রাসী সংহার-মূর্ত্তি দেখিয়া কাহাকেও ভীত হইতে হয় না এবং অকালে এই কর্ম্মময় ও আনন্দময় জীবনকে অতি শোচনীয়ভাবেও বিসর্জ্জন দিতে হয় না। অন্যান্য রোগে মানুষ অল্প দিন ভুগিয়া কষ্ট পায় কিন্তু যক্ষ্মা মানুষকে বহুদিন ধরিয়া তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া যায়। যক্ষ্মার ন্যায় মারাত্মক রোগের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের দেশে শীঘ্র হওয়া উচিত। যাহাতে সুস্থ ও সবল ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত না হইতে পারে এবং রোগের সূত্রপাতেই কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিলে আরোগ্য লাভ করা যায়, এই বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা করিব। সকলে যদি সেই ব্যবস্থা মানিয়া চলিবার চেষ্টা করে, তবে আমরা বলিতে পারি আমাদের দেশে যক্ষ্মারোগ ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। গুছাইয়া বলিবার জন্য আমরা বিষয়টিকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছি:—

(১) যক্ষ্মারোগাক্রান্ত না হইবার উপায়।

(২) যক্ষ্মারোগের লক্ষণ।

(৩) স্কুল হইতে উক্ত রোগের সূচনা।

(৪) থুথু কি করিয়া নষ্ট করা যায়।

(৫) যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইলে কি করা কর্ত্তব্য।

(৬) পথ্য।

(৭) বিবিধ প্রতিষেধক (disinfectant)।

(৮) যক্ষ্মারোগীর বায়ু-পরিবর্ত্তন।

১

যক্ষ্মারোগাক্রান্ত না হইবার কয়েকটী প্রধান উপায়:—বিশুদ্ধ বায়ু-সেবন, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, বাসগৃহে, অফিসে ও কর্ম্মস্থলে আলোক ও বাতাসের বহুলতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ, সুপাচ্য ও পরিমিত আহার, সংযত জীবন-যাপন। অত্যধিক ধূম ও মদ্য-পানে মানবের জীবনী শক্তি হ্রাস হয় ও অতি-শীঘ্র মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কোথাও থুথু ফেলিবে না, সে রাস্তাতেই হোক, কিম্বা বাড়ীর দেওয়ালে, মেজেয় কি কোন গাড়ীতেই হোক। যদি থুথু ফেলিবার দরকার হয়, তবে পিক্‌দানী বা কোন পাত্রে অল্প জল দিয়া তাহাতে, অথবা এক টুক্‌রা কাপড়ে ফেলা উচিত। কারণ সকলের জানা উচিত যে "no spit, no consumption।" বিলাতে ও আমেরিকার রাস্তায় ফুটপাথে, আলোকস্তম্ভে বাড়ীর দেওয়ালে "থুথু ফেলা নিষেধ," "এখানে থুথু ফেলিলে .....টাকা দণ্ড হইবে" ইত্যাদি লেখা থাকে।

এমনভাবে কাপড় পরা উচিত যাহাতে মাটীতে কাপড় না স্পর্শ করে; রাস্তায় চলিতে কাপড় মাটীতে লুটাইলে কাপড়ে ধূলা-ময়লা, থুথু প্রভৃতি লাগিয়া যায় ও বাড়ীতে নানা প্রকার রোগের আমদানি হয়।

সোনা, রূপা বা কোন প্রকার ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা মুখের মধ্যে দিবে না। কারণ পয়সা, আনী, দুয়ানী, সিকি, আধুলী, টাকা প্রভৃতি কত প্রকারের কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত লোকের হাত দিয়া চলা-ফেরা করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মুখে দেওয়া দূরে থাকুক, মুদ্রাস্পর্শে হাত ধোয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আহারের পূর্ব্বে হাত মুখ ধুইতে অবহেলা করা উচিত নহে; হাত না ধুইয়া হাতের অঙ্গুলি মুখের মধ্যে বা নাকের গর্ত্তে প্রবেশ করাইবে না।

প্রত্যহ স্নান করিবে ও দেহ পরিষ্কার রাখিবে। কি শীত কি গ্রীষ্ম, সর্ব্বকালেই মুক্ত বাতাসে প্রত্যহ ব্যায়াম করিবে। ভ্রমণ করা, দাঁড় বহা, সাঁতার কাটা ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি শরীরের পক্ষে অনুকূল। নাক দিয়া সর্ব্বদা নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইবে। অত্যধিক ব্যায়ামও আবার ভাল নয়; সবল সুস্থ ব্যক্তিও তাহাতে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। যক্ষ্মারোগীর সহিত কখনও এক-ঘরে শয়ন করিবে না। উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে কখনও চুম্বন করিবে না বা করিতে দিবে না।

ঘর-দ্বার সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। মধ্যে মধ্যে ঘরের দেওয়াল ধৌত করা কিংবা চুণকাম করা উচিত। যে গৃহে একবার কোন যক্ষ্মারোগী বাস করিয়াছে, সে গৃহে বাস করিবার পূর্ব্বে খুব ভালরূপে disinfect করা কর্ত্তব্য। যক্ষ্মার বীজ না পুড়াইলে অনেকদিন যাবত উহা বাঁচিয়া থাকে, বিশেষতঃ অন্ধকারপূর্ণ, অপরিষ্কার ও স্যাঁতসেঁতে জায়গায় যক্ষ্মাবীজ বহুদিন জীবিত থাকে। জনতার সংস্পর্শ ত্যাগ করিবে, কারণ জনতা হইতেই

নানা রোগের উৎপত্তি ও উহার প্রসার হয়।

থালা, বাটী, গেলাস প্রভৃতি বাসন সর্ব্বদা ধৌত করিয়া ব্যবহার করিবে। আমেরিকার কোন কোন প্রদেশে জন-সাধারণের একগ্লাসে জল বা মদ্যপান করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। হোটেল প্রভৃতি সাধারণ ভোজনাগারে একই গ্লাসে বা একই পেয়ালায় একাধিক ব্যক্তিকে পান করিতে দিবার প্রথা রহিত হইয়াছে। চলন্ত ট্রেণেও একই গ্লাসে জল খাইতে দেওয়া হয় না; সেখানে দুই পয়সা করিয়া একরূপ কাগজের গেলাস কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে করিয়াই যাত্রীগণ জল পান করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে আজ যদি গভর্ণমেন্ট ঐ ব্যবস্থা করেন, তবে বহু লোক রোগের হাত এড়াইতে পারে।

কাহারও ব্যবহৃত জামা-কাপড় পরিধান করা উচিত নহে। জুতা-জামা ভিজিলে তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করিবে

শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে শয়ন-গৃহে অবাধে বাতাস খেলিতে দিবে। মুক্ত বাতাসে যক্ষ্মার বীজাণু বাঁচিতেই পারে না। সামান্য সর্দ্দি-কাশীকে কখনও অবহেলা করিবে না। সর্দ্দি-কাশী থাকিলে যক্ষ্মার বীজ সহজে আক্রমণ করিবার সুবিধা পায়।

পুস্তকের পাতা উল্টাইবার সময় অনেকে আঙুলে থুথু মাখাইয়া থাকেন, এ অভ্যাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

২

সব যক্ষ্মারোগীদেরই যে প্রথম অবস্থা একই রূপ হয়, তাহা নহে, তবে বেশীর ভাগেরই লক্ষণ এক-রূপ হয়। যক্ষ্মা-রোগের কতকগুলি লক্ষণ:—ক্ষুধামান্দ্য, গুরুত্বের লাঘবতা, অল্পশ্রমে ক্লান্তি, দৌর্ব্বল্য অনুভব করা, উৎসাহ ও উচ্চাশার অভাব, নাড়ীর গতির দ্রুততা, সকালে ও বৈকালে অল্প অল্প জ্বর এবং সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প কাশী (সকালে বাড়ে)। যাহার কখনও নিউমোনিয়া, হাম বা হুপিং কফ্ হইয়াছে, তাহাকে যক্ষ্মা সহজে আক্রমণ করে। শরীরের ওজন ক্রমশঃ কম বলিয়া মনে করিলে ডাক্তারকে দিয়া নিজের শরীর ও থুথু পরীক্ষা করাইবে। গুরুত্বের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে যদি ক্ষুধার অভাব, heart-beatingএর বৃদ্ধি, বৈকালে ও প্রাতঃকালে কাশী থাকে, তবে তাহা যক্ষ্মারোগের লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। যক্ষ্মারোগীর জ্বর সকালে normal সহজ অবস্থার নীচে (অর্থাৎ ৯৮.৬) নামে ও বৈকালে ১০০ ডিগ্রী ওঠে। কয়েকদিন ধরিয়া রোগীর সকাল, দুপুর ও বৈকালে তাপ গ্রহণ করিয়া, ডাক্তারের সাহায্যের নিমিত্ত একটী খাতায় লিখিয়া রাখিবে। রোগ যে না কমিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত লক্ষণ হইতে বুঝা যায়:—ক্রমশঃ ক্ষীণ হওয়া, প্রত্যহ জ্বর, চোখের অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ রক্তিম গণ্ড, নিদ্রাকালীন ঘর্ম্ম, অবিরাম কাশী ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি। এই লক্ষণগুলি দেখিলে কাল-বিলম্ব না করিয়া ডাক্তার দেখাইবে। দুঃখের বিষয়, রোগের প্রথম অবস্থায় কেহ বড় গ্রাহ্য করেন না, পরে বৃদ্ধি পাইলে নিজের জীবনের আশাও পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা ছাড়া অনেকে জীবনকে বিপন্নও করেন।

৩

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জনতা হইতে সংক্রামক ব্যাধি গৃহে প্রবেশ করে। একটী বিদ্যালয়ে তিন শত ছাত্রের মধ্যে সুস্থ, সবল, ক্ষীণ, দুর্ব্বল, ব্যাধিগ্রস্ত কতপ্রকারের বালক থাকে। এখন যে সুস্থ সবল, সে অপর-কোন সংক্রামক রোগাক্রান্ত বালকের সংস্পর্শে আসিয়া ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত কোনও শিক্ষকের শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত কোন ছাত্রের স্কুলে পাঠ-শিক্ষার জন্য আগমন অকর্ত্তব্য। ঐ রোগগ্রস্ত কোন কেরাণী বা কর্ম্মচারীর বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত। বিদ্যালয়ের কক্ষ গুলিতে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে আলো ও বাতাস প্রবেশ করে, তাহার ব্যবস্থা করিবে।

ছাত্রগণ কখনও কাহারও ব্যবহৃত পেন্সিল বা অন্য-কিছু দ্রব্য লইয়া ব্যবহার করিবে না; কারণ বালকদিগের প্রায়ই পেন্সিল-কলমের প্রান্তভাগ মুখে দেওয়া অভ্যাস আছে। ছাত্রদের শ্লেট ব্যবহার করা উচিত নহে। ঘরের দেওয়ালে মেজের বেঞ্চে থুথু ফেলা অকর্ত্তব্য, কারণ সকলের জানা উচিত যে "no spit, no consumption." ছাত্রগণের স্কুলের জল খাইবার গেলাস ব্যবহার করা উচিত নহে; যদি ব্যবহার করার আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, তবে খুব উত্তমরূপে তাহা ধৌত করিয়া তবে ব্যবহার করা উচিত।

দোকান হইতে বাঁশী, বা অন্য কোন বাজনা (মুখ দিয়া বাজাইবার) ও খেলেনা প্রভৃতি কিনিবার পর সর্ব্বদা তাহা ধৌত করিয়া ব্যবহার করিবে।

বিদ্যালয়ের মেজে ঝাঁট দিবার পূর্ব্বে ধৌত করিয়া লইলে ধূলা উড়িতে পায় না। ধূলা সংক্রামক রোগের আবাস-ভূমি। ধূলায় মিশিয়া নানা রোগের বীজ নিশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবেশ করে; সেই জন্য ধূলার সংস্পর্শ হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকিবে। অন্ততঃ তিন-মাস অন্তর সমস্ত বিদ্যালয়টী উত্তমরূপে ৩ নং disinfectant (যাহার কথা পরে বলা হইয়াছে) দ্বারা ধৌত করা আবশ্যক। ছেলেরা নাক দিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে কি না, শিক্ষকগণের তাহা দেখা কর্ত্তব্য। যদি তাঁহারা দেখেন যে কোন বালক মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে, তৎক্ষণাৎ তাহা তাহার পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের জানাইবেন।

ক্লাসে বসিবার সময় বালকগণ কখনও কুঁজো হইয়া বসিবে না। কুঁজো হইয়া বসিলে বুক প্রশস্ত হয় না, ও নিশ্বাস-প্রশ্বাস অবাধে লওয়া-ফেলা যায় না। সেই জন্য ডেস্ক ও বেঞ্চ বালকগণের বসিবার উপযোগী হওয়া উচিত। বাদলার দিন না হইলে বালক ও শিক্ষকগণের টিফিনের ছুটীতে একবার বাহিরে ঘুরিয়া আসা ভাল।

৪

যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তি কখনও রাস্তায়, গাড়ীতে, পাব্লিক হলে, ঘরে, মেজের বা দেওয়ালে থুথু-গয়ার ফেলিবে না। অনেকে ইহা অগ্রাহ্য করিয়া জীবনকে বিপন্ন করেন। অন্যে যাহাতে বিপন্ন না হয়, তাহা করিতে হইলে জলপূর্ণ পিকদানী বা অন্য কোন পাত্রে থুথু ফেলিবে। পিকদানী বা অন্য কোন পাত্রে যেন জল ও কার্ব্বলিক

এসিড দিয়া পরে থুথু ফেলা হয়, প্রত্যহ উহা water closet-এ ড্রেনে বা পায়খানায় নিক্ষেপ করিবে। পিকদানীর মধ্যে যাহাতে থুথু পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে; উহার আশে-পাশে পড়ে, তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থান ১নং disinfectant (পরে বলা হইয়াছে) দ্বারা ধৌত করিবে। বহির্গমন-কালে যক্ষ্মারোগীর ছোট ছোট কাপড়ের টুক্‌রা লওয়া উচিত; কারণ রাস্তায় গমন-কালে থুথু ফেলিবার প্রয়োজন হইলে কাপড়ের টুক্‌রাতে তাহা ফেলিবে; পরে থুথু শুকাইবার পূর্ব্বেই তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলা উচিত।

যক্ষ্মারোগীর মনে রাখা উচিত:—"Do unto others as you would that they should do unto you" যাহাতে অন্য ব্যক্তি যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শে আসিয়া ঐ রোগগ্রস্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুনরায় বলিতেছি—কোন ঘরে, বা রাস্তায়, বা কোন বেড়াইবার স্থানে রোগীর কখনও থুথু-গয়ার ফেলা উচিত নহে। কাশিলে যে থুথু-গয়ার ওঠে, তাহা কখনও গিলিবে না। রোগ সারিয়া যাইবে মনে করিয়া রোগী সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও আশান্বিত থাকিবে। রোগীর সর্ব্বদা অন্যমনস্ক, আনন্দিত চিত্তে থাকা উচিত। প্রথম হইতেই উপযুক্ত চিকিৎসকের উপদেশ মত চলিলে সত্যই রোগ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। শীতে, গ্রীষ্মে, দিনে-রাত্রে যতদূর-সম্ভব ঘর খুলিয়া রাখিবে; রাত্রির বাতাস অস্বাস্থ্যকর নহে, সেজন্য ভয় হইবার কোন কারণ নাই।

মন প্রফুল্ল থাকিবার জন্য রোগী যদি ইচ্ছা করে, তবে কিছু হাল্কা ও বিনা-আয়াস সাধ্য কার্য্য করিলেও করিতে পারে; তবে কোন কাজ না করাই ভাল। ব্যায়াম ত্যাগ করিবে; অসুস্থ অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে বিশ্রামের প্রয়োজন। তবে যখন জ্বর থাকিবে না, ও রোগীর দেহে শক্তি সঞ্চয় হইবে, তখন অল্প শ্রমের কার্য্য করা চলে। তবে খুব সাবধান, অত্যধিক মানসিক ও শারীরিক শ্রমের দ্বারা রোগ-বৃদ্ধি এমন কি মৃত্যু অবধি ঘটিয়া থাকে।

রোগী মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলিবে না, সর্ব্বদা নাক দিয়া ফেলিবে। দেহ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে; ধূমপান ও মদ্যপান বিষবৎ ত্যাগ করিবে; জনতা হইতে দূরে থাকিবে। কাশিবার সময় মুখে রুমাল চাপা দিবে। কাহাকেও চুম্বন করিবে না; কাহারও সহিত hand shake কর-কম্পন করিবে না; অন্য ব্যক্তির খাইবার দ্রব্য কখনও বিক্রয় বা প্রস্তুত করিবে না; বা তাহাতে হাত দিবে না। বইয়ের পাতা উল্টাইবার সময় আঙ্গুলে থুথু লাগাইবে না।

৬

যক্ষ্মারোগীর সুপাচ্য, সুসিদ্ধ, পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন; রোগী যত খাইতে পারিবে, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল। তাই বলিয়া দিনে আট দশ বার খাইতে দেওয়া উচিত নহে; আট-দশ বারের চেয়ে চার-পাঁচ বার খাইলে উপকার বেশী হয়। খুব তাড়াতাড়ি বা খুব বিলম্ব করিয়া খাওয়া উচিত নহে। সব রোগীর হজম-শক্তি একরূপ নহে, সেজন্য কিরূপ আহার ও কয়ঘণ্টা অন্তর

আহার করা কর্ত্তব্য, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে মোটামুটি সাধারণ রোগীর খাদ্যের তালিকা দেওয়া যাইতে পারে। একবার খাওয়ার পর যদি বুঝিতে পারা যায় যে ভুক্ত দ্রব্য হজম হয় নাই, তবে কদাপি পুনরায় আহার করিবে না। অনেক রোগী দুধ খাইতে ভালবাসে না, কিন্তু দুধই তাহাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট ও প্রধান খাদ্য। অনেকের ধারণা যে দুধে কোষ্ঠবদ্ধতা হয়, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। একসের হইতে চারসের করিয়া দিনে দুধ খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। "এক গ্লাস দুধ, দুইটী ডিম, তিন আউন্স মাংস, যোল আউন্স গুগ্‌লি, এক আউন্স কোকো কিংবা মাখন ও দুই আউন্স রুটীর তুল্য উপকারী।" ১০১ ডিগ্রী জ্বরের উপর কখনও গুরু ভোজন করিতে নাই। একইরূপ আহার প্রত্যহ করিবে না, নানারূপ আহার করিবে। যাহাদের হজম করিবার শক্তি আছে, তাহারা নিম্নলিখিতভাবে আহার করিতে পারে :—

৭টা পূর্ব্বাহ্ন—ফল, পাঁউরুটী টোষ্ট ও মাখন, ২টী কাঁচা বা soft-boiled ডিম ও এক-কি দুই গ্লাস দুধ।

১০টা এক গ্লাস দুধ, মাখন ও টোষ্ট।

১২ : ৩০টা—সুপ, কচিৎ কখনও ভেড়া, পাঁঠা বা মুরগির মাংস, আলু, পটল, সিম, ফুলকপি, মটর ইত্যাদির দুই একটা নিরামিষ তরকারী, পাঁউরুটী ও মাখন, পাঁউরুটীর পুডিং, rice pudding, বাদাম ও আখরোট যক্ষ্মারোগীর পক্ষে খুব উপকারী।

৪টা অপরাহ্ন—দুইটা ডিম মিশ্রিত এক কি দুই গ্লাস দুধ, রুটী, মাখন।

সন্ধ্যা ৭টা—এক কি দুই গ্লাস দুধ, মাখন, রুটী, jelly কিংবা jam। যদি দ্বিপ্রহরের আহার লঘু হইয়া থাকে, তবে এই সময় মাংস দেওয়া যাইতে পারে।

খুব ধীরে ধীরে ভালরূপে চিবাইয়া খাইবে, কখনও গিলিয়া খাইবে না। দুধ খুব ধীরে ধীরে পান করিবে, চক্ চক্ করিয়া গিলিলে হজম হইতে বিলম্ব হয়। দুধের সহিত যৎসামান্য লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে উহা শীঘ্র হজম হয়। ডিম কাঁচা, সিদ্ধ, অল্প-সিদ্ধ, Poach করিয়া বা ভাজিয়া খাওয়া যায়; কিন্তু কাঁচা ডিমই সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। দুধের সহিত কাঁচা ডিম ফেনাইয়া খাওয়াও পুষ্টিকর। যক্ষ্মা-রোগীর পক্ষে মাখন অত্যন্ত উপকারী, মাখনে চর্ব্বি বৃদ্ধি করে।

ডাক্তার আলফ্রেড লুমিস্ বলেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ছয়বার রোগীর আহারের প্রয়োজন। ঘুমাইবার পূর্ব্বে ও গুরুভোজনের মধ্যে-মধ্যে অল্প আহার করা কর্ত্তব্য; শারীরিক ও মানসিক কষ্ট বা স্নায়ু-দুর্ব্বলতার সময় আহার করা উচিত নহে। দ্বিপ্রহর ও রাত্রির আহারের পূর্ব্বে অন্ততঃ বিশ মিনিট বিশ্রাম করিবে। আহারের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণে তরল পদার্থ থাকিবে; Starch চিনি বা মিষ্ট দ্রব্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যে সকল আহার্য্য দ্রব্যের পরিপাক-ক্রিয়া একই সময়ে সম্পন্ন হয়, তাহাই খাওয়া উচিত। দুই বারেই আহারের মধ্যকালীন সময়ের মধ্যে যাহা হজম হয়, তাহাই খাইবে। আহার-সামগ্রী সর্ব্বদা সুন্দররূপে রন্ধন করার পর খাওয়া উচিত। ডাক্তার আলবার্ট ফ্রান্সিন্ বলেন, "রাত্রি

নয়টা-সাড়ে-নয়টার মধ্যে রোগী শয়ন করিবে; আহারের পূর্ব্বে রোগী উত্তমরূপে হাত ও মুখ ধুইয়া লইবে; রোগী চিকিৎসকের অনুমতি-ব্যতীত কখনও মদ্যপান করিবে না।”

রোগীর প্রত্যেকবার আহারের পর তাহার উচ্ছিষ্ট থালা, গেলাস, বাটি, পেয়ালা, চাম্‌চে ইত্যাদি মাজিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট ধরিয়া সেগুলি গরম জলে ডুবাইয়া রাখা উচিত।

ঘর, শয্যা, পরিচ্ছদ ইত্যাদি। যক্ষ্মারোগী যত উন্মুক্ত জায়গায় বাস করিবে, তাহার পক্ষে ততই মঙ্গল; তাই বলিয়া সব সময় ও একেবারে উন্মুক্ত জায়গায় বাস করাও ভাল নয়। এই সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে রোগী উন্মুক্ত জায়গায় থাকিলে বীজ তত বেশী ছড়ায় না; কিন্তু অবরুদ্ধ স্থানে বা গৃহে থাকিলে অন্যলোক ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। বাহিরে (রাস্তায় বা লোক-চলাচল-স্থানে নহে) থুথু ফেলিলে বাতাস রৌদ্র ও বৃষ্টি দ্বারা বীজ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। যে রোগীর জানালা খুলিয়া শয়ন করা অভ্যাস নাই, তাহার পক্ষে বাহিরে শয়ন করা অসঙ্গত। দিনে রৌদ্রতাপ না লাগাইয়া যতদূর সাধ্য রোগীর বাহিরে থাকা উচিত। শুইবার সময় শীতকালে সূতার পাজামা বা সার্ট পরিবে, তাহার উপর আজানুলম্বিত ফ্লানেলের নাইট সার্ট। শীতকালে গরম মোজা পরা উচিত। রোগী যাহাতে গরমে ও আরামে শয়ন করিতে পায়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু দেহের উপর কোনও গুরুভার চাপাইবে না, কারণ তাহাতে রোগী ক্লান্তি ও অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে পারে। গরীবের পক্ষে নিম্নলিখিত উপায়টী সুলভঃ—দুইখানি পাতলা কম্বল বা গরম কাপড়ের মধ্যে ২।৪ খানা খবরের কাগজ পাট করিয়া পরে তাহা সেলাই করিয়া গায় দিলে বেশ হাল্কা, গরম ও আরাম বোধ হয়।

রোগীর ঘর বেশ বড় ও দক্ষিণমুখো হইবে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই দিকে দুইটা জানালা থাকিবে। ঘরে প্রচুর পরিমাণে রৌদ্র ঢুকিবে। অন্য ব্যক্তির শয়ন-ঘর রোগীর শয়ন-ঘর হইতে কিছুদূরে থাকিবে; রোগীর প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র ছাড়া সমস্ত দ্রব্যাদি ঐ ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবে; রোগী ঠিক ঘরের মধ্যভাগে শয়ন করিবে; ঘরে সর্ব্বদা পর্দ্দা দিয়া রাখিবে ও মাছি যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করিবে *।

৭

প্রতিষেধক বা Disinfectant.—রোগীর আরোগ্যলাভ বা মৃত্যু বা প্রস্থানের পর তাহার সংস্পৃষ্ট প্রত্যেক জিনিষপত্র নিম্নলিখিত-ভাবে disinfect করা কর্ত্তব্য।

ঘরের সমস্ত জানালা, দরজা বন্ধ করিয়া তবে disinfect করিবে। এমন জিনিষ, যাহা ধৌত করা যায় না, তাহা খুব ছড়াইয়া টাঙ্গাইয়া দিবে। যদি ঘরে বাক্স, সিন্দুক থাকে, তাহা খুলিয়া দিবে ও তাহাতে কোন জিনিষ-পত্র রাখিবে না। বালিস

* বহরমপুরের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ সেন অনুগ্রহপূর্ব্বক এই অধ্যায়টির স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সে জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।—লেখিকা।

খুলিয়া ফেলিবে, যাহাতে disinfecting gas তুলার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে ; ঘরের মধ্যে কোন জিনিস স্তূপাকার করিয়া রাখিবে না। গন্ধক দ্বারা disinfect করা যায়। ঘরের সমস্ত জানালা, দরজা বন্ধ করিয়া অন্ততঃ দশ ঘণ্টা ধরিয়া গন্ধকের ধূপ দিবে ; কিন্তু সাবধান, গন্ধকের ধূপ নাকের মধ্যে যেন না যায়! গন্ধকের ধূপ লাগাইবার পর সমস্ত দ্রব্য প্রখর রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিবে। ৩নং disinfectant (পরে বলা হইয়াছে) দ্বারা মেজে, দেওয়াল, ছাদের তলা, দরজা, জানালা প্রভৃতি উত্তমরূপে ধৌত করিবে। ঘরের মেজেয় যদি ফাট থাকে, তবে উক্ত তরল আরক solution খুব ভাল করিয়া উহার মধ্যে ঢালিয়া দিবে। অল্প দামের জিনিষ-পত্র (যাহা-কিছু রোগীর সংস্পর্শে ছিল) পুড়াইয়া ফেলাই বাঞ্ছনীয়। রোগীর সংশ্লিষ্ট বই না পুড়াইয়া disinfect করার সময় টেবিলের উপর পাতা খুলিয়া রাখা যাইতেও পারে।

মৃত্যু ঘটিলে মৃতদেহ লইয়া যাইবার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত উহা ঘরে (যে ঘরে মৃত্যু হইয়াছে) রাখিবে ; ও একখানি চাদর ৩নং disinfectant (পরে বলা হইয়াছে) দ্বারা ভিজাইয়া শবদেহে চাপা দিয়া তবে সৎকার করিতে লইয়া যাইবে।

শুশ্রূষাকারীগণ যাহাতে ঐ রোগে আক্রান্ত না হইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। চিকিৎসক-প্রদত্ত কোনরূপ antiseptic solution দ্বারা তাহারা দিনে দুই-তিন বার কুলকুচা করিবে ও নাকের ভিতর ধুইয়া ফেলিবে। তাহাদের হাত ধুইয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। যখন রোগী শয্যাগত থাকে ও জীবনের শেষ কয়দিন ধরিয়া তাহার উত্থানশক্তি রহিত হয়, সেই সময় সে কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারে না। সেই সময় উত্থান শক্তি না থাকার জন্য রোগীর বস্ত্র, বিছানাদি, মেজে, দেওয়াল, আসবাব প্রভৃতি প্রায়ই থুথু, গয়ার, বমন, রক্তাদি দ্বারা ভিজিয়া যায়। সেজন্য সর্ব্বদা সেইগুলি ৩নং disinfectant দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কার রাখিবে। ঘরের মধ্যে একটী পাত্রে উক্ত solution আরকে দুই ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে, তাহার পর সেগুলি নিংড়াইয়া সিদ্ধ করিয়া লইবে। ছেঁড়া নেকড়া, toilet paper ইত্যাদি তৎক্ষণাৎ পুড়াইয়া ফেলিবে।

নিম্নলিখিত solution গুলি standard disinfectant স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে :—

১। এক গ্যালন অর্থাৎ পাঁচ সের জলে ছয় আউন্স chloride of lime মিশ্রিত আরক solution।

২। এক গ্যালন জলে দুই ড্রাম Corrosive sublimate ও দুই ড্রাম Muriate of Ammonia মিশ্রিত solution। উক্ত solution কাঠের বা মাটীর পাত্রে তৈয়ার করিবে ও রাখিবে।

৩। এক গ্যালন জলে এক ড্রাম Corrosive ও এক ড্রাম Muriate of Ammonia মিশ্রিত solution। ইহাও কাঠের বা মাটীর পাত্রে তৈয়ার করিবে ও রাখিবে।

Chloride of lime, Carbolic acid ও Corrosive sublimate অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ। ১নং solutionএর বদলে এক গ্যালন জলে সাড়ে ছয় আউন্স কার্ব্বলিক এসিড্ মিশাইয়াও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৮

অনেকের ধারণা যে জল-বায়ু পরিবর্ত্তন করিলেই রোগ সারিয়া যায়, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। বরং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে রোগীকে বিদেশে লইয়া গেলে অনেক সময় বিপরীত ফল ফলে। রুগ্ন অবস্থায় মনে স্ফূর্ত্তির প্রয়োজন; আত্মীয়-বন্ধুর বিরহ রোগীকে ক্লিষ্ট করিলে তাহার দেহ ও মনের অবস্থা খারাপ হয় ও সে শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগীর পক্ষে বহুদূরব্যাপী রেলপথে ভ্রমণও ক্লান্তিজনক। আজকাল দেওঘর, মধুপুর, গিরিধি, শিমুলতলা প্রভৃতি স্থানে বহু রোগীকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য লইয়া যাওয়া হয়, এমন কি পুরীর সমুদ্র-তীরে তাহাদের রাখিয়া Ozone inhale করানও হয়। কয়জন তাঁহাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন? জল-বায়ু পরিবর্ত্তন করার সম্বন্ধে অনেক ডাক্তার অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। ফিলাডেলফিয়ায় হেনরি ফাইপস্ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাক্তার লরেন্স ফ্লিক বলেন—"যক্ষ্মা যে-কোন স্থানেই ভাল হইতে পারে।" বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, পরিমিত আহার, সুনিয়ম ও রোগবৃদ্ধিকালে নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম ও ব্যায়াম রোগীর পক্ষে প্রয়োজন। যাহাদের ঐ সকল সুবিধা বাড়ীতেই হয়, তাহাদের আর বিদেশ বা সানিটেরিয়ম্ স্বাস্থ্য নিবাসে যাইতে হয় না। বার্লিনের আচার্য্য ডাক্তার কর্ণেট বলেন,—Recoveries too are seen in every clime. প্রত্যেক স্থানেই রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা যায়। ডাক্তার ফ্লিক আরও বলিয়াছেন "Climate has practically nothing to do with the matter......It has been demonstrated however, by practical tests that the disease can be successfully treated anywhere."

যক্ষ্মারোগের ঔষধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ সংক্ষেপে ইহাই বলিয়াছেন:—

"Consumption cures" do not cure, neither do the doctors who claim their "Cures" will cure. Medicines may help, but no medicine in a bottle ever cured consumption.

শ্রীসুষমা সিংহ।

নীরব নিবেদন

(বিশ্ববরেণ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় সমীপে)

আজ নীরবে যাব প্রণাম ক'রে
একটু শুধু নিয়ে পায়ের ধুলো,
সঁপে মোদের প্রাণের অর্ঘ্য, কবি,
বল্‌ব নাকো বাক্য কতকগুলো।
বাক্য যে আজ শুধুই জ্বালার মালা,
হৃদয় সে যে রুদ্ধ ব্যথার ডালি ;
মৌন মুখে তাই তোমারে দেখি,
তিরিশ কোটির নয়ন দিয়ে খালি।
শঙ্কামূঢ় স্বদেশবাসীর পাশে
দেখি তোমায় আত্ম-বোধের ঋষি !
অভিচারের মন্ত্রে যখন ঘোলা
আকাশ জুড়ে নামে অকাল নিশি ;—
জগৎ যখন নিচ্ছে বিভাগ ক'রে
মারণ এবং উচ্চাটনে মিলে,
সে সঙ্কটে সত্য-অনুরাগী
আত্ম-প্রদ মন্ত্র তুমি দিলে।
আত্মনিষ্ঠ মানুষ স্বয়ম্প্রভু,
মন ব'লে তার একটা মহাল আছে,—
ভয়ঙ্করের ভোজবাজীতে কভু
খাজ্‌না আদায় হয় না কো তার কাছে !
সেই মহালের খবর তুমি দিলে,
সূর্য্য জাগে তোমার তূর্য্যরবে,
মানুষ বলেই প্রাপ্য যে মর্য্যাদা
সে মর্য্যাদা পেতে হবেই হবে।
গুমট রাতে অসঙ্কোচের হাওয়া
জাগ্‌ল,—উষার নিশাসটুকুর মত,
নাগালে বৈকুণ্ঠ বুঝি এল
তোমার পুণ্যে কুণ্ঠা হ'ল হত।

সত্য কথা সত্য যুগের কথা,
কলিযুগে চারদিকে তার ঘাঁটি,
কলির মানুষ—আমরা—ভাবি মনে
কামান যা' কয় সেই কথাটাই খাঁটি।
গোলন্দাজের গোলা যে বোল্ বলে
সেই বুলিটাই বুঝি চরম বলা,
আজ দিয়েছ তুমি সে ভুল ভেঙে
তিরিশ কোটির ঘুচিয়ে মনের মলা।
অপ্রমত্ত তোমার সরস্বতী
ভুভারতে দান করে আজ ভাষা,
সঞ্চারে বল আত্মাতে আত্মাতে
বাক্যে মনে সত্য হবার আশা।
সাচার আদর জাগ্‌ছে তোমায় হেরে
মিথ্যাচারের মহাজনীর হাটে,
কুণ্ঠিত দীন মনের উপর থেকে
ভ্রুকুটিময় মেঘ্‌লা বুঝি কাটে।
জীবন যা'দের অসম্মানের বোঝা,
গুলিয়ে যারা আছে অবজ্ঞাতে,
ইচ্ছা করার সহজ শক্তিটুকু
লুপ্ত যেন পঙ্গু পক্ষাঘাতে,—
তাদের তুমি মুখ রেখেছ, কবি,
হাল্কা ক'রে দিয়েছ ঢের লাজে,
সবার দুখের ভাগ নিয়ে স্বেচ্ছাতে
তকমা ছেড়ে এসে সবার মাঝে।
সারা ভারত শ্রদ্ধ তোমার ত্যাগে,
ঘুচল এবার টুট্‌ল মনের জরা,
তিরিশ কোটির প্রাণের স্পন্দ, কবি,
তোমার প্রাণের ছন্দে প'ল ধরা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বেদ বিশ্বমানবের আদিম ধর্ম্মবিধান

("Primeval Revalation")

সমস্ত মানবজাতি এক পরিবার* কিনা, নিগ্রো (Ethiopic), চীন (Mongolic), এবং আর্য্য (Caucasic), সকলে এক পিতার সন্তান কিনা, সে বিচার এস্থলে নিষ্প্রয়োজন; সে বিচারের আমরাও অনধিকারী। মানব জাতির আদিম নিবাস (Cradle-land) কোথায় ছিল, মধ্য এসিয়া, ইরান, তুরস্ক, অথবা সাইবেরিয়া, অথবা পুরাকল্পের ভারত-আফ্রিকীয় মহাদেশ (Indo-African continent), যাহার অস্তিত্ব, ভূবিদ্যা, উভয় দেশের পুরাকল্পের উদ্ভিদতত্ত্ব (Flora) এবং প্রাণীতত্ত্ব (Fauna), পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন,—সে বিচারেও আমরা অক্ষম। কোন্ বেদ কোন্ সময়ে, কোথায় রচিত হইয়াছিল, মঙ্গোলিয়াতে, পারস্যে, অথবা ভারতে, সে বিচারেরও আমরা অযোগ্য পাত্র। আবার বর্ষগণনাদ্বারা বেদের বয়স গণনা, আর বর্ষগণনাদ্বারা পৃথিবীর বয়স গণনা, উভয় চেষ্টাই বৃথা, কারণ গণনা আরম্ভ করা যাইতে পারে, তাহার উপযুক্ত, স্থির, সর্ব্ববাদি-সম্মত, একটি খুঁটি বা বিন্দু নাই। পণ্ডিতবর উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলিতেছেন—"ত্রয্যা বয়ঃক্রমঃ খলু সপ্তদশ-বর্ষাধিক—ষষ্টিসহস্রাধিকৈকবিংশতিলক্ষবর্ষাত্মক ইতি -" "ত্রয়ীর বয়স ২১,৬০,০১৭ বৎসর, এবং তাঁহার মতে সামবেদ মঙ্গোলিয়াতে, ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদ ভারতে এবং যজুর্ব্বেদ তুরস্ক পারস্য আফগানিস্থানে রচিত। তাহার মতে সে প্রজাপতি ব্রহ্মা "ভূর্ভুবঃ স্বর্"—এই লোকত্রয় অনুসন্ধান করিয়া ভূলোক বা পৃথিবী, অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে 'অগ্নিকে', ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ, অর্থাৎ তুরস্ক পারস্য হইতে 'বায়ু'কে, এবং স্বর্লোক বা দ্যুলোক, অর্থাৎ মঙ্গোলিয়া হইতে 'আদিত্য বা 'সূর্য্যকে' † ডাকিলেন, এবং অগ্নি বায়ু এবং সূর্য্য এই দেবত্রয়,

* The works of early man everywhere present the most startling resemblance. The palæolithic implements all over the globe are of one pattern. This identity in the earliest arts is repeated in the latest stages of man's culture; his arts, crafts, his manners, and customs, exhibit a similiarity so close as to compel the presumption that all the races are but divisions of one family." (Ethnology—Encye. Brit.)

† সূর্য্যও যে একজন বৈদিক ঋষির নাম ছিল, তাহা আমরা ঋগ্বেদেই পাইতেছি, কারণ ঋষি বামদেব বলিতেছেন,

"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং কক্ষীবান্ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ। ৪—২৬—১

এই সূর্য্য ঋষির কন্যা সূর্য্যার বিবাহের মন্ত্র—"গৃভ্ণামি তে সৌভাগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টি র্যথা সঃ" (১০—৮৫—৩৬) অদ্যাপি হিন্দু বিবাহের পাণিগ্রহণ মন্ত্র হইয়া রহিয়াছে।

অর্থাৎ দিব্যগুণশালী ঋষিত্রয়কে বেদসংগ্রহে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার আদেশমত অগ্নি ভারতবর্ষ হইতে ঋক্‌বেদ, বায়ু পারস্য হইতে যজুর্ব্বেদ, এবং সূর্য্য মঙ্গোলিয়া হইতে সামবেদ সংগ্রহ করিলেন।* (*) তিনি প্রমাণরূপে ২টি মনুবচনের উল্লেখ করিতেছেন:—"অগ্নিবায়ু রবিভ্যস্ত ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং। দুদোহ যজ্ঞ-সিদ্ধ্যর্থং ঋগ্‌-যজুঃসাম-লক্ষণং।" (১-২৩) "ঋগ্বেদো দেব-দৈবত্যো যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ। সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাৎ তস্যা শুচিধ্বনিঃ" (৪—১২৪)। তিনি বলেন, ঋগ্বেদকে "দেব-দৈবত্য" বলার উদ্দেশ্য যে ঋগ্বেদে ইন্দ্রাদি নরদেবগণকেই উপাস্য বলা হইয়াছে, যজুর্ব্বেদকে 'মানুষঃ' বলার উদ্দেশ্য যে মাতৃমনুসন্তান বরুণাদি-মনুষ্যের বাসস্থানে উৎপন্ন। সামবেদকে "পিত্র্যঃ" বলার উদ্দেশ্য যে পিতৃলোকে বা আদিস্বর্গে তাহার উৎপত্তি। তাঁহার মত যে সামবেদই আদিমবেদ। বস্তুতঃ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই আমরা সামগানের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাই:—"প্র বো মহে মহি নমঃ ভরধবং আঙ্গুষ্যং শব-সানায় সাম" (১-৬২-২) "তোমরা মহা-শক্তিমান্ (ইন্দ্রের) মহতী স্তুতি, ঘোষণ-যোগ্য সামদ্বারা নিষ্পন্নকর।" "ঋতস্য সামন্ রনয়ন্ত দেবাঃ" দিব্যগুণশালী ঋষিগণ সত্যের সামে আনন্দিত। বেদের বয়ঃক্রমসম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর বাল গঙ্গাধর তিলকও বোধ হয় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত একমত। তিনিও নাকি জ্যোতির্বিদ্যার প্রমাণদ্বারা বেদের বহু লক্ষবৎসর বয়ঃক্রমই স্থির করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'ওরায়ন' গ্রন্থ ("Orion") আমাদের হস্তগত হয় নাই। বস্তুতঃ বেদের গৌরবে আমাদেরই গৌরব; তাই অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ বেদের বয়স নির্দ্ধারণে যতদূর গবেষণা করিয়াছেন, এবং করিতে প্রস্তুত, পাশ্চাত্য কোন পণ্ডিতই সেরূপ গবেষণা করেন নাই, এবং করিতেও প্রস্তুত নহেন। বরং বেদের বয়ঃক্রম বাড়িলে পাছে বাইবেলের গৌরবের হানি হয়, সে ভয়ও তাঁহাদের থাকা স্বাভাবিক। তাঁহারা একটা "সর্ব্বচূর্ণ গদার বারি" ন্যায়ের (sledge-hammer-logic) মত মোটামুটি আলোচনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে বেদের বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫০০ সাড়ে তিন সহস্র কি ৪০০০ চারি সহস্র বৎসর হইবে। মোক্ষমূলার তাঁহার ভাষাবিজ্ঞানে বলিতেছেন:—

"As I sketched the history of Sanskrit in one of my former lectures, it must suffice at present, to mark the different periods of that language, beginning about 1500 B.C. with the dialect of the Vedas." (M.M's Sc of Lan I—V.)

বেদের বয়ঃক্রম নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যীশুখৃষ্টের জন্মই তাহাদের একটি স্থির মানদণ্ড, যদিও আমাদের নিকটে তাহা "বেঙ্গের হাতের" মত ছোট বোধ হয়। সেই মানদণ্ড দিয়াই তাঁহারা

(*) ব্রহ্মণঃ আদেশাৎ মহর্ষি রগ্নিদেবো ভারতবর্ষাৎ ঋগ্বেদং মহর্ষির্বায়ুদেবঃ অন্তরীক্ষাৎ (তুরস্ক-পারস্যোপপ-স্থানাৎ) যজুর্বেদং, মহর্ষিঃ সূর্য্যদেবঃ জ্যোরাদিস্বর্গাৎ সামবেদং সমাহৃতবান।" ঋগ্বেদ-সংহিতার উপোদ্ঘাত প্রকরণ।

পশ্চাৎ দিকে মাপ করিতে করিতে আর একটি স্থির খুঁটি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাহা আলেকজেণ্ডারের (Alexander the Great). ভারত আক্রমণ। সে খুঁটি যীশুখ্রীষ্টের অভ্যুদয়ের ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বের। সেকেন্দরের পূর্ব্বে ভারত ছিল কিনা, বেদ ছিল কিনা, সে বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণে তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ থাকিবার কারণ নাই। বইবেলের‌ও পূর্ব্বে, বাইবেলের‌ও মূলস্বরূপ, কোন গ্রন্থ থাকিতে পারে, এরূপ কল্পনাও তাঁহারা মনে স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন। তাই অতি স্থূল স্থূল কথাতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেবল নামে মাত্র বেদের বয়ঃক্রমের আলোচনা করিয়াছেন। মোটামুটি কথা মোক্ষমূলার তাঁহার 'হিবার্ট লেক্‌চারে' এইরূপ বলেন :—আলেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণের সময় মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত * (Sandro Cottus) বালক ছিলেন। তিনি বিখ্যাত বৌদ্ধরাজা অশোকের পিতামহ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত মতে খৃঃ পূঃ ৪৭৭ সনে বুদ্ধের স্বর্গারোহণ। মোক্ষমূলারের মতে, তাহার পূর্ব্বে খৃঃ পূ ৫০০ সন পর্য্যন্ত,—সূত্ররচনাকাল। অর্থাৎ পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী সূত্র, গৃহ্যসূত্র, ব্রহ্মসূত্র, ন্যায়সূত্র, ইত্যাদি খৃঃ পূ ৫০০ সনে রচিত। তাহার পূর্ব্বে তিনি বলেন ঐতরেয়-শতপথাদি ব্রাহ্মণ রচনার কাল, খৃঃ পূ ৬০০ হইতে ৮০০ সন। তাহার পূর্ব্বে মোক্ষমূলারের মতে মন্ত্রবিভাগ কাল অর্থাৎ ঋগাদি বেদমন্ত্র,—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, এই চারিভাগে বিভক্ত হইয়া, গ্রন্থাকারে পৃথক্‌রূপে নিবদ্ধ হওয়ার কাল,—খৃঃ পূ ৮০ হইতে ১০০০। তাহার পূর্ব্বে ঋষিদিগের নিকটে ছন্দাকারে বেদমন্ত্রের প্রকাশের কাল। মোক্ষমূলার তাঁহার ভাষাবিজ্ঞানে, খৃঃ পূঃ ১৫০০ সন বেদের আরম্ভ কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে (Hibbert Lectures) সেই মত সংশোধন করিয়া, বলিতেছেন যে সেইকাল খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে অতীতে কতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, তাহা অপবিজ্ঞাত ("1000 to X B. C.)। † মোক্ষমূলার বলিতেছেন—"How far back that period, the so-called Chandas period, extended who can tell?"—"সেই প্রকাশের কাল অতীতের গর্ভে কতদূর বিস্তৃত কে বলিতে পারে" (H. L. 111)। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে বেদমন্ত্রের প্রকাশের শেষ হইবার কাল খৃঃ পূঃ ১০০০; কিন্তু বেদমন্ত্র প্রকাশের আরম্ভ কোথায়, তিনি বলিতে পারেন না। তাঁহার গণনার ফল এই মাত্র, যে শেষ বা অতি আধুনিক বেদমন্ত্রের বয়ঃক্রম অন্ততঃ ৩০০০ বৎসর হইয়াছে।

বুদ্ধের পূর্ব্বেরকাল নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে

* চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক ৩১৫ খৃঃ পূ। রাজত্ব ২৪ বৎসর, তৎপুত্র বিন্দুসারের রাজ্যাভিষেক ২৯১ খৃঃপূঃ। রাজত্ব ২৮ বৎসর। তৎপুত্র অশোকের অভিষেক ২৬৩ খৃঃ পূ, রাজত্ব ৩৭ বৎসর। বুদ্ধের মৃত্যু হইতে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক ১৬২ বৎসর। (H. L. III)

† মোক্ষমূলারের 1000 to X "কথার তাহার editor অর্থ করিয়াছেন;" IV Chandas period, 1000—1010 B. C." (See Contents) বা ১০০০ হইতে ১০১০ খৃঃ পূ। প্রকাশকের এই ভ্রম হইতে, আমরা মোক্ষমূলারের প্রতি ও কিঞ্চিৎ অবিচার করিয়াছি। মোক্ষমূলারের X এর অর্থ অঙ্ক-শাস্ত্রের অর্থ—'Unknown quantity."

মোক্ষমূলার কোন প্রমাণই দেন নাই। বরং যথাসাধ্য অল্প সময় নির্দ্ধারণ করিয়া সমবিশ্বাসী দিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। শুধু ভাষার রূপান্তরের প্রতি দৃষ্টি করিলে, বৈদিক সংস্কৃত হইতে শতপথাদি ব্রাহ্মণের ভাষা, শতপথাদির সংস্কৃত হইতে গৃহ্য-সূত্রাদির ভাষা, এবং গৃহ্যসূত্রাদির ভাষা হইতে বৌদ্ধ সংস্কৃত বা রামায়ণাদির ভাষা (বা পালিভাষা) —শুধু ভাষার এই সকল রূপান্তরের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায়, যে মোক্ষমূলারের এই কালনির্ণয় আমাদের নির্ভরের অথবা গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য। মোক্ষমূলার কোনও প্রমাণ না দিয়া আরও বলিতেছেন, "লিপিবিদ্যা যে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুপূর্ব্বে ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই।" আমরা বলিতে বাধ্য যে পণ্ডিতবরের এই কথারই কোন প্রমাণ নাই। তিনি প্রশ্ন করিতেছেন যে বৈদিক সূক্ত সকল, ব্রাহ্মণগ্রন্থ সকল, এবং সম্ভবতঃ (পাণিনীয়াদি) সূত্র সকল, তবে কিরূপে রক্ষিত হইল? তিনি উত্তর করিতেছেন, "সম্পূর্ণ স্মৃতি শক্তির বলে।" তাঁহারই প্রশ্ন, তাঁহারই উত্তর! আমরা জিজ্ঞাসা করি, মানুষের পক্ষে ইহা কি কেহ সম্ভব মনে করিতে পারে? তাঁহার কথায় তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই। প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজনও মনে করেন নাই। বিনা প্রমাণে কৃষ্ণাঙ্গদিগের শাস্ত্রের প্রতি কলঙ্ক আরোপ করিলে, কাহারো কোন শিবঃপীড়া হইবার আশঙ্কা নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে (১৭৮৪) য়ুরোপে যখন সংস্কৃত সাহিত্যের অস্তিত্বের, এবং সেই সঙ্গে বেদের প্রাচীনত্বের কথা প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন অনেক পাশ্চাত্য মনিষীর মাথায় যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়াছিল। কোন কোন মনিষী সে সকল কথাকে আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত ("fairy tales") অলীক মনে করিয়া, উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। একজন দার্শনিক বলিয়া ছিলেন (Dugald Stewart) যে "সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্য আমূল কূটবুদ্ধি জালিয়াত-শিরোমণি * ব্রাহ্মণদিগের প্রবঞ্চনার ফলভিন্ন আর কিছুই নয়।" এরূপ স্থলে মোক্ষমূলার যে সাহস করিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যে বেদের প্রাচীনত্বের ইয়ত্তা করা যায় না, এজন্যই তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। য়ুরোপীয়দিগের চক্ষে যীশুর জন্ম এবং সেকেন্দরের আক্রমণ, অথবা বুদ্ধদেবের স্বর্গারোহণ ভিন্ন, বেদের প্রাচীনত্ব-বিচারের অন্য কোন স্থির খুঁটি নাই, অথবা অন্য কোন স্থির খুঁটির জন্য মাথা ঘামাইতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। কিন্তু বেদের তুলনায়, যীশু, অথবা সেকেন্দর, অথবা বুদ্ধ, সকলই কল্যকার লোক। এরূপ বেঙের হাতের মত মাপকাটির দ্বারা

* "He (Dugald Stewart) therefore denied the reality of such a language as Sanskrit altogether, and wrote his famous essay to prove that Sanskrit had been put together after the model of Greek and Latin, by those archforgers and liars the Brahmans, and that the whole of Sanskrit literature was an imposition" (M. M. Sc of Lang—I—1894)

নির্দ্ধারিত অতীত ও কল্যকার পাশ্চাত্যদিগের এইরূপ ক্ষুদ্র মাপকাটি অবলম্বন করিয়া,আমরা আমাদের দৃষ্টির প্রসার কেন খর্ব্ব করিব?

আমাদের চক্ষে বেদের প্রাচীনত্বের বৃহৎ বৃহৎ খুঁটি সুদূর অতীতের বক্ষে নিহিত দৃষ্ট হইতেছে। আমরা একটি একটি করিয়া তাহা নির্দ্দেশ করিব:—(১) সেই আদিম জলপ্লাবন বা নওয়ার (বৈদিক নহুষের) অথবা নু বা বৈবস্বত মনুর জলপ্লাবন। বেদে সেই নহুষের এবং 'মনুর' পুনঃ পুনঃ উল্লেখ, কিন্তু কোন জলপ্লাবনের উল্লেখ নাই। অর্থাৎ সেই জলপ্লাবন বেদের পরবর্ত্তী। সেই জল-প্লাবনের ঐতিহাসিক সত্যতা কোন প্রকারেই অস্বীকার করা যায় না। একদিকে আমাদের শতপথ ব্রাহ্মণ (১-৮-১), অপর দিকে য়ীহুদিদিগের বাইবেল, এবং তদ্ভিন্ন অপর একদিকে গ্রীকদিগের প্রাচীনশাস্ত্র, তিনই এক বাক্যে সেই আদিম জলপ্লাবনের ঐতিহাসিক সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছে। 'নহুষ' এবং 'মনু উভয় নামই বৈদিক। বাইবেল মতে 'মানুষ' 'নওয়ার' সন্তান।. পণ্ডিত বিষ্ণাবন্তের কৃপাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ঋগ্বেদেও মানুষের নাম 'নহুষ্য' বা নহুষ—সন্তান—"বিশ্বা নহুষ্যানি জাতা" (৯-৮৮-২)। আমাদের নহু(ষ)' অথবা (ম)নু স্পষ্টই দেখা যায় যে য়ীহুদিদিগের নোওয়া বা নু নামের মূল। শব্দের তুলনাদ্বারাই তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়। গ্রীকেরা পূর্ব্বপুরুষের বৈদিক নাম ভুলিয়া গিয়া 'ডিউকেলিয়ন' নাম দিয়াছেন। 'নুহুষ' 'মনু' 'নু' এবং 'ডিয়ুকেলিয়ন', এই তিন নামই বর্ত্তমান মানবজাতির এক আদিপুরুষকে লক্ষ্য করিতেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে উত্তরে এক পর্ব্বতের উল্লেখ আছে—যাহার দিকে মনুর নৌকা অগ্রসর হইয়াছিল "উত্তরং গিরিং অভিদুদ্রাব"(১-৮-১-৫)। মানচিত্রদৃষ্টে শতপথ ব্রাহ্মণের এই "উত্তরং গিরিং" বাইবেলের আরারাট পর্ব্বত হওয়াই সম্ভব। ("The ark rested upon the mountains of Ararat"). গ্রীক-গ্রন্থকার পারনাসাস্ (Parnassus) পর্ব্বত নামে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাকালের জগতের প্রধান প্রধান মানবজাতীয় পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই যখন এক বাক্যে এই আদিম জল-প্লাবনের সত্যত্ব স্বীকার করিতেছেন, তখন তাহার ঐতিহাসিকত্ব অস্বীকার করা যায় না। বেদের বহুপরবর্ত্তী শতপথ ব্রাহ্মণে সেই আদিম জলপ্লাবনের প্রথম বর্ণনা। বেদে সেই জলপ্লাবনের উল্লেখ নাই। অতএব বেদ সেই জলপ্লাবনেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। মৎস্যাবতারে বিষ্ণুকর্ত্তৃক বেদের উদ্ধারের প্রবাদ দ্বারাও ("বেদানুদ্ধরতে") তাহা প্রমাণিত হয়। এই আলোচনার ফলে কি ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে না যে বেদ জগতের সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে প্রাচীন? আমাদের বেদমাতা যে বিশ্বমানবের ধর্ম্মমাতা, আমাদের বেদমাতাই সেই আদিম ভগবৎ প্রেরিত ধর্ম্মবিধান, সেই "Primeval Revelation" যাহাতে মধ্য-যুগের (middle ages) য়ুরোপীয়গণও বিশ্বাস করিতেন; *

* "Another theory very prevalent during the middle ages, that religion began with a primeval revelation." (M. M H. L. VI).

(২) আবার সেই আদিম জলপ্লাবনেরও বহুপূর্ব্ববর্ত্তী বেদমাতার অতি-প্রাচীনত্বের সাক্ষি-স্বরূপ, আর একটি খুঁটি বৈদিক দেবাসুর-শব্দদ্বয়ের অর্থবিরোধ। সেই খুঁটিও সুদূর হইতেও সুদূর অতীতের বক্ষে দাঁড়াইয়া বেদমাতার অতি প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। "দেবাসুরা হবৈ যত্র সংযেতিরে, উভয়ে প্রাজাপত্যা" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য ১-২-১) এই ব্রাহ্মণ বাক্যেও সেই বিরোধ চিরকালের জন্য মুদ্রিত রহিয়াছে। বোধ হয়, ব্রাহ্মণ-রচনাকালেই এই দেবাসুর বিরোধের প্রকৃত তত্ত্ব লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য এই দেবাসুর শব্দের ভিতরে আধ্যাত্মিক ভিন্ন কোন ঐতিহাসিক অর্থই দেখেন নাই। তাই—ছান্দোগ্য ভাষ্যে তিনি 'দেব'শব্দের একমাত্র আধ্যাত্মিক অর্থ করিতেছেন:—"শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়:", এবং 'অসুর' শব্দের অর্থ করিতেছেন:—"তদ্বি-পরীতাঃ স্বাভাবিক্য স্তমআত্মিকা ইন্দ্রিয়-বৃত্তয়ঃ॥" তিনি "সংযেতিরে" অর্থ করিতেছেন: —"সংগ্রামং কৃতবন্তঃ"। কিরূপ সংগ্রাম? আধ্যাত্মিক সংগ্রাম। সেই "সংগ্রাম" সম্বন্ধে শঙ্কর বলিতেছেন—"অন্যোন্যাভিভবোদ্ভব-রূপঃ সংগ্রাম ইব সর্ব্বপ্রাণিষু—প্রতিদেহং দেবাসুরসংগ্রামোঽনাদিকালপ্রবৃত্তঃ"। শঙ্কর জানিবেন দূরে থাকুক, বৈদিক ব্রাহ্মণও বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে "দেবাসুর সংগ্রাম" এক অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য, শতপথাদি ব্রাহ্মণরাও ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে দেবের উপাসক ভারতীয় ঋষিগণের সহিত, তাহাদের এক পরিবার ভুক্তভ্রাতৃবর্গ, অসুরের উপাসক, ইরাণি ঋষিদিগের "দূরাৎ সুদূর" অতীতে, সম্ভবতঃ যজ্ঞে সোমরসের ব্যবহার লইয়া, ঘোর বিরোধ ঘটিয়াছিল! তাঁহারা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে প্রজাপতি নামে একজন বৈদিক ঋষি ছিলেন, যাঁহার পুত্র হিরণ্যগর্ভ ঋগ্বেদের একটি বিখ্যাত সূক্তের ঋষি। (১০-১২১)। তাঁহারা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে দেবের উপাসক ও অসুরের উপাসক উভয়েই সেই প্রজাপতির সন্তান, উভয়েই "প্রাজাপত্য"। সেই দেবাসুর-বিরোধের সাক্ষীস্বরূপ, আমরা সামবেদে দুই শ্রেণীর ঋষির উল্লেখ দেখিতে পাই:—(১) ইন্দ্রের উপাসক, (২) ইন্দ্রের উপাসক নয়, "যে ত্বামিন্দ্র ন তুষ্টুবুঃ, ঋষয়ো যে চ তুষ্টুবুঃ"। (২আ-৭-১-৫)। বেদমাতা স্বয়ংই পুনঃ পুনঃ সাক্ষ্য দিতেছেন যে দেবত্ব এবং অসুরত্ব শব্দদ্বয় পূর্ব্বে একার্থক ছিল—"মহৎ দেবানাং অসুরত্বমেকং"—"দেবগণের মহৎ অসুরত্ব বা শক্তি এক" (ঋগ্বেদ ৩-৫৫-১)! "যক্ষ্যামহে সৌমনসায় রুদ্রং নমোভির্দেবমসুরং দুবস্য" (৫-৪২-১১) "সেই দুঃখ-মোচনকারী দেবের পূজা কর, মহাসুখ লাভ করিবে, স্তুতি দ্বারা সেই অসুর দেবের পরিচর্য্যা কর।" *

---

* "তদ্দেবস্য সবিতুর্ব্বার্য্যং মহদ্বৃণীমহে অসুরস্য প্রচেতসঃ" "(৪—৫৩—১) "হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীথঃ সুমৃলীকঃ"(১—৩৫—১০)" স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ "(৫—৫১—১১)" "অসুরঃ পিতা নঃ" (৫—৮৩—৬) জনানাং যো অসুরো বিধর্ত্তা—(৬—৩৬—২৪)।, "অসুরো—বিশ্ববেদা," "অসুরস্য বেদসো" (৮—২০—১৭) পতঙ্গমক্তমসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসাবিপশ্চিতঃ।" (পতঙ্গ=সূর্য্য)(১০—১৭৭—১)(অক্ত=ব্যক্ত)।

তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে সবিতা, পূষা, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বৈদিক দেবগণ * ঋগ্বেদে অসুর নামে অভিহিত। "ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহোদিবঃ" (ঋগ্বেদে ২-১-৬)। এই বৈদিক অগ্নি, এই "অসুরোমহো"ই ইরাণিদিগের "আহুরামজদা!" আবেস্তা গ্রন্থে অগ্নিকে বলা হইতেছে, 'আহুরা মজদার পুত্র' ("the son of Ahura Mazda") আবার বেদেই আমরা দেবাসুর সংগ্রামেরও আভাস, ইন্দ্র-বিষ্ণু কর্ত্তৃক শম্বর পক্ষীয় অসুরবীর বধেরও আভাস পাইতেছি—"ইন্দ্রাবিষ্ণু দৃংহিতাঃ শম্বরস্য নবপুরো নবতিং চ শ্নথিষ্টং। শতং বর্চ্চিনঃ সহস্রং চ সাকং হথো অপ্রত্যসুরস্য বীরান্" (৭-৯৯-৫) "হে ইন্দ্রাবিষ্ণু, তোমরা শম্বরের দৃঢ়ীকৃত ৯৯ পুরি নাশ করিয়াছ, তোমরা সেই তেজস্বী অসুরপক্ষীয় শত-সহস্র বীরকে অবাধে সংহার করিয়াছ"; "দৃলহানি পিপ্রোরসুরস্য মায়িন ইন্দ্রো ব্যাস্যচ্চকৃবাং ঋজিশ্বনা" (১০-১৩৮-৩)। "ঋজিশ্বের সাহায্যার্থ ইন্দ্র মায়াবি পিপ্রু-নামক অসুরের সুদৃঢ় পুরিসকল আক্রমণ করিয়াছিলেন"। ইন্দ্রের একনাম "অসুরঘ্ন," —"পুরুহূত পুরুবসো অসুরঘ্নঃ" (৬-২১-৪)। সূর্য্যেরও একনাম "অসুরহা"—"অমিত্রহা, বৃত্রহা দস্যুহন্তমং জ্যোতি র্জজ্ঞে অসুরহা সপত্নহা (১০-১৭০-২)। সামবেদের পূর্ব্বার্চ্চিকে "বলবান" অর্থে ইন্দ্রকে "অসুর" বলা হইতেছে! "অসুরস্য পুংস ইন্দ্রস্যেব" (১-৩-৬)। দ্বিতীয় আর্চ্চিকে ও ইন্দ্রকে 'অসুর' শব্দে সম্বোধন করা হইতেছে—"তমু ত্বা নূনমসুর প্রচেতসং রাধো ভাগমিমহে।" (৬ ১২-২)। আবার 'দেবশত্রু' অর্থেও অসুরশব্দ সামবেদে দৃষ্ট হয়—"যা ইন্দ্র ভুজ আভরঃ সর্ব্বাং অসুরেভ্যঃ (পূ ৩-২-২) "হে সুখস্বরূপ ইন্দ্র, তুমি যে সকল ভোগ্যবস্তু অসুরদিগের নিকট হইতে আহরণ কর", ইত্যাদি। এইরূপে বেদেই আমরা দেখিতেছি যে একসময়ে দেব এবং অসুরশব্দ একার্থক ছিল। কালক্রমে যখন বৈদিক ঋষিগণ দুই বিরুদ্ধদলে বিভক্ত হইয়া, পরস্পরের পারিবারিক সম্বন্ধ ভুলিয়া গেলেন, তখন একদল 'ইন্দ্র' এবং দেবাদি নামের অনুরাগী ও অসুর নামের বিরোধী, এবং আর একদল ইন্দ্র এবং দেবাদি নামের বিরোধী এবং অসুর নামের অনুরাগী হইল। তখন হইতেই 'দেব' অসুরের বিরোধী, এবং 'অসুর' দেবের বিরোধী হইল। কালক্রমে সেই সঙ্গে 'অসুর' শব্দের 'অ' লোপ করিয়া 'দেব' অর্থে 'সুর' শব্দেরও সৃষ্টি হইল। ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তেই আমরা একটি ঋক্

* "The Adityas, the Vasus, the Asurae, and other names, had fallen back in the onward race of the human mind towards the highest conception of the Divine; the Devas alone remained to express *theos, deus,* God. Even in the Veda, where these glimpses of the original meaning of Deva, brilliant, can still be caught, Deva is likewise used in the same sense in which the Greeks used *theos.* The poet (X—121—8) speaks of 'Him who among the gods, was alone God—"যঃ দেবেষু অধিদেবঃ একঃ আসীৎ" (Sc. L II—11)

দেখিতেছি, যাহাতে ঋষিদিগের মধ্যে এক প্রকার বিচ্ছেদের আভাস পাওয়া যায়—"অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃগণ ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত"! বৈদিক এবং ইরাণি উভয় শ্রেণীর ঋষিগণই অগ্নির উপাসক। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই আবার প্রশ্ন করা হইতেছে:—"ক্ক ঋতং পূর্ব্ব্যং গতং কদ্বৎ বিভর্ত্তি নূতনো" (১-১০৮-৪)। হে অগ্নি "পূর্ব্বকালের সত্য কোথায় গেল? আধুনিকদিগের মধ্যে কে তাহা পালন করে"? এইরূপে অগ্নিদেবের উপাসক ঋষিদিগের মধ্যেই দেখা যাইতেছে 'পূর্ব্ব' এবং 'নূতনের' আচারের ভেদ, চরিত্রের ভেদ। এই "পূর্ব্ব" এবং "নূতন" ভেদের ভিতরেই যে ঋষিদিগের মধ্যে একটা ঘোর মতান্তর বা পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যায়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বেদ অবতরণের কালেই, আদিম জলপ্লাবনের পূর্ব্বেই, যে পূর্ব্বোক্ত দেবাসুর-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল,—তাহা দুই কারণেই অনুমান করিতে হয়। (১) কোন বেদেই আদিম জলপ্লাবনের উল্লেখ নাই। (২) ঋগ্বেদের আদিভাগে দেব এবং অসুর শব্দ সর্ব্বদা একার্থক, এবং শেষভাগে এই দুই শব্দ অনেক স্থলেই বিরুদ্ধ অর্থবোধক! আবার পৌরাণিক "সুরাসুর" শব্দ সম্বন্ধে বলিতে হইতেছে, যে ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব এই চারিবেদের কোন বেদেই "সুর" শব্দ নাই। ইহাতেও অনুমান হয় যে বেদের বহুপরে বৈদিক 'অসুর' শব্দের "অ" লোপদ্বারা, আধুনিক পৌরাণিক দেব-বাচক 'সুর-শব্দের উৎপত্তি। এইরূপে দেবাসুর-বিরোধের-ঐতিহাসিকত্বের আলোচনার দ্বারা আমরা বেদমাতার অতি প্রাচীনত্বের অকাট্য প্রমাণ পাইতেছি। দেবাসুর যে উভয়েই অগ্নিদেবের ভক্ত, এবং ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিতেছে উভয়েই 'প্রাজাপত্য' বা এক 'প্রজাপতি' ঋষির বা এক পিতার সন্তান, উভয়ে হিন্দুর সুপরিচিত 'মনুর' ও 'যমের'* পিতা বিবস্বৎ * বা 'বিবস্বানের' সন্তান। যমের পিতা বিবস্বতের ঐতিহাসিকত্বের সাক্ষ্য "Fair Yima, son of Vivanghat" আমরা 'জেন্দাবেস্তা' গ্রন্থে পাইতেছি। অগ্নিদেব সম্বন্ধেও বেদমাতা বলিতেছেন "স ইমাঃ প্রজাজনয়ন্ মনূনাম্ বিবস্বতা চক্ষসা" —"তিনি জ্ঞানীপ্রবর বিবস্বৎ দ্বারা এই মানবী প্রজা উৎপন্ন করিলেন" (ঋগ্বেদ ১ ৯৬-২)। এই "বিবস্বৎ" আবার আমাদের যমেরও পিতা—("যমস্য মাতা পুর্য্যহ্যমানা মহীজায়া বিবস্বতো ননাশ" অথর্ব্ব ১৮-১-৫৩)। ইরাণিদিগের জেন্দাবেস্তা গ্রন্থেও দেখা যায়,যে 'হোম' (বৈদিক সোম) 'জারাথুষ্ট্রাকে' বলিতেছেন:—"বিবংবন্ত (বৈদিক বিবস্বৎ') মানুষের মধ্যে প্রথম। তাহার একপুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার নাম 'য়িম' (বৈদিক 'যম')।

(৩) ইরাণিরা আমাদের নিন্দার্হ 'অসুরের' উপাসক, 'আহুরা মজদার' বা বৈদিক "অসুরো মহত্তের"—উপাসক। আমরা দেবের ইরাণিদিগের নিন্দার্হ "দৈবের"—উপাসক। কিন্তু দেবাসুর শব্দদ্বয়ের অতি প্রাচীন

* "Vivangvant was the first of man. To him was born a son who was "Yima" (M. M's Zendavesta—Yasna—IX).

একার্থতাদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে এক সময়ে ইরাণি এবং ভারতীয় ঋষিগণ উভয়ে এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, "এক দেব এক অসুরের, উপাসক ছিলেন।" * বেদের অনেক সূক্তই তাহাদিগের এবং আমাদিগের সাধারণ সম্পত্তি। "মিত্র, অর্য্যমা, সোম, অগ্নি, নরাশংস, অপাংনপাৎ বায়ু, বৃত্রঘ্ন, বিশ্বদেব, যম প্রভৃতি দেবগণ বেদ এবং আবেস্তা উভয়ের সাধারণ উপাস্য। আবার আমাদের "ইন্দ্র"দেব আবেস্তাতে:—"বত্রঘ্ন" নামে 'দেব,' এবং 'ইন্দ্র' নামে অপদেবতা "I drive away Indra" Z. A. (Fargared X.)। সুধু ইহা নয়। আধুনিক অনুশীলনদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে, যে আদিম আসিরিয়া বেবিলনের (Assyria and Babylon) শরাকৃতি লিপির (cunieform Inscription) বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সেই সকল প্রাচীন দেশেও বৈদিক মিত্র, বরুণ, এবং ইন্দ্রের নাম সুপরিচিত ছিল; সেই সুদূর অতীতে, খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীরও পূর্ব্বে তবে হিন্দুর বেদমাতার প্রভাব আসিরিয়াতে বিস্তৃত হইয়াছিল! পুরাতন মিসর দেশ (Egypt) সম্বন্ধেও এস্থলে বলিতে হইতেছে, যে আসিরিয়া ও বেবিলনের সহিত মিসরের যোগ অতি আদিকাল হইতেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল; সেই সূত্রে বেদমাতার প্রভাব, ব্রতনিয়ম এবং পৌরোহিত্যাদি ব্যবস্থা পুরাতন মিসরেও বিস্তৃত হইয়াছিল। বৈদিক "পণি," অনেকে মনে করেন, ফিনিসিয়া (Phœnicia) বাসিকেই লক্ষ্য করে। "অসেন্যা বঃ পনয়ো বচাংসি" "হে পণিগণ তোমাদের কথা বীরোচিত নয়।" মিসরবাসিদিগের আকাশকে গাভিরূপে কল্পনা করা বৈদিক মেঘের গাভি-কল্পনার ছায়া মাত্র:—"ইমা গাবঃ সরমে যা এচ্ছ," "হে সরমে, এই সকল গো, যাহা তুমি পাইতে ইচ্ছা করিতেছ" (১০-২৬-৫,৬)। এইরূপে দেখা যায়, মিসর দেশের আইছিজ

* "দেবাঃ—দিব্যতিদানার্থো দীপ্ত্যর্থো বা। দ্যোতয়ো অভিমন্তানাং ভক্তেভ্যঃ। তেজস্বাৎ দীপ্তা বা। দিবঃ সমন্বিনো বা দেবাঃ। দেবা রশ্ময়ঃ উচ্যন্তে—যাস্ক।

"রাজা ভট্টারকো দেবঃ"—অমরকোষ। "If we raise Div by Gune we get the Sanskrit Deva, originally bright, afterwards God. What is most interesting in the Veda is exactly this uncertainty of meaning, the half-physical and half-spiritual intention of words such as deva." M. M. (This is exactly what Rishi Dayananda speaks of as "শ্লেষালঙ্কার" inhernt in the Vedas. D. D.

অসুরঃ—অসুরিতি প্রাণ নাম "অস্তুতি ক্ষিপ্যত্যমর্থান্, অস্তাঃ ক্ষিপ্তা অস্তামর্থাঃ। অসুরঃ অস্তুতি ক্ষিপতি ভূমৌ জলং জলবান্ প্রাণবান্ বা, স্রো—মস্বর্থীয়ঃ—যাস্ক। "This root 'as' even in Sanskrit means to be. But there is in Sanskrit a derivative of the root 'as' namely 'asu' which means the vital brath. 'As' in order to give rise to such a noun as 'asu' must have meant to breathe, then to live, then to exist. Thus asura means having life (Sc. Lan II—384).

(Isis) দেবীর এবং আকাশের গাভীরূপে কল্পনার মূলও বৈদিক। অথবা বেদের অথবা আবেস্তার গাভিপূজা ("We sacrifice unto the soul of the bounteous cow") প্রাচীন মিসরে প্রতিফলিত হইয়াছিল। এ সকল দেখিয়া শুনিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বৈদিক ধর্ম্মের ন্যায় মিসরের ধর্ম্মকেও এক প্রকার উদ্দাম বা বিশৃঙ্খল বহুঈশ্বরবাদ ("Chaotic polytheism") বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন দেবদেবীরূপে সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, আকাশ, অহোরাত্র, জ্ঞানধর্ম্ম ইত্যাদির পৃথক্ পৃথক্ পূজা, এবং এই সকল দেবগণের একের সহিত অন্যের মিশ্রণ, এবং পরিশেষে দেবদেবী সকলকে গালিয়া একদেবে (monotheism) ঢালাই করা, ইত্যাদি কল্পনা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যেরূপ, মিসরের ধর্ম্মের বিরুদ্ধেও সেইরূপই করিয়াছেন। তাহাতেও মিশরের ধর্ম্মে বেদ-মাতার প্রভাবই দৃষ্ট হয়। চীনের (China) ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যায়, যেন সুদূর অতীতকাল হইতে বৌদ্ধকাল পর্য্যন্ত, তথায় সর্ব্বদাই ভারতীয় ধর্ম্ম প্রতিধ্বনিত হইয়াছে:—(১) অতি আদিম-কালে বেদের বা বেদান্তের প্রতি-ধ্বনিস্বরূপ আকাশরূপী "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম"—এক নির্গুণ ঈশ্বর "টি ইয়েন" প্রতিষ্ঠিত। আবার সেই সঙ্গেই সগুণ পুরুষরূপী ঈশ্বর "সাঙটি"ও প্রতিষ্ঠিত। তদ্ভিন্ন পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্রাদি, প্রতীকের মধ্যে এবং পূর্ব্বপুরুষের মধ্যেও ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত দৃষ্ট হয়। (২) তাহার পর, বা মধ্য যুগে, চীন দেশে বেদান্তেরই প্রতিধ্বনি দৃষ্ট হয়,—এক সর্ব্বাতীত অবাঙ্‌মনস-গোচর ("Absolute and Unconditioned") 'টাউ' একমাত্র ঈশ্বর (Taoism)। (৩) তাহার পর, শেষ যুগে, খৃঃ ৮ সনে, চীনের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের কথা অনেকেই অবগত আছেন।

(৪) আবার অগ্নির বিশ্বজনীন ঈশ্বর-প্রতীকত্বের আলোচনার ফলে, আমরা কি দেখিতে পাই? প্রাচীন জগতে সমস্ত মানব-জাতির দৃশ্য মিলন-কেন্দ্র ("visible rallying center") স্বরূপ সর্ব্বত্র অগ্নি-পূজা অথবা ঈশ্বরপ্রতীকরূপে অগ্নির ব্যবহার লক্ষিত হয়। তাহাও বেদের আদিম ধর্ম্ম-মাতৃত্বের প্রমাণ। য়িহুদী 'নবী' এব্রাহাম বৈদিক যজ্ঞেরই ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ, তাহার পুত্র 'আইসেককে বৈদিক শুনঃসেপের ন্যায়, যজ্ঞাগ্নিতে হবন করিতে ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "Take now thy son, thine only son Isaac, and offer him for a burnt offering." Abraham took the fire in his hand" &c. (Gen 22)—ইহাতে বৈদিক হোমেরই ছায়া দৃষ্ট হয়। মুসার "Burning bush" রূপে ঈশ্বরদর্শন এবং শ্রবণ And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire, out of the midst of a bush. God called unto him out of the midst of the bush" (Ex.3)—ইত্যাদি দর্শন ও শ্রবণ বৈদিক অগ্নিরই ধ্বংসাবশেষ। ঈশ্বরের (প্রতীকরূপে "as the visible expression

of Ahura Muzda") ইরাণিরা যেমন অগ্নির আদর করিতেন, ইহুদিরাও সেইরূপ "পবিত্রের পবিত্র" (Holy of Holies বা Shekina) জ্ঞানে, ঈশ্বরের প্রকাশের বাহ্যচিহ্নজ্ঞানে অগ্নির ("cloud of light") আদর করিতেন বোধ হয়, অদ্যাপিও করিয়া থাকেন। ইহুদিরাও বৈদিক আহিতাগ্নির ন্যায়, একটি প্রদীপ নিত্য তাহাদের দেবমন্দিরে, জ্বালিয়া রাখিতেন। গ্রীক্ এবং রোমানদিগেরও দেবপূজায় "Vestal Fire" নামে, অগ্নির স্থান ছিল। গ্রীকদিগের প্রমন্থ বা প্রমথ (Prometheus), যিনি মানবের হিতের জন্য স্বর্গ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া ধরাতলে আনিয়াছিলেন—"the thief of Fire from heaven", বৈদিক অথর্ব্বা—যিনি সর্ব্ব প্রথমে অরণিদ্বয়ের সংঘর্ষদ্বারা অগ্নির আবিষ্কার করেন—সে অথর্ব্বা ভিন্ন আর কে হইবে! আবেস্তাতে অগ্নির পুরোহিতের নামও "অথর্বন্।" ঐতিহাসিক সত্যভিন্ন এরূপ হওয়া অসম্ভব। খৃষ্টবাদিদিগের কল্পিত অগ্নিজিহ্বাও-("There appeared unto them cloven tongues like as offire"—Acts (1-3) বৈদিক;—"যে যজত্রা য ইড্যাস্তে পিবন্ত জিহ্বয়া বাকোবই (১-১৪-৮) ধ্বংসাবশেষ; অথবা ব্রাহ্মণগ্রন্থের "কালী-করালী" প্রভৃতি অগ্নির সপ্তজিহ্বারই ধ্বংসাবশেষ। কাথলিক খৃষ্টবাদীর স্বর্ণদীপাধারে ("Golden candelabra") পূজার বেদিতে (Altar) ঈশ্বরজ্যোতির প্রতীকরূপে ("symbolical of the light of God's presence,"—"as symbols of the presence of God and tributes of adoration."—A lamp must burn in the sanctuary as "symbol of the eternal presence") দীপাবলির আশ্রয় গ্রহণ বৈদিক যজ্ঞেরই ধ্বংসাবশেষ। এমন কি প্রটাষ্টাণ্ট" খৃষ্টবাদীরাও (Church of England) ঈশ্বর-পূজায় ঈশ্বরের প্রতীকরূপে, সময়ে সময়ে প্রদীপের ("Dim religious light") ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা কি আশ্চর্য্য নয়, যে এই খৃষ্টবাদীরাই আবার বৈদিক যজ্ঞের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকতার অভি-যোগ উপস্থিত করিয়াছেন! ইহা কি গভীর পরিতাপের বিষয় নয়, যে আমাদের মধ্যেও অনেকে খৃষ্টবাদীদিগের তালে নাচিয়া বৈদিক যজ্ঞের মধ্যেও—"Grim idolatry"—ঘোর পৌত্তলিকতা দর্শন করিয়াছেন! মুসলমান ফকিরদিগেরও সম্মানার্থ তাহাদের সমাধি-স্থানে প্রদীপের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এ সকল ব্যবহার সর্ব্বত্রই বৈদিক যজ্ঞেরই ধ্বংসাবশেষ। বৈদিক যজ্ঞের ভিতরেই, সকল ব্যবহারের মূল দৃষ্ট হয়। "যজ্ঞৈ-রথর্ব্বা প্রথমঃ পথস্ততে" (১-৮৩-৫) "ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্ব্বা নিরমন্থত" (৬-১৬-১৩) ইত্যাদি ঋগ্‌মন্ত্রের ভিতরেই অগ্নির এই বিশ্বজনীন ঈশ্বর-প্রতীকত্বের মূল পাইতেছি। সে মূল কি? শুষ্ককাষ্ঠ নিহিত, নিরাকার, শক্তিরূপী, অগ্নি হইতে বলের সহিত (Energy) ঘর্ষনদ্বারা সাকার শিখাযুক্ত অগ্নির উৎপত্তি, নিরাকার জ্ঞানশক্তিরূপী ঈশ্বর হইতে সাকার জড়জগতের উৎপত্তির বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত বা প্রতীক। এস্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে মুসলমানদিগের 'নমাজ' শব্দও, বোধ হয়,

স্তুত্যর্থক বৈদিক 'নমস্' শব্দেরই রূপান্তর —"বৃহন্নমো ভরত" (১-১৩৬-১), "অবোচাম বৃহন্নমঃ" (৫—৭৩—১০)। মুসলমানের 'রসুল' শব্দও বোধ হয় বৈদিক 'ঋষি' শব্দের রূপান্তর। এ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া কে না বলিবে, যে বেদই জগতের ধর্ম্মদাতা, বেদই মধ্য-যুগের (Middle ages) য়ুরোপীয়গণ-কল্পিত "Primeval Revelation."

(৫) বেদের প্রাচীনত্বের আর একটি নূতন রকমের নিদর্শনের উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তাহা সমীচীন কি না, পাঠক বিচার করিবেন:—ঋগ্বেদে "শ্যেনের ন্যায় পক্ষবিশিষ্ট, হরিণের ন্যায় বাহুযুক্ত 'অর্ব্বা' নামক জীবের (ঋগ্বেদ ১-১৬৩-১) উল্লেখ। "অর্ব্বা" শব্দের যাস্ক এইরূপ অর্থ করিতেছেন:—"ঋ-গতিপ্রাপণয়োঃ" "গচ্ছত্যধ্বানং প্রাপয়ত্যধ্বনঃ পারমিতি বা।" অনুবাদকারীগণ সকলেই "অর্ব্বা" শব্দের অর্থ করিতেছেন—ঘোড়া। "বাহু" অর্থ করিতেছেন পদ, কিন্তু পক্ষবিশিষ্ট ঘোড়া কেহ কখনো দেখে নাই। পদ অর্থে—"বাহুর" ব্যবহারও দৃষ্ট হয় না। তবে এই অর্ব্বা কি? "যদক্রন্দঃ প্রথমং জায়মান উদ্যন্ সমুদ্রাৎ উত বা পুরীষাৎ। শ্যেনস্য পক্ষা হরিণস্য বাহু উপস্তুত্যং মহি জাতং তে অর্বন্॥ (১-১৬৩-১) "হে অর্ব্বন্, তুমি যখন সমুদ্র হইতে অথবা জল হইতে জন্মলাভ করিয়া, প্রথমে শব্দ করিতে করিতে উঠিলে, তোমার সেই জন্ম স্তুতিযোগ্য। তোমার পক্ষ শ্যেনের ন্যায়, তোমার বাহুদ্বয় হরিণের ন্যায়"—অবশ্য এই ঋকের ভিতরে প্রচ্ছন্নভাবে শ্লেষ অলঙ্কার রহিয়াছে, কারণ এক অর্থে এই ঋক্ সূর্য্যোদয়কে লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু অর্ব্বার সহিত সূর্য্য উপমিত হইতেছে। সেই "শ্যেনের ন্যায় পক্ষবিশিষ্ট, হরিণের ন্যায় বাহুবিশিষ্ট" অর্ব্বা কি? প্রশ্ন করি, ভূ-তত্ত্ববিৎ যে পক্ষবিশিষ্ট হস্তী অথবা অশ্ব-সমান দেহধারী—অর্দ্ধেক কুম্ভীর, অর্দ্ধেক পক্ষী "huge ostrich-like, flying reptiles" 'ডাইনসর' প্রভৃতির (Dinosaur Atlantosaur &c) বর্ণন করিতেছেন, যাহা পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে ছিল, এখন নাই,—ইহা কি তাহা নয়? এ-সকল প্রকাণ্ড দেহধারী প্রাণী, বেদ যেমন বলিতেছে, "উদ্যন্ সমুদ্রাৎ"— সমুদ্র হইতে উঠিয়া, জলে, স্থলে, আকাশে, হ্রদাদিতে, অথবা সমুদ্রাদির তীরে বিচরণ করিত। এ সকল প্রাণীর স্মৃতিও যে বেদের সময়ে লুপ্ত হয় নাই, তাহাই বেদের অতিপ্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ, যেহেতু এরূপ প্রাচীন প্রবাদ জগতের আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

(৬) সাধারণভাবে আমাদের শাস্ত্র এবং সেই সঙ্গে বেদও যে কত প্রাচীন, তাহার আর একটি প্রমাণ এস্থলে আমরা উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। তাহাও সমীচীন কি না, পাঠক বিচার করিবেন। যদি উপযুক্ত মনে করেন, তবে জ্যোতির্ব্বিৎগণও তাহার যুক্তিযুক্ততার পরীক্ষা করিবেন:—আমরা অধুনা বৈশাখ মাস হইতে বৎসরের আরম্ভ গণনা করি। কিন্তু এমন সময় ছিল যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অগ্রহায়ণ হইতে বৎসরের আরম্ভ গণনা করিতেন। "অগ্রহায়ণ" মাসের নামের ভিতরই তাহার অকাট্য প্রমাণ

নিহিত। "হায়নস্তাগ্রো অগ্রহায়ণঃ মার্গশীর্ষমাসঃ।" (শব্দকল্পদ্রুম)। আবার বৈশাখ মাস সম্বন্ধে বলা হইতেছে "দ্বাদশমাসান্তর্গত-প্রথমমাসঃ। বিশাখা-তারকাযুক্তা বৈশাখী পূর্ণিমা। সা বৈশাখী যত্র মাসে স বৈশাখঃ (শব্দকল্পদ্রুম)। ইহাদ্বারা আমরা দেখিতেছি যে এক সময়ে আমাদের বৎসর আরম্ভ হইত অগ্রহায়ণে। তাহার তুলনায়, এখন ছয়মাস পরে, বৈশাখে, আমাদের অধুনাতন বৎসর আরম্ভ হয়! ইহার কারণ এই, যে সূর্য্য প্রতিবৎসর যৎকিঞ্চিৎ আগে বিষুব রেখাতে আগমন করে (Precession of the equinoxes and nutation)। জ্যোতির্বিদেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে ২৬,০০০ বৎসরে এই অগ্রগতি ৩৬০ ডিগ্রি পূর্ণ হয়, অর্থাৎ ২৬০০০ বৎসরান্তে সূর্য্য তাহার পূর্ব্বস্থান লাভ করে। * আধুনিক বৎসরারম্ভের সহিত পুরাতন বৎসরারম্ভের তুলনাদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ, এই ছয় মাসের দূরতাতে সূর্য্য ১৮০° ডিগ্রি স্থানান্তরিত হইয়াছেন। সেই দূরতার পরিমাণ ২৬,০০০ বৎসরে ৩৬০ ডিগ্রি পূর্ণ হইবে। অধুনা সূর্য্য সেই ৩৬০ ডিগ্রির অর্দ্ধেক গতি লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ যে কালে অগ্রহায়ণ মাসে আমাদের বৎসর আরম্ভ হইত, অথবা যে কালে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম নামকরণ হয়, সেই কালের তুলনায়, এই বর্ত্তমান কাল,যে-কালে বৈশাখ মাসে বৎসর আরম্ভ হয়, ১৩,০০০ তের হাজার বৎসর পরবর্ত্তী। আবার এই 'অগ্রহায়ণ' নামের উৎপত্তি বেদের বহুপরবর্ত্তী, কারণ আমাদের চারি বেদের কোন বেদেই এই অগ্রহায়ণ নাম দৃষ্ট হয় না। বোধ হয়, অগ্রহায়ণ নাম ব্রাহ্মণিক অথবা পৌরাণিক কালের। এই হিসাবে আমাদের ব্রাহ্মণ-গ্রন্থাদির অথবা পুরাণেরই বয়ঃক্রম ১৩,০০০ তের হাজার বৎসর। বেদের ত কথাই নাই। তবে অথর্ব্ব বেদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অথর্ব্ব বেদে পুরাণেরও পুনঃপুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক, যাঁহারা বলেন, বেদের বয়স খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসর মাত্র ("It is therefore before 1000 B.C. that we must place the spontaneous growth of Vedic poetry"—M. M'S Hibbert Lectures, III), তাঁহাদের কথা আর কি বলিব।

এই সকল কথা পর্য্যালোচনা করিয়া পাঠকই উত্তর করুন, আমাদের বেদমাতা বিশ্বমানবের বেদমাতা কি না? আমাদের বৈদিক বিধান, বিধাতার প্রকাশিত জগতের আদিম ধর্ম্মবিধান বা "Primeval Revelation" কি না? মুসলমানেরা যে একলক্ষ চব্বিশ হাজার রসুলের বা ঋষির কথা বলিয়া থাকেন, বৈদিক ঋষি তাহাদের প্রথম কিনা?

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

* "This is the present amount of the lunisolar preacession which, if it remained constant, would carry the pole completely round in a period of 25, 730 years" (En. Brit)

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রঙিন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত

ভারতী

৪৩শ বর্ষ]　　　　শ্রাবণ, ১৩২৬　　　　[৪র্থ সংখ্যা

বঙ্গ-সাহিত্যে ত্রিপুরার গৌরব

("ময়নামতীর গান" ও "রাজমালা")

বঙ্গ-সাহিত্যের মূল উৎস কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সন্ধান করিলে ত্রিপুরার সহিত ইহার যেরূপ যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, আর কোনও স্থানের সহিত সেরূপ যোগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বঙ্গভাষার প্রথম সাহিত্যে পরিণতি সাধারণ লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হইতেই হয়। সেই উপদেশ শৈব যোগীদিগের উপদেশ। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নাথ সম্প্রদায় নামে এক সাধক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব আমাদের দেশে হয়। তাঁহারা তান্ত্রিক বৌদ্ধ প্রণালীতে সাধনা করিতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ যেমন চলিত পালি ভাষায় প্রদান করা হইত; আমাদের দেশের তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধকের উপদেশও তেমনই আমাদের কথিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রদত্ত হইত। এই সমস্ত উপদেশ দোঁহা বা ছড়ার আকারে ব্যক্ত হইত। ইহাকেই বঙ্গসাহিত্যের প্রথম অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। নাথ সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্ত্তক মীন নাথের এরূপ একটী প্রবচন বা ছড়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে আনীত হাজার বছরের বাঙ্গালা পুঁথিতে পাইয়াছেন। সেই ছড়াটী এই :—

"কহংতি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম্ম কুরংগ সমাধি কপাট ॥
কমল বিকসিত কহিছন যমরা।
কমল মধু পিবি বি ধোঁকেন ভমরা ॥"

সিদ্ধ পুরুষদিগের এই সমস্ত ধর্ম্ম-বিষয়ক বাঙ্গালা ভাষার ছড়ার এরূপই প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে এইগুলি বঙ্গদেশ ছাড়াইয়া কেবল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নহে, পরন্তু সমগ্র আশিয়া মহাদেশেই ব্যপ্ত হইয়া

পড়িয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য :—

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নেপাল হইতে হাজার বছরের যে সকল বাঙ্গালা পুঁথি আনা হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায় বাঙ্গালার গান, বাঙ্গালার ছড়া, বাঙ্গালার দোঁহা এক কালে তর্জ্জমা হইয়া এসিয়ার দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা আদর করিয়া বাঙ্গালার সিদ্ধ পুরুষদের উপদেশ শুনিত, দেবতা বলিয়া তাহাদের পূজা করিত। তাঁহাদের "প্রতিমা গড়াইয়া মন্দিরে মন্দিরে" রাখিত, তাঁহাদের নামে যাত্রা উৎসব করিত, তাঁহাদের গানগুলি, ছড়াগুলি, দোঁহাগুলি নিজ নিজ ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া বিহারে বিহারে রাখিত, যত্ন করিয়া পড়িত, পড়াইত। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা জাতির একটা শক্তি ছিল, যাহাতে শুধু প্রতিবেশীদের নয়, দূর দূরান্তরের লোককেও মোহিত করিতে পারিত।"

(ত্রিপুরা সাহিত্য পরিষদে পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের সম্বোধন।)

মীন নাথ যে নাথ যোগিসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন, সেই নাথ যোগীদিগের অভ্যুদয় প্রায় খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"একজন রুষ পণ্ডিত বলিয়াছেন নাথেরা খ্রীঃ ৮০০ বছরের কাছাকাছি প্রবল হইয়া উঠে॥" ঐ—

নাথ যোগীদিগের প্রবর্ত্তক মীন নাথের জীবন অবলম্বন করিয়া "মীনচেতন" নামে একখানা কাব্য রচিত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহা ত্রিপুরার ময়নামতীর নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ঢাকা সাহিত্য পরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে মীন নাথ যে ত্রিপুরার ময়নামতী অঞ্চলের লোক ছিলেন এবং এতদঞ্চলেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহাই প্রমাণিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ মীন নাথ অন্য কোথাকার লোক হইলে, অন্য স্থলেও তদীয় কীর্ত্তিকথা গানে বা কাব্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যাইত। বিশেষতঃ ময়নামতী প্রদেশের রাণী—ময়নামতী ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের ঘটনা লইয়া যে 'ময়নামতীর গান' নামক কাব্য বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে মীন নাথের জীবন সম্বন্ধে যে আভাস প্রদান করা হইয়াছে; মীন চেতনের তাহাই আখ্যান-বস্তু হইয়াছে। মীন নাথ সম্বন্ধে এইরূপ প্রসঙ্গ ত্রিপুরা ব্যতীত অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় বলিয়া আমরা অবগত নহি। সুতরাং তাঁহাকে ত্রিপুরার লোক বলিয়া আমরা দাবী করিলে অসঙ্গত হয় বলিয়া মনে করি না।

নাথ সম্প্রদায় হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত রাণী ময়নামতী ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যান অবলম্বনে 'ময়নামতীর গান' নামে একটী কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় বিরচিত হইয়াছিল। এই কাব্যটীও ঢাকা সাহিত্য পরিষদ্ হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। মেহারকুলের রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদের রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্যগ্রহণ ইহাই কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। গোপীচাঁদের বৈরাগ্য লোকদিগের এরূপই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, তাঁহার আখ্যান ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই বহুল

প্রচারলাভ করিয়াছিল। তিনি সুপ্রসিদ্ধ বিষয়বিরাগী রাজা ভর্ত্তৃহরির ভাগিনেয় ছিলেন তাঁহার নাম ভর্ত্তৃহরিরই সহিত গ্রথিত হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে গীত হইয়া থাকে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় গোপী চাঁদের আখ্যানের লোকপ্রচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"হিন্দুস্থানীরা বলে তিনি যোগী ভর্ত্তৃহরির ভাগিনেয় ছিলেন। হিন্দুস্থানে গোপীচাঁদ ও ভরথরি নামে বই এখনও খুব চলিতেছে; এই দুই নামে নাটক নভেলও খুব চলিতেছে। গোপীচাঁদ ও ভর্ত্তৃহরির পালা গান হইলে সারা হিন্দুস্থানের লোক মুগ্ধ হইয়া যায়॥"

উত্তর ভারতে যেমন গোপীচাঁদের আখ্যান লোকের হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, দক্ষিণ ভারতেও যে তদ্রূপই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী তদীয় প্রবন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন:—"মারাঠী, হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় রাজা গোপীচাঁদ সম্বন্ধে শত শত কাব্য, নাটক, গল্প, ছড়া ও গীত প্রভৃতি বিরচিত হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই ও পুনায় বাঙ্গালী রাজা গোপীচাঁদের ছবি বিক্রীত হইয়া থাকে। কাশী, ফয়জাবাদ, আহামদ নগর, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে গোপীচাঁদ রাজার নাটক অভিনয় হইয়া থাকে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গোপীচাঁদের গল্প করিয়া অথবা তাঁহার জীবনের ঘটনা বিশেষের গান গাইয়া শত সহস্র লোক ভিক্ষা করিয়া থাকে॥"

(ময়নামতী গানের ভূমিকায় উদ্ধৃত।—পরলোকগত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী কৃত "বঙ্গে ব্রাহ্ম রাজবংশ।")

পূর্ব্বাঞ্চলে আসামেও গোপীচাঁদের নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিশ্বকোষে এতৎ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:—

"কামরূপের যুগী নামক নীচশ্রেণীর লোকেরা আজিও "শিবের গীত" নামে এক প্রকার গান করে, তাহাতেই এই গোপীচন্দ্রের বিষয়বিরাগ ও তাঁহার শত-স্ত্রীর খেদোক্তি অতি সবল গ্রাম্য ভাষায় রচিত। ইহা গান করিতে দুই দিন লাগে।"

তিব্বত ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সাহিত্যেও গোপীচাঁদের উপাখ্যান স্থান পাইয়াছে।

"মাণিকচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর কাহিনী তিব্বত ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধ গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে।" (বিশ্বকোষ)।

রাজা মাণিকচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের পিতা ও ময়নামতীর স্বামী। রঙ্গপুর তাঁহাদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল। তাহাতেই রঙ্গপুরে তাঁহাদের বিষয় লইয়া 'মাণিক চাঁদের গান' ও 'গোবিন্দ চন্দ্রের গীত' নামক কাব্য লিখিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী সময়ে যে "ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্য বিরচিত হইয়াছে তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত আখ্যানেরই ছায়াপাত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বকোষে এতৎপ্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল:—

"পিতা, পুত্র ও মাতার চরিত্র লইয়া বঙ্গভাষায় বহুতর কাব্য রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'মাণিক চন্দ্রের গান' ও দুর্ল্লভ মল্লিক রচিত "গোবিন্দ চন্দ্রের গীত" মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। নানাস্থান হইতে যে বহুতর "ধর্ম্মমঙ্গল"

বাহির হইয়াছে, উক্ত চরিত্রত্রয়ের আদর্শ লইয়া গ্রথিত।"

এইরূপে গোপীচাঁদের উপাখ্যান অবলম্বনে বঙ্গভাষায় ও ভারতের অন্যান্য ভাষায় যে বিপুল সাহিত্য গঠিত হইয়াছে, তাহারই আমরা স্পষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। "ময়নামতীর গান" পাঠ করিলে ময়নামতী ও গোপীচাঁদের নিবাসস্থান যে 'মেহেরকুল' ছিল তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। যদিও তাঁহাদের নাম রঙ্গপুরের সহিতও বিশেষভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে, তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহাদের মূলরাজ্য মেহেরকুলের পাটিকাড়াতেই অবস্থিত ছিল। রঙ্গপুর তাঁহাদের অর্জ্জিত বা বিজয়লব্ধ রাজ্য ছিল, তাহাতে তাঁহাদের অধিষ্ঠানও সাময়িক ছিল, নিয়ত ছিল না। এস্থলে আমরা "ময়নামতীর গানের" ভূমিকার সারবান্ মন্তব্যটী আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মেহারকুল পাটিকারায়ই যে গোপীচন্দ্রের রাজ্য ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন পুস্তকে মৃকুল এবং কোন কোন পুস্তকে পাটিকানগর বলিয়া এই নগরদ্বয়ের উল্লেখ হইয়াছে। সুকুর মহম্মদ মৃকুল লিখিয়াছেন। দুর্লভ মল্লিক পাটিকা লিখিয়াছেন। রঙ্গপুরের গাথাগুলিতে শুধু বঙ্গ বলিয়া সারিয়া দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গ যে প্রাচীনকালে পূর্ব্বাঞ্চলকেই বুঝাইত এবং বাঙ্গাল বলিতে যে এখনও পূর্ব্বাঞ্চলবাসীদিগকেই বুঝায় ইহা সকলেই জানেন। ময়নামতী পাহাড়ের আশেপাশে বহুপ্রাচীন ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে।"

এইরূপে গোপীচাঁদের মূলস্থান যখন ত্রিপুরায় বলিয়াই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন গোপীচাঁদের কীর্ত্তিকাহিনী যে তাঁহার স্বদেশেই প্রথম গীত হইবে তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। ময়নামতীর গানেই সেই কীর্ত্তিগাথার সুন্দর নিদর্শন আমরা প্রাপ্ত হই। ময়নামতীর গানে গোপীচাঁদের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কাব্য সকলে তাহাই আদর্শরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং যেমন ত্রিপুরার গোপীচাঁদ রাজার চরিত্রাখ্যান জন্যই বঙ্গ সাহিত্যের প্রথম বোধন হইয়াছে, তেমনই তদীয় চরিত্র-গীতি ত্রিপুরার 'ময়নামতীর গানে'ই সেই বোধনের প্রথম স্তুতিপাঠ হইয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যের উৎপত্তি-যুগে যে সমস্ত কাব্য বিকাশলাভ করিয়াছে, গোপীচাঁদের উপাখ্যান সেইগুলিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং "ময়নামতীর গান" সেইগুলিকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে। রঙ্গপুরের "মাণিক চাঁদের গান," "গোবিন্দচন্দ্রের গীত," কামরূপের 'শিবের গীত,' এই সমস্তই 'ময়নামতীর গানের' প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এমন-কি বৌদ্ধ কাব্য 'ধর্ম্মমঙ্গল' পর্য্যন্ত ময়নামতীর গানের ছাঁচেই ঢালা। এইরূপে বঙ্গসাহিত্যের প্রথম আকৃতি ও প্রকৃতি যে ত্রিপুরাই প্রদান করিয়াছে, তাহাই উৎপন্ন হইতেছে। বঙ্গ সাহিত্যের দেশ-দেশান্তরে খ্যাতি প্রতিপত্তির মূলেও যে ত্রিপুরারই প্রভাব বিদ্যমান ছিল তাহাও ইহা হইতেই উপপাদিত হয়।

বঙ্গসাহিত্যের প্রথম প্রবর্ত্তনে ত্রিপুরার সাক্ষাৎ সম্পর্কের অন্য একটী নিদর্শনের বিষয়ও এতৎ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় আবহমান কাল হইতে যযাতিবংশীয়

দ্রুহ্যসন্তানগণ রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের বংশানুবৃত্ত ধারাবাহিকরূপে রক্ষিত হইয়াছে। সেই বংশানুবৃত্ত বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া "রাজ-মালা" আখ্যা লাভ করিয়াছে। এই রাজমালার রচনা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই হয়। সুতরাং ইহা বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত এবং চৈতন্য-চরিতামৃত অপেক্ষাও প্রাচীন। 'ময়নামতীর গানের' ন্যায় ইহা কাব্য নহে। ইহা পদ্যে ইতিহাস। 'ময়নামতীর গানের' ন্যায় ইহা প্রচার লাভ করে নাই বা বঙ্গসাহিত্যের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করে নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকবর স্বনামখ্যাত লং সাহেব, মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে ইংরেজীতে ইহার সার সঙ্কলন করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। রাজমালার প্রচার কম হইলেও বঙ্গসাহিত্যে ইহার মূল্য কম নহে। ইহা বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সম্পদ্। ইহা ছন্দোবদ্ধ প্রকৃত ইতিহাস। ইহাতে বঙ্গের সুপ্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস উভয়েরই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে 'ময়নামতীর গান' ও 'রাজমালা' ত্রিপুরার এই দুইখানা গ্রন্থই যে বাঙ্গালা ভাষায় আদি মৌলিক রচনা তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ইহাদের রচনারই যে কেবল মৌলিকত্ব আছে তাহা নহে, ইহাদের বিষয়েও মৌলিকত্ব আছে। ইহাদের বিষয় পৌরাণিক উপাখ্যানের অনুকীর্ত্তন নহে, ইহাদের বিষয় ত্রিপুরার ঐতিহাসিক প্রকৃত ঘটনা।

বঙ্গসাহিত্যের মূলবিকাশরূপে 'ময়নামতীর গান' ও 'রাজমালাকে' আমরা বঙ্গ ভাষায় আদি 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চদম্পতীর একতর বধ-জনিত শোক হইতে যেমন আদি কবি বাল্মীকির শ্লোক বা কবিতা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল; গোপীচাঁদের করুণ জীবনকথা হইতেও তেমনই গাথা বা বাঙ্গালা কবিতা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। পিতৃআজ্ঞায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রামের বনবাস গমন, ইহাই রামায়ণের মূল আখ্যান; মাতৃআজ্ঞায় রাজত্ব ছাড়িয়া সন্ন্যাসগ্রহণ, ইহাই "ময়নামতী গানে"র মূল আখ্যান। রামচরিত শ্রবণে এখনও লোকের মনে যেমন ভাবের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়, গোপীচাঁদের চরিত শ্রবণেও, এখনও তেমনই লোকের মনে ভাবের উচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে রাজমালাতেও মহাভারতেরই ন্যায় যযাতিরই বংশানুকীর্ত্তন। মহাভারতেরই ন্যায় ইহাতে ঘটনা-পরম্পরার সমাবেশ; যুদ্ধ বিগ্রহাদির বিবরণ। মহাভারতেরই ন্যায় ইহাতে বিষয়বাহুল্য ও বিষয়বৈচিত্র্য। বস্তুতঃ ইহার রচনার এরূপই গাম্ভীর্য্য, ওজস্বিতা ও পারিপাট্য আছে যে, তাহাতে কৃত্তিবাস ও কাশীরামের হৃদয়গ্রাহী প্রগাঢ় রচনার পূর্ব্বাভাসই যেন আমরা প্রাপ্ত হই।

পর্ব্বতের ক্ষীণ উৎসই যেরূপ ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া বিপুলকায় প্রবাহে পরিণত হয়; ত্রিপুরার পর্ব্বতেই সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যের ক্ষীণ উৎস প্রথম উৎপন্ন হইয়া বর্ত্তমান বিপুল বঙ্গ-সাহিত্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গকবির গীতিকবিতায় আজ জগৎ

মোহিত। ত্রিপুরার গোপীচাঁদের প্রাচীন গীতেই আমরা বাঙ্গালা গাথার সেই শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হই। গোপীচাঁদের গানের সেই শক্তি এখনও যে তিরোহিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ আমরা উপরে পাইয়াছি।

গোপীচাঁদের নাম ও গান ভারতের সর্ব্বত্র যেরূপ সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়াছে এবং এখনও ইহাদের প্রভাব যেরূপ জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বঙ্গবাসী মাত্রেই যে এতদুভয়কে পরমগৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ গোপীচাঁদ ও গোপীচাদের গান বঙ্গের খাঁটি জিনিসরূপে বঙ্গসাহিত্যকে যেরূপ গৌরব প্রদান করিয়াছে এরূপ আর অন্য কিছুতেই করিতে পারে নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নিজের ঘরের জিনিস বলিয়াই যেন বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে ইহারা হতাদর হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গে অধুনা যখন পুরাতত্ত্বের এরূপ অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে, তখন নিজের জিনিস নিজে চিনিয়া লওয়ার সময় অবশ্যই আসিয়াছে। গোপীচাঁদ ত্রিপুরার মেহারকুল পাটিকাড়ার রাজা ছিলেন। সুতরাং গোপীচাঁদ ত্রিপুরার আপনার লোক, গোপীচাঁদের গানও ত্রিপুরার নিজস্ব রচনা। এইরূপে বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপুরার প্রথম দান হইলেও ইহা সামান্য দান নহে! কারণ এই দানের দ্বারা বঙ্গ সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যসমাজে বরণীয় হইয়াছে। এই প্রথম ও শ্লাঘ্য দানের গৌরব ত্রিপুরা প্রাপ্ত হইলে ত্রিপুরার সাহিত্যগৌরবও সামান্য হয় না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ব্যাকরণ-বিভ্রাট

পঞ্চদশ দৃশ্য

সিদ্ধান্ত। (তাকের উপর টুক্‌রাগুলি সাজাইতে সাজাইতে) একখানি স্ফটিক পাত্রের টুক্‌রোও পাওয়া গেছে -

রামা। (স্বগত) বেশ যা হোক্— এবে সেই কাট্‌গ্লাসের ডিকেন্টারটার সদ্গতি করেছে দেখচি।

সিদ্ধান্ত। (সম্মুখে আসিয়া) আর কতকগুলা অর্ব্বাচীন কি না বলে বেড়ায় যে গুপ্তযুগে পাত্রের ব্যবহার ছিল না! বাঃ, এতে যে আবার রীতিমত খোদাই কাজও রয়েছে, দেখ্‌চি। এবার এই নিয়ে আমাদের 'পত্রিকায়' বেশ কড়া রকমের একটা প্রবন্ধ লিখতে হবে।

ঘন। চমৎকার মতলব করেছেন।

সিদ্ধান্ত। আপনার কল্যাণেই আমার জীবনের আজ এই শুভ দিন উপস্থিত। আজই আমাকে এ সব কথা অপর সদস্যদের জানাতে হবে। (পুনরায় পশ্চাদ্ভাগে গিয়া) প্রত্নতত্ত্বের এই নূতন আবিষ্কার সদস্যদের কাছে নিবেদন না কর্‌লে—

ঘন। বেশ কথা—সেই ব্যবস্থাই করুন।

সিদ্ধান্ত। আমি প্রস্তাব করতে চাই— আপনার বাগানে এই খনন-কার্য্য আরও

কিছুদিন ধরে চালানোর জন্যে এখানে একটা শাখা সমিতি গঠন করা হোক্।

ঘন। ঐটে মাপ কর্ত্তে হবে।

সিদ্ধান্ত। এযে প্রত্নবিস্তার জন্যে আবশ্যক। না হলেই নয়—দিন্ আমাকে—তাড়াতাড়ি কালি-কলমটা দিন্।

ঘন। এই যে, আসুন—আমার ডেস্কের উপর সবই রয়েছে। (সিদ্ধান্তকে ডেস্কের সম্মুখে চেয়ারে বসাইয়া দিল)

সিদ্ধান্ত। আপনি দেখ্‌ছি পাখার কলমেই লেখেন।

ঘন। হ্যাঁ—বরাবর—ওটা আমার চির-কেলে অভ্যাস।

সিদ্ধান্ত। কলমটার কচ্ খারাপ হয়ে গিয়েছে। আপনার ছুরি-টুরি বাইরে আছে কি ?

ঘন। (সিদ্ধান্তকে ছুরি দিয়া) আছে বৈ কি—এই নিন্।

সিদ্ধান্ত। (কলম কাটিতে কাটিতে) বলে কি-না, গুপ্তযুগে স্ফটিক পাত্রের ব্যবহার ছিল না! (হঠাৎ চীৎকার করিয়া) উহুহুঃ—

ঘন। কি হলো ?

সিদ্ধান্ত। হাত কেটে ফেলেছি।

ঘন। দাঁড়ান্। টানার মধ্যে ন্যাকড়া রয়েছে, বেঁধে দি। (আঙুলে নেকড়া জড়াইয়া দিয়া) নড়্‌বেন্ না—কেমন, হয়েছে তো ?

সিদ্ধান্ত। ধন্যবাদ—আপনাকে কিন্তু আরও একটু কষ্ট কর্ত্তে হবে।

ঘন। কি কর্‌বো, বলুন।

সিদ্ধান্ত। আমার হয়ে আপনি একবার কলমটা ধরে বসুন। আমি বলে যাচ্ছি।

ঘন। (স্বগত) সেরেছে, দেখ্‌চি! (প্রকাশ্যে) কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন ?

সিদ্ধান্ত। কেন, এতে আর আপত্তি কিসের ?

ঘন। পত্র যাচ্ছে আপনার প্রত্ন-সঙ্ঘতে—সে পত্র কি আমার লেখা ভাল দেখাবে ?

সিদ্ধান্ত। আহাহা, আপনি সহায়ক সদস্য হয়েছেন—আপনারই তো এ সব লেখ্‌বার কথা।

ঘন। (ডেস্কের ধারে বসিবার উপক্রম করিয়া) তা অবশ্য বল্‌তে পারেন বটে। (স্বগত) আজ সবাই আমার পিছনে লেগেছে—না লিখিয়ে ছাড়্‌বে না, দেখ্‌চি—এদিকে মা সরস্বতীটিরও দেখা পাবার যো নেই।

সিদ্ধান্ত। প্রস্তুত হয়েছেন ?

ঘন। এই যে—এক মিনিট্ (স্বগত) দেখি, যদি মেলা কালিটালি ফেলে—

সিদ্ধান্ত। (বলিয়া যাইতে লাগিলেন) 'সভ্য মহোদয়গণ আজ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের সৌভাগ্য-রবি সমুদিত—'

ঘন। (স্বগত) চলে এসো দাদা—যত বড় বড় শক্ত কথা সব বেছে বেছে বলতে থাকো—প্র—ত্ন—ত—ত্ব—

সিদ্ধান্ত। হলো ?

ঘন। দাঁড়ান্ একটু। (স্বগত) প্র—ত্ন—ত—ত্ত—তাইত—'তয়ে'-'তয়ে' না 'তয়ে'-'তয়ে' 'ব'-ফলা—বেটা 'ব' ফলায় ফের গোল বাধিয়েছে। যাক্, একটা ফন্দী ঠাওরেছি—(ছুরি লইয়া কলম কাটিতে লাগিল)

সিদ্ধান্ত। (বলিয়া যাইতে লাগিলেন)

'সৌভাগ্যরবি সমুদিত—আমাদিগের প্রত্ন-সাহিত্য-সঙ্গতের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে—'

ঘনশ্যাম। (হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন) উহুহু!

সিদ্ধান্ত। কি হলো?

ঘন। আমিও হাত কেটে ফেলেছি—টানার মধ্যে থেকে ন্যাকড়াটা বার করে দিন্‌তো।

সিদ্ধান্ত। (টানা খুলিয়া নেকড়া বাহির করিয়া) এই যে, পেয়েছি—বেঁধে দিচ্ছি। দাঁড়ান—এবার আমার পালা। (ঘনশ্যামের আঙুলে সযত্নে নেকড়া জড়াইয়া দিল)

ঘন। (স্বগত নেকড়া-বাঁধা আঙুল নাড়িতে নাড়িতে) যাক্‌, কাজ মিটেছে এবার—এখনকার মত তো বেঁচে গেলুম।

সিদ্ধান্ত। (তাঁহার নিজের আঙুল দেখাইয়া) আঃ, কি মুস্কিল!—শেষে—চিঠিখানা দেখ্‌চি, আজ আর লেখা হল না।

ঘন। বলেন তো আমার মেয়েটিকে ডেকে দি। সে এমন শুদ্ধ বাঙ্গলা লেখে—যে লোহারাম শিরোরত্ন কোথায় লাগেন!

সিদ্ধান্ত। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) এমন মেয়ে! আপনার ভাগ্য ভাল। তা কি মনে হয়? হেমাঙ্গিনী আমার সুধীরকে বিবাহ কর্ত্তে রাজী হবে কি?

ঘন। না হবার তো কারণ দেখি না।

সিদ্ধান্ত। কিছু মনে করবেন না। একটা ঘরোয়া কথা বলছি—আমাদের ওখানে বড় রাস্তার ধারে একখানি সুন্দর বাড়ী রয়েছে—পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকেই খালি হবে—তাই জবাবটা আমার একটু তাড়াতাড়ি পেলে ভাল হয়—

ঘন। কেন, বলুন্‌ তো।

সিদ্ধান্ত। মনে করছি ঐ বাড়ীটা বৌমাকে কিনে দেব—

ঘন। সে কি—আমার মেয়ে কি সেখানেই থাক্‌বে না কি?

সিদ্ধান্ত। স্ত্রী ত স্বামীর কাছেই থাকে।

ঘন। (স্বগত) না—এ হচ্ছে না—আমার তা হলে চলবে কি করে? আমি রইলুম এখানে, আর আমার বানান-ব্যাকরণ রইল সেখানে। এ হতেই পারে না।

হেমাঙ্গিনী। (দ্বারের নিকট আসিয়া) আপনাদের কাজ হয়ে গেছে? এখন আস্‌তে পারি কি?

সিদ্ধান্ত। এসো মা—আস্‌বে বৈকি—আমি এই তোমার বাবাকে বল্‌ছিলাম—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে—বড় প্রয়োজনীয় কথা, মা।

হেমাঙ্গিনী। আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন?

সিদ্ধান্ত। তোমার এতে মত হলে বড়ই খুসী হবো মা।

[নেপথ্যে—সিদ্ধান্ত-মশায়! ও সিদ্ধান্ত-মশায়!]

সিদ্ধান্ত। (ঘনশ্যামের প্রতি) আপনার মালীটা এসেছে—ওকে বলেছিলাম—ফুলগাছ তলাটাও একবার খুঁড়ে দেখবো। (হেমাঙ্গিনীর প্রতি) আমি একটু ঘুরে আসি মা। (পশ্চাৎদিকের দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

ষোড়শ দৃশ্য

ঘনশ্যাম। (জনান্তিকে) না—এ পাত্তরে চল্‌বে না। প্রথমতো ওর একটা দোষ

রয়েছে—কি, তা সঠিক জানা গেল না বটে—তবে, স্বভাবের দোষও হতে পারে তো।

হেমা। তখন কি একটা কথা বল্‌বেন, বল্‌ছিলেন না?

ঘনশ্যাম। সেই কথাই তো হচ্ছে রে পাগলী—তা সে আর শুনে কি হবে? যত বাজে কথা—ছেলেমানুষী, সিদ্ধান্তর মাথায় ঢুকেছে। তোমার সঙ্গে তার ছেলে সুধীরের বে দেবে বলছিল কি না—

হেমা। যান্—যত বাজে কথা—

ঘন। তুইতো জানিস্ না। বল্‌ছি, দাঁড়া—পাত্তরটি নেহাৎ মন্দ নয়, তবে দোষের মধ্যে মাথায় একটু টাক্ পড়েছে—চোখেও একটু কম ভাখে, মামুলি রকমের চেহারা—বেঁটে খাটো—তার উপর আবার ভুঁড়িটিও ছোট নয়—

হেমা। কিন্তু, বাবা—

ঘন। মনে করিস্‌নে—তোর মন ভাঙ্গাবার জন্যে বল্‌ছি। তোর যদি পছন্দ হয়, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে মনে রাখিস্, তার সাম্‌নের দিকে গোটা তিনেক দাঁতও পড়ে গিয়েছে।

হেমা। তা বাবা—

ঘন। তারপর ওর একটা খুঁতও রয়েছে—বড় বিষম খুঁত—প্রায় দোষ বল্লেই হয়।

হেমা। (ব্যস্তভাবে) সুধীর বাবুর দোষ!

ঘন। (সিদ্ধান্তের দেওয়া পত্রখানি বাহির করিয়া)—দাঁড়া, এই যে আমার পকেটেই রয়েছে—পড়ছি, শোন্—শুনলেই গা জ্বলে উঠ্‌বে। (স্বগত) মেয়ে আমার হয়তো, খুঁতটা কি, এইবার ধরে ফেল্‌বে। (পড়িতে লাগিলেন)

"বাবা, আজ আপনার কাছে একটা গোপন কথা প্রকাস করব। আমার জীবনের যা-কিছু সুখ-সচ্ছন্দ সবই এর উপর নির্ভর করছে। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসি-"

হেমা। (বিচলিত হইয়া স্বগত) কি সরল লোক! কি সুন্দর!

ঘন। (পড়িয়া যাইতে লাগিলেন) "তাকে দেখে অবধি আমার আহার-নিদ্রা একেবারেই ত্যাগ—"

হেমা। (স্বগত) আহা, বেচারী—

ঘন। কৈ, কিছু ধর্‌তে পার্‌লে?

হেমা। না—

ঘন। তাহ'লে আর খানিকটা পরেই পাওয়া যাবে। (পুনরায় পড়িতে লাগিলেন) "তার মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে সদাই বিরাজিত—" (থামিয়া—হেমাঙ্গিনীর প্রতি)—কি ভয়ঙ্কর কথা!

হেমা। ভয়ঙ্কর?

ঘন। বলিস্ কি? ভয়ঙ্কর নয়? (তাড়াতাড়ি চিঠিখানা পকেটে ফেলিয়া) আমি তো স্থির করেছি, এ সম্বন্ধটা তেমন সুবিধের হবে না।

হেমা। কিন্তু বাবা—

সপ্তদশ দৃশ্য

সিদ্ধান্ত। (প্রবেশ করিয়া) ফুলগাছটা কাটা হলো বটে, কিন্তু তলা খুঁড়ে কিছুই পাওয়া গেল না!

ঘন। সর্ব্বনাশ! আমার কাশীর কুল-গাছটা!

সিদ্ধান্ত। (হেমাঙ্গিনীর প্রতি) তা হলে ছেলেকে গিয়ে কি বল্‌বো, মা?

হেমা। আজ্ঞে—আমি তা—

ঘন। (নিম্নস্বরে—হেমাঙ্গিনীর প্রতি) জবাবটা আমিই দিচ্ছি (সিদ্ধান্তের প্রতি) আমি বড়ই লজ্জিত, কিন্তু কি করি, এ-রকম বন্ধুত্বের স্থলেও আমাকে বাধ্য হয়ে জানাতে হচ্ছে, আপনি যে ত্রুটির কথা বলেছেন, তা একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না—

সিদ্ধান্ত। আর বল্‌তে হবে না—বুঝতে পেরেছি—আমিও এই ভয়ই কর্‌ছিলাম।

ঘনশ্যাম। (কন্যার প্রতি) দেখ্‌লি মা—উনিও আগে থাক্‌তেই আন্দাজ করেছিলেন!

সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমাকে একেবারে না—শুধু এইটুকু ভরসা দিতে হবে—যে যদি কোন দিন অসম্ভবও সম্ভব হয়—অর্থাৎ সুধীরটা বি, এ, পাশ কর্ত্তে পারে, তা হলে—

ঘনশ্যাম। বি, এ, পাশ?

সিদ্ধান্ত। তা হলে বুঝ্‌লেন তো! কথা রইলো! যাই, এবার কাপড়গুলো ব্যাগের ভিতর গুছিয়ে নিইগে—এখনই রওনা হতে হবে। (বাহিরের দিকে চলিলেন)

হেমা। (ঘনশ্যামের প্রতি) সে কি! উনি এখনই যাবেন!

।। (ফিরিয়া আসিয়া) আর দেরি কর্‌বো না—যাই, ছেলেকে সুসংবাটা দিই গে—

(হেমাঙ্গিনী টেবিলের নিকট ফিরিয়াবসিল)

সিদ্ধান্ত। আমার কিন্তু আর একটি অনুরোধ আছে—আমাকে অনুগ্রহ করে—অতীত যুগের ভগ্নাবশেষগুলি সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি দিতে হবে।

ঘন। তা আর বল্‌তে! কতকগুলো ভাঙ্গা টুক্‌রো জিনিষ বইতো নয়।

সিদ্ধান্ত। আমি অঙ্গীকার-বদ্ধ রইলাম, এগুলি আমাদের চিত্রশালায় সযত্নে রক্ষিত হবে। অনুমতি করেন তো নিজে সংস্কৃত ভাষায় কাষ্ঠ ফলকের উপর লিখিয়ে নেব, "রামনগর-নিবাসিনঃ চক্রবর্ত্তী-উপধিকস্য শ্রীবনশ্যামস্য দানং"।

ঘন। সে আপনার অনুগ্রহ।

(সিদ্ধান্ত তাকের উপর সাজানো টুকরাগুলি উঠাইয়া লইতে লাগিলেন)

সিদ্ধান্ত। এইবার ব্যাগ আর বোচকাটা বেঁধে ফেল্‌তে হবে)

(ডানদিকের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন)

অষ্টাদশ দৃশ্য

(হেমাঙ্গিনী টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া দুই হাতে মুখ-চোখ ঢাকিল)

ঘন। যাক্, এ ব্যাপারটা তো এক-রকম চুকিয়ে দেওয়া গেল। (হেমাঙ্গিনীর প্রতি) কেমন খুসি হয়েছিস্ তো? এ কি, তুই কাঁদ্‌ছিস্ মা। কেন, কি হয়েছে?

হেমাঙ্গিনী। (উঠিয়া পিতার সম্মুখে আসিয়া) কাঁদ্‌বো না? আপনি যে মিছিমিছি সুধীর বাবুর কতকগুলো নিন্দা কর্‌লেন, তিনি ত বেঁটেও নন্, চোখেও কম দেখেন না—

বেশ লম্বা-চওড়া সুডৌল গড়ন, মুখে সর্ব্বদাই হাসিটুকু লেগে রয়েছে।

ঘন। তুই কি তাকে চিনিস্ নাকি ?

হেমা। সেই গেল-বার গ্রীষ্মকালে—সেখানে সখের থিয়েটারে দেখেছিলুম।

ঘন। তা সে ছোঁড়ার ভাঁড়ামি দেখে তুই বিরক্ত হোস্‌নি ?

হেমা। (মাথা নীচু করিয়া) তাঁর অভিনয় তো সকলেই ভাল বল্‌ছিলো !

ঘন। (স্বগত) তারই উপর মন পড়েছে দেখ্‌ছি—নাঃ—মেয়েটাকে এতক্ষণ মিছিমিছি কাঁদালুম্।

পশু। (ফুলের তোড়া হাতে প্রবেশ করিয়া) সুখবর! সুখবর! আজ আপনারই জয়-জয়কার! এক নিজের ভোট ছাড়া মোক্তারচন্দ্র আর একটি ভোটও পান্‌নি—সর্ব্বসম্মতিক্রমে আপনিই নির্ব্বাচিত হয়েছেন। কৈ! শুনে ত তেমন খুসি হলেন বলে বোধ হচ্ছে না ?

ঘন। (চিন্তাকুলভাবে) না, না, খুসি হয়েছি বৈকি, খুব খুসি হয়েছি।

পশু। শুভস্য শীঘ্রম্। (উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া) হাঁরে রামা, তোকে না বলেছিলুম জালা দুই গুড়ের সরবৎ আর ক' কল্‌সী পচাই এদের জোগাড় করে রাখ্‌তে ?

ঘন। আবার 'পচাই' কেন হে ?

পশু। বুনোগুলোর গলা ভিজোবার একটু ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে তো! এ কাজের এই দস্তুর। (পুনরায় ভৃত্যকে ডাকিয়া) ওরে রামা, নিয়ে আয়না!

রামা। (ভার ধার দিয়া বাঁকে করিয়া বড় বড় দুইটি কল্‌সী আনিয়া) এই যে সরবৎ-টরবৎ সব এনেছি। (পশুপতির প্রতি নিম্নস্বরে) ডাক্তার বাবু, ক' বোতল 'ধেনো'রও জোগাড় আছে—চাকর-বাকরদের চল্‌বে'খন।

পশু। (কলসী উঠাইতে ইঙ্গিত করিয়া) চল্, বেরিয়ে পড়ি।

(রামকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান)

ঘন। (স্বগত) কত আদরের মেয়ে! না, আর ইতস্ততঃ করেই বা কি হবে! (ডেস্কের সম্মুখে বসিয়া কলম তুলিয়া লইলেন)

হেমা। (স্বগত—আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে) আজ যে বড় নিজেই লিখ্‌ছেন!

(নিঃশব্দে কাছে গিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া কি লিখিতেছেন, দেখিতে লাগিল)

ঘন। (নিবিষ্টচিত্তে ধীরে ধীরে এক-একটি কথা লিখিতেছেন আর এক একবার করিয়া পড়িতেছেন)—'গ্রামবাসিগন, আমি ইচ্ছা করিয়াই পদত্যাগ করিতেছি—'

হেমা। বাবা, এ কর্‌ছেন কি ? (কাগজখানি তুলিয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল)

ঘন। ছিঁড়্‌লে কেন ?

হেমা। 'গণে'র 'ণ' মূর্দ্ধণ্য 'ণ' হবে যে।

ঘন। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) দূর হোক্‌গে। —আবার সেই 'ণ' ত্ব-বিধানের গোলমাল! নাঃ—পদত্যাগ যে কর্‌বো, তাও মেয়েটা না হলে হবে না!

(নেপথ্যে সিদ্ধান্ত-রত্নের গলায় স্বর শুনা গেল)

ঘন। এই দিকেই আস্‌ছেন।

হেমা। আমি যাই, তা হলে।

ঘন। না—থাক্ আর একটু।

ঊনবিংশ দৃশ্য

সিদ্ধান্ত। (এক হাতে ব্যাগ ও অপর হাতে ভাঙ্গা টুক্‌রাগুলির পুঁটুলি) আপনার কাছে বিদায় নেবার পূর্ব্বে—

ঘন। (সিদ্ধান্তের হাত হইতে ব্যাগ লইয়া) মেয়েদের কি মতের ঠিক আছে, মশায়! জানেন্ তো—ক্ষুব্ধ জলধি—নারীর চিত্ত ক্ষণতরে নহে স্থির। আমাদের বাপ-বেটীতে এতক্ষণ এই নিয়েই কথাবার্ত্তা হচ্ছিল—ভাল-মন্দ দু দিকই বিবেচনা করে মা-লক্ষ্মীর আমার শ্রীমান সুধীরকেই বিবাহ করার মত হয়েছে। আমিও আনন্দের সঙ্গে আপনার এ প্রস্তাবে আমার আন্তরিক সম্মতি জানাচ্ছি।

(আকস্মিক চিত্তবিপ্লবে সিদ্ধান্তের হাত হইতে ভাঙ্গা টুকরার পুঁটুলিটি অতর্কিতে ঘনশ্যাম বাবুর পায়ের উপর পড়িয়া গেল)

সিদ্ধান্ত। (হেমাঙ্গিনীর প্রতি) বড় সুখী কর্‌লে মা—আমায়। আশীর্ব্বাদ করি, চিরদিন এম্‌নি সুখে থাকো। না বেহাই মশায়, আর আমি থাকতে পার্‌বো না। আমাকে গিয়ে এখন সেই বাড়ীখানার বন্দোবস্ত কর্ত্তে হবে।

হেমা। কোন্ বাড়ী বাবা?

ঘন। (বিষণ্ণ ভাবে) যে বাড়ীতে তুমি স্বামীর ঘর কর্ত্তে যাবে মা!

হেমা। (স্বগত) বাবাকে ফেলে? তাঁর বক্তৃতা, প্রবন্ধ, এগুলোর তা হলে কি উপায়? নাঃ, সে হবে না! বাবাকে দেখবার কেউ নেই যে! (প্রকাশ্যে সিদ্ধান্তের প্রতি) বাবা কিন্তু আপনাকে একটা সর্ত্তের কথা বল্‌তে ভুলে গেছেন।

সিদ্ধান্ত। কি সর্ত্ত, মা?

হেমা। আমি কোনমতেই এ বাড়ী ছেড়ে যেতে পার্‌বো না।

ঘন। (কন্যার হাত ধরিয়া) মা—

সিদ্ধান্ত। বুঝ্‌লাম্—তা তোমাদের এখানে প্রত্ন-অনুসন্ধানের যে সুবিধা আছে—এ সর্ত্তে বিশেষ বাধা হবে না। তবে বছরে মাস দুই করে বাটুকেমারী গিয়ে—(নিজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এ বুড়োর খবরও নিতে হবে ত! তারই বা কে আছে মা?

হেমা। (পিতার দিকে চাহিয়া) তা বেশ ত!

ঘন। (কন্যার প্রতি নিম্নস্বরে) রাজী হ মা। আমি এক ফন্দী ঠিক করেছি—সে সময় বুড়ো আঙুলটা না হয় একটু কেটে ফেলা যাবে। (প্রকাশ্যে সিদ্ধান্তের প্রতি) আচ্ছা, এই কথাই রইল।

সিদ্ধান্ত। তুমি যে কত লক্ষ্মী, মা, তা আর কি বল্‌বো?—তুমি সুধীরের অমন একটা দোষের দিকে চেয়েও দেখলে না!

হেমা। দোষ! কি দোষ?

সিদ্ধান্ত। সে কি বেহাই মশায়—সে কথা কি মাকে বলেননি?

ঘন। না—আমার সাহসে কুলোইনি, মশাই—আপনিই বলুন। (স্বগত) দোষটা যে কি, এইবার বোঝা যাবে।

সিদ্ধান্ত। সুধীরের আমার বয়স তো বেশী নয়, কিন্তু ছেলে ছোট হলেও সে খুবই ধীর। মনটা বড় ভাল, শরীরে দয়া-মায়া খুবও আছে। নির্ম্মল চরিত্র, কোন নেশা-ভাং নেই—বড় জোর অসাক্ষাতে এক-আধটা চুরুট যদি খায়।

ঘন। সেই বার্ড্স্আই-গুলো বুঝি?

সিদ্ধান্ত। কিন্তু আর সব গুণ থাক্‌লেও তার ব্যাকরণের জ্ঞান বড়ই কম। দেখেন নি; চিঠিতে প্রকাশ বানান করেছে 'স' দিয়ে, তারপর 'স্বাচ্ছন্দ্য' না লিখে লিখেছে 'সচ্ছন্দ'! হুঁঃ! তার উপর অব্যয়ের 'উপসর্গ'গুলোও শুদ্ধ ভাবে প্রয়োগ কর্ত্তে পারে না।

ঘন। তা ভয় নেই, বেয়াই মশায়, আমরা তো আর উপসর্গ নই, তদ্ধিত, মিলেমিশে থাক্‌লে পর কোন গোলই বাধ্‌বে না।

হেমা। কি বলেন বাবা—ক'দিন একখানা ব্যাকরণ নিয়ে পড়ে থাক্‌লেই তো এ সব ঠিক হয়ে যায়।

ঘন। আমি একজনকে জানি, তার এ কাজের ভার নেওয়া খুব অভ্যাস আছে। (স্বগত) বেটীর একটা নতুন পড়ো জুটলো—মেয়েটা দেখ্‌চি, গোষ্ঠী-শুদ্ধ সকলের কলাপ, মুগ্ধবোধ, ব্যাকরণ-চন্দ্রিকা হয়ে পড়্‌বে।

কোরাস্—(সমস্বরে গান)

সুখে যদি থাক্‌বে—পড় প্রণয়েরি পাঠ।
গেরস্থালির মাঝে মিছে ব্যাকরণের ঠাট॥

যবনিকা

শ্রীগুরুদাস সরকার।

ভারতের দারিদ্র্য ও তাহার প্রতিকার।

(ফরাসী হইতে)

আবার বলিতেছি, ভারতের অবস্থা সচরাচর নিয়মের বহির্ভূত নহে। যে সকল দেশ পরিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছে সেই সকল দেশেরই ন্যায় ভারতেও আমরা দেখিতে পাই, গ্রাম্য লোকের সংখ্যা অত্যধিক এবং তাহারই পরিণাম—দারিদ্র্য, প্রাচীন শ্রমশিল্পের অবনতি, বৃহৎ-শ্রমশিল্প এখনও অনিশ্চিত, কাঁচা মালের বেশী রপ্তানি, কারখানা-তৈয়ারী মালের বেশী আমদানি—কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ত্তকর্ম্মের দ্রুত বৃদ্ধি, নূতন নূতন শ্রমশিল্পের ও নূতন নূতন চাষের উৎপত্তি। ইংরাজের সংগৃহীত তথ্য-বিবরণ হইতে, এমন-একটা সঙ্কট-অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় যাহার দৃষ্টান্ত অন্যত্র কোথাও নাই, এবং যে সঙ্কট-অবস্থা অন্যান্য দেশের লোক অতিক্রম করিয়াছে বা অদ্যাপি করিতেছে। ভারত নিশ্চয়ই এই সঙ্কট-অবস্থা হইতে খুব সমৃদ্ধ হইয়াই বাহির হইবে, কদাচ দৈন্যদশাপন্ন হইবে না।

কিন্তু যেমন ভারতের স্বার্থ তেমনি ইংলণ্ডেরও স্বার্থ যে, এই সঙ্কটের অবস্থাটা অধিক কাল স্থায়ী না হয়।

এখন এই সম্বন্ধে ইংরেজ-সরকারের কি কর্ত্তব্য, এবং ভারতবাসীদিগেরই বা কি কর্ত্তব্য তাহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাক্‌।

সকল দেশেই, সরকার অনেক কাজ করিতে পারে; ভারতের শাসন-কর্ত্তৃত্ব অবাধিত, রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রায় অসীম।

সকল দেশেই সরকারের অনেক কর্ত্তব্য আছে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কর্ত্তব্য কমিয়া যায়। সরকারের অভিভাবকতার অধীনে কোন রাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জ শিক্ষিত ও সমুন্নত হইয়া উঠিলে, তাহারা জন-সভা ও স্বাধীনভাবে-গঠিত দলবদ্ধ বণিক-সভাদির সাহায্য বেশী বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে। কিন্তু উনবিংশতি শতাব্দীতে সমাজের বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে, হঠাৎ নানাপ্রকার অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হওয়ায়, যে সকল মহাদেশের ধনরত্ন-উদ্ধার অসহ হইয়াছিল, সেই সকল অনুদ্ধৃত-ধনরত্ন মহাদেশের প্রতি লোকের নজর পড়িল এবং খুব সম্প্রতি জনশিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ায়, রাজসরকার জনসাধারণের অভিভাবক ও পথপ্রদর্শক হইতে বাধ্য হইলেন। কেননা, প্রজাপুঞ্জ নবশিক্ষিত হওয়া প্রযুক্ত অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের বিচার করা তাহাদের পক্ষে অতীব কঠিন, এবং সম্প্রতি কতকটা রাষ্ট্রীয় অধিকার ও স্বাধীনতা লাভ করায়, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সংযতভাবে ও বিজ্ঞতাসহকারে প্রয়োগ করাও তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য,—ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তবে, যে দেশের সমস্ত মাটি সরকারের নিজস্ব, যে দেশের ৯৯ অংশ লোক একেবারেই নিরক্ষর সে দেশের অভিভাবকেতার কাজ কি রাজ-সরকার সহসা ছাড়িয়া দিতে পারে?,

যাহাতে ভারত শীঘ্র সমৃদ্ধ হইয়া উঠে তাহার জন্য ভারত-সরকার অবশ্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। কিন্তু কেমন করিয়া সফলতা লাভ করিবেন? এই সকল অর্থনৈতিক সমস্যা সবে মাত্র আলোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য এখনো গোড়ার তথ্যসমূহের অভাব রহিয়াছে। অবশ্য, যাহাতে উত্তমরূপে ধন-বণ্টন হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা সরকারের কর্ত্তব্য; কিন্তু সর্ব্বোপরি সরকারের দেখা উচিত, যাহাতে ধনের উৎপত্তি স্থগিত না হয়। যদি ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পের উন্নতি, উনবিংশতি শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অত্যন্ত দুঃখ-দৈন্য আনিয়া থাকে তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে শ্রমজীবীরা প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শেষ-কয়েক বৎসরের অর্থ-সঙ্কট সত্ত্বেও, রুস কৃষক ও জাপানী কৃষকের অবস্থা অনেকটা ভালোর দিকে যাইতেছে। প্রধান দরকার—ধনের উৎপত্তি; ধনের বণ্টন কালসহকারে অপেক্ষাকৃত সমভাবে স্বতই সম্পাদিত হইবে।

ভারতের দরকার—মূলধন; লভ্যজনক সুদ না দিতে পারিলে, ভারত মূলধন আকর্ষণ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না।

অতএব ভারত-সরকারের কর্ত্তব্য :—

বৈষয়িক হিসাবে দেখিতে গেলে—

প্রথমে "হোম্-চার্জ্জ" কমানো। গ্রেট-ব্রিটেনের আয়-ব্যয় হিসাবের মধ্যে, ভারত-সচিব-বিভাগ-সংশ্লিষ্ট খর্চ্চা ধরা উচিত এবং সৈনিক খর্চ্চা কমানো উচিত।

রাজস্বও কমানো আবশ্যক (অন্তত বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও মধ্য-ভারতের রাজস্ব)। এইরূপ

ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া যে আয় হইবে, সেই আয়ের টাকা কৃষকদিগকে খয়রাৎ না করিয়া উহার দ্বারা কৃষি-বেঙ্কের পত্তনভূমি স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

নৈতিক হিসাবে দেখিতে গেলে :—

বাধ্যতামূলক জনশিক্ষা। ব্যবসায়িক শিক্ষার বিস্তার। এখনকার পিতৃতন্ত্রিক ও স্বেচ্ছাতন্ত্রিক শাসনের বদলে, যাহাকে প্রকৃতরূপে আধুনিক শাসন-তন্ত্র বলে সেই শাসনতন্ত্র ক্রমশ বেশী বেশী করিয়া প্রবর্ত্তিত করা। এই রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যবহার এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতে রাষ্ট্রাধিকারী রাষ্ট্রাধিকারী ইংরাজের দায়িত্ব উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাই শ্রমশিল্পী ইংরাজকে, বণিক ইংরাজকে, রাজ্যাধিকারী ইংরাজকে কর্ম্মে আগ্রহ, নূতন উদ্যোগে উৎসাহ-উদ্যম, এবং বৃহৎ ব্যাপার সাধনোপযোগী কর্ত্তৃত্বশক্তি প্রদান করিয়াছে।

ভারতের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ইংরেজ-সরকার যেরূপ অনেকটা সাহায্য করিতে পারেন, ভারতবাসীরা তাহা অপেক্ষা আরও বেশী সাহায্য করিতে পারে।

সব-শুদ্ধ ধরিতে গেলে, উহাদের চিরপ্রথাগত, শ্রেণীবদ্ধ পিতৃতন্ত্রিক সমাজ এখনও সেই অতীতকালের সমাজই রহিয়াছে; সুতরাং আধুনিক য়ুরোপীয় সমাজ যে বলবীর্য্য, যে স্থিতি-স্থাপকতা, যে সমৃদ্ধি, এবং যে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া থাকে, ভারতীয় সমাজ তাহা ভোগ করিতে অসমর্থ।

অবশ্য, রাষ্ট্রবিপ্লব বিপদজনক, তাছাড়া রাষ্ট্রবিপ্লব অসম্ভব। কিন্তু ভারতের ক্রমবিকাশ যাহাতে আস্তে আস্তে ক্রমশঃ সংসাধিত হয় তজ্জন্য ভারতবাসীদিগের বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নিম্নলিখিত বিষয়ে তাহাদের চেষ্টা উদ্যম প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক, যথা,—

(১) যৌথ-পরিবারতন্ত্র রহিত করা।

(২) আস্তে আস্তে জাতের বন্ধন ছিন্ন করা।

(৩) বণিক-সংঘ, অন্যোন্য-সাহায্য-সমিতি, যৌথ-কারবার প্রতিষ্ঠিত করা।

(৪) যে মূলধন অনর্থক পড়িয়া থাকে, তাহা কাজে খাটানো।

এইরূপ সমস্ত ভারতে, নৈতিক সভ্যতা ও বৈষয়িক সভ্যতা এরূপ একটা সঙ্কটের অবস্থা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে, যাহা অতীব জটিল; এবং যাহা সভ্যতার ইতিহাসে অপরিজ্ঞাত।

এই অবস্থাটা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য, আমরা ফরাসী-বিপ্লবের দৃষ্টান্তটা আনিব;

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী-রীতিনীতির সহিত উনবিংশতি শতাব্দীর রীতিনীতির তুলনা করিব। তখনকার সেই সকল যুঝাযুঝি, সেই সকল রাষ্ট্রনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদ, সেই সকল দ্বেষ-বিদ্বেষ মনে করিয়া দেখ, যাহা হইতে ফরাসী-বিপ্লব উদ্দীপিত হইয়াছিল। তথাপি, ১৭৮৯ অব্দের ঘটনাবলীর ৬০ বৎসর পরে সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন, সংঘটিত হয়। রাষ্ট্র-বিপ্লব যে সকল প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সকে প্রদান করে বস্তুত তাহা ফ্রান্সের ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি। সকল রাজা ও সকল মন্ত্রীবর্গ

পূর্ব্বেই কি জনশিক্ষা-পদ্ধতির কেন্দ্রিকতা ও সুসঙ্গতি প্রস্তুত করেন নাই? "Civil-code" এর যে সকল ব্যবস্থা Le Play ও তাঁহার সম্প্রদায়ের লোক দুষিয়াছেন, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর বিধিব্যবস্থা ও "প্যারী নগরের ব্যবহারের" মধ্যে কি দেখা যায় না?

ইহার বিপরীতে, ভারতবর্ষে নৈতিক মূলতত্বের সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের বৈষয়িক-অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে সকল জাতির ধর্ম্মমত বিভিন্ন, ইতিহাস বিভিন্ন, এবং যাহাদের দেশের আব্-হাওয়া বিভিন্ন, সেই সকল জাতির মতবাদ ও নূতন রীতিনীতি ভারত কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য মানব-সভ্যতা মূলে এক; এই সভ্যতার প্রাচ্যরূপ ক্রমশঃ পাশ্চাত্য রূপের নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি সভ্যতা অন্য সভ্যতাকে প্রভূত পরিমাণে আগাইয়া গিয়াছে; মানব-সভ্যতা ভারতে একটা বিশেষ লক্ষণ ধারণ করিয়াছে; এবং অপর একজাতি—যাহার মতিগতিও ভিন্নরূপ, সেই ব্রিটিস্ জাতির প্রভাবাধীনে এই ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ লক্ষণটি ক্রমশ লুপ্ত হইবার দিকে চলিয়াছে।

*

এসিয়িক জাতিদিগের মধ্যে কেবল দুইটি জাতি য়ুরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে তাই, উহাদের পরস্পর তুলনা করিলে, আলোচনার পক্ষে সুবিধা হইবে।

প্রথমে সাদৃশ্য।

জাপানের ন্যায় ভারতেও, প্রাচীন সভ্যতার প্রভাব ও প্রাচ্য-সুলভ মনোভাব প্রবল; এবং উহা কি নৈতিক, কি বৈষয়িক, উভয় হিসাবেই প্রবল। প্রাচীন রীতি-নীতি, পারিবারিক গঠনপদ্ধতি, ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি জন-সাধারণ, বজায় রাখিয়াছে। জাপানীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন, ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জন কৃষিজীবী; চাষের প্রণালীটা পুরাকালেরই মতো। ছোট-খাটো শ্রমশিল্পের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; গ্রাম্য মণ্ডলী সমূহ নিজের প্রয়োজন অনুসারে সমস্ত দ্রব্যই উৎপাদন করে।

জনসাধারণের বিপরীত,—একটি বিশিষ্ট দল সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। ছাত্র, রাজকর্ম্মচারী, সাহিত্যিক—ইহারা য়ুরোপীয় রীতিনীতি ও য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতেছে। উহারা য়ুরোপের বিজ্ঞান অনুশীলন করে, য়ুরোপীয় সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে।

দাসবৎ অনুকরণের যুগের পর— এইরূপ বিশ্বাস হয়, বুঝি সুশিক্ষিত ভারতবাসী ও জাপানী—উভয়ই উহাদের নিজস্ব জাতীয় সভ্যতা ত্যাগ করিবে, কিন্তু তাহা না হইয়া, দেখা যায়, উভয়ই স্বকীয় সভ্যতা আবার গ্রহণ করিয়াছে।

M. Masujema নামক এক জাপানী লেখক এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন:—

"আমাদের শেষ বিশ বৎসরের ইতিহাসটি এই:—প্রথমে আমরা অতীতকে উচ্ছেদ করিলাম; তাহার পর, সমস্ত বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করিলাম; পরিশেষে, যাহা আমরা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম।"

সেইরূপ নব-হিন্দুরাও আজকাল আর তত য়ুরোপীয় রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণ করে না ;—নিজের রীতিনীতির সংশোধনেরই দিকে উহাদের বেশী চেষ্টা।

পক্ষান্তরে, বৈষম্য। বৈষম্যও গুরুতর। জাপানে, একটা রাষ্ট্র-বিপ্লব,—সমস্ত গোত্র, সমস্ত কুল, সমস্ত শ্রেণীকে এক করিয়া ফেলিয়াছে। স্বাধীনতা হইতে একটা জীবন্ত দেশানুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছে এবং জাতীয় রাষ্ট্র-নীতি সমুদ্ভূত হইয়াছে। জনশিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়াছে, ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিষম সংশয়বাদ উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতে, বিভিন্ন রাজ্য, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তাহার উপর আবার বর্ণভেদ-প্রথা সমস্তকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। দেশানুরাগ এখনও অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট ; শিক্ষার বিস্তার অল্পই হইয়াছে ; ধর্ম্মান্ধতার গোঁড়ামি অতিশয় প্রবল। সর্ব্বোপরি—যাহারা সমাজ-সংস্কারের সূত্রপাত করিয়া থাকে, তাহারা বৈদেশিক।

অতএব দেখা যাইতেছে, জাপান যতটা সকল বিষয়ে পরিপুষ্ট ও সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছে, ভারত ততটা হয় নাই। কিন্তু য়ুরোপীয়েরা যেরূপ মনে করে তাহা অপেক্ষা অবশ্য ভারতের বেশী উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে। সাধারণতঃ ইহা স্বীকৃত না হইলেও,—ভারতের উন্নতি-সাধনে ভারতবাসীদের যে কতকটা হাত আছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোর ফুল্‌কি

[৪]

ক্ষেত আর আবাদ যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানে পাহাড়ের একটা ঢল্‌, সেইখানে পেঁচাদের ঘোঁটের মজলিস বসবে। অতি নোংরা ঢালু জমী ;—শেয়াল-কাঁটা, বাবলা-কাঁটায় ভরা ; উপরে মস্ত পাকুড় গাছটা, সরু একটা পাগ্‌দণ্ডি বেয়ে সেখানে উঠতে হয়। রাত্রে জায়গাটাতে এলে ভয় করে কিন্তু দিনের বেলায় যখন সূর্য্য ওঠে, এখান থেকে ছায়ায় বসে পাহাড়ে-ঘেরা গ্রাম, নদী সবই অতি চমৎকার দেখায়।

পাকুড় গাছে, লতা-পাতায়, ঝোপে-ঝাড়ে জায়গাটা এমনি ঢাকা যে একবিন্দুও চাঁদের আলো সেখানে পড়তে পায় না। সেই ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে হুতুম পেঁচার চোখ টিপ্‌টিপ্‌ করে জ্বলছে, আর-কিছু দেখাও যাচ্ছে না, শোনাও যাচ্ছে না ; অথচ অনেক পাখীই আজ সেখানে জুটেছে ঘোঁট করতে। পেঁচার সদ্দার হুতুম একে-একে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, আর চারিদিকে একটার পর একটা লাল, নীল, হল্‌দে, সবুজ চোখ জ্বালিয়ে দেখা দিতে থাকলো একে-একে—ধুঁধুল পেঁচা, কাল্‌ পেঁচা, কুটুরে পেঁচা, গুড়্‌গুড়ে পেঁচা, দেউলে পেঁচা, দালানে পেঁচা, গেছো পেঁচা,

জংলা পেঁচা, পাহাড়ী পেঁচা। হুথুমথুমো ডেকে চলেছে—"ভুতো পেঁচা, খুদে পেঁচা, চিলে পেঁচা, গো-পেঁচা, গোয়ালে পেঁচা, লক্ষ্মী পেঁচা—"লক্ষ্মী পেঁচার দেখা নেই, চোখও জ্বলছে না। হুতুম ঘাড় ফুলিয়ে রেগে ডাক দিলে—"ল-ক্-খী-পেঁ-এঁ্যা-এঁ্যা-চা-আ-আ!"লক্ষ্মী পেঁচা তাড়াতাড়ি এসে চোখ খুলে হাঁপাতে-হাঁপাতে বল্‌লে—"অনেক দূর থেকে আসতে হয়েছে,বিলম্ব হয়ে গেল।" চিলে পেঁচা চেঁচিয়ে বল্লে—"সেই জন্যেই ত্বরা করা তার উচিত ছিল।"

সব পেঁচা একত্র হয়েছে, তখন হুতুম গম্ভীরভাবে বল্লেন—"কাজ আরম্ভ হবার আগে এস ভাই সব এককাট্টা হয়ে এক-সুরে নিজের-নিজের ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে দিই —"হুতুম্-থুম্, হুদুম্-দুম্! লাগ্ লাগ্ ঘুঁট্! লাগ্ লাগ্ ঘুঁট! দে ধুলো, দে ধুলো, দে ধুলো—চোখ্‌-আ-আ গো-ফ্-তা!" সমস্ত রাত্রিটার অন্ধকার বিকট শব্দে ভরে দিয়ে পেঁচাগুলো ডানা ঝাপ্‌টাতে লাগলো, আর অন্ধকারের জয় দিতে থাকলো—

ঘুট্ ঘুটে আঁধারে
আমরা খুলি চোখ,
—যত লাল চোখ্!
বুকে বসাই নোখ,
রক্তে গিলি ঢোক্!
হাড় ভাজি আর ঘাড় ভাজি
আর দিই কোপ্,
ঝোপ বুঝে কোপ্
আঁদাড়ে কোপ্, পাঁদাড়ে কোপ্!

"চোপ্ চোপ্"—বলে হুতুম সবাইকে থামিয়ে গম্ভীর সুরে আঁধারের স্তুতি আওড়ালেন —"নিঝুম্ রাত—দুপুর রাত—নিশুতি রাত! কেষ্টপক্ষের কষ্টিপাথর কালো আকাশের কালো রাত! বর্ষাকালের কাজল-মাখা পিছুর রাত! নিখুঁত রাত! কালোর পরে একটি খুং তারার টিপ্! ভয়ঙ্করী নিশিথিনী—বিরূপ ঘোর—ছায়ার মায়া—থাকুন, তিনি রাখুন নিশাচর-নিশাচরী রক্তপাত করি—আচম্বিতে নিঝুম রাতে, দুপুর রাতে! নষ্ট চন্দ্র, ভ্রা তারা, ভিতর-বার অন্ধকার—রাত, সার রাত! নিঝুম দুপুর—নিখুঁৎ দুপুর, অকূ রাত!"

হুতুম পেঁচা চুপ করলেন। খানিব চারিদিক যেন গম্‌গম্ করতে লাগলো কারু সাড়া-শব্দ নেই,অন্ধকারে কেবল ছুঁচোর খুস্‌থাস্ আর বেরালের গা-চাটার চট্‌চা শোনা যেতে লাগলো! পাকুড়-তলায় এত-বড় গম্ভীর মজলিস কোনো দিন বসেনি।

এইবার বয়েসে সবার বড় চিলে পেঁচার পালা। সে চড়া গলায় চীৎকার করে সুর কল্লে—"ভাই সব!" সব জ্বলন্ত চোখগুলো অমনি চিলের দিকে ফিরলো।—"ভাই সব, আমরা আজ এই কতকালের পুরোনো মিস্ কালো পাকুড়-তলায় ঘুটঘুটে আঁধারে কেন এসেছি জানো? খুন—খুন—খুন—করতে, এ আমি চেঁচিয়েই বলবো! কিসের ভয়? কাকে ভয়!" তারপর একেবারে নবমে গলা চড়িয়ে চিলে বল্লে—"ভয় করবোনা, চেঁচিয়েই বলি—কুঁকড়োটা চো-ও-ও-র—"বলেই বুড়ো চিলের গলা ভেঙে গেল, সে খক্‌খক্ করে কাশ্‌তে লাগলো। আর অন্য সব পেঁচা চেঁচাতে থাকলো—"চোর! ডাকাত! সিঁদেল! বদমাস!—আমাদের সর্ব্বস্ব নিলে!"

চড়াই অম্‌নি বলে উঠলো—"কি নিলে শুনি ?"

"আমাদের আনন্দ, আমাদের তেজ সবই হরণ করছে জাননা ?"—বলে পেঁচাগুলো চড়ায়ের দিকে কট্‌মট্‌ করে চাইতে লাগলো।

চড়াই একটু দূরে সরে একটা বাঁশ-ঝাড়ে বসে শুধোলে—"তোমাদের তেজ কেমন করে হরণ কল্লে সে ?"

"কেন, গান গেয়ে ! তার সুর শুনলেই আমাদের দুঃখু আসে বেদনা বোধ হয় ; সব পেঁচারই মন খারাপ হয়ে যায়, কেননা তার সাড়া পেলেই মনে পড়ে—"

"আলো আস্‌ছে !"—বলেই চড়াই সট্‌ করে বাঁশ-ঝাড়ে লুকুলো। হুতুম রেগে চড়াইকে বল্লে—"চুপ্‌ ! খবরদার ও-জিনিষের নাম আর করোনা, ও-নাম শুনলেই রাত্রির মন চঞ্চল হয়ে যেন পালাই-পালাই করতে থাকে !"

চড়াই বেরিয়ে এসে বল্লে—"আচ্ছা না হয় দিন আস্‌ছে বলা যাক্‌ !"

অম্‌নি সব পেঁচা শিউরে উঠে চারিদিকে উ আঁ করতে লাগলো আর কানে ডানা ঢেকে বিকট মুখ করে বলতে লাগলো—"থামো, থামো, চুপ, চুপ !" চড়াই আবার লুকিয়ে পড়লো, পেঁচাদের বিকট চেহারা দেখে তার একটু ভয় হলো। হুতুম খানিক ভেবে বল্লে—"বল না বাপু, যা আসবার তা আসছে !" চড়াই বল্লে—"ছি ছি ও কথা—যা আসবার তা তো আসবেই, কেউ তো ঠেকাতে পারবে না !"

হুতুম বল্লে—"তা তো জানি, কিন্তু আসবার আগে তার নাম কেন সে কুঁকড়ো করে বল তো ? তার কাঁসির মত গলা শুনলেই সেই শেষ-রাতের কথাই যে মনে আসে।"

"ঠিক্‌, ঠিক্‌, সত্যি, সত্যি !"—সব পেঁচাই বলে উঠলো। দিনের কথা মনে করতেও তাদের বিষম কষ্ট হচ্ছিল।

হুতুম বল্লে—"রাত যখন পোহাবার দিকেই যায়নি, তখন থেকেই পাজি কুঁকড়োটা গান সুরু করে..."

সবাই অম্‌নি বলে উঠলো—"ডাকু হায় ! চোট্টা হায় !" হুতুম আবার বল্লে—"বাকি রাতটুকু সে একেবারে কাঁচা-ঘুম ভাঙিয়ে মাটি করে দেয়।" চারিদিক দিন থেকে অম্‌নি চেঁচানি উঠলো—"মাটি। মাটি ! একেবারে মাটি ! নেহাৎ মাটি।" তারপর একে-একে সবাই আপনার-আপনার দুঃখু জানাতে লাগলো। ধুঁধুল বল্লে—"খরগোসের গর্ত্তর কাছে খানিক বসতে-না-বসতে কুঁকড়োটা ডাক দেয় আর অম্‌নি আমায় সরতে হয়।" কাল পেঁচা বল্লে—"পেটের ক্ষিদে ভালো করে মেটাবার জো নেই—সেটার জ্বালায়।" কেউ বল্লে—"তার সাড়া কানে এলেই আর মাথা ঠিক রাখতে পারিনে, এটা করতে ওটা করে ফেলি। খুন করতে হয় মশায় তাড়াতাড়ি—যেন আমারি দায় পড়েছে ! জখমগুলোও যে একটু শক্ত করে বসাবো তার সময় পাইনে মশয় ! যতটুকু মাংস দরকার তার বেশি একটু কি সংগ্রহ করবার জো আছে ওটার জ্বালায় ! ওর গলাটা শুনলেই দেখি যেন অন্ধকার দেখতে-দেখতে ফিকে হচ্ছে, আর আমি ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে যাই !"

চড়াই শুনে-শুনে বল্লে—"আচ্ছা সব দোষ কি কুঁকড়োর ? এ-পাড়া ও-পাড়ায় আরো

তো অনেক মোরগ আছে যারা ডেকে থাকে!”

হুতুম বল্লে—“তাদের গানকে আমরা ভয় করিনে! ওই কুঁকড়োর ডাকটাই যত নষ্টের গোড়া, সেইটেই বন্ধ করা চাই।” সবাই অমনি চেঁচিয়ে উঠলো—“বন্ধ হোক! বন্ধ হোক! চাই,—বন্ধ করা চাই!”—আর ডানা বাজাতে লাগলো।

গোলমাল একটু থামলে গো-পেঁচা বল্লে—“তা যাই বল, চড়াই আমাদের জন্যে অনেক করেছেন।” চড়াই ভয় পেয়ে বল্লে—“কি, কি, আমি আবার কল্লেম কি, এ আবার কেমন কথা?” খুদে পেঁচা বল্লে—“কুঁকড়োর নিন্দে রটিয়ে, তার নকল দেখিয়ে তামাসা করে’!” অমনি দেউলে, দালানে, গুড়গুড়ে, গোয়ালে, গেছো, জংলা, পাহাড়ে সব পেঁচা হাসতে লাগলো—হুঃ হুঃ, ঠিক ঠিক, বাঃ বাঃ, ঠিক ঠিক, হু হু হু হু, হু-উ-উ, খুব ঠিক্, খুব ঠিক!

হুতুম রোঁয়া ফুলিয়ে পাখা ঝাপ্টালে—“বস্-স্-স্।” অমনি সব চুপ হয়ে গেল! চিলে-পেঁচা গলা কাঁপিয়ে চিঁচিঁ করে বল্লে—“তার নিন্দেই রটাও আর নকলই দেখাও, সে তো তাতে থোড়াই ডরায়! বেপরোয়া সে গান গেয়ে চলে, আর বেকার আমরা কেঁপেই মরি। এই দেখনা সাজগোজ হীরে-জহরতের দিক দিয়ে দেখলে ময়ূরের সাম্নে কুঁকড়োটা দাঁড়াতেই পারে না, কিন্তু তবু তার গান, সে তো এখনো আমাদের জ্বালাতে ছাড়ছে না।” সব পেঁচা বিকট চীৎকার করতে থাকলো—“ধর কুঁকড়োকে! মার কুঁকড়োকে—ধুমা ধুম্ ধুমা ধুম্!”

হুতুম চট্‌পট্ ডানা ঝেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে বল্লে—“থামো থামো শোনো শোনো—এ্যা-টেন্-শ-ন্ অ-ব-ধা-ন্।” অম্নি সব পেঁচা ডানা ছড়িয়ে গোল চোখগুলো পাকিয়ে স্থির হয়ে বসলো—এম্নি গম্ভীর হয়ে যে, রাতটাও মনে হতে লাগলো যেন কত বড়, কত-না গভীর! ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে থেকে লক্ষ্মী-পেঁচা আস্তে-আস্তে বল্লে—“তাকে মারা তো হয় না! যে-সময়ে সে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় সে সময় আমরা দেখতেই পাইনে, চোখে সব যে বোধ হয় ধোঁয়া আর ধাঁধা—ধাঁ-ধাঁ ধাঁ।” বলেই লক্ষ্মী-পেঁচা চুপ করলে, আর সব পেঁচা গুমরোতে থাকলো।

তখন পাকুড়-গাছের আগডালের উপর থেকে কুটুরে পেঁচা মিহি আওয়াজ দিলে,—“বোলুঙ্গা কুছ্, সচ্চা হায় কুছ্!” হুতুম উপর দিকে চেয়ে বল্লে—“শুনি তোমার মতলবটা কি?” কুটুরে সট্ করে নীচের ডালে নেমে বসে আরম্ভ করলে—“পাহাড়ের ও দিকটায় একটা লোক অদ্ভুত সব পাখীর চিড়িয়াখানা বানিয়েছে, নানা দেশী-বিদেশী মোরগ—নানা জাতের, নানা কেতার—ধরা আছে। ময়ূর—যিনি রাজ্যের অদ্ভুত পাখীর খবর রাখেন, তিনি কুঁকড়োকে কিছুতে দেখতে পারেন না, কেননা ময়ূরের একটিমাত্র বই দুটি সুর নেই, তাও আবার কর্ণকুহর ভেদ করা ছাড়া আর-কিছু করতে পারে না। কিন্তু কুঁকড়োর ডাক—সে সোজা অন্ধকারের বুকে গিয়ে বেঁধে আর তারপর যে কাণ্ডটা ঘটে তা কারুর জানতে বাকি নেই! কাজেই ময়ূর স্থির করেছেন চিনেমুর্গির কুলতলার মজ্‌লিসে তিনি এই-সব অদ্ভুত

মোরগদের হাজির করবেন।" "চিনে মুরগীর সঙ্গে আলাপ করে দিতে বুঝি ?"—বলেই সব পেঁচা হোঁ হোঁ করে হাসতে থাকলো।

কুটুরে বল্লে—"এই সব অদ্ভুত মোরগের কাছে কি কুঁক্ড়ো দাঁড়াতে পারবে ? একেবারে খাড়া দাঁড়িয়ে মাটি হবে।"

গোয়ালে-পেঁচা বলে উঠলো—"হাজির তারা হবে কেমন করে ? খাঁচা না খুলে দিলে তো সেই সব খাসা মোরগদের এক পা নড়বার সাধ্যি নেই।"

কুটুরে সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বল্লে—"তারও উপায় করা গেছে। যে পাহাড়ী ছোঁড়াটা খাঁচা খুলে সকালে তাদের দানাপানি খাওয়ায় সে কাল যেমন খাঁচা খুলবে আর আমি অমনি তার মুখে গিয়ে ডানার এক ঝাপ্‌টা দেবো। নিশ্চয়ই সে কাঁদতে-কাঁদতে দৌড় দেবে—খাঁচা খোলা রেখে। পেঁচার বাতাস গায়ে লাগলেই অসুখ, সেটা জানো তো ? তার পর সব মোরগকে নিয়ে সরে পড় আর কি !"

চড়াই বল্লে—"ওদিকে কুঁকড়ো বলছেন যে তিনি মজলিসে মোটেই যেতে রাজি নন।"

বেরাল বল্লে—"যাবে না কি ? নিশ্চয়ই যাবে! দেখনি সোনালিয়া মুর্গিটির সঙ্গে তার কত ভাব। আমি এই লিখে দিচ্ছি সোনালিয়া কুঁকড়োকে মজলিসে হাজির করবেই কাল।"

চড়াই বুঝলে কালো বেরালটা সারাদিন ঘুমোয় বটে, কিন্তু কোথা কি হয় সেটুকুও দেখে শোনে, গোলাবাড়ীর সব খবরই সে রাখে চোখ বুজে-বুজেই।

চড়াই বল্লে—"হাজির যেন হলেন কুঁকড়ো, তারপর ?"

"তারপর আর কি? কুঁকড়ো যখন দেখবেন পাড়ার সবাই অদ্ভুত সব মোরগদের খাতির করতেই ব্যস্ত—এমন-কি হয়তো সোনালী পর্য্যন্ত—জেনে রেখো তখন খুটিনাটি বাধবেই, আর তা হলেই—"

"কুঁকড়োর লড়াই না হয়ে যায় না।" বলেই হুতুম ঠোঁটে ঠোঁট বাজিয়ে দিলেন। কিন্তু বেরাল বল্লে—"ধর লড়ায়ে কুঁকড়োর হার না হয়ে জিতই হয়ে গেল ফস্ করে। তখন উপায় ?"

কুটুরে অমনি বল্লে—"সে ভাবনা নেই, ঐ-সব খাসা মোরগদের মধ্যে যে বাজাখাঁই পালোয়ান মোরগ আছে তাকে পারে এমন কেউ দেখিনে। মানুষ তার পায়ে লোহার কাঁটা-দেওয়া যে কাতান বেঁধে দিয়েছে তার এক ঘা খেলে কুঁক্ড়োকে আর দেখতে হবে না—একেবারে চিৎপটাং।" বলে কুটুরে হাসতে লাগল। সঙ্গে সব পেঁচাই খাঁই খাঁই করে নাচতে থাকলো।

হুতুম বল্লে—"আমি তো বাপু আগে গিয়ে তার মাথার মোরগ-ফুলটা ছিঁড়ে খাবো—কপা কপ্, কপা কপ্!"

চড়াই মনে-মনে বল্লে—"গতিক তো খারাপ দেখছি। কুঁকড়োকে খবর দেবো না কি ?" কিন্তু চেঁচিয়ে সে সবাইকে বল্লে—"বেশ হবে, খুব হবে, ভালোই হবে, কি বল ?"

কুটুরে বল্লে—"মজা বলে মজা! খাসা মোরগগুলোও দুচারটে মরবে নিশ্চয়। পেট ভরে খাও; সেগুলো কি নষ্ট করা ভালো ?"

হুতুম চিলের কানে-কানে বল্লে—"কুঁক্ড়োর কাবাবের পর দুজনে মিলে—বুঝেছ কি না—চড়াই-ভাজি..." আর তারপরে

ধুঁধুলে পেঁচা কি বলতে যাচ্ছে এমন সময় দূরে কুঁকড়োর সাড়া পড়লো—"গা -তোল্— তোল্!" পেঁচারা শুনলে—"পটোল তোল্।" অমনি ভয়ে সব চুপ। কুটুরে ক্রমেই মাথা হেঁট করতে লাগলো—কে যেন তার ঘাড় ধরে মাটিতে মুখ ঘসে দিতে চাচ্ছে। এতক্ষণ পেঁচা সব রোঁয়া ফুলিয়ে বিকট চেহারা করে বসে ছিল, দেখতে-দেখতে ফুটো রবারের গোলার মতো চুপ্‌সে গেল—যেন কতদিন খায়নি! মুখে কারু কথা সরছে না, কেবল চোখ পিট্‌পিট্‌ করে এ ওকে শোধাচ্ছে—"হল কি? কি ব্যাপার?" তারপর ডানা মেলে একে-একে সবাই পালায় দেখে চড়াই বল্লে—"এরি মধ্যে চল্লে নাকি?" চড়ায়ের কথা কেই-বা শোনে! চড়াই যত বলে—"ভোর হতে এখনো দেরী, চলুক না ঘোঁট আরো খানিক।"—সব পেঁচা চোখ পিট্‌পিট্‌ করে বলে—"না না না, আর না, আর না, আর না!" হুতুম বল্লে—"গেলুম!" ধুঁধুল বল্লে—"মলুম্! "বাঁচাও বাঁচাও।"— বলছে আর-সব পেঁচাগুলো। তাড়াতাড়িতে কোথায় যাবে, কি করবে ঠিক পাচ্ছেনা, কাণার মতো কখনো কাঁটা-গাছে গিয়ে পড়ছে, কখনো পাথরে টক্কর খাচ্ছে আর ডানা দিয়ে চোখ-মুখ ঘস্‌ছে আর বলছে— "উঃ গেছি! উঃ গেছি!" "লাগ্‌ছে লাগ্‌ছে!" —বলতে-বলতে একে-একে সব পেঁচা চম্পট দিলে। সব-শেষ হুতুম-পেঁচাটা "গেলুম! গেলুম!"—বলতে-বলতে উড়ে পালালো।

চড়াই দেখলে অন্ধকারের মধ্যে কালো-কালো নৌকোর মতো দলে-দলে পেঁচা গ্রাম ছাড়িয়ে ক্রমে পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে গেল। আর কেউ কোথাও নেই, পাকুড়-তলা সে একা রয়েছে। "কাজের তো হলো, এখন ছোট-হাজরির জন্যে একটা গঙ্গা-ফড়িং পেলে হয় ভালো,"—বলে চড়াই এদিক-ওদিক করছে, এমন সময় একটা ঝোপের আড়াল থেকে ঝপ্‌ করে সোনালিয়া বেরিয়ে এল। চড়াই অবাক হয়ে বল্লে—"এ কি? এত রাত্রে আপনি এখানে!"

সোনালিয়া একটু দূরে থেকে পেঁচাদের যুক্তি সমস্ত শুনেছিল, সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বল্লে—কি ভয়ানক ব্যাপার, চড়াই তো কুঁকড়োর বন্ধু, এখন বন্ধুকে বাঁচাতে চেষ্টা তো তার করা উচিত!

চড়াই আবার ফড়িংএর সন্ধান করতে করতে বল্লে—"পেঁচা-ভাজা খেতে কি মজা চা পাখী-জন্মে তারা কেউ জানলে না—"

সোনালিয়া অবাক হল। চড়াইটার রকম দেখে সে রেগে বল্লে—"কথার জবাব দাওনা!" "কিঃ!"—বলেই চড়াই ফিরে দাঁড়লো। সোনালি শুধোলে—"ঘোঁটের খবর জানতে চাচ্ছি!" চড়াই ধীরে-সুস্থে উত্তর কল্লে—"ঘোঁটটা খুব চলেছিল, সব দিকেই ভালো।"

সোনালি চড়াইয়ের হেঁয়ালির অর্থ বুঝলে না; সে পরিষ্কার জবাব চাইলে। চড়াই বল্লে —"অন্ধকার বেশ ঘুট্‌ঘুটে আর পেঁচাগুলোও বেশ মোটা-সোটা দেখলেম।"

"তারা তাঁকে মারবার যুক্তি করলে?" সোনালি শোধালে।

"নাঃ, মারবার নয়—তাঁকে পরলোকে পাঠাবার যুক্তি।"—বলে চড়াই সোনালিকে আশ্বাস দিয়ে বল্লে—"তবু কষ্টকটা রক্ষে, কি

বল?" সোনালি কি বলতে যাচ্ছিল, চড়াই বল্লে—"ভাবছো কেন, শেষ দাঁড়াবে যা তা কচ্ছাঃ, বুঝলে?" "সোনালি ভয়ে-ভয়ে বল্লে —"যাই বল কিন্তু পেঁচারা তো সহজ পাখী নয়!"

চড়াই হেসে বল্লে—"কিন্তু তাদের যুক্তিটা মোটেই ভয়ানক নয়। আরো অনেক যুক্তি তারা এঁটেছে, আঁটবেও। পেঁচাগুলো যদি সহজ পাখী হতো তবে খুঁটে না করে খাবার খুঁটেই তারা বেড়াতো। কিন্তু তাদের ভুরু চোখের উপরে, নীচে, আশে-পাশে; আর চোখগুলো দেখেচো তো? মনে হয় যেন পাহারোলার লণ্ঠন—খোলো আর বন্ধ কর। আর ঠোঁট তো দেখেছ?"—বলেই চড়াই "ছিঃ ছিঃ!" বলে ডানা ঝাড়া দিয়ে বল্লে— "তুমি কিছু ভেবোনা সোনালি! সব ঠিক হবে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা চাই, বুঝলে কি না!"

সোনালি চড়াইয়ের হেঁয়ালি বড়-একটা বুঝলে না কিন্তু কুঁকড়োর পুরোনো বন্ধু হয়ে চড়াই এখনো যখন হাসি-তামাসা করছে তখন ভয়ের কারণ খুবই কম এটা তার মনে হল। "কিন্তু তবু কি জানি, কুঁকড়োকে সব কথা জানানো ভালো।"—বলে সোনালি গোলাবাড়ীর দিকে যাবে, চড়াই তাকে তাড়াতাড়ি পথ-আগলে বল্লে—"অমন কাজটি করো না, যদি-বা কুঁকড়ো সেখানে না যান, এই ঘোঁটের কথা শুনলে নিশ্চয়ই যাবেন, আর তাহলে লড়াই বাধবেই!" সোনালি চড়ায়ের কথা রাখলে। চড়াই যখন তাঁর পুরোনো বন্ধু, তখন তারি পরামর্শ-মতো কাজ করাই ঠিক। সোনালি যাচ্ছিল ফিরে এল।

ওদিক থেকে শব্দ এল—"গা-তো-ল্!" চড়াই আর সোনালি ফিরে দেখলে কুঁকড়ো আসছেন। কুঁকড়ো হাঁক দিলেন—"কো-উ-ন হ্যায়!"

সোনালি মিহিসুরে উত্তর দিলে— "সো-না-লি য়া"—

কুঁকড়ো শোধালেন—"ওখানে আর কেউ আছে কি?" সোনালি চড়াইকে চোখ টিপে বল্লে—"না মশায়!" ঘোঁটের কথা কুঁকড়োকে যেন বলা না হয় সোনালিকে সে-বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে, চড়াই আস্তে-আস্তে বাব্‌লা-গাছের তলায় একটা খালি ফুলের টবের আড়ালে গিয়ে লুকোলো।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রণসঙ্গীত

রচনা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

লক্ষ ভায়ের দাঁড়ের টানে ভাস্‌লো রণতরী,
ভাবনা কি আর, হবই ত পার, তুফানে কি ডরি।
পরেছি বীর-বর্ম সাজ, মাতৃভূমির ঘুচাব লাজ,
হঠ্‌ব না ভাই হঠ্‌ব না আজ, বাঁচি কিম্বা মরি।

কোরাস—

জয় জয় জয় জয় বল বল হো,—
দিগ্‌সীমান্তে চল চল হো,—
গাও জয়, রণজয়, গগন ভরি,—
আমরা তুফানে কি ডরি!

২

ছিলাম একা, আজকে কোটি, কাঁদ্‌ব না আর ধূলায় লুটি,
শপথ নেছি সবে জুটি, মায়ের চরণ ধরি।
শাণিত কৃপাণ দর্পে খুলে, মাভৈঃ বলে দিব তুলে
অন্যায়েরি বক্ষঃমূলে, মৃত্যু বরণ করি।—

কোরাস—

জয় জয় জয় জয় বল বল হো—
দিগ্‌ সীমান্তে চল চল হো—
গাও জয়, রণজয়, গগন ভরি—
আমরা তুফানে কি ডরি।

৩

তপ্ত রক্ত শিরায় জাগে,—নাম্‌রে কূলে, চল্‌রে আগে,
দাঁড়াই গিয়ে পুরোভাগে,—অরির প্রতাপ হরি।
ধন্য হোক্ তুচ্ছ জীবন,—ধন্য মানি শুভ্রগ্রহণ—
জয়-সমুদ্রে পার হব ভাই—ধর্ম্মরাজে স্মরি।

কোরাস—

জয় জয় জয় জয় বল বল হো—
দিগ্‌সীমান্তে চল চল হো—
গাও জয়, রণজয়, গগন ভরি—
আমরা তুফানে কি ডরি।

স্বরলিপি

II র্সা -া -া র্সা। র্সা -া র্সা -া। না -ধা না -ধা।
ল ০ ০ ক্ষ ভা ০ য়ের ০ দাঁ ০ ড়ের ০

। পা -ক্ষা পা -া I গা -া -া গা। পা -ক্ষা পা -া। গা -ঋা -গা -ঋা।
টা ০ নে ০ ভা ০ সৃ লো র ০ ণ ০ ত ০ ০ ০

১ ৩
। সা -ন্‌া র্সা -া I সা -া -া গা। ক্ষা -া পা -া
রী ০ ০ ০ ভা ০ ব্‌ না কি ০ আর্‌ ০

০ ১ ২
। ধা -া পা -া। ক্ষা -া পা -া I র্রা -া র্সা -া।
হ ০ বই ০ ত ০ পার্‌ ০ তু ০ ফা ০

৩ ০ ১
। না -া ধা -পা। গা -রা -গা -রা। সা -ন্‌া -সা -া II
নে ০ কি ০ ড ০ ০ ০ রি ০ ০ ০

৩
I {পা -া গা । । পা -ক্ষা ধা -া। র্সা -ন্‌া র্রা -না।
{প ০ বে ০ ছি ০ বার ০ ব ০ র্ষ ০

১ ২ ৩
। র্সা -া -া -া I র্সা -া -া র্রা। র্গা -া র্পা -া।
সাজ্‌ ০ ০ ০ মা ০ ০ ঽ ভূ ০ মিব ০

১ ২
। র্গা -র্রা র্গা -র্রা। র্সা -না র্সা -া I র্সা র্গা -া র্গা।
ঘু ০ চা ০ ব ০ লাজ্‌ ০ হ ০ ঠ্‌ ব

৩ ০ ১
। র্রা -া র্সা -া। না -র্রা -া র্সা। না -া ধা -পা I
না ০ ভাই ০ হ ০ ঠ্‌ ব না ০ আজ্‌ ০

২ ৩ ০ ১
। সা -া -া রা। গা -া পা -া। গা -রা -গা -রা। সা -না -সা -া I
বাঁ ০ ০ চি কি ০ স্বা ০ ম ০ ০ ০ বি ০ ০ ০

(কোরাস)

২ ৩ ০ ১
I র্গা র্গা র্রা র্রা। র্সা র্সা ধা ধা। পা পা গা গা। সা -া -া -া I
জ য় জ য় জ য জ য ব ল ব ল তো ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
I পা -া -া পা। ধা -া না -া। ধা পা ধা পা। র্সা -া -া -া I
দি ০ গ্ সী মা ০ ন্তে ০ চ ল চ হো ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা গা পা -া। মা মা ধা -া। পা -া না না। ধা -া র্সা -া I
গা ও জ য়্ র ণ জ য়্ গ ০ গ ন ভ ০ বি ০

২ ৩ ০ ১
I র্রা -া র্সা -া। না -া ধা -পা I গা -রা -গা -রা। সা -ন্‌া -সা -া II
তু ০ ফা ০ নে ০ কি ০ ড ০ ০ ০ রি ০ ০ ০

কোরাস সর্ব্বত্র এই সুর।

২ ৩
I সা -া ধ্‌া -া। সা -া সা -রা। গা -া -া পা।
ছি ০ লাম্ ০ এ ০ কা ০ আজ্ ০ ০ কে

১ ২ ৩
। মা -া গা -া I না -া ধা -া। পা -ক্ষা পা -া।
কো ০ টী ০ কাদ্ ০ ব ০ না ০ আব ০

০ ১ ২´
I গা -রা গা -রা। সা -ন্‌া সা -া I সা -া ধা -া।
ধু ০ লায়্ ০ লু ০ টি ০ শ ০ পথ্ ০

৩ ০ ১
। ধা -া পা -া। ক্ষা -ধা পা -া। ক্ষা -া গা -া I
নে ০ ছি ০ স ০ বে ০ জু ০ টি ০

২ ৩ ০ ১
I সা -া রা -া। গা -া পা -া। ধা -পা -ধা -পা। র্সা -া -া -া I
মা ০ য়ের ০ চ ০ বণ্ ০ ধ ০ ০ ০ রি ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I পা -া গা গা। পা -ক্ষা ধা -া। র্সা -না -র্রা না। র্সা -া র্সা -া I
শা ০ নি ত কৃ ০ পাণ ০ দ ০ ০ র্পে খু ০ লে ০

২ ০ ১
I র্সা -া র্রা -া। র্গা -া র্পা -া। র্গা -র্রা র্গা -র্রা। র্সা -না র্সা -া I
মা ০ ভৈঃ ০ ব ০ লে ০ দি ০ ব ০ তু ০ লে ০

২ ০ ১
I র্সা -র্গা -া র্গা। র্মা -া র্গা -া। না র্রা -া র্সা। না -া ধা -পা I
অ ০ ০ ন্যা যে - রি ০ ব ০ ০ ক্ষ মূ ০ লে ০

২ ৩ ০ ১
I সা -া -া রা। গা -া পা -া। গা -রা -গা রা। সা -ন্া সা -া I
মৃ ০ ০ ত্যু ব ০ বণ্ ০ ক ০ ০ ০ বি ০ ০ ০

(কোরাস্)

জয় জয় জয় .. .. ইত্যাদি।

২ ৩ ০ ১
II সা -া -া ধ্া। সা -া সা রা। গা -া পা -া। মা -া গা -া I
তৃ ০ ০ ষ্ণু র ০ ক্ত ০ শি ০ রায ০ জা ০ গে ০

২ ৩ ১
I না -া ধা বা। পা -ক্ষা পা -া। গা -রা -গা রা। সা -ন্া সা -া I
না ০ ম্ রে কূ ০ লে ০ চ ০ ল্ রে আ ০ গে ০

২ ৩ ০ ১
I সা -া ধা -া। ধা -া পা -া। ক্ষা -ধা পা -া। ক্ষা -া গা -া I
দাঁ ০ ড়াই ০ গি ০ যে ০ পু রো ০ ০ ভা ০ গে ০

২ ৩ ০ ১
I সা -া রা রা। গা -া পা -া। ধা -পা -ধা -পা। র্সা -া -া -া I
অ ০ রি র প্র ০ তাপ্ ০ হ ০ ০ ০ রি ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
I পা -া -া ক্ষা। পা -ক্ষা -ধা -া। র্সা -না র্রা -মা। র্সা -া র্সা -া I
ধ ০ ০ ন্য হোক্ ০ ০ ০ তু ০ চ্ছ ০ জী ০ বন্ ০

২ ৩ ০ ১
I র্সা -া -া র্রা। র্গা -া র্পা -া। র্গা -র্রা র্গা র্রা। র্সা -না র্সা -া I
ধ ০ ০ ন্য মা ০ নি ০ স্ত ০ ০ ন্য গ্র ০ হন ০

২´ ৩
I র্সা -র্গা -া র্গা। র্রা -া র্সা -া। না -র্রা -া র্সা। না -া ধা পা I
জয়্ ০ ০ স মু ০ দ্র ০ পার ০ ০ হ ব ০ ভা ই

২ ৩ ০ ১
I সা -া -া ‌রা। গা -া পা -া। গা -রা -গা -র্রা। সা -ন্‌া -সা -া I
ধ ০ ০ র্ম্ম রা ০ জে ০ স্ম ৃ ০ ০ রি ০ ০ ০

(কোরাস)—

জয় জয় জয় ... ... ইত্যাদি।

টিকারী

গয়া সহর হইতে সাত ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম কোণে মোরহর নদীর উপর টিকারী অবস্থিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত টিকারী-রাজগণ বিহারের রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে কম খেলা খেলেন নাই। গয়া জেলার মধ্যে এই রাজ-বংশ দেও অপেক্ষা আধুনিক হইলেও, ইঁহাদের শৌর্য্য-বীর্য্য, বদান্যতা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও উচ্চাশয়তা সেকালের ভারতবর্ষের রাজন্য-বর্গের মধ্যে অপরিজ্ঞাত ছিল না। পারস্য বীর নাদির সাহের ভারত-বিজয়ের পর হইতে আন্তর্জাতিক বিপ্লব ও মহারাষ্ট্র অশ্বারোহী বীর সৈনিকগণের উপর্য্যুপরি আক্রমণে মোগল-সাম্রাজ্য ক্রমশঃ হীনবল হইয়া শনৈঃ ধ্বংস-মুখে নীত হইলে পর পাওয়াই ও টিকারী রাজগণের অভ্যুত্থান হয়। তাঁহাদের শিক্ষিত সাহসী সেনাগণের ক্ষিপ্র গতি রোধ করিতে কেহই সক্ষম হইত না। প্রাচীন দেও-রাজগণ যেমন দেওএর চারিক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী উমগাপুরীতে বাস করিতেন, সেইরূপ টিকারীর প্রাচীন রাজগণ টিকারী দুর্গের চারি মাইল দক্ষিণে উত্রেণ নামক স্থানে বাস করিতেন। ইঁহারা দণ্ড কর্ত্তার সম্প্রদায়ভুক্ত, গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। টিকারীর রাজবংশ এখন নাই; কিন্তু এখন এই বিশাল রাজ্য কন্যার (দৌহিত্রের) শাখায় নীত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পরে বিবৃত হইবে। ওম্যালি সাহেব তাঁহার গয়া গেজিটীয়ার পুস্তকে বলেন যে, ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইলে পর দেশে যে সর্ব্বব্যাপী অরাজকতা উপস্থিত হয়, তাহা হইতেই টিকারী-রাজবংশের অভ্যুত্থান হইয়াছে; কিন্তু এ কথা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। মোগল সাম্রাজ্যের শৌর্য্যবীর্য্য ও গুণগরিমার সমৃদ্ধির সময় হইতেই টিকারী-রাজ সুবা বিহারের মধ্যে এক জন মান্যগণ্য ও "ইজ্জৎদার" ভূস্বামীরূপে পরিগণিত হইতেন। এই বংশের মধ্যে রাজা

সুন্দর সিংহ স্ববংশের যশঃভাতি সুদূর দিল্লী-"তখ্‌ত্‌" পর্য্যন্ত যে বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সে কথা পরে বিবৃত হইবে।

গয়া জিলার মধ্যে টিকারীর মত প্রখ্যাত রাজবংশ আর নাই। দেও-রাজবংশ ইহা অপেক্ষা বহু শতাব্দীর প্রাচীন হইলেও টিকারীর মত সমৃদ্ধ, বিখ্যাত এবং ধনী রাজবংশ বিহার-প্রদেশ মধ্যে দ্বারবঙ্গ ছাড়া আর ছিল না। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উত্রেণ-বাসী একজন মধ্যবিত্ত ভূস্বামী। ইহাঁর নাম রিপুমর্দ্দন সিংহ। ইনি সম্রাট সাহজেহানের সমসাময়িক। ইহাঁর পুত্র রণজিৎসিংহ। রণজিতের পুত্র ধনবিজয় সিংহ। তিনি একজন খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধির লোক ছিলেন। তিনি বিহারের সুবাদারের নিকট হইতে সম্রাট-আদেশে চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র চৌধুরী বীরসহায় বা ধীরসহায় সিংহ। চৌধুরী ধীর সিংহের পুত্রগণ হইতে বর্ত্তমান টিকারী ও মুকসুদপুরের রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছে। চৌধুরী বীরসিংহ সম্রাট মহম্মদ সাহ এবং ফরুক্‌সাহের সমসাময়িক। বীরসিংহের তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ ছত্র সিংহ, মধ্যম ত্রিভুবন সিংহ এবং কনিষ্ঠ সুন্দর সিংহ। কনিষ্ঠ পুত্রই সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, কূটনীতিজ্ঞ, এবং নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন। রণজিৎ সিংহ সম্রাট আওরঙ্গজীব, বাহাদুর (প্রথম শাহ্ আলম্) এবং জাহন্দর সাহের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। ধনবিজয় সিংহ সম্রাট জাহান্দর সাহ, ফরুকশীয়ার এবং মহম্মদ সাহের সময়কার লোক। চৌধুরী বীর সিংহ সম্রাট মহম্মদ সাহের সময়ে জীবিত ছিলেন। সম্রাট মহম্মদ সাহের সময় হইতে মোগল সম্রাটের বিপর্য্যয় ঘটে এবং পারস্য-রাজ নাদির সাহ ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া কোহিনূর এবং ময়ূর-সিংহাসনসহ বহু ধনরত্ন স্বদেশে লইয়া যান। চৌধুরী বীর সিংহ সম্রাট মহম্মদ সাহ এবং আহম্মদ সাহের শাসন-কালে বর্ত্তমান ছিলেন। পিতা চৌধুরী বীর সিংহের মৃত্যুর পর চতুর সুন্দর সিংহ অপর ভ্রাতাগণকে ফাঁকি দিয়া সুবাদারের প্রসাদ লাভ করিয়া এবং সম্রাটের নিকট হইতে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত হইয়া গয়া জিলার অধিকাংশ প্রদেশ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ অষ্ট-বিংশতি শতাব্দীর সমধিক অংশের মধ্যে টিকারী-রাজ রাজা সুন্দর সিংহ গয়া জিলার অধিকাংশ স্থল বাহুবলে দখল করিয়া সমগ্র নয় বা দশ পরগণার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজা সুন্দর সিংহ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁকে বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যার সুবেদারী পদ পাইতে বিশেষ সাহায্য এবং ঐ সকল দেশ-লুণ্ঠনকারী মহারাষ্ট্র সৈন্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া প্রচুর হিত সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া সুবাদার আলিবর্দ্দী খাঁর বিশেষ সুপারিশে টিকারীর বীর রাজা সুন্দর সিংহ "রাজা" উপাধি, এবং সেকালের "ঝালরদার পাল্কীতে" চড়িয়া ও "নহবৎ ও নাকাড়া" সহ ভ্রমণ করিবার অধিকার সম্রাট-সদন হইতে ফারমান-সূত্রে ফশলী ১১৪৭ (১৭৪০) সালে প্রাপ্ত হন; পরে ১১৫৫ ফশলী সালে সনন্দসূত্রে সহরঘাটী পরগণাও প্রাপ্ত হন। সায়ের-

উল্‌-মুতাক্ষরীন নামক পারস্য ইতিহাস-গ্রন্থে টিকারী-রাজবংশের বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়। জমিদারবর্গের মধ্যে টিকারীরাজ সর্ব্ব-প্রধান এবং সর্ব্বাগ্রগণ্য আসন অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ পুস্তকে উল্লিখিত আছে; এবং তাঁহার সৌজন্য, সমাজে প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধে বীরত্ব এবং দানে মুক্তহস্ততা দেখিয়া সম্রাট তাঁহাকে উক্তরূপ ভ্রমণাদির অধিকার দেন। নবাব মুর্শীদ কুলীখাঁ কর্ত্তৃক তখন তিন সুবেদারীর ভদ্রলোক ও ভুস্বামীগণের বিশেষ জাকজমকের সহিত প্রকাশ্য পথ দিয়া পাল্কী-আদি যানে ভ্রমণের অধিকার রহিত ছিল। রাজা সুন্দরসিংহ সে অধিকারে বঞ্চিত হন নাই। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ সাহের পুত্র সম্রাট আহম্মদ সাহ স্বীয় মন্ত্রী মীর সাহবুদ্দীন কর্ত্তৃক সিংহাসন-চ্যুত হইলে এবং মন্ত্রী তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া নানাবিধ ক্লেশ ও যন্ত্রণা দিয়া নিহত করিলে বাদসাহ জাহান্দর সাহার পুত্র দ্বিতীয় আলমগীরকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত করা হয়; কিন্তু গৃহবিচ্ছেদের ফলে ১৭৫৯ সালে তিনিও নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে রাজা সুন্দরসিংহ পরলোক গমন করেন। ১৭৫৯ সালে সম্রাট আলমগীরের নিধনের পর সাহ আলম দিল্লীর সম্রাট হন। তিনি ভারতের তমসাচ্ছন্ন রাজনৈতিক গগনে মেঘমালা বিদূরিত করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও ফলে কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং কার্য্যগতিকে শিখ, রোহিল্লা, এবং মহারাষ্ট্র-শক্তি সকলের ক্রীড়াপুত্তলিতে পরিণত হইয়াছিলেন। মিলের ভারত-ইতিহাসে রাজা সুন্দরসিংহ একজন পরাক্রান্ত সামন্ত রাজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি বিহার প্রদেশ জয় করিয়া ইংরাজ সৌদাগর কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার নবাব মীর জাফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া দেশের অত্যাচার ও অরাজকতা দূর করিবার জন্য রাজপুত্র আলি গহরকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বহু সৈন্য সহ অগ্রসর হইবার সময় তাঁহার দেহরক্ষিদলের অধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৭৫৮ সালে তিনি নিহত হন। যুবরাজ আলিগওহার ভারত ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ সম্রাট দ্বিতীয় সাহ আলম। ভারত ইতিহাসে সম্রাট দ্বিতীয় সাহ আলমের রাজত্ব কাল খুব ঘটনা-পূর্ণ। উজীর গজী-উদ্দীনের ক্ষমতা এই বাদসাহের রাজত্বকালে এককালীন তিরোহিত হইলে ইংরাজ বণিক কোম্পানি ১২ই আগষ্ট, সন ১৭৬৫ সালে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী-ভার প্রাপ্ত হইলেন এবং অল্পকাল পরে অন্ধ সম্রাটকে মহারাষ্ট্র শক্তিসংঘের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ভাতার বন্দোবস্ত করেন, ও তদ্বিনিময়ে দিল্লীপর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া লন। রাজা ত্রিভুবন সিংহের জীবদ্দশায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বেচুসিংহ এবং তাঁহার দুই পুত্র দয়াল সিংহ এবং প্রীতম সিংহ পরলোক গমন করেন। রাজা ত্রিভুবন সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র নিহাল সিংহের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পীতাম্বর সিংহ, মধ্যম চৈন সিংহ এবং কনিষ্ঠ মৈন সিংহ। বাবু চৈন সিংহ এবং মৈন সিংহের বংশাবলী লইয়া

বর্তমান সাত-আনা টিকারী এবং মুকুন্দপুর রাজ-বংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। রাজা ফতেহ সিংহ ১৭৬২।৩ খৃষ্টাব্দে, পূর্ব্ব লিখিতরূপে নবাব মীরকাসিম কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহার পত্নী রাণীলগন কুঁয়ার বাবু পীতাম্বর সিংহকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন; কিন্তু স্বামীর কোনরূপ অনুমতি-পত্র না থাকায়, তিনি রাজটীকা ও গদি পাইলেন না।

অনেক দিনের কথা, ইহার সত্যাসত্য এতকাল পরে নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন। এই বংশে পূর্ব্বে "প্রাইমোজেনিচার" প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন তাহা না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকল প্রাচীন রাজবংশে বিহার পালামু ও রামগড় প্রদেশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু টিকারী হইতে কেন তিরোহিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

বাবু কেহর সিংহ এই সময়ে সম্রাটের সনন্দের বলে রাজা সুন্দর সিংহের গদির উপর দাবী বসান। রাজা সুন্দর সিংহ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু কেহর সিংহের নামে সম্রাট দরবার এবং মুর্শিদাবাদের দরবার হইতে সোনোৎ পরগণার (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে) এবং (১৭৪৮ সালে) সহরঘাটী পরগণা এবং চারকাঁওয়া পরগণার অর্দ্ধেক সনন্দ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া ফারমান লন, এই সনন্দ এবং ফার্ম্মাণের বলে বাবু কেহর সিংহ রাজা সুন্দর সিংহের গদী দাবী করিলেন। বাবু এবং মহারাজের পক্ষীয় সৈন্যদলে পরইয়ার বিখ্যাত রণক্ষেত্রে ১৭৫২।৩ খৃষ্টাব্দে ঘোর সংগ্রাম হয়; এই সমরক্ষেত্রে রাজা সুন্দর সিংহ অসমসাহসিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাবু কেহর সিংহ এই রণক্ষেত্রে সম্মুখ-সংগ্রামে নিহত হন। ১৭৫৯ সালে রাজা সুন্দর সিংহের পরলোক-গমনের পর, বিহার প্রদেশের নায়েব-সুবাদার রাজা রামনারায়ণ সিংহ মুর্শিদাবাদের নায়েব নাজীম নবাব জাফর আলি খাঁর পক্ষ হইতে তাঁহার স্বাক্ষরিত সনন্দ-মতে টিকারী-রাজের সনন্দ রাজা সুন্দর সিংহের দত্তক পুত্র রাজা বুনিয়াদ সিংহকে অর্পণ করেন। মুকুন্দপুরের পক্ষীয় লোকগণ বলেন যে রাজা ত্রিভুবন সিংহের (সন ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু ফতেহ সিংহ গদি প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি খুব শিশু ও অপরিণত-বয়স্ক ছিলেন বলিয়া তদীয় খুল্লতাত বাবু সুন্দর সিংহ যাবতীয় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন, তিনি মোগল বাদসাহের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ৭ রজবুল্ মোরাজব জলুস্ পঞ্চমে মোগল সম্রাট রাজা ফতেহ সিংহকে সনন্দ দিয়া "মহারাজ" উপাধিতে ভূষিত করিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যার নবাব মীর কাশিমের বিরাগ-ভাজন হইয়া নৃশংসরূপে গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া নিহত হন, তাহা পরে বিবৃত করিতেছি।

নবাব মীর কাসিম রাজা ফতেহ সিংহের একমাত্র পুত্র কুমার ত্রিলোক সিংহ, ফতেহ সিংহ, বুনিয়াদ সিংহ প্রভৃতি টিকারীর রাজকুলের পুরুষগণকে নিহত করিয়া, সমস্ত রাজা ছত্রসিংহের পৌত্র এবং কেহর সিংহের পুত্র বাবু দুন্দ বাহাদুর সিংহকে রাজ-খিলাতে

ভূষিত করিয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু এই বন্দোবস্ত বেশী দিন রহিল না। মীর কাসিমের পতনের পর টিকারী-রাজ পুনরায় মহারাজা মিত্রজীৎ সিংহের নামে বন্দোবস্ত হইল।

১২৬২ হিজরী সালে বাবু কেহর সিংহ রাজা সুন্দর সিংহের বিরুদ্ধে টিকারী-রাজ-গদি পাইবার জন্য এক মকদ্দমা মুর্শিদাবাদে বঙ্গের সুবাদার আলিবর্দ্দী খাঁ নবাবের নিকট রুজু করেন, কিন্তু নবাব বাহাদুর প্রকৃত বিচার করিয়া বাদীর মকর্দ্দমা অগ্রাহ্য করেন, এবং কথিত আছে, রাজা সুন্দর সিংহ টিকারী রাজগদীতে সম্পূর্ণ সত্ত্ব ত্যাগ করেন, কিন্তু ইহার কোন লিখিত প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। রাজা ফতেহ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী রাণী লগন কুঁয়ার বাবু নিহাল সিংহের পুত্র বাবু পীতাম্বর সিংহকে স্বীয় কর্ত্তা-পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, এইরূপ কর্ত্তা-পুত্র গ্রহণ করার প্রথা গয়ার গয়ালা সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহুল প্রচলিত আছে। রাণী লগন কুঁয়ার রাজা ফতেহ সিংহের মৃত্যুতে অত্যন্ত অভিভূতা হইয়া পড়েন বলিয়া বেশী দিন রাজ-কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিতে অসমর্থা হন এবং যাবতীয় গৃহস্থালী ও রাজকীয় কার্য্যাদি স্বীয় পুত্র পীতাম্বর সিংহ বাবুর হস্তে অর্পণ করিয়া বৃন্দাবন তীর্থে টিকারীর ছত্রে বাস করিয়া ভগবৎ-আরাধনায় শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। মীর জাফর আলি খাঁ বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যার সুবাদার ও নবাব নাজীমরূপে মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন। এই সময়ে রাণী লগন কুঁয়ার তাঁহার দত্তক পুত্র বাবু পীতাম্বর সিংহকে টিকারীর ভাবী রাজারূপে স্বীকার করাইবার জন্য এক আবেদন-পত্র নবাব-দরবারে পেশ করিলেন, কিন্তু রাজা বুনিয়াদ সিংহের বিধবা রাণী কমলবতী কুঁয়ার স্বীয় নাবালক পুত্র মিত্রজীৎ সিংহের পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপন করেন যে তাঁহার নাবালক পুত্র রাজবংশের জ্যেষ্ঠ শাখা হইতে জাত এবং বাবু পীতাম্বর সিংহ রাজা ফতেহ সিংহের অনুমতি পত্র ব্যতিরেকে দত্তক গৃহীত হন বলিয়া তিনি "রাজা" হইতে পারেন না। অবশেষে রাণী লগন কুঁয়ার নিজ দাবীর অসারতা বুঝিয়া রাণী কমলাবতী কুঁয়ারের সহিত এই মকদ্দমা আপোষে এই সর্ত্তে নিষ্পত্তি করিলেন যে বাবু পীতাম্বর সিংহ এবং তাঁহার ভ্রাতা বাবু চৈন সিংহ খোরপোষের জন্য টিকারি-রাজ হইতে একুশ খানি মৌজা পাইবেন এবং বাবু পীতাম্বর সিংহ এবং রাণী লগন কুঁয়ার ও তাঁহার পক্ষীয় লোকগণ টিকারী-রাজের উপর দাবী ত্যাগ করিবেন। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম নবাব মীর জাফর আলি খাঁ বাহাদুর এই মকদ্দমা সম্যকরূপে অনুসন্ধান করিয়া উপরোক্তরূপ আপোষ-নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। বাবু পীতাম্বর সিংহকে "রাজা" এবং মিত্রজীৎ সিংহকে ১৫ই জীলহীজ জলুষ-এর সনন্দ-মতে "মহারাজা" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ঐ বৎসরের ১৫ই মহরম তারিখে পরোয়ানা প্রদত্ত হইল, এই গৃহ বিবাদ এইরূপে শেষ হইলে, পুনরায় রাজা ৺ফতেহ সিংহের দৌহিত্র বাবু রঘুনন্দন সিংহ টিকারী-রাজের উপর দাবী করিয়া অপর একটি মকদ্দমা

নবাব-দরবারে রজু করিলেন; কিন্তু এই মকর্দ্দমাও যথাসময়ে নামঞ্জুর হয় এবং নবাব বাহাদুর নিজ-বিচারে প্রকাশ করিলেন যে এই প্রাচীন রাজবংশের সম্পত্তি কদাচ ভাগ হইবে না এবং প্রাচীন প্রথানুযায়ী ইহার গদীতে "প্রাইমোজেনিচার" আইন-মতে উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ন্ত্রিত হইবে। ইহার অল্পদিন পরেই ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাদসাহ সাহ আলমের নিকট হইতে (১৭৬৫ সালে) বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী-ভার প্রাপ্ত হইলে সোদাগর কোম্পানিও রাজা মিত্রজীৎ সিংহকে ইংরাজ-রাজের সামন্ত-বন্ধু-রাজ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে "মহারাজ বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

১৯০১ সালে পাটনা জেলায় তৃতীয় সদর-আলার আদালতে বাবু ছোটু নারায়ণ সিংহ সমগ্র টিকারী-রাজ-উদ্ধারের ও পাইবার জন্য যে ২৭ নং দেওয়ানী মকর্দ্দমা রুজু করেন, তাহার আর্জ্জির বিবরণাদি পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, রাজা সুন্দর সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছত্র সিংহ ভীরু প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং সর্ব্বদা ধর্ম্ম-কর্ম্মে ও পূজা-পাঠে রত থাকিতেন বলিয়া তিনি রাজ-গদী স্পৃহা করেন নাই। ছত্র সিংহের তিন পুত্র কেহর সিংহ, রূপসিংহ এবং নয়ন সিংহের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বংশ লোপ পাইয়াছে; মধ্যম রূপ সিংহের দলীপ, দলীল, দরিয়াও, দুঃখহরণ, উমরাও, কল্যাণ, জিতন এবং যদু এই আট পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের বংশধর শিবপ্রসাদ সিংহ মাত্র জীবিত আছেন।

চৌধুরী বীর সিংহের মধ্যম পুত্র ত্রিভুবন সিংহ এবং কনিষ্ঠ পুত্র সুন্দর সিংহের বংশ লইয়া টিকারী এবং মুকসুদপুরের রাজ-বংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ত্রিভুবন সিংহের চারি পুত্র বেচু সিংহ, ফতেহ সিংহ, বুনিয়াদ সিংহ এবং নিহাল সিংহ। বেচু সিংহ—১১৪৭ ফশলী সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ দয়াল সিংহ এবং কনিষ্ঠ প্রীতম সিংহ; দয়াল সিংহ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। প্রীতম সিংহ এক পুত্র রামনারায়ণ সিংহকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন; রামনারায়ণ সিংহ অপুত্রক অবস্থায় মৃত হন। বাবু ত্রিভুবন সিংহ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রাজা সুন্দর সিংহ ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রক্ষীর দ্বারা নিহত হইলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা বুনিয়াদ সিংহের দ্বারা রাজ গদীতে অধিরূঢ় হন; ইনি বাবু ত্রিভুবন সিংহের তৃতীয় পুত্র এবং বাবু নিহাল সিংহের তৃতীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রাজগদীতে উপবিষ্ট হইয়া তিনি সম্রাট শাহ আলমের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া ইংরাজ কোম্পানির সাহচর্য্য ও পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এই বন্ধুত্ব তিনি কর্ণেল ক্লাইভের সময় হইতে কাপ্তান নক্সের সময় পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। সম্রাট সাহ আলমের পক্ষে গয়া জিলার অন্যতম ক্ষমতা-শালী ভূম্যধিকারী নবাব কামগার খাঁ ছিলেন বলিয়া সাধারণ প্রজাবর্গের উপর অত্যন্ত অত্যাচার ও অবিচার হইতেছিল; এই সময়ে শান্ত-প্রকৃতি ধর্ম্ম-প্রাণ রাজা বুনিয়াদ সিংহ কোম্পানি বাহাদুরের সৌহার্দ্য ও পক্ষ

অবলম্বন করায় তাঁহার বিশাল জমিদারী এই দস্যুদলের নেতা নবাবের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পায় নাই। অর্থ-লোলুপ নবাব সাহেব রাজা বাহাদুরের প্রজাবর্গকে লুণ্ঠনে ব্যতিব্যস্ত করিয়া খোদ রাজাকে টিকারা দুর্গে অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলে তিনি বহু চেষ্টায় ঐ দুর্গে কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি আর টিকারীর অবরোধ বারিত করিতে না পারিয়া তাঁহার খুল্লতাত রাজা সুন্দর সিংহের চির-শত্রু নবাব কামগার খাঁর হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন, শেষে সম্রাটের তাম্বুতে তাঁহাকে কিছু-কাল বন্দীভাবে রাখা হইল। সম্রাট তাঁহাকে শেষে কারামুক্ত করিলে তিনি পুনরায় ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুরকে বশ্যতা স্বীকার করিয়া পত্র লিখিলে সে পত্র ইংরাজ-শত্রু মীরকাসিম আলির হাতে আসিয়া পড়ে। নবাব মীরকাসিম আলি রাজা বুনিয়াদ সিংহ এবং তাঁহার ভ্রাতা রাজা ফতেহ সিংহ ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে পাটনায় আমন্ত্রণ করিয়া ১৭৬২।৩ খ্রীষ্টাব্দে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। ইংরাজ ঐতিহাসিক সার উইলিয়ম হাণ্টার তাঁহার "Statistical Account of Bengal" এর দ্বাদশ ভাগে টিকারী-প্রসঙ্গে ইহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। টিকারী-রাজের শৌর্য্য এবং বীরোচিত কাহিনীর ইতিবৃত্ত পারস্য ঐতিহাসিক সায়ারউল্—মোতাক্ষরীনের লেখক জ্বলন্ত অক্ষরে কীর্ত্তিত করিয়াছেন। রাজা বুনিয়াদ সিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তদীয় রাণী ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে এক পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রই গয়াজেলার আদর্শ রাজা এবং প্রজাপালক মহারাজ মিত্রজীৎ সিংহ বাহাদুর।

রাজা ত্রিভুবন সিংহের মধ্যম পুত্র রাজা ফতেহ সিংহ রাজা বুনিয়াদ সিংহের শৈশব এবং নাবালক অবস্থায় তাঁহার পক্ষ হইতে যাবতীয় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। রাজা বুনিয়াদ সিংহ রাজা সুন্দর সিংহের পোষ্যপুত্র ছিলেন। গয়া জেলার মধ্যে রাজা সুন্দর সিংহের দত্ত বাস্ত জাইগীর বহ্মোত্তর ও লাখেরাজ ভূমি আছে, তাহার সনন্দ-পত্র অদ্যাবধি সময়ে-সময়ে আইন আদালতে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা মিত্রজীৎ সিংহ ১৭৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া রক্তলোলুপ নৃশংস নবাব মীরকাসিম তাঁহার প্রাণনাশের জন্য গুপ্তচর পাঠান, কিন্তু টিকারীর রাণী কমলাবতী কুঁয়ার খুব চতুরা রমণী ছিলেন, এই সংবাদে পূর্ব্বেই পাইয়া শিশু সন্তানটিকে ঘুঁটের ঝোড়ায় লুকাইয়া বিশ্বস্ত বাবু দলীল সিংহের নিকট পাঠান। মন্ত্রী-প্রবর তাঁহাকে নিজের ঘরে খুব গোপনে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে নবাব মীরকাসিম মুঙ্গের দুর্গ হইতে সৈন্য লইয়া ইংরাজ সৌদাগর কোম্পানিকে দমন করিবার জন্য সম্রাটের সৈন্য-দলের সহিত মিলন-জন্য বক্সারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; এদিকে বাবু দলীল সিংহ একদল পটু শিক্ষিত সৈন্যসহ দেও-রাজ ও পাওয়াই রাজের সৈন্যদলকে একত্রিত করিয়া সের সাহের নির্ম্মিত সুলেমানি পথ (Grand Trunk Road) দিয়া সাসেরামের মধ্য দিয়া

কাশী অতিক্রম করিয়া ইংরাজ সেনা-নায়কদের সহিত মিলিত হইয়া নবাব কাসিমের অশিক্ষিত পদাতিক ও অশ্বারোহীদলকে সম্রাটের সৈন্য দলের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই বক্সারের সন্নিকটে অবরোধ করিয়া যুদ্ধ প্রদান করিলেন; নবাব-সৈন্য রণে পরাজিত হইয়া পূর্ব্বমুখে পলায়ন করিলে, টিকারীর সাহসী সৈন্যাধ্যক্ষ বাবু দলীল সিংহ এক দিকে এবং অপর দিকে দও-রাজ রাজা ঘনশ্যাম সিংহ তাঁহাদের গতি রোধ করিয়া ১৭৬৪ ও ১৭৬৫ সালে ঘেরীয়া এবং উদয়নালার যুদ্ধে উপর্য্যুপরি বিধ্বস্ত করিয়া নবাবের স্বাধীন রাজ্য-স্থাপন এবং ইংরাজ-দলনের বাসনার মূলে চিরকালের জন্য কুঠারাঘাত করিলেন। বিজয়ী টিকারীর জঙ্গী-নেতা বাবু দলীল সিংহ টিকারী-দুর্গে প্রত্যাগমন করিয়া বালক রাজপুত্র মিত্রজীৎ সিংহকে ইংরাজ নায়ক টমাস্ ল সাহেব এবং সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর ক্রফোর্ডের চরণ-তলে বসাইয়া দিলে, সহৃদয় সেনাপতি মহাশয় তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া টিকারীর রাজগদীতে বসাইয়া ইংরাজ-রাজের সামন্ত বন্ধু বলিয়া টুপি খুলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন; এবং ডঙ্কা টীকা চামর ও পতাকাসহ নগরে পরিভ্রমণ করিবার, মোগল বাদশাহদের আমল হইতে টিকারী রাজগণের যে বংশগত মর্য্যাদা ছিল, তাহা স্বীকার করিয়া এবং সনন্দ দিয়া সম্মানিত করিলেন। এই সময়ে টিকারীর ভিতরকার বিবরণ কিছু বিশদভাবে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে রাজা পীতাম্বর সিংহ তাঁহার মাতা মৃতা রাণী লগন কুঁয়ারের আপোষের পর পুনরায় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে টিকারীর রাজ-গদি পাইবার জন্য মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারে একটি মকর্দ্দমা রুজু করিলেন; এই দাবীতে পূর্ব্বলিখিত একুশ খানা মৌজা ব্যতীত বক্রী সমস্ত রাজসম্পত্তির উপর দাবী করা হইলেও তাহা পুনরায় বিচক্ষণ নবাব দরবার হইতে বিশেষ তদন্তের পর নামঞ্জুর করা হইল। এই মকর্দ্দমায় রাজা পীতাম্বর সিংহ অকৃতকার্য্য হইয়া বিশেষ মনোদুঃখ পান এবং কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। পরে তাঁহার মধ্যম পুত্র রাজা তোড়লনারায়ণ সিংহ কোম্পানি বাহাদুরের নিকট হইতে রাজ-উপাধিতে ভূষিত হইয়া যাবতীয় টিকারী রাজসম্পত্তি বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লইলেন। রাজা মিত্রজীৎ সিংহের বিধবা অসহায়া মাতা রাণী কমলাবতী কুঁয়ার জ্ঞাতির দ্বারায় এইরূপ নিপীড়িত হইয়া নিজ নাবালক পুত্রের স্বামীত্ব এবং রাজ্য-রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া ইংরাজ সেনা-নায়কের কৃপা-প্রার্থিনী হইলেন। এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিশের শাসন-কালে ১৭৯২।৩ সালে বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যায় দশশালা বন্দোবস্তের কায়েমী ব্যবস্থা হইতেছিল এবং সেইজন্য কলিকাতা হইতে মিঃ টমাস ল সাহেব পাটনার ইংরাজ এজেন্টের নিকট হইতে বোর্ডের আদেশমত উপদেশ লইতে গয়া জেলায় আসিয়াছিলেন। চতুরা রাণী কমলাবতী ঐ সময়ে তাঁহার পদপ্রান্তে স্বীয় নাবালক ও অসহায় রাজ্যভ্রষ্ট পুত্র মিত্রজীৎ সিংহ বাহাদুরকে স্থাপন করিলে, ইংরাজ সেনানায়ক মিঃ টমাস ল প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য তাঁহার অন্যতম বিশ্বস্ত মুন্সী রায় পৃথি সিংহকে নিযুক্ত করিলেন। মিঃ টমাস ল সাহেবের

অন্যতম মুন্সী গয়া নগরের চৌকি মহল্লার পার্শ্বস্থ সিঁড়িয়া ঘাটের রায় যশোবন্ত সিংহের পিতামহ রায় চিন্মৎ রায়—অন্যতম মুন্সী ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ কর্ম্মচারী বাহাদুর মিঃ টমাস ল রায় পৃথি সিংহকে বেশী ভাল বাসিতেন বলিয়া এই কার্য্যের নিরপেক্ষ তদন্তের ভার তাহারই উপর ন্যস্ত করেন। রায় সাহেব স্বল্পকাল মধ্যে রাণীমাতা, মন্ত্রী-প্রবর দলীল সিংহ প্রভৃতির নিকট হইতে জানিয়া প্রকৃত বিবরণ জ্ঞাত করাইলে, সাহেব নাবালক রাজপুত্রকে টিকারীর প্রকৃত রাজা বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং যাবতীয় টিকারী রাজসম্পত্তি তাহারই নামে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মঞ্জুরীর জন্য রাজপুত্র, রাজমাতা ও রাজমন্ত্রীকে পত্রসহ স্বীয় মন্ত্রী রায় পৃথি সিংহকে সঙ্গে দিয়া কলিকাতায়—বড়লাট-সদনে প্রেরণ করিলেন। গয়ার এই অভিযান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যথাকালে বড়লাট লর্ড কর্ণোয়ালিস বাহাদুরের সদনে পৌঁছিলে লাট বাহাদুর ল সাহেবের পত্র-মত সমগ্র টিকারী রাজ্যের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রাজা মিত্রজীৎ সিংহের নামে মঞ্জুর করিয়া দিলেন এবং অধিকন্তু রাজ-পুত্রের নাবালক অবস্থায় সমগ্র রাজ্যের তত্ত্বাবধারণ জন্য বোর্ডের বড় সাহেবকে যথোচিত আদেশ প্রদান করিলেন। এই আদেশমত রাজকুমারের নাবালক অবস্থায়—সমগ্র টিকারী ষ্টেট্ কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধারণে থাকে।

রাজা তোড়লনারায়ণ সিংহ মুকুন্দপুর রাজ্যের স্থাপয়িতা। ইনি তাঁহার দুই রাণী কুঁদিনী কুঁয়ার এবং রাণী নয়ন কুঁয়ার ও একমাত্র কন্যারত্ন রাজকুমারী ঝাল্লা কুঁয়ারকে রাখিয়া ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। রাজকুমারী ঝাল্লা কুঁয়ারের গয়া জেলার অন্তর্গত চৈনপুর গ্রামের বাবুদিগের গৃহে মহাসমারোহে বিবাহ হয়। রাজকুমারীর গর্ভে দুইটি মাত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এই সন্তানদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাবু রামেশ্বরপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ মাতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া গয়া জেলার অন্তর্গত মুকুন্দপুর গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। ইনি মুকুন্দপুরের রাজগদীতে সেদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। রাজা রামেশ্বর প্রসাদ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর খুব স্বধর্ম্মরত ও উচ্চ অন্তঃকরণের লোক ছিলেন। শেষ-জীবনে রাজা সাহেব কিছু অধিক প্রজাপীড়ক এবং অত্যাচারী [illegible] হইয়া পড়েন। তিনি [illegible] ১৯০২ সালে স্বীয় প্রিয়তমা রাণী সুন্দর কুঁয়ারের গর্ভজাত দুইটি মাত্র কন্যা সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন, জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী গোদাবরী কুঁয়ারের এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত আয়নাপুরের বাবু ভগবতীচরণ সিংহের সহিত বিবাহ হয়, এবং কনিষ্ঠা রাজকুমারী মুরতমতী কুঁয়ারের বিবাহ হয় মোজাফ্‌ফরপুর জেলার অন্তর্গত সাঁড়া গ্রাম নিবাসী বাবু হরিকৃষ্ণপ্রসাদ সাহীর সহিত। রাণী সুন্দর কুঁয়ার ২৭।৩।১২ সালে পরলোক গমন করিলে রাজকুমারীদ্বয় রাণীর স্বীয় যৌতুকের বাৎসরিক ৮০ সহস্র টাকা আয়ের জমীদারী সম্পত্তি তুল্যাংশে বংশের প্রাচীন রীতি এবং হিন্দু আইনানুসারে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হন।

মৃত্যুকালে রাজা রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর বহু লক্ষ টাকা দেনা রাখিয়া যান। রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ নারায়ণ সিংহ, যিনি এতদিবস কাল ছাপরা জেলায় স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ-দখল করিতেছিলেন, মুকুন্দপুর রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু রাজ্যের বহু দেনা থাকায়, ঐ ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন তত্ত্বাবধারণ ও সুচারুরূপ পর্য্যবেক্ষণের জন্য রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কোর্ট অব ওয়ার্ডের রাজকার্য্য-পরিচালন বড় আশাপ্রদ হইতেছে না। রাজা চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ সিংহ অপুত্রক। তিনি তামাওয়া-রাজ রাজা হরিহরপ্রসাদ নারায়ণ সিংহের ভগ্নীপতি। টিকারী ও মুকুন্দপুরের রাজগণ দত্তকর্ত্তার ও একসারিয়া পরিবার ভুক্ত ব্রাহ্মণ। মুকুন্দপুরের রাজবংশের অবস্থা বড় শোচনীয় এবং ক্রমেই ধ্বংস-মুখে নীত হইতেছে। এই রাজগণ একসারিয়া পরিবার-ভুক্ত ব্রাহ্মণ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; টিকারী, মুকুন্দপুর এবং জমুয়াঁওয়ার রাজবংশ অতি প্রাচীন কাল হইতে দত্তকর্ত্তার বংশীয় ব্রাহ্মণের আবাস স্থান ও কিল্লা ছিল,—এখন কালের কঠোর শাসনে এই রাজবংশ অপর ব্রাহ্মণদের অধিকার ভুক্ত হইয়াছে।

রাজা মিত্রজীৎ সিংহ ১৮১২ অথবা ৮১৩ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমগ্র টিকারী-রাজ্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া রায় পৃথি সিংহ বাহাদুরকে স্বীয় মন্ত্রী পদে বরণ করিলেন। এই সময়ে টিকারী রাজ্যের ভাগ্যে আর একটি বিপদের সূচনা হয়। পাটনায় ল্যাণ্ড সাহেবের অধীনে রাজা শিতাব রায় দেওয়ান হইয়া এজেণ্ট সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন। ইনি পাটনা নগরের দিওয়ান-মহল্লায় বাস করিতেন। রাজা শিতাব রায়ের প্ররোচনায় এজেণ্ট বাহাদুরের আদেশক্রমে রাজা মিত্রজীৎ সিংহের যাবতীয় রাজসম্পত্তি রাজস্বের দায়ে কোম্পানি বাহাদুর কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, কিন্তু পুনশ্চ হয় কালকাতায় বড় লাট বাহাদুরের হুকুম-অনুসারে অব্যাহত করিয়া রাজা বাহাদুরকে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই হইতে রাজা বাহাদুর ইংরাজ-রাজের পরম বন্ধু হন এবং জিলা পড়গড়িহার কোলহন্ বিদ্রোহ দমনে ইংরাজ-রাজকে স্বীয় সাহসী এবং শিক্ষিত সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজ সরকার হইতে বন্ধুতার পুরস্কার-স্বরূপ "মহারাজা বাহাদুরের" খেতাবে সম্মানিত হন। এই সময় বিহার প্রদেশের দ্বারবঙ্গ, ডুমরাঁও, বেতিয়া, হাথুয়া, কাশী প্রভৃতি অপরাপর রাজাগণকে মুসলমান শাসন-কালের অনুষ্ঠিত প্রথানুযায়ী "রাজা" উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু টিকারীর মর্য্যাদা সকলের অপেক্ষা বেশী ছিল ও বিদ্রোহ-দমনে, বক্সারের যুদ্ধে সাহায্য-দান প্রভৃতি মিত্রোচিত কার্য্য স্মরণ করিয়া ইংরাজ-রাজ রাজা মিত্রজীৎ সিংহকে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়া বিশেষ উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন।

রাজা মিত্রজীৎ সিংহের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র হিতনারায়ণ সিংহ এবং কনিষ্ঠ রাজপুত্র মোদনারায়ণ সিংহ। বৃদ্ধ কনিষ্ঠ পুত্রেরই সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন; জ্যেষ্ঠ

রাজপুত্র কিছু শান্ত, নির্ব্বিবাদী "সাধু সন্ত ও ফকিরগণের" সেবাব্রতে রত ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন; কাজেই গৃহ ও রাজকর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন বলিয়া পিতার তত প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। বৃদ্ধ মহারাজ ১৮২৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে একটি দানপত্র (বক্‌শীসনামা) সূত্রে টিকারী-রাজের যাবতীয় ষ্টেট কনিষ্ঠ রাজপুত্র মোদনারায়ণ সিংহকে অর্পণ করিলে জেলা বিহারের আজিমাবাদের (পাটনার) দেওয়ানী আদালতে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রও বৃদ্ধ মহারাজের বিরুদ্ধে উক্ত অর্পণ-নামা রদের জন্য এক মকর্দ্দমা রুজু করিলেন, ঐ মকর্দ্দমা ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮২২ সালে উক্ত আদালত হইতে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের সাপক্ষে এই মর্ম্মে বিচার হইল যে টিকারী-রাজ্য অবিভাজ্য বিধায় বৃদ্ধ মহারাজ তাহা কাহাকেও দানসূত্রে অর্পণ করিতে পারেন না। এই রায়ের বিরুদ্ধে কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল রুজু হয়, কিন্তু ইত্যবসরে পিতা এবং পুত্রদ্বয় নয় আনা ও সাত আনা অংশে রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলে উপরোক্ত আপীল মকর্দ্দমা কলিকাতা হইতে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যাওয়ার কারণ খারিজ হইয়া যায়। এইরূপ মীমাংসা সত্বেও অবিভাজ্য রাজ বিষয়ে বৃদ্ধ মহারাজ মিত্রজীৎ সিংহ বাহাদুর নিজ জীবদ্দশায় উপরোক্তরূপ রাজ্য ভাগ করিতে দিলেন না, কিন্তু পরে ১৮৪০ সালের ৩০ অক্টোবরে তাঁহার মৃত্যুর পর উভয় রাজকুমার উপরোক্ত নয় এবং সাত আনায় সমগ্র টিকারী-রাজ্য কুলরীতি ও বহুকালস্থায়ী নিয়মের বিরুদ্ধে ভাগ করিয়া লইলেন। ১৮৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট দুঃখ-প্রকাশ সূচক এক খানি খিলাৎযুক্ত পত্রসহ সাতখানি নববস্ত্র, এক ছড়া মোতির মালা, একটি শিরপেচ সহ পক্ষযুক্ত তাজ জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে পাঠাইয়া সম্মানিত করিলেন এবং ১০ই নবেম্বর সন ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট মাননীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর এক সনন্দ-সূত্রে রাজপুত্রকে "মহারাজা বাহাদুর" পদবীতে ভূষিত করিয়া ইংরাজ-রাজের গুণগ্রাহিতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

বুল্‌বুলি

ওগো আমার বুল্‌বুলি,

আজ কেন তুই এমন কোরে তুল্‌লি এ প্রাণ চুল্‌বুলি!

ডাগর চোখের রগড় দেখে, বন্যা বুকে উঠ্‌লো ডেকে,

সুখের ব্যথায় কাঁপ্‌ছে শরীর, চেয়ে আছি চোখ্ তুলি'—

বুল্‌বুলি লো বুল্‌বুলি!

ওগো আমার বুল্‌বুলি,

আঁখি খুলে আচম্‌কা তুই চাইলি কেন লাজ ভুলি'।

আঁচল থেকে মুচকি হেসে, করলি আকুল ভালোবেসে,

টোল-খাওয়া গাল দেখে আমার সুরের বাঁধন যায় খুলি' —

বুলবুলি লো বুলবুলি !

ওগো আমার বুলবুলি,

কোথায় পেলি নিটোল বাহু, চাঁপার কলির অঙ্গুলি।

মোতির নোলক দুলছে নাকে, ধন্য মানে জীবনটাকে,

রাঙা ঠোঁটের মধু পিয়ে দিনযামিনী রয় ভুলি —

বুল্‌বুলি লো বুল্‌বুলি।

ওগো আমার বুল্‌বুলি,

গভীর দীঘির জল যেন তোর নিবিড় কালো চুলগুলি।

ইচ্ছে করে ঝাঁপিয়ে পোড়ে, সাঁতার কাটি জীবন-ভোরে,

সরস কবি শুক্‌নো প্রাণের নালা-ডোবা সব ভুলি

বুলবুলি লো বুলবুলি।

ওগো আমার বুল্‌বুলি,

বিধি তোদের গড়্‌লো অনেক খরচ কোরে রং তুলি।

তোরা আছিস তাই জগতে, রইছি বেঁচে কোনো মতে,

স্বর্গটাকে যাচ্ছে দেখা দিয়ে রূপের ঘুলঘুলি—

বুল্‌বুলি লো বুল্‌বুলি।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

হরিশ্চন্দ্র ও দীনবন্ধু

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জুন তারিখে হিন্দু পেটিয়টের স্বদেশব্রত সম্পাদক চিরস্মরণীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়' ইহলোক হইতে অপসৃত হন। তাঁহার পরলোক-গমনে সমগ্র ভারতবর্ষ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন-স্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়াছিল। সকল সৎকার্য্যের অগ্রণী স্বজাতি-বৎসল মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্বা-নুযায়ী সুকীয়াবাগান ষ্ট্রীটে অবস্থিত দুই বিঘা জমি ও পঞ্চ শত মুদ্রা হরিশ্চন্দ্র স্মৃতি-সমিতির হস্তে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং 'হরিশ্চন্দ্র সমাজ' নামে একটি স্মৃতি মন্দির স্থাপনের প্রস্তাব করেন। Federation Hall যে উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইবার কথা হয়, এই স্মৃতি-মন্দিরও সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে এইরূপ সঙ্কল্প হয়। এই মন্দিরের সম্মুখে লর্ড ক্যানিংয়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি এবং নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজানিকরের চিরবন্ধু সার জন গ্রাণ্ট মহোদয়ের তৈলচিত্রও প্রতিষ্ঠিত হইবে, এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল। কলিকাতার রামগোপাল ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মনীষিগণ দেশবাসী-দিগকে এই সৎকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ে হরিশ্চন্দ্রের চরিত-কার ফ্রেমজী বোমানজী এই কার্য্যের নায়ক হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সকল প্রধান স্থানেই প্রধান ব্যক্তিগণ সভাসমিতি করিয়া হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহোদয় এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরে তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান উকীল তারিণীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়, নীলদর্পণ-প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র, ধর্ম্মপ্রাণ রামতনু লাহিড়ী, সুবিদ্বান উমেশচন্দ্র দত্ত এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া একটি সভা আহ্বান করিয়া কৃষ্ণনগরবাসিগণকে এই সৎকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই সভার দীনবন্ধু একটি সুললিত করুণরসপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ১২৬৯ অব্দের ২৭শে শ্রাবণ তারিখের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত জনৈক কৃষ্ণনগর-বাসীর পত্রে এই সভার কার্য্য-বিবরণ বর্ণিত আছে। আমরা সেই পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। দুঃখের বিষয়, দীনবন্ধুর বক্তৃতা অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় সোমপ্রকাশ-সম্পাদক পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিয়দংশমাত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বক্তৃতার কিয়দংশও যে প্রায় ষাট বৎসর পরে উদ্ধার করিয়া আমরা বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই যথেষ্ট আনন্দের বিষয়। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, দীনবন্ধুর বক্তৃতার ভাষা কিরূপ সরল অথচ মর্ম্মস্পর্শী।

হরিশ্চন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রায় সার্দ্ধ দশ সহস্র মুদ্রা কিরূপে ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা মৎপ্রণীত "মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" নামক চরিতগ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের সে কলঙ্কের ইতিহাস পুনরুদ্ধারযোগ্য নহে। যাঁহার

সম্বন্ধে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখিয়াছেন—"তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার যত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সতীদাহ-নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবা-বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে পারেন নাই"—তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্নের অভাব আজিও দেশবাসীর কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে।

(সোমপ্রকাশ ২৭শে শ্রাবণ ১২৬৯)

আমরা কৃষ্ণনগর হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছি। বক্তৃতাটি অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া তাহার কিয়দংশ এবং কয়েকজন স্বাক্ষরকারীর নামমাত্র প্রকটিত হইল।

"পরম সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

নিম্নলিখিত প্রেরিত বিবরণটী, আপনার সমুজ্জ্বল পত্রৈকদেশে স্থান প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ লাভ করে, এই আমার একান্ত বাসনা।

সম্প্রতি একদিন শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়া, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র এই কয় মহাশয় সমবেত হইয়া মৃত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কলিকাতা নগরীতে প্রারব্ধ অট্টালিকার সাহায্য-করণের মন্ত্রণা করেন। দীনবন্ধু বাবুই প্রধান সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়া অকপট যত্ন-সহকারে তত্রত্য মহারাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। ২৬এ জুলাই শনিবার বেলা ৪টার সময় পাবলিক লাইব্রেরীতে এই সভা সংস্থাপিত হয়। কৃষ্ণনগরস্থ বহুতর ভদ্রব্যক্তি সমাগত হইয়া এই সভা-মণ্ডপ মণ্ডিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হন। অনন্তর দীনবন্ধু বাবু যে বক্তৃতা দ্বারা সমাগত সভ্যগণকে আর্দ্র করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

"হরিশবাবু যেরূপ দেশহিতৈষী ছিলেন, হরিশবাবু যেরূপ পরোপকারী ছিলেন, হরিশবাবু যেরূপ সুলেখক ছিলেন, হরিশবাবু স্বদেশের উন্নতির জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, হরিশবাবু রাজপুরুষদিগের যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপন করা না করা সমান, কারণ তিনি চিরস্মরণীয়, তিনি প্রাতঃস্মরণীয়, তিনি ভুলিবার যোগ্য নন, তাঁহাকে ভুলেও ভোলা যায় না। হরিশবাবুর স্মরণার্থ কোন অট্টালিকা প্রস্তুত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের অন্তঃকরণ-অট্টালিকায় সতত বিরাজ করিতেছেন, হরিশবাবুর স্মরণার্থ কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের হৃদয়-মন্দিরের আরাধ্য দেবতা হইয়া আছেন, হরিশবাবুর প্রতিমূর্ত্তি কোন রাজপথে স্থাপিত হউক না হউক, তিনি আমাদের স্মরণপথে দেদীপ্যমান দণ্ডায়মান আছেন। কিন্তু ভাবিকালে তাঁহার নাম বিলুপ্ত না হয় এবং সকল দেশেই এরূপ সৎপ্রথা আছে যে, দেশের হিতকারী সাধারণ গুণসম্পন্ন মহোদয়ের পরলোক হইলে তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার দেশস্থ লোকে কোন চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখে, এই জন্য 'হরিশ্চন্দ্র সমাজ' নামক অট্টালিকার অনুষ্ঠান হইয়াছে।

"হরিশ্চন্দ্র শিশুকালে উপায়হীন ছিলেন। তাঁহার পিতামাতার তাদৃশ সম্পত্তি ছিল না যে তাঁহাকে সুচারুরূপে শিক্ষা দেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ছিল। তিনি প্রথমতঃ ইউনিয়ান স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। তার পরে আপনি আপনার শিক্ষক হইয়াছিলেন, আপনি আপনার উপদেষ্টা হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ কলিকাতার পবলিক লাইব্রেরীতে গিয়া সকল সংবাদপত্র এবং নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া আসিতেন এবং তাহাতেই যে ভুবনবিখ্যাত বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভুবনবিখ্যাত 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সংবাদপত্রেই প্রকাশ আছে। পিতামাতা-পরিজন প্রতিপালনের ভার তাঁহার কোমল স্কন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি অতি অল্প বয়সে টালার নিলামে এক ক্ষুদ্র কেরাণীর কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার অধিকদিন থাকিতে হয় নাই। মিলিটারি অডিটার জেনেরল আপীসে ২৫ টাকা বেতনের এক কর্ম্ম খালি হইলে তিনি পরীক্ষা দিয়া ঐ কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। হরিশ্চন্দ্র শুভক্ষণে মিলিটারি আডিটার জেনেরেলের আপীসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐখান হইতেই তাঁহার উন্নতির সোপান হইল। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া তাঁহার মনিব সাহেবেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং যখন পাইয়াছিলেন, তখনই হরিশের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। অতি অল্প কালের মধ্যে ঐ আপীসে হরিশের ৪০০৲ বেতন হইয়াছিল।

"শিশুকাল হইতে হরিশের সংবাদপত্রে অনুরাগ ছিল। কারণ তিনি জানিতেন, সংবাদপত্রই দেশের উন্নতির মূল, সংবাদ পত্রের দ্বারা দেশের উপকারজনক রাজ নিয়ম সৃষ্টি হইতে পারে। তিনি প্রথমতঃ সংবাদ পত্রে স্বদেশের মঙ্গলজনক পত্র প্রেরণ করিতেন, কিন্তু সম্পাদকেরা তাঁহার সকল পত্র ছাপিতে সাহসী হইত না, এজন্য তিনি বিরক্ত হইয়া আপনি নিজে একখানি সংবাদপত্রের সৃষ্টি করিলেন,* সেই সংবাদপত্রের নাম 'হিন্দুপেট্রিয়ট' হরিশ্চন্দ্র অর্থ লাভ করিবার জন্য হিন্দু পেট্রিয়ট প্রচার করেন নাই, কেবল স্বদেশের উপকার করিবার জন্য 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যখন ১০০, টাকা বেতন পান, তখনই হিন্দু পেট্রিয়টের সৃষ্টি হয়, কিন্তু তখন ঐ পত্রের মাসে ৫০ টাকা করিয়া ঘর হইতে দিতে হইত। স্বদেশ-অনুরাগী হরিশ্চন্দ্র তাহার জন্য একদিনের তরেও কাতর হন নাই। কাতর হইবেন কেন? তাঁহার অন্তঃকরণ অতি মহৎ, তাঁহার অন্তঃকরণ অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত

* বেঙ্গলী'পত্রের প্রবর্ত্তক এবং প্রথম সম্পাদক স্বদেশ প্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষমহাশয়ই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের প্রবর্ত্তন ও প্রচার আরম্ভ করেন। দুই তিন বৎসর তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবার পর তাঁহার অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ হরিশ্চন্দ্র ঐ পত্রের স্বত্বাধিকারী মধুসূদন রায়ের নিকট হইতে ভ্রাতা হারাণচন্দ্রের নামে উহা ক্রয় করিয়া সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। মৎসম্পাদিত Life of Grish Chandra Ghosh, the founder and first Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee নামক গ্রন্থে হিন্দু পেট্রিয়টের ইতিহাস বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

করিত না, কেবল স্বদেশের উপকারই পরমার্থ বলিয়া জানিত! হরিশ্চন্দ্র যে কাগজে লেখনী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, সে কাগজে লোক্‌সান কদিন থাকিতে পারে? হরিশের লেখা যে একবার পড়ে সেই মোহিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার জগৎ-বিখ্যাত হিন্দু পেট্রিয়টের গ্রাহক হয়। অতি অল্পদিনের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের হিন্দু পেট্রিয়ট হইতে ৩০০ ৪০০৲ টাকা লাভ হইতে লাগিল। হিন্দু পেট্রিয়ট, হিন্দুবন্ধু হরিশ্চন্দ্রের লেখার কৌশলে বঙ্গদেশে অতিশয় আদরণীয় হইয়াছে। কেবল বঙ্গদেশ কেন বলিতেছি, ভারতবর্ষময় হিন্দু-পেট্রিয়টের গৌরব হইয়াছে। কি মান্দ্রাজ, কি বোম্বাই, কি লাহোর, কি আগরা সকল স্থানেই হিন্দুপেট্রিয়টকে অতি সাহসী সংবাদপত্র বলিয়া গণ্য করে। ইংলণ্ডেও হিন্দুপেট্রিয়টের অতিশয় আদর হইয়াছে। ইণ্ডিয়া কাউনসিলে আদর হইয়াছিল, মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে আদর হইয়াছিল, প্রিভি কাউন্‌সিলে আদর হইয়াছিল। বিলাতে আবোরিজিনল প্রোটেক্‌শন নামক এক সভা আছে, বিলাতের রাজ্যাধীন যত দেশ আছে সেই সকল দেশের আদিম বাসেন্দা লোকদিগের উন্নতি সাধন করা সে সভার উদ্দেশ্য। হরিশের হিন্দুপেট্রিয়ট এই সভার চক্ষু হইয়াছিল। হরিশ যে সকল মত প্রচার করিতেন, এই সভার সভ্যগণ সেই মত অতি বিধেয় বলিয়া গণ্য করিতেন। কলিকাতার বৃটিস ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়েসনের এখানে যে গৌরব দেখিতেছেন, সে গৌরব হরিশ্চন্দ্রের লেখনীর জোরে হইয়াছে! ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের দ্বারা ভারতবর্ষের যে উপকার জন্মিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই, লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকটে, গবর্ণর জেনেরলের নিকটে ইণ্ডিয়া কাঁউনসিলের সেক্রেটারির নিকটে, ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের প্রস্তাবাদি অতি আদরণীয় হইয়াছে। তাঁহারা জানেন, এই ভারতবর্ষীয় সভার যে অভিপ্রায়, তাহা ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অভিপ্রায়, ভারতবর্ষীয় সভাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভারতবর্ষের সমুদায় লোক সন্তুষ্ট হইবে। তাঁহারা জানিয়াছেন, এই ভারতবর্ষীয় সভা ভারতবর্ষের পার্লিয়ামেণ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য মহোদয়েরা হরিশের বিদ্যা বুদ্ধি কৌশল ও রাজকার্য্যে পারদর্শিতা বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা হরিশকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন, কোন মহৎ বিষয় সুসম্পন্ন করিতে হইলেই তাঁহারা হরিশকে ভার দিতেন; হরিশ সে বিষয় এমনি সমাধা করিতেন তাঁহারা সকলে চমৎকৃত হইতেন এবং হরিশ দীর্ঘজীবী হউক, জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণের কি দুরদৃষ্ট! তাঁহাদের কি পরিতাপ! তাঁহারা অতি অল্প দিবসের মধ্যেই হরিশের অসাধারণ সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

গত ৫৭ সালের মিউটিনির সময়, যে সময় সেপাইগণ রাজবিদ্রোহিতা করিয়াছিল, সে সময় হরিশবাবু যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। সে কথা মনে করিতে গেলে আমার অন্তঃকরণ, অদ্যকার সভার সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ ও ভারতবর্ষের সমুদায়

লোকের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হয়। সেপাইদিগের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরাজ লোকে রাগান্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সমুদয় লোকের প্রাণসংহার করিবার জন্য চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখন কাহার সাধ্য তাহাদের এই অসঙ্গত মতে বিমত করে। তখন তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিলে ফাঁসি হয়, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিলে তদ্দণ্ডে কাটিয়া ফেলে। আমরা কোন্ কাটস বাট। গবর্ণর জেনেরেল লর্ড ক্যানিং তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার লেখনী দ্বারা স্বদেশের লোকদিগকে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে সাহস দিতে লাগিলেন আর দিকে রাগান্ধ ইংরাজদিগের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিলেন। এবং যে সদুপায় দ্বারা রাজবিদ্রোহিতা একেবারে নিরাকৃত হইবে এবং ইংরাজ রাজ্য ভারতবর্ষে সগৌরবে চিরস্থায়ী হইবে তাহার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। আহা! হরিশ্চন্দ্র কিছু মাত্র প্রাণের শঙ্কা করিতেন না, তিনি কেবল দেখিতেন কিসে স্বদেশের উপকার হইবে, তিনি স্বদেশের উপকারের কাছে তাঁহার জীবন অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সেই ভয়াবহ সময়ে একজন ইংরাজ যদি বলে এই ব্যক্তি আমাদের মন্দ কথা বলিয়াছে, তবে তৎক্ষণাৎ কোন বিচার না করিয়া, কোন প্রমাণ না লইয়া, ফাঁসি দেয়। তা ব'লে কি হরিশ্চন্দ্র পিচপা হবেন, তা ব'লে কি হরিশ্চন্দ্র যথার্থ কথা লিখিতে সঙ্কুচিত হবেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার জীবন দিয়া দেশের যদি কিঞ্চিৎমাত্র উপকার হয় সেই তাঁহার যথেষ্ট। লর্ড ক্যানিং মহোদয় এই সময়ে হিন্দুপেট্রিয়ট সংবাদপত্রকে অতিশয় আদর করিতেন, তিনি রাগান্ধ হন নাই, তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ চঞ্চল হয় নাই তিনি তাঁহার মহানুভব সুপ্রিম কাউনসিলের সভ্যগণের পরামর্শ যেরূপ শুনিতেন, সেইরূপ হিন্দুপেট্রিয়ট সংবাদপত্রের পরামর্শও শুনিতেন, তিনি তাঁহার সভার সভ্যগণের দ্বারা যেরূপ উপকৃত হইয়াছেন, সেরূপ হরিশ্চন্দ্রের হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রদ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন। লর্ড ক্যানিং প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন, হরিশ্চন্দ্র আমাদিগের কি লেখেন। এক দিবস হিন্দু-পেট্রিয়ট পৌঁছিবার সময় অতীত হইয়া গেল। হিন্দু পেট্রিয়ট না আসাতে লর্ড ক্যানিং ব্যস্ত হইয়া তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারিকে বলিলেন এখন পর্য্যন্ত হিন্দু পেট্রিয়ট পাইলাম না, ইহার কারণ কি? প্রাইবেট সেক্রেটারি এই কথা তৎক্ষণাৎ হিন্দু পেট্রিয়ট যন্ত্রালয়ে লিখিলেন এবং অবিলম্বে হিন্দু-পেট্রিয়ট ক্যানিং মহোদয়ের হস্তগত হইল। সেই মহাত্মা লর্ড ক্যানিং সাহেবের জন্য এবং আমাদের হরিশের জন্য আমরা অন্যায় অপমৃত্যু হইতে রক্ষিত হইয়াছি। হরিশ্চন্দ্র আমাদের দেশের জন্য এত করিয়াছেন, আমরা কি তাঁহার স্মরণার্থ অকিঞ্চিৎকর কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিতে পারিব না? হে সভাস্থ লোক, অর্থদান করিতে পারিব কি না পারিব বলিয়া জিজ্ঞাসা করা আমার অন্যায়, যখন হরিশ্চন্দ্রের নামমাত্র আমাদের মন প্রফুল্ল হয়, যখন অদ্যাবধি

সভার কথা শুনিবামাত্র এখানকার যাবতীয় লোকে আনন্দিত হইলেন এবং উৎসাহ-প্রফুল্ল বদনে সভায় আগমন করিয়াছেন, তখন যে উদ্দেশ্যে সভা হইয়াছে, তাহা সুসম্পন্ন হবে, তাহার সন্দেহ কি!"

দীনবন্ধু বাবুর এইরূপ কারুণ্যরসাশ্রিত বক্তৃতা-শ্রবণে সভাস্থ যাবতীয় লোক মুগ্ধ, আর্দ্র ও সজললোচন হইয়া উঠিলেন। অনন্তর স্ব স্ব শক্তি-অনুসারে যিনি যাহা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইল।

মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	২০০৲
বাবু তারিণীপ্রসাদ সেন	৫০৲
পূর্ণপ্রসাদ রায়	৫০৲
রামগোপাল মুখোপাধ্যায়	৫০৲
রামচরণ মুখোপধ্যায়	৫০৲
রামগোপাল মিত্র	৫০৲
উমেশচন্দ্র দত্ত	৫০৲
দীনবন্ধু মিত্র	৩০৲
এলাঙ্গী ও মথুরাপুরের প্রজাগণ	২৮৲
যদুনাথ রায়	২৫৲
মহেশচন্দ্র পাল	২৫৲
অভয়চরণ চট্টোপাধ্যায়	২৫৲
দ্বারকানাথ দে	২৫৲
কার্ত্তিকচন্দ্র রায়	২৫৲
ব্রজকুমার মল্লিক	২৫৲
লালমোহন ঘোষ	২৫৲
গোপীমোহন বসু প্রভৃতি	১০৲
মোট—	১০৪১॥০

কস্যচিৎ কৃষ্ণনগরবাসিনঃ।"

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

'বেস্পতি-বারের বার-বেলা'

(বা শাস্ত্র-বাক্য না-মানার ফল)

ভামিনীভূষণের অপরাধের অধিকারিণী ভুগাকালা হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ওগো শীগগির ওঠ,—শীগগির! রাস্তা দিয়ে মৈ যাচ্ছে।"

দুধের হিসাবে গয়লা প্রায় আড়াইটাকার গর-মিল করিয়া ফেলিয়াছে। ভামিনীভূষণ একমনে মাথা হেঁট করিয়া সেই হিসাবটা কাটছাঁট করিতেছিলেন। মাথা তুলিয়া তিনি বলিলেন, "মৈ! মৈ কি হবে?"

—"ছাতের ঐ ভাঙা জায়গাটায় খানিক বালতি মাটি লেপে দিয়ে এস-গে! নৈলে আজকেও ঘুমের দফায় ইতি।"

—"কিন্তু, রাস্তা দিয়ে কোথাকার কে মৈ নিয়ে যাচ্ছে, আমাকে দেবে কেন?"

—"আহা, ওদের কাছে একবার চেয়েই দেখনা ছাই! ওরা মুটে বৈ ত নয় অম্‌নি না দেয়—কিছু পয়সা দিলেই খানিকক্ষণের জন্যে মৈখানা নিশ্চয় ছেড়ে দেবে। যাও যাও, আর দেরি কোরো না।"

একটি সুপ্রকাণ্ড জৃম্ভন উত্তোলন করিয়া ভামিনীভূষণ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

ব্যাপারটা আসলে খুব সামান্যও নয়,—খুব অসামান্যও নয়। ভামিনীভূষণ গেল-কাল সবে এই নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কাল সারারাত ঘরের ছাদের একটা ভাঙা জায়গা হইতে এম্‌নি হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া জল পড়িয়াছিল যে, বিছানা-পত্তর সমস্ত দস্তরমত ভাসিয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়। এ বাড়ীতে একে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি ছিল না, তায় এখন আবার বর্ষাকাল; বাড়ীওয়ালাকে খবর দিয়া মিস্ত্রী আনাইতেও একযুগের কম দেরি লাগিবে না;—কারণ, যেখানে সুরক্ষিত ট্যাঁক্ খালি হওয়ার সম্ভাবনা, কলিযুগের বাড়ীওয়ালারা সেখানে ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ণের মত অগাধ নিদ্রায় বধির হইয়া থাকেন,ভামিনীভূষণের বুদ্ধি চাণক্যের মত খুব বেশী তীক্ষ্ণ না-হইলেও এটুকু তাঁহার অজানা ছিল না! সুতরাং, আজ যদি ফের জল পড়ে, তবে তাহা বন্ধ করিবার উপায় কি,—ভামিনীভূষণ ও দুর্গাকালী কিছুতেই সেটা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

ইতিমধ্যে রাস্তা দিয়া মস্ত-লম্বা একখানা মই লইয়া দুটো মুটেকে যাইতে দেখিয়া, বুদ্ধিমতী দুর্গাকালী ধাঁ-করিয়া একটা উপায় বাৎলাইয়া দিলেন।

দুই

মুটেরা পরের মই লইয়া যাইতেছিল। বখ্‌শিষের লোভে ভামিনীভূষণের প্রস্তাবে তাহারা তখনি রাজি হইয়া গেল। রাস্তা হইতে মইখানা দু-তলার ছাদে লাগাইয়া, একটা মুটে বলিল, "বাবু, আমাদের পয়সা দিয়ে আপনি ওপরে যান, ততক্ষণে বাজার থেকে আমরা জলপান খেয়ে আসি। দেখবেন বাবু, দেরি করবেন না,—আমরা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারব না!"

মুটেদের পয়সা দিয়া ভামিনীভূষণ বলিলেন, "না না, দেরি হবে কেন,—যাব আর নেমে আসব।"

মুটেরা চলিয়া গেল। একটা ভাঁড়ে খানিক বিলাতী মাটি ও আর-একটা ভাঁড়ে খানিক 'পিচ্' লইয়া, বিষ্যুৎ-বারের ভরা-বার-বেলায়, নব্য-যুবক ভামিনীভূষণ অতি সাবধানে ছাদের উপরে গিয়া উঠিলেন। কিন্তু ভামিনীভূষণ যদি পরম নিষ্ঠাবান প্রাচীন হিন্দু হইতেন, তাহাহইলে এত-বড় একটা অকর্ম্ম করিবার আগে, নিশ্চয়ই গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাখানা অন্তত একটিবারও খুলিয়া, 'জ্যোতিষ-বচনার্থে' 'বারবেলা'র অ-গুণ-বর্ণনাটা মন দিয়া পড়িয়া দেখিতেন।

যাহা হউক, উপরে উঠিয়া ভামিনীভূষণ দেখিলেন, ছাদের মাঝখানে একটা জায়গা ফাটিয়া একেবারে আট-চির হইয়া আছে। সেটা চলন-সৈ রকমে মেরামত করিতেও বড় অল্প সময় লাগিবে না।

বাড়ীওয়ালার অবিবেচনার উপরে যৎপরোনাস্তি অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে ভামিনীভূষণ তাড়াতাড়ি কাজে লাগিয়া গেলেন। কোথাও খানিক্ বিলাতী মাটি লেপিয়া দিলেন, কোথাও খানিক 'পিচ্' ঢালিয়া দিলেন। এম্‌নিভাবে অনেকক্ষণ গেল।

ইতিমধ্যে মুটেরা ফিরিয়া আসিয়া রাস্তা হইতে বার-দুয়েক 'বাবু বাবু' বলিয়া ডাক্ দিল। রাজমিস্ত্রীর কর্ম্মানুকরণে ব্যস্ত ভামিনী-ভূষণের শ্রবণ-বিবরে সে ডাক্ আদৌ

প্রবেশ-পথ পাইলনা। কাজেই মুটেরা ভাবিল, বাবু বোধ হয় এতক্ষণে নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। তাহারা মৈ লইয়া চলিয়া গেল।

রাজমিস্ত্রীর কাজ সারিয়া আসিয়া ভামিনীভূষণ যখন এই অভাবিত ব্যাপারটা আবিষ্কার করিলেন, তখন উদ্বিগ্ন স্বরে স্ত্রীকে ডাক্ দিলেন, "ওগো! শুন্‌চ? ওগো!"

বারকতক ডাকাডাকির পর সাড়া পাওয়া গেল, "কি বল্‌চ গো? ছাতে উঠে চিলের মত চ্যাচাও কেন?"

—"চ্যাচাবার যথেষ্ট কারণ আছে,—তাই চ্যাচাই! বলি, মৈ কোথায় গেল?"

দুর্গাকালী ছমড়ি খাইয়া একটা ভাঙা জান্‌লায় মুখ বাড়াইয়া দেখিল, রাস্তায় মৈও নাই, মুটেও নাই! স্বামীর উদ্দেশে বলিল, "ঐ যাঃ! মুখপোড়ারা মৈ নিয়ে চলে গেছে যে!"

এ-খবরে কিছুমাত্র নূতনত্ব ছিল না! ভামিনীভূষণ একটুও খুসী না-হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হুঁ, মুটেরা যে মৈ নিয়ে গেছে, সেটা আর তোমাকে কষ্ট করে' স্পষ্ট করে' বোঝাতে হবে না! এখন আমার কি গতি হবে বল দেখি?"

দুর্গাকালী মহা ফাঁপরে পড়িয়া বলিলেন, "তাইত, একটা কিছু উপায় কর্‌তে হবে ত!"

—"কি উপায়? ছাদ থেকে লাফ মেরে নীচে যাব? কিন্তু আমার যে ল্যাজ নেই, সেটা তুমি জানো বোধহয়?"

—"ওমা, লাফাবে কি গো! তাহলে কি বাঁচবে আর?"

—"হ্যাঁ, এখান থেকে লাফ মারলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা, অতিশয় শক্ত হয়ে উঠবে বটে! কিন্তু ছাদের ওপরেও বেঁচে থাক্‌বার আশা ভারি অল্প দেখচি। এই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সময়, তায় আমার খালি গা, ওদিকে আকাশে ক্রমেই মেঘ করে' আস্‌চে—সঙ্গে-সঙ্গে সন্ধ্যেও হয়ে এল! আমার অবস্থাটা বুঝ্‌চ কি? যতদূর সঙিন হ'তে হয়!"

দুর্গাকালী আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্যসত্যই বৃষ্টির আর বেশী-বিলম্ব নাই!

গ

বন্ধুরা বলিতেন, ভামিনীভূষণের সুরসিক পিতা ঠাট্টা করিয়া ছেলের এ-হেন নাম রাখিয়াছিলেন। কারণ, স্বচক্ষে ভামিনীভূষণের চেহারা দেখিলে যে-কোন ভামিনীই, গুরুজনের কঠোর আদেশ ভিন্ন তাঁহাকে আপনার ভূষণ রূপে গ্রহণ করিতে একান্ত আপত্তি প্রকাশ করিবেন! সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের এই ভামিনীভূষণের চেহারাটি ঠিক সেই-শ্রেণীর,—রাত্রে নির্জ্জন রাস্তায় যে-শ্রেণীর লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া গেলে, আমাদের বুকের কাছটা যার-পর-নাই গুর্‌গুর্ করিয়া ওঠে!

সুতরাং ও-বাড়ীর ছাদের উপরে এমন-একটা ঘোর-কৃষ্ণ হৃষ্টপুষ্ট অশিষ্ট চেহারা দেখিয়া, পাড়ার বিশিষ্ট ভদ্রলোক গঙ্গারাম হাতী-মহাশয় আদৌ হৃষ্টচিত্ত হইতে পারিলেন না। কাল যে ও-বাড়ীতে এক-ঘর নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে পরিচয় না-থাকিলেও এটুকু তাঁহার অজানা ছিল না। সব-জান্তা হাতী-মহাশয় আরো জানিতেন, ও-বাড়ীতে ছাদে উঠিবার

সিঁড়ি নাই। সুতরাং এমন অসময়ে, এই ভরসন্ধ্যায় যখন ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সোঁ সোঁ করিয়া ঝড় বহিতেছে, তখন ও-বাড়ীর ছাদে ঐ বদ্‌খত্ চেহারার লোকটিকে দেখিবামাত্র গঙ্গারামের মনে ভয়ানক সন্দেহ হইল।

তথাকথিত 'ভয়ানক সন্দেহ' আবার দুর্জ্জয় ক্রোধে পরিণত হইল তখন, গঙ্গারামের যখন মনে পড়িল, গেল-মাসে উপর-উপরি দুই রাত্রিতে তাঁহার বাড়ী হইতে ঘটি-বাটি বাসন-কোসন ও কাপড়-চোপড় চুরি গিয়াছে এবং সেই ধূর্ত্ত ও অভদ্র চোরকে আজ-পর্য্যন্ত তিনি গ্রেপ্তার করিতে পারেন নাই। এই চোরই নিশ্চয় সেই চোর! যাঁহাতক্ এই কথা মনে-পড়া, তাঁহাতক্ গঙ্গারামের ষণ্ড-কণ্ঠে প্রাণপণে চীৎকার—"চোর, চোর! পুলিস, পুলিস! চোর! চোর! চোর! ধর্ ধর্! ধর্! মার্! মার্! চোর! চোর!—" (চীৎকার সমানে চলিল)

চোর-নামে কি আকর্ষণ আছে! গঙ্গারামের উচ্চনাদে স্ফীত কণ্ঠ ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই, সেই ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাতকে আমোলের মধ্যেই না-আনিয়া চারিদিক হইতে সেখানে কাতারে কাতারে লোক ছুটিয়া আসিল।

কৈ কৈ? কোথায় সে শা—? বেটা গেল কোথায়? পাহারওলা—এই পাহারওলা! জল্‌দি—জল্‌দি! চোট্টা—ডাকু!—এম্‌নিতর নানা কণ্ঠের বিচিত্র হাঁকডাকে বাজের আওয়াজ কোথায় তলাইয়া গেল!

একে ত মৈ হারাইয়াই মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উপরে এই ঝড়-বৃষ্টির হাঙ্গাম, তাহার উপরে আবার এই নূতন আপদ! বেচারী ভামিনীভূষণ রীতিমত স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

ঝড়ের ঝাপট্ ও বৃষ্টির দাপট্ আরো বাড়িয়া উঠিল—শীতে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভামিনীভূষণ একধারের পাঁচিল ঘেঁসিয়া সরিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলেন।

ঈগল-চক্ষু গঙ্গারাম হাতী অম্‌নি চ্যাঁচাইয়া উঠিলেন, "ব্যাটা পালাচ্চে—ব্যাটা পালাচ্চে!"

—"কী! আমাকে ব্যাটা বলা? তবে রে ছুঁচো!"—ভামিনীভূষণ মহা ক্ষাপ্পা হইয়া বিলাতী মাটির ও পিচের ভাঁড় দুটো গঙ্গারামকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারিলেন!

গঙ্গারাম হাতী মুহূর্ত্তমধ্যে জান্‌লার ধার হইতে হরিণের মত চট্‌পট্ অদৃশ্য হইলেন।

রাস্তার লোকেরা চ্যাঁচাইয়া উঠিল, "খুন! খুন! পাহারওলা—ও পাহারওলা!"

ভামিনীভূষণ দুইহাত উর্দ্ধে তুলিয়া ছাদের ধারে গিয়া উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "মশাইরা—মশাইরা, আমি খুনেও নই, চোরও নই—আমি—" তিনি যে কি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার আগেই তাঁহার উদ্দেশে একঝাঁক ইষ্টকবৃষ্টি হইল। ভাগ্যে লোক-গুলো ইট-ছোঁড়ায় তেমন অভ্যস্ত ছিল না,—সে-যাত্রা ভামিনীভূষণ তাই দু-এক জায়গায় অল্পস্বল্প চোট্ খাইয়াই ঈশ্বর-প্রদত্ত দেহ-খানির ঠাট কোনক্রমে বজায় রাখিতে পারিলেন।

ঘ

কনষ্টেবল রামভজন রাস্তার মোড়ে পানের দোকানের আরসির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া,

বিনি-পয়সার তাম্বুল-রসে শ্মশ্রু-গুম্ফ ভিজাইয়া, পানের দোকানের স্বজাতীয়া অধিকারিণীর কাছে 'এমন ঘন-ঘোর বরিষা'য় যে-কথাগুলি বলা যায়, প্রাণের সেই গোপন কথা-গুলি অল্পে-অল্পে হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া একে একে দিব্য গুছাইয়া বলিতেছিল। এমনসময় আচম্‌কা বেসুরো 'চোর চোর' চীৎকার শুনিয়া সে চোরের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা এবং আপনার দুরদৃষ্টকে অশ্রাব্য ভাষায় ধিক্কার দিতে দিতে সেইদিকে বেগে ধাবমান হইল।

ঘটনাস্থলে হাজির হইয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া, উচ্চরবে সে ভামিনী-ভূষণের উদ্দেশে গ্রাম্য মেড়ুয়া-ভাষায় যে-কথাগুলি বলিল, তাহার সোজাসুজি সভ্য বাঙ্‌লা অনুবাদ এই :—ভামিনীভূষণ যদি সহজে উপর হইতে নামিয়া আসে, তবে তাকে মোটে বছরখানেকের জন্য শ্রীঘর-বাস করিতে হইবে ; আর সহজে নামিতে রাজি না-হইলে তাহার শাস্তি কিন্তু অত্যন্ত কঠিন হইবে—যার নাম, পাকা দশটি বৎসর!

উপর হইতে সহজে নামিয়া আসা তাঁহার পক্ষে যে একটুও সহজ নয়, সেটা ভালো করিয়া সমঝাইয়া দিবার জন্য বেচারী ভামিনীভূষণ আবার ছাদের ধারে আসিয়া, আস্তে আস্তে সাবধানে সর্ব্বপ্রথমে নাকের ডগাটি একটুখানি* মাত্র বাড়াইলেন। কিন্তু নীচের লোকেরা অত্যন্ত বেশীরকম প্রস্তুত হইয়াছিল,—যেমন চোরের দেখা পাওয়া, অম্‌নি বিনাবাক্যব্যয়ে গোটা-তিনেক গুল্‌তি হইতে গোটা-তিনেক বড় বড় মার্ব্বেল এবং অসংখ্য হস্ত হইতে অগুন্তি ইঁট আর পাথর তাঁহার উপরে দুম্‌দাম্ করিয়া বর্ষিত হইল—তার কাছে কোথায় লাগে শিলাবৃষ্টি!

হতাশ হইয়া ভামিনীভূষণ ছাদের উপরে সটান শুইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, জগৎ রসাতলে গেলেও অদূর-ভবিষ্যতে তিনি আর গাত্রোত্থান করিবেন না। একটা* গুল্‌তির মার্ব্বেল আসিয়া এমন গভীর প্রেমে তাঁহার গণ্ড চুম্বন করিয়াছিল যে, তাঁহার সেই কালো গালও ফুলিয়া এবং রাঙা হইয়া উঠিল! সকলের চেয়ে দুর্গাকালীর উপরেই রাগটা তাঁহার বেশীমাত্রায় হইল। স্বামী যাহার মৃত্যুমুখে পড়'-পড়', সে কিনা লজ্জার অছিলায় অন্তঃপুরে গা-ঢাকা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে! আর তাহারই পরামর্শে বোকার মত ছাদে চড়িয়া আজ তাঁহার এই বিপদ!

হঠাৎ রাস্তা হইতে নূতন চীৎকার উঠিল—'আগুন! আগুন!'—ভামিনীভূষণ কাণ পাতিয়া শুনিলেন, দুর্গাকালীও বাড়ীর ভিতর হইতে আগুন আগুন বলিয়া চ্যাচাইতেছে! প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া তাড়াতাড়ি তিনি উঠিয়া বসিলেন। এ আবার কি ব্যাপার?

ব্যাপার আর কিছুই নয়! একটা লক্ষ্যচ্যুত ইঁট বা পাথর ছাদের বদলে ভামিনীভূষণের ঘরে ঢুকিয়া, কেরোসিনের জ্বলন্ত ল্যাম্প উল্টাইয়া দিয়াছে। ফলে এই নূতন বিপত্তি!... ... ...

মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যে ফায়ার-ব্রিগেড আসিয়া হাজির! আগুনটা ভালো করিয়া জ্বলিতে-না-জ্বলিতেই নিবাইয়া ফেলা হইল।

ফায়ার-ব্রিগেডের লোকেরা যে মই আনিয়াছিল, ভামিনীভূষণ তাহার সাহায্যে অবশেষে নিরাপদে নীচে নামিয়া আসিলেন।

তারপর অবকাশ পাইয়া ভামিনীভূষণ যখন আসল ঘটনাটা খুলিয়া বলিলেন, কনষ্টেবল রামভজন তখন তাঁহার দিকে একটা অত্যন্ত ঘৃণা-বিরক্তি-ভরা দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দ্রুতপদে আবার সেইখানে চলিয়া গেল, অত্যন্ত অনিচ্ছা-সত্বেও যেখানে সে তাহার নিভৃত হৃদয়ের গোপন কাহিনী অসমাপ্ত রাখিয়া আসিয়াছিল।

বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতেই দুর্গাকালী তাড়াতাড়ি এক্‌চোখ জল লইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল। ভামিনীভূষণ কিন্তু স্ত্রীর কাতরতা একেবারেই গ্রাহের মধ্যে আনিলেন না। ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "স্ত্রী-বুদ্ধি যে প্রলয়ঙ্করী, আজ তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ পেলুম। হিন্দুর ছেলে আমি,—ভবিষ্যতে আর-কখনো বিষ্যুৎ-বারের বার-বেলায় অব্যর্থ শাস্ত্র-বাক্য অবহেলা করব না।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মার্কিণ কবিতা

নেই-ঘরের ঘুম-পাড়ানি

(Arturo Giovannitti)

আয় নেমে আয় ঘুমের পাখী আমার বাছার চোখে,
—কোন্ ডাকিনী নজর দিয়ে কঁবুলে কাহিল তোকে!
হ'লি যখন তখন ছিলি ট্যাপারিটির মত,
দিনের পরে দিন যত যায় শুকিয়ে উঠিস্ তত!
ফ্যাক্‌ফেকে রং ছিল না তোর এমন গোড়াগুড়ি,
বোল্‌তা-কাটা বিষিয়ে-ওঠা বন্-গোলাপের কুঁড়ি!
গণকগুলো গেল শনির দৃষ্টি দিয়ে তোরে,
মড়াঞ্চেরা মড়ার চুলে গেল কি তুক্ ক'রে!
আমার বুকে দুধ হ'ল হায় তেতো আচম্বিতে,
হাঁদ্‌লা ভেঙে পড়্‌ল বাছার কাদের কুদৃষ্টিতে!
ড্যাক্‌রা পুরুৎ চাঁদ্-কপালে দিলে পায়ের ধুলো
কানাচে মোর উঠ্‌ল ডেকে উট্‌কো কুকুরগুলো!

*　*　*　*　*

ঘুম কি চোখে নেইক তোমার ?—কোল গেছে মোর ভেরে,
কাদিয়ে গেছিস্ ? পাঁজ্‌রাগুলো আমারো হিম যে রে,
ক্ষিদেয় কাঁদিস্ ? এক্‌ফোঁটা দুধ নেই যে তোমায় দিতে
ঘুমো মায়ের মুখ চেয়ে, ধন, ধুঁক্‌ছি ক্ষিদেয় শীতে !

* * * * *

ঘুমো খোকন্ ! ডাঙায় ডোবায় ফসল ষোলআনা
মুরুব্বিরা বল্‌লে হেঁকে—'কাস্তেগুলো শানা'—
'মরাইগুলো সাফ ক'রে থো' বল্‌লে হেঁকে ডেকে
'পোয়াল-গাদা কোথায় হবে ?—জায়গা রাখ দেখে ;
ঢেঁকির গড়ের পাড় ধ্বসেছে,– নিকিয়ে রাখিস্ বউ,
আতাগাছের তোতাপাখী—ডালিম-গাছের মউ !
কিন্তু এত ফুর্ত্তি চাষীর সইল না বিধির,
ঝড় এল শিল-বৃষ্টি নিয়ে চক্ষু হ'ল স্থির !
আশার স্বপন ফুরিয়ে গেল পড়্‌ল ভেঙে বুক
কান্না ভালোবাসেন বিধি দুখ দিয়ে তাঁর সুখ !
ভাঙন নিয়ে বন্যা এল উঠ্‌ল হাহারব,
পাকা ধানে মই দিলে রে ডুব্‌ল ফসল সব।
সর্‌ল না জল, পাথার ক'রে রইল মাঠে ঠায়,
সড়িয়ে দিলে ঝড়ে-শোয়া ফসল সমুদায়।
কাদায় পাঁকে একৃশা হ'ল রইল না বীজ ধান,
ভিজেল্-তোলোয় ইঁদুর নাচে, ছুঁচোয় করে গান।
উনুনে ছাই হিম হয়েছে কবে কে জানে,
মাকোষা জাল বুনছে ঘন আজকে সেখানে !
কাঁদিস্‌নে ধন, তুই যে ছেলে, তুই যে রে বুঝ্‌দার
তোর কাঁদনের মতই নাগাড়—এ মোর হাহাকার।

* * * *

ঘুমো খোকন্ ! চষ্‌ত জমী তোমার ঠাকুর-দাদা,
তোমার দাদার একলা ছেলে কাট্‌ত ফসল আধা ;
ঠাকুর-মা তোর দিতেন এলে ভান্‌ত মা তোর ধান,
চরকা নিয়ে কাট্‌ত কাপাস সকল দিন-মান।
ঠাকুর্দ্দা তোর হ'লেন বুড়ো পড়্‌ল ভেঙে মাজা,
মাঠের মাটি পাথর হ'ল,—সমান শুকো হাজা ;

তার উপরে বাধ্‌ল লড়াই দুখের উপর দুখ
কাস্তে ছেড়ে ধর্ত্তে হবে চাষাকে বন্দুক।
জোয়ান ব'লে বাপকে তোমার রাজা নিলেন ডেকে,
চাষার ঘরের আশার আলো নিবল যে সেই থেকে।
একটি পুরুষ বুড়ো ছিলেন একটি সমর্থ
সংসারে ছিল না মোদের তৃতীয় নদ্দ।
সমর্থ যে রাজ ভুজোড়ে হারিয়েছে সে প্রাণ
বৃদ্ধ যে তায় দয়া ক'রে নেছেন ভগবান।

* * * *

ঘুমো খোকন। ঘুমো রে ধন। ঘুমোরে চাঁদ পানা।
তোর বিছানার চাইতে নরম মুদোরও বিছানা।
মা তোর তোরে বলবে আদর কাঁদবে না সে আর
করবে না আর হারা-মরার জন্যে হাহাকার।
ঘুমো মাণিক। তুই হবি চিব বন্ধ-বান্ধব মোর,
তাদের খিদে ফুরিয়ে গেছে, দুখের নিশা ভোর,
আমরা দুটি আছি সকল যন্ত্রণা সইতে
দুনিয়তির লাঞ্ছনা সব নীরবে বইতে।

* * * *

ঘাট খরচ ছাগল বেচে মোড়ল জুবালে
বেচিয়ে গরু পুরুত ঠাকুর শ্রাদ্ধ করালে।
পৈঁছে, খাড়ু, ঝুমকো, পাশা, সাজ্‌ নাতে গেছে,
গাছ-সিন্দুক, বাসন-কোষণ বেচিয়ে ছেড়েছে।
বিয়ের চেলি তাও বেচেছি, সকল খেয়েছি
স্বামী দিয়ে ব্যাঙ্‌ পিতলের পদক পেয়েছি।

* * *

ঘুমো খোকন্! ঘুমো রে ধন। ঘুমো চাঁদের কোণা
জিরি জিরি পাঁজর তোমার নজরে যায় গোণা,
মা তোর তোরে বল্‌বে শোলোক করবে না শোক আর
যারা গেছে তাদের তরে মিথ্যে হাহাকার।
ঘুমো মাণিক! ঘুমো খানিক, ঘনিয়ে আসে শীত,
বাতাস হ'ল বরফ-ঝামর নিঝুম চারিভিত।

কোথায় যাব ? করব বা কি ? নেই ঘরে খাবার,
জ্বালান নেই কাঠের ডোলে, শুকনো তেলের ভাঁড়।
কি ক'রব রে না পাই ভেবে, নেহাৎ নিঃসহায়,
খিদেয় শীতে মরব ?—পথে বেরুব ভিক্ষায় ?
পাঁচ দরজায় পাত্‌ব কি হাত পেটের জ্বালার পাকে ?
সরাই-খানায় সরাব-খানায় বেচব কি আপনাকে ?
বেশ্যা কিসের অন্নহীনের ? লজ্জা কিসের তার ?
বাঁচিয়ে তোরে রাখ্‌তে প্রাণে সইবে সব আমার।
সইব মানুষ ক'র্‌তে তোরে সব অপমান ক্লেশ
তোমার সুখের সুরু যেথায় আমার দুখের শেষ।
আমাদেরও আসবে সুদিন,—জানি যে নিশ্চয়।
সেই সুদিনের আগেই যদি মৃত্যু আমার হয়,—
কেথায় থাকি হাবিব হ'তে যশ-অযশের বা'র,
যা' কিছু বল দায় জীবনে তারেই ক'রে সার,—
তবে সেদিন বাছা রে মোর মুক্ত হ'য়ো দায়,
(আজ) এক দিয়ে কেউ রাখলে শরম একশো দিয়ো তায়।
কিন্তু যদি পাল্‌তে তোরে কলঙ্ক কিনি,
পঙ্ক ছেনে মুখে এনে দিই ছানা চিনি,—
তবে বাছা ভুলিসনে শোধ দিতে তা' সবায়,—
উপবাসের ঠোঁটে যারা রসের চুমা চায়;—
ভুলিস্‌ নে হায় এই অভাগী নারীর অনুরোধ,
এক এক খোঁচা দিস্‌ ভোজালির এক এক টাকার শোধ।

* * * * *

ঘুমো মাণিক! ঘুমো মাণিক মায়ের বুকের নীড়ে,
পল্‌কা হ'ল কুয়োর দাঁড় বাল্‌তি প'ল ছিঁড়ে।
পাশ-গাদাতে ঢুক্‌বে কুকুর কাঁদ্‌ছে ঘড়ি ঘাড়,
জোয়াল-খানার খিল খুলে যায় ধুলোয় গড়াগড়ি।
আমার মনের কসকসানি আফসে মরে বুকে,
খোলোক তোরে বলব কি বল্‌? উঠছি কেবল রুখে।
আথ্‌ চেয়ে ধন! ভোর হ'য়েছে আঁধার সরে যায়,
জোড়-পাহাড়ের ওপার থেকে সুর্য্যি-মামা চায়,

ডাক্‌ছে ভোরের পাখী যত কর্‌ছে কাকলি,
নিদ্‌-মহলে নিদ্‌ নাহি আর নয়ন আগলি'।
ঘুম্‌-পাড়ানির ওস্তু গেল, গেলরে উৎরে,
মার বাঘিনীর বাচ্ছা জাগে আলোর সমুদ্রে।
রাত গিয়েছে, দুঃখ যাবে,—যাবে সে,—ভুল নাই,
ঘুম-পাড়ানির গান অবসান, দুখের আসান গাই।

* * * * *

ঘুমোস্‌ নে রে, চোখ্‌ মেলে চা', ঘুমোস্‌ নে আর তুই
তলোয়ারও যা' কুড়ুলও তা সমান লোহা দুই।
বড় হ'য়ে হ'স্‌নে বাছা বেনে কি ভুঁই-হার,
হ'স্‌নেরে ঠক্‌ ধরমী বক হ'স্‌নে অবতার।
মিন্‌মিনে কি জবরদস্ত হ'স্‌নে তুই খোকা,
রাজাকুজির ধারিস্‌ নে ধার হ'স্‌নে দারোগা ;
সোজাসুজি মানুষ হ' তুই সিধে মানুষটি
জোরের কাছে জুজু হ'য়ে জানাস্‌ নে তুষ্টি।
মানুষ হবি শক্তপোক্ত সাহসে উল্লাস,
এই দুনিয়ায় সবাই সমান কেউ কারো নয় দাস।
ভালো হবি মানুষ হবি এই তো মনের সাধ,
ভালোমানুষ হ'স্‌নে শুধু এ মোর আশীর্ব্বাদ।

কাঠগড়া

জীবন-সিন্ধু জলের ঢেউয়ে ধাক্কা খেয়ে হয় যারা চুরমার,
ঝড়-তুফানের খেল্‌না-হেন গুঁড়ে মাথা পড়ে হাজার বার,
কালের জোয়ার ছড়িয়ে তাদের এই ঠিকানায় হাজির করে রোজ
ব্যথার ভয়ের রোষের মূর্ত্তি! হেথায় এলে সবার মেলে খোঁজ।
এখান দিয়ে যায় চ'লে সব রসাতলের তলায় একেবারে,
ক্লিষ্ট দেহ দীর্ণ আত্মা তলিয়ে হঠাৎ মিলায় অন্ধকারে ;
মিলায় তাদের অপরাধের অবসাদের স্মৃতি নিরাস্বাদ
হোটেল-খানার বদ্‌হজম আর শুঁড়িখানার আবর্জ্জনার গাদ।

সকল কসুর মেনে নিয়েও জুড়িয়ে ক্রমে আসে মনের রাগ
থাকে শুধু শোণিত-চিহ্ন থাকে শুধু চোখের জলের দাগ।

*　　*　　*　　*　　*

এখানে কার ঠাঁই হ'ল আজ? ঘৃণার চোখে ওরে দেখিস্‌নেরে
চল্‌তে না হয় পারেহনি ও,—আইনকারে বেবাক আঁখি ঠেরে।
বন্ধু! সবুর! কাঠগড়াটার ঝাড়ছ কেন ধুলো মনের ভুলে?
কাঠগড়াতে যারা দাঁড়ায় অশুচি তো নয়কো তারা মূলে
অন্তত নয় তেমন,—যেমন গলা-কাটা মহাজনের দল,
কিম্বা যেমন জমীদারের জুলুম-জবর আম্‌লা-নায়েব খল।
কাঠগড়া তো অশুচি নয়, অশুচিও নয় কো কোনমতে
ওখানে তো জজ বসেনা,—ফাঁসার হুকুম হয়না ওখান হ'তে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কাজরী

১২

শ্রাবণ মাস। একটু আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। জলো হাওয়া বইছে। সূর্য্যি একবার চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা করছিল—ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ! আবার কোথা থেকে মেঘের পর মেঘ এসে তার চোখদুটিতে গাঢ় ঘুমের ঘোর লাগিয়ে দিলে। টিপ্‌টিপে বৃষ্টিতে পথে কাদা জমে গেছে—কোঁচার খুঁট ধরে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে, এখানে একবার পা ফেলে ওখানে একবার পা রেখে পথে লোক চলেছে। আহা, এই জলে কাদায় বেচারাদের পথ চলার আর বিরাম নেই! আমি দোতলার ঘরে খড়খড়ির পাখি তুলে পথে লোক-চলাচল দেখছি। এমন সময় মা উপরে এল, হাতে একখানা চিঠি। মা বললে, "ওরা এই রবিবারেই তোকে নিয়ে যাবে রে—দিন ভালো, তাই এঁকে লিখেছে। জামাই আসতে পারবেনা—আমাদেরই দিয়ে আসতে হবে। এই চিঠি এসেছে।"

যাবার কথা লোক আসা-যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে উঠছিল। যেতে ত হবেই! যাবার কথায় আনন্দ যে না হত, এমনও নয়। রোজ দেখতে পাব—প্রায়ই, সর্ব্বক্ষণ। তবু আজ এখন সেই যাবার দিনটা স্থির হয়ে গেছে শুনে বুকটা কেমন ধড়াস্‌ করে উঠল। আজ বুধবার—মাঝে আর তিনটি দিন শুধু। আমার মনে হল, আমার এই মুক্ত জীবনটার মাঝখানে কে মস্ত লাইন টেনে সীমা এঁকে দিয়েছে—স্বাধীনতার শেষ রেখাটি স্পষ্ট ঐ দেখা যাচ্ছে! মার মুখের

পানে চাইলুম—মা'র মুখখানি শুকিয়ে গেছে। আহা, মা আমার, জননী আমার!—

আমার সমস্ত মনের ফাঁকটুকু ঐ আকাশের মতই মেঘে ঢেকে গেল। এখানে এসে কত আব্দার, কত খেয়াল নিয়ে রয়েছি—অবাধ স্বচ্ছন্দ মনটাকে নিয়ে কেমন আমোদে মেতে খেলছি, কোথাও বাধা নেই, বন্ধ নেই—সেখানে না জানি কি ধরা-বাঁধা নিয়ম-কায়দার মধ্যে মনকে এঁটে চেপে রাখতে হবে। ফরফুর করে মিঠে হাওয়াও একটু বয়ে গেল—তাকে দেখতে পাব ত—কাছে কাছে পাবব ত! আচ্ছা, যে মেয়েমানুষ স্বামীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত, কি করে সে শ্বশুর-ঘরে পড়ে থাকে? কি করে সে সময় কাটায়? কথাটা মনে হতেই সর্ব্বাঙ্গে আমার কাঁটা দিয়ে উঠল।

ঘরের চারিদিকে চাইলুম। মনে হল, এই প্রাণহীন ইট-কাঠের দেওয়াল দরজা জানলাগুলো অবধি যেন কত দুঃখে হতভম্ব হয়ে আছে। সমবেদনার কি স্তম্ভিত দৃষ্টি নিয়ে সব নিথর দাঁড়িয়ে আছে। ঘটি, বুড়া—আহা, আমি চলে গেলে ওরা কতখানি কাতর হয়ে পড়বে। ওদের ত যখন খুসী, আমি দেখতে পাবনা। কত মার-ধোর করি, কত বকি—আহা—

... ...

নিজের ঘরে চুপ করে বসে ছিলুম। ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছিল—সামনের বাড়ীর গোলাপী রঙের দেওয়ালগুলোর মাঝে-মাঝে রঙ উঠে গেছে। কোথাও বালি বেরিয়ে পড়েছে, আর তার চারপাশ ঘিরে সবুজ শ্যাওলা দেখা দিয়েছে। সেই জায়গাটায় ছাদের ভাঙা নল বয়ে জল এসে জমছে—আবার টুপটুপ করে মুক্তোর মত ঝরে পড়ছে। আমার মনে হচ্ছিল, ওটা যেন ঐ বাড়ীর চোখ—চোখ মেলে বাড়ীটা আমার পানেই চেয়ে চেয়ে কাঁদছে, ভাবী দুঃখে, আবার। নিত্য আমাকে ছাখে, আমার ঘরের এই জানলার সামনেটিতে,—কখনো আনমনে বসে আছি, কখনো বই পড়ছি, কখনো বা কিছু শেলাই করছি, আবার কখনো রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আকাশে অলস দৃষ্টি ছাড়িয়ে দিচ্ছি। এ জায়গাটি আমার ভারী ভালো লাগে। যখন তখন, হাতে কাজ না থাকলেই এই জায়গাটিতে এসে বসি। ওধারে কত-দূর অবধি রাস্তা দেখা যায়—তাতে কত রকমের লোক চলেছে—তার উপর এ আকাশ পার নীল, লাল, ধোঁয়াটে, কালো, নানা রঙের পর্দা খুলে কত বিচিত্র রূপ ধরে দেখা দিচ্ছে।—যাক্।

আমার মনে হচ্ছিল, বাড়ীটা যেন আমায় আর দেখতে পাবেনা বলেই কাঁদছে। তার উপর সামনের বাড়ীর কালাবাবুর ঘরের জানলায় কালীবাবুর ছোট ছেলেটি বসে আধ আধ ভাষায় ছড়া বলছে

"বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বাণ।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ী যান।"

কালাবাবুর বাড়ীর ছাদে একটা গন্ধরাজের গাছ বৃষ্টির ঘা খেয়েও এক একবার মাথা ঝাড়া দিচ্ছে, যেন বলছে,

যেয়োনা, ওগো, যেয়োনা। কোথায় যাবে গো তুমি, কোথায় যাবে? আমরা নিত্যি নিত্যি সবাই সবাইকে দেখছি, শুনছি—কত মেলা-মেশা, কত ভাব, কত জানা-শোনা—এক সঙ্গেই আমরা বেড়ে উঠেছি, এমন কত বৃষ্টি, কত ঝড়, কত গন্ধ, কত আলো আমাদের উপর দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে চলে গেল, এতদিনের এমন সঙ্গ-সুখ এ ছেড়ে কোথায় কোন অজানা ঠাইয়ে চলে যাব। ও-বাড়ীর খাঁদুর কচি ছেলেটি ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে, বৃষ্টির শব্দের মধ্য দিয়ে তার কান্নার সুর জ্যাঠাজের নাশার মতই কানে এসে লাগছে। চিরদিনকার পরিচিত এই সহজ সুর সকল দৃশ্য এ যে এমন সুন্দর, তা কোনদিন লক্ষ্য করিনি ত। এমনি সব চেনা হয়ে গেছে যে কার ছেলেটি কখন কিসে কাঁদবে, হাসবে, কি খেলা খেলবে, তা নিমেষে বুঝে ফেলি। ঐ ও-বাড়ীর তরলা কখন ছাদে কাপড় শুকোতে দিতে উঠবে, ঘোষেদের মিনি বইখানি নিয়ে বারাণ্ডার কোণে চিরুটা ঝুলিয়ে বসে পড়বে, হাজরাদের মেয়ে চাকরের সঙ্গে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে,—জ্যোতিষার খড়িতে আঁক কষার মত সব বলে দিতে পারি! এই সব ছেড়ে চলে যেতে হবে? এর পর ঐ বাড়ী অমনি করেই তার মাথাটি তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে, ঐ লতাগাছগুলি তাদের কচি কচি ডাল-পাতা নেড়ে বাতাসের সঙ্গে এমনি খেলা করবে—ঐ যে রাস্তায় বৃষ্টির ঘোলা জলে ঘোষেদের বাড়ীর সহিসের ছেলেগুলো কাদা মেখে গা মেখে নেচে বেড়াচ্ছে, ওরা এমনি নেচে বেড়াবে হাজরা-গিন্নী, মিনি, তরলা সবাই যে যেমন নিজেদের কাজ-অকাজ নিয়ে দিব্যি থাকবে, আর এ-সব ছেড়ে আমি কোথায় কত দূরে, সে কোথায় যাব।

. . . .

সন্ধ্যার পর ভাই-বোনগুলিকে নিয়ে বিছানা পেতে বসলুম, বললুম, আয়, তোদের গল্প বলব'খন। ঘন্টি অবাক! বুড়ী ত বিশ্বাসই করতে চায় না। ছোটদিদি হঠাৎ এত সদয় হল যে আজ! সত্যিই ত। এ কি বিশ্বাস করবার মত।

এ তিন চার মাস সন্ধ্যার পর আমি একলাটি নিজ্জনে থেকে যতক্ষণ না খাওয়া দাওয়া চোকে, হয় বই নিয়ে, নয় এমনি শুয়ে পড়িয়ে কাটিয়ে আসচি যে। ওরা কত আব্দার করেছে এসে, 'একটা গল্প বল না, ছোটদি—সেই টুনটুনির নাকে বেগুন কাটা ফুটে গেল সেই গল্পটা?" আমি ধমক দিয়ে আমার কাছ থেকে তাদের কেবলি তাড়িয়ে দিয়েছি। আর শুধু কি ঐ সন্ধ্যার সময়টিতেই? বেচারারা যখনই আমার কাছে এসে আব্দার তুলেছে, তখনই ধমক দিয়েছি, দু একটা চাপড়ও পিঠে বসিয়েছি, কত সময়!

এখন কেবলি মনে হচ্ছিল, আমার আদরের ভাই-বোনগুলিকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে নিয়ে বসে থাকি! ওরে আমার যাদুরা, সোনার ধনরা, কত তোদের মিছিমিছি বকেছি, ধমকেছি, আহা, অমন চাঁদের মত হাসি-ভরা মুখগুলি তোরা কালি করে ফিরে গেছিস্। চোখ তোদের ছলছলিয়ে উঠেছে, আর আমি তা দেখেও পাশ ফিরে শুয়ে ছাই-পাঁশ ভাবতে ভাবতে আরামের নিশ্বাস ফেলেছি!

ঘন্টির মুখে বুড়ীর মুখে বারবার চুমু দিলুম। আমার আদরের ঘটায় তারা অবাক, অস্থির হয়ে পড়ল। প্রাণে সাহস পেয়ে বললে, "ছেই গপ্পতা বলো না—ছেই ঝড়ের বাজা, জলের রাণী—"

"বলি ধন"—বলে তখন গল্প সুরু করলুম—বায়োস্কোপের একটা গল্প! এ গল্পটা ওরা শুনতে, ভারী ভালোবাসে! গল্প শেষ হলে বুড়ী বললে, "এই বইটা পড় না,—"

'হিজিবিজি' বই। আমি পড়তে লাগলুম, "অ আ ঢু' ভাই অজ বেয়াকুব আসল কুড়ের ধাড়ি। গোঁপ-দাড়ি সব পাকল, তবু বগলে পাততাড়ি—"

ঘন্টি পাতাছুটো উল্টে দিয়ে বললে— "না, না, ও-তা না। খেইতে বলো না, অন্তত্ত দ বল্ থেলেচে ভালো—"

"এইবার বকুনি খাবি। বই ধরে টানছিস কেন?" বলে বুড়ী বইটা কেড়ে নিয়ে তাকে ধমক দিলে।

আমি বললুম, "এই যে, সব পড়ছি, সব। শোনো না লক্ষ্মী হয়ে—"

ঘন্টি আব্দার তুললো, "না, থব না। ও ঘল্ তেকে ওচ্ছুদ্ এনে আমাল্ তাকে থালো। না ছোড়্দি?"

মা এসে বললে, "আবার ওকে জ্বালাতন কচ্ছিস, এখনি মার খেয়ে মরবি ত। তোরা বড় বেহায়া রে! কাতীটা গেল কোথায়? ওদের একটু আগলাতে পারে?"

মার কথায় আমি একেবারে এতটুকু হয়ে গেলুম। আমি বললুম, "না মা, আমার কাছেই ওরা থাক্। আর ত খালি আজকের দিনটি।"

"তোকে বিরক্ত করবে শেষে?"

"করুক গে।"

মা চলে যাচ্ছিল। একটা কথা খানিকক্ষণ থেকে আমার বুকের মধ্যে গুমরোচ্ছিল, চেপে রাখতে পারলুম না আর। মাকে বললুম, "আজ আমি মা তোমার কাছে শোব। বেশ সব ভাই-বোনগুলি একসঙ্গে—এ্যা—"

"তা শুস্‌খন—"বলে মা দেরাজ থেকে কি বার করে নিয়ে চলে গেল। আমি ভাইবোন-গুলিকে গল্প বলতে লাগলুম। বই থেকে ছড়া পড়ে শোনাতে লাগলুম। তাদের আর আমোদ ধরে না আজ। থেকে থেকে আমার দুঃখ হচ্ছিল। আহা, এতদিন কেন এদের মুখের পানে ফিরে তাকাইনি। কি এমন আমার মহা কাজ পড়েছিল যে—

হঠাৎ বুড়ী বলে উঠল, "কাল তুমি শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে,—না, ছোড়্দি? আর তোমায় দেখতে পাবনা? আমার বড় মন কেমন করবে।"

ঘন্টি বলে উঠল, "ছচ্ছুরকে আমি দুম্‌দুম করে মারব, বাবার নাতি দিয়ে মারব—" তারপর শ্বশুরের কাল্পনিক দুর্দশার কথা ভেবে সে একেবারে হো-হো করে হেসে উঠল।

... ...

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম কিছুতেই হচ্ছিল না। ভাই-বোনেরা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। মাও ঘুমিয়ে পড়ল। ঘড়িতে বারোটা, একটা বেজে গেল, তবু ঘুমের দেখা দেবার লক্ষণই নেই!

ঘরে বাতি জ্বলছিল—মার মুখের পানে

চেয়ে বিছানায় বসে রইলুম—কি সুন্দর মার মুখখানি! এমন মন কেমন করতে লাগল। মাকে ছেড়ে কেমন করে সেখানে পরের ঘরে থাকব। কত আব্দার, কত খুঁটি-নাটি নিয়ে দিবারাত্রি মাকে জ্বালাতন করেছি, মা হাসিমুখে সব সয়েছে—আহা, মাগো, ও আমার মাগো—

মার প্রাণে কতখানি আজ বেদনা হচ্ছে। কিন্তু মা একটা সামান্য ইঙ্গিতেও তা প্রকাশ করছে না—মুখে আমায় কেবলি আশ্বাস দিচ্ছে! কিন্তু ওবেলার সেই একটা কথা—"আর দু'তিন মাস পরে পুজোর সময় নিয়ে গেলেই বেশ হত'খন—'

এই কথাটুকুতে কতখানি বেদনা এখন যেন সেই কথাটা মনে পড়তে লাগল। মাথাটা কেমন করে উঠল। হঠাৎ মনে হল, মার আর আমার মধ্যে মস্ত একটা ব্যবধান বেড়ে উঠছে—মা চুপ করে এখানে শুয়ে আছে, আর আমায় ক ভাসিয়ে-ভাসিয়ে কোথায় কত দূরে টেনে নিয়ে চলেছে,—আমি কত ডাকছি, কত হাত পা ছুড়ছি, তবু মার ঘুম ভাঙ্গচে না, আমিও যে দাঁড়াব, তা খই পাচ্ছি না। দূরেই যাচ্ছি,—দূরেই যাচ্ছি মার মুখখানিও ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। তারপর—তারপর মাকে আর দেখাও যায় না! বুকটা কেঁপে উঠল। শুয়ে পড়ে আস্তে আস্তে মাকে জড়িয়ে ধরে, একেবারে মার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজলুম। মাও ঘুমন্ত অবস্থাতেই হাতখানি দিয়ে আমায় আরো বুকের মধ্যে টেনে নিলে—আমার সমস্ত কাঁপুনি আস্তে আস্তে 'তারপর চলে গেল। ...

১৩

সন্ধ্যার একটু আগে বাবার সঙ্গে এখানে এসেচি। গাড়ী থেকে নামবার সময় কাণদুটো সজাগ রেখেছিলুম, পরিচিত কোন স্বর যদি ধরা পড়ে। কোথাও না! নিরাশ হয়ে কার্তীর হাত ধরেই সন্তর্পণে উপরে উঠলুম। সবাইকে প্রণাম করলুম। শাশুড়ী মুখে চুমু দিয়ে বললেন, "এসো মা। কে, একটু মোটা-সোটা হতে পারোনি ত।" তারপর বড় যা'কে বললেন, "অনুকে নিয়ে যাও ত। আমি বেয়াইয়ের সঙ্গে কথা কইগে—"

বড় যাকে বললুম, "বড়ি কোথায় দিদি?"

"বেড়াতে গেছে। সে কি যায়! টাটিমা টাটিমা করে একেবারে অস্থির। আম ভাই এবার বাঁচলুম—তোর হাতে ওকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তি—"

... ...

নিজের ঘরে এলুম। ঘর নতুন ধরণে সাজানো হয়েছে। ঝরঝরে। একপাশে একটা টেবিল হার্মোনিয়ম এসেছে, আর-এক কোণে ছোট টেবিল—তার উপর দু-একখানি ঝকঝকে বাঁধানো বই, আর বাবার দেওয়া বিয়ের সময়কার সেই দোয়াত-দানটা! চারিধার ঝাড়া মোছা,—একেবারে তকতক করছে!

বড় যা বললে, "ঠাকুরপোর পড়াশোনার সরঞ্জাম সব এই ঘরেই ঢুকেছে, দেখেছিস্ ত। তোর কাছে পড়বে কিনা, এবার—"

আমি হাসলুম। যা বললে, "হার্মোনিয়মটি বাবুর কাল কেনা হয়েছে—"

সত্যি, অভ্যর্থনার আয়োজন খুবই। দেখে আহ্লাদ হল।

... .

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে বুড়িকে ঘুম পাড়িয়ে রাত দশটা অবধি শাশুড়ীর কাছে-কাছে ছিলুম। ঘরে যাবার জন্ত বারবার তাগিদ হচ্ছিল, খুব। কিন্তু যাই কি করে? আমার কাণের কাছে মুখ নিয়ে এসে দিদি বললে, "ঠাকুরপো কি-রকম উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে, দেখবি আয়।"

দেখ দেখি, কাণ্ড। যাই কি বলে এখন। যতই দিন্ না ওরা তাগিদ। শাশুড়ী-টাশুড়ী কারো খাওয়া-দাওয়া চুকল না, তারা এদিকে ব্যস্ত রইলেন—আর আমি সেজে-গুজে মল বাজিয়ে ঘরে শুতে চললুম। ধেৎ। ভারী লজ্জা করে সে!

শাশুড়ী কিন্তু শুনলেন না। আমি তাঁর পায়ের কাছটিতে বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলুম। তিনি উঠে আমার হাত দুটি ধরে দাড়িতে হাত ঠেকিয়ে চুমু নিয়ে বললেন, "রাত হয়ে গেছে মা, আর তোমার জেগে বসে থাকেনা। তুমি শোওগে। অসুখ করবে, না হলে" দিদির দিকে চেয়ে বললেন, "অমুকে ঘরে দিয়ে এসো ত মা।" বিয়ের পর থেকেই শাশুড়ী আমায় অমু বলে ডাকেন, 'বৌমা' বলেন না। আমার ভারী মিষ্টি লাগে।

আমি বললুম, "আমার অসুখ করবে না মা। আপনার খাওয়া হলে আমি শুতে যাব'খন।"

শাশুড়ী বললেন, "সে কাল থেকে আমার খাওয়া হচ্ছির করো মা— আজ গাড়ীতে এতটা পথ এসেছ,—কত কষ্ট হয়েছে। আজ শোওগে, যাও—অসুখ করলে আমাকেই ভুগতে হবে যে মা।"

এ কথার পর আর বসা চলে না। দিদি হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে তুললে, বললে, "শুবি আয়, ভাই। ঠাকুরপো তোর জন্যে শুতে পাচ্ছে না।"

কেউ না দেখে, এমনি ভাবে আমি দিদির হাতে ছোট্ট একটু চিমটি কাটলুম।

ঘরের সামনে আসতেই দিদি চুপিচুপি বললে, "একটু নিঃশব্দে উঁকি মেরে বাবুর হালটাই দেখ্ না, ভাই। ঘরে ত যাবিই লো।"

আমি চুপি-সাড়ে উঁকি পাড়লুম। দেখি, দেওয়ালের দিকে মুখ করে চেয়ারে বসে তার কি বই পড়া হচ্ছে। তন্ময় এরে বাসে! দিদি চুপি চুপি বললে, "দেখবি মজা?" বলে আঁচলের চাবির রিংটা ঝুনঝুন্ করে বাজিয়ে সরে এল। আমি আড়াল থেকেই দেখলুম, অমনি তার টনক নড়ল। খাড়া উঠল—পরে হাই তোলবার ছল করে একবার দোরের দিকেও তাকালেন। তারপর কোলের উপর বইখানা ফেলে দেওয়ালের দিকে উদ্দেশ্যে হয়ে চেয়ে রইলেন। কতক্ষণ রইলেন। তারপর উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"নাঃ, এ নিষ্ঠুর খেলা দর্শক আর কৌতুক, দুজনকেই সমান বাজচে, কি বালস্ ভাই? তুইও এ বিলম্ব হওয়ায় আমায় গাল দিচ্ছিস কত--" বলেই আমায় কোন কথা বলবার সাবকাশ না দিয়ে আমার হাত ধরে দিদি ঘরের মধ্যে হাজির। তিনি ফিরে একটু হেসে চেয়ে চেয়ারে গিয়ে

বসলেন। দিদি বললে, "ওগো আর কেতাবের গহন বনে উদাসীন হয়ে বেড়াতে হবে না। এই নাও, ফিরে চাও দেখি,—বলি, তোমার ধ্যানের মূর্তি এই মুখখানি মনে পড়্ছে কি ?" বলে আমার মুখের ঘোমটটা খুলে দিলে। আমি ঘোমটার আড়ালে চোখ মেলে তাঁর ভাব-ভঙ্গী দেখছিলুম—তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলুম।

তিনি বললেন, "কি হচ্ছে বৌদি ?"

দিদি বললে, "এতদিন বৌদিকে কত পূজা-অর্চ্চনায় তুষ্ট করেছ। আজ বৌদি সদয় হয়ে তাই বর দিতে এসেছে। বর নেরে ভক্ত মোর—"শেষের কথাটা দিদি একেবারে হুবহু থিয়েটারী সুরে এমন ভঙ্গীতে বললে—মাগো মা, এতও জানে দিদি! কথাটা বলে দিদি আমার হাতটা তার হাতে তুলে দিলে। তিনি বললেন, "বর নয়—এ যে কন্তে—"

"তোমারই জন্যে—। নাও ভাই, আমি চললুম—যতক্ষণ দাঁড়াব, ততই তোমরা বিরক্ত হবে ত!"

হাসতে হাসতে তিনি বললেন, "না, না বৌদি, থাকো। একটুও বিরক্ত হব না।" আমি দিদির আঁচলটা চেপে ধরলুম।

দিদি বললে, "কেন ভাই, আর লোক-দেখানে কুটুম্বিতে করিস্! ছেড়ে দে। শেষে ঘড়ির কাঁটাগুলো যত ছুটে এগিয়ে যাবে, ততই দুজনে হায়-হায় করে মরবি!"

দিদি চলে গেল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি দোরটা বন্ধ করে দিয়ে একেবারে এসে টেবিলের ড্রয়ারটা খুললেন; বার করলেন, খুব বড়-একটা গোড়ে মালা। আমার গলায় সেইটে পরিয়ে দিয়ে বললেন, "বাঃ, কেমন দেখাচ্ছে, বল দেখি!" বলে আমায় বড় আর্শির সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন—মাথার ঘোমটা মালাটা পরাবার সময়ই খুলে দিছলেন। আমি চোখ খুলে দেখলুম, ঠিক আমার পাশে বড় বড় দুই চোখ মেলে এমন দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন! ভারী দুষ্টু! কেবলি রঙ্গ! আমি সরে একেবারে খাটের পাশে এসে দাঁড়ালুম। তিনি দূরে দাঁড়িয়ে আমার পানে চেয়ে হাসতে লাগলেন।

* * *

স্বপ্ন—আবার স্বপ্নের স্রোত বয়ে চলেছ। স্বপ্নের ঢেউয়ে ফানুসের মত ভেসে চলেছি! জীবন-বীণায় কি মিঠে সুরই বাজছে রে!

আমি বললুম, "তুমি কি পাগল হয়েছ ?"

তিনি বললেন, "পাগল সাধে হয়েছি! তুমি পাগল করেছ যে।"

* * * *

আজ সাত দিন হল, এসেচি। শাশুড়ীর মুখে আমার সুখ্যাতি আর ধরে না, দিদি ত অনু বলতে অজ্ঞান! আমার হাতের পাণ সাজা বড়ঠাকুরের এত ভাল লাগে যে, দিদি বলছিল, "তুই মাথা খেলি ভাই,—তোর ভাসুর দুটির বেশী পাণ খেত না এখন ডাবর-কে-ডাবর উড়ে যাচ্ছে!" বুবড়ির ত কথাই নেই! টাটিমা নাইয়ে দেবে, ভাত খাওয়াবে, দুধ খাওয়াবে, পোষাক পরিয়ে বেড়াতে পাঠাবে—বেড়িয়ে ফিরলে টাটিমাকে রোজ রাজার গল্প, মন্ত্রীর গল্প, রাক্ষসের গল্প বলতে হবে। আর তিনি? সত্যি—এমন ভাগ্য ক'জনের হয়!

* * * *

মনটা আজ ভারী খারাপ রয়েছে। মার চিঠি পেলুম সেদিন,—বুড়ীর জ্বর হয়েছে লিখেছিল—তার পর আর কোন চিঠি আসেনি। মা কি বাবা রোজই চিঠি লিখ্‌ছিল,—আর আজ তিনদিন চিঠি নেই। তার উপর বুড়ীর অসুখের খবর পেয়েছি। মনটা হু-হু কর্‌ছে, কিছু ভাল লাগছে না।

* * * *

রাত্রে তিনি এসে বললেন, "আজ তোমায় এমন শুক্‌নো দেখ্‌চি কেন, রাণী? অসুখ করেছে কি?" তিনি ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আমি বললুম, "না, অসুখ করেনি ত।"

তিনি বললেন, "তবে—?"

আমি বুড়ীর অসুখের কথা বললুম।

তিনি বললেন, "ওঃ! তা তার জন্য ভাবচ কেন? অসুখ অমন ছেলে পিলের একটু-আধটু হয়। তার জন্যে এত ভাবনা কিসের?"

আমি আর কিছু বলতে পারলুম না। ব্যাপারটা তিনি যত সহজ করে দিলেন, আমার মন ত সেটাকে তেমন সহজ করে নিতে পারলে না!

তিনি বললেন, "তবু তুমি চুপ করে রইলে? আমি আজ বায়োস্কোপে গেছলুম—সেখানে ছবিতে একটা সুন্দর রোমান্স দেখে এলুম—ভাবছিলুম, তোমাকে বলব। তা তুমি-"

আমি বললুম, "বল না—"

তিনি গল্প বলতে লাগলেন। আমার মন কিন্তু সেদিকে এতটুকু আগ্রহ জাগালে না। পারলে না জাগাতে। আমার চোখের সামনে জাগছিল তখন, আমাদের সেই ঘরটি—সেই ঘরে আমার বুড়ী সোনা শুয়ে আছে, রোগে মুখখানি শুকিয়ে গেছে, আর মা বাবা শব শিয়রে চুপটি করে বসে রয়েছে।

*

তিনি বললেন, "তুমি ত শুনছ না, ভাল করে। ভাল লাগছে না বুঝি?"

আমি বললুম, "শুনচি ত—"

"না, তুমি শুনচ না। তুমি তোমার বোনের অসুখের কথাই ভাবচ—না?"

"আমার বড্ড মন কেমন করচে—"

"তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর কি? বল-"

"করি।"

"তাহলে আমি বলচি, ভাবনার কোন কারণ নেই—বুড়ী ভালই আছে।"

"কোন চিঠি পাইনি, আজ তিনদিন-"

"তুমি পাগল হয়েছ। তিনদিন চিঠি পাওনি তা কি—।"

"মা বলেছিল, রোজ চিঠি লিখবে। এসে অবধি ত রোজই চিঠি পাচ্ছিলুম। তারপর সেদিন মা লিখেছিল, বুড়ীর অসুখ করেছে—তা আমি ক'দিনই চিঠি লিখেচি,—জিজ্ঞাসা করেছি, বুড়ী কেমন আছে, লিখতে বলেছি, তবু কোন জবাব পাইনি—"

"নাও, তুমি জ্বালালে, দেখ্‌চি—"

কথাটা আমার মনে যেন ছুরির ফলার মত বিঁধল। আমার মনে কি যে হচ্ছিল তখন,—তিনি সেটা এত তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে চান কেন? আমার মন ত এটাকে এতটুকু তুচ্ছ বলতে চায় না! বুড়ী, বুড়ী—ওগো, সে যে আমার মার পেটের বোন্‌!

আমার দুঃখ হল ভারী। আমি বললুম, "তুমি রাগ করোনা—"

"না, রাগ কিসের! তবে আজকের রাত্রিটা তুমি মাটী করে দিলে, দেখচি। মজার রোমান্সটা ছিল। ভেবেছিলুম—" বলে তিনি টেবিলের ধারে গিয়ে একটা বই তুলে নিয়ে তার পাতা উল্টোতে লাগলেন। আমি বিছানার উপর কাঠের পুতুলের মত বসে রইলুম।

... ...

পরের দিনও কোন চিঠি এল না। দিদিকে বললুম, "কি হবে ভাই?" দিদি শাশুড়ীকে গিয়ে খবর দিলে। শাশুড়ী বললেন, "হ্যাঁ অনু, বুড়ীর অসুখ, তা আমাকে বলনি কেন মা এ কথা? আমি ত জানিনা কিছুই। সুনীলকে পাঠাই একবার—"

... ...

রাত্রে তিনি বললেন, "আমি আজ গেছলুম গো তোমাদের ওখানে। বুড়ীর জ্বর এখনো আছে, তবে ভাবনার কারণ নেই।"

মন আমার গলে গেল। এ কি কৃতজ্ঞতা? কি জানি!

ইচ্ছা হল, ওঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ি। যদি কিছু বলেন?

আমি বললুম, "মাকে তুমি চিঠি দিতে বলে এসেছ?"

"চিঠি আবার কি দিতে বলব! আমি নিজে গিয়ে দেখে এলুম, এমন কিছু নয়—তবু তোমার বিশ্বাস হয় না?"

আমি চমকে উঠলুম। এতে রাগ করছেন কেন? অসুখের খপর নিয়েছি মাত্র! এতে—

তিনি বললেন, "তোমার বাবা বললেন, খবর পাঠাবেন।"

আমার মন অস্থির হয়ে উঠছিল। আমি বললুম, "আমায় একবার নিয়ে যাবে কাল? আমি দেখেই চলে আসব'খন।"

তিনি মুখটা একটু গম্ভীর করে বললেন, "কাল আমার সময় হবে না—কাল এক বন্ধুর বাড়ী পার্টি আছে আমাদের—"

সে রাত্রে তাঁর মেজাজটা দেখলুম, একটু চটা—আমি আশ্চর্য্য হলুম। ভয়ও হল একটু। রাত্রে দেবতাদের ডেকে বুড়ীর কুশল মেগে বিছানায় চুপ করে পড়ে রইলুম। আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগার মধ্যে দিয়ে রাত্রিটা কেটে গেল। তিনি একটা কথাও কইলেন না—আশা কি সান্ত্বনার একটা কথাও না!

* * *

তার দুদিন পরের কথা। বেলা নটা। পাণ সেজে বড়ঠাকুরের ঘরে ডিবে রেখে বেরিয়ে আসছি, সিঁড়ির পাশে তাঁর গলা শুনলুম। শাশুড়ী বকছিলেন,—শাশুড়ী বলছিলেন, "বোনের অসুখটা খারাপ; টাইফয়েড। ওর বাপ অত করে বলেচে, একবার ওকে পাঠাতে। মেয়েটি দিদিকে দেখতে চাইছে বড্ড—আহা, তা একবারটি গিয়ে রেখে আসতে পারবে না?"

তিনি বললেন, "পাঠাতে হয় আর কারো সঙ্গে পাঠাও না! আমার সময় হবে না আজ।"

শাশুড়ী বললেন, "তোরও একটা কর্ত্তব্য আছে ত! দেখে আসা উচিত নয়?"

"আমি পারব না।" কি ঝাঁজ সে

আওয়াজে। আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। দরজা ধরে আমি সেইখানেই বসে পড়লুম।

একটু পরে দিদির মুখে শুনলুম, বড় ঠাকুর গেছলেন বুড়ীকে দেখতে—তিনিই খবর এনেছেন, বুড়ীর অসুখ শক্ত, টাইফয়েড।

আমি কেঁদে ফেললুম, তবে কি হবে? "বুড়া কি বাঁচবে না, দিদি?"

দিদি বললে, "পাগলের মত কাঁদিস্‌নে। টাইফয়েড কি হয়না কারো, না, হলে সারে না? হাজার-হাজার লোক সেরে উঠছে। তবে অসুখটা শক্ত। সাবধান হওয়া দরকার।"

আমি বললুম, "আমি ভাই যাব, দিদি। আমার মন বড্ড অস্থির হয়েছে—"

দিদি বললে, "মা ত ঠাকুরপোরে ভাই বলছিলেন—তা বাবুর সময় হবেনা নিয়ে যাবার। এমনি পুরুষ জাত। স্ত্রীর চন্দ্রমুখ না দেখলে এদিকে মূর্চ্ছা যান—শুধু ওঁদের মন জোগাও। স্ত্রীর যে একটা সুখ-দুঃখ আছে, তার পানে ফিরেও তাকান্ না। দুনিয়ায় যেন স্ত্রীর আর কেউ কোথাও নেই। ওরাই সব মা-বাপ, ভাই-বোন, এরা সব বাণের জলে ভেসে যাক্।"

আমি বললুম, "কি হবে ভাই, তবে? কি করে যাওয়া হবে?"

"ঠাকুরপোর মত নেই, দেখচি।"

"তবে?" আমার চোখ দিয়ে ঝর ঝর্ করে জল ঝরে পড়ল। ওরে আমার বুড়ী, ওরে বোন্‌টি আমার, সোনা আমার।

দিদি বললে, "ইনি রেখে আসবেন'খন। মা এখনি পাঠিয়ে দেবেন, বলেছেন। তোমার ভাসুর বলেছেন, রেখে আসবেন। এখন আয়, কিছু খেয়ে নিবি, আয়। উনি খেতে গেছেন। খেয়ে আফিস যাবার মুখে তোকে পৌঁছে দেবেন, বললেন।"

আমি বললুম, "না ভাই, আমি কিছু খেতে পারবো না এখন। আমার একটুও খিদে নেই।" খাওয়া কি যায়, না, তখন খাবার সময়। কিন্তু দিদি ছাড়বে না—কিছুতেই না।

দিদি বললে, "পাগলামি করিস নে, আয়, কিছু না খেলে তোর যাওয়া হবেনা—"

দিদি আমায় নীচেয় নিয়ে এল। শাশুড়ী বললেন, "তুমি কিছু খেয়ে নাও মা—তোমার বোনের অসুখ তোমার ভাসুর তোমায় সেখানে রেখে আসবেন, এখনি। পাঠিয়েই ত, বোনের অমন অসুখ, যাবে না?"

আমি একেবারে গলে গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়লুম। কান্না চাপতে পারলুম না। তিনি বললেন, "ছি, কাঁদে না। আপনার জনের অসুখ করলে কাঁদতে নেই, তাতে অকল্যাণ হয়। ভগবানকে ডাকো মা, তিনি সারিয়ে দেবেন বৈ কি।"

আমি শিউরে উঠলুম—ঠিক, কাঁদলে অকল্যাণ হয়। এ কথা মাও কতবার বলেছে যে।

কিছু খেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে গেলুম, কাপড়টা বদলাতে। দেখি, তিনি বিছানায় চুপ করে শুয়ে আছেন। আমি একেবারে তাঁর দুই পায়ে মাথা রেখে বললুম, "লক্ষ্মীটি, তুমি রাগ করোনা,—বুড়া সেরে উঠলেই আমি চলে আসব। মা যেতে বলেছেন। যাব আমি?"

তিনি স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে

চেয়ে রইলেন। আমি বললুম, "লক্ষ্মীটি, অনুমতি দাও—"

তবুও তিনি স্থির,—পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির।

"দেবেনা অনুমতি?" আমার হাত্-পা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল, মাথা ঘুরতে লাগল—চারিদিক অন্ধকার দেখলুম। উঃ, বুক ভেঙ্গে যায় যে! মাগো—

বাইরে থেকে বড়ঠাকুর ডাকলেন, "শীগ্গির এসো, বৌমা! গাড়ী এসেছে, আমার নাহলে দেরী হয়ে যাবে, মা—"

সময় নেই, ওগো, সময় নেই!

আবার বললুম, "দেবে না অনুমতি?" তবুও কোন জবাব নেই—তেমনি পাথরের মতই দৃষ্টি!

ওগো দেবতা, আমার দেবতা, তুমি কেন আজ এমন নিষ্ঠুর হলে! তোমার এ মূর্ত্তি ত কখনো দেখিনি! তবে, তবে—?

আমি আবার বললুম, "আমার মন বড্ড খারাপ হয়েছে। তুমি রাগ করোনা, লক্ষ্মীটি। আমি সখ করে ত যাচ্ছিনা। বুড়ীর বড্ড অসুখ, তাই—"

তিনি বললেন, "বেশ ত, যাও না—বাড়ী থেকে অনুমতি পেয়েছ ত!" আমি তাঁর পাদুটি বুকের উপর তুলে নিতে যাচ্ছিলুম—হল না। দিদি হঠাৎ এসে বললে, "করছিস্ কি, অনু? আয়, আয়, তোর ভাসুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেরী হয়ে যাচ্ছে যে—"

না, আর দাঁড়ানো চলে না। বেরিয়ে এলুম।

ওগো দেবতা, পাষাণ দেবতা, আমায় মার্জ্জনা কর।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দিদি বললে, "ঠাকুরপোর রাগ হয়েছে! তার জন্যে ভাবিসনে। ফিরে এসে বোঝাপড়া করিস্ তার! ও রাগ কতক্ষণ! আর এ যে অন্যায় রাগ, তাও বলি।"

গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম। গাড়ী চলল। আমি সমস্ত কায়-মন ঢেলে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলুম। হে ঠাকুর, গিয়ে যেন দেখতে পাই, আমার বুড়ীকে যেন দেখতে পাই! ভালো করে দাও ঠাকুর, তাকে ভালো করে দাও!

মনের মধ্যে তখন আর কোন চিন্তা, কিছুর চিন্তা ছিল না—শুধু ডাকছিলুম, ঠাকুর, হে ঠাকুর, আমার বুড়ী—! তাকে ভালো করে দাও ঠাকুর!

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল-মহাশয় আর ইহলোকে নাই! গেল ৪ঠা আষাঢ় বৃহস্পতিবারে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মরণ-কালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় উন-ষাট বৎসর।

কলিকাতার চোরবাগানে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে তিনি সুবর্ণ-বণিক ছিলেন। আঠারো বৎসর বয়স হইতেই তাঁহার কাব্য-চর্চ্চার সূত্রপাত। 'বঙ্গদর্শনে', তাঁহার প্রথম উল্লেখযোগ্য

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সে-যুগের নবীন কবিরা আসিয়া পথিক হইয়াছিলেন, অক্ষয়কুমারও তখন সেই দলে যোগ দিয়া নব্য-বঙ্গের কাব্য লোকে নব-প্রভাতের সূচনা সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমারের রচনায় গুরুর প্রভাব যত বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিহারীলালের আর-কোন শিষ্যের লেখায় ততটা দেখা যায় না। এমন-কি, অক্ষয় কুমারের কবিতায় এবং পর্য্যন্ত শব্দে, ছন্দে, ভাষায় 'সারদা-মঙ্গলে'র প্রতিধ্বনি নানা স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গীতকবিতার জানা শোনা সাধা সুর ছাড়িয়া, আর সকলে যখন নিত্যনূতন রাগ-রাগিণীর বৈচি... লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত, অক্ষয়কুমার তখনো তাঁহা সেই গুরু-মন্ত্রের মত পুরাণো পরিচিত সুরের সাধনা লইয়াই তন্ময় হইয়া ছিলেন। অতীতের সেই উপভোগ্য পুরাণো সুরে এমন একটু মধুর রস ও সরল-শ্রী ছিল, একালকার অধিক-উন্নত কাব্যের মধ্যেও প্রায়ই যাহার অভাব মনে মনে অনুভব করা যায়। কিন্তু, অতি-বড় নিন্দুকের পক্ষেও, অক্ষয় কুমারের কবিতা পড়িবার সময়ে এমন অভিযোগ করিবার সুযোগ কোনমতেই ঘটিয়া উঠিবে না। কারদানি দেখাইবার জন্য ভাবকে তিনি কখনো সৃষ্টিছাড়া

কবিতা বাহির হয়। তাহার নাম 'রজনীর মৃত্যু'।

কিন্তু বাঙলার রসিক-সমাজের সঙ্গে বিশেষ-করিয়া অক্ষয়কুমারের পরিচয় সাধন হয় 'ভারতী'র কাব্যকুঞ্জে। উঠতি বয়সে তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইত। পর-জীবনে 'সাহিত্য' ও 'নব্য-ভারতে'ই তাঁহার বেশীরভাগ কবিতা বাহির হইয়াছিল।

তাঁহার সাহিত্য-গুরু ছিলেন ভাবুক কবি স্বর্গীয় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। বিহারীলালের প্রদর্শিত পথে যখন রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ সেন,

ছন্দের মুখোস পরাইয়া দেন নাই, বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য তিনি কখনো গম্ভীর রসের প্রগাঢ়তাকে চপল ও বাচাল ছন্দের চটুলতায় হাল্‌কা করিয়া তুলেন নাই, কেতাবী ভক্তি দেখাইবার জন্য তিনি কখনো যথার্থ ভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ করিয়া, অন্যান্য অনেক কবির মত একালের কৃত্রিম আধ্যাত্মিকতায় আচ্ছন্ন হন নাই। এই-সব নানা কারণে তাঁহার কবিতা পড়িবার সময়ে কেমন-একটা মুক্তির আভাসে আমাদের হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে! অক্ষয়কুমার আজ পরলোকে—তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে পুরণো-দিন-কার বাংলা গীতি-কবিতার প্রীতিময়ী জীবন্ত স্মৃতটুকুও নিঃশেষে মরিয়া গিয়াছে!

অক্ষয়কুমারের প্রথম কবিতা-পুস্তক 'ভুল' এখন আর পাওয়া যায় না। 'ভুলে'র পর তাঁহার 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়। তারপর কিছুদিন নীরব থাকিয়া, প্রাচীন বয়সে আবার তিনি নূতন উৎসাহে সাহিত্য-চর্চ্চায় নিযুক্ত হন। অবশ্য, ইতিমধ্যে 'সাহিত্য' ও 'নব্যভারতে' মাঝে মাঝে তাঁহার দু-একটি কবিতা বাহির হইত। এইসকল কবিতার সঙ্গে কতকগুলি নূতন কবিতা লিখিয়া একত্রে তিনি 'শঙ্খ' নামে কাব্য-পুস্তক প্রকাশ করেন। পরলোকগতা সহধর্ম্মিনীর স্মৃতির উদ্দেশে তিনি যে কবিতাগুলি লিখিয়া অনেকদিন অপ্রকাশিত রাখিয়াছিলেন, তাঁহার "এষা" নামক কাব্য-গ্রন্থে তাহা স্থান পাইয়াছে। তাঁহার কতকগুলি কবিতা এখনো বাহির হয় নাই—সেগুলি মাসিকপত্রের পৃষ্ঠাতেই ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া আছে।

অক্ষয়কুমার খুব-বেশী লেখা রাখিয়া যান নাই। তাঁহার ভাণ্ডার ছোট—তাহাতে বাজে জিনিষও কম। বিদেশী জিনিষ তিনি কতটা স্বদেশী করিয়া লইতে পারিতেন, তাঁহার 'ওমর খৈয়মে'র অনুবাদই তাহার প্রমাণ। ওমর খৈয়মের বাঙ্‌লা অনুবাদ অনেকেই করিয়াছেন, কিন্তু অক্ষয়কুমারের অনুবাদই এ-বিভাগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি "চণ্ডীদাস" নামে একখানি নাটক-রচনায় হাত দিয়াছিলেন। চার অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিয়া নাটকখানি অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দরিদ্র বঙ্গসাহিত্য যে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা আর লিখিয়া বলিবার নহে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য

জগন্নাথ-মন্দির দুইটি বিভিন্ন এক-কেন্দ্রিক আয়ত প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত ("deux encientes rectangulaires concentriques")। ইহার মধ্যে একটি প্রাচীর "মেঘনাদ" নামে অভিহিত। ডাঃ লে বঁ স্বীয় গ্রন্থে বহিঃ-প্রাচীরটির যে পরিমাপ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, (p. 73) যে বহিঃ-প্রাচীরটির উচ্চতা ৬

মিটার, দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার ও প্রস্থ ১৮০ মিটার। (১) ইহার উপরিভাগে battle-ment বা খাঁজ-বিশিষ্ট অংশ দেখা যায়। অন্তর্বেষ্টনের প্রাচীর ফাঁপা। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মিত্র প্রণীত পুরীতীর্থ গ্রন্থে মন্দিরের মানচিত্রে (contra p 58) অন্তর্বেষ্টনের ফাঁপা প্রাচীরটি দেখানো হইয়াছে। শ্রীরঙ্গম ও মাদুরার মন্দির প্রভৃতিও এইরূপ বিভিন্ন প্রাকারে বেষ্টিত; সেইজন্য কেহ কেহ এই বেষ্টনীদ্বয়কে দ্রাবিড় প্রণালীর নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। চারিদিকে চারিটি প্রবেশ-দ্বারের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—পূর্ব্বদিকে সিংহ-দ্বার, দক্ষিণে অশ্ব-দ্বার, উত্তরে হস্তী-দ্বার, পশ্চিমস্থ অবশিষ্ট দ্বারটির নাম খাঞ্জাদ্বার। অশ্বদ্বারে অশ্ব নাই, বাহিরদেশে রহিয়াছে শুধু প্রকাণ্ড এক হনুমানের মূর্ত্তি, পবন-নন্দন যোদ্ধৃবেশে নাকি এ মন্দিরকে সমুদ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দণ্ডায়মান! হস্তীদ্বারের পাঁচফিট উচ্চ হস্তীদুইটি দ্বারদেশ হইতে অপসারিত হইয়া প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছে। (২) উত্তর দ্বারে চামচিকা, আরশুলা প্রভৃতির এতই প্রাদুর্ভাব যে সেদিকে কেহই অগ্রসর হয় না।

রোমান-কাথলিক সম্প্রদায়ের জন্য প্রকাশিত (published by Washbourne Limited) ইংরাজী বাইবেল গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় (app. 16) সলোমন-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের যে নক্সা (plan) দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও দুইটি প্রাঙ্গণ এবং দুইটি আয়ত প্রাচীর-বেষ্টনী দেখা যায়। একটি প্রাঙ্গণের নাম court of Israelite, অপরটির নাম, court of Gentiles। এ মন্দিরেরও চারিটি দ্বার; একটির নাম উত্তরদ্বার (North gate), এবং অপর তিনটির নাম যথাক্রমে Susan gate, Cattle gate ও Parbar gate। বহির্বেষ্টনীতে Cattle gate এর সম্মুখেই Olda gate। ইহা ত গেল এসিয়ার পূর্ব্ব-সীমান্তের ইহুদী মন্দিরের কথা। কিন্তু নব-প্রকাশিত আর্য্য শাসনের ইতিহাস নামক ভারতবর্ষের ইতিহাস-গ্রন্থে (pp. 243-244) শ্রীযুক্ত হেভেল সাহেব লিখিয়াছেন যে, ভারতীয় মন্দির ও প্রাকারাদির আদর্শ ভারতীয় আর্য্যদিগের গ্রামের আদর্শ হইতেই গৃহীত।

শ্রীযুক্ত হেভেল মহোদয় এ সেমিটিক আদর্শের উল্লেখ করেন নাই। আবার এদিকে কাঞ্চী, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম, রামেশ্বরম্ প্রভৃতি স্থানে অবলম্বিত দ্রাবিড়ী প্রথা প্রাকার-যুক্ত মন্দির-নির্ম্মাণের প্রণালী যে প্রাচীন যুগে শ্যাম কাম্বোজ প্রভৃতি স্থানেও এক সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য বলিয়া মনে হয়। হেভেল মহাশয়ের মতে চারিদিকের চারিটি 'গেট' (দক্ষিণী ভাষায় গোপুরম্) আর্য্যদিগের সুরক্ষিত গ্রাম-দুর্গে গোমহিষাদি সংরক্ষণ-স্থানের অনুকরণে নির্ম্মিত। তবে ধর্ম্মমন্দিরের বেলায় 'গো' শব্দ সমগ্র চতুষ্পদ

(১) ১ মিটার=১ গজ ৩. ৩৭০৮ ইঞ্চের সমান। অপর একজন লেখক বলিয়াছেন, বহিঃ-প্রাচীর দৈর্ঘ্যে ৬৬৫ ফিট, প্রস্থে ৬৪০ ফিট এবং উচ্চতায় ২০ হইতে ২৪ ফিটের মধ্যে।

(২) শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কৃত 'সেতুবন্ধ যাত্রা'; পৃঃ ৫৬।

বিশেষত্ব ছিল, সে সমস্তই মন্দির-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদির মধ্যে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি মন্দিরাদির জন্য মন্দির-প্রাঙ্গণে পুষ্করিণী ও বহিঃপ্রাচীর সংলগ্ন বাজার ও পান্থশালা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। এক কথায় নগর কিম্বা জনপদ বিষয়ক যাহা কিছু মঙ্গলকর ব্যবস্থা আর্য্য সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা মন্দিরাদির নির্ম্মাণ-পদ্ধতিতে আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তনের সহিত সর্ব্বত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (History of Aryan rule in India p. 241)

শ্রীমন্দির—পূর্ব

অগেই ব্যবহৃত হইত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিমান-মধ্যস্থ "মণিকোঠা"-চতুষ্পথে অবস্থিত, রাজ-প্রাসাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। রাজপথ ও ভ্রমণপথ যথাক্রমে প্রদক্ষিণপথ ও 'মঙ্গলবীথিতে (mangali vithi) পরিণত হইয়াছে, আর গ্রাম্য সভামণ্ডপের সংস্থান-স্মরণে মন্দিরের "মণ্ডপ" নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধু-সন্ন্যাসীগণ যে-সকল উদ্যান বা বৃক্ষপরিবেষ্টিত আশ্রম-কুঞ্জে বাস করিতেন, বোধ হয়, তাহারই অনুকল্পে দাক্ষিণাত্যের কোন-কোন মন্দিরে সহস্র স্তম্ভ-শোভিত দর দালানগুলির উদ্ভব হইয়া থাকিবে।

হেভেল সাহেব বলেন, আর্য্যদিগের সুনিয়ন্ত্রিত সামাজিক জীবনে যাহা-কিছু

কোনও মাদ্রাজী বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে দাক্ষিণাত্যে পল্লী-সভামণ্ডপ অদ্যাপি গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত দেখা যায়। শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয়ের মতবাদ কল্পনা পরিপুষ্ট হইলেও ইহাতে কি পরিমাণ সত্য নিহিত আছে, তাহা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় দ্রাবিড় গোপুরমের সহিত জগন্নাথের 'অংশরূপিণ্ড' ও ভোগমণ্ডপের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলের ন্যায় অগ্রভাগাবশিষ্ট মাদুরার বিখ্যাত গোপুরমের চিত্র দর্শন করিলে এ সাদৃশ্য কতকাংশে কাল্পনিক বলিয়াই বিবেচিত হইবে বরং তাঞ্জোরের বিমানটি কতক পিরা

মাদুরা—গোপুরম্

নির্ম্মাণ-দিক দিয়া দেখিলে ভোগমণ্ডপ প্রভৃতির প্রণালী উৎকলের মৌলিক আদর্শমূলক বলিয়া কতদূর বিবেচনা করা যাইতে পারে, তাহা বিশেষজ্ঞ স্থাপত্যবিদ্গণ বিচার করিবেন।

ভোগমণ্ডপের আদর্শ যাহা হইতেই উদ্ভূত হউক, উহা বিমানাংশের উদ্ভব-বিষয়কগবেষণার ন্যায় দেশ, কাল অতিক্রম করিয়া আদিম সভ্যতার কুহেলিকাচ্ছন্ন যুগে পদার্পণ করিতে সমর্থ হয় নাই। উৎকল মন্দিরের রেখা বা বিমান যে উত্তরাপথের মন্দিরনির্ম্মাণ-প্রণালীর সহিত সংশ্লিষ্ট, এ-কথা দেশী বিদেশী সকল সমালোচকই স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী বেহার ও উড়িষ্যার প্রত্নানুসন্ধান বিষয়ক সমিতির পত্রিকায় (J. B. O. R. S.) অধ্যক্ষ ডাঃ স্পুনার (Dr. Spooner) মহাশয়ও মন্দির-স্থাপত্যে ত্রিহুত আদর্শের (Tirhoot type) উল্লেখ-প্রসঙ্গে এরূপ সুদূরঅতীতের যবনিকা উদ্ঘাটন করেন নাই। কাশী অঞ্চলের কর্দ্দমেশ্বর প্রভৃতি মুসলমান যুগে নির্ম্মিত উত্তরাপথ প্রণালীর মন্দিরের কথা না হয় নাই ধরিলাম। ‘শিখর’ বা বিমানের শিরোদেশে অবস্থিত আমলকি ফলের ন্যায় পলবিশিষ্ট শিলা, গয়ার মহা বোধি মন্দিরে এবং সাঞ্চীর আনুমানিক দশম শতাব্দীর বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখে ও শিরোদেশে দেখা

মিডাকৃতি; (৩) তবে রক্ষিত মহাশয় এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে “অধিক প্রসারযুক্ত আমলা শীলা” ও “পিরামিডযুক্ত” মণ্ডপই ওড্র দেউলের বিশেষত্ব। ভোগ-মণ্ডপের ছাদ দেখিয়া মনে হয় যেন “ভিতের” উপর চারিখানি চাল পর্য্যায়-ক্রমে স্তরে স্তরে সংন্যস্ত হওয়ায় ক্রমে তাহা সরু হইয়া চূড়ার নিকট গিয়া মিশিয়াছে। “পুরীর চিঠি” গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী মহাশয়ও এ সাদৃশ্যটি লক্ষ্য করিয়াছেন। পর্ণশালা হইতে যে মন্দিরাদির উদ্ভব, ইহা কিছু নূতন কথা নহে। আমাদের বঙ্গদেশীয় শিব-মন্দির এই আদর্শ হইতেই উদ্ভাবিত; সুতরাং সে

(৩) মাদুরার গোপুরম্ সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং তাঞ্জোরের বিমান একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত।

গিয়াছে। (৪) ইহার মধ্যে বোধগয়া মন্দিরের সংলগ্ন আমলক অলঙ্কারটিই প্রাচীনতম। ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। মহারাজ প্রিয়-দর্শী বা অশোকের সাম্রাজ্য-জ্ঞাপক প্রস্তর-স্তম্ভেও আমলক চিহ্নের ন্যায় অলঙ্কার দৃষ্ট হয়।

তাঞ্জোরের বিমান

শিখর বা মন্দিরের বিমান শুনিতে পাই নাকি বিষ্ণুর পবিত্র নিকেতন মেরু পর্ব্বতের নিদর্শন, আর আমলক পদ্ম বা পদ্মবীজের প্রতিরূপ মাত্র। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সাঙ্কেতিক চিহ্ন নীল-পদ্মের (nymphoea cerulea) পরিবর্ত্তে পদ্মবীজই না কি স্থপতিগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইত। জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরেও শিখরাংশ লক্ষিত হইয়া থাকে কিন্তু গুপ্তযুগে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতেও ইহা বিশেষভাবে স্থান লাভ করিয়াছিল। গুপ্তযুগে সমতল ছাদ-বিশিষ্ট মন্দিরও নির্ম্মিত হইত। (V. Smith in Imp Gazeteer vol. II p. 122) শিখর না থাকিলেই যে দেব-সৌধের সৌন্দর্য্য-হানি ঘটে, এরূপ নহে। কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড-মন্দির ঢালু ছাদবিশিষ্ট ছিল বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে এবং পশ্চিম ভারতে শিখর-বিহীন গুজরাটের অন্তর্গত মুধেরার বিখ্যাত সূর্য্য-মন্দির ভারতীয় স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া বিশেষজ্ঞগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয় অনুমান করেন, বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুদিগের মধ্যে "শিখর"-নির্ম্মাণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রামের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত না হইয়া উহা রাজপথের পশ্চিম পার্শ্বে অধিষ্ঠাতৃ দেবতার মন্দিরের উপর নির্ম্মিত হইত। তাঁহার মতে ইউফ্রেতিস উপত্যকায় সূর্য্যোপাসক আর্য্য ও দস্যুদিগের
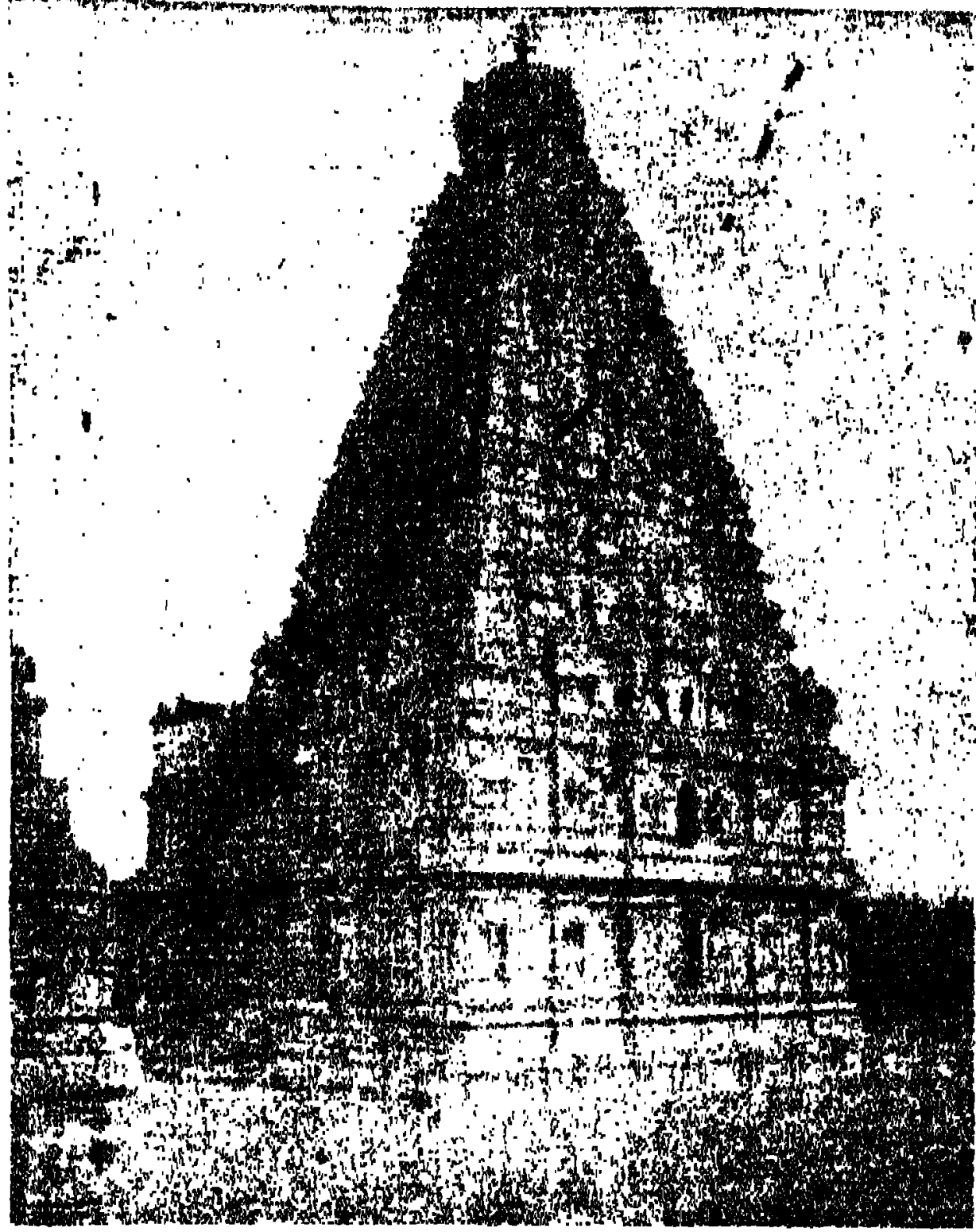
(৪) ...spire of the usual curvilinear type distinguishing Hindu temple of northern style summit crowned with massive *amalaka* and *Kalasa*......

The exterior was relieved on its four faces by repetitions of thesame *amalaka* motive alternaing with stylised Chaitya desidno Sir J. Marshall's Guide to Sanchi (p. 127.)

মধ্যে যখন বিবাদ চলিতেছিল, তখন হইতেই এই শিখরের উদ্ভব। এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে এখনও, এ মত বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত এইচ্‌ আর্‌, হল্‌, সাহেব বলিয়াছেন, প্রাচীন বাবিরুষবাসীদিগের সহিত দ্রবিড় জাতিরই সম্বন্ধ অধিক। (৫) তাঁহার মতে আর্য্য বা সেমেটিক জাতির সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। খৃঃ পূঃ ২৭০০ অব্দে ইউফ্রেতিস (Euphrates) উপত্যকায় নারামসিন (Naram—Sin) নামে এক পরাক্রান্ত নরপতি রাজত্ব করিতেন। (Havell's History p. 112) তাঁহার রাজত্বকালের একখানি চিত্রযুক্ত মৃৎফলক(stile) পাওয়া গিয়াছে। (৬) শ্রীযুক্ত হল (H. R. Hall) মহাশয় ইহার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ইহা সাতুনী নামক কোন বিপক্ষ-পক্ষীয় নরপতির পরাভবের চিত্র। ইহাতে নারামসিনের প্রতিদ্বন্দ্বীর যে দুর্গ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা বক্ররেখাযুক্ত (conical)—দেখিলেই শিখরের সহিত সাদৃশ্যের কথা মনে পড়ে। এমন কি, শিরোদেশে আমলকের ন্যায় চিহ্নটিও বাদ পড়ে নাই। (Ibid p. 113). শ্রীযুক্ত লেয়ার্ড প্রাচীন
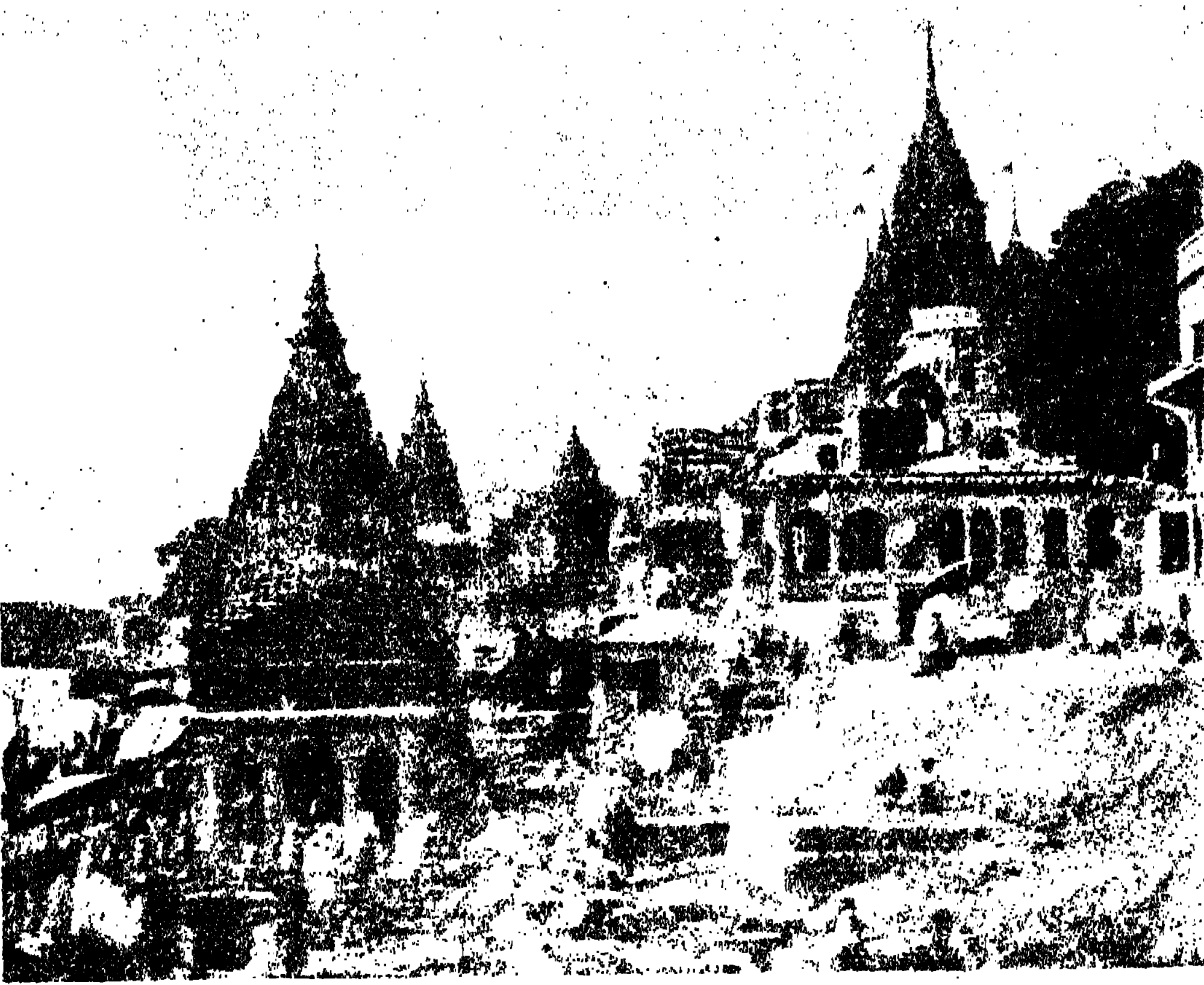
কাশীর মন্দির

(৫) H. R. Hall's Ancient History of the Near East pp. 171—174 quoted by Mr. Havell.

(৬) ভারতে প্রাচীন বাবিরুষের একটি প্রস্তর ফলক ব্যতীত অপর কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই; ইহা এক্ষণে নাগপুর মিউজিয়মে রক্ষিত। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পৃঃ ২০—২২।

।নেভে নগরীর (Nineveh) পুরাকীর্তির যে বর্ণনা করিয়াছেন, (Nineveh and Series pt XVI—quoted by Havell) তাহাতে শিখর ও স্তূপাকৃতি দুই শ্রেণী হর্ম্যেরই প্রতিরূপ দেখা যায়। হেভেল সাহেব শিখরের পুরাকালীন ব্যবহার প্রসঙ্গে স্থিরমত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। একবার বলিয়াছেন, উহা শৈল পৃষ্ঠে নির্মিত তোরণ-সদৃশ চৌকি দেওয়ার বুরুজ (watch-tower), আবার বলিয়াছেন, যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাজকীয় রথের বংশ নির্মিত চূড়া হইতেই ইহার উদ্ভব। অন্য রথ হইতে রাজার রথ চিনিয়া লইবার জন্য এবং শরীর-রক্ষা ও তীরন্দাজগণের ব্যবহারার্থে নির্মিত শিখরাকৃতি রথোপরি বংশ-রচিত মঞ্চসকল সংস্থাপিত হইত। মন্দিরের শিখরধ্বজ ও রথ-যাত্রার রথের উপরিস্থিত বংশ রচিত আবরণের যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে, তাহা সাধারণ লোকও লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। আধুনিক পাশ্চাত্য স্থপতিদিগের মতও এইরূপ (৭) শিখরের আদর্শ-সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্ত সত্য না হইলে সৌধ রচনায় প্রস্তরের ব্যবহারের উপরেও বাষ্ট ও বংশ রচিত 'বিমানে'র অনুরূপ এই সকল মন্দির নির্মিত হইবে কেন? মণ্ডপের ভিত্তির চারিপার্শ্বে কোন কোন মন্দিরে—যে চক্রসকল খোদিত দেখা যায়—তাহা অপেক্ষা রথ-আদর্শের পোষকতার আর অধিক কি সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রয়োজন হইতে পারে?

মহাবোধি মন্দির

উত্তরাপথ ও দ্রাবিড়ের সহিত উৎকলের স্থাপত্য-সম্বন্ধ নির্ণয় এবং এই দুই দেশী প্রভাবের যুগ-কালের বিচার সহজে মীমাংসিত হইবার নয়। দ্রাবিড়ের গোপুরম্ বিমান অপেক্ষা যেন শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। সেগুলি কতকটা পিরামিডাকৃতি ও প্রায়ই বহুতল (storey) বিশিষ্ট। শিখর পিরামিড প্রভৃতি ও বহু 'তলা' (storey) বিমানের উদ্ধদেশে কখনও

(৭) নারায়ণ, কার্ত্তিক ১৩২২, মদ্রাচিত "ভুবনেশ্বর" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
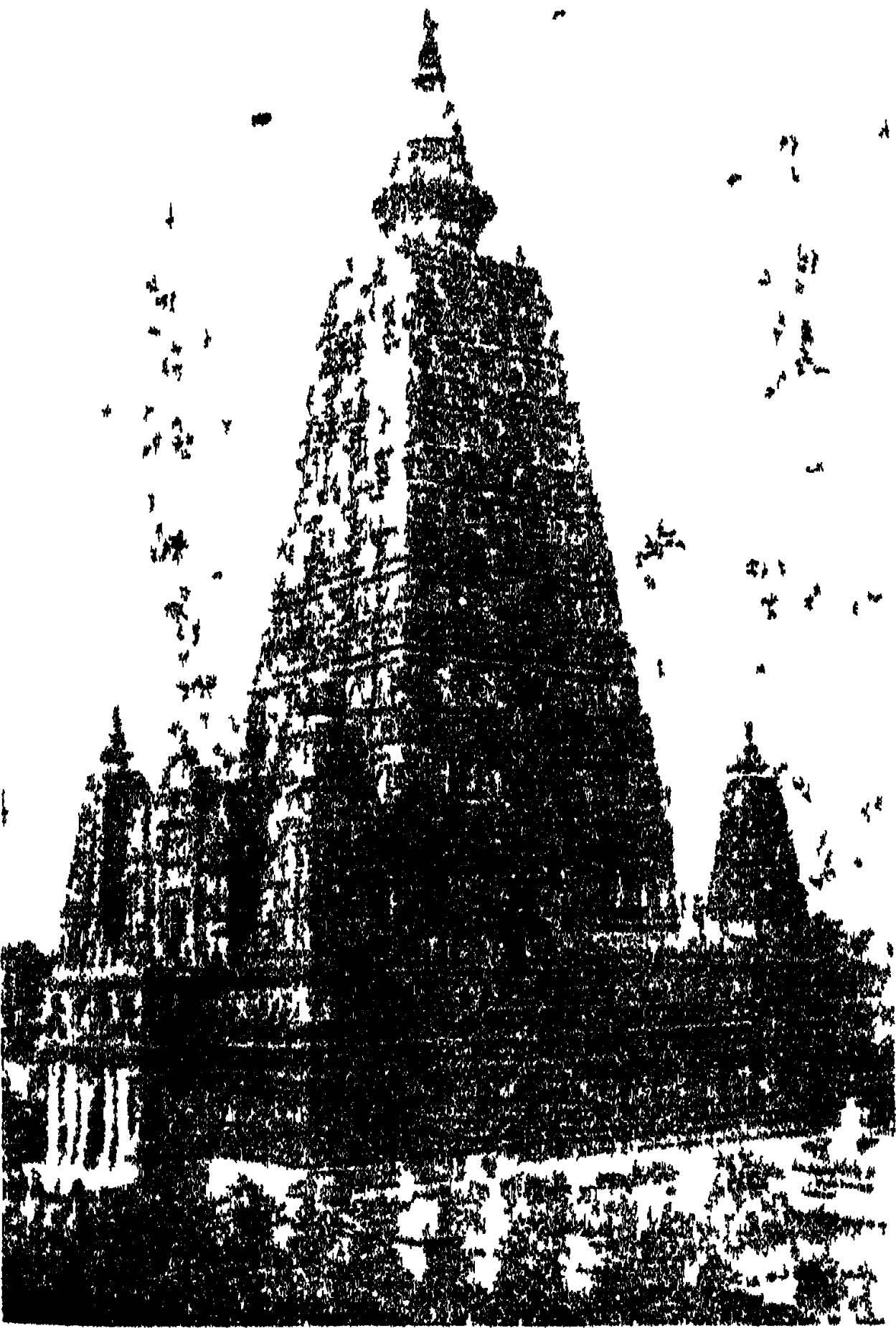
কখনও গোলাকৃতি গম্বুজ ও বহু কোন বিশিষ্ট (polygonal) দেখা যায়। বিজাপুর প্রদেশে ঐহোল নামক স্থানের বিখ্যাত মন্দিরাদি হইতে ছয় মাইল দূরে পট্টদকল (Pattadakal) গ্রামে বিরূপাক্ষের মন্দিরের নিকট একটি মন্দির আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, উহা যেন উড়িষ্যাদেশ হইতে হুবহু তুলিয়া লইয়া গিয়া বসান হইয়াছে। বিরূপাক্ষ মন্দিরটি খাঁটি দ্রাবিড় প্রণালীতে নির্ম্মিত। ইহার নির্ম্মাণ-কাল অনুমান ৭০০ খৃঃ অব্দ। (Imp. Gazet. Vol II p. 175) কিন্তু উহার নিকটবর্ত্তী পাপনাথ মন্দিরে দ্রাবিড় ও উত্তরাপথ উভয় প্রকার স্থাপত্য-প্রথার অপূর্ব্ব সংমিশ্রন দৃষ্ট হয়।

বুন্দেলখণ্ডে ৯০০-১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত খাজুরাহোর মন্দিরগুলি উত্তরাপথের স্থাপত্য-প্রণালীর নিদর্শন রূপে পরিগণিত হইলেও উড়িষ্যার দেউলের সহিত বিশেষ নিকট-সম্পর্কিত বলিয়া মনে হয়। খাজুরাহোর বামন মন্দিরের চিত্র হঠাৎ দেখিলে উড়িয়া মন্দিরের প্রতিরূপ বলিয়াই বোধ হয়। ছত্র-কা-পত্র নামে আর একটি মন্দির দেখিয়া বোধ হয় যেন উড়িষ্যার মন্দির নির্ম্মাণ-প্রণালীর অনুকরণে নবরত্ন মন্দিরের ন্যায় একটি অভিনব মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আর এক কথা ; উড়িষ্যার ন্যায় খাজুরাহোর মন্দিরেও বহু স্থানে কাম-লীলার বহু চিত্র দেখা যায়।"

মন্দিরাদির আকৃতি ও স্থান-বিন্যাসের ক্রম-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, সর্ব্বপ্রথমে শিখর ও তৎসম্মুখস্থ মণ্ডপটি মাত্র নির্ম্মিত হইত ; পরে মানবীয় ধর্ম্মারোপমূলক (anthropomorphic) উপাসনার ফলে অন্যান্য অংশ পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত

মুধেরার সূর্য্য-মন্দির

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শক্তিকে "খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা" (চণ্ডী প্রথম অধ্যায় ৭৬ শ্লোক) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু চক্রচিহ্ন শাক্ত মন্দিরে বড় অধিক দেখায় না। মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে লিখিত আছে (৪৫ অধ্যায় ১২৮ শ্লোক) যে শিব স্বয়ং চক্র নির্ম্মাণ করিয়া দৈত্য-নিধনার্থ বিষ্ণুকে উহা দান করিয়াছিলেন; সুতরাং কেবল বৈষ্ণব নহে, শাক্ত ও শৈব উভয় সম্প্রদায়ই এ চিহ্ন ইচ্ছা করিলে যে দাবী করিতে না পারেন, এমন নহে। শিবকেও চক্রী, শঙ্খশূলধারী প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত টি গোপীনাথ রাও ভারতীয় মূর্ত্তি-পরিচয় (Element of Indian Iconography) নামক গ্রন্থে ঐহোলে (Aihole) প্রাপ্ত বিষ্ণুর প্রস্তর-নির্ম্মিত যে অনন্ত যোগ-শয়ান মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, (Plate XXXIII Contn p 92) তাহাতেও চক্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়। ধারওয়ার জেলার অন্তর্গত ঐহোলের প্রাচীন বৈষ্ণব মন্দিরটি খৃষ্টীয় ৭০০ অব্দে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত। (Imp Gazetteer) সুতরাং আজ পর্য্যন্ত অন্ততঃ ১২০০ বৎসর যাবৎ চক্র যে বৈষ্ণব-চিহ্নরূপেই ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

জাতির আত্মবিশ্বাস

জাতির কথা আলোচনা করিতে বসিয়া, আমরা তাহার পারিপার্শ্বিকের কথাটাই বেশী করিয়া ভাবি। যে-সকল বাহিরের ঘটনা-পরম্পরা, তাহার উন্নতি বা অবনতির সহায়তা করে, ঐতিহাসিকের চোখে সেইগুলিই ধরা পড়ে। কিন্তু জাতিরও যে একটা "মন" বা "আত্মা" আছে, সে কথা আমরা তেমন ভাবি না। সমস্ত জাতীয় শক্তির পশ্চাতে যে সেই জিনিষটা কেন্দ্র-স্বরূপ রহিয়াছে, তাহার গুরুত্ব আমরা ভাল করিয়া উপলব্ধি করি না। জাতি শুধু লোক-সমষ্টি নহে। হাড় ও মাংসের সমষ্টিতে যেমন আসল মানুষের প্রতিষ্ঠা হয় না,—কেবল লোক-সমষ্টিতে তেমনই জাতির প্রতিষ্ঠা হয় না। তার জন্য চাই আরো-কিছু, মন বা আত্মা। আর এই জিনিষটাই সকলের পশ্চাতে অজ্ঞাতভাবে থাকিয়া জাতির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকে।

এই মন বা আত্মা হইতেই সকল জাতীয় প্রেরণার উদ্ভব। যাহাকে আমরা জাতীয় আদর্শ বলি—তাহাও এই আত্মারই বস্তু। যতক্ষণ না এই আত্মার বিকাশ হয়—ততক্ষণ সহস্র ঘটনা-পরম্পরার বা বাহ্য শক্তির সংঘাত জাতিকে জীবন দিতে পারে না। এই আত্মা যখন নবীন ও সতেজ থাকে তখনই জাতি উন্নতির পথে চলিতে থাকে আর এই আত্মা মলিন হইলেই তাহার অধোগতি আরম্ভ হয়।

রোম যখন তাহার গৌরব-জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল, তখন তাহার আত্মা এক বিরাট

শক্তিকে উপলব্ধি করিয়াছিল। আর এই শক্তির আগুন যখন নিবিয়া গেল—তখনই রোম-সাম্রাজ্য অঙ্গারে পরিণত হইল। বর্ব্বর জাতির আক্রমণ রোমের পতনের কারণ নয়। রোম আপনার কাছে আপনি পূর্ব্বে পরাজিত হইয়াছিল। ভারতের অধঃপতনের কারণ খুঁজিয়া আমরা মরিতেছি। কিন্তু আসল কারণ যে জায়গায় ঠিক সেই জায়গায় সব সময়ে হাত দিতেছি না। মোগল-পাঠান শক-হূণের প্রবল বন্যা ভারতের কিছুই করিতে পারিত না—যদি না তাহাদের আসিবার পথ ভারতবর্ষ আপনার চারিত্রের মধ্যেই প্রস্তুত করিয়া রাখিত।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এই ঋষিবাক্য যে কত গভীর—তাহা বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই। দীনাত্মা যে, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্যে তাহার কিছু করিতে পারে না।

আত্মার দীনতা না হইলে কখনও পরবশতা আসিতে পারে না, আবার দীর্ঘকালব্যাপী পরবশতা আত্মার দীনতা আনিয়া দেয়। এ উভয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। "আমি দীন, আমি দীন"—এই কথা বলিতে বলিতে ও ভাবিতে ভাবিতে ব্যক্তির ন্যায়, জাতিও দীন হইয়া যায়। তখন নিজের মধ্যে কোন বলই সে আর খুঁজিয়া পায় না—সে যে কিছু করিতে পারে, এ বিশ্বাসই আর তাহার থাকে না। আর এই "আত্মবিশ্বাস-হীনতাই" —জাতির পক্ষে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমেরিকায় দাসত্ব-প্রথা তুলিয়া দেওয়ার সময় কতকগুলি দাস দরখাস্ত করিয়াছিল যে তাহারা মুক্তি চায় না,—দাস থাকিতেই চায়,—দাস থাকিয়াই তাহারা সুখী। দাসত্ব-প্রথার যত রকম শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল—তাহাদের কোনটাই এর চেয়ে বেশী নহে।

হিপনটিজম্ বা মোহিনী শক্তির কথা সকলেই জানেন। প্রবলচেতা ব্যক্তি দুর্ব্বলচেতার উপর এই শক্তির প্রয়োগ করিয়া তাহাকে ইচ্ছামত চালাইতে পারে। প্রবলচেতা দুর্ব্বলচেতারে যেরূপ ভাবিতে বলিবে—যেরূপ করিতে বলিবে—সে সেইরূপই ভাবিবে ও করিবে। স্থলকে সূক্ষ্ম, কঠিনকে কোমল—অন্ধকারকে সে আলো বলিতে দ্বিধা করিবে না। নিজের ভাবিবার বা অনুভব করিবার ক্ষমতা তাহার লোপ পাইবে—প্রবল তাহাকে যে ভাবে নাচাইবে—সে সেইভাবেই নাচিবে।

প্রবল জাতি দুর্ব্বল অধীন জাতিকে অনেক সময় এইরূপ মোহিনী-মায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। দুর্ব্বল জাতিকে সে যেরূপ ভাবিতে বা চিন্তা করিতে শিখায়—সে সেইরূপই ভাবে বা চিন্তা করে। প্রবলের প্রেরণায় দুর্ব্বল নিজেকে অতি দীন, দুর্ব্বল ও অক্ষম বলিয়া মনে করে। প্রবলের সাহায্য ব্যতীত সে যে নিজে কিছু করিতে পারে, ইহা সে ভুলিয়া যায়। নিজের অতীত ইতিহাস গৌরব ঐশ্বর্য্য সকলই সে বিস্মৃত হইয়া যায়। রূপকথার রাজকন্যা যেমন রূপার কাঠির স্পর্শে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল, হতভাগ্য জাতি তেমনই মোহিনী-মায়ার প্রভাবে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়ে। তাহার অভ্যন্তরে যে শক্তি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তখনও জাগ্রত থাকে, তাহার কথা তাহার একবারও মনে হয় না।

আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্যে একদল লোকের সৃষ্টি হয়—যার দ্বিতীয় ভাগের সুবোধ বালকের মত শান্ত নিরীহ। তার পণ্ডিত-মশায়ের বকুনি চলে, তার মন যোগাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া উঠে। 'যা পায় তাই খায়, যা মেলে তাই পরে'। কিছুতেই অসন্তোষ প্রকাশ করে না। পড়ুয়ার মধ্যে যারা পণ্ডিত মশায়ের ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করে, এই সুবোধ বালকেরা সবিস্ময়ে তাহাদিগকে গালি দিতে থাকে। পণ্ডিত মশায় ইহাদের উপাস্য, তাঁহার চরণবন্দনা করিয়াই ইহারা সব কাজ করে। তাঁহার হাসিতেই ইহাদের জীবন, তাঁহার ভ্রূকুটি ইহাদের কাছে মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ। ফলে পণ্ডিত-মশায়ের কাছে ইহারাই ধীর, শান্ত ও বিচক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। এই সুবোধ বালকেরা যে ভণ্ড, তাহা নহে। বাস্তবিকই অন্যরূপ ভাবিবার শক্তি ইহাদের লোপ পাইয়াছে। প্রভুর ছন্দানুবর্ত্তন করাই ইহারা অন্তরের সহিত শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে।

মোহিনী মায়ার প্রভাবে নিজেদের শক্তিতে দাস-জাতিরা আর বিশ্বাসই করিতে পারে না। "Nil admirari" যাহাকে বলে, সমস্ত জাতিটা তাহাই হইয়া উঠে। নিজেদের মধ্যে যে মহত্ত্ব—যে প্রাণের স্পন্দন দেখা যায়—তাহাকে তাহারা সত্য বলিয়া ভাবিতে পারে না। তাহা ভাবিবার ক্ষমতাও তাহাদের লোপ পায়। তাই দাসজাতির মধ্যে প্রতিভার আদর কখনই হয় না। রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্ব-বরেণ্য কবিকে তাই আমরা ভাল করিয়া—চিনিতে পারি নাই। পশ্চিমের কর্ত্তারা যখন তাঁহার মাথায় গৌরবের মুকুট পরাইয়া দিলেন, তখনই আমরা আদরে একেবারে গলিয়া গেলাম। গাড়ীভাড়া করিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্য দিতে ছুটিলাম। জগদীশচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার গবেষণার ফল তিনি প্রথমে মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশবাসী তাহা বোঝে নাই। তারপর যখন সেই জিনিসগুলি পশ্চিমের "ট্রেডমার্ক" পরিয়া আসিল, তখন আমরা তাহাদিগকে [illegible] করিলাম। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য জীবন ক্ষয় করিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার মর্য্যাদা [illegible] বাঙ্গালী [illegible] দিন গিয়াছিল—তাঁহার [illegible] করিবার ক্ষমতা আমাদের লোপ পাইয়াছে। শুনিলাম, কোন পক্ষের ব্যক্তি নাকি পশ্চিমে তাঁহার দর কষিতে গিয়াছিলেন ও সে দেশের জহুরীরা নাকি তাঁহার উচ্চ মূল্য ঠিক করিয়াছিলেন। নিজেদের সাহিত্যের সম্পদ বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। নতুবা যে জিনিষ বাঙ্গালা ভাষার আবরণে কাহারও চোখে পড়ে না—সেই জিনিষই বিদেশী ভাষার মুখোসে বহু সম্মান পায় কেন? আমাদের প্রতিভাশালীরা তাই আজকাল পশ্চিমের দরবারে আরজী পেশ না করিলে আর মোটেই আসন পান না। কিন্তু দেখ একবার জীবন্ত জাতির মনের জোর! রাসিয়ান বৈজ্ঞানিক অনুন্নত রাসিয়ান ভাষাতে নিজ গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—যার গরজ পড়িবে, সে আমার মাতৃভাষা শিখিয়া—আমার গবেষণার মূল্য বুঝিবে। হইলও তাই। দলে-দলে ইংরাজ,

রচনা করিয়াছিলাম, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতেও আমরাই করিব। আমাদের 'ভীমরতি' ধরিয়াছে মাং, আমরা মরি নাই। ইচ্ছা করিলেই আবার উঠিয়া দাঁড়াইব।

বাঙ্গালী চিত্রকর সে দিন লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন-বৃত্তান্ত আঁকিয়া অন্তরে আনন্দ অনুভব করিলেন। বাঙ্গালী কবি প্রতাপাদিত্যের নিন্দা অসঙ্কোচে গাহিয়া গেলেন, কিন্তু কৈ, বোধনের সঙ্গীত ত কাহারও মুখে বড় শুনিতে পাই না! যে মন্ত্র আত্মাকে বল দেয়, যে মন্ত্রে মোহের ঘোর কাটিয়া যায়—মিথ্যার জাল ছিন্ন হইয়া পড়ে—সেই মন্ত্র কে উচ্চারণ করিবে? নবীন প্রভাতে পৃথিবীর চারিদিকে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, কেবল আমরাই কি বিছানায় শুইয়া মোহ-মুদ্গরের শ্লোক আবৃত্তি করিতে থাকিব?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

সমালোচনা

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দত্ত, এম, বি ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ ঘোষ, বি, এ, বি ই প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীশচীন্দ্রলাল মিত্র, কমলা বুক ডিপো, ১৯৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা বাণী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড়টাকা মাত্র। এই গ্রন্থখানি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। ইহাতে খাদ্য, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও তাহার প্রতিকার, সংক্রামক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার, ব্যায়াম, রোগীর সেবা, পরিচ্ছদ, বাস-গৃহ, জল, বায়ু এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য প্রভৃতির সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। কোন্ খাদ্যের কি গুণ, কি খাইলে অপকার হয়—জলে ডুবিলে কি, পুড়িয়া গেলে, কি শৃগাল-সর্প প্রভৃতি দংশন করিলে ডাক্তার ডাকাইবার পূর্ব্বে কি প্রতিকার করা যায় ও গৃহে কি করা সম্ভব, গৃহে বা পল্লীতে সংক্রামক ব্যাধি হইলে কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, বাসগৃহ কিরূপ হইবে, কি পরিচ্ছদ আমাদের দেশে পরা কর্ত্তব্য—এই সমস্ত বিষয় বেশ সহজ,—সরল ভাষায় সুশৃঙ্খলভাবে এ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থোক্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ দেশোপযোগী ও সহজ। ডিম ও মাংসের ব্যবহার বা বিদেশীয় পদ্ধতির উপর এতটুকু ঝোঁক দেওয়া হয় নাই—ইহাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই সুন্দর, গ্রন্থখানিও বৃহৎ, এ সবের তুলনায় মূল্য সুলভ হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীদুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য, বি, এ, ২নং রিচি রোড কলিকাতা। একনমিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য কাপড়ে বাঁধাই দেড় টাকা, কাগজে বাঁধাই পাঁচসিকা। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থে মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-কথা ও তাঁহার তত্ত্ব-প্রচারের ইতিহাস লেখক নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। গোঁড়ামি বা বিদ্বেষ কোথাও নাই। "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জীবন ঈশ্বর সম্ভোগের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত"—এই কথাটিই গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইতিহাস, পুঁথি ও কাব্য হইতেই লেখক বাছিয়া ছাঁটিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন ভক্তির বিহ্বলতায় ইতিহাসের মর্য্যাদা কোথাও ক্ষুণ্ণ করেন নাই—সেজন্য গ্রন্থখানির রচনায় তাঁহাকে খাটিতে হইয়াছে বিস্তর এবং ইহারই ফলে গ্রন্থখানি প্রামাণ্য-স্বরূপ গৃহীত হইবে। লেখকের ভাষা সহজ রচনার ভঙ্গীও বেশ সরল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
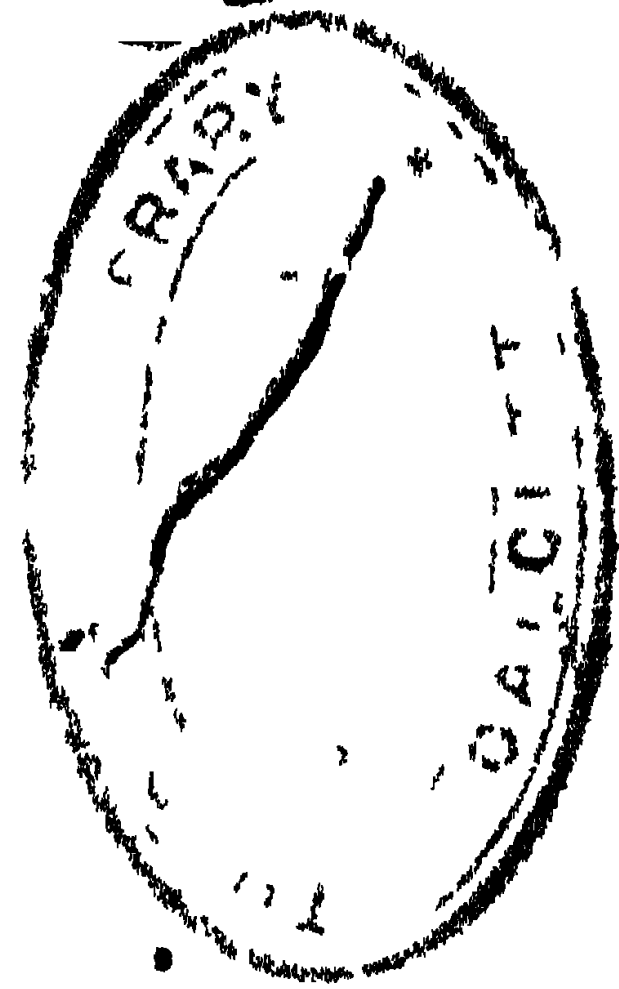
৪৩শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩২৬ [৫ম সংখ্যা

কিরাত জাতি

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে Nonnos গ্রীক-ভাষায় একখানি মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মহাকাব্যের নাম Dionysiaka বা Bassarika। তাঁহার গ্রন্থে তিনি কিরাতদিগের নামের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কিরাতজাতি নৌযুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল; তাহাদের নৌকাগুলি চর্ম্মনির্ম্মিত। এই কিরাতদিগের [illegible] অধিনায়কের নাম ছিল Thyamis ও [illegible]kaios। ইহারা দুইজনেই নৌচালন-বিশারদ Tharseiosএর পুত্র। এই গ্রীক গ্রন্থে কিরাতের নাম 'Cirradioi' বলিয়া উল্লিখিত আছে।* M'Crindle সাহেব 'কিরাদই'-কে কিরাত বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "Periplus of the Erythraean Sea"র রচয়িতা কিরাতদিগকে Kirrhadai সংজ্ঞা দিয়াছেন। Pliny কিরাতদিগকে Scyrites বা Syrites নামে অভিহিত করিয়াছেন। M'Crindle বলেন, কিরাতগণ পার্ব্বত্য জাতি, অরণ্য ও পর্ব্বত উহাদের বাসস্থান, শিকার-লব্ধ দ্রব্যই ইহাদের উপজীবিকা। [illegible] হিন্দুধর্ম্মাচার ইহারা রক্ষণ করিয়া চলিত না [illegible]ন। কিরাতগণ শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছে। [illegible] প্রাচীন শিলালিপি পাঠে জানিতে পারা যায়

* By the Cirradioi are meant the Kirata, a race spread along the shores of Bengal to eastward of the mouths of the Ganges as far as Arracan. They are described by the author of the "Periplus of the Erythraean Sea," who calls them the Kirrhadai as savages with flat noses. He places them on the coast to the west of the Ganges, but erroneously. They are the Airrhadoi of Ptolemy—M'Crindle's Ancient India, p 199 (1901)

† M'Crindle's Ancient India, p 61

যে, কিরাতগণ আসাম হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল। নেপালে যে 'কিরান্ত' জাতি আছে, * তাহারা যে কিরাতজাতি তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই কিরাতজাতি কালক্রমে পূর্ব্বভারতের পার্ব্বত্য ভূমি অধিকার করিয়া বসে। যে যে স্থানে গমন করিয়া ইহারা বাস করিয়াছে তত্তৎভূমি কিরাতভূমি নামে আখ্যাত হইয়াছে। কাজেই কিরাতভূমির পরিসর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিরাতগণ অতি প্রাচীন জাতি। বৈদিকগ্রন্থে ইহাদের কথা আছে। বাজসনেয়ী সংহিতায় উল্লিখিত আছে যে ইহারা গুহাবাসী (৩০।১৬) †। অথর্ব্ববেদে (১০।৪।১৪) একজন 'কৈরাতিকা'র (কিরাতবালার) উল্লেখ আছে। Lassen তাঁহার 'ভারতীয় পুরাতত্ত্বে' (Lassen, Indische Alterthumskunde, 12, 530, 534) প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে কিরাতগণ বৈদিকযুগের পর নেপালের পূর্ব্বাংশে বাস করিত। মানবধর্ম্মশাস্ত্রে (১০।৪) কিরাতদিগকে অধঃপতিত ক্ষত্রিয় আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। কিরাতদিগকে অনেকে ম্লেচ্ছ শ্রেণীভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ‡। কিন্তু মূলতঃ ইহারা যে ক্ষত্রিয় ছিল তাহা Zimmer (Altindisches Leben, p 32), Ludwig (Translation of the Rigveda, 3. 207), Vincent Smith (Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, 258, p 1) ও Sylvain Levi (Le Népal, 2, 77) দেখাইয়াছেন। বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড ও বামন পুরাণমতে ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমায় কিরাতদেশ অবস্থিত। মহাভারতের সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত চীন ও কিরাতসেনা লইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

'স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগজ্যোতিষোঽভবৎ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ।
সভাপর্ব্ব—২৬ অধ্যায় ৯ শ্লোক

মহাভারতের অন্যত্র লিখিত আছে—

'যে পরার্দ্ধে হিমবতঃ সূর্য্যোদয়গিরৌ নৃপাঃ।
কারূষে চ সমুদ্রান্তে লৌহিত্যমভিতশ্চ যে ॥ ৮ ॥
ফলমূলাশনা যে চ কিরাতাশ্চর্ম্মবাসসঃ।
ক্রূরশস্ত্রাঃ ক্রূরকৃতস্তাংশ্চ পশ্যাম্যহং প্রভো ॥ ৯ ॥
চন্দনাগুরুকাষ্ঠানাং ভারান্ কালীয়কস্য চ।
চর্ম্মরত্নসুবর্ণানাং গন্ধানাঞ্চৈব রাশয়ঃ ॥ ১০ ॥
কৈরাতকীনাময়ুতং দাসীনাঞ্চ বিশাম্পতে।
আহৃত্য রমণীয়ার্থান্ দূরজান্ মৃগপক্ষিণঃ ॥ ১১ ॥
নিচিতং পর্ব্বতেভ্যশ্চ হিরণ্যং ভূরিবর্চ্চসম্।
বলিঞ্চ কৃৎস্নমাদায় দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ ॥ ১২ ॥
—সভাপর্ব্ব—৫২ অধ্যায়

---

* M'Crindle বলেন, কিরাতগণ ভুটানের অধিবাসী, অধুনা নেপালে তাহাদের বংশপরিবার বর্ত্তমান রহিয়াছে।

† "The Pygmies are the kirata—the Mongolian hillmen of Bhotan or the wild tribes of the Assam frontier perhaps." [Intercourse between India and the western world -H. G Rawlinson p. 27.] তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—৩।—৪।১২।১ দ্রষ্টব্য।

‡ ভেদাঃ কিরাতশবরপুলিন্দা ম্লেচ্ছজাতয়" অমরকোষ, শূদ্রবর্গ ৫৬।৫৭ পর্য্যায়। কিরাতাদ্যাশ্চাণ্ডালানাং ভেদাঃ ম্লেচ্ছজাতয়ো ম্লেচ্ছশব্দবাচ্যাঃ।—অমরটীকায়াং রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রথমোদ্ধৃত শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষের নিকটেই কিরাত ও চীন ছিল। তখনকার প্রাগ্‌জ্যোতিষ এখনকার আসাম; সুতরাং পূর্ব্বদিকেই কিরাত জনপদ হওয়াই সম্ভবপর। অতঃপর যে শ্লোকগুলি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে বোধ হয়, হিমালয়ের পূর্ব্বে লৌহিত্য নদের পরে কিরাতজাতির বাস ছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতকের কতকগুলি শিলালিপি ব্রহ্মদেশ ও কাম্বোডিয়া (কম্বোজ) হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপিগুলিতে ব্রহ্ম ও কাম্বোডিয়ার অধিবাসীদিগকে 'কিরাত' নামক পার্ব্বত্য জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় (১৪।১৮) ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে 'কিরাত' নামক একটী জনপদের উল্লেখ আছে। * যাহা হউক দেখা যাইতেছে যে, এক সময়ে হিমালয়ের পূর্ব্বাংশে বর্ত্তমান ভূটান, আসামের পূর্ব্বাংশ মণিপুর, ব্রহ্মদেশ, এমন কি চীনসমুদ্র-তীরবর্ত্তী কম্বোজ পর্য্যন্ত কিরাতজাতির বাসভূমি ছিল। ঐ সমস্ত স্থান সময়ে সময়ে কিরাত জনপদ বলিয়া আখ্যাত হইত। এখনও নেপালের পূর্ব্বাংশ হইতে আসামাঞ্চলের পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত কিরাতজাতি বাস করে। নেপালের পর্ব্বতীয় বংশাবলী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে আহীর-বংশের পর ১০ জন কিরাত-বংশীয় রাজা নেপালে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারপরও বহুদিন পর্য্যন্ত কিরাতদিগের প্রতাপ ছিল; শেষে নেপালরাজ পৃথ্বীনারায়ণ ইহাদিগকে একেবারে অধঃপতিত করেন। কিরাতদিগকে বাধ্য হইয়া অরণ্যে বাস করিতে হয়। নিরুপায় অসহায় অবস্থায় থাকিয়া তাহাদিগকে দীনহীন ভাবে কালযাপন করিতে হয়। পৃথ্বীনারায়ণ ও তাহার উত্তরাধিকারিগণের প্রতাপে তাহাদিগের বর্ত্তমান অসভ্যাবস্থা ঘটিয়াছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৫৭শ অধ্যায়ে। ক্রোষ্টুকিকে ঋষি মার্কণ্ডেয় ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগের কথা বলেন। ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগ সাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। এইগুলির নাম ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরুমান্, তাম্রবর্ণ (সিংহল), গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য গন্ধর্ব্ব ও বারুণ। ভারত নবম বিভাগ। ইহার পূর্ব্বকোণে কিরাতগণ এবং পশ্চিমে যবনগণের অবস্থিতি। বর্ত্তমান কিরান্তি বা কিরান্তিজাতিই কিরাত, এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। কিরাতি বা কিরান্তি বলিলে কিরান্ত দেশের অধিবাসী অর্থাৎ নেপালের অন্তর্গত দুধ-কোসি এবং কুকিনদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসী বুঝায়। খম্বু, লিম্বু ইন য়াখা জাতিও কিরান্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত।

* শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে তপ্তকুণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া রামক্ষেত্র পর্য্যন্ত কিরাত দেশ, ইহা বিন্ধ্যশৈলে অবস্থিত।

"তপ্তকুণ্ডং সমারভ্য রামক্ষেত্রান্তগং শিবে।
কিরাতদেশো দেবেশি বিন্ধ্যশৈলেঽবতিষ্ঠতে॥"

এই শ্লোকটীর কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত।

† পার্জিটার-লিখিত এই অধ্যায়ের টিপ্পনী হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

দস্থুয়ার, হয়ু এবং থামী এই তিনটী জাতিও কিরাতিনামের দাবী করে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত খম্বুপ্রমুখ তিনটী উচ্চ জাতি, আদৌ স্বীকার করে না। কিন্তু পূর্ব্বে ইহাদের প্রসার অধিকতর বিস্তৃত ছিল এবং হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ স্থলেই ইহাদের বসবাস ছিল। এরূপ হওয়া যে সঙ্গত তৎ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের উত্তরদিগ্বিজয়ে (সভাপর্ব্ব, ২৫ অধ্যায়, ১০০১), ভীমের পূর্ব্বদিগ্বিজয়ে (সভাপর্ব্ব, ২৯ অ, ১০৮৯) এবং নকুলের পশ্চিমদিগ্বিজয়ে (ঐ, ৩১ অ, ১১৯৯) কিরাতদিগের সহিত যুদ্ধই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই কিরাতগণ সকলেই এক শ্রেণী বা বংশের অন্তর্গত ছিল না। ইহারা নিতান্ত সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ থাকিত। আমাদের এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে মহাভারতের সভাপর্ব্বের দুইটা পাশাপাশি শ্লোকে (৪র্থ অধ্যায়, ১১৯,১২০) দুইজন ভিন্ন ভিন্ন কিরাতরাজার উল্লেখ আছে। ঐ পর্ব্বের ২৯ অধ্যায়ের ১০৮৯ শ্লোকে সাতজন কিরাতরাজের কথা বলা হইয়াছে। বনপর্ব্বে সমস্ত কিরাতদিগের কথা লিখিত আছে। (৫১ অ, ১৯৯০ ভীষ্মপর্ব্বে নামের তালিকায় তিনবার কিরাতদিগের নাম আছে (৯ অ, ৩৫৮, ৩৬৪, ৩ ৬)। কিরাতদিগের প্রধান রাজ্য ছিল কৈলাস, মন্দর ও হৈম পর্ব্বতের মধ্যে। মন্দর পর্ব্বত বেহারের অন্তর্গত ভাগলপুরের প্রায় ৩১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত Arch. Surv Reps. vol VIII, p 130) ; হৈমপর্ব্বত (অনুশাসন—১৯ অ, ১৪৩৪) মানস সরোবরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি। কিরাতগণ, তঙ্গণ ও পুলিন্দ জাতির সহিত সম্পর্কিত বলিয়া মনে হয়; কেন না এই জাতিত্রয় হিমালয়ের মধ্যভাগে একটা প্রকাণ্ড রাজ্যে বাস করিত। এই তিনটী জাতির অম্বষ্ঠদিগের সহিতও সম্বন্ধ ছিল (দ্রোণপর্ব্ব ১২১ অ, ৮৮১৯)। এই রাজ্যের শাসক ছিলেন পুলিন্দদিগের রাজা সুবাহু (বনপর্ব্ব—১৮০ অ, ১০৮৬৩-৬ শ্লোক, সভাপর্ব্ব—৫১ অধ্যায়, ১৮৫৮-৯১)। সুবাহু কিরাত নামেও অভিহিত ছিলেন (বনপর্ব্ব, ১৭৭ অ, ১২৩৪৯)। সভ্যতা, আচার, রীতি-নীতি প্রভৃতি বিষয়ে ইহাদের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল (বনপর্ব্ব, ১৪০ অধ্যায়, ১০৮৬৫-৬, উদ্যোগ—৬৩ অধ্যায়, ২৪৭০ শ্লোক)। ইহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় বিশেষ সুসভ্য ছিল, আবার কতকগুলি সম্প্রদায় নিতান্ত অসভ্য ও চর্ম্মপরিহিত, ফলমূলাশী এবং নিতান্ত নিষ্ঠুর ছিল (সভাপর্ব্ব-৫১ অ, ১৮৬৫)। এইরূপ কিরাতদিগের নারীগণ ক্রীতদাসীরূপে ব্যবহৃত হইত (ঐ, ১৮৬৭)। রামায়ণের বর্ণনানুসারে ইহারা বড় বড় ঝুঁটা ধারণ করিত (কিষ্কিন্ধ্যা, ৪০ অধ্যায়, ৩০ শ্লোক)। মনু স্পষ্টই ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন, কিন্তু আর্য্যজুষ্ট রীতি পরিত্যাগ করায় ইহারা অধঃপতিত হয়।

> শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
> বৃষলত্বং গত লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ ৪৩।
> পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজাঃ জবনাঃ শকাঃ।
> পারদাপহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥ ৪৪।

ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে তাহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, পরযুগে অধঃপতিত হয়।

প্রাগ্‌জ্যোতিষের সীমান্তদেশে কিরাত ও চীনরাজ্য সংস্থিত ছিল (সভা, ২৫ অধ্যায়, ১০০২ শ্লোক, উদ্যোগ ১৮ অধ্যায়, ৫৮৪-৫ শ্লোক)। কিরাতদিগের মধ্যে যাহারা অন্ত্যজ হীন ছিল তাহারা 'অধমকিরাত' নামে অভিহিত হইত।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

টিকারী

১

মহারাজ হিতনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ধর্ম্মপ্রাণ ও সর্ব্বত্যাগী লোক ছিলেন। তিনি রাজকার্য্যাদি-পরিচালনের ভার মহারাণী ইন্দ্রজীৎ কুমারীর হস্তে অর্পণ করিয়া স্বয়ং সাধু সঙ্গে জীবনের অধিকাংশ কাল পাটনায় গঙ্গাতীরে এক কুটীরে ভগবৎ ভজন-পূজনে অতিবাহিত করিতেন। মহারাণী বেশ চতুর ও বিচক্ষণ রমণী ছিলেন এবং পুরুষোচিত দক্ষতার সহিত যাবতীয় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে অপুত্রক মহারাজ অমরধামে প্রয়াণ করিলে বিধবা রাজমহিষী রাণী ইন্দ্রজীৎ কুঁয়ার সৎপরামর্শদাতৃগণের মতানুযায়ী যাবতীয় রাজ-কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। গয়ার প্রধান ব্যবহারবিদ্ ৺উমেশচন্দ্র সরকার ও ৺ভূপসেন সিংহ মহাশয়গণ তাঁহার পরামর্শ-দাতৃগণের অন্যতম ছিলেন। ১৮৬২ সালে বৃদ্ধ রাণী ইন্দ্রজীৎকুমারী মৃত স্বামীর অনুমতি-পত্রানুযায়ী স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু রামকিষণ সিংহকে বহু-সমারোহ-সহ দত্তক গ্রহণ করেন। এই সময়ে টিকারীর জ্ঞাতি-শাখার অর্থাৎ বাবু চৈন সিংহের বংশে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু রামসিংহ এবং কনিষ্ঠপুত্র বাবু বিষণ সিংহ জীবিত ছিলেন। বাবু রামসিংহের বংশে রাজকুমার ছোটে নারায়ণ সিংহ এবং বাবু বিষণ সিংহের বংশে রাজা রণ বাহাদুর সিংহ জন্মগ্রহণ করেন, সে বিবরণ পরে বিশদরূপে আলোচিত হইবে।

বাবু রাম সিংহ ২১।৫।৬৩ সালে মানব লীলা সংবরণ করেন। বাবু রামসিংহের পুত্র বিক্রমজিৎ সিংহ এবং তাঁহার পুত্র বাবু কানাইয়া দয়াল সিংহ। তিনি ১৮৮৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাবু রণজিৎ নারায়ণ সিংহ ৩০।৩।১৮৯[illegible] সালে তরুণবয়সে পরলোক গমন করেন [illegible] কনিষ্ঠ বাবু ছোটে নারায়ণ সিংহ জীবিত আছেন। তিনি পাটনা জেলার তৃতীয় সদর[illegible]র আদালতে ১৯০১ সালে সমগ্র ৯ আনা ও [illegible] আনা টিকারী-রাজ্য দাবী করিয়া মকর্দ্দমা রুজু করেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা শেষ পর্য্যন্ত চালাইতে না পারায় শেষে তুলিয়া লইতে বাধ্য হন। তিনি অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। বাবু বিষণ সিংহের দুই

পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাবু রণবাহাদুর সিংহ। ইনি বিখ্যাত সাত আনা রাজ্যের রাজা রণ বাহাদুর সিংহ। বাবু বিষণ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু মুরলীধর সিংহ; ইনি ২৮।২।৭২ সালে অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার পত্নী মোসম্মাৎ লাচ্ছু কুঁয়ার তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি মিতাক্ষরা আইন-মতে যাবজ্জীবন ভোগদখল করিতে থাকেন; পরে তাঁহার পরলোক-গমনের পর রাজকুমার বাবু ছোট নারায়ণ সিংহ নিকটস্থ জ্ঞাতি বিধায় এই রাজ্য পাইবার জন্য ১৯০২ সালে গয়ার জজ আদালতে মকর্দ্দমা রুজু করিলে তাহা যথাসময়ে তাঁহার সাপক্ষেই বিচারিত হয়। বাবু মুড়লী (মুরলী) ধর সিংহের বনিতা মোসম্মাৎ লাচ্ছু কুঁয়ার—বাবু নন্দকিশোর প্রসাদ সিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন; তিনি অদ্যাবধি জীবিত আছেন।

বাবু চৈন সিংহের পুত্র বাবু শোভা-নারায়ণ সিংহ; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র লাল নারায়ণ সিংহ এবং কনিষ্ঠ বাবু দেবপতি নারায়ণ সিংহ। বাবু লাল নারায়ণ সিংহের দত্তক পুত্র বাবু ক্রোড়পতি নারায়ণ সিংহ; দেবপতিবাবুর দুই পু[illegible] মধ্যে কমলাপতি নারা[illegible] সিংহ জ্যেষ্ঠ এবং বাবু ক্রোড়পতি নারায়ণ সিংহ কনিষ্ঠ; ইনিই লাল নারায়ণ বাবুর দত্তক পুত্র হইতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহারাণী ইন্দ্রজীৎ কুমারী খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ও চতুর রমণী ছিলেন; সমগ্র রাজকার্য্য তিনি অমাত্যগণের সাহায্যে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার স্থাপিত দেবালয়, শিবালয়, ৺বৃন্দাবনে সত্র প্রভৃতি ধর্ম্মমন্দির সকল এবং জল-কষ্ট নিবারণের জন্য রচিত কূপ, তড়াগাদি গয়া ও টিকারী রাস্তার পার্শ্বে বিস্তর দেখা যায়; এই সকল কীর্ত্তি অদ্যাবধি তাঁহার অতীত গুণরাশির পরিচয় দিতেছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাণীর প্রখর বুদ্ধির ফলে গয়া জেলার মধ্যে বিদ্রোহীগণ বড় বেশী অনিষ্ট ঘটাইতে পারে নাই। মহারাজ এবং মহারাণী গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোডস্থিত দানুয়া এবং ভালুয়া চটী সুচারুরূপে রক্ষা করিয়া এবং সরকারী গয়া ট্রেজারির টাকা কলিকাতাভিমুখে পাঠাইয়া কালেক্টার মোলানী (Money) সাহেবকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া বড়লাট বাহাদুর মহারাজ বাহাদুরকে দার্জ্জিলিঙ্ হইতে বিশেষ ধন্যবাদ ও সম্মান-সূচক পত্র (২৪শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ সালে) পাঠাইয়া-ছিলেন। ১৮৭৪ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় মহারাণী গয়া জেলার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নিঃস্ব অধিবাসীগণকে অন্ন-বস্ত্রদানে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ হন এবং ইংরাজি ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ সালে বঙ্গেশ্বর সার রিচার্ড টেম্পল বাহাদুর মহারাজা রামকিষণ সিংহ বাহাদুরকে দার্জ্জিলিঙ্ হইতে একটি বিশেষ সম্মান-সূচক পত্র প্রেরণ করেন।

মহারাজ হিতনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের পরলোকগমনের পর মহারাণী ইন্দ্রজীৎ কুমারী স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু রামকিষণ সিংহকে মহারাজের প্রদত্ত অনুমতি-পত্রানুযায়ী দত্তক গ্রহণ করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ইংরাজ

গভর্ণমেণ্টও এই দত্তককে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করিয়া টিকারী-রাজ্যের মালিক বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ এমনই—মহারাজ রামকিষণ সিংহ এক বৎসরের মধ্যে মহারাণী রাজরূপ কুঁয়ার এবং একমাত্র কন্যা মহারাজ-কুমারী রাধেশ্বরী কিশোরীকে ১৮৭৫ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে রাখিয়া অমর-ধামে প্রয়াণ করেন। মহারাণী ইন্দ্রজীৎকুমারী খুব দানশীলা, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্না আদর্শ ধার্ম্মিক হিন্দু রমণী ছিলেন। প্রজাবর্গের হিতের জন্য তিনি সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিতে কোনরূপ কুণ্ঠা করিতেন না। সন ১৮৭৭ সালের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইলে পুত্রবধূ মহারাণী রাজরূপ কুঁয়ার যাবতীয় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। মহারাণী রাজরূপ কুঁয়ার শাশুড়ীর মতই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিযুক্তা, দানশীলা, ও পরম-হিন্দু রমণী ছিলেন। তাঁহার মুক্তহস্ততার পরিচয় তাঁহার প্রদত্ত বহু সনন্দ, ব্রহ্মোত্তরাদিতে আজও গয়া জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ন্যায় পতিপ্রাণা ও সহৃদয়া রমণী, ইংরাজ-রাজের পরম বন্ধু অদ্যাবধি টিকারীর গদীতে উপবিষ্টা হন নাই। তাঁহার জীবন-কালে কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে টিকারীর দেবালয় ও সত্রগুলির কার্য্য খুব সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইত। তাঁহার যত্নে রাজ্যে পুনরায় সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজিত হইল এবং প্রজাগণ সুখী ও অর্থবান হইতে লাগিল; তিনি গয়ার কালেক্টারের হস্তে ত্রিশ সহস্র মুদ্রা দিয়া 'প্রবেশিকা ষ্টাণ্ডার্ড পর্য্যন্ত একটি ইংরাজি বিদ্যালয় টিকারীতে স্থাপন করান। দশসহস্র টাকা দিয়া স্কুলবাটী নির্ম্মাণ এবং দশসহস্র টাকার সুদে পারদর্শী ছাত্রকে বৃত্তি-দানের ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে স্কুলের রক্ষা ও পরিচালনকল্পে ত্রিশ সহস্র টাকা গয়ার কালেক্টারকে দান করিয়া যান। ইহা ছাড়া দশ সহস্র টাকা ব্যয়ে তিনি বাঁকিপুরে শিল্পাদি শিক্ষার জন্য (Industrial School) একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের (ভারত-সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড) ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-পরিদর্শনের স্মৃতি-স্থাপনের জন্য টিকারী নগরে একটি হাঁসপাতাল এবং অবৈতনিক ঔষধালয় স্থাপন করেন; ১৮৭৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-সম্রাজ্ঞী" উপাধি-গ্রহণের স্মরণার্থে দানশীলা মহারাণী একটি আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তারের অধীনে টিকারী হাসপাতালটি রক্ষার ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে হাসপাতাল-রক্ষা ও তাহার কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য ত্রিশ সহস্র টাকা গয়ার কালেক্টার বাহাদুরের হস্তে অর্পণ করেন; হাসপাতাল এবং চিকিৎসালয় বাটী নির্ম্মাণের জন্য দশ সহস্র টাকা দান করেন; বাৎসরিক দ্বিসহস্র টাকা [illegible] টিকারী গ্রামে একটি সংস্কৃত পাঠশালা এবং অভ্যাগত পথিক ও ফকীরদের সেবার জন্য একটি সদাব্রত সত্র বাৎসরিক ৮০০০ টাকা ব্যয়ে স্থাপন এবং ১৬০০০ টাকার সুদ হইতে টিকারী হইতে ফতেহপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটির নিয়-মিতসংস্কার, মার্জ্জন ও সংরক্ষণ-জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুসৌড়ীর "মন্দির পুষ্করিণী"র সংস্কার-কল্পে পাটনার কালেক্টারের হস্তে

১৩০০০ টাকা, কলিকাতার জু বাগানের ফণ্ডে ৫০০০ টাকা, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের চাঁদায় ১০৫০ টাকা এককালীন দান করিয়া মুক্ত-হস্ততা এবং ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়া চিরস্মরণীয়া হন। তিনি কূপ, তড়াগাদি খননে ও পথ-নির্ম্মাণে নিজের রাজ্যের স্থানে স্থানে ভূমি দান করিয়া আজও জনসমাজে ধন্যবাদার্হা হইতেছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে অকটোবর তারিখে এই সহৃদয়া রাণীর মৃত্যু হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মহারাজা মিত্রজীৎ সিংহের পরলোক-গমনের পর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ রাজকুমারদ্বয়ের মধ্যে সমগ্র টিকারী রাজ্য পাইবার জন্য তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। মহারাজ হিত নারায়ণ সিংহ বৃদ্ধ মহারাজ মিত্রজীৎ সিংহের জীবদ্দশায় বণ্টন-নামায় বাধ্য থাকিতে চাহিলেন না বলিয়া কনিষ্ঠ রাজপুত্র মোদ্‌নারায়ণ সিংহ মকদ্দমা রুজু করেন। কিন্তু এই মকদ্দমায় তিনি অকৃতকার্য্য হইলে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সাত আনা রাজ্যই ভোগ-দখল করিতে থাকেন; তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার দুই বিধবা মহিষী রাণী অশ্বমেধ কুমারী এবং রাণী সুনীতি কুমারী সমগ্র সাত-আনা রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হন। বাবু রাম সিংহের পরলোক-গমনের পর, বাবু রণবাহাদুর সিংহ তাঁহার পিতার পক্ষ হইতে আম-মোক্তার-নামার বলে ৯ আনা অংশ টিকারী রাজ্য পাইবার জন্য মহারাণী ইন্দ্রজীৎ কুমারী এবং তদীয় পোষ্যপুত্র মহারাজা রামকিষণ সিংহের উপর এই মর্ম্মে এক মকর্দ্দমা রুজু করেন যে অনুমতি-পত্র জাল এবং কাজেই পোষ্যপুত্র-গ্রহণ অসিদ্ধ। এই মকর্দ্দমা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আপীল আদালত হইতে প্রাথমিক (preliminary point) নির্ঘণ্টে ডিশমিশ হয় এবং ১৮৬৮ সালে বাবু বিষণ সিংহ এবং মহারাজা রামকিষণ সিংহ পরস্পরের মধ্যে একরার-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিষণ সিংহ বাবু ৯ আনা রাজ্যের উপর নিজ-দাবী উঠাইয়া লন এবং মহারাজা রাম কিষণ সিংহ বাবু বিষণ সিংহের মৃত্যুর পর এবং রাজা মোদনারায়ণ সিংহের মহিষীদ্বয়ের মৃত্যুর পর ৭ আনা রাজ্যের উপর দাবী স্বীকার করিয়া নিজ দাবী তুলিয়া লন।

রাজমহিষীদ্বয় এই সাত আনা রাজ্যকে ৮।।০ এবং ৭।।০ আনা অংশে বিভক্ত করিয়া, জ্যেষ্ঠারাণী ৮।।০ আনার উপর এবং কনিষ্ঠা রাণী ৭।।০ আনা অংশের উপর দখলিকার রহিলেন। ১৮৭০ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে বাবু বিষণ সিংহ বাবু রণবাহাদুর এবং বাবু মুরলি ধর নামক দুই পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠারাণী অশ্বমেধ কুমারী ১৮৭২ সালের ৮ই অগষ্টের দানপত্র-সূত্রে স্বীয় ৮।।০ আনা অংশ রাজ্য বাবু রণবাহাদুর সিংহকে অর্পণ করিলেন; ১৮৭২ সালের ৩০শে নবেম্বর তারিখে কনিষ্ঠারাণী সুনীতি কুঁয়ারী পরলোক গমন করিলে তাঁহার ৭।।০ আনা অংশ জ্যেষ্ঠারাণী প্রাপ্ত হইলেন; এবং তিনি ১৫ই এপ্রিল সন ১৮৭৩ সালে দানপত্র-সূত্রে তাহা বাবু রণবাহাদুর সিংহকে অর্পণ করিলে, বাবুসাহেব ৭ আনা অংশের সমগ্র টিকারীরাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। জ্যেষ্ঠ

রাণী অশ্বমেধ কুমারী ১৮৭৮ সালের ২৯শে অক্‌টোবর তারিখে পরলোক গমন করেন।

মহারাজা রাম কিষণ সিংহ ১৮৭৫ সালের ১৮ই অক্‌টোবর তারিখে পরলোকগমন করেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং তাঁহার পর মহারাণী রাজরূপ কুমারী ও তাঁহার পর তাঁহার একমাত্র কন্যা মহারাজ-কুমারী রাধেশ্বরী কিশোরী কুঁয়ার টিকারীর ৯ আনার সিংহাসনে অধিরূঢ়া হন। মহারাজ রাম কিষণ সিংহ মৃত্যুর পূর্ব্বে এই মর্ম্মে একটি উইলপত্র সম্পাদন করেন যে তাহার মৃত্যুর পর বিধবা রাজমহিষী এবং তাহার কন্যা টিকারী-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন, এই উইল-পত্রের মর্ম্মানুযায়ী মহারাণী ও মহারাজকুমারী টিকারীর ৯ আনা সিংহাসনে যথাসময়ে অধিরূঢ়া হন। এদিকে মহারাণী ইন্দ্রজীৎ কুঁয়ারের পর-লোক-গমনের পর রাজা রণবাহাদুর সিংহ ১৮৭৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে মহারাণী রাজরূপ কুঁয়ারের বিরুদ্ধে গয়া আদালতে ৯ আনা রাজ্য দাবী করিয়া এক মকদ্দমা রুজু করেন। এই মকদ্দমা ১৮৬৮ সালের একরারের বলে বাদীর দাবা ডিস্‌মীশ ও অগ্রাহ্য হইল; বাদী কলিকাতার হাইকোর্টে আপীল রুজু করিলে আপীল আদালতে ৫ই এপ্রিল ১৮৮২ সালে সোলেনামা (compromise) সূত্রে উক্ত মকর্দ্দমা আপোষ হইয়া যায়। উক্ত সোলেনামার সর্ত্তানুসারে রাজা রণবাহাদুর সিংহ ৯ আনা রাজ্যে নিজ দাবী পরিহার করিলেন ও তাহার পরিবর্ত্তে উক্ত রাজ্য হইতে কতকগুলি মৌজা মোকররী মৌরুসী প্রাপ্ত হইলেন। রাজা রণবাহাদুর সিংহ এইগুলি যাবজ্জীবন নিজ দখলে রাখিয়া ভোগ করেন। এইরূপে নয় আনা ও সাত আনা রাজ্যের মধ্যে ভাবী বিবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া নির্দ্বন্দ্ব করা হইল।

রাজা রণবাহাদুরের জীবদ্দশাতেই তাঁহার পুত্র বাবু নারায়ণ সিংহ পরলোকগমন করেন। তাহার বিধবা পত্নী এবং রাজা সাহেবের পুত্রবধূ মোসম্মাৎ রাণী রামেশ্বর কুঁয়ার কেবল মাত্র তাঁহার সংসারে থাকিলেন। রাজা সাহেব রাজা রণবাহাদুর সিংহ খুব ভাল লোক ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁহার শত্রুগণ বিদ্রোহী নেতা বলিয়া ধরাইয়া দিলে বাবু রণবাহাদুরের ফাঁসির হুকুম হয়; কিন্তু মহারাজা হিতনারায়ণ সিংহ এবং মহারাণী ইন্দ্রজীৎ কুমারী ও রাজা তোড়ল নারায়ণ সিংহের যত্নে এবং গয়ার তাৎকালীন কালেক্টার ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার মোণীসাহেবের সুপারিশে বড়লাট লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের আদেশে বাবু রণবাহাদুরের ফাঁসির হুকুম র[illegible] হয়। ভারতীয় যাত্রীগণের সুবিধার জন্য রামশীলা পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিবার তিনি প্রস্তর-নির্ম্মিত এক[illegible] পাকা সো[illegible]পান-শ্রেণী বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করাই[illegible] সকলের চিরধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ১৮[illegible]০ সালের ৩১ মার্চ্চ তারিখে তিনি কলিকাতা[illegible] পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি রাণী রামেশ্বর কুমারী, পুত্রবধূ এবং রাজ-কুমারী রতনকুমারী নাম্নী একমাত্র পৌত্রীকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া যান। মিতাক্ষরা আইনানুসারে কন্যা উত্তরাধিকারী হয় না বলিয়া এক উইল বহু যত্নে গয়া ও

কলিকাতার ব্যবহারবিদ্‌গণের পরামর্শে ১৮৯০ সালের ২৩ মার্চ্চ তারিখে রচনা করা হয়; এই উইলের মকর্দ্দমায় বাবু ছোটে নারায়ণ সিংহ প্রভৃতি নিকটস্থ আত্মীয় বর্গ আপত্তি উত্থাপন করেন। গয়ার জেলা আদালতে এই মকর্দ্দমায় বিচার হইয়া উইল-পত্র খানি অসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইলে কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্টে এবং তৎপরে বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে ইহা সিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই উইল-পত্রের মর্ম্মানুসারে রাজকুমারী রতন কুঁয়ার টিকারী সাত আনা রাজ্য নির্ব্যূঢ় সত্বে সত্ববতী হইয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ-দখল করিতে থাকিলেন। রাজকুমারী রতন কুঁয়ার ১৮৯৫ সালের ২৬সে মে তারিখে নাবালিকা কন্যা রাজকুমারী ভুবনেশ্বরী কুঁয়ারীকে রাখিয়া অমর-ধামে প্রয়াণ করেন। মৃতা রাজকুমারী রত্ন কুঁয়ারের শেষ উইলের মর্ম্মানুসারে তাঁহার কন্যা রাজকুমারী ভুবনেশ্বরী টিকারী সাত আনা রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইলেন। এই রাজকুমারীর নাবালিকা অবস্থায় তাঁহার মাতামহী রাণী রামেশ্বর কুঁয়র অর্থাৎ [illegible]রণবাহাদুর সিংহের [illegible] বাবু ও ৺ বাবু নারায়ণ সিংহের বিধবা স্ত্রী তাঁহার ওলী ওছি রূপে রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। বাবু নারায়ণ সিংহ ৺রাজা রণবাহাদুর সিংহের জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেন। তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাটনা জেলার প্রখ্যাত জমিদার আমাওয়াঁ-নিবাসী মৃত বৈজনাথ সিংহের সুযোগ্য পুত্র বাবু হরিহর প্রসাদ সিংহ রাজকুমারী ভুবনেশ্বরীর পাণি গ্রহণ করেন। সম্প্রতি বাবু হরিহর প্রসাদ সিংহ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। গয়ায় এবং মানপুর গ্রামে তাঁহার কয়েকটি সুন্দর বাটিকা ও অট্টালিকা আছে। সাত আনার রাজা বাবু হরিহর প্রসাদ সিংহ খুবই ধর্ম্মজ্ঞ ও ভগবৎ ভক্ত, পূজাদিতে রত হিন্দু। যাবতীয় রাজ-কার্য্য তাঁহার মহিষীর পক্ষ হইতে তাঁহার মাতুল বাবু বংশী সিংহ পরিদর্শন করিয়া থাকেন। টিকারীর সাত আনা রাজ্য সুশাসন জন্য ৯ আনা রাজ্যের মত সার্কেল বিভক্ত হইয়া কর্ম্মচারীর দ্বারায় শাসিত হইতেছে বটে, কিন্তু রাজা হরিহর প্রসাদ তথা মহারাজ গোপাল শরণ সিংহের তেমন সুযোগ্য সৎপরামর্শদাতা না থাকায় উভয় রাজ্যেরই অবস্থা তেমন সুখকর নহে; প্রজাগণ অনেক সময় অর্থ-লোলুপ কর্ম্ম-চারীর দ্বারায় প্রপীড়িত হইতেছে। রাজ্যের অবস্থা শান্তি-প্রদ নহে। রাজা হরিহর প্রসাদ শোরিয়ার পরিবারভুক্ত কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ (বাভন) হইয়াছেন। আসল টিকারী-রাজগণ ভরদ্বাজ-গোত্রীয় দত্তকর্ত্তার বংশীয় ব্রাহ্মণ (বাভন); এখন টিকারীর উভয় শাখার গদীনশীন রাজাগণ দত্তকর্ত্তার পরিবারভুক্ত ব্রাহ্মণ নহেন; এখন উভয় রাজ্যের প্রজাদের অবস্থাও খুব ভাল নয়।

রাজা রণবাহাদুর সিংহ স্বীয় জীবদ্দশায় বহু অর্থব্যয়ে ছাপরা জেলার অন্তর্গত চৈনপুর-নিবাসী বাবু রাজেশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ সিংহের সহিত পৌত্রী রাজকুমারী রতনকুমারের বিবাহ দেন। ইনি মুকুন্দ-পুরের রাজাগণের অন্যতম জ্ঞাতি ছিলেন,

ইনি এক সরিয়া পরিবার-ভুক্ত ব্রাহ্মণ (বাভন) ছিলেন। ১৮৯৫ সালের ২৬শে মে তারিখে রাজকুমারী রতনকুমারী পরলোক গমন করিলে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন, তাঁহার একমাত্র কন্যা রাজকুমারী ভুবনেশ্বরী কুঁয়ার তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাজকুমারী এখন রাণী হইয়াছেন। রাজা হরিহরপ্রসাদ পরম হিন্দু এবং ভগবদ্ভক্ত ও ব্রাহ্মণসেবী তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বহু অর্থব্যয়ে তিনি ৺বারাণসীক্ষেত্রে ৺দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিকটে এক ঘাট ও সত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া অমিত যশ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রসন্তান নাই।

টিকারীর প্রবাসিক ঐতিহাসিকের গ্রন্থ হইতে আমরা অবগত হই যে নয়-আনির প্রধান মহারাণী রাজরূপ কুঁয়ার ১৮৮৪ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন, তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার একমাত্র কন্যা মহারাজ কুমারী রাধেশ্বরী কিশোরী কুঁয়ার ৯ আনা টিকারী রাজগদিতে উপবিষ্টা হন। মহারাজ রামকিষণ সিংহ ও মহারাণী রাজরূপ কুঁয়ার বহু সমারোহে দিঘ্‌বইৎ পরিবারভুক্ত শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকা প্রসাদ সিংহকে স্বীয় একমাত্র কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া টিকারী গ্রামে আনিয়া "ঘরজামাই" করিয়া রাখেন। মহারাজ কুমারী গদীনশীন হইলেন। বাবু অম্বিকা প্রসাদের সহিত তাঁহার বড় সদ্ভাব ছিল না, এবং স্বামী-স্ত্রীতে অত্যন্ত অবনিবনাও হইতে লাগিল; গৃহস্থালীর সুখ তিরোহিত হইল। বাবু সাহেবের স্বেচ্ছাচারিতা; উদ্দাম চরিত্র মহারাণীর মনঃপূত হয় নাই। ক্রমে শাসকগণ এই কথা শুনিয়া ১৮৮৫ সালের জুলাই মাসে তাঁহাকে "অক্ষম" (disqualified proprietor) বলিয়া তাঁহার ষ্টেট্ কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌এর অধীনে গ্রহণ করিলেন এবং সান্ত্বনার জন্য তাঁহাকে "মহারাণী" উপাধিতে ভূষিত করিলেন; কিন্তু এই আঘাত তাঁহার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ করিল, এই হেতু তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়াইল। মহারাণী বহু কষ্ট পান। সে কথা সেই সময়কার হিন্দু পেট্রিয়ট্ এবং অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মহারাণী ভগ্নহৃদয়ে শূন্য প্রাণে কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া অন্তিম শয্যা গ্রহণ করেন এবং ২৭শে মে ১৮৮৬ সালে একমাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র মহারাজকুমার গোপাল শরণ নারায়ণ সিংহকে রাখিয়া চির নিদ্রায় নিদ্রিতা হন। মহারাজ-কুমার গোপাল শরণ নারায়ণ সিংহ ১৮৮৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ তাঁহার রাজ্যের পরিচালনা করিতে লাগিলেন, ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে মহারাজ-কুমার ২১ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইলে নিজ হস্তে সমগ্র রাজ্য পরিচালনা করিতেছেন। মহারাজ-কুমার অতি শৈশব হইতেই সুখে এবং যত্নে ইংরাজ অভিভাবকগণের অভিভাবকতায় শিক্ষিত এবং লালিত-পালিত হইয়াছেন। অদ্যাবধি কেহ তাঁহার ক্রোধ দেখে নাই এবং উচ্চ বা অশ্লীল কথা তিনি কদাচ কাহারও সহিত কখনও কহেন না। ইংরাজের অধীনে, ইংরাজ মেম ও বালিকাদের সহিত লালিত-পালিত হওয়ায় মহারাজ ইংরাজী সভ্যতায় খুবই দীক্ষিত, শিক্ষিত এবং

অভ্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহার সমগ্র ষ্টেটের আয় এই বেবন্দোবস্ত অবস্থায় ৮।৯ লক্ষ টাকার ন্যূন হইবে না, কিন্তু উত্তম বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর অধীনে এই রাজ্যের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে, এবং আয় বাৎসরিক ২৫ হইতে ২৯ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইতে পারে। ১৯০৮ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত এই রাজ্যের আয় দেড় ক্রোরের অধিক টাকা মহারাজ কুমার দেশ ভ্রমণ, ইংরাজ মেমবিবাহ, আমোদ আহ্লাদাদিতে ব্যয় করিয়াছেন। মহারাজ কুমার কর্ণেল হইয়া বিগত মহাযুদ্ধে পঞ্চম জর্জ সম্রাট বাহাদুরের পক্ষ হইতে সৈনিকরূপে বিশেষ সাহসিকতা দেখাইয়াছেন, এবং ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের অবৈতনিক সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া বিহার প্রদেশের নাম উজ্জ্বল ও মুখরক্ষা করিয়াছেন। মহারাজ-কুমার গোপাল শরণ কর্ণ সম দানী, ইন্দ্র-সম বিলাসী, বিষ্ণু-সম অক্রোধী ও মিষ্টভাষী নরপতি। বিলাত আমেরিকা ও ভারতের যাবতীয় স্থান মহারাজ কুমার অল্পবয়সেই পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কয়েকবৎসর হইল কোর্ট অব ওয়াডের অধীন থাকাকালে [illegible] জি কুমার রুণীর কন্যা [illegible] কুমারের পাণিপীড়ন করেন, কিন্তু মহিষীর সহিত তাঁহার সেরূপ সম্পর্কই নাই।

মহারাজ-কুমার ইওরোপীয় যুদ্ধে লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল এবং পরে কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়া ফ্রান্সে গিয়া বিশেষ সাহসিকতা দেখাইয়া বিহার দেশে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছেন। মহারাজ-কুমার গোপাল শরণ সিংহ ইংরাজী সাজে সাজিয়া জাতিচ্যুত অবস্থায় থাকায় বিহারের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আছেন, সেজন্যও বটে, এবং তিনি ইংরাজী সভ্যতার বশবর্ত্তী হওয়া প্রযুক্তও বটে,—স্বীয় যাবতীয় বিশাল রাজ্য স্ত্রীশিক্ষার জন্য ট্রষ্ট করিয়া দান করিবার মনস্থ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রে খুবই আন্দোলন চলিতেছে এবং বিহারের ভূমিহার সম্প্রদায় এ সংকল্প বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। মহারাজ-কুমারের ইংরাজী শিক্ষা তাঁহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অঙ্কে নীত করিয়াছে, এখন সে বিষয়ে অনুশোচনা করিলে চলিবে না। মহারাজ-কুমার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া স্বীয় রাজ্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য ইংরাজ ম্যানেজার পরিচালন করেন।

এখন ৯ আনা টিকারী ষ্টেট্ একরূপ লয় হইতে বসিয়াছে। এই ট্রষ্ট ফণ্ডের ও স্কীমের নেতা ও পরামর্শদাতা সার আলি ইমাম, মি. হোসেন ইমাম, লর্ড সার এস্ পি সিংহ, সার রাসবিহারী ঘোষ, বাবু নন্দকিশোর লাল প্রমুখ মহোদয়গণ। আমাদের মনে হয় যে মহারাজ-কুমার যে স্ত্রী ও বালিকাদের শিক্ষা বিস্তার জন্য স্বীয় সমগ্র ষ্টেট দান করিতেছেন তাহা খুব সাধু উদ্দেশ্য হইলেও দেশের তাহাতে কতখানি লাভ হইবে বলা যায় না, তাঁহার বিত্তের [illegible]কাংশ দীন ও অসহায় ভারত সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য দান করিলে অধিক কাজের হইত কি [illegible]বা কৃষির উন্নতির জন্য বিহার প্রদেশে [illegible] আমেরিকা ও [illegible] অনুকরণে [illegible] প্রতিষ্ঠা [illegible] অথবা [illegible] জন্য [illegible] করিলে দেশের [illegible] না, সুধীবৃন্দ তাহার বিচার [illegible]

১৯০৩ সালের দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে মহারাজ-কুমারের আদেশে দশ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা দান করা হয়; লর্ড মেয়রের টান্সভ্যাল যুদ্ধ ভাণ্ডারে তিনি ৭৫০০ হাজার টাকা, গয়া হাসপাতালে চক্ষু রোগীদের চিকিৎসার জন্য এক বাড়ী ও ওয়ার্ড নির্ম্মাণ জন্য ৪০০০্ টাকা দান করেন; তাঁহার নাবালক অবস্থায় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ প্রত্যেক বৎসর প্রায় ৯ সহস্র টাকা বিদ্যা-বিস্তার-কল্পে এবং চিকিৎসার জন্য ৬১০০্টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহা ছাড়া দার্জ্জিলিঙের লুইস স্যানিটেরিয়মের রক্ষার জন্য বাৎসরিক ১০০০্ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে এবং ৪০০০্ দরিদ্রের ভোজন জন্য ও ২৫০০০্ টাকা ধর্ম্মার্থে ব্রাহ্মণদের দান করা হইয়াছে।

মহারাজ-কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া টিকারীর ম্যাট্রিকিউলেশান বিদ্যালয়টি ফ্রী করিয়া দিয়াছেন; বিহার ন্যাশানাল কলেজে বিজ্ঞান-শালা প্রতিষ্ঠার জন্য দশ সহস্র টাকা দান করিয়া এবং ১৯০৮ সাল হইতে বাৎসরিক ১৮০০ টাকা ব্যয় করিয়া তিনি প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। তিনি সম্রাট এডোয়াডের স্মরণার্থ ফণ্ডে ১৫০০০্ টাকা এককালীন দান করেন এবং প্রতিবৎসর ৮০০্ টাকা করিয়া বাঁকিপুরের Behar Industrial and Scientific Associationএ দান করিতেছেন। তিনি গয়ার জলের কলে ৫০০০০্ টাকা দান করিয়াও স্বীয় মুক্ত-হস্ততার পরিচয় দিয়াছেন। উপসংহারে আমার বক্তব্য যে, ৯ আনা টিকারীরাজ বাবু ৺নন্দকিশোর লাল, তদীয় ভ্রাতা ৺যজ্ঞেশ্বর লাল, সার আলি ইমাম, মিঃ হোসেন ইমাম প্রভৃতি বিহারের রাজনৈতিক নেতাদের কৃপায় বিগত ২২শে আগষ্ট ১৯১৭ তারিখের ট্রাষ্ট ডীড অনুসারে সমগ্র রাজ্য কন্যা পাঠশালার হিতকল্পে প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাজ-কুমার তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার ফল ভোগ করিয়া কেবলমাত্র ১২০০০্ টাকা মাসিক ভাতায় কষ্টে জীবন যাপন করিতেছেন। এখন ঐ রাজ্য ফিরাইবার চেষ্টা করা হইতেছে!

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

রাত্রির বেদনা

যাও যাও ডুবে যাও ক্লান্ত শ্রান্ত হে তপ্ত তপন,
ডুবে যাও! ফিরিয়ো না আর!
অজানা সাগর হ'তে কৃষ্ণ-পক্ষ মৃত্যু-দূত সম
উড়ে এস ঘন অন্ধকার!
জলেস্থলে দিগ্বিদিকে অদৃশ্য ও-মায়াজালখানি
ধীরে ধীরে নীরবে বিছাও;
অশান্ত চঞ্চল এই জর্জ্জরিত ক্ষুব্ধ ধরণীরে
মূঢ় মূক মুগ্ধ করি দাও!

যাক্ থেমে কোলাহল, যাক্ থেমে অজস্র উচ্ছ্বাস,
নিভে যাক্ আলোক-প্রবাহ !
আঁধার-সমুদ্র শুধু তুলি শত তরঙ্গ নিষ্ঠুর
ডুবাইয়া দিক্ সব দাহ।
রন্ধ্রহারা অন্ধকার বুকে মোর রহুক চাপিয়া
জগদ্দল শীতল পাথর।
তারি তলে ধীরে ধীরে মরে যাক্ অস্ফুট বাসনা
হোক হিয়া নিস্পন্দ নিথর।

রশ্মিরসে আর্দ্র মেঘ ভাসে দূর পশ্চিম গগনে
যেন কার সোণার স্বপন।
বিদায়ের স্মৃতিমাখা ছল ছল তরল আকাশ
ঝুরিয়া মরিছে অনুখন।
তটিনী কোথায় ওগো। দিবসের উষ্ণ আঁখিজল
কার টানে ওই ব'য়ে যায়,
মাঝিদল অশ্রু সেঁচে তরী বেয়ে পারেনাকো আর
অবশেষে কূলেতে ভিড়ায়।
মুক্তিলোভী প্রাণগুলি উড়ে আসে বাদুড়ের মত
মূর্চ্ছাহত করি গ্রামটীরে ;
নদীর ওপার হ'তে দীঘ ডানা দোলায়ে আকাশে
কোন্ পারে ভেসে যায় ধীরে।
আঁধার ঘনায়ে আসে, সহস্রাক্ষ নীরব আকাশ
চেয়ে রয় চির-লোভাতুর।
যুগে যুগে কার প্রেম ওরে হায় রেখেছে ভুলায়ে
কার প্রেম এমন প্রচুর।

উজল দিনের আঁখি ভেরে আসে স্নিগ্ধ অন্ধকারে
বন্ধ হয়ে আসে গীত-গান ;
অমনি মরণরূপে এস তুমি শীতল আঁধার
ভরি দাও তৃষিত নয়ান।
উদ্দাম ঝটিকা যথা ছুটে আসে উন্মাদের মত
লিধ্বজা উড়াধুয়ে অম্বরে,

তেমনি আমারে আজি করি লও পতাকা তোমার
ধেয়ে চল দূর-দূরান্তরে !
ভাল মন্দ ভাবিবার অবসর দিয়োনা দিয়োনা
স্পন্দিত ও-বক্ষে তুলে নাও,
অকস্মাৎ ঘূর্ণিবেগে গৃহহারা জীর্ণ পত্রসম
নিয়ে চল উধাও ! উধাও !
যে দিকে চাহিয়া দেখি ঘন কালো আঁধারের ঝড়
কূলে কূলে ঘিরে ঘিরে আসে,
দেখি চেয়ে নদীবুকে অকারণে চঞ্চলতা জাগে
ভরে প্রাণ প্রচণ্ড উল্লাসে !

রাত্রি আসে শান্তিময়ী—সেকি শুধু মিথ্যা একেবারে ?—
প্রাণে মোর শান্তি নাহি হায় !
দুঃখ-মেঘ ছিল কোথা, করি দিল সহসা মলিন
জীবনের তরুণ উষায় !
বিরহী হৃদয় মোর ভেঙে ভেঙে পড়িছে নিয়ত
নিজেরে সে রুধিতে না পারে ;
স্বপনে দেখেছে কারে ; কার যেন পেয়েছে পরশ,
কাছে শুধু পায়নি তাহারে !
আকাশে এঁকেছি যায় তারি লাগি দু-বাহু বাড়াই
ভুল ক'রে ফিরে ফিরে আসি,
মানসী মুরতিখানি বাসনায় লুকায় চকিতে
ব্যথা পেয়ে আঁখিজলে ভাসি !
ফিরে দাও ! ফিরে দাও ! হে রজনী, কোরোনা বঞ্চনা
ফিরে দাও বাঞ্ছিত নিধিরে—
তপ্ত হিয়া শান্ত হোক্, ঝরে যাই মরে যাই আমি
তারে দুটি বাহুপাশে ঘিরে !

আশা-ভরা স্বপ্ন-ভরা কোন্ দূর কল্প-লোক মাঝে
আছ তুমি হে বন্ধু আমার !
আজি এ নিশীথ রাতে এস নেমে নীরবে নিভৃতে
নিয়ে তব সৌন্দর্য্য অপার !
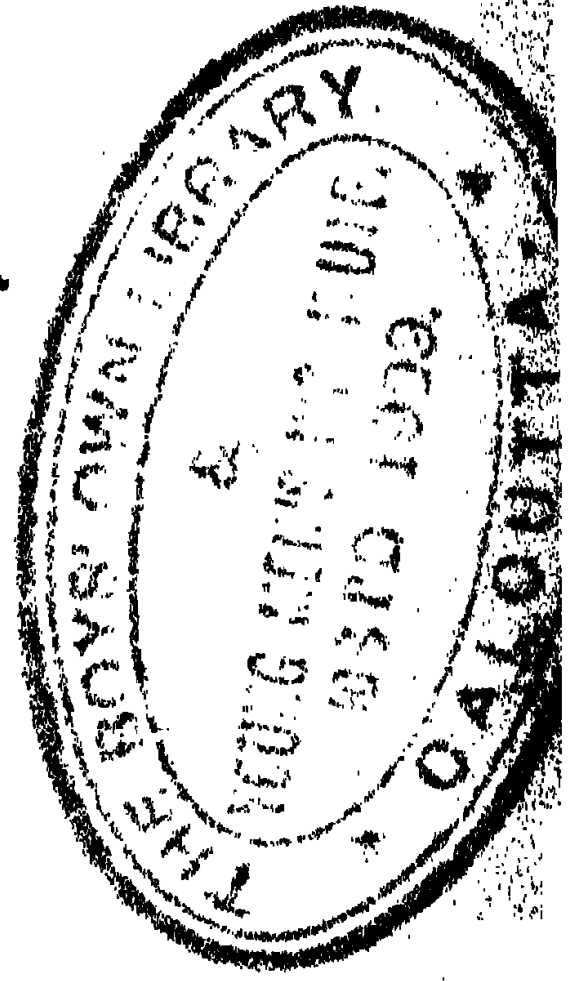
এস নেমে এস হেথা অসঙ্কোচে ব'স মোর কাছে
অন্ধকার রচিবে আড়াল,
হৃদয়ের যত কথা হাতে হাতে হবে বিনিময়
মৌন হ'য়ে রব চিরকাল !
ক্ষুদ্র এ কুটীরে মম আমাদেব দুজনের স্থান
হবে নাকি, ভাব মনে মনে ?
নাহি থাক্ আয়োজন, মালা ক'রে মোর দেহখানি
কণ্ঠে তব পরাব যতনে।
বিবশ আকাশ অঙ্গে কার তপ্ত চুম্বন নিবিড়
হের ওই জ্বলে অগণন।
তুমিও অমনি চুপে ঢাল মোর মুগ্ধ আঁখি পাতে
প্রেমভরা সহস্র চুম্বন।

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

ক্রমবিকাশ-পদ্ধতির সাধারণ মূল তত্ত্ব

আমরা ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ-মূলক ইতিহাসের আলোচনা সমাপ্ত করিলাম। এখন দেখা যাক্, অতীত ভারত হইতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করিলাম। এক্ষণে উহা হইতে আমরা ভাবী ভারত সম্বন্ধে কতক গুলি সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিব।

*

* *

প্রথমে আমরা ঐতিহাসিক বিজ্ঞানে প্রযুক্ত ক্রমবিকাশ-পদ্ধতির কতকগুলি সাধারণ তত্ত্ব সংস্থাপন করিব।

মানবীয় সভ্যতা একটিমাত্র এবং উহার ক্রমবিকাশ নিয়তির ন্যায় অনিবার্য্য। কিন্তু হেগেল-দর্শনের দার্শনিক অর্থে ইহা গ্রহণ করিতে হইবে না; সভ্যতার অর্থে—"অনিবার্য্য ক্রমাভিব্যক্তির দ্বারা বিশ্ব-আত্মার ক্রমবিকাশ" বুঝিতে হইবে না। হেগেল বলেন "এই যে আত্মা যাহার স্বরূপ চিরকাল এক ও একই প্রকার কিন্তু যাহা ক্রমশ বিকসিত হইতেছে,—এই আত্মার গুটান পাক্‌গুলি জগৎ সত্তার মধ্যে ক্রমশঃ খুলিয়া যাইতেছে।" আমরা বলি, সমগ্র মানব-সভ্যতা বিশেষ বিশেষ সভ্যতা-পরম্পরাব দ্বারাই গড়িয়া উঠে। এই সভ্যতা একমাত্র; কারণ, একই প্রণালী অনুসরণ করিয়া বিশেষ বিশেষ সভ্যতাগুলি সাধারণ সভ্যতার মধ্যে বিলীন হইবার দিকে উন্মুখ; এবং আমাদের মনে হয়, ক্রমাভিব্যক্তি যে অনিবার্য্য তাহার কারণ, একই মানব-প্রকৃতি ও পৃথিবীর গঠন গোড়ার ধরিয়া লইলে মানব-

সমাজগুলির বিভিন্ন ক্রমাভিব্যক্তি আমরা কল্পনা করিতে পারি না। যে সকল উপাদান জীব-জন্তুর ক্রমাভিব্যক্তিকে একটা নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে, তাহার সহিত এই ক্রমাভিব্যক্তির উপাদানের তুলনা করা যাইতে পারে। উপাদানগুলি যথা—ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য বা অবান্তর ভেদ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাচন, এবং বহুবিধ আকারে জীবন-সংগ্রাম।

বস্তুত সন্তানের চরিত্রগত কোন লক্ষণই যদি পিতা-মাতার চরিত্রে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে মানব-জাতি কখনো যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন দুইটি জীবের যৌন-মিলন হইতে যে জীব উৎপন্ন হয় তাহা উভয় হইতেই পৃথক। সকল সন্তানই জন্ম হইতেই কতকগুলি ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য সঙ্গে করিয়া আনে এবং সেইসকল বৈলক্ষণ্য তাহাদের জীবনে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তন্মধ্যে কতকগুলি বৈলক্ষণ্য একটা বিশেষ আব্-হাওয়ায় কিংবা একটা বিশেষ সামাজিক অবস্থায় মনুষ্যের অনুকূল এবং বংশানুক্রমিক হইবার দিকে উন্মুখ হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা নহে যে, পুত্র পিতার নিকট স্থূল মাংসপেশী কিংবা কোন কোন ব্যাধি হইতে অব্যাহতি সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কোন বংশ বা জাতির পক্ষে যে সকল পরিবর্ত্তন হিতকর, তাহা আকস্মিক ঘটনা নহে; আব-হাওয়ার প্রভাবের মধ্যে উহার মূলকারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে, ঐ প্রভাবের ফলে, কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে ঐ-সকল পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক উত্তর-বংশে, এইরূপ পরিবর্ত্তিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আব্হাওয়া ও জীবন-প্রণালী উহাদের জীবনের বিশেষ অনুকূল হওয়ায়, উহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী হয়, অধিক অপত্য উৎপাদন করে, আদিম-মানবের ছাঁচ্টি ক্রমশ উহাদের মধ্য হইতে বিলুপ্ত হয়; যে সকল বৈলক্ষণ্য ব্যক্তিগত ছিল, তাহা জাতিগত হইয়া দাঁড়ায় এবং পরে বংশানুক্রমিক লক্ষণে পরিণত হয়।

মানুষের মধ্যে কৃত্রিম নির্ব্বাচন, বা স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাচন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের চিরসহচর। বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে, কোন ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য, যে সকল লোককে অপেক্ষাকৃত অধিক বলশালী করিয়া তুলে, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ ও সুন্দরী নারী লাভ করে; তাহারা অন্য ব্যক্তিদিগকে হত্যা করে কিংবা দাসে পরিণত করে, অবশেষে তাহাদের যে-সকল অপত্য সুকুমার ও কু-গঠন হয় তাহাদিগকে উহারা পরিত্যাগ করে কিংবা বধ করে। অপেক্ষাকৃত সভ্যজাতির মধ্যে, যে সকল ব্যক্তির দৈহিক আকৃতি কোন কোন বিশেষ সমাজের প্রয়োজনানুরূপ হয়, তাহারা নারীর অনুগ্রহ,জনসাধারণের [illegible] কার্য্যে সফলতা, ও ধন-ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া পুরস্কৃত হয়। এইরূপে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাচনের সম্মিলনে, কোন দেশের লোক বা কোন রাষ্ট্রজাতি (nation) বিভিন্ন মানসিক প্রকৃতি লাভ করে। এইরূপে, কতকগুলি দৈহিক গুণের নির্ব্বাচনের সহিত, কতকগুলি মানসিক বা নৈতিক গুণের নির্ব্বাচনও সংযুক্ত হয়। যাযাবর ও লুণ্ঠন-জীবী

জাতিদিগের মধ্যে, চৌর্য্য ও হত্যাকাণ্ড সম্মানের কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু যখনই কোন জাতি কৃষিজীবী ও স্থিতিশীল হইয়া পড়ে, তখনই উহাদের মধ্যে হত্যাকারী ও দস্যু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়, এবং ঐ সকল হত্যাকারী ও দস্যুদের সন্তান-সন্ততিকে উহারা হত্যা করে কিংবা দাসে পরিণত করে। কোন বিশেষ মনোবৃত্তির উৎকর্ষ বশত যাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক নিপুণ কিংবা উদ্ভাবনীশক্তি-সম্পন্ন হয়, তাহারা কতকগুলি বিশেষ ব্যবসায় আবিষ্কার করিয়া থাকে এবং ঐ সকল ব্যবসায়ের গুপ্তকথা উহারা সযত্নে রক্ষা করে। এই নূতন প্রণালীর নির্ব্বাচনের দ্বারা, কতকগুলি পৃথক সামাজিক শ্রেণী গঠিত হয়, এবং উহাদের কৌলিক প্রবণতাগুলি পুরুষানুক্রমে বৃদ্ধি পায়। দৈহিক প্রকৃতির ন্যায়, প্রত্যেক জাতির নৈতিক চরিত্রও এইরূপে গড়িয়া উঠে এবং ঐ সকল চরিত্র লক্ষণের দ্বারা এই জাতির ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, শাসন, বিধিব্যবস্থা, রীতিনীতি এবং সমাজের সাধারণ গঠন-প্রণালীও পরিচিহ্নিত হয়।

জীবজন্তু অপেক্ষা মানুষের মধ্যে যেরূপ নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়া সমধিক প্রবল এবং তাহারই ফলে, কোন জাতি বা লোকসঙ্ঘের ছাঁচটি যেরূপ চিরস্থায়ী হইবার দিকে উন্মুখ হয়, সেইরূপ মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত ভেদও অসংখ্য ও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

এই সকল ভেদের মধ্যে কতকগুলি ভেদের লক্ষণ নিছক্ ব্যক্তিগত; তাই, এই সকল লক্ষণ,—কি দৈহিক-হিসাবে, কি নৈতিক হিসাবে,—বংশানুক্রমিক নহে। Nietzscheর মতো মনে করা যাইতে পারে যে, প্রতিভা গড়িয়া তোলাই বিশ্বমানবের বিশেষ কাজ।

তাছাড়া, প্রকৃত মৌলিক গুণের দ্বারা প্রতিভাবানেরা বিশ্বমানবের উপর প্রভাব প্রয়োগ করে না, পরন্তু যে সকল গুণ কোন বিশেষ যুগে, বহুব্যক্তির প্রবণতাকে একত্র জুড়িয়া সংশ্লিষ্ট করে, কেবল সেই সকল গুণের দ্বারাই প্রতিভাবানেরা বিশ্বমানবের উপর প্রভাব প্রয়োগ করে।

কোন জাতির পক্ষে হিতকর এই সকল অবান্তর ভেদ হইতে কতই দৈহিক পার্থক্য, বিশেষত কতই নৈতিক পার্থক্য উৎপন্ন হইয়াছে!

কতকগুলি ব্যক্তি-বিশেষই, ধাতুর ব্যবহার ও অগ্নির ব্যবহার আবিষ্কার করিয়াছে, খাদ্য-সামগ্রী রন্ধন করিতে শিখিয়াছে, এবং আধুনিক কালে, সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছে; ব্যক্তি-বিশেষই, ভাষাকে একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ প্রদান করিয়াছে এবং সাহিত্যের ক্রম-বিকাশকে একটা বিশেষ পথে পরিচালিত করিয়াছে। বিশ্বমানব উন্নতির পথে যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য বৃদ্ধি পাইতেছে, ও পরিস্ফুট আকার ধারণ করিতেছে। পক্ষান্তরে, সভ্যতার জটিলতা বৃদ্ধি হইতে থাকায়, এই সকল বৈলক্ষণ্যের অধিক অংশই সমাজের হিতকর হইতেছে। এইজন্যই,—সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে, জাতির চিরস্থায়িত্ব ও জাতির

পরিবর্ত্তনশীলতা—এই দুয়ের মধ্যে যে যোঝাযুঝি চলিতেছে, বিশ্বমানবের ইতিহাসে এই যোঝাযুঝির এতটা গুরুত্ব।

সমস্ত অর্জ্জিত লক্ষণ সংরক্ষিত হয় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা (যথা, কোন বিশেষ দেশের আব্‌হাওয়া, কোন বিশেষ দৈহিক প্রকৃতির উপযোগী হয় এবং কোন বিশেষ ঐতিহ্যের ফলে কতকগুলির বিশেষ অভ্যাস গড়িয়া উঠে) এবং স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাচনের দ্বারা (যথা ধর্ম্ম, বিধিব্যবস্থা, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতি)। কিন্তু নূতন নূতন চরিত্র-লক্ষণও আত্মপ্রতিষ্ঠাসাধনে সমর্থ হয়। প্রথমে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা:—ভৌতিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থা, এবং অত্যন্ত-লোকাকীর্ণ স্থান হইতে অন্যত্রগমন। তাহার পর স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাচন:—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বিপ্লব, দিগ্‌বিজয়, এবং যে সকল যন্ত্র উদ্ভাবনের দ্বারা ধনবৃদ্ধি হয় এবং রীতিনীতি পরিবর্ত্তিত হয় সেই সকল যন্ত্রের উদ্‌ভাবন। এই উভয় প্রকার নির্ব্বাচন বা নির্ব্বাচনের প্রবণতাই সমান হিতকর। ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য উৎপন্ন না হইলে বিশ্বমানব উন্নতির পথে অগ্রসর না হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে, এইসকল অবান্তর-ভেদের দ্বারা, অনেক সময়, যাহা নিতান্ত ব্যক্তিগত চরিত্র, তাহাই উপরঞ্জিত হয়; তাছাড়া, প্রতিভা,—প্ররোচনার দ্বারা অথবা বলের দ্বারা, এমন সব রীতিনীতি ও বিশ্বাস কোন সমাজের উপর চাপাইতে পারে, যাহা সমগ্র সমাজের স্বার্থবিরুদ্ধ; কিন্তু অর্জ্জিত লক্ষণের প্রতি সৌভাগ্যক্রমে জনসাধারণের বিশেষ আস্থা ও আসক্তি থাকা প্রযুক্ত কোন্ অনিষ্টকর প্রভাব দীর্ঘকাল আধিপত্য করিতে পারে না।

এই উভয় নির্ব্বাচন প্রবণতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব-সভ্যতা, সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্রমাগত সাধারণ হইতে সাধারণতর ও জটিল হইতে জটিলতর পথে অগ্রসর হইতেছে। উহাদের প্রধান উপকরণ—লোকসংখ্যার বৃদ্ধি এবং নৈতিক সভ্যতা ও ভৌতিক সভ্যতার পুষ্টিসাধন। এই লোক-সংখ্যার বৃদ্ধিই প্রথমে শাখাজাতিদিগকে, পরে ভিন্ন দেশের লোককে কাছাকাছি আনিয়াছে; ভৌতিক সভ্যতার ক্রমোন্নতিই, বড় বড় রাজ্যের জয়-সাধনে ও শাসনকার্য্য পরিচালনে এবং সুদূরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে নিয়মিত ও সহজ গতিবিধি স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে। এবং একই পর্য্যায়ের মধ্যে সেই সব বড় বড় মানসিক ও নৈতিক আন্দোলন সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে যাহা অতিদূরস্থ বিভিন্ন দেশের লোককে, বিভিন্ন রাষ্ট্রজাতিকে, একই মতামত, একই চিন্তা, একই মনোভাব প্রদান করিয়াছে, এমন কি, ব্যক্তি-বিশেষের উপর ও সমগ্র সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া সাম্য, স্বাধীনতার স্পৃহার দ্বারা এবং দয়া, প্রেম, ও পারত্রিক বিশ্বাসের দ্বারা, কতকগুলি সাধারণ দৈহিক গুণও প্রদান করিয়াছে।

বিশ্বমানবের এই দুই সংশ্লেষণ-ব্যাপারের মধ্যে প্রত্যেকটিই দুই প্রকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে, অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ সংশ্লেষণ প্রভাবে যে সকল চরিত্র-লক্ষণে মানবের মূল ছাঁচটি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল,

সেই-সব লক্ষণের পরিবর্ত্তন কিংবা ক্রমশ বিলোপসাধন; তাহার পর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাচনের দ্বারা নূতন নূতন চরিত্র-লক্ষণের সমুৎপাদন। এইরূপে শাখাজাতির ও গোত্র সমূহের মূল-ছাঁচ, বিশ্বাস, ও রীতি-নীতি—প্রদেশ সমূহের মূল-ছাঁচ, বিশ্বাস ও রীতি নীতির সহিত মিশিয়া গিয়া এক হইয়া যায়। এবং আজিকার দিনে, পৃথিবীর বড় বড় 'নেশনেরা' (রাষ্ট্রজাতিরা) নিজের মৌলিকতা বজায় রাখিয়াও একই সাধারণ সভ্যতা গ্রহণ করিতেছে।

অতঃপর উপরি-বিবৃত মূল-তত্ত্বগুলি আমরা ভারতের ইতিহাসে প্রয়োগ করিব।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোর ফুল্‌কি

[৫]

কুঁকড়ো নিজে যেমন, তেমনি কাউকে ভোরে উঠতে দেখলে ভারি খুসি! সোনালিয়াকে দেখে বল্লেন, "বাঃ তুমি তো খুব সকালে উঠেছো! বেশ, বেশ!" কিন্তু সোনালিয়া চিনেমুর্গির চা-পার্টিতে যাবার জন্যেই খালি আজ এত সকালে বিছেনা ছেড়ে বেরিয়েছে শুনে কুঁকড়ো ভারি দমে গেলেন। কুঁকড়ো স্পষ্ট বল্লেন, তিনি ওই চিনেমুর্গিটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। কিন্তু সোনালিয়া ছাড়বার নয়, সে তবু কুঁকড়োকে চিনেমুর্গির মজলিসে [illegible] পেড়াপিড়ি করে [illegible]—"দেখি, তুমি আমার কথা রাখো কি না?"

কুঁকড়ো তবু যেতে রাজি নয়, তখন সোনালিয়া অভিমান করে বল্লে—"তবে আমি এখনি বাড়ি চলে যাই?" কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি বলে ফেল্লেন—"না সোনালি, এখনি যেওনা!" সোনালি অমনি সুযোগ বুঝে বল্লে—"তবে যাবে বল চিনিদিদির বাড়িতে!" কুঁকড়ো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন—"আচ্ছা তাই, আমিও যাব!" কথাটা বলেই কুঁকড়ো মনে মনে নিজের উপর খুব চট্‌লেন,—মেয়েরা যা আবদার করবে, তাই কি মান্‌তে হবে?

সোনালি কুঁকড়োর ভাব বুঝে মনে মনে হাসতে লাগলো। কুঁকড়োকে চিনিদিদির বাড়ীতে নিয়ে যেতে সে খুব ব্যস্ত ছিল না; সে কুঁকড়োর কাছ ঘেঁসে বল্লে—"তোমার সেই মন্তরের কথাটি বলনা, শুনি-ই-ই—"

কুঁকড়ো একটু গম্ভীর হলেন, সোনালি বল্লে—"বলোনা-বলো-বলো-বলোনা!"

কুঁকড়ো এবারে গদ-গদ স্বরে "সোনালী আমার মনের কথাটি—"বলে আবার চুপ করলেন—সোনালি বলে চল্লো, "বনের মধ্যে বসন্তকালের চাঁদনীতে সারারাত কাটিয়ে একলাটি আমি বনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি—সকালের আলো আকাশে ঝিলিক দিয়ে উঠলো, আর অমনি শুনলেম, তোমার ডাক দূর থেকে আসছে—যেন দূরে কার বাঁশী বাজছে!"......বনের রাণী সোনালিয়া পাখি সকালের সোনার আলোতে একলাটি

দাঁড়িয়ে কান পেতে তাঁর গান শুনছে একমনে, এ খবর পেয়ে কোন্ গুণীর না মনটা নরম হয়। কুঁকড়ো ঘাড় হেলিয়ে ভাবতে লাগলেন, বলি কি না বলি? সোনালিয়া মিঠে সুরে আরম্ভ করলে রূপকথা, "এক যে ছিল কুঁকড়ো আর যে ছিল বনের টিয়া—" কুঁকড়ো ভুল ধরলেন, "হলোনাতো, হলোনাতো"; তারপর নিজেই রূপকথার খেই ধরলেন—"কুঁকড়োর পিয়া ছিল সোনালিয়া, বনবাসিনী বনের টিয়া।" সোনালিয়া বলে উঠলো, "কুঁকড়ো টিয়াকে কখনো বল্লে না রূপকথার নিতিটুকু"...বলতেই কুঁকড়ো সোনালিয়ার কাছে এসে বল্লেন, "জানো, সে কথাটা কি! যেটা বনের টিয়েকে কুঁকড়ো বলতে সময় পেলেনা? কথাটা হচ্ছে—তোমার সোনার আঁচল বসন্তের বাতাস দিয়ে গেল সোনালিয়া বনের টিয়া।" সোনালি গম্ভীর হয়ে বল্লে—"কি বকছেন আপনি! রূপকথা শোনাতে হয়তো আপনার চার বৌকে শোনান্ গিয়ে, খুসি হবে" বলেই সোনালি অন্যদিকে চলে গেল।

কুঁকড়ো রেগে গজ গজ করে ঘুরে বেড়ান, অনেকক্ষণ পরে সোনালি আস্তে আস্তে কুঁকড়োর কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্লে "একটা গান গাও না!" কুঁকড়ো ফোঁস্ করে উঠলেন, সোনালি বল্লে, "বাস্‌রে, একে বুঝি বলে গান!" তখন মিষ্টি সুরে কুঁকড়ো ডাকলেন—সো ও-ও-ন্ যেন শ্যামা পাখী সিটি দিলে—সোনালি অমনি আবদার ধরলেন, কুঁকড়োর গুপ্ত মন্তরটি শোনবার জন্যে। কুঁকড়ো খানিক এদিক ওদিক করে বল্লেন—"সোনালি তুমি বাইরে যেমন খাঁটি সোনার বুকের ভিতরটাও যদি তেমনি তোমার খাঁটি হয়, তবে তোমায় আমার গোপন কথাটি শোনাতে পারি বলে সোনালির মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে যেন শুনতে লাগলেন, সোনালির বুকের মধ্যে থেকে ডাক আসছে কি না—বল বল। তারপর কুঁকড়ো আরম্ভ করলেন—সোনালি পাখী, বুঝে দেখ আমি কি, সোনার শিঙ্গার মতো বাঁকা আমি বাজবার জন্যেই সৃষ্টি হয়নি কি জীবন্ত এক রৌসন-চৌকী? জলের উপরে যেমন রাজহাঁস, তেমনি সুরের তরঙ্গে ভেসে বেড়াতেই আমার জন্ম, আমি চলেছি সুরের বোঝা শব্দের ভার বয়ে সোনার একটি মউরপঙ্খি, সকাল-বিকাল।"

সোনালিয়া বলে উঠলো—"নৌকোর মতো ভেসে বেড়াতে তো তোমায় কোনদিন দেখিনি, মাটি আঁচড়াতে প্রায়ই দেখি বটে!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"মাটি আঁচড়াবার অর্থ আছে। তুমি কি মনে কর, আমি মাটি আঁচড়াই, মাসকলাই সংগ্রহ করতে? সে করে মুরগীরা, আমি মাটি আঁচড়ে দেখি [illegible]ন্ মাটি আমার উপযুক্ত [illegible] বেদী হবে [illegible]রে। আমি জানি, গান গাওয়া মিছে হবে [illegible] ইট-পাটকেল ঘাস-কুটো-কাঁটা সব স[illegible]য়ে এই পুরোনো পৃথিবীর কালো মাটির পর[illegible] খানি নিতে ভুলি! পৃথিবীর বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে নিজেকে একেবারে মিলিয়ে তবে আমি গান করি। সোনালিয়া, প্রায় সবই তো শুনলে, আরো যদি জানতে চাও তো বলি, আমাকে সুর খুঁজে খুঁজে তো গান গাইতে হয় না—সুর

আপনি, ওঠে আমার মধ্যে, মাটি থেকে লতায় পাতায় রস যেমন করে উঠে আসে, গানও তেমনি করে আমার মধ্যে ছুটে আসে আপনি, জন্মভূমির বুকের রস! পূব্ আকাশের তীরে সকালটি ফুটি-ফুটি করছে, ঠিক সেই সময় আমার মধ্যে উথলে উঠতে থাকে সুর আর গান, বুক আমার কাঁপতে থাকে তারি ধাক্কায়, আর আমি বুঝি, আমি না হলে সরস মাটির এই সুন্দর পৃথিবীর বুকের কথা খুলে বলাই হবে না। সকালের সেই শুভ লগ্নটিতে মাটি আর আমি যেন এক হয়ে যাই, মাটির দিকে আমি আপনাকে নিয়ে যাই, আর পৃথিবী আমাকে সুন্দর শাঁখের মত নিজের নিশ্বেসে পরিপূর্ণ করে বাজাতে থাকে, আমার মনে হয় তখন আমি যেন আর পাখী নই, আমি যেন একটি আশ্চর্য্য বাঁশি, যার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর কান্না আকাশের বুকে গিয়ে বাজছে!

অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভোর রাতের হিম মাটি এই যে কাঁদন জানাচ্ছে, আকাশের কাছে তার অর্থ কি সোনালিয়া—সে আলো ভিক্ষে করছে, [illegible] সোনার আলো-[illegible]দিন তারি প্রার্থনা, ভোর বেলার সবাই কাঁদছে, দেখবে, আলো চেয়ে, গোলাপের কুঁড়ি সে অন্ধকারে কাঁদ্ছে আর বলছে, আলো দিয়ে ফোটাও। ওই যে খেতের মাঝে একটা কাস্তে চাষারা ভুলে এসেছে, সে ভিজে মাটিতে পড়ে মর্‌চে ধরে মরবার ভয়ে চাচ্ছে আলো, একটু আলো এসে যেন রামধনুকের রংএ চারিদিকের ধানের শিষ রাঙিয়ে দেয়!

নদী কেঁদে বলছে, আলো আসুক, আমার বুকের তলা পর্য্যন্ত গিয়ে আলো পড়ুক! সব জিনিষ চাচ্ছে যেন আলোয় তাদের রং ফিরে পায়, আপনার-আপনার হারানো ছায়া ফিরে পায়, তারা সারারাত বলছে, আলো কেন পাচ্ছিনে—আলো কি দোষে হারালেম?

আর আমি কুঁকড়ো তাদের সে কান্না শুনে কেঁদে মরি, আমি শুনতে পাই ধান ক্ষেত সব কাঁদছে, শরতের আলোয় সোনার ফসলে ভরে ওঠবার জন্যে, রাঙামাটির পথ সব কাঁদছে—যারা চলাচল করবে তাদের ছায়ার পরশ বুকের উপর বুলিয়ে নিতে আলোয়। শীতে গাছের উপরের ফল আর গাছের তলার গোল গোল নুড়িগুলি পর্য্যন্ত আলো তাপ চেয়ে কাঁদছে, শুনি। বনে বনে সূর্য্যের আলোক কে না চাচ্ছে বেঁচে উঠতে জেগে উঠতে, কে না আলোর জন্যে সারা রাত কাঁদছে? এই জগৎশুদ্ধ সবার কান্না আলোর প্রার্থনা এক হয়ে যখন আমার কাছে আসে তখন আমি আর ছোট পাখীটি থাকিনে, বুক আমার বেড়ে যায়, সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে শুনি আমার দুই পাঁজর কাঁপিয়ে, তারপর আমার গান ফোটে—আ লো-র-ফুল! আর তাই শুনে পূবের আকাশ গোলাপি কুঁড়িতে ভরে উঠতে থাকে, কাক সন্ধ্যার কা কা শব্দ দিয়ে রাত্রি আমার গানের সুর চেপে দিতে চায়, কিন্তু আমি গেয়ে চলি, আকাশে কাগভিমে রং লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল, তারপর হঠাৎ চম্‌কে দেখি আমার বুক

সূর্য্যের রঙে রাঙা হয়ে গেছে আর আকাশে আলোর জবাফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি আমি পাহাড়-তলীর কুঁকড়ো!"

সোনালি অবাক হয়ে বল্লে—"এই বুঝি তোমার মন্তর?"

"হাঁ সোনালি, মন্তরটা আর কিছু নয় —আমি থাকলে পূব-আকাশে সব আলো ঘুমিয়ে থাকতো এই বিশ্বাসটা আমি করতে পেরেছি এইটুকুই আমার ক্ষমতা, তা একে মন্তরই বল বা তন্তরই বল কিম্বা অন্তরই বল"—বলে কুঁকড়ো এমনি ঘাড় উঁচু করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন যে মনে হল যেন তিনি বলছেন ঘাড় হেঁট হয় এমন কায আমি করিনে, আমি নিজের গুণগান করে বেড়াইনে, আমি আলোর জয়-জয়-কারই দিই, আমি জোরে গাই নিজের গলার রেস্ নিজে শোনবার জন্যে নয়, আমি জোরে গাই আলোতে সব পরিষ্কার হয়ে ফুটবে বলে।"

কুঁকড়ো যতক্ষণ বলে চলেছিলেন ততক্ষণ সোনালি সব ভুলে তাঁর কথাই শুনছিল, এখন কুঁকড়ো চুপ করতে তার চট্‌কা ভেঙে গেল, কুঁকড়োর কথায় তার অবিশ্বাস হল; সে বলে উঠলো, "এ কি পাগলের কথা! তুমি—তুমি ফুটিয়ে দাও আকাশে..."

"সেই জিনিষ যা চোখের পাতা মনের দুয়ারে এসে ঘুমের ঘোমটা খুলে দেয়! আকাশ যে দিন মেঘে ঢাকা, সে দিন জানবো, আমি ভালো গাইনি।"

"আচ্ছা, তুমি যে দিনের বেলাও থেকে থেকে ডাক দাও তার অর্থটা কি, শুনি!" সোনালি শুধোলো।

কুঁকড়ো বল্লেন, "দিনের বেলায় এক-একবার গলা সেধে নিই মাত্র! আর কথনো বা ঐ লাঙলটাকে নয়তো কোদালটাকে ঐ ঢেঁকি ও ঐখানে ওই কুড়ুল এই কাস্তেকে বলি, ভয় নেই, আলোকে জাগিয়ে দিতে ভু-ল-বো-না ভু-ল-বো-না!"

সোনালি বল্লে, "ভালো, আলোকে যেন তুমি জাগালে, কিন্তু তোমাকে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেয় কে, শুনি?"

"পাছে ভুল হয়, সেই ভয়েই আমি জেগে উঠি।"

কুঁকড়োর জবাব শুনে সোনালির তকরার করবার ঝোঁক বাড়লো বই কমলো না; সে বল্লে, "আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, সত্যিই তোমার গানে জগৎ জুড়ে আলোর বান ডাকে?"

কুঁকড়ো বল্লেন—"জগৎ জুড়ে কি হচ্ছে তার খবর আমি রাখিনে, আমি কেবল এই পাহাড়তলিটির আলোর জন্যে গেয়ে থাকি, আর আমার এই বিশ্বাস যে, এ পাহাড়ে যেমন আমি, ও পাহাড়ে তেমনি সে, এমনি এক-এক পাহাড়তলীতে এক-এক কুঁকড়ো রোজ রোজ আলোকে জাগিয়ে দিচ্ছে!" সোনালির সঙ্গে কথা কইতে রাত [illegible] এল। কুঁকড়ো দেখলেন, সকালের জানান্ দেবার সময় হয়েছে,—তিনি সোনালিকে বল্লেন—"সোনালি, আজ তোমার চোখের সাম্‌নে সূর্য্য ওঠাবো, আমাকে পাগল ভেবোনা, দেখো এবং বিশ্বাস কর। আজ যে গান আমার বুকের মধ্যে গুম্‌রে উঠছে, তেমন গান আমি কোনদিন গাইনি, গানের সময় আজ তুমি কাছে দাঁড়াবে, আমার মনে

হচ্ছে, আজ সকালটি তাই এমন আলোময় হয়ে দেখা দেবে যে তেমন সকাল এই পাহাড়-তলীতে কেউ কখনো দেখেনি সোনালিয়া।” বলে কুঁকড়ো চালুর উপরে গিয়ে দাড়ালেন। নীল আকাশের গায়ে যেন আঁকা সেই কুঁকড়োকে কি সুন্দরই দেখাতে লাগলো! সোনালি মনে মনে বল্লে, “এঁকে কি অবিশ্বাস করতে পারি!” এইবার কুঁকড়ো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, গায়ের রঙিন পালক ঝাড়া দিয়ে। সোনালি দেখলে, তাঁর মাথার মোরগ-ফুলটা যেন আগুনের শিখার মতো রগ্‌ রগ্‌ করছে। পূবদিকে মুখ করে কুঁকড়ো ডাক দিলেন, ক ক্রী-ই-ই র্‌ ক-ক্রী-র ...সোনালি শুনলে কুঁকড়ো যেন পূব আকাশকে হুকুম দিলেন কায সুরু কর আর অমনি মাটিব হুকুম কাযের সাড়া সকালের বাতাসে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছুটে গেল—ভোর ভয়ি ভো-র-ভ-য়ি হাঁকতে হাঁকতে। তারপর সোনালি দেখলে, কুঁকড়ো যেন সব কাদের সঙ্গে কথা কইছেন—বাদল্‌ বসন্তের চেয়ে দুদণ্ড আগে তোমার আলো এনে দেবো ভয় নেই, সোনালী [illegible] তিনি একবাব মাটির কাছে মুখ নামিয়ে একবার ও-ঝোঁপ এ-ঝোঁপের দিকে মুখ ফিরিয়ে কখনো ঘাসগুলির পিঠে ডানা বুলিয়ে কত কি বলছেন—যেন সবাইকে তিনি অভয় দিচ্ছেন আর বলছেন দেবো দেবো, আলো দেবো, রোদ দেবো, হিম আঁধার ঘুচবে, ভয় কি ভয় কি! অণু পরমাণু ধূলো বালি তারা—কুঁকড়োর কাণে কাণে কি বলে গেল, কুঁকড়ো ঘাড় নেড়ে বল্লেন —দোলনা চাও, আচ্ছা, দোলনা দিচ্ছি, সোনার সে দোলনা বাতাসে ঝুলবে—আর অণু-পরমাণু মিলে লাগবে ঝুলোন দে দোল দোল, দে দোল দোল! সোনালি দেখলে, আকাশ আর মাটিব মধ্যে ঝোলানো পাতলা নীল অন্ধকার একটু একটু দুলছে আর দেখতে দেখতে ভোবের শুকতারা যেন ক্রমে নিভে আসছে। সোনালি বল্লে—“দিনেব আলো দেবার আগে সব তারাগুলোকে বড যে নিভিয়ে দিচ্ছ—একে নিভিয়ে অন্যকে আলো দেওয়া, এ কেমন ?” কুঁকড়ো একটু হেসে বল্লেন—“একটি তারাও আমি নিভিয়ে ফেলিনি সোনালি, আলো জ্বালাই আমার ব্রত, দেখো এইবার পৃথিবী আলোময় হচ্ছে, রাত্রি দূ-উ-উ-র হল দেখতে দেখতে—” সোনালির চোখের সামনে নীলের উপর হলদে আলো লেগে সমস্ত আকাশ খানি রংএ সবুজ হয়ে উঠল, মেঘগুলোতে কমলা রং আর দূরের পাহাড়ে মাঠে সব জিনিসে কুসুম ফুলের গোলাপি আভা পড়ল। কুঁকড়ো ডাক দিয়ে চল্লেন, “আলোর ফুল, আলোব ফু-ল-কী-ই-হ্‌ গোলাপী হোক সোনালি, সোনালি সে রূপোলী, রূপোলী হোক সাদা আ-লো-আ-লো-র ফুল, কিন্তু তখনো দূরে ক্ষেতগুলোতে শোন্‌ ফুলের রং মেলায় নি, সব জিনিষে চমক দিচ্ছে, কুঁকড়ো ডাকলেন—আ-লো-ও-ও, অমনি কাছের ক্ষেতের উপরে চট্‌ করে এক পোঁছ সোনালি পড়লো, পাহাড়ে ঝাউগাছের মাথায় সোনা ঝকমক্‌ করে উঠলো। কুঁকড়ো পূব ধারের আকাশকে বল্লেন—

খুলুক্‌, খুলুক্‌! অমনি আকাশ জুড়ে পুবদিকে আলোর ছড়া পড়তে থাকলো! পাহাড়ের দিকে চেয়ে কুঁকড়ো ডাকলেন—খুলুক খুলুক্‌, অমনি সব পাহাড়ে পাহাড়ে গোলাপী ফুলে ভরা পদম্‌ গাছ ছবির মতো খুলে গেল সোনালির চোখের সামনে। খুলুক্‌, খুলুক্‌—দূরে ঝাপ্‌সা পাহাড় কুয়াসার চাদর খুলে যেন কাছে এসে দাঁড়ালো! দূরের কাছের সব জিনিষ ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে, অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে, নতুন করে আলো-ছায়া দিয়ে গড়া একটুকরো পৃথিবী! শুকনো ছড়ি থেকে ফলন্ত আমগাছ গড়বার সময় ছেলেরা যেমন সেটার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে সোনালি তেমনি কুঁকড়োর এই সব কাণ্ড-কারখানা অবাক হয়ে দেখছিল আর ভাবছিল, কুঁকড়োই বুঝি এ সবের ছিষ্টিকর্তা, এমন সময় কাণের কাছে শুনলে—মোন্‌, বল-ভালবাসোতো?

সোনালি খানিক চুপ করে থেকে বল্লে—"অন্ধকার থেকে এমন সকাল যে উঠিয়ে আনলে, তার সঙ্গে মনের কথা চালাচালি করতে কে না ভালোবাসে?"

কুঁকড়ো বল্লেন—"সরে এসো সোনালি, বুক তুমি আনন্দে ভরে দিয়েছ, তোমাকে পেয়ে আজ কাজ মনে হচ্ছে কত সহজ" এই বলে কুঁক্‌ড়ো ডাকলেন—"আলোর ফুল্‌কি সোনালি", সোনালি অমনি কুঁকড়োর একেবারে খুব কাছে এসে বল্লে—"ভালোবাসি গো ভা-লো-বা-সি"! কুঁকড়ো বল্লেন—"সোনালিয়া, তোমার সোনালিয়া রূপটি সোনালি কাজলের মতো আমার চোখের কোলে লাগলো, তোমার মধুর মতো মিষ্টি আর সোনালি কথা প্রাণের মধ্যেটা সোনায় সোনায় ভরে দিয়েছে! এত সোনা আজ পেয়েছি যে মনে হচ্ছে এখনি ওই সামনের উঁচু পাহাড়টা আমি আগাগোড়া সোনায় মুড়ে দিতে পারি!" সোনালিয়া আদর করে বল্লে—"দাওনা পাহাড়টা গিল্টি করে, আমি তোমাকে রোজ রোজ ভালোবাসবো!" কুঁকড়ো হাঁক দিলেন—সো-না-র-জল্‌ সো-না-লি-য়া, অমনি পাহাড়ের চুড়োয় সোনা ঝক্‌ ঝক্‌ করে উঠলো—তারপর সোনা গলে ঢালু বেয়ে আস্তে আস্তে নিচের পাহাড়ের গোলাপিতে এসে মিশলো, শেষে গোলাপি ছাপিয়ে একেবারে তলায় মাঠের উপরে গড়িয়ে পড়লো! দেখতে দেখতে দূর আর কাছের রাস্তা-ঘাট-মাঠ-ময়দান ঘর-দুয়োর গ্রাম-নগর বন-উপবন সোনাময় হয়ে দেখা দিলে! কিন্তু দূরে পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে নদীর ধারে গাছগুলোর শিয়রে এখনো একটু-আধটু কুয়াশা মাকসার জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে, ওগুলো তো থাকলে চলবে না, কুঁকড়ো প্রথম আস্তে বল্লেন—সাফাই—সোনালি ভাবলে, কুঁকড়ো বুঝি হাঁফিয়ে পড়েছেন আর বুঝি পারেন না গান করতে, কিন্তু একি যে-সে কুঁকড়ো! যে কাজ বাকী রেখে যেমন-তেমন সকাল করেই ছেড়ে দেবে,—আরো আলো চাই বলে কুঁকড়ো আবার গা-ঝাড়া দিয়ে এমন গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন যে মনে হল বুঝি, তাঁর বুকটা ফেটে গেল—আলোর ফুল আলোর ফুল ফু-উ-উ-উল-কী-ই-ই

আলো-র্-র্-র্-র্—দেখতে দেখতে আকাশের শেষ তারাটি সকালের আলোর মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেল, তারপর দূরে দূরে গ্রামের কুটিরের উপর জলন্ত আথার সাদা ধূঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সকালের আকাশের দিকে উঠে চল্লো আস্তে আস্তে! সোনালি তাকিয়ে দেখলে, কুঁকড়ো কি সুন্দর! সে সকালের শিল্পী কুঁকুড়োকে মাথা নিচু করে নমস্কার করলে, আর কুঁকড়ো দেখলেন, আলোর ঝিকিমিকি আঁচলের আড়ালে সোনালিয়ার সুন্দর মুখ। কুঁকড়ো মোহিত হলেন। আজ তাঁর সকালের আরতি সার্থক হলো, তিনি এক আলোতে তাঁর জন্মভূমিকে আর তাঁর ভালোবাসার পাখীটিকে সোনায় সোনায় সাজিয়ে দিলেন। কুঁকুড়ো আনন্দে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু তথনো কেন মনে হচ্ছে, কোথায় যেন একটু অন্ধকার লুকিয়ে আছে! তিনি আবার ডাক দিতে যাবেন, এমনি সময় নীচের পাহাড় থেকে একটির পর একটি মোরগের ডাক শোনা যেতে লাগলো—যে যেখানে সবাই সকালের আলো পেয়ে গান গাচ্ছে। আগে আলো হল, পরে এল সব মোরগের গান, কুঁকড়ো কিন্তু সবার আগে যথন আলো বলে ডাক দিয়েছেন, তথনো রাত ছিল, তিনি যে সবার বড় তাই অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি আলোর আশা সবাইকে শোনাতে পারেন। আলো জাগানো হল এইবার সূর্য্যকে আনা চাই, কুঁকুড়ো আবার সুরু করলেন—রাঙা ফুল আগুনের ফুলকি, অমনি দিকে দিকে সব মোরগ গেয়ে উঠলো সেই সুরে—আলোর ফুলকি আলোর ফুল!

সোনালী বল্লে—"দেখেচো ওদের আস্পর্দ্ধা! তোমার সঙ্গে কিনা সুর ধরেছে, এতক্ষণ সবাই ছিলেন কোথা?"

কুঁকড়ো বল্লেন—"তা হোক্, সুর বেসুর সব এক হয়ে ডাক দিলে যা চাই তা পেতে বেশী দেরি হয় না, সূর্য্য দেখা দিলেন বলে!" কিন্তু তথনো কুঁকড়ো দেখলেন একটি কুটির ছায়ায় মিশিয়ে রয়েছে, তিনি হাঁক দিলেন অমনি কুটিরের চালে সোনার আলো লাগলো। দূরে একটা সবুজ-ক্ষেত তথনো নীল দেখাচ্ছে, কুঁকড়ো ডাক দিলেন—আলো পড়ে ক্ষেতটা সবুজ হল, ক্ষেতে যাবার রাস্তাটি পরিষ্কার সাদা দেখা গেল, নদীটা কেমন ধুঁয়াটে দেখাচ্ছিল কুঁকুড়ো ডাকলেন—অমনি নদীর জলে পরিষ্কার নীল রং গিয়ে মিল্লো। হটাৎ সোনালিয়া বলে উঠলে—"ঐযে সূর্য্য উঠেছেন!" কুঁকড়ো আস্তে আস্তে বল্লেন—"দেখেছি, কিন্তু বনের ওপার থেকে এপারে টেনে আনতে হবে আমাকে ঐ সূর্য্যের রথ, এস তুমিও" বলেই কুঁকুড়ো নানা ভঙ্গিতে যেন সূর্য্যের রথ টেনে ক্রমে পিছিয়ে চল্লেন—তাকৎ হো তকাৎ হো বলতে বলতে। সোনালিয়া বলতে লাগলো—"আসছেন আসছেন!" কুঁকড়ো হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লেন—"ওপার থেকে এল রথ" ঠিক সেই সময় শালবনের ওপার থেকে সূর্য্য উদয় হলেন সিঁদুর বরণ। কুঁকড়ো মাটিতে বুক ঠেকিয়ে সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্লেন, "আঃ, আজকের সূর্য্য কত বড় দেখেছো!" সোনালির ইচ্ছে, কুঁকড়ো সূর্য্যের

জয় দিয়ে একবার গান করেন! কিন্তু গলার সব সুর খালি করে তিনি আজ সকালটি এনেছেন আর তাঁর সাধ্য নাই গাইতে। যেমন এই কথা সোনালীকে কুঁকড়ো বলেছেন —অমনি দূরে দূরে সব মোরগ ডেকে উঠলো উরু-উরু-রু-রু-রু! কুঁকড়ো শুকনো মুখে বল্লেন, "আমি নেইবা জয় দিলেম, শুনছো, দিকে দিকে ওরা সব তুরী বাজিয়ে তাঁর উদয় ঘোষণা করছে!" সোনালি শুধোলে—"সূর্য্য উঠলে পর তুমি কি কোন দিনই তাঁর জয়-জয়-কার দাওনা? তোমার নবৎখানায় সোনার রৌসনচৌকি সূর্য্যের জয় দিয়ে কি কোন দিন বাজাওনি?"

"একটি দিনও নয়" বলে কুঁকড়ো চুপ করলেন!

সোনালি একটু ঠেস্ দিয়ে বল্লে—"সূর্য্য তো তাহলে ভাবতে পারেন অন্য সব মোরগেরা তাঁকে উঠিয়ে আনে!" কুঁকড়ো বল্লেন, "তাতেই বা কি এলো গেল!" সোনালি আরও কি বলতে যাচ্ছে, কুঁকড়ো তাকে কাছে ডেকে বল্লেন—"আমি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি, তুমি আমার কাছে আজ না দাঁড়ালে সকালের ছবিটা কখনই এমন উৎরোতো না!" সোনালি কুঁকড়োর কাছে এসে বল্লে—"তুমি যে সকালটা করতে সূর্য্যের রথ বনের ওধার থেকে টেনে আনতে এত কষ্ট করলে তাতে তোমার লাভটা কি হলো?" কুঁকড়ো বল্লেন—"পাহাড়ের নীচে থেকে ঘুমের পরে জেগে ওঠার যে সাড়াগুলি আমার কাছে এসে পৌছচ্চে, সেইটেই আমার পরম লাভ!" সোনালি সত্যিই শুনলে, নীচে থেকে দূর থেকে কাছ থেকে কি সব শব্দ আসছে! সে পাহাড় থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে চারিদিক চাইতে লাগলো! কুঁকড়ো চুপটি করে চোখ বুজে বসে বল্লেন, "কি শুনছো সোনালিয়া, বল!"

সোনালিয়া বলে চল্লো—"আকাশের গায়ে কে যেন কাঁসর পিটছে!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"দেবতার আরতি বাজছে!"

সোনালি বল্লে—"এবার যেন শুনছি মানুষদের আরতির বাজনা টং টং!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"কামারের হাতুড়ি পড়ছে।"

সোনালি—"এবার শুনছি গরু সব হাম্বা দিয়ে ডাকছে আর মানুষে গান ছেড়েছে।"

কুঁকড়ো—"হাল গরু নিয়ে চাষা চলেছে!"

সোনালি এবার বল্লে "কাদের বাসা থেকে বাচ্ছাগুলো সব রাস্তার মাঝে ঝুঁকে পড়ে কিচ মিচ্ করে ছুটছে।"

কুঁকড়ো বলে উঠলেন—"পাঠশালার পড়োরা চল্লো"—বলে কুঁকড়ো সোজা হয়ে বসলেন। সোনালি আবার বল্লে—"পিঁপড়ের মতো কারা সাদা সাদা হাত-পা-ওয়ালা কাদের সব ধরে ধরে আছাড় দিচ্ছে, খুব দূরে একটা জলের ধারে পষ্ট দেখা যাচ্ছে না!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"কাপড় কাচা হচ্ছে! আর দেখছি"—সোনালিয়া বল্লে—"একি, কালো কালো ফড়িংগুলো সব ইস্পাতের মতো চক্‌চকে ডানা ঘসছে।" কুঁকড়ো দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—"ওহো, কাস্তেতে যখন শান্ পড়ছে তখন ধান-কাটার দিন এলো বলে!" তারপর পাহাড়তলীর থেকে এদিক থেকে

ওদিক থেকে চারিদিক থেকে কত কিসের সাড়া আসতে লাগলো! ঘণ্টার ঢং ঢং, হাতুড়ির ঠং ঠং, কুঁড়ুলের খট্ খট্, জলের ছপ ছপ, সেকরার টুকটাক্, কামারের এক ঘা, হাসি বাঁশী বাজনা সব শুনতে লাগলেন কুঁকড়ো। কায-কর্ম্ম চলেছে, কেউ কি আর ঘুমিয়ে নেই বসে নেই সত্যিই দিন এসেছে—কুঁকড়ো যেন স্বপন দেখার মত চারিদিকে চেয়ে বল্লেন—"সোনালি, দিন কি সত্যিই আনলেম, এই-সব কারখানা একি আমার ছিষ্টি? দিন আমি যে আনলুম মনে করেছি আমি যে ভাবছি আকাশে আলো আমিই দিচ্ছি একি সত্যি,—না এ-সব পাহাড়তলী পাগলা কুঁকড়োর খ্যাপামি আর খেয়াল? সোনালি, একটি কথা বলবো, কিন্তু বল সে কথা প্রকাশ করবে না, আমার শত্রু হাসাবে না? সোনালি, তুমি আমাকে যাই ভাবনা কেন, আমি জানি এই স্বর্গে মর্ত্তে আলো দেবার ভার নেবার উপযুক্ত পাত্র আমি নই, এত পাখি থাকতে অতি তুচ্ছ সামান্য পাখি আমার উপর অন্ধকারকে দূর করবার ভার পড়লো? কত ছোট, কত ছোট আমি, আর এই জগৎজোড়া [illegible]লের আলো সে কি আশ্চর্য্যরকম বড়, কি অপার তার বিস্তার! প্রতিদিন সকালে আলো বিলিয়ে যখন দাঁড়াই তখন মনে হয়, একেবারে ফকির হয়ে গেছি! আমি যে আবার কোন দিন এতটুকুও আলো দিতে পারবো, তার আশাটুকুও থাকে না। সোনালি শুনলে যেন কুঁকড়োর কথা চোখের জলে ভিজে ভিজে, সে তাঁর খুব কাছে গিয়ে বল্লে—"মরি মরি!" কুঁকড়ো সোনালির মুখ চেয়ে বল্লেন "আঃ সোনালি, যে আশা-নিরাশার মধ্যে আমার বুক নিয়ত দুলছে তার যে কি জ্বালা কেমন করে বলি। গান গাইতে হবে আলোও জ্বালাতে হবে, কিন্তু কাল যখন আবার এইখানে দাঁড়িয়ে দশ আঙুলে আশার রাগিণী খুঁজে খুঁজে কেবলি মাটির বুকের তারে তারে টান দিতে থাকবো, তখন হারানো সুর কি আবার ফিরে পাব না দেখবো, গান নেই গলা নেই আলো নেই তুমি নেই আমি নেই কিছু নেই? হারাই কি পাই, এরি বেদনা মোচড় দিচ্ছে বুকের শিরে শিরে সোনালি। এই যে দো-টানায় মন আমার দুলছে এর যন্ত্রণা কে বুঝবে? রাজহাঁস যখন রসাতলের দিকে গলাটি ডুবিয়ে দেয়, সে নিশ্চয় জানে, পদ্মের নাল তার জন্যে ঠিক করা রয়েছে জলের নীচে, বাজপাখি যখন মেঘের উপর থেকে আপনাকে ছুঁড়ে ফেলে মাটির দিকে তখন সেও জানে ঠিক গিয়ে সে যেটা চায় সেই শিকারের উপরেই পড়বে, আর সোনালি তুমিও জানো বনের মধ্যে উই পোকা আর পিঁপড়ের বাসার সন্ধান পেতে তোমায় এতটুকুও ভাবতে হয় না, কিন্তু আমার একি বিষম ডাক দেওয়া কাজ? কাল যে কি হবে সেই দুঃস্বপ্ন বয়ে বেড়াচ্ছি, আজকের ডাক আজকের সাড়া কাল আবার দেবে কিনা প্রাণ, গান গাবো কিনা ফিরে আর একবার, তাই ভাবছি সোনালিয়া।"

সোনালি কুঁকড়োকে আপনার ডানার মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্লে—"নিশ্চয়ই কাল তুমি গান ফিরে পাবে গলা ফিরে পাবে, আলোর

শুধু মাটির ভালোবাসা আবার সাড়া দেবে তোমার বুকের মধ্যে।”

কুঁকড়ো সোনালিকে বল্লেন—“কি আশার আলোই জ্বালালে সোনালি, বলো, বলো, আবো বলো—”

সোনালি চুপি চুপি বল্লে—“আহা মরি, কি সুন্দর তুমি”—“ও কথা থাক্ সোনালি কি চমৎকারই গাইলে তুমি।” কুঁকড়ো বল্লেন—“গান ভালো-মন্দ যেমনি গাই আমি যে আনতে পেরেছি......” সোনালি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো—“ঠিক, ঠিক, আমি তোমায় যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।” “না সোনালি আমার কথার উত্তর দাও, বল, সত্যি কি—”সোনালি আস্তে বলে—“কি?” কুঁকড়ো বল্লেন—“বল, সত্যি কি আমি” সোনালি এবার তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে—“পাহাড়তলীর কুঁকড়ো তুমি সত্যিই আলো দিয়ে সূর্য্যকে ওঠালে আজ, এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি।”

“ভ্যালারে ওস্তাদ” বলেই তাল-চড়াইটা হঠাৎ উপস্থিত। কুঁকড়ো চমকে উঠে দেখলেন, চড়াইটা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চক্ষু তুলে শিষ দিচ্ছে আর নমস্কার করছে। কুঁকড়ো ভাবচেন, এ হরবোলাটা সব শুনেছে না কি? ইতিমধ্যে সোনালিয়া আস্তে আস্তে অন্যদিকে চলেছেন দেখে তিনি ডাকলেন—“আমাদের একলা ফেলে কোথায় যাও সোনালি?” চড়াই যতই হাসুক কুঁকড়োর আজ কিছুই গায়ে লাগবে না, সোনালিকে কাছে পেয়ে তাঁর আনন্দ ধরছে না।

চড়াই বল্লে—“বাহবা তারিফ। যা দেখলেম শুনলেম—”

কুঁকড়ো বল্লেন—“চটকরাজ, তুমি যে মাটি খুঁড়ে উপস্থিত হলে দেখছি।”

চড়াই কুঁকড়োকে সেই পুরোণো ময়লা খালি ধুলের টবটা দেখিয়ে বল্লে—“আমি ওইটের ভিতরে বসে একটা কান-কুটুরে পোকা কুটুর কুটুর করে খাচ্ছি, এমন সময় আঃ, কি যে দেখলেম, কি যে শুনলেম তা কী বলি!”

কুঁকড়ো বল্লেন—“তারপর?” চড়াই অমনি বলে উঠলে—“তারপর যদি বলি ঐ মাটির টবটা দিব্বি শুনতে পায় তবে কি তুমি অবাক হবে নাকি?”

কুঁকড়ো বল্লেন—“গামলা থেকে লুকিয়ে শোনা বিদ্যেও তোমার আছে দেখছি?” চড়াই জবাব দিলে—“শুধু শোনা নয় লুকিয়ে দেখার লুকি-বিদ্যেও আমি জানি, আমি এমনি অবাক হয়েছিলেম যে কখন যে গামলার তলার ফুটোটা দিয়ে উঁকি মেরে সব দেখেচি তা আমার মনে নেই। আহা, কি দেখলেম রে, কি দেখলেম রে, কি সুন্দর কি সুন্দর!”

কুঁকড়ো তাকে এক ধমক দিয়ে বল্লে—“বটে, লুকিয়ে দেখা, তফাৎ যাও!” কুঁকড়ো যত বলেন—তফাৎ তফাৎ, চড়াই ততই লেজ নাচিয়ে বেড়ায় আর ঘাড় নেড়ে কুঁকড়োর নকল করে কিচ কিচ করে—“বিদ্যে ফাঁস লুকি-বিদ্যে হ'ল ফাঁস ফুস্-মন্তর হল ফাঁস ক্যাবাৎ কাবাৎ!” কুঁকড়ো তার রকম দেখে হেসে ফেল্লেন। সোনালিয়া বল্লে “চড়াই যখন সত্যিই তোমায় ভক্তি করে তখন ওর সাত খুন মাপ।”

চড়াই বল্লে—“ভক্তি করবো না? এমন আলেয়া বাজিগর বুজরুগ্ কেউ কি দেখেছে—

কি সকালের রংটাই ফলালে কি গানটাই গাইলে, গা যেন ভুবড়ি-বাজি—ভুস্!"

সোনালি বল্লে—"এখন তোমরা দুই বন্ধুতে আলাপ সালাপ কর, আমি চল্লুম!"

কুঁকড়ো বল্লে—"কো-ক্-কো-ক্ কোথায়?"

সোনালি বল্লে—"ওই যে সেই—

চড়াই অমনি বলে উঠলো, "তাইতো, কুঁকড়োর গানের গুণে চিনে-মুরগির ছোট-হাজিরিও জমতে চল্লো, সাধে বলি কুঁকড়োর গান গাওয়া, চিনে-মুরগীর চা খাওয়া, একসঙ্গে আসা যাওয়া!"

কুঁকড়ো সোনালিকে চুপিচুপি শুধোলেন—"সে একা যাবে, না তিনিও সঙ্গে যাবেন?"

সোনালি বল্লে-"না ওরকম মজলিসে তাঁর যাওয়াটা ভালো দেখায় না।" কুঁকড়ো সোনালিকে বল্লেন "তবে তুমি যাচ্ছ যে?"

সোনালি বল্লে—"আমি যাচ্ছি আজ তোমার আলোর ঝকমকানিটা কেমন তাই সেই-সব হিংসুক পাখিকে দেখিয়ে আসবো," বলে সোনালী একবার গা-ঝাড়া দিলে তার সোনার পালকগুলো থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়তে লাগলো। সোনালি কুঁকড়োকে সেইখানে তার জন্যে থাকতে বলে চিনে-মুরগীর মজলিসে চল্লো। চড়াই অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—"হাঁ, কুঁকড়োর আজ সেখানে না গেলেই ভালো!"

কুঁকড়ো শোধালেন "কেন?"

"সে তোমার শুনে কাজ নেই" বলে চড়াই মিটমিট করে চাইতে লাগলো সোনালীর দিকে!

সোনালি হেসে বল্লে—"না, চড়াইকেও যে তুমি পাগল করলে" বলে সোনালি পাখি সোনালি-ডানা মেলে উড়ে গেল। কুঁকড়ো চড়াইয়ের দিকে চেয়ে ভাবছেন, জিম্মা একে দেখতে পারে না, কিন্তু চড়াইটা নেহাৎ মন্দ নয়, একটু বক্তার বটে, কিন্তু বদমাস তো নয়!

চড়াই এবার লেজ নেড়ে বল্লে—"বলিহারি তোমার বুদ্ধিকে, সব মুরগীগুলোকে বিশ্বাস করিয়েছে যে তুমিই সূর্য্যোদয় করে থাক, মেয়েদের চোখে ধুলো দিতে তোমার মতো দুটি নেই, এতদিনে বুঝলেম মুরগীরা কেন তোমার অত প্রশংসা করে! হয় কলম্বস যে ডিমটি নিয়ে রাজাকে ডিমের বাজি দেখিয়েছিলেন সেই ডিমটি থেকে তুমি বেরিয়েছো, নয়তো সিন্ধবাদ যে আজগুবি সামোরগের ডিমের গল্প লিখে গেছে, তারি তুমি বাচ্ছা, এ না হলে তুমি আলোর আবিষ্কর্ত্তা হতে না আর মুরগীদের এমন আজগুবি কথা শুনিয়েও ভোলাতে পারতে না। অণু-পরমাণুদের জন্যে আলোর দোলনা, খড়ের চালে সোনার পোঁচ, এ সব খেয়াল কি যে সে মাথা থেকে বার হয়, না আপনাকে অতি দীন অতি হীন বলে চালিয়ে যেমনি দিন এল বলে অমনি আলোর ফুল বলে চেঁচিয়ে উঠে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে যাওয়া যার তার কর্ম্ম!"

রাগে কুঁকড়োর দম বন্ধ হবার জোগাড় হচ্ছিল, তিনি অতি কষ্টে বল্লেন—"থামো, চুপ্!"

চড়াই দুপা পিছিয়ে গিয়ে বল্লে—"আচ্ছা, সত্যি কি তুমি জাননা যে দিন-রাত যে আসে সেটা একটা প্রকৃতির নিয়ম ছাড়া আর কিছু নয়?"

কুঁকড়ো বল্লে—"তুমি জানতে পারো আমি জানিনে। আর যাং নিয়ে ঠাট্টা কর কর এ-কথা নিয়ে আর কোনদিন তামাসা করোনা যদি আমার উপর তোমার একটুও মায়া থাকে।"

চড়াই মুখে বল্লে—খুব মায়া খুব শ্রদ্ধা সে কুঁকড়োকে করে কিন্তু তবু খোঁচা দিয়ে ঠেস দিয়ে কথা সে বলতে ছাড়ছে না, তর্কও করতে চায়।

কুঁকড়ো রেগে বল্লেন—"কিন্তু যখন আমি ডাক দিতেই সূর্য্য উঠলো আলো হল, সে আলো পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে গেল, আকাশে নানা রং ধরলে তখনও কি একবার তোমার মনে হয় না যে এ-সব কাণ্ড করলে কে?"

চড়াই বল্লে—"গামলায় গর্ত্তটা এমন ছোট যে সেখান থেকে আমি কেবল একটুখানি মাটি আর তোমার ঐ হলুদবরণ চরণ-দুখানি দেখেছিলেম, আকাশটা কোথায়, তা খবরেও আসেনি।"

কুঁকড়ো বল্লেন—"তোমার জন্য আমার দুঃখু হয়, আলোর মর্ম্ম বুঝলে না, তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকো অত্যন্ত চালাক পাখি!"

চড়াই জবাব দিলে—"বেশ কথা, অতি বিখ্যাত কুঁকড়ো!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"বেশ কথা, যে থাকবার থাক্, আমি যেমন চলেছি সূর্য্যের দিকে মুখ রেখে তেমনিই চলি দিনরাত এই পাখী-জন্ম সার্থক করে নিয়ে! চড়াই জানো, বেঁচে সুখ কেন তা জানো?"

চড়াই ভয় পেয়ে বল্লে—"তত্ত্বকথা এসে পড়লো শুনেই মনে হয় পিঁপড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে" বলে চড়াই নিজের পালক খুঁটতে লাগলো। কিন্তু কুঁকড়ো বলে চল্লেন—"কিছুর জন্যে যদি চেষ্টা না করবো তবে বেঁচেই থাকা বৃথা, বড় হবার চেষ্টাই হচ্ছে জীবনের মূল কথা, তুই চড়াই সবার সব চেষ্টাকে উড়িয়ে দিতে চাস্, সেই জন্যে তোকে আমি ঘৃণা করি, এই যে এতটুকু গোলাপি পোকাটি একা মস্ত ওই গাছের গুঁড়িটাকে রূপোর জাল দিয়ে গিল্টি করতে চাচ্ছে ওকে আমি বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করি—"

"আর আমি ওকে টুপ করে গালে ভরি" বলেই চড়াই পোকাটিকে ভক্ষণ করলেন—"তোর কি দয়া মায়া নেই রে? যাঃ, তোর মুখ দেখবোনা" বলে কুঁকড়ো চল্লেন। চড়াই বল্লে—"দয়া মায়া নেই কিন্তু ঘটে আমার বুদ্ধি আছে, যাহোক আমি আর তোমায় কিছুতে নেই তোমার শত্রুরা যা-ইচ্ছে করুক বাপু, আমার সে কথায় কাজ কি, তুমি জানো আর তারা জানে।"

কুঁকড়ো শোধালেন—"শত্রু কারা শুনি?"

"কেন, পেঁচারা?" চড়াইটা বলে উঠলো। "শেষ এও ভাগ্যে ছিল, পেঁচা হলেন শত্রু আমার, হাঃ হাঃ হাঃ—" বলে কুঁকড়ো হেসে উঠলেন। চড়াই বল্লে—"আলোর কাছে তারা এগোতে পারে না বটে, সেইজন্যে তারা এক বাজখাঁই গুণ্ডা জোগাড় করেছে, যে পাখী রোজই দিন গুনছে তাকে জবাই করতে।"

"কাকে তারা জোগাড় করেছে" কুঁকড়ো শোধালেন। চড়াই বল্লে—"তোমারই জাত-ভাই হায়দ্রাবাদি মোরগ আঃ সেযে কুস্তিগীর

ভীম বল্লেই চলে সে তোমার আসা পথ চেয়ে সেখানে আছে! কুঁকড়ো শোধালেন "কোথায়!" "ঐ চিনে মুরগীর ওখানে" চড়াই বল্লে। কুঁকড়ো শোধালেন "তুমি তাকে দেখতে যাচ্ছ নাকি?"—"না বাবা যে তার পায়ে লোহার কাঁটা বাঁধা কি জানি যদি লেগে যায় তবে"—বলে চড়াইটা আড়চোখে কুঁকড়ো কি করেন দেখতে লাগলো—কুঁকড়ো চট্ করে ফুলতলার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। চড়াই যেন কত ভয় পেয়ে বল্লে—যাচ্ছ কোথায়? "ফুলের কাঁটা যেখানে অনেক সেই ফুল-তলাতে যাচ্ছি" বলে কুঁকড়ো ঘাড় উঁচু করে পায়ে পায়ে চল্লেন। চড়াই যেন কুঁকড়োকে কিছুতে যেতে দেবেনা এমনি ভঙ্গি করে বল্লে—"না তোমার যাওয়া সেখানে মোটেই উচিত হবেনা—আমি বলছি যেওনা!" "যাওয়া চাই," বলে কুঁকড়ো গম্ভীর মুখে পুরোনো ফুলের খালি টবটা দেখে বল্লেন—"এই ছোট গামলাটির মধ্যে তুমি সেঁধোলে কেমন করে!" "কেন এমনি করে" বলেই চড়াই লাফিয়ে সেটার মধ্যে গিয়ে বল্লে "কে না এই এমনি করে সেঁধিয়ে এই ফুটো দিয়ে আমি দেখলুম—"কি দেখলে?" "কেন মাটি আর—একবার আকাশ দেখে নাও।" বলেই কুঁকড়ো ডানার এক ঝাপটে টবটা উল্টে চড়াইকে চাপা দিয়ে সোজা চলে গেলেন। চড়াইটা গামলার মধ্যে থেকে বেরোবার জন্যে ঝটাপটি করতে থাকলো গেছি গেছি বলে! (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ষার গান

মেঘ মল্লার—একতালা।

সুনিবিড় ঘন গরজে সঘন
ঝর ঝর বারি ঝরণা,
সচকিত দিশি, চমকিত নিশি
ঘোর তামসী বরণা!

(১) স্বন্ স্বন্ স্বন্, দুরন্ত পবন
চমকিছে মৃদু দামিনী,
সে গো, একাকী শয়নে, রয়েছে কেমনে,
বুঝি জাগরণে কাটে যামিনী?

(১) তারে, একাকী ফেলিয়া, এসেছি চলিয়া
কেমনে সে হিয়া বাঁধিছে।
তার—মলিন বয়ান, ছল ছল নয়ান
আঁখিপরে শুধু জাগিছে!

সে যে—কত কেঁদে কেঁদে, বাহু দিয়ে বেঁধে
বলেছিল—'ও গো যেয়ো না ;
যদি, নিতান্তই যাবে, কি বলিব তবে—
বেশী দিন যেন রোয়ো না।"

(২) এই, কঠোর হৃদয়, বজ্র-শিলাময়
তাই, ফেলে আছি তাহারে,-
বুঝি, একা শূন্য ঘরে, নিশি-দিন ধ'রে
সে ভাবে, কেবলি আমারে।
যত গরজন গুরু, হিয়া দুরু দুরু
শূন্যপানে আঁখি লগনা,
বুঝি, আমারি স্মরণে, আমারি স্বপনে,
আমারি বিরহে মগনা।

রচনা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন-গুপ্তা।

স্বরলিপি

২ ৩ ০ ১
I রা রমা রা । রা সা সা । সা সরা সন্‌া । সা সা সা I
স্থ নি০ বি ড় ঘ ন গ র০ জে০ স ন

২ ৩ ০ ১
I রা মা - মা । গমপা পা ধপা । মা পধা –নর্সা । র্সা –া –নপা I
ঝ র ঝ র০০ রা বি০ ঝ র০ ০০ ণা ০ ০০

২ ৩ ০ ১
I মা মপা পা । পা পা ধপা । মা মপা পা । পর্সা সা নর্সা
স চ০ কি ত দি শি চ ম০ কি ত০ নি শি

২ ৩ ০ ১
I ণা –া পা । মা মা পা । মা পা মা । –রা –সা –া II
ঘো ০ র তা ম সী র ব ণা ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
II {মা মপা না । না না ধনর্সা । র্সা র্সা র্সা । র্সা সা র্সা I
{স্ব ন০ স্ব ন০ স্ব ন০ ঠু র স্তু প ব ন

২ ০ ১
I না নর্সা র্রর্মা । র্রা র্সা র্সা । র্সা -নর্সা নর্রা । (র্সা -নর্সা -নর্সা) } I
চ ম০ কি০ ছে মৃ দু দা ০০ মি০ (নী ০০ ০০)

১ ২´ ৩ ০
। র্সা মা মা I { মা পা র্মা । র্রা র্রা র্রা । র্সা র্রা র্সা ।
নী সে গো { এ কা কা শ য নে র য়ে ছে

১ ১ ২ ৩
। (না নর্সর্রা র্সা) } । না নর্সা নর্সা I না র্সা না । পা মা মা ।
(কে ম০ নে) } কে মনে বুঝি জা গ র গে পা টে

০ ১
। মা -রা পা । পা -মা -রা II
যা ০ মি নী ০ ০

২ ৩ ০
II { রা রা I সা ন্‌া প্‌া । ন্‌া ন্‌া না । সা সা সা ।
(১) { তা রে এ কা কী ফে লি যা এ সে ছি
(২) এ ই ক ঠো র হৃ দয়্ ০ র ভূ শি

১ ৩
। সা সা সা I না সা রা । মা পা পা ।
(১) চ লি যা কে ম নে সে হি যা
(২) লা ময়্ ০ তা ই ফে লে আ ছি

০ ১ ২´ ৩
। মা -রা রা । সা -া সা I রা মা মা । পা পা -া ।
(১) বাঁ ০ ধি ছে ০ তার ম লি ন ব য়ান্ ০
(২) তা ০ হা রে ০ বুঝি এ কা শূ ন্য ঘ রে

০ ১ ২´ ৩
। মা পা ণা । পা মা -রা I র্সা ণা পা । মা রা সা ।
(১) ছ ল ছু ন যান্ ০ আঁ খি প রে শু ধু
(২) নি শি দিন ০ ধ রে সে ভা বে কে ব লি

০ ১ ১ ২´
। রা -পা মা । (পা -া -া) } । পা পা পা I { মা মপা না ।
(১) জা ০ গি (ছে ০ ০) ছে সে যে { ক ত০ কেঁ
(২) আ ০ মা (রে ০ ০) রে য ত { গ র জ

৩ ০ ১ ২
। না না ধনর্সা । র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা I না র্সা রা ।
(১) দে কেঁ দে০ বা ত দি যে বেঁ ধে ব লে ছি
(২) ন গু রু হি যা ড় ক ডু ক শূ ন্য পা

৩ ০ ১ ১
। মা র্রা র্সা । র্সা নসা -নর্রা । (র্সা -নর্সা -নর্সা) । র্সা মা মা I
(১) ল ও গো যে য়ো০ ০০ (না ০০ ০০) না য দি
(২) নে আঁ খি ল ০ গ (না ০০ ০০) না বু ঝি

২ ৩ ০ ১
। মা পা র্গা । রা রা র্রা । র্সা রা র্সা । না র্সা র্সা ।
(১) নি তা ন্ত উ যা বে কি ব ল ব ত বে
(২) আ মা বি স্ম র ণে আ মা রি স্ব প নে

২ ৩ ০ ১
I না না সা । -নপা মা মা । মা রা -পা । পা -মা -রা II II
(১) বে শী দিন ০০ যে ন বো যো ০ না ০ ০
(২) আ মা রি বি র হে ম গ ০ না ০ ০

স্বপ্ন

* * * হঠাৎ বাঁধন আমার টুটিয়া গেল। দেখিলাম, আকাশের কোল হইতে খসিয়া পড়িতেছি! কি একটা আকর্ষণে বা কিসের প্রেরণায় ছুটিয়া চলিয়াছি অসীম ব্যোম ভেদ করিয়া, সমস্ত অন্তরীক্ষ আলোকিত করিয়া! শত বিমানচারী গ্রহ-নক্ষত্র ধীর স্থির উদাসীন ভাবে আপন আপন পথে চলিতেছে, আমি তাহাদের পাশ কাটাইয়া সব্যাজে প্রধাবিত। তাহাদের জ্বল-জ্বল টল-টল চক্ষুগুলি আমারই উপর সংন্যস্ত! কি যেন অপার করুণায় অথবা কি নিবিড় পরিহাসে ভরপুর! চলিয়াছি, জ্ঞান ক্রমে আমার লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, এক অস্ফুট চেতনার ঘোরে আপন-হারা হইয়া নামিয়া চলিয়াছি, পৃথিবীর দিকে। কতক্ষণ এই ভাবে চলিয়াছি, জানি না, হঠাৎ কখন্ জাগিয়া উঠিলাম, একটা তড়িত-প্রবাহ মর্ম্মে-মর্ম্মে খেলিয়া গেল—পশ্চাতে অজ্ঞাতসারেই দৃষ্টি আমার কে ফিরাইয়া ধরিল! দেখিলাম, আর-একটি তারকাও আমার পিছনে ধাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে! মনে হইল, এ যেন সেই তারাটি, যে ছিল আকাশের কোলে আমারই প্রায় কাছে-কাছে, আমারই অঙ্কটি অনুসরণ করিয়া সেও পরিভ্রমণ করিত। দেখিয়া আর নিজেকে থামাইয়া রাখিতে পারিলাম

না, ঝুঁকিয়া তাহার দিকে হাতদুখানি বাড়াইয়া দিলাম—কিন্তু অকস্মাৎ এক বিরাট গর্জ্জনের মধ্যে আকাশটা যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল, বাষ্পে ধুমে ভস্মাবশেষে সব কোথায় মিলাইয়া গেল—

* * * *

নদীতীর। মন্থরগমনা প্রশান্ত-সলিলা নদীর জলে ছোট ছোট ঢেউ দিয়াছে, ঢেউএর মাথায় মাথায় তরুণ অরুণ-ছটা ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে। পাশেই সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, স্বর্ণ শস্যশীর্ষে প্রভাতসমীরণ দুলিয়া চলিয়াছে। ক্ষেতের মাঝে মাঝে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত আম্রবৃক্ষ সোজা দাঁড়াইয়া। তাহারই নীড় হইতে দুই-একটি করিয়া পাখী আনন্দে শীষ্ দিতে দিতে উড়িয়া চলিয়াছে। সম্মুখেই একটি গ্রাম্যপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বসিয়া আছি, আর আনমনা হইয়া কি যেন ভাবিতেছি,—হঠাৎ মুখ তুলিয়া সেই পথখানির দিকে চাহিলাম। কি দেখিলাম! ষোড়শী বালা এক, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ভরা-যৌবনের তড়িৎলেখা ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছে। উঠিলাম, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার পানে এক [illegible] তাকাইয়া রহিলাম। তাহার অপাঙ্গে ও কি! ও কোন্ জ্যোতি! এ যেন কোন্ সুদূর জগতের অতীত স্মৃতির এক চিরপরিচিত আভা, চিরপরিচিত ভঙ্গিমা। ব্যাকুল আকুল প্রাণে ছুটিয়া গেলাম, বলিয়া উঠিলাম—তুমি এখানে? এই যে আমিও আসিয়াছি···চিনিতে পার না, সখি?

সে চমকিয়া দাঁড়াইল, বিস্ময়ে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত—অর্দ্ধস্ফুট স্বরে অবশেষে বলিল, 'পাগল—!" আর অমনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। ভুল তবে করিয়াছি! ভুল? ভাবিতে ভাবিতে পথ বাহিয়া উঠিতে লাগিলাম। নদীর কূল, ক্ষেত পার হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। গ্রামখানিও পার হইলাম, তবুও চলিয়াছি। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের উগ্র তাপে বাতাস যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে —তৃষার্ত্ত পাখীর কণ্ঠে সুর যেন বাজিয়াও বাজিতেছে না! অদূরে একখানি ছবি যেন সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। একখানি কুটিরের পাশে একটি গাছের তলায় শিশু হাঁটিতেছে, পড়িতেছে, উঠিতেছে, আর কাছেই তাহার দিকে ফিরিয়া দুই হাত বাড়াইয়া স্মিতমুখে আছে, এক রমণী। সে স্নিগ্ধ হাসিতে কি দেখিলাম, জানি না, উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—'এবার ভুল নয়, তুমি, তুমিই—কোথায় ছিলে? একে কোথায় কুড়িয়ে পেলে?' কিন্তু কোন উত্তর নাই-- সেও দেখি কাষ্ঠপুত্তলিকার মত ক্ষণিক আমার দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর কিছু না বলিয়া ভীত-ত্রস্ত পদে ছেলেটিকে কোলে লইয়া একেবারে ছুটিয়া কুটিরের ভিতরে যাইয়া দরজা দিল। আমার কিছুই বোধগম্য হইল না। এ কি? এ কে? মায়া নু মতিভ্রমো নু। আবার চলিতে লাগিলাম। স্থানের কালের কোন জ্ঞান নাই! চলিতে চলিতে শরীর অবসন্ন, মন-প্রাণ খিন্ন আর পা চলে না, বসিয়া পড়িলাম। ... ... গভীর নিদ্রা আসিয়া দুই চক্ষু চাপিয়া ধরিল। কতক্ষণ সেইভাবে ছিলাম, জানি না। কি এক মধুর মূর্চ্ছনায় ধীরে ধীরে জাগিলাম। শুনিতে লাগিলাম, কি একটা

মৃদুল ধ্বনি সমস্ত আকাশে করুণ আবেশ-প্রলেপ মাখাইয়া দিতেছে। উঠিলাম, শ্লথ পদবিক্ষেপে চলিলাম, সেই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। আলোকে-আঁধারে শান্তি-দেবী টিপি-টিপি পা ফেলিয়া আসিতেছেন। অদূরে এক মন্দির —মন্দিরের মুক্ত দ্বার দিয়া আলোর শিখা বাহিরে আসিয়া পড়িতেছে। অগ্রসর হইয়া একেবারে দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শুভ্রবেশধারিণী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী পূজারিণী। দক্ষিণহস্তে আরতির পঞ্চদীপ দুলিতেছে, বামহস্তে ঘণ্টা বাজিতেছে; রমণী দাড়াইয়া, ধীর স্থির প্রশান্ত মূর্ত্তি। অকুণ্ঠিত চিত্তে আমি মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলাম —দেবতা দেখিতে পাইলাম না, দেবীর সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলাম। ধীরে-ধীরে বলিলাম, "যাহার খোঁজে জীবন গেল, আজ তাহাকে অবশেষে পাইলাম! দেবতা আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন।" রমণী অবগুণ্ঠন একটু সরাইয়া দিলেন, অসীম করুণা-ভরে একবার আমার দিকে তাকাইলেন, আমার মাথার উপর হাতখানি রাখিয়া বলিলেন, "হাঁ বাছা, দেবতা কাহারও আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন না।" কোথা হইতে সব শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, ধূপ-ধূনার গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল। কর্ণ আমার বধির, দৃষ্টি অন্ধ। মাথা ঘুরিতে লাগিল, পৃথিবী টলিতে লাগিল, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম—

* * *

গভীর নিশীথ। অসীম ব্যোম। কি বিরাট নিবিড় নিস্তব্ধতা। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, বেলাহীন আকাশমণ্ডল, অগণ্য নক্ষত্ররাজি তথায় জ্বলিতেছে—ধীরে ধীরে আপন-পথ বাহিয়া চলিয়াছে। দেখিলাম, তাহারই মধ্যে একধারে আমিও আমার অভ্যস্ত স্থানটিতে আছি, আর অতি দূরে আমার পরিচিত পুরাতন সঙ্গী সেই তারাটি আমার দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

কে ইনি?

কৃষ্ণলাল প্রত্যহ সকালে একবার দুচার মিনিটের জন্য খবরের কাগজে চোখ বুলাইয়া লন। আজ বেঙ্গলিখানা খুলিতেই প্রথমে নজরে পড়িল—"বায়-ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে।"

একটা মুক্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ভাবিলেন "ভাগ্যিস্ ও ব্যাঙ্কে টাকা রাখা হয় নাই"। এই সময় হাসি আসায় তিনি সে চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া হাসিকে দর্শন-তত্ত্ব বুঝাইতে বসিলেন। সবে মাত্র ওঁ শব্দের প্রথম গ্রন্থির সহিত মধ্য গ্রন্থির যোগাযোগ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন,—ভৃত্য আসিয়া খবর দিল—"রায়-মশায় এসেছেন।"

বলিতে বলিতে সে ভূপতিত খবরের কাগজখানা কুড়াইয়া ভাঁজ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—"রায়-

মশায়। রায় মশায় কে? কোন্ রায়-মশায়?"

ভৃত্য কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই স্বয়ং সুজন রায় মূর্ত্তিমন্ত-রূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার সমস্যা পূরণ করিয়া দিলেন। ভৃত্য তখন কাগজখানা পাশের টেবিলে রাখিয়া নীরবে সরিয়া পড়িল।

"একি, তুমি ভায়া।" আনন্দ-বিস্ময়-গদগদ চিত্তে কৃষ্ণলাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাসি আগেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। করমর্দ্দনে সুজন রায়কে সাদৃত করিয়া কৃষ্ণলাল কহিলেন, "এই আমার কন্যা হাসি। প্রণাম কর মা।"

সুজন রায় যে হাসিকে দেখিবার অভিপ্রায়েই এখানে আসিয়াছেন, কর্ত্তার মনে তাহাতে সন্দেহ মাত্র ছিল না। হাসি প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে—সুজন রায় কহিলেন—"বেশ বেশ। বেশ মেয়েটি। তা মা তোমার বাবার সঙ্গে একটু কাজের কথা আছে।" হাসি একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। হাসির প্রতি এইরূপ সম্বর্দ্ধনা কর্ত্তার কিন্তু ভাল লাগিল না। যদিও তিনি জানিতেন বিবাহের দিন-ক্ষণ ঠিক করিবার জন্যই সুজন রায় এইরূপ ব্যস্ত ভাবে হাসিকে বিদায় করিলেন, তবুও অরসিকের প্রতি রহস্য নিবেদনের ন্যায়—এই ঘটনায় তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন। বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই কহিলেন—"এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? জান ত ভায়া,—আমার ঐ একটি মেয়ে, ছাড়তে মন চায় না। তা—একটু-দেরী তোমাকে করতেই হবে?"

সুজন রায়ের ওষ্ঠাধরে আগত বিদ্রূপ-হাস্যকুঞ্চন সরলরেখায় মিলাইয়া পড়িল—তিনি গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"হ্যাঁ, দেরী ত হয়েই পড়লো।—শুনেছ ত দাদা, আমার ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে।"

"এইমাত্র কাগজে দেখলুম।"

সুজনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বেশী বিশ্বাস কাউকে করতে নাই দাদা, তাহ'লেই ঠকতে হয়। তোমার যেমন হেম আমার সেইরূপ ছিল ডিক্রুজ সাহেব। আমার আহাম্মকীর এ ফল ভোগ।"

কৃষ্ণলাল বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন "সত্যি।"

"হ্যা ঠিক কথাই বলছি দাদা। তাই'ক তুমি ভয় পেয়ো না,—আমি থাকতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না,—সেই কথাই তোমাকে বলতে এসেছি—"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"আমার টাকা ত ব্যাঙ্কে দেওয়া হয়নি,—সে কথা বুঝি ডিক্রুজ তোমাকে বলেনি? আমার ত ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নেই?"

"কিন্তু তুমি যে একজন ডিরেক্টার,—তারও একটা দায়িত্ব আছে ত?"

কৃষ্ণলালের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল—তিনি ভীতচিত্তে কহিলেন—"তোমার কথায় তখন ত বুঝেছিলাম—টাকা-কড়ি সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব কিছু থাকবে না।"

"ঠিকই বুঝেছিলে দাদা। নাম থাকবে তোমার আর দায়িত্ব বহন করব আমি—বরাবরই আমি এই মনে করে আছি।"

কৃষ্ণলাল তাহার সৌজন্য-সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া কহিলেন—"তোমার কি খুবই ক্ষতি হলো ভায়া?"

"ক্ষতি সবই। ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখেছিলুম সে সবই গেল,—তা ছাড়া অন্য লোকের গচ্ছিত টাকার জন্যেও আমাকে দায়ী হতে হচ্ছে।"

কৃষ্ণলাল ইহা শুনিয়া আশ্বস্ত ভাবে কহিলেন—"তা বাইরের লোকের টাকা ত এখানে বেশী নেই শুনেছি! হেম ত বলছিল ব্যাঙ্ক তোমার টাকাতেই চলছে।"

সুজনরায় খনখনে হাসি হাসিয়া কহিলেন—"ব্যাঙ্কিং বিজনেস্ যে হেম কত বোঝে—এ কথায় তা বোঝা যাচ্ছে। বাইরের লোকের টাকা বেশী নেই এটা ঠিক, তাড়াতাড়ি টাকা অনেকেই তুলে নিয়েছে—তবুও যে টাকার জন্যে দায়ী আমি—সেও ত নিতান্ত কম নয়!"

কৃষ্ণলালের দৃষ্টিতে সহানুভূতি প্রকাশিত হইল। সুজন আবার কহিলেন—"এদানি যেমন ব্যাঙ্কটি জমে আসছিল, অমনি ভিতরে ভিতরে লুটও চলছিল। আমারই আহাম্মকি দাদা! চার পো আহাম্মকি! আমি সুজনরায় কিনা—একটা ফিরিঙ্গি বাচ্চার হাতের লাড্ডু হলুম! তবে আমি কারো টাকা রাখব না—সবাইকে দিয়ে দেব, চিরদিনই ধর্ম্মের পথ ধরে চলেছি…এখনো চলব।"

কৃষ্ণলাল তাহার সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—"ধন্য!"

"কিন্তু সাধুতার কি একালে আদর আছে ভাই? আজকাল নামে বিকোয়,—চকচকে ঝুটোর দরই বেশী। একটি কথা শুনে বড় আশ্চর্য্য হয়েছি; আমাকে কথা দিয়ে তুমিও নাকি অতুলের কাছে রাণীগঞ্জের সম্পত্তি বিক্রী করছ—? তুমিও দাদা কথা ভাঙ্গলে?"

কৃষ্ণলাল আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন "কই আমি ত এর বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানিনে? এ দেখছি হেমের কাণ্ড।"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া সুজনরায় কহিলেন—"হেম যদি তোমার অমতে একাজ করে থাকে ত কাজটা বন্ধ করতে কতক্ষণ? তুমি না সই করলে ত কাজ হবে না?"

কৃষ্ণলাল মুস্কিলে পড়িলেন। হেমের কর্ত্তৃত্বের উপর যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম—একথা বিশ্বাস করিবে কে? আর বলিবার কথাও ত নয়! তবুও বলিলেন, "আচ্ছা ভায়া, হেমকে জিজ্ঞাসা করে আমি এ বিষয়ে উত্তর দেব। হেমের অমতে ত আমি বিষয়-কর্ম্ম কিছুই করতে পারিনে। আর সে আমার আমমোক্তার নামায় বলে সব কাজই করতে পারে।"

সুজন রায় অনুনয়ের স্বরে কহিলেন—"দেখ ভাই, তোমাকে স্পষ্ট করে বলি—যদি তোমার এই সম্পত্তিটা পাই—তবেই আমার উদ্ধার—নচেৎ আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে—তোমার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করবার শক্তিও আমার থাকবে না, এটাও বুঝো।"

এতক্ষণ সুজন রায়ের বাক্যে প্রকাশিত সাধুতার পরিচয়ে কৃষ্ণলালের মন ভক্তি-আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু এই কথায় রায়বাহাদুরের মনের আসল রূপ যেন ধরা পড়িল; কৃষ্ণলালের বিশ্বাসে সহসা সন্দেহ ছিদ্র প্রবেশ করিবামাত্র সুজনের অনুরোধ অনুনয় আর তাঁহার হৃদয় স্পর্শ

করিল না, তিনি অটল ভাবেই কহিলেন "আমিত বল্লেম ভাই, হেম যা করেন তার বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারি নে।"

সুজন জানিতেন হেম ইহাতে আপত্তি করিবেন; যদি এখনি কাজ বাগাইতে পারেন ত ভাল, নচেৎ আশা নাই। এই ভাবিয়া তিনি বায়নানামা লিখিয়া পর্য্যন্ত সঙ্গে আনিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণলালের অটল ব্যবহারে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল,—তাঁহার ভিতরের সর্প ফণা বাহির করিয়া কহিল "আচ্ছা বেশ! সুজন রায় সুজনের সঙ্গে সুজন বোলে যে দুর্জ্জনের সঙ্গে দুর্জ্জন হ'তে জানে না তা মনে করোনা। তোমার দুর্ব্বুদ্ধিতার ফলে দেখো তোমার ঘরের কড়িকাঠখানও থাকবে না।"

সুজন রায় চলিয়া গেলেন—তাঁহার ক্রোধ উদ্গীরিত গরলে কৃষ্ণলালের সাদা মন ঘৃণায় কালো হইয়া উঠিল। উঃ, এই কাল-সর্পকে তিনি কিনা দেবতা মনে করিতেছিলেন! মোহমুক্ত হইয়া মনে মনে তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

হেম থাকিতে সুজন যে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে পরিবেন না, ইহাতে তিনি বেশ আশ্বস্ত রহিলেন! হেমের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস তাঁহার বৃথা হইল না!

ব্যাঙ্ক যে ফেল হইবে, বিশ্বস্তসূত্রে আগেই হেম সে খবর পাইয়াছিলেন—এবং এজন্য যাহাতে কৃষ্ণলালকে কোন ক্ষতি সহ্য করিতে না হয়, শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহারই উপায় অবলম্বনে সচেষ্ট ছিলেন। রাণীগঞ্জের সম্পত্তি অতুলেশ্বরকে lease দিবার পরামর্শ তিনিই দান করেন। এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্যই শ্যামাচরণ প্রসাদপুর যাইতেছিলেন। কিন্তু ব্যাঙ্কের কোন দায়িত্ব কৃষ্ণলালের উপর আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার এ সম্পত্তি যথাশীঘ্র হস্তান্তর করিবার আবশ্যক হইয়া পড়ায় অতুলেশ্বরকেই পরে তাঁহারা কলিকাতায় আহ্বান করিলেন। বাড়ী-ঘর প্রভৃতি অন্যান্য সম্পত্তি কৃষ্ণলালের পিতা পৌত্রদিগের নামে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণলালকে ডিরেকটারের দায়িত্বে লিপ্ত করিয়া মকদ্দামা আনিলেও যে সুজন রায় তাঁহার ক্ষতি করিতে পারিবেন না,—বরঞ্চ এরূপ মকদ্দামায় তাঁহার নিজেরই প্রতারণাজাল প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, উকীল ব্যারিষ্টারগণ একবাক্যে কৃষ্ণলালকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

(২৮)

রাজা অতুলেশ্বরের কলিকাতার নিবাস মাণিকতলায়। ইহা একটি বিচিত্র উদ্যান-ভবন। বাড়ীর চারিদিকেই সবুজ ঘাসের ময়দান; আশেপাশে ফুলের কেয়ারি; স্থানে স্থানে প্রস্তর-মূর্ত্তির বিচিত্র শোভা, ফোয়ারার উৎস এবং যত্রতত্র বসিবার আসন। উদ্যানের পশ্চিম প্রান্তে স্বচ্ছসলিল সুবিশাল একটি হ্রদ; জ্যোতির্ম্ময়ী ইহার নামকরণ করিয়াছেন কিন্নরহ্রদ। এইনামানুযায়ী এ হ্রদে কিন্নরবাহন জালিবোট একখানি স্থানলাভ করিয়াছে।

রাজপ্রাসাদ উদ্যানের মধ্যস্থলে আর উদ্যানপ্রান্তে একটী ছোট দ্বিতল ভবনে বাস করেন ম্যানেজার। এতদ্-সংলগ্ন একটি স্বতন্ত্র একতল গৃহ ম্যানেজারের আফিস।

রাজা আসিয়াছেন, দ্বিপ্রহরের পর হইতে আজ আফিসে লোক সমাগম চলিতেছে। কৃষ্ণলালের রাণীগঞ্জের সম্পত্তির লেখাপড়া হইয়া গেল। কার্য্য-সমাপ্তিতে হেম নিশ্চিন্ত মনে কাগজের তাড়া লইয়া উকিলের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন, রাজা ও শ্যামাচরণ প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অপরাহ্নকাল—প্রথম আশ্বিনের দিবসান্তে কনক রৌদ্র তরুশীর্ষ হইতে শাখান্তরে লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে কিন্নরহ্রদে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। ইচ্ছা ডুব-সাঁতারে ওপারে যাইবে। কিন্তু কিন্নরনৌকার দাঁড়াহত বারিকণিকাপুঞ্জ পথিমধ্যে সহসা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়া সকৌতুকে তাহার কনক কান্তি রজত উচ্ছাসে ভাসাইয়া তুলিতেছিল। নৌকা বাহিত হইতেছিল আজ কাহার হস্তে? কে উহারা,—মানবী বা কিন্নরী?

অণুভা ধরিয়াছিল হাল আর দাঁড় বাহিতেছিল হাসি।

হাসি প্রায়ই এই উদ্যান-ভবনে বেড়াইতে আসে। কিন্তু তাহাকে এখানে টানিবার পক্ষে কাহার আকর্ষণ-বল অধিক—অণুভার বা এই কিন্নর-নৌকার তাহা ঠিক বলা যায় না। অণুভা যখন অভিমান ভরে সখীকে এইরূপ অনুযোগ প্রশ্ন করে তখন হাসি উত্তর না দিয়া—কখনো বা মৃদুমধুর হাসিতে কখনো বা চুল টানিয়া কখনো বা চুম্বনে তাহার মুখ বন্ধ করে।

নাবিক তারা উভয়েই সুদক্ষ। প্রথম প্রথম একজন মাঝি তাহাদের সঙ্গে থাকিত—আজকাল মাঝিকে তাহারা নৌকায় লয় না;—বেলা-শেষে নৌকা কূলে ভিড়িলে মাঝি নৌকা টানিয়া যথাস্থানে লাগায়।

হাসি দাঁড় টানিতে টানিতে গান ধরিয়াছিল;

আহা মরি জোয়ারে লেগেছে আজি ঢল!
ওরে স্রোত তরী মোর চল্ বেগে ছুটে চল্।
এ কি রঙ্গ কি কৌতুক! আমি ক্ষুদ্র বারিটুক
ধরেছি তরঙ্গ রূপ—যৌবনেতে টলমল।
চল্ স্রোত তরী মোর, বেগে চল্ ছুটে চল্।
নভ আজ রঙে ভরা—কি সুন্দর বসুন্ধরা।
কনক ভাদরে ক্ষণে—চমক বাদল জল।
চল স্রোত তরী মোর চল্ বেগে ছুটে চল্।
ঐ যে মেঘের নীচে, ঘাটের সীমানা পিছে—
কদম্ব কি কৃষ্ণতরু? কিবা ওর নাম বল্?
শাখা-ঢাকা ফুলে ফুলে, ডাকে রোজ দুলে দুলে
জানে না কি বন্দী আমি? বলহীন কণা-জল?
আজ মুক্তপ্রাণ দেহ, রাখিতে কি পারে কেহ?
এখনি উচ্ছাসনীরে ভিজাব চরণ ত—।
স্রোত ওরে তরী মোর চল্ বেগে ছুটে চল।

রাজা তখন শ্যামাচরণের সহিত এই পথে প্রাসাদে যাইতেছিলেন, গান শুনিয়া তীরে দাঁড়াইয়া শ্যামাচরণকে বলিলেন—

"বেশ ত মিষ্টি গলা। তোমার মেয়ে গাইছে বুঝি? আমি ত জানতাম না অণুভা গাইতে পারে?"

শ্যামাচরণ বলিলেন—"না অণুভা নয়, গান করছে হাসি—কৃষ্ণলালের মেয়ে—ও গানবাজনা বেশ শিখেছে।" এই সময় বোটের মুখ ফিরিল,—হাসির চোখ পড়িল তীরদেশে রাজার দিকে,—সহসা তাহার গান

৬

থামিয়া গেল।—রাজা তাহার লজ্জা বুঝিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। অণুভার চোখ ছিল তীরের বিপরীত দিকে, সে কহিল—"গান বন্ধ করলে যে?" হাসি এ প্রশ্নের উত্তর না করিয়া কহিল,—"কে ভাই উনি?" অণুভা তখন ঘাড় ফিরাইয়া তীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "কই, কাউকে ত দেখছিনে?"

"চলে গেলেন যে,—তোমার বাবাও সঙ্গে ছিলেন।" কে উনি ভাই?

"হতে পারেন রাজা—"

"রাজা কে?"

"জান না? প্রসাদপুরের রাজা,—তিনি এসেছেন যে।"

"রাজকুমারীর বাবা? তিনি হতেই পারেন না,—এ একজন পুরুষ মানুষ।"

অণুভা হাসিয়া কহিল—"রাজা কি স্ত্রীলোক হয় নাকি?"

হাসি এ-কথায় খুব খানিকটা হাসিল; তারপর কহিল—"না গো না, তা নয়, আমি বলছি ইনি একজন যুবাপুরুষ।"

"রাজা হলেই বুঝি বুড়ো হতে হয়?"

"আঃ, তা কে বলছে—! তবে রাজকুমারীর বাবা নন ইনি নিশ্চয়ই, দেখতে এঁকে অনেক ছোট।"

"তবে বোধ হয় কুমার অনাদি-দা, এঁর সঙ্গে তোর বিয়ে হলে ভাই বেশ হয়। রাজকুমারী এখনো বিয়ে করলেন না, রাজা বোধ হয় অনাদিদাকেই পুষ্যি নেবেন,—এইত ভাই গুজব। বিয়ে করবি ভাই তাঁকে?"

হাসি সে কথায় মন না দিয়া কহিল "কি রং ভাই?" অণুভা কহিল—"রাজবাড়ীর সকলেই সুন্দর! রাজার রংও চমৎকার! তুই অনাদিদাকে বিয়ে কর ভাই, আমরা সম্বন্ধ করি। রাণী হবি তুই, আমরা বলব রাণি-দিদি।"

অণুভা দূরে বসিয়াছিল—তাহার গাল টিপিতে পারিল না হাসি;—কিন্তু হাসির চুলে অণুভা যে ফুলগুচ্ছ পরাইয়া দিয়াছিল, তাহা খুলিয়া সে ছুঁড়িয়া মারিল। অণুভা আবার সেই ফুলে তাহাকে বাঁধিবার চেষ্টা করিল। এইরূপ ফুল সন্ধানে তাহারা বেশ যখন মাতিয়া উঠিয়াছে—তখন তীর হইতে শ্যামাচরণ ডাকিলেন "অণু—? সন্ধ্যা হয়ে আসছে—ফের এবার।"—

মুহূর্তে তাহাদের হাসি-কৌতুক বন্ধ হইল এবং নৌকাও কূলের দিকে ফিরিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সংযত শিষ্ট শান্ত মেয়ে দুইটি ঘাসের উপর শ্যামাচরণের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্যামাচরণ কহিলেন—"রাজা বাইরে যাচ্ছেন—আমারও সঙ্গে যেতে হবে,—একটা কথা বলতে এলুম হাসি? তোমার মাকে বলো মা; কাল আমি নরেনকে আশীর্বাদ করতে যাব।" হাসি বলিল, "আচ্ছা বলব। আপনি তাহলে বোধহয় শীঘ্র ফিরবেন না; প্রণাম করে নিই।" হাসি প্রণাম করিল। অণুভা কহিল—"বাবা, অনাদি দা-ও কি তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছেন? নইলে হাসিদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতুম।"

হাসির মুখ লাল হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণ বলিলেন,—"অনাদি আগেই বাইরে গেছেন। দেখাশুনো হবে, সেজন্যে

ভাবনা কি? হাসি, তাহলে বলো মা তোমার মাকে যে, কাল বিকালের দিকে আমরা যাব। বেশী আয়োজন যেন না করেন। এ আশীর্ব্বাদে সমারোহ পর্ব্ব কিছু থাকবে না,—বড় জোর দু-একটি বন্ধুকে মাত্র সঙ্গে নিতে পারি—।”

হাসি যথাসময়ে বাড়ি আসিয়া সকলকে এই খবর দিল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

খাজুরাহো

খাজুরাহো বুন্দেলখন্দের অন্তর্গত ছত্তরপুর বা ছত্রপুর নামক করদরাজ্যে অবস্থিত। বুন্দেলখন্দের প্রাচীন নাম যিঝোতি বা যাজকভুক্তি। (Ep Ind. Vol. IX. p. 284) চীন পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যাজভুক্তি চি-চি-তো নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ইউয়ান চোয়াংএর ভারত-ভ্রমণ ৬৪১ খৃঃ অব্দের কথা। তারপর ১০২২ অব্দে গজনীর সুলতান মামুদের কলিঞ্জর অভিযান-কালে আবু রিহাণ ‘কাজুরাহা’ ‘যাজাহুতির’ রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইউয়ান চোয়াং-এর বর্ণনা-মতে যাজাহুতির রাজা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার রাজধানীর বেড় ১৫ বা ১৬ লি অর্থাৎ ২৷৷০ মাইলের কম ছিল না। সে সময় কিয়ৎসংখ্যক বৌদ্ধ বিহার এই স্থানে অবস্থিত থাকিলেও দ্বাদশটি হিন্দু মন্দির সম্পর্কে প্রায় এক সহস্র ব্রাহ্মণ নগর-সীমায় বাস করিতেন। স্বর্গগত কানিংহাম সাহেবের মতে যিঝোতির পশ্চিম সীমায় বেতোয়া নদী, পূর্ব্ব সীমায় মৃজাপুরের স্থান অবস্থিত। আচার্য্য স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যে যিঝোতীয় ব্রাহ্মণকুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এই ভূভাগেই সেই ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষদিগের বাসস্থান ছিল বলিয়া শুনা যায়। জেনারেল কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন, যমুনার উত্তরে ও বেতোয়ার পশ্চিমে তিনি কোনও যিঝোতীয় ব্রাহ্মণ-পরিবার লক্ষ্য করেন নাই। (Cunningham’s Archaeological Survey Reports, Vol. II. p. 413)

খাজুরাহে খাজুর-সাগর ও শিবসাগর বলিয়া দুইটি দীর্ঘিকা আছে। গ্রামের পশ্চিমাংশে অবস্থিত হিন্দু মন্দিরগুলি শিবসাগরের সান্নিধ্যে অবস্থিত। জৈন মন্দিরগুলির অবস্থান গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে। এই সকল প্রাচীন ভগ্নাবশেষ প্রায় একবর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; গান্থাই নামক এক-স্তম্ভ-বিশিষ্ট একটি মন্দির ও একটি স্তূপাকৃতি ভগ্নাবশেষ বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির, উত্তরে গঙ্গা ও যমুনা এবং দক্ষিণে নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি-বৌদ্ধ কীর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দেউলের বহির্ভাগে, ভগ্নাবশেষ মধ্যে একটি বৃহদায়তন মূর্ত্তির পাদপীঠ পাওয়া যায়, তাহাতে “যে ধর্ম্ম হেতুপ্রভব”

প্রভৃতি বৌদ্ধমন্ত্র লেখা ছিল। ১৩১৫ খৃঃ অব্দে আরব ভ্রমণকারী ইবন্ বতুতা যখন খাজুরাহে আগমন করেন, তখন এখানে একশ্রেণীর জটাধারী যোগী সম্প্রদায় বাস করিতেন। ইবন্ বতুতা লিখিয়াছেন যে প্রায়শঃ উপবাস করিতেন বলিয়া ইঁহাদের দেহের বর্ণ পীতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-কলাপ শিক্ষা করিবার জন্য অনেক মুসলমানও ইঁহাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন।

খাজুরাহোর প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে চন্দেল রাজপুত বংশের এবং প্রভাবশালী গুপ্তরাজ-বংশের স্থাপত্য চিহ্নগুলিই সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বর্ত্তমান খাজুরাহো গ্রামে এখনও যে প্রায় বিশ-ত্রিশটি মন্দির অল্পাধিক জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেগুলি চান্দেল বংশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ১০০০ অব্দেরও প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়া উহার প্রায় একশত বৎসর পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত—দুইটি সুদীর্ঘ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। খাজুরাহোতে যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ৯৫৪ অব্দ হইতে প্রায় ১০০২ অব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ।

(Ep. Indic vol I. p 121-153)

সমগ্র মন্দিরগুলির এক-তৃতীয়াংশ জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত, অপর তৃতীয়াংশ শৈব এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ বৈষ্ণব মন্দির। কেহ কেহ ইহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অভাব এবং রাজশক্তির নিরপেক্ষ ব্যবহারের জাজ্বল্যমান নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা করেন। (Fergusson's History of India and Eastern Architecture Vol II. p. 141) এখানকার সকল মন্দিরগুলিই উত্তর-দেশীয় আর্য্যাবর্ত্ত-প্রথায় নির্ম্মিত। শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয় প্রণীত "ভারতীয় স্থাপত্য" (Indian Architecture) নামক গ্রন্থে খাজুরাহো প্রসঙ্গে কান্ধারিয়া মহাদেবের মন্দিরটিই বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভিন্সেট স্মিথ শিল্প-সৌন্দর্য্যে খাজুরাহোর বিশ্বনাথ মন্দির প্রধান প্রধান হিন্দুমন্দিরগুলির অন্যতম বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন। (V. Smith's History of Fine Art in India and Ceylon p. 28) এখানকার মন্দিরসমূহের অধিকাংশই কঠিন নিস্ (gneiss) প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই দেউলগুলি যেরূপ বিশালকায়, সেইরূপ আবার সুন্দর শিল্পকলায় বিভূষিত।

নিস্ পাথরে বাটালি ভাল চলেনা বলিয়া কারু-কার্য্য করিবার জন্য বালিয়া পাথর মন্দির-গাত্রের কোলঙ্গা কার্ণিস প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। কয়েকটি মন্দিরে ভারতী প্রথায় নির্ম্মিত গম্বুজগুলি বড়ই সুন্দর—স্থপতির অদ্ভুত কীর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত গ্রথিত প্রস্তররাশির—পাটিগুলি (courses অপূর্ব্ব কৌশলে একটি অপরটির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। অভিজ্ঞগণের মতে স্থাপত্য-শিল্পের পরিপাট্য-নিদর্শক উদ্গাত অ (cusps) গুলিও বড়ই সুন্দর!

হেভেল সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন মুধেরা, খাজুরাহো, দাভোই, গোয়ালি প্রভৃতি স্থানের এই সকল প্রাচীন হিন্দুকী যদি বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে মো যুগে আগ্রার তাজ ও 'মতি' মসজিদ, দিল্লী

জামী মস্‌জিদ ও রেজাপুরের মুসলমান সুলতান-গণের কীর্ত্তি-স্তম্ভস্বরূপ প্রাসাদ ও উপাসনা-গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা কখনও সম্ভব হইত না। মোগল সম্রাট ও তাঁহাদের অধীনস্থ শাসন-কর্ত্তৃগণ হিন্দুস্থাপত্য-প্রতিভার সদ্ব্যবহার করিয়াও মুসলমান-ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। (Havell's Indian Architecture I. 2)

পালিতানার জৈন মন্দিরের শিখরের ন্যায় খাজুরাহোর মন্দিরের শিখরগুলিও উদ্গত স্তম্ভ বিশিষ্ট। উৎকল মন্দিরের বিমানের সহিত সাদৃশ্যের কথা শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য প্রবন্ধে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ইংরাজ স্থপতিবিদ সম্পসন সাহেব রথের বংশ নির্ম্মিত আবরণ হইতে বক্রতা

রথ
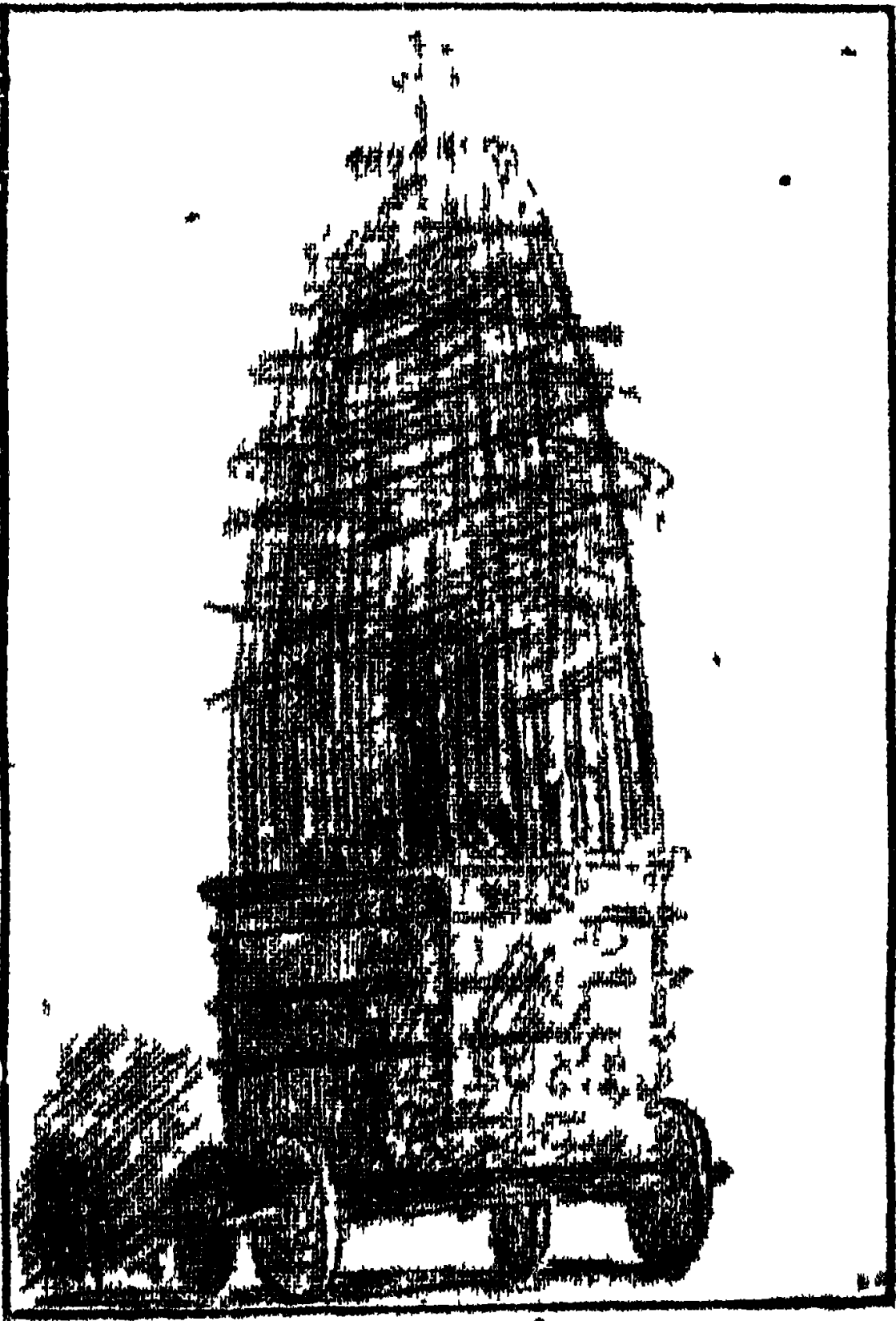
বিশিষ্ট (curvilinear) শিখরাদি উদ্ভব হওয়া সম্বন্ধে যে মতবাদের সমর্থন করিতেছেন, প্রদর্শিত চিত্রটি লক্ষ্য করিলে প্রাচীন যাজকভুক্তির অন্তর্গত আর্য্যাবর্ত্ত-প্রণালী মন্দিরাদির শিখর সম্বন্ধে ইহা যে কতদূর প্রযুজ্য, পাঠকগণ সহজেই তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন। খাজুরাহোর প্রধান মন্দিরগুলিতে মণ্ডপ, মহামণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ ব্যতীত অর্দ্ধমণ্ডপও দেখা গিয়া থাকে। সম্মুখভাগে অর্দ্ধ-উন্মুক্ত মণ্ডপস্থানীয় প্রবেশ পথ এতদ্দেশীয় মন্দিরের বিশেষত্ব বলিয়া মনে হয়। প্রথম দৃষ্টিতে মণ্ডপের ছাদের ক্রমবিন্যাস দেখিয়া তাহা কেমন যেন গোল মেলে বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু পা হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এক আর একটির উপর বেশ সুশৃঙ্খলভাবে সুবিন্যস্ত।

উড়িষ্যার নাট-মন্দিরের ছাদের সহিত ইহার পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য উহার একটি রেখা চিত্র প্রদত্ত হইল।

এখানকার সকল মন্দিরগুলিতেই আ লকের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কান্দারিয়া মহাদেব মন্দিরের চারি পার্শ্বের পরিক্রমণ-পথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। বিশ্বনাথ মন্দিরে সুবৃহৎ হস্তীমূর্ত্তি কোণারকের হস্তীর ন্যায় সুন্দর না হইলেও ভারতীয় ভাস্কর্যে জান্তব প্রতিকৃতির নিতান্ত অযোগ্য নহে। চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরই খাজুরাহোর প্রাচীনতম মন্দির। ইহা স্থাপত্য অলঙ্কার বর্জ্জিত বলিলেও হয় এবং ইহার গঠন-প্রণালী অন্য দেউল হইতে ভিন্ন বলিয়া কানিংহাম অনুমান করিয়াছিলেন,
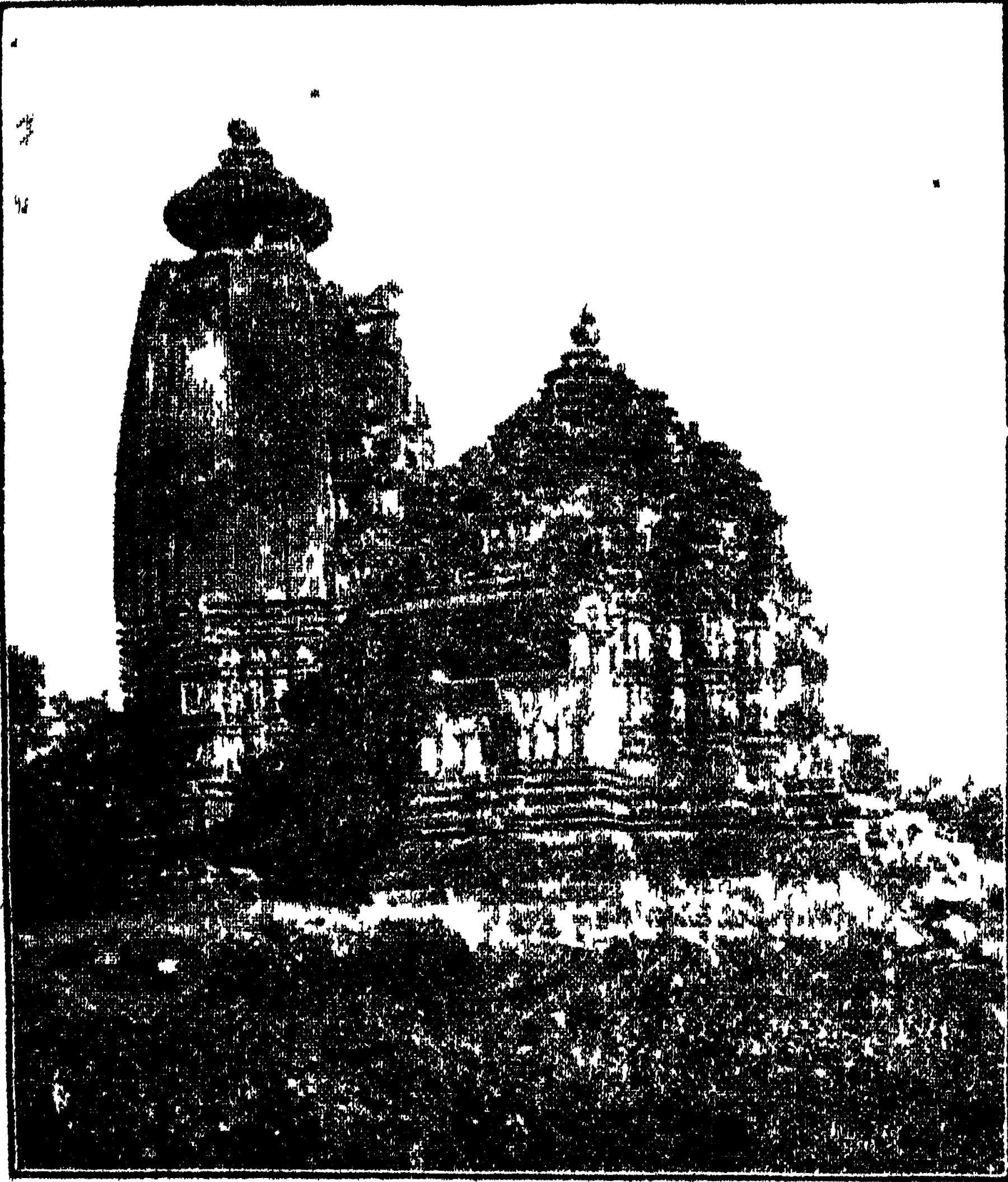
বামন-মন্দির

১০০ খৃঃ অব্দেরও পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দির কয়টি ব্যতীত দেবী জগদম্বা, মৃত্যুঞ্জয় শিব, বামন ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের মন্দির পুরাতত্ত্ববিদ ও সৌন্দর্য্য-পিপাসু দর্শক উভয়েরই নিকট সমান আদরণীয়। সৌধসংলগ্ন 'কুটিল' লিপির অক্ষরাদি পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বামন-মন্দিরটি দশম বা একাদশ খৃঃঅব্দে নির্ম্মিত। উড়িষ্যার মন্দিরের সহিত ইহার আকৃতি-গত সাদৃশ্য প্রতিকৃতি দর্শন-মাত্রেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। 'ছত্রকা পত্র' সূর্য্য মন্দির। গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের উপরি ভাগে তিনটি সূর্য্য-মূর্ত্তি এবং গর্ভগৃহের ভিতরে পাঁচফুট উচ্চ পদ্ম-পুষ্পধারী দ্বিভুজ সূর্য্য মূর্ত্তি আছে। ইহাই মন্দিরের প্রধানতম বিগ্রহ। এই মন্দিরের শিখরদেশ হইতে উদ্গত শিখরাকৃতি ক্ষুদ্র চূড়াগুলি—উত্তর দেশীয় আর্য্যাবর্ত্ত-স্থাপত্য-প্রথার প্রভাব জ্ঞাপন করিতেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আর্য্যাবর্ত্ত-প্রণালীর মন্দির গুলিতে বিভিন্নপ্রকার বৈশিষ্ট্য অবলম্বিত
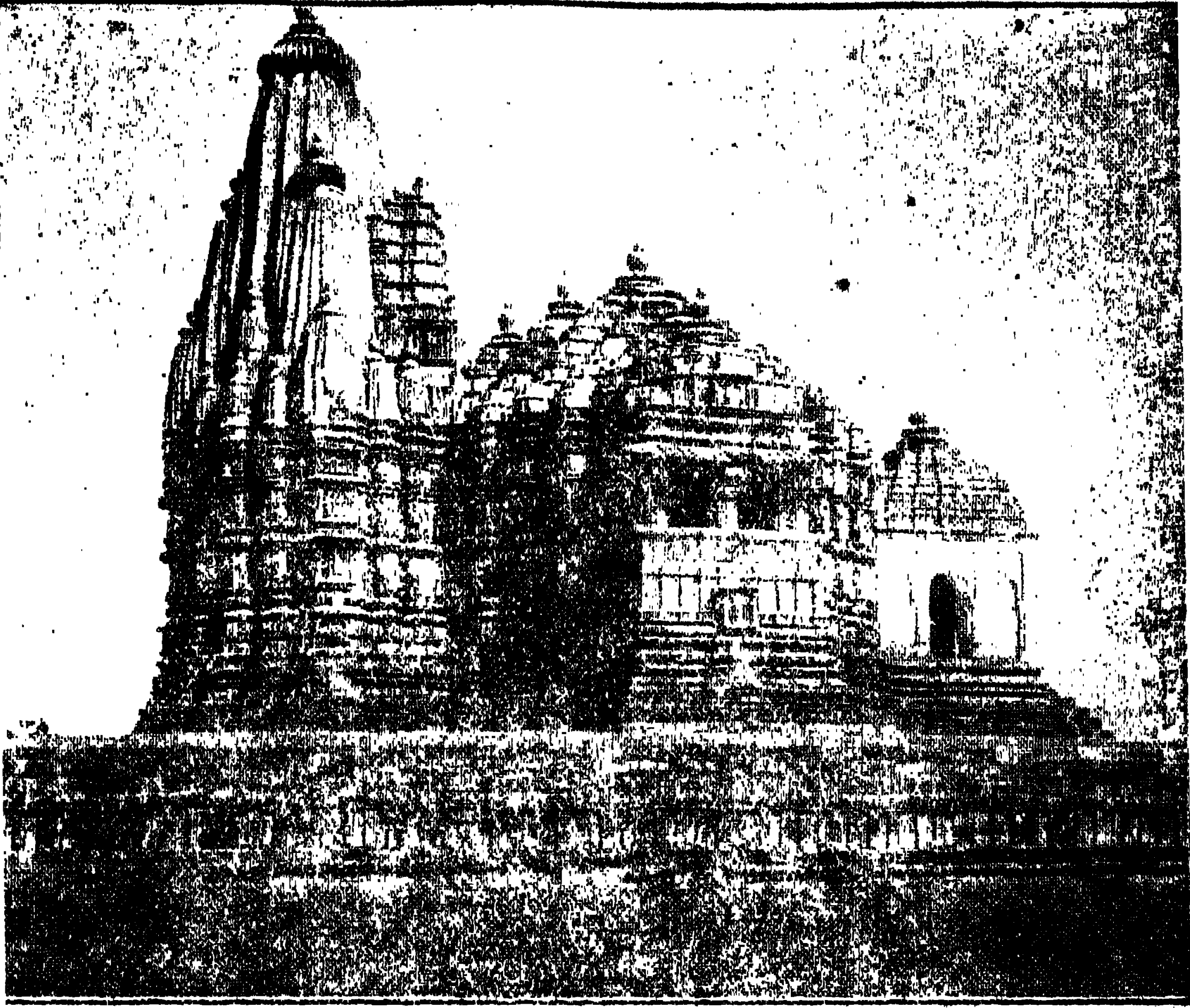
ছত্রকা-পত্র মন্দির

হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় আর্য্যাবর্ত্ত-প্রণালীর দেউলের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্তনগরের বিখ্যাত মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

খাজুরাহোর খোদিত চিত্রাদির আলোক-চিত্র দেখিয়া * উড়িষ্যার মন্দির-ভাস্কর্য্যে মিথুন-লীলার কথা স্বতঃই মনে আসে বটে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে রাজপুত ও উড়িয়া শিল্পিগণ একই প্রথা অবলম্বন করে নাই। ধরা-বাঁধা নিয়ম মানিয়া চলিলে উভয় দেশীয় চিত্রে বন্ধবিন্যাস প্রভৃতির বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইত না।

এখানে কোন কোনও আলম্বনে বহু নরনারী শ্রেণীবদ্ধভাবে চারিদিক বেড়িয়া সহস্র বন্ধে অবস্থিত দেখিতে পাই; কেবল দুই-দুইটি তিন-তিনটি করিয়া বিভিন্ন ফলকে সন্নিবিষ্ট নহে। কোণার্কের সে সৌন্দর্য্য এগুলিতে নাই,—কামনার তরঙ্গ-ভঙ্গে মানব-মানবীর পশুত্বই যেন অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে!

শ্রীগুরুদাস সরকার।

* বিশ্বনাথ-মন্দিরে মিথুন-মূর্ত্তি ও কামলীলার চিত্রে অভাব নাই। জগদম্বা-মন্দিরে অশ্লীল চিত্র আছে বটে, কিন্তু উহা কান্ধারিয়া মহাদেবের মন্দির-গাত্রস্থ চিত্রাদির ন্যায় বীভৎসভাবে প্রকট নহে।

আলোচনা

মাননীয় সম্পাদক-মহাশয়,

বিগত আষাঢ় সংখ্যার ভারতীতে প্রকাশিত "বৌদ্ধ-শিক্ষা-পদ্ধতি" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া লেখক-মহাশয়ের অকারণ মোস্লেম-বিদ্বেষ-পরায়ণতার পরিচয় পাইয়া নিতান্ত বিস্মিত এবং ব্যথিত হইলাম।

সরকার-মহাশয় লিখিতেছেন যে,—"বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিহারে ৮ টী প্রশস্ত কক্ষ এবং ৩০০ শত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল। ইহারই একটি বড় প্রকোষ্ঠার মধ্যে রত্ন-দধি নামক বৃহৎ গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল; হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়েরই যাবতীয় পুস্তক, এই পুস্তকালয়ে রক্ষিত ছিল। জনপ্রবাদ এই যে, অষ্টম শতাব্দীতে সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে, অপ্রাপ্তবয়স্ক তৈর্থিক সন্ন্যাসীগণ দ্বারা এই পুস্তকাগার ভস্মীভূত হয়। আমার মনে হয় যে, বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের মধ্যে যেরূপ কঠোর নিয়মাবলী ছিল, তাহাতে এরূপ দুর্ঘটনা কদাপি সাধুদিগের দ্বারা সম্ভাবিত হইতে পারে না।"

এই কথা বলিয়াই তিনি বিনা-কারণে বিনা-প্রমাণে সহসা বঙ্গ-বিজেতা প্রাতঃস্মরণীয় বীরপুরুষ বখ্তিয়ার খিলিজীর স্কন্ধে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়-ধ্বংসের অপরাধ চাপাইয়াছেন; এবং মহারাজ শশাঙ্ক যেমন একদিনে ৮৪ সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণ বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবীর বখ্তেয়ার খিলিজীও বিহারের সমস্ত বৌদ্ধকীর্ত্তি বিনাশ করিয়াছিলেন, এক নিশ্বাসে এই কথাটি বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তৎসম্বন্ধে একটী প্রমাণও উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই!

আমরা জিজ্ঞাসা করি, তৈর্থিক সন্ন্যাসীদিগের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হওয়া অসম্ভব হইল কিসে? যাহারা হিংসাবশে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতে পারে, তাহারা যে হিংসা-বশে পরস্পরের গ্রন্থাদি জ্বালাইয়া দিতে পারে না, ইহা কোনও বুদ্ধিমান লোক বিশ্বাস করিতে পারে কি? ভারতের ইতিহাসে হীনযানে ও মহাযানে, শৈবে ও শাক্তে, শাক্তে ও বৈষ্ণবে কতবার ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে, সরকার-মহাশয় তাহার কোন খোঁজ-খবর লইয়াছেন কি? শঙ্করাচার্য্য এবং কুমারিল ভট্ট দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের নব অভ্যুত্থানে ও নব-প্রচারে ভারতের যাবতীয় বৌদ্ধ নর-নারী কিরূপ ভাবে নিহত এবং যাবতীয় হিন্দু মন্দির কিরূপ ভাবে ধ্বংসীকৃত এবং রূপান্তরিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন জগন্নাথের মন্দির এবং গয়ার মন্দির দেখিলেই ত বুঝিতে পারা যায়। আজ যে হিন্দুভ্রাতারা "বুদ্ধ এবং বৌদ্ধযুগের উন্নতি"র কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতে শিক্ষা করিতেছেন, হায়, তাঁহাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষগণ বৌদ্ধরক্তে স্নান করিয়া ত্রিতাপ-জ্বালা দূর করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার!

আজ হিন্দুলেখকদিগের অনেকেই সেই মহাধ্বংস ও হত্যার পাপ, নির্দ্দোষ মুসলমানের স্কন্ধে চাপাইয়া আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে কলঙ্ক-মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন! কিন্তু এ চেষ্টা কদাপি সফল হইবে না।

প্রথম কথা এই যে, মুসলমানের পৃথিবী-বিজয় ব্যাপারে এবং সহস্রবর্ষ নিখিল পৃথিবীতে রাজদণ্ড পরিচালনার সুদীর্ঘ ও বিপুল ইতিবৃত্তে পুস্তক, পাঠাগার ও বিদ্যালয় ধ্বংসের বিন্দুমাত্র কলঙ্ক-কালিমাও দেখাইতে কাহারও সামর্থ্য নাই। সমস্ত জীবন ধরিয়া মোস্লেম ইতিহাসের চর্চ্চা করিয়া যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তাহা হইতেই ইহা স্পর্দ্ধা করিয়াই ঘোষণা করিতেছি। মুসলমানেরা কোনও জাতির জ্ঞান-বিদ্যাকে অগ্রাহ্য বা হিংসা করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহারাই গ্রীশ, রোম ও ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডার রক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই মুসলমানের নিকট "কাফের" বলিয়া অভিহিত ছিল। এ অবস্থায় হিন্দু "কাফের", বৌদ্ধ "কাফের" অপেক্ষা কোন্ সূত্রে এত প্রীতিভাজন হইয়াছিল যে, মুসলমানেরা বাছিয়া বাছিয়া কেবল বৌদ্ধ কীর্ত্তিই বিনাশ করিলেন, আর হিন্দুকীর্ত্তি স্পর্শও করিলেন না।

যে রাজা শশাঙ্ক একদিনে ৮৪ হাজার শ্রমণ হত্যা করিতে পারেন, বরং তিনি বা তাঁহার বংশধর বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার পোড়াইয়া দিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিলেও না-হয় সরকার-মহাশয়ের প্রবন্ধটা কিছু ইতিহাস-গন্ধী হইতে পারিত! যাহা হউক, আশা করি আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণ, অতঃপর "যবন" নিন্দা-প্রচারে একটুকু সাবধান ও সতর্ক হইবেন। ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধানে সর্ব্ব-প্রকারের জাতি-গত ও দেশ-গত সংস্কার পরিবর্জ্জনীয়। ইতি

সৈয়দ ইস্মাইল হোসেন সিরাজী।

২

ভারতীর মাননীয় সম্পাদক-মহাশয় বঙ্গের বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ ইস্মাইল হোসেন সিরাজী-সাহেবের একখানি প্রতিবাদ-পত্র পাঠাইয়া আমার উত্তর চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

আমি কদাচ জাতিগত বা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করি নাই।

এখন দুই-একটা কাজের কথা বলি। সিরাজী-সাহেবের ইতিহাসটা ততদূর ভালরূপ পড়া আছে কিনা জানি না,—যদি থাকিত, তাহা হইলে আমাকে তিনি এরূপ নির্দ্দয়ভাবে আক্রমণ করিতেন না। কর্দোভার বিশ্ব-বিদ্যালয় ও তাহার পুস্তকাগার মুরগণ নষ্ট করে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। মুরগণ মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মধ্যভারতের চঙ্গিজ খাঁ যেরূপভাবে জয়-সাধন ও তদ্দেশীয় সভ্যতার নিদর্শন-গুলি নষ্ট করেন, তাহা পাঠ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে; ইহাও যে ঐতিহাসিক সত্য, তাহা সিরাজী-সাহেব কি অস্বীকার করেন? যদি তাহা করেন, তবে তাঁহাকে আমার বলিবার কিছুই নাই। তবে

এ কথা বলিতে পারেন যে, এ-সব ঘটনাগুলি ভারতের ঘটনা নহে।

সত্য! ভারতের ঘটনা এইবার শুনুন। আমি যে কথা লিখিয়াছি, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। স্থানীয় প্রবাদ ও মুসলমানদিগের রচিত গ্রন্থ-সমূহ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মুসলমানগণ ভারতের প্রতি কিরূপ নৃশংস অত্যাচার করিয়াছিলেন। হোসেনাবাদ নবাবগৃহে যে মূল সাইয়ার মুতাক্ষরীণ রক্ষিত আছে, তাহা, এবং সার হেনরি ইলীয়টের ভারতের ইতিহাস ২য় ভাগ ৩০৫ পৃষ্ঠা, তবাকাৎ-ই-নাসিরী ও শূন্য পুরাণাদি পুস্তক-পাঠে আমরা জানিতে পারি, বিজয়ী মুসলমানগণ কিরূপে ভারতের তথা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ও বিহারের মন্দিরাদি লুণ্ঠন এবং বৌদ্ধ শ্রমণাদি নাশ ও পুস্তকালয় ধ্বংস করিয়াছিলেন। এই-সব বই পাঠ করিয়া তবে সিরাজী-মহাশয় যাহা করিবার ও বলিবার তাহা করিবেন ও বলিবেন। সিরাজী সাহেব যদি এই-সব বই পাঠ করেন, তবে তাঁহার ভ্রম অপনোদিত হইবে এবং সেই সঙ্গে তিনি জানিতে পারিবেন যে, লোককে বুঝিয়া-সুঝিয়া সব কথা বলা উচিত।*

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

বর্ণ-সঙ্কর

প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণসঙ্কর অনেকস্থলে ভয়াবহ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হিন্দু-শাস্ত্রের মুকুটমণি শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা তো বর্ণসঙ্করের উপর খড়্গহস্ত। 'সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ" গীতার এই সব বচন সকলেরই জানা আছে। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকাররাও ইহার উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। যদিও সমাজ-রক্ষার খাতিরে তাঁহাদিগকে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের ব্যবস্থায় মত দিতে হইয়াছিল, তবুও সেটা যেন কতকটা দায়ে পড়িয়া। আসলে সঙ্কর জাতিদের উপরে স্মৃতিশাস্ত্র বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রকাশ করা হয় নাই।

অথচ এটা একটা জানা কথা যে, এই বর্ণসঙ্কর ব্যাপারটাকে কোন লোক-মত বা শাস্ত্রই ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের বিপুল ভাণ্ডার মহাভারতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত। যে মহাবংশের গৌরব-কীর্ত্তন মহাভারতের প্রধান উদ্দেশ্য, সেই কুরুবংশের ভিত্তিই বর্ণসঙ্করের উপর। শান্তনু রাজা ধীবর-কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করিয়া ইহার

---

* এই দুইটী পত্রেই আক্রমণের ভঙ্গীটা তেমন 'সাহিত্যোচিত' হয় নাই। সাহিত্যে অযথা ব্যক্তিগত কটুকাটব্যের স্থান নাই। কোন ঘটনার সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে হইলে মূল গ্রন্থাদি হইতেই তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় দুইখানি পত্রেই স্থানে স্থানে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছিল যে, ভদ্রতার খাতিরে দুইখানি পত্রেই কিছু কিছু বাদ দিতে হইয়াছে। ভাঃ সঃ।

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তারপর ভীমের হিড়িম্বা-বিবাহ, অর্জ্জুনের নাগকন্যা উলুপী, চিত্রাঙ্গদা ও প্রমীলা প্রভৃতিকে বিবাহ, জরৎকারু ঋষির নাগকন্যা-গ্রহণ, যদুবংশ-ধ্বংসের পর যাদব-রমণীদের অনার্য্যদের অঙ্ক-লক্ষ্মী হওয়া প্রভৃতি বিস্তর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। রামায়ণেও আর্য্য-অনার্য্য মিলনের অভাব নাই। প্রাচীন শাস্ত্রকার বা কবি অধিকাংশ স্থলেই কোন না কোন অদ্ভুত পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করিয়া এই বর্ণসঙ্করের দোষ চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত অন্ধ ভিন্ন এত স্পষ্ট ব্যাপারটা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না।

ফলতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসকে এই বর্ণসঙ্কর বা জাতিসংমিশ্রণের একটা বিরাট মানচিত্র বলিলেও বলা যায়। আর্য্য, দ্রবিড়, মোগল, শক, হূণ, তাতার ও তুর্ক প্রভৃতি কত জাতি যে এই ভারতক্ষেত্রে আসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আর তাহার ফলে এই-সব জাতির পরস্পরের মিশ্রণে কত যে বিচিত্র বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও বর্ণনা করা অসাধ্য। একথা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না, যে আধুনিক ভারতে এমন জাতি নাই যাহার মধ্যে বিভিন্ন জাতির রক্তসংমিশ্রণ না হইয়াছে। বিশুদ্ধ আর্য্য বা বিশুদ্ধ দ্রাবিড় প্রভৃতি সমস্ত ভারতবর্ষ খুঁজিলেও মেলা ভার। মিথ্যা গর্ব্বের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যে যাহাই মনে করিনা কেন, খাঁটি ককেশিয়ান বা খাঁটি মঙ্গোলিয়ান রক্তের অস্তিত্ব, আমাদের মনো-জগৎ ছাড়া আর কোথায়ও নাই।

ভারতবর্ষের জাতিসমূহ সম্বন্ধে এতক্ষণ যে কথা বলিলাম, পৃথিবীর সমস্ত জাতির সম্বন্ধেই সেই একই কথা বলা যাইতে পারে।

ইউরোপ, আমেরিকা——এমন-কি আফ্রিকার জাতি-সকলের মধ্যেও আভিজাত্য গর্ব্ব অত্যন্ত প্রবল, বর্ণসঙ্করকে তাহারাও অত্যন্ত ঘৃণা করে। কিন্তু ঘৃণা করিলে কি হয়, বর্ণসঙ্করকে তাহারাও ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। ইউরোপ ও আমেরিকার জাতি-সমূহের মধ্যে যে কত বিভিন্ন জাতির রক্ত মিশিয়াছে, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন। ইংরাজ, জর্ম্মাণ, ফরাসী, রুস ও মার্কিন প্রভৃতি সকল প্রধান জাতিই নানাজাতির রক্ত-সংমিশ্রণে পরিপুষ্ট। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকলেই মনে করে আমরা অত্যন্ত বিশুদ্ধ জাতি, আমাদের মধ্যে কোনরূপ ভেজাল নাই। কলিকাতার অধিবাসীরা জানিয়া-শুনিয়া বেশী দাম দিয়া মাড়োয়ারীদের দোকান হইতে ভেজাল ঘি কিনিয়া, যেরূপ মনে মনে আনন্দ বোধ করে, এটাও অনেকটা সেইরকম।

আসল কথা, একদিকে স্বভাব ও অন্য দিকে অহঙ্কার, এই দুইয়ে মিলিয়া মানুষকে বড় গোলমালের মধ্যে লইয়া গিয়া ফেলিয়াছে। জাতির সঙ্গে জাতির মিশ্রণ মানুষের স্বভাবের বশে অনিবার্য্য,ইহাকে কেহই ঠেকাইতে পারে না। ফলে প্রতিনিয়তই সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব-কালে এই জাতিমিশ্রণ ঘটিতেছে। অন্যদিকে মানুষের অহঙ্কার, আভিজাত্য বা জাতিগর্ব্ব এই জিনিষটাকে কোনরূপেই পছন্দ করে না। সুতরাং সকল জাতিই এই বর্ণসঙ্করকে

আটকাইবার জন্য নানারূপ বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। সমাজের নানারূপ বিধি নিষেধ, আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন এই বেড়া দেওয়ার চেষ্টায় পরিপূর্ণ। বিবাহ সম্বন্ধে যত কথাকথি, সকলেরই মূখ্য লক্ষ্য এইখানে। ভারতবর্ষের জাতিভেদের মূল তত্ত্ব খুঁজিতে গিয়া নানা পণ্ডিতে নানারূপ গবেষণা করিয়াছেন। আমাদের সে সকল কচ্কচির মধ্যে যাওয়ার দরকার নাই। তবে মোটা বুদ্ধিতে এটা আমরা নিশ্চয় করিয়া জানি যে, জাতিভেদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য, এই বর্ণসঙ্কর আটকাইবার দেয়াল গড়িয়া তোলা। যে সকল সমাজে আমাদের মত জাতিভেদ নাই, সেখানেও ইহার ছোটভাই আভিজাত্য, সামাজিক প্রথা প্রভৃতির দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। আমাদের দেশের নবীন উপন্যাসকারেরা যেমন ব্রাহ্মণ-কায়স্থের কিশোর-কিশোরীর মধ্যে প্রণয় সংঘটন করিয়া করুণ সমস্যার সৃষ্টি করিয়া তোলেন; বিলাতী নভেলিষ্টরাও তেমনই লর্ড ও কৃষক দুহিতার প্রণয়-কাহিনীর মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনাতে পাঠকের হৃদয়দুর্গ জয় করিতে চেষ্টা করেন।

বিশেষ করিয়া আমাদের জাতির মধ্যে এই বন্ধনের কড়াকড়ি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। মুক্ত জাতির মধ্যে নানা মহালের দরজা খোলা থাকায়, এই বন্ধনের কর্তৃত্ব সেখানে ততটা প্রবল হয় না। কিন্তু দাস জাতির মধ্যে জীবনগতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসাতে বাঁধাবাঁধির কারবারটাই বাড়িয়া উঠে। স্রোতের জলের খর গতিতে অনেক আবর্জ্জনাই দাঁড়াইতে পারে না। আর কূপ-তড়াগের বদ্ধজলে সহজেই শৈবালদল আপন আধিপত্য বিস্তার করে। তাই মুসলমান-বিজয়ের পর হইতে যতই আমাদের বাহির-মহালের দরজা একে একে বন্ধ হইয়া আসিতেছে, ততই আমাদের অন্তঃপুরের প্রাঙ্গন, ছোটখাট অসংখ্য দেয়ালে ভরিয়া উঠিয়াছে। ফলে ঘরের আনাচ-কানাচ পর্য্যন্ত বন্ধনের দড়াদড়িতে এমন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে যে, অনেকস্থলে নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলা দায়। কিন্তু চীনারমণীরা যেমন লোহার জুতার নিগড়ে বদ্ধ নিজেদের খোঁড়া পা-টাকেই আভিজাত্যের চরম চিহ্ন মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করে, আমরাও তেমনই এই বন্ধনের আতিশয্যকেই আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ মনে করিয়া গৌরব বোধ করি। কেহ ইহার বিরুদ্ধে কথা কহিলে, বাঁধনটা একটু আল্গা করিতে চাহিলে, লাঠি লইয়া তাহাকে তাড়া করি।

অবশ্য, বন্ধনের যে একেবারেই দরকার নাই এমন কথা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বলে না। বন্ধনহীন সমাজ কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হয়। কিন্তু এই যে বন্ধন, ইহা স্বাধীনতাকেই নিয়মিত করিবার, সমাজের এলোমেলো গতিকে জীবনের ছন্দের মধ্যে আনিবার জন্যই প্রয়োজন। প্রত্যেক জাতিরই একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা বিশিষ্টতা আছে; আর ইহাকেই ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নিয়ম সংযমের শৃঙ্খলা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য এইরূপ হইলেও, জীবনের অনেক ব্যাপারে যেমন এখানেও তেমনই, আসল

উদ্দেশ্যকে ভুলিয়া উপায়কেই আমরা বড় করিয়া তুলি। সমাজের বর্ণসঙ্কর-ভীতি এই সহজ নিয়মের ফলে, আত্মরক্ষার উপায় রূপেই প্রথমে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু কাল-প্রবাহে ইহার সঙ্গে নানারূপ কষ্টকল্পনা ও ভ্রম ধারণা মিলিয়া ইহা একটা কিম্ভূত-কিমাকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, এই সকল কষ্ট-কল্পনা ও ভ্রম-ধারণার নিরসন করিয়া সত্যকে প্রকাশ করা। আধুনিক জীব-বিজ্ঞান বর্ণসঙ্কর সমাজকে লইয়া অনেক নাড়া চাড়া করিয়া সত্যকেই জানিতে চেষ্টা করিয়াছে। সমাজ-বিজ্ঞানের শৈশবে লোকমতের অনুসরণ করিয়া বর্ণসঙ্করকে জাতিধ্বংসকর বলিয়াই স্থির করা হইয়াছিল। অনেক স্থলে এইরূপ কতকগুলি দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের জাতিরা যখন আমেরিকা ও আফ্রিকার নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তখন সেই সকল স্থানের আদিম জাতিদের সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্য জাতিদের মিশ্রণের ফল বড় ভাল দেখা যায় নাই। প্রবল জাতির সংঘর্ষে কতকগুলি আদিম জাতি একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল; তাহাদের উৎপাদিকা শক্তি একেবারে হ্রাস পাইয়াছিল। মিশ্রণের ফলে যে বর্ণসঙ্কর জাতি-সকলের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহারাও দেহে ও মনে খুব সবল বা সতেজ হয় নাই। মৌলিক জাতিদের চেয়ে সকল বিষয়েই তাহাদিগকে হীন দেখা গিয়াছে। আত্মরক্ষাও বহুস্থানে তাহারা করিতে পারে নাই। সেকালের বংশানুক্রম-তত্ত্ব এমন কথাও বলিয়াছে যে, মিশ্রণের পরিণামে সঙ্করজাতি মৌলিক জাতিদের শুধু দোষগুলাই পাইয়াছে। ফলে মানব-সমাজে তাহারা ঘৃণ্য জাতি বলিয়াই গণ্য হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু বিংশশতাব্দীর সমাজ-তত্ত্ববিদেরা এ কথাটা আর তেমন মানিতে চাহিতেছেন না। প্রথম সংঘর্ষের পর বহুকাল অতীত হইয়াছে, ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ও নিগ্রো প্রভৃতির মিশ্রণে অনেক নূতন নূতন সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল জাতির ইতিহাস ও জীবন-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আধুনিক সমাজ-তত্ত্ব-বিদেরা যে সকল কথা বলিতেছেন, সে সকল কথা পূর্ব্বের কথার সঙ্গে বড় একটা মিলে না। আমেরিকার আধুনিক সমাজ-তত্ত্ববিদেরা বলিতেছেন যে, সঙ্কর জাতিদের সম্বন্ধে যে সকল ধারণা প্রচলিত আছে, তাহাদের অধিকাংশই অমূলক। সঙ্কর জাতি দেহে ও মনে সবল ও সতেজ হয় হয় না, এটা একটা মিথ্যা কথা। প্রমাণ-স্বরূপ তাঁহারা আমেরিকার আধুনিক নিগ্রো জাতিদের দেখাইয়া দেন। এই সকল সঙ্কর নিগ্রো ইউরোপীয়দের চেয়ে দেহে ও মনে হীন, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। শারীরিক ও মানসিক নানাগুণে তাহারা ইতিমধ্যেই বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে "কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত" মানুষের দর্শনলাভও দুর্ল্লভ নহে। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে তাহাদিগকে চাপিয়া রাখা হয় বটে, কিন্তু ভগবান তাহাদিগকে কোন গুণেই বঞ্চিত করেন নাই। অনেক

জাতির মধ্যে যে স্বাভাবিক কোন হীনতা আছে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তাহারা ইউরোপীয়দের হইতে স্বতন্ত্র এমন কোন অদ্ভুত জীব নহে, যে উভয়ের মিশ্রণে অত্যন্ত ভয়ের কারণ আছে।

যে দুইপ্রকার মতের উল্লেখ করিলাম, উহারা দুই দিককার চরম মত। আধুনিক কালের ধীরবুদ্ধি পণ্ডিতেরা এই সকল চরম মতকে বড় একটা অনুমোদন করেন না।

জাতিমিশ্রণ সম্বন্ধে মোটামুটি আধুনিক বিজ্ঞানের সার সিদ্ধান্তকে নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) যে দুই বর্ণের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাদের মিশ্রণ শুভকর নহে।

(২) যে দুই জাতির মধ্যে প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত বেশী—তাহাদের মিশ্রণও শুভকর নহে।

(৩) যে দুই জাতি বা বর্ণের মধ্যে পার্থক্য আছে, অথচ প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত বেশী নহে, তাহাদের সংমিশ্রণে সবল ও সতেজ জাতির সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় সত্যটি প্রমাণ করিবার জন্য বেশীদূর যাইবার দরকার নাই। আধুনিক ইংরাজ, জর্ম্মণ, ফরাসী, রুস ও মার্কিন প্রভৃতি জাতিরা এইরূপ সংমিশ্রণের ফলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হইয়া উঠিয়াছে। স্বতন্ত্র রকমের রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে যে নবীন সতেজ জাতির জন্ম হয়, ভারতবর্ষেও বোধ হয় তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যে যাহাই বলি না কেন, আধুনিক মারাঠা, পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী জাতিদের উৎপত্তি গোড়াতে বোধ হয় এইরূপ বিভিন্ন রক্ত-সংমিশ্রণের ফলেই হইয়াছিল।

উল্লিখিত দ্বিতীয় নিয়মটি হইতে আধুনিক ভারতবর্ষের বিশেষ ভয় নাই। আমাদের ভয় প্রথম নিয়মটি হইতে। আমরা পার্থক্যের ও বিধিনিষেধের সীমারেখা টানিতে টানিতে এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি যে, আমাদের অবস্থা প্রায় প্রথমোক্ত নিয়মের শাসনের যোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য কেবল হিন্দুজাতির কথাই বলিতেছি। পাঞ্জাবী, বাঙ্গালা, মারাঠী, গুজরাটী, বেহারী ও উড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে তো বিবাহ হয়ই না। এক বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে বিবাহও অসম্ভব। আবার এক ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের মধ্যেও কত-না উপ-বর্ণ আছে। সেই উপ-বর্ণের আবার কত শাখা—তাহার আবার কত প্রশাখা! "গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ" (মহিমচন্দ্র মজুমদার কৃত) নামক একখানি বহিতে দেখিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গত বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র প্রশাখা "নিরাবিনা পটি"র মধ্যে অন্যূন দশটি উপবিভাগ আছে;—উহাদের কাহারও মধ্যে পরস্পর বিবাহ হয় না। হাস্যকর ব্যাপার আর কতদূর হইতে পারে? অলস নিষ্কর্ম্মা লোক যেমন বসিয়া বসিয়া পুকুরে মাছ ধরে, আমরাও তেমনি বহু গবেষণা করিয়া এই সকল "গাঁই গোত্র পটীর" ভাগ বাঁটোয়ারা করিতেছি! বাঙ্গালী যে ক্রমে এমন নির্বীর্য্য হইয়া পড়িতেছে, আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, তাহার একটি কারণ এই যে,

ঘনিষ্ঠ উপশাখা প্রভৃতির ভিতর অন্ত-বিবাহ। আমাদের শাস্ত্রে স্বগোত্রের মধ্যে বিবাহের একটা নিষেধ ছিল। আমরা আজকাল অনেক স্থলে তাহাও বাঁচাইয়া চলিতে পারিতেছি না।

যদি আমরা বাস্তবিকই আমাদের মঙ্গল চাই—তবে আধুনিক সমাজ, বিজ্ঞান ও বংশানুক্রম-তত্ত্বের নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। মিথ্যা আভিজাত্য গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন হিন্দুবর্ণের মধ্যে বিবাহ-ক্ষেত্রের বিস্তার করিতে হইবে। নহিলে "ঘরে ঘরে" বিবাহরূপ শাস্ত্র ও বিজ্ঞান-নিন্দিত বিবাহের ফলে জাতির অধঃপতন অনিবার্য্য। কেবল এক প্রদেশের বিভিন্ন হিন্দুবর্ণের মধ্যেই নহে, বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুজাতিদের মধ্যেও—(যেমন মারাঠা, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী প্রভৃতির মধ্যে) বিবাহ-ক্ষেত্র প্রসারের প্রয়োজন। এই বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে, নবীন ভারতীয় জাতি যে দেহে ও মনে খুব সবল ও সতেজ হইয়া উঠিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা জাতীয় উন্নতির আশা করেন—অনাগত নবীন ভারতের দিব্য মূর্ত্তির স্বপ্ন দেখেন, তাঁহারা এই বিষয়ে চিন্তা করুন—এই পন্থা অবলম্বন করুন। বসিয়া বসিয়া শুধু অতীত কালের সমুজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিলেই চলিবে না। অতীতের জীর্ণ আবর্জ্জনা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে—এমন কতকগুলি হতভাগা লোক সব দেশেই আছে। তাহাদের কথা ধরিতে নাই। কিন্তু যাঁহারা স্বদেশ ও স্বজাতির ভবিষ্য গৌরব-চিন্তায় মগ্ন—তাঁহারা মিথ্যা গর্ব্ব ও কল্পনা ত্যাগ করিয়া সত্য ও বিজ্ঞানের উপর মাতৃভূমির কল্যাণ-প্রতিষ্ঠা করুন। ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস—ভাগ-বাটোয়ারার ইতিহাস নহে;—বহু বৈচিত্র্যের সমাবেশে যে মহা মিলনের প্রতিষ্ঠা, তাহাই ভারতের বিধিনির্দ্দিষ্ট কল্যাণের পন্থা।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

বিরহে

আজি, বাদলার দিনে বেদনা-বিধুর কাঁদিছে বিরহী হিয়া!
হায়, আমি কোথা আজ রয়েছি পড়িয়া, কোথায় আমার প্রিয়া!
ওই, গাছে বসে ভিজে নীরবে বায়স, ঘরে বসে ভিজি আমি!
ওগো, কেমনে জানাব কাটিছে কেমনে আমার দিবসযামি!
হায়, যাতনা সহে না আর—
সারাটি হৃদয় জুড়িয়া বসেছে জগতের হাহাকার!

ওরা, বোঝেনা মোদের মরম-বেদনা, জানে না জীবন-জ্বালা!
পাছে, জেনে ফেলে সবি তাই আজি তারা সাধ ক'রে হলো কালা!

তাই, নয়ন ফিরায়ে ধীরে চ'লে যায় যদি বা দু-ফোঁটা ঝরে !
ওগো, অভিমানে তাই বুকের ভিতর কি জানি কেমন করে !
আমি, বেদনা বোঝাতে নারি !
মনের মাঝারে আগুন লেগেছে, কোথায় নয়ন-বারি !

এই, মানুষের গড়া রীতি-নীতি কত মানুষ বধিছে প্রাণে ।
ওরে, মানবের মন এত যে কঠোর, মন তাহা নাহি মানে !
এত, ঠেকে ঠুকে হায়, কাঁদি নিরালায়, তবু তো বোঝে না মন !
তবু, বিরহের মাঝে মিলন মাগিছে, পাষাণে প্রস্রবণ !
ওগো, প্রাণে কেন এত আশা ।
এত যাতনায় কেন বুকে হায়, বুক-ভরা ভালবাসা !

ওগো, আমি তো ধাইনি আলেয়ার পিছে, চাহিনি গগন শশী ।
তবে, কেন গো এমন বুকের উপরে বজ্র পড়িল খসি' ।
হায়, তাপহীন তাপে হিয়া পুড়ে যায়, জীবনে নাহিক মধু ।
আমি, জনমে জনমে কিছু নাহি চাই, চাহি সে পরাণ-বঁধু !
ওগো, বেঁচে আছি এক সুখে !
তাহার বুকের সে' মধু-পরশ এখনো জাগিছে দুখে ।

সেযে, হৃদয়-গগনে ফুটে উঠেছিল যেন শরতের শশী !
তার, নীল শাড়ী-পরা সুষমা কেবলি হেরিতাম কাছে বসি' !
ওগো, আজো চোখে ভাসে কটি-চুম্বিত তার সেই কালো চুল !
তার, হাসি-মাখা মুখ দিল কত দুখ, জীবনে এনেছে ভুল !
ওগো, আজি সে নিকটে নাই !
বিরহের মেঘে ঢেকেছে তাহারে,বুক ফেটে ম'রে যাই !

তাই, আকাশ জুড়িয়া কাঁদন জেগেছে ঝর ঝর ঝরে জল !
বুকে, উথলি' উঠিছে বিষাদ-সিন্ধু, কাঁপিছে হৃদয়-তল !
আজি, গগন আঁধার, ভুবন আঁধার, আঁধার সারাটি প্রাণ !
এই, আঁধারে বিজলি কতটুকু আলো আমারে করিবে দান !
ওগো, জ্বেলেছি যে দুখ-বাতি—
তাহারি আলোকে উজল রহিবে আমার তামসী রাতি !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ।

কাজরী

১৪

আজ দশদিন হল এখানে এসেছি। ক'দিন যে কি করে কেটেছে, তা শুধু মা-কালীই জানেন! বুড়ীকে ফিরে পাবার কোন আশা ছিল কি। কাল সে দুটি ভাত খেয়েছে সবে, গলা ভাত,—তা'ও বিছানায় শুয়ে, চামচেয় করে। যে করে খাচ্ছিল, দেখে আমার অনেকদিন-আগেকার একটা কথা মনে পড়ছিল। এক রাত্রে সেই ঝড় হয়েছিল।—সে ঝড়ে কাছে-পিঠে যেখানে যা গাছ-পালা ছিল, সব একেবারে পড়ে ছিঁড়ে একাকার হয়ে গেছল। ঝড়ের পরদিন ভোরে উঠে দেখি, বারান্দায় একটা টিয়াপাখী আধ-মরা পড়ে। বেচারী কোন্ দূর থেকে ঝড়ের ঠোক্কর খেয়ে একেবারে এখানে আমাদের বাড়ী এসে পড়েছে! প্রাণটুকু তখনো ধুক্‌ধুক করছিল—আমরা তুলোর [illegible]তে করে তার ঠোঁটে ফোঁটা-ফোঁটা দুধ দিয়ে কত করে যে তাকে বাঁচাই! ওঃ! বুড়ীকে দেখে মনে হচ্ছিল, ও-ও যেন অমনি এক প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কা খেয়ে কোন-মতে প্রাণটুকু নিয়ে ঠিকরে আমাদের কোলে এসে পড়েছে! বুড়ীর খাওয়া হলে তাকে গল্প বলছিলুম, কিন্তু শোনে কে। রোগের অত যাতনার পর একটু আরাম পেতেই বড় শ্রান্ত চোখদুটি তার ঘুমে আজ ঢুলে-ঢুলে পড়ছে।

... ...

এ ক'দিন বড়ঠাকুর রোজই বুড়ীকে দেখতে আসতেন, কালও সন্ধ্যার পর এসেছিলেন। আমার সমস্ত দেহে-মনে সেই ক্ষণটুকুতে এমনি আশা[illegible] জেগে উঠত। ভেঙ্গে দুম্‌ড়ে-পড়া [illegible] তিনি [illegible]ই, কেমন যেন চাঙ্গা হয়ে [illegible] বল্‌ত, 'বাঁচবে রে, বুড়ী বাঁচবে'! এই ক্ষণটুকুর জন্যে আমি কি অধীর প্রতীক্ষায় বসে থাকতুম। তিনি চলে গেলে মনে হত, আবার কাল কতক্ষণে সন্ধ্যা হবে, বড়ঠাকুর বুড়ীকে দেখতে আসবেন—একটু আশা পাব। বড়ঠাকুর যখনই আসতেন, হাতে দুটি বেদানা, কি আঙুরের বাক্স, না হয় একটা পুতুল—কিছু-না-কিছু থাকত। এত মায়া, এত মমতা আমার বুড়ীর উপর! চোখ আমার ছলছলিয়ে উঠত।

তিনি দুদিন মাত্র এসেছিলেন। আমি এখানে আসবার ঠিক পর-দিনও, সন্ধ্যার সময়। সেদিন আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বুড়ীর মাথায় আইস-ব্যাগ ধরে আমি বসেছিলুম। উনি এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন—ঘরে ঢোকেন নি! বাবার সঙ্গে কি-সব কথা-বার্ত্তা হল, তারপর বাইরের ঘরে গিয়ে বসলেন। মা খাবার পাঠাতে বল্লেন, আমায় একবার বাইরে যেতেও বলেছিলেন, কিন্তু তখন কি যাবার সময় না, সে আছে। চাকর ফিরে এসে বললে, জামাইবাবু খাবার খেলেননা, বাড়ী চলে গেলেন।

এই ব্যাপারে আমি যেন এতটুকু হয়ে ছিলুম—কেবলি মনে হচ্ছিল, এখনো কি রাগ আছে? এ অবস্থা দেখেও তাঁর রাগ গেল না? ভগবানকে ডেকে এমনও বলেছিলুম সে-রাত্রে—যদি তাঁর যথার্থই

রাগ থাকে, আর সে রাগ এখনও না পড়ে থাকে, তাহলে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবার আগেই যেন আমার মরণ হয়! তাঁকে খাটো ভেবে, তাঁকে খাটো করে বেঁচে থাকা যায় না ত। দেবতাকে দেবতার আসনটিতেই দেখতে চাই যে। বড় তিনি, বড়ই থাকুন! তাঁকে ছোট দেখবার দুর্ভাগ্য যেন কখনো না হয়। সে দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে আর-যে বাঁচতে পারে, বাঁচুক,—আমি পারব না।

ভগবান আমার প্রাণের সে কাতরতা বুঝেছিলেন—তিনি যে অন্তর্যামী।

তাই তিন দিন আগে তিনি যখন এলেন, তখন দেখলুম, বুড়ীর সম্বন্ধে তিনি কতখানি আগ্রহ প্রকাশ করছেন। বুড়ীর মাথার শিয়রে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া তার খোলো-খোলো চুলগুলি নিয়ে নাড়া-চাড়া—মাকে তিনি বললেন, "আমি খানিকক্ষণ আছি ত। তা ছাড়া বুড়ী ভালই আছে—আপনি একটু বাইরে ঘুরে আসুন, বরং।" তারপর আমি ওষুধ খাওয়াতে যাচ্ছিলুম, তিনি আমার হাত থেকে শিশিটা নিয়ে মেজার গ্লাসে ঢেলে নিজেই সেটা খাইয়ে দিলেন। আমার তখন কেবলি মনে হচ্ছিল, আঃ, সে কি সুখ। দেবতা, ওগো আমার দেবতা, তুমি চিরদিন মাথার উপর আছ, অনেক উঁচুতে, দেবতারই আসনে। কার সাধ্য তোমাকে সেখান থেকে নীচে এই হীন ধূলির মধ্যে টেনে নামিয়ে আনে।

* * * * *

বুড়ী এখন বেশ জোর পেয়েছে। একটু-আধটু ছুটোছুটিও করে বেড়ায়। আমাদের পশ্চিম যাবার কথা হচ্ছে, বুড়ীকে নিয়ে। বাবা গেছলেন আমার শাশুড়ীর কাছে,—আমাকে পাঠাতে তাঁর মত আছে কি না, জানতে! সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে বললেন, মত আছে। আর একটা খবর বাবা যখন বললেন, তখন আমার সমস্ত দেহ-মন আহ্লাদে নেচে উঠল। উনিও সঙ্গে যাবেন।

... ...

ট্রেন রিজার্ভ হয়েছে। এলাহাবাদ যাব আমরা। যমুনার ধারেই বাড়ী নেওয়া হয়েছে। উনিও সঙ্গে যাবেন। এক-গাড়ীতে সকলে মিলে যাব—ভারী আহ্লাদ হচ্ছে। তিনি একেবারে বাড়ী থেকে ষ্টেশনে যাবেন—সেইখানেই সব একসঙ্গে মিলব।

১৫

এলাহাবাদে এসেছি। তিন-চারদিন ত গেল খাল সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে। কাল রাত্রে উনি বললেন, "একটা কথা রাখবে, অনু?"

আমি বললুম, "কি কথা?"

"আমার একটা সাধ আছে, রাখবে?"

হেসে আমি বললুম,"কি সাধ,শুনিই না।"

"রোজ সন্ধ্যার সময় একটু চলনা যমুনার ধারে—সেই কোর্টের ওধারে বেড়াবার ব্যবস্থা করি। তবে যাব শুধু দুজনে—তুমি আর আমি!"

আমি বললুম, "রোজ রোজ এ-রকম বেড়ালে গাড়ী ভাড়া পড়বে কত, মশাই, তা একবার ভেবে দেখেছেন?"

তিনি বললেন, "গাড়ী কোথায় যে গাড়ী ভাড়ার ভয় করছ! হেঁটে যাব।"

"হেঁটে!" আমি অবাক হয়ে গেলুম, বললুম, "ওঃ, ঠাট্টা হচ্ছে!"

"ঠাট্টা কেন হবে, অনু—সাহেব-মেয়েরা যায় না! তবে? বেশ হবে'খন সে। আমি কাল ওধারে কত দূর যে বেড়িয়ে এসেছি। ওঃ! রাস্তার একধারে কেমন যমুনার কালো জল ছলছল করছে, আর একধারে ধূ-ধূ মাঠ। চমৎকার!"

"বাবাঃ, অত দূর? এতখানি কেউ হাঁটতে পারে কখনো? পা কি আর থাকবে তাহলে! তায় তোমার এই পশ্চিমের পাথরের রাস্তা!"

তিনি বললেন, "ক্ষেপেছ তুমি! শুধু পায়ে হাঁটবে কি, জুতো পরে যাবে। তোমার পায়ের জুতো-মোজা আমি সব কিনে এনেছি যে—"

"এঁ্যা! সত্যি?"

তিনি বললেন, "দেখবে এসো—"

ঘরে ঢুকে ওঁর হাত-ব্যাগের মধ্যে থেকে তিনি মেয়েদের পায়ের মত এক জোড়া জুতো, দিব্যি সাদা ধব্ধব্ করছে—কেমন ছোট ছোট বুটিদার বোতাম-আঁটা—আর সাদা ফুট্‌-ফুটে মোজা বার করলেন। আমি বললুম, "সত্যি, তুমি এ কি করেছ! আমায় এ-সব পায়ে দিতে হবে না কি? ছি,—বিয়ের পর জুতো-মোজা পায়ে দেওয়া, এ কি ভাল দেখাবে? আমার ভারী লজ্জা করবে কিন্তু।"

তিনি বললেন, "কিসের লজ্জা! আমার সামনে পায়ে দেবে—আমার সাধ। শোনো, তুমি কি ভাবচ, আমি বুঝেছি—"

সত্যি, আমি তখন ঠিক যে কি ভাবছিলুম, তা নিজেই বুঝছিলুম না। তবে যদি তাঁর কাছ থেকে ভাবনার একটা কিনারা পাই, এই ভেবে বললুম, "কি ভাবছি, বল দেখি—"

তিনি বললেন, "তোমার মা-বাবার সামনে দিয়ে হঠাৎ কি করে জুতো-মোজা পায়ে এঁটে বেরুবে আমার সঙ্গে—এই—না?"

আমার ভাবনা অবশ্য এতটা পথ অবধি এখনো এসে পৌঁছোয়নি—ওঁর কথায় ভাবনাটা রাজ্যের খানা-ডোবা ডিঙিয়ে ছুটে একেবারে এই জায়গাটায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সত্যি, মার সামনে দিয়ে বাবার সামনে দিয়ে কি করে জুতো-মোজা এঁটে ওঁর সঙ্গে বেরুব!

আমি বললুম, "য্যাঃ, সে আমি পারব না।"

"তোমায় পারতেই হবে, অনু—লক্ষ্মীটি" তাঁর কথায় কি যে মিনতির সুর বেজে উঠল! আমার হাত ধরে তিনি একটা সোফার উপর এসে বসলেন—আমি পাশে বসলুম।

তিনি বললেন, "দেখো, তোমার মার বাবার কোন আপত্তি হবে না। জামাইয়ের ইচ্ছা—এটুকু জানলে তাঁরা তখনই মত দেবেন, এতটুকু আপত্তি করবেন না। এইটুকু শুধু তোমার মাকে তুমি জানাও,—যে, আমি তোমায় রোজ আমার সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাই—আর তা হলে জুতো-মোজা পায়ে দিতে হবে! অর্থাৎ তুমি শুধু জানানটুকু দাও, এই আর কি! বাকী কাজের ভার আমার উপর। কত আমোদ পাবে, তখন দেখো একবার—ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সেই যমুনার তীর। এটা কি পক্ষ চলেছে, তা লক্ষ্য করেছ কি?"

শুক্লপক্ষ! ঠিক! কাল আমি সার্শির ধারে দাঁড়িয়ে ঐ বনটার পানে চেয়েছিলুম —বনের গায়ে জ্যোৎস্না তার রূপোর তুলি

বুলোচ্ছিল—চারিধার ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠেছিল। আমি বললুম, "শুক্লপক্ষ।"

তিনি বললেন, "বোঝো—

আজ লো সজনি জোছনা-তরঙ্গে
রঙ্গে কুঞ্জে যামিব দুজনে—
ঐ যে পাপিয়া দিগন্ত ছাপিয়া—"

শুনে আমি শিউরে উঠলুম, বললুম, "চুপ, চুপ—পাশের ঘরে বাবা বসে হিসেব দেখচেন—এখনি শুনতে পাবেন—শুনে কি মনে করবেন।"

তিনি আমার গায়ে ছোট্ট একটা চিমটি কেটে বললেন, "মনে আর কি করবেন। আরাম এবং আনন্দের নিশ্বাস ফেলে ভাববেন, মেয়েটিকে তার জলে [illegible]।"

"যাও :—" বলে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরে এলুম। তিনি বললেন, "বেশ, তাহলে আজই যাতে বেড়ানো আরম্ভ হয়, তার ব্যবস্থা করো—কোনমতে নড়চড় না হয়। এ না হলে আমার এলাহাবাদে আসার কি দরকার ছিল—কলকাতা কোন অপরাধ করেনি ত।"

"এতও জানো তুমি—" বলে আমি জুতো-মোজা সরিয়ে ফেললুম—একেবারে আমার বিছানার তোষকের নীচে। জুতো-মোজার ব্যবস্থা করে ফিরে দেখি, কখন এর মধ্যে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। আমি মার কাছে গেলুম।

মাকে ত জানি। মার মত করানো, সে শক্ত কথা নয়। ছেলেবেলায় সেই থিয়েটারে যাবার আব্দার, সে কথা ত আর ভুলিনি। সকাল থেকে কি কড়া শাসন—"তোরা কেউ যাবিনে বাড়ীতে কর্তার কাছে সব থাকবি—" তার পর যত বেলা পড়ে আসত, মার আঁচলের কাছে ততই ঘেঁসে ঘেঁসে বসতুম—তারপর মার আঁচলটা কপালে জড়াতে জড়াতে কি মার পায়ের আঙুলটা খুঁটতে খুঁটতে সুর তুলতুম,—"মা, তোমার জন্যে মন কেমন করবে মা, লক্ষ্মী মা, নিয়ে চল মা—এই আজ শুধু—দেখো, আর কখনো যেতে চাইব না—" মার তখনো গম্ভীর সুর—"না, না ছেলেমানুষ থিয়েটার দেখে না—" তারপর যাবার বেলায় চোখ ছলছলিয়ে মার গা ঘেঁসে দাঁড়ানো—আর [illegible] কেবল এক বুলি, "মা-অ মা,— [illegible]" শেষে মা বলে উঠত "জানি শত্তুর সব ছাড়বে না। চল— [illegible] বলে [illegible] করেছে, [illegible] দেখে নেব,— [illegible] নীচের ঘরে ফেলে রাখব, কখখনো দেখবে না [illegible] ব্যস্। আমরা নেচে-কুঁদে থিয়েটারের যাত্রী হয়ে পড়তুম। সে সেই কোন ছেলে-বেলার কথা। আর এখন বড় হয়েছি, [illegible] উপর, এ ত নিজের সখ নয়—তাঁর [illegible] সাধ্য-সাধনার জামাইয়ের সাধ।

মার মত হল। আমি একটু খুঁত খুঁত করতে লাগলুম- "আমার ভারী লজ্জা করে।

মা বললে, "ছি, ওতে লজ্জা করতে নেই। স্বামীই হল মেয়েমানুষের সব স্বামী যেভাবে সাজতে-গুজতে বলে, মেয়েদের তাই করা উচিত। তাতে আপত্তি করলে চলে না। এই যে আমি জুতো-মোজা পরে কত বেড়িয়েছি। তোরা তখন কতটুকু— তুই বুঝি দেড় বছরের মেয়ে—তোর বাবর দার্জিলিং যাবার সখ হল সেবার,—সঙ্গে [illegible] —তা ওখানে ঠাণ্ডা কি রকম। আমি ওঁর সঙ্গে জুতো-মোজা পরে বেড়িয়েছি কত—"

আমি বললুম, "তোমার লজ্জা করত না ?"

মা বললে, "তা আর করত না। চেনা লোকের সামনে কতদিন অমন পড়ে গেছি—তা তখন ঘোমটা টানলে চলবে কেন ? কস্তা পেড়ে শাড়ী পরে যখন বৌটি হয়ে ঘরের মধ্যে থাকব, তখন একচালে চলতে হবে, আর এখন একরকম! মেয়েদের নিজের বলে কিছু রাখতে আছে কি ?"

… … … …

ভারী মজা, সাতা! রোজ সন্ধ্যাবেলায় দুজনে একটা গাড়ী করে সহরের মধ্যি খানটা পার হয়ে যাই, তারপর সহর পেরিয়ে গাড়ী থেকে নেমে যেম বলি। গাড়ী ছেড়ে দি। ফেরবার সময় হেঁটেই ফিরি। তখন রাত হয়ে পড়ে, চেনা মানুষের ভয় থাকেনা ত!

সত্যি, ভারী সুখ! এমনি ভাবে খাঁচার বাহিরে ডানা মেলে একটু নড়তে-চড়তে পেলে—বিশেষ স্বামীর সঙ্গে থেকে—আঃ! লক্ষ্মীছাড়া আমাদের ঐ কলকাতা সহরটা। কে…বেরোও দেখি কোথাও, অমনি চারদিক থেকে একেবারে সব হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসবে। যেন কি হচ্ছে—কোথা থেকে চোর ডাকাত পড়ে যেন সব লুটে নিয়ে যাচ্ছে! কি সুখে মানুষ কলকাতায় থাকে, তা জু জানি না! খালি ইট আর কাঠ, আর গাড়ী আর ঘোড়া! একটু খোলা জায়গা নেই! গঙ্গার ধারটা অবধি কি বিশ্রী—খালি খড়ের গাদা আর মালগাড়ীর মেলা! খাসা দেশ এই এলাহাবাদ!

… … … …

কাল বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ উনি বললেন, "আমায় বোধ হয় কলকেতায় ফিরতে হবে শীগ্‌গির—অনু, তাই ভাবচি, কি করি!"

সবে তখন সন্ধ্যা হয়েছে আর কি! যমুনার ধারে উঁচু পাহাড়ে বসে ছিলুম—মাথার উপর চাঁদ আলোর ফোয়ারা খুলে দিয়েছে—নীচে যমুনার কালো জল। ওপারে অস্পষ্ট বনের সারি। সেই আলোয় গাছপালা সব এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল—যেন—যেন রিমি-ঝিমি ঝিমি-ঝিমি কোন্ স্বপ্ন-পুরীর আবছায়া! ঐ গাছগুলোর পাতায় পাতায় পরীদের ছেলেমেয়েরা সব ঘুমিয়ে আছে আর কি! রাতটা নিশুতি হলেই ওরা মাথার চুলগুলি এলিয়ে দিয়ে নেচে-গেয়ে দিক মাতিয়ে তুলবে। ঠিক এমান সময় ঐ কথাটা শুনে বুক আমার ধড়াস করে উঠ্‌লো।

আমি একেবারে তাঁর হাঁটুর উপর হাত দিয়ে বলে উঠলুম, "যেতে হবে ?"

"একজামিন আসচে। বইটইগুলো একটু নেড়ে-চেড়ে দেখতে হবে ত!"

আমি বললুম, "সত্যি, এতগুলো বই নিয়ে এসেছ, তা কৈ কখনো পড়তে দেখিনা ত তোমায়। না, সত্যি, কেন পড় না, বল।" আমার মনে হল, সমস্ত চাঁদের আলো যেন নিভে আসছে!

তিনি বললেন, "কখন্ পড়ব, বল দেখি ?"

"কেন ? সকালে, দুপুরবেলায়, রাত্রে—"

"ওরে বাপ্‌রে—এলুম এখানে হাওয়া খেতে, তা না খেয়ে ঐ বইয়ের বোঝার তলায় চাপা পড়ে থাকব!"

"এগ্‌জামিন দেবে কি করে ?"

"কলকাতায় যাই, পড়াশোনা করিগে—

কি বল ?" কথাটা বলে তিনি আমার মুখের পানে চাইলেন।

আমি বললুম, "কেন, তুমি ত বলেছ, মা বড়ঠাকুর দুর্জনেই বলেছেন, তুমি এখানে থাকবে—যতদিন আমরা থাকব, ততদিন।"

"হুঁ—তা বলেছেন বটে! কিন্তু সে কেন, তা ত জান না। বৌদির চেষ্টায় এইটি হয়েছে। তোমাদের যখন এলাহাবাদে আসবার কথা পাকা হল, আর তোমার যখন এখানে আসায় মা, দাদা মত দিলেন, তখন আমি বৌদিকে পষ্ট খুলে বললুম—অনু যাচ্ছে—সে কাছে না থাকলে লেখা-পড়া আমার মোটে হবে না। বৌদি কত ঠাট্টা করলে—কিন্তু পরে বৌদিই তার বন্দোবস্ত করে দিলে। সত্যি, বৌদি ভারী ভালো,—না ?"

"তাতো বলবেই। এখন নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে পেরেছ কি না!"

তিনি বললেন, "আমার স্বার্থের জন্ত ত আর আসিনি। পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ। তোমার জন্তেই এসেছি আমি। কলকেতায় থাকলে তুমি এখানে সারতে পারতে? বসে বসে খালি গাইতে,

হায়রে কতদূরে বসিয়া ভাবি তারে
হৃদয়-প্রাণ-মন সঁপিয়া দিছি যারে—"

"থাক্, থাক্" বলে আমি বাধা দিলুম। আমার কিছু ভাল লাগছিল না—ঐ কলকাতা যাবার কথাটা শুনে-ইস্তক মন ভারী খারাপ হয়ে গেছে। কিছু ভাল লাগছিল না।

আমি বললুম, "আচ্ছা, বাড়ী চল, রাত্রে আমার কাছে বসে তোমাকে পড়তে হবে! দেখো দেখি—না পড়লে কখনো তোমার কথা শুনবো না, এবার থেকে।"

তিনি বললেন, "তার চেয়ে কলকাতা যাওয়াই ভালো।"

আমি বললুম, "কেন ?"

"তুমি সামনে থাকলে কখনো পড়া হবে, ভাবো? পড়াটা হলগে তপস্তার সামিল। তা সাম্‌নে বরনারী থাকলে তপস্তার বিঘ্ন হবে বিস্তর! পুরাণগুলো পড়েছ ত? বেচারা বিশ্বামিত্র,—জানো ত—তার হালটা ?"

"যাও—সব কথায় তোমার চালাকি।"

উনি বললেন, "আচ্ছা, তোমার কি মত, কলকাতায় যাব, না, এখানে থেকে লেখাপড়া করব। বল, তুমি যা বলবে, আমি তাই করবো—"

দেখ দেখি দুষ্টুমি। আমায় শুধু ক্ষেপানো হচ্ছে। বটে! আমি যেন কিছু বুঝি না।

আমি বললুম, "তুমি এইখানেই থাকো—ভয় নেই গো। শুধু এই সন্ধ্যার সময় বেড়াতে আসতে যা আমায় পাবে সঙ্গে, আর সেই রাত্রে, অনেক-রাত্রে, পড়া-শোনা সেরে যখন শুতে যাবে, তখন আমি ঘরে আসব। তাহলে ত আর তোমার তপস্যার কোন বিঘ্ন ঘটবে না।"

"এই, এইবার ঠিক বলেছ—"

তবুও সারারাত্রি মনটা ভাল রইল না।

ভোরে উঠে আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "কি, এখানে থাকবে ত—না, কলকাতায় যাওয়া চাইই— ?"

উনি বললেন, "দাদা লিখেছে, পড়া শোনা কেমন হচ্ছে—তাই কথাটা ভাবছিলুম—"

আমি বললুম, "তা হলে বাবু কলকাতায়

চল বরং। এগজামিনটা কি শেষে মাটী করবে। তার উপর বড়ঠাকুরকে কি বলে লিখবে, এখানেই থাকবে? তিনি কি ভাববেন!"

"কি ভাববেন, বল দেখি—"

"যাওঃ—ও কথা ছেড়ে দাও। কলকাতাতেই না হয় চল তাহলে। তবে আমার একটা কথা রাখতে হবে।"

"কি কথা?"

"আমাকেও কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে—সেই বুড়ীর অসুখে এসেছি, সত্যি,—না হলে তাঁরাই বা কি মনে করবেন!"

উনি হেসে বললেন, "তোমারও মন যখন ঐ কথা বলছে, তখন বেশ, তাই হবে—তবে আর দু'চারদিন পরে ও-কথা তোলা যাবে। একদিন যমুনার কালো জলে তরী বেয়ে বেড়ানো যাক আগে—কি বল, সেখানে গেলে ত আবার রবিবাবুর সেই

"ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ-কীট
নাইক দয়া-মায়া, নাইক স্নেহ—"

... ...

তাই হল। কলকাতা থেকে একটা তাগিদ এল—কাজেই স্থির হল, আর তিন-চারদিন পরেই আমরা দুজনে কলকাতায় ফিরব।

ভারী লজ্জা হচ্ছে। মা বাবা কি ভাবছেন! ওঁরা যে বলেন, বিয়ে দিলেই মেয়ে পর হয়ে যায়—আমি কি সত্যিই পর হয়ে গেছি?

না। কখনো না।

এ ত আমি নিজের সখের জন্তে শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছি না। আমি না গেলে তিনি পড়বেন না—এগজামিনটা মাটী করে ফেলবেন,—তাই না শুধু! এ কথাটা কিন্তু খুলে বলা যাচ্ছে না—তা না বলি, ওঁরা কি বুঝবেন না?

... ...

আজ আমরা দু'জনে কলকাতা যাব, মন কেমন করছে বড্ড। খাঁচার বাইরের পাখীর মত কেমন হাল্কা আনন্দ নিয়ে অবাধে এখানে হেসে খেলে বেড়াচ্ছিলুম। কলকাতায় গিয়ে আবার সেই খাঁচার পাখীটি খাঁচার মধ্যে ঢুকতে হবে। একটুখানি নীল আকাশ আর সেই মাপা ওজন-করা হাওয়াটুকু—। কি করে থাকব।

কাল আমাদের সেই সুখের কুঞ্জ, যমুনা-পুলিনের সেই বটগাছটার তলায় যে পাথরটি পড়ে আছে, সেখানে শেষ বসে এসেছি। দু'জনে সেই বিজনে নিভৃতে বসে কত স্বপ্নের জাল বুনেছি, কত গানের ফোয়ারা খুলে দিয়েছি—মাথার উপর এলাহাবাদের এই নীল আকাশের চাঁদ আমাদের প্রণয়-লীলায় শত মাধুরী-ভরা জ্যোৎস্নার হাসি ঢেলে দিয়েছে! কত সাধ, কত আশা দু'জনের মনের তারে-তারে কি ঝঙ্কারই না তুলে গেছে। তেমনটি আর জীবনে কখনো হবে কি!

ফিরে আসবার সময় চোখ আমার জলে ভরে এল। পা আর চলতে চায় না। একবার করে আমি চলি, আবার তখনি থমকে দাঁড়াই—চারিধারে ঐ আলো-আঁধারে ঘেরা ছায়ার রাজ্যে কি কুহক লুকোনো আছে, বলতে পারি না! ঐ দূরে ছোট্ট পাতার কুঁড়েটির চাল ফুঁড়ে ধোঁয়ার রাশ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে—

গরিব চাষা সারাদিন খেটে কাজ করে এসে রান্না চড়িয়েছে। তাদের সেই মেয়েটি—গোলগাল গড়ন, সুস্থ বলিষ্ঠ দেহটি ছিটের টাইট্ জামায় এঁটে কলসী-কাঁধে সন্ধ্যার সময় জলে নামত—ছোট দামাল ভাই দুটি পাহাড়ে বসে মাটী মাখত! ঐ জলে বাঁধা বড় নৌকাটায় বসে মাঝির দল গান ধরে দিত—একটার পর আর একটা গান ধরবার ফাঁকে বাটনা বাটার ঘস্‌ড্ ঘস্‌ড শব্দ গম্ভীর তালে জলের বুকের উপর দিয়ে কানে এসে বাজত—আমার মনে হত, যেন গানের সুরটা সে বন্ধনে রাখছে একটুও ফাঁক পড়তে দিচ্ছেনা। ভাবব মত চারিধারটা মনের ফ্রেমে আজ এঁটে বসেছে। এই সরল জীবন-যাত্রার ধারাটি এখানে এমনি একটানা বয়ে যাবে, কাল থেকে আমিই শুধু আর এ-সব চোখে দেখতে আসব না!

তিনি বললেন, "দাঁড়ালে কেন?"

আমি কোন মতে নিশ্বাস চেপে বললুম, "জায়গাটার উপর কেমন মায়া পড়ে গেছে, ছেড়ে যেতে মন কেমন করছে—কাল থেকে আর দেখতে পাবনা ত।"

তিনি আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, "এ সমস্ত একদিকে আর অন্য দিকে আমি, তবু পাল্লা এদিকে ঝুঁকবে না?"

"যাও—তোমার সব কথাতেই ঠাট্টা।" বলে আমি হন্ হন্ করে গাড়ির আড্ডাটা হঠাৎ বাড়িয়ে দিলুম। তিনি বললেন, "ওগো দাঁড়াও গো, দাঁড়াও, আমায় ফেলে চললে যে—" (ক্রমশ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সন্ধ্যা হয়

সন্ধ্যা হয়, অন্ধকারে বসে আছি একা,
ঘন তিমিরের ভারে দিগন্তর নাহি যায় দেখা;
জাগেনি তারার ভাতি, সন্ধ্যার গৈরিক
তপস্বী ভিক্ষুর মত, মৌন মুখে চায় অনিমিখ,
নীরব প্রার্থনা তার কেবলি জানায়,
দিনের সম্বল যেন পারেনিক দিতে আপনায়,
সম্মুখে সুদূর পথ, গাঢ় অন্ধকারে
যাত্রার প্রভাত আলো
কোন্‌দিকে লুপ্ত একেবারে?

একখানি কালো মেঘ ভেসে এল ধীরে,
বিছাইল আপনারে অস্তাচল চরণের তীরে
নিখিল ব্যথার যেন সম-অনুভূতি;
সংশয়ের বাষ্পজাল, ভেদ করি বিদ্যুতের দ্যুতি
দেখাইল কোথা জাগে পরম-নির্ভর,
সে যে অন্তরের মাঝে, ব্যগ্র হয়ে ছুটে এল ঝড়
জড়াইল আলিঙ্গনে, পল্লব মর্ম্মরে
কহিল মর্ম্মের কথা, ঝর ঝর বারিধারা ঝরে।
উদাসী গৈরিক রাগ মিলাইয়া আসে,
তিমির তরল হয়, নীলিমায় তারাবলি ভাসে
সন্ধ্যাবায় ছায়াপথে, সপ্তর্ষি আলোকে,
তপন তোরণদ্বার, ঊষা যেথা খোলে সুরলোকে

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্য

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিয়া কেহ মনে করিবেন না, যে আমি এক নিশ্বাসে রামায়ণ-কথা শেষ করিবার অভিপ্রায়ে একটি অতি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ প্রবন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর অতি বিচিত্র, বিশাল ও সর্ব্বতোমুখী সাহিত্য-চেষ্টাকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত আকারে প্রকটিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। আমাদের সাহিত্যের অনেক অঙ্গ অসম্পূর্ণ আছে এবং বর্ত্তমান যুগে মৌলিক রচনাকার্য্য কতকটা স্থগিত থাকিলেও বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গ-ভাষার সেই অসম্পূর্ণতা দূর করিবার একটা সর্ব্বব্যাপী চেষ্টার লক্ষণ এই যুগেই দেখা যাইতেছে। তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের ইতিহাস আলোচনা করিলে, কত অল্প সময়ের মধ্যে কত বড় ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্য যে যুগে সর্ব্ব প্রথম সুসমঞ্জস কলেবর ধারণের দুষ্কর কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছে, সে যুগের প্রাণপণ প্রয়াস ও অনুপমা সিদ্ধির কাহিনী উপন্যাসের মত চমক-প্রদ; প্রতিকূল অবস্থা, দুরূহ উপায়, অপ্রত্যাশিত সহায় এবং পরিশেষে মনীষা ও শক্তির আকস্মিক ও যুগপৎ বিকাশের সেই অপূর্ব্ব ইতিহাস বাঙ্গালীর * একমাত্র গৌরবের নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। এই নবঅভ্যুদয়ের সম্যক আলোচনা যেমন অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধার অপেক্ষা রাখে, তেমনি স্থিতধী, অপক্ষপাত ও জ্ঞানগবেষণা-পরায়ণ প্রকৃত পাণ্ডিত্যেরই আয়ত্ত। এতদিন তেমন আলোচনা কেহই করেন নাই, আজ আমরা একখানি সেইরূপ গ্রন্থ পাইয়াছি, তাহারি পরিচয়চ্ছলে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

বাংলায় প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কলাশিল্পের আলোচনা অল্পবিস্তর আরম্ভ হইয়াছে। ব্যাকরণ ও অভিধান-রচনা বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির সাধ্যমত চেষ্টার পরিচয়ও আমরা পাইতেছি। তথাপি ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বনে বাংলা-সাহিত্যের বিকাশ ও তাহার গতি নিরূপণ চেষ্টা বা সমগ্রভাবে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ —বিশেষতঃ যে যুগের সাহিত্যের আলোচনা এক হিসাবে অত্যাবশ্যক—এ পর্য্যন্ত কেহই তেমন ভাবে করেন নাই। আমাদের সাহিত্যের যে নবযুগ বিগত শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার শেষ ফল এখনও দেখা দেয় নাই; সুসম্পূর্ণ, নিটোল ও সুপরিপক্ক হইতে এখনও বিলম্ব আছে এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে এখনো বহু পরিশ্রম করিতে হইবে। বর্ত্তমানে—আমরা তাহা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি। নবীন লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চাঞ্চল্য ভাবে ভাষায় ও চিন্তায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে, যে সকল নূতন সমস্যা উপস্থাপিত

* History of Bengali Literature in the Nineteenth Century By Sushil Kumar De, M. A Published by the University of Calcutta, 1919

হতেছে এবং সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার নানা অভাবজনিত যে অসন্তোষ কাজে ও কথায় স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—তাহা সত্যই আশাপ্রদ। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ সেই আশা ও বিশ্বাসকে উদ্দীপিত করিয়াছে।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দ পাঠকসমাজে বিজ্ঞাপিত করাই আমার উদ্দেশ্য। এরূপ গ্রন্থে ত্রুটি যাহা আছে—এবং তাহা থাকা আশ্চর্য্য নয়—উপযুক্ত সমালোচক তাহার আলোচনা করিয়া পাঠক ও গ্রন্থকার উভয়েরই উপকার সাধন করিবেন, বর্ত্তমান লেখক সে কার্য্যের অনুপযুক্ত। গ্রন্থকার ইতিহাস লিখিয়াছেন, তিনি সত্যানুসন্ধিৎসু, যোগ্যতর ব্যক্তি গ্রন্থখানি পরিশ্রম সহকারে পাঠ করিয়া তাহার দোষগুণ নির্ণয় করিলে গ্রন্থকারের ধন্যবাদভাজন হইবেন এ বিশ্বাস আমার আছে। তবে গ্রন্থখানি বাংলাতে না হইয়া ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছে ইহাই আমাদের ক্ষোভের কারণ—এই এক ত্রুটির উল্লেখ করিয়া এবং গ্রন্থকারকে সে পক্ষে কি বলিবার আছে বলিতে দিয়া আমি গ্রন্থ পরিচয় আরম্ভ করিলাম।

মুখবন্ধে গ্রন্থকার নিজেই এই পরিচয় দিয়াছেন, যে তিনি প্রথমে বাংলা সাহিত্য-বিষয়ে মৌলিক গবেষণা-মূলক একটি রচনা Griffith Memorial Prizeএর জন্য পণয়ন করেন; ঐ রচনা শেষে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য বৃহত্তর নিবন্ধে পরিণত হয় এবং ১৯১৮ সালে উক্ত বৃত্তির জন্য মনোনীত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ,—পরীক্ষার বিষয় হইয়াছে, বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে—উভয়ই বাংলা সাহিত্যের নিত্যনব সৌভাগ্যের দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে একটি কথা না বলিলে লেখকের প্রতি সম্যক শ্রদ্ধার হানি হয়। তিনি এই বাংলা সাহিত্যকে মৌলিক গবেষণার বিষয় করিয়া উক্ত বৃত্তি লাভে একাধিকবার বিফলপ্রযত্ন হন। কিন্তু যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তিনি এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি হতাশ হন নাই—অধিক তর উৎসাহ ও অধ্যবসায় গুণে তিনি তাঁহার রচনাটির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন এবং এই বৃত্তিলাভ না করিলে হতোদ্যম হইতেন না।

গ্রন্থখানিকে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ করিবার আশায় এই প্রথম খণ্ডে তিনি ১৮০০ হইতে ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, উপস্থিত, ১৮৬০ সালে পৌঁছাইয়া দিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার কল্পনা করিয়াছেন। কালহিসাবে এত অল্প হইলেও গ্রন্থের কলেবর অল্প নহে, প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় এই খণ্ড সম্পূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থখানির অধ্যায় বিভাগ এইরূপ—

(১) বিষয় বিভাগ।

(২) উপক্রমণিকা হিসাবে অতীত দর্শন।

(৩) প্রথমতম য়ুরোপীয় লেখকগণ।

(৪) কেরী ও শ্রীরামপুর-মিশন।

(৫) কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

(৬) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ও মুন্সীগণ।

(৭) সর্ব্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র পরিচালনা।

(৮) পরবর্ত্তী য়ুরোপীয় লেখকগণ।

(৯) এ যুগের সাধারণ লক্ষণনিচয়।

(১০) কাব্যসাহিত্যে যুগসন্ধির অবকাশ কাল।

(১১) প্রেম ও ভক্তিমূলক কবিতা ও গান।

(১২) প্রাচীন রীতি অনুসারী নানা শ্রেণীর লেখক।

এতদ্ব্যতীত পাঁচটি অতিরিক্ত পত্র ও একটি সুবিস্তৃত প্রমাণপঞ্জী আছে।

কিন্তু অধ্যায়গুলির নাম হইতে গ্রন্থের স্বরূপ নির্ণয় করা যাইবে না। গ্রন্থখানি আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে-যুগের সাহিত্য চেষ্টা বর্ণন করিয়াছেন, সে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র ভূমিকারূপে সন্নিবেশিত করিয়া তদানীন্তন দেশকাল ও পাত্রের সহিত সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিচার করিয়াছেন। অন্য সকল বিভাগের ন্যায় সাহিত্যও যে জাতির জীবনধর্ম্মের স্বভাব-নিয়মে গড়িয়া উঠে এবং বিশিষ্ট আকার প্রাপ্ত হয়, এই বিকাশের ধারা যে সুসঙ্গত, এবং সর্ব্বকালের ভিতর দিয়া যে সেই একই জাতির আত্মা আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, বাহিরের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহার আত্মিক বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলে, কোনো যুগান্তরই যে তাহাকে তাহার এই স্বপ্রকৃতি হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না—ইতিহাসের ধারা কোনখানেই আচম্বিত আঘাতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না—এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তির উপরেই তিনি তাঁহার গবেষণা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠা, যাহাতে এই সকল ক্ষেত্রে লেখকের দেশানুরাগ চাপল্যমুক্ত হইয়া একটি গম্ভীর শ্রী ধারণ করে, তাহা সর্ব্বত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রমাণসংগ্রহের পরিশ্রম, সর্ব্বগ্রন্থের সহিত চাক্ষুষ পরিচয়; যেখানে পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে, সেখানে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ, প্রমাণসমুচ্চয়ে পণ্ডিতজনোচিত ধীরতা, নিজমত প্রকাশে সংযম ও সাবধানতা, স্বকপোল-কল্পনার পরিহার, নির্ভীকতা ও সরলতা—গ্রন্থখানিকে একটি বিশিষ্ট গৌরব দান করিয়াছে। এই হিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় এই গ্রন্থ একটি নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। যে unshrinking intellectual sincerity আমরা একালের রচনায় বিশেষ করিয়া অনুভব করিতে চাই, গ্রন্থকারের তাহা আছে বলিয়া বোধ হয়।

গ্রন্থকার বর্ত্তমান খণ্ডে আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠায় বৈদেশিক প্রভাব ও চেষ্টার মূল্য ও তথা ঋণ-নিরূপণ অতি নিপুণ ও সতর্কভাবেই করিয়াছেন। ইতিহাসের ধারায় আকস্মিক বিপ্লব কতখানি কার্য্য করে—কেবল মাত্র ঘটনামাহাত্ম্য কতখানি—তাহার বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্য যে নূতন জন্ম লাভ করিয়াছে তাহা যে এক মাত্র ব্রিটিশ অধিকারের ফল, তাহা নহে।

প্রাচীন সাহিত্যের গতি পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চল হইয়া আসিতেছিল, সে সাহিত্যের প্রাণশক্তি কালবশে নিস্তেজ হইয়া অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিল—ইংরাজী প্রভাব তাহার এই পরিবর্ত্তন ত্বরান্বিত করিয়াছে, যাহা ঘটিতে আরও বিলম্ব হইত, তাহা অতি-শীঘ্র ঘটাইয়াছে, তবে, ঠিক কি আকারে নবসাহিত্য জন্মলাভ করিত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বৈদেশিক মিশনারী লেখকগণ সাহিত্য গড়েন নাই, তাঁহাদের শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টায়, সাহস শ্রমশীলতা ও বিচার বুদ্ধির প্রেরণায় নবসাহিত্যপ্রতিষ্ঠার অনুকূল বায়ু বহিয়াছিল। কেরী জানিতেন, সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে তাহা এই দেশের মাটিতেই সম্ভব, সে কাজ শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশীয়েরাই করিবেন। কিন্তু বৈদেশিকের এই চেষ্টা ও উৎসাহের মূল্য অল্প নহে। এ বিষয়ে তাঁহার আলোচনা বড়ই শিক্ষাপ্রদ। তিনি সাহিত্যসৃষ্টির এই প্রয়াস-কালকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন—য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষাচর্চ্চার যুগ, ভাব-বিপ্লব বা Reforming Young Bengalএর যুগ, এবং সর্ব্ব শেষে Literary Young Bengalএর যুগ। বর্ত্তমান গ্রন্থ বিশেষভাবে প্রথম যুগের ইতিহাস। এজন্য প্রকৃত সাহিত্য বিচারের অবকাশ ইহাতে বড় অল্প। এই শুষ্ক নীরস কঙ্কালসংগ্রহের বিবরণ তিনি কি ধৈর্য্য ও অনুরাগের সহিত লিখিয়াছেন, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এই গ্রন্থে যে সকল তথ্য আলোচিত ও বিবৃত হইয়াছে তাহা কেবল মাত্র সংগ্রহ কার্য্যে পর্য্যবসিত হয় নাই, লেখক এত বহুশ্রমলব্ধ প্রমাণ ও উপাদানরাশির মধ্যে কালের ধারা ও সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা সূত্রটিকে কোনোখানে হারাইয়া যাইতে দেন নাই।

প্রথমতঃ, বাংলা ভাষায় বৈদেশিক সংস্রবের ইতিহাস তিনি আদি হইতে বিবৃত করিয়াছেন, পুরাতন পোর্ত্তুগীজ মিশনারীদের চেষ্টা ও কতকটা সেই সকল মিশনের সংক্ষিপ্ত ও সুসংবদ্ধ বিবরণ তিনিই পরিশ্রম সহকারে এই প্রথম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সংকলিত করিয়াছেন। এই সূত্রে "কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ" নামক প্রাচীনতম ও প্রথমতঃ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের সন্ধান ও পরিচয় দিয়াছেন। হালহেডের বাংলা ব্যাকরণের পূর্ব্বেও পোর্ত্তুগীজ মিশনারী মানোয়েল দ'-আসাম্পসাঁও রচিত একখানি ব্যাকরণ ছিল সে সংবাদও পূর্ব্বে কেহ দেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মত কেবল নানা catalogue হইতে নাম ও তারিখ (অনেক স্থলে ভ্রমসঙ্কুল) উদ্ধৃত করিয়া তিনি এ যুগের ইতিহাস রচনায় যাহা-খুসী প্রাণ ভরিয়া লিখিয়া গিয়া সুলভ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন নাই। এই গ্রন্থে বিবৃত সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয়-বিবরণে যতখানি প্রকৃত তথ্য ও সত্যকথা জানিতে পারা যায়, তাহা জানিতে ও জানাইতে গ্রন্থকার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন—এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের ঐতিহাসিক মর্য্যাদার বিচার সর্ব্বত্র করিয়াছেন।

তাঁহার দ্বিতীয় চেষ্টা, বাংলা গদ্যের উদ্ভব উন্মেষ ও বিকাশ ব্যাপারের যথাসাধ্য অনুসন্ধান ও আলোচনা—বস্তুতঃ বর্ত্তমান খণ্ডের ইহাই বিশেষ কৃতিত্ব। প্রায় অর্দ্ধেক গ্রন্থ এ যুগের এই সর্ব্বপ্রধান সাধ্য ও সিদ্ধির পরিচয়ে পূর্ণ। বাইবেল অনুবাদের ভাষা হইতে ফেলিক্স কেরীর 'বিদ্যাহারাবলী'র ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যার ভাষা পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ রচনা, কথা, কাহিনী, ইতিহাস ও নানা অনুবাদের ভাষা, সংবাদপত্রের ভাষা এবং সেই সময়ের অনুসৃত রীতি চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যান ও সমালোচনা; ভাষায় বৈদেশিক ভাব ও ভঙ্গির প্রভাব -এই সকল বিষয় এমন করিয়া অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইতে উদাহরণ সাহায্যে এরূপ সুনিপুণ ভাবে আর কোথাও আলোচিত হয় নাই। আদালতী ভাষা, সাহেবীভাষা, সাধুভাষা ও চলিত ভাষার চারি ধারা শেষে কেমন করিয়া সংস্কৃত-কলেজী ভাষা ও আলালী ভাষার দ্বন্দ্বে পরিণত হইল এবং সর্ব্বশেষে বঙ্কিমের হাতে তাহার সমন্বয়ের চেষ্টা সত্বেও অদ্যাপি যে যুদ্ধের অবসান হয় নাই—সেই বাংলারচনা রীতির জন্মগত দ্বন্দ্বের কথা লেখক এই অংশে লিখিবার কালে বিস্মৃত হন নাই। সাহেবী ভাষাই আলালী ও অধুনাতন রচনা রীতির আদি জনয়িতা; মূলের সেই প্রভাব বাংলাভাষায় কতখানি বেগ সঞ্চারিত করিয়াছে ও সর্ব্ববিষয়োপযোগী গদ্য সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে—সেই লাভের অঙ্ক প্রদর্শনকালে, পণ্ডিতী ও সাহেবী প্রভাবের সমন্বয়ফলে বর্ত্তমান ভাষা যাহা হারাইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—

But the literature of Bengal which had hitherto belonged to the people in general, ...under the patronage of an alien lettered class, imbued with new ideas and novel methods, lost its representative character; its primitive colouring and pristine simplicity.

এবং অন্যত্র চলিত ভাষার সম্বন্ধে বলিতেছেন,

A little sanscritised on the one hand and a little persianised on the other, the language preserved the equipoise perfectly and drew its nerve and vigour from the soil itself It was so direct in its simplicity, so dignified in its colloquial ease, and so artful in its want of art, that it never failed to appeal. * * * * While speaking of this language of the people in its contrast to modern mixed literary diction, Bankim Chandra lamented

আজিকার দিনে অভিনব ও উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গলা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে ক্ষোভ হয়, হোক সুন্দর এবুঝি পরের, আমাদের নয়। খাঁটি বাঙ্গালা কথায় বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না।

* * * Iswar Gupta whose tone and temper allied him with the Kabiwalas, was indeed the last of that blessed race over whom the confusion of Babel had not yet fallen.

তাঁহার আলোচনার তৃতীয় প্রধান বিষয় হইয়াছে, এই সাহিত্য-রস-বর্জ্জিত যুগে লোকসাধারণ্যে প্রচারিত ও তাহাদেরই জন্য রচিত কবিগান ও অন্যান্য গীতি কবিতা। এই কাব্যরস নিকৃষ্ট হইলেও উহাই এ যুগের "তিক্ত হোক মিষ্ট হোক্

এক মাত্র রস"। লেখক এগুলিকে তুচ্ছ করেন নাই, বরং ইহাদের ঐতিহাসিক মর্ম্ম ও সাহিত্যিক মূল্য যথাযথ নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্তুতঃ গ্রন্থের কেবল এই অংশে মাত্র লেখক তাঁহার রসবোধ ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিবার পূর্ণ অবসর পাইয়াছেন। এই অংশ পাঠকালে, লেখকের ইংরাজী-বেশ আর চোখে পড়ে না; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তির সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি বাঙ্গালীর প্রাণ না থাকিলে তাহা যে অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে, এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কবি-গান, পাঁচালি প্রভৃতি বঙ্গ-সাহিত্য-সরস্বতীর বেলাবালুকার মধ্য হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া এবং তাহার প্রকৃত মূল্য ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া তিনি যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহার অভাবে অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধও ব্যর্থ হইতে দেখা গিয়াছে। আজিকার এই রাজনৈতিক জাগরণের দিনে জাতীয়তা ও তথা বাঙ্গালিয়ানার গৌরব-কীর্ত্তন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালীর হৃদয়ের যে একটি বিশিষ্ট গঠন আছে, তাহার ভাবনা, ভাষা ও ভাবপ্রকাশে, তাহার হাসি ও কান্নায় যে একটি জাতীয় style বা অ-সাধারণ মনোদেহ আছে, সেই ঐতিহাসিক মনোদেহের পরিচয় শিক্ষিত বাঙ্গালী রাখেন না এবং এ কথার উত্থাপনও বিশ্বজনীন উদার culture এর বিরুদ্ধে—সূর্য্যালোকের প্রতি ধূমসর্বস্ব মশালের—ঈর্ষা বলিয়া নিন্দিত হয়। লেখক সেই উদারতার পরিচয় দেন নাই, এমন কি কবিগান পাঁচালীর প্রতিও নাসা কুঞ্চিত করেন নাই, এজন্য আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। পাঠক ভুল বুঝিবেন না, গ্রন্থকার ঐতিহাসিক সমালোচকের আসন কলঙ্কিত করেন নাই, তিনি এই সকল গানকে সাহিত্যিক গৌরব দান করেন নাই। তিনি এই সকল গানের মধ্যে আমাদের জাতীয় ভাবগত অতীতের অতি বিশীর্ণ লুপ্তপ্রায় স্রোতঃসঞ্চার লক্ষ্য করিয়াছেন; এবং বাংলা-সাহিত্যে প্রকৃত বাঙ্গালীয়ানার চিরন্তনী ধারা রক্ষাকল্পে তাহারা কতটুকু সাহায্য করিয়াছে, এবং উত্তরকালের দিগ্‌বিজয়ী নবসাহিত্যে কতটুকু শক্তি সংক্রমিত করিয়া তাহারা অতীতের কুক্ষিগত হইয়াছে, —এই কথার আলোচনা-কালে, লেখক এই সকল গানের মধ্যে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীয়ানা বিশ্লেষণ করিয়া একাধারে যে পাণ্ডিত্য ও সহানুভূতি এবং তথা আপনার খাঁটি বাঙ্গালীত্বের পরিচয় দিয়াছেন—তাহার কথাই বলিতেছি। তিনি বলিতেছেন,

Standing as they (the Kabiwalas) do on the gate-way of modern literature, they give little or no presentiment of things to come, they do not announce the future; but they represent the past and stoutly, if unconsciously, make their stand for a fast disappearing form of art and expression which drew its inspiration from the past life of the nation itself and which was not without its significance to the new life the nation was entering upon.

এই কালের কাব্যসমষ্টির সাহিত্যিক মূল্য-বিচারকালে বলিতেছেন—

Much of this literature, as in the case of some of the songs of the Kabiwalas, is no doubt transient and ephemeral and there is certainly much in it which is really contemptible, yet the frivolity of an imitative culture or the wild pursuit of evershifting literary fashion ought not to blind us to the historical and literary value, whatever it might be, of the art and literature of a generation which has passed away.

এবং অন্যত্র—

It is a mistake to suppose that the old tendency absolutely died out with the death of Iswar Gupta. It never died out but it left its enduring vitality in the current of national thought and feeling, unmistakeable influence of which may be traced even in the literature of to-day. The spirit of an age or race yielding to that of its successor continues to abide in it as an essential ingredient, assumed, tranformed and carried forward.

এই সকল কথাই তিনি এই সাহিত্যের সাক্ষাৎ আলোচনা প্রসঙ্গে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন।

এই যুগের কাব্যচেষ্টাকে তিনি এই কয় বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; (১) কবিওয়ালা। (২) নিধুবাবু ও অন্যান্য টপ্পাকার। (৩) রামপ্রসাদের শিষ্য ও অন্যান্য ভক্তিসঙ্গীতরচয়িতাগণ। (৪) ভারতচন্দ্রের কবিশিষ্যগণ (৫) পুরাতন রীতি অনুসারী একৈক লেখকগণ: জয়নারায়ণ ঘোষাল, রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতি। (৬) পাঁচালী ও যাত্রাকারগণ। (৭) বিবিধবিষয়ক সঙ্গীতকর্ত্তাগণ।

এই আলোচনায় আখড়াই হাপআখড়াই, খেউড়, তর্জ্জা এবং ঐ সকল কবিতার গাওনা ও রচনা-পদ্ধতির বিবরণ কিছুই বাদ যায় নাই। এই সকল কাব্যশ্রেণীর ক্রমবিবর্ত্তন উন্নতি ও অবনতি, প্রাচীন যুগের কাব্য সাহিত্যের সহিত—বিশেষতঃ বৈষ্ণবপদাবলীর সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ও তুলনায় সমালোচনা এবং ইহাদের নানা জাতি ও নানা স্তরের বিশেষ ও সাধারণ লক্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু উদাহরণসমন্বিত সুনিপুণ গবেষণা এই অধ্যায়কে অলঙ্কৃত করিয়াছে। প্রত্যেক লেখক বা গীত-রচয়িতার সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে এই নিবন্ধে তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় হইয়াছে, বৈষ্ণব ও শাক্ত কবিতার ভাব ও রীতি বিশ্লেষণ—এবং উক্ত দুই কাব্যপ্রকৃতি এই যুগের কবিতা ও গীতিরচনায় তাহাদের সেই অতি প্রাচীন ও বহুদূরাগত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি কতটুকু অব্যাহত রাখিয়াছে, এবং এযুগের মৌলিকতাই বা কতটুকু—তাহার বিচার বিশ্লেষণ। যাত্রা ও পাঁচালী সম্বন্ধেও লেখকের মৌলিক গবেষণা বহু তথ্যে পূর্ণ। এক কথায় এই অংশে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় গ্রন্থ হইতেই লইতে হইবে, আমি এই স্বল্প-কলেবর প্রবন্ধে সে চেষ্টা করিলে, যিনি গ্রন্থ পড়িয়াছেন তাঁহার নিকট হাস্যাস্পদ হইব।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রাচীন বাংলা গদ্য বিষয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ গ্রথিত হইয়াছে।

গ্রন্থ পরিচয় শেষ করিলাম। অসম্পূর্ণ হইলেও আশা করি যেটুকু বলিতে পারিয়াছি তাহাতেই পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি, বা সাহিত্যক্ষেত্রে (?) এই নবীন লেখকের প্রবীণ কীর্ত্তির প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

শ্রীমধুব্রত।

ভাদরের বেলা

ভাদরের বেলা আদরে কাটিয়া যায়—
এটা, ওটা, সেটা—প্রাণ তবু কি সে চায়!
ভিজা বায়ু বয় দিন মেঘময়,
এমন আঁধারে একরাশ চুল কেমনে শুকা'বে হায়,
কেন ভুল কর? কি হবে বাঁধিয়া কেবলি যা' খুলে যায়!

এলো খোঁপা আজ দু'হাতে বাঁধিয়া নাও,
যূথিকার হার উহাতে দুলায়ে দাও।
কাণে দোলে আজ ওই যে দোদুল্ দুল্
আঁখি দু'টি মোর হেরিয়া হরষাকুল,
গণ্ড-গ্রীবায় নবনীত ভায়,
কেতকী-কেশর-গৌর তোমার ভুজ-শাখা সবলয়
মনটি আমার কেমন করিয়া আজিকে কাড়িয়া লয়!

নীল শাড়ী খুলি' পোরো না খয়েরী খানি,
খয়েরের টিপে ভুরু ভেঙ্গে দাও রাণি!
মুখর নূপুর করি দাও দূর!
আজ শুধু ভালো কালো চুড়ী আর কাঁকণের রুণিঝুনি,
বকুলের মালা গাঁথ বসি বালা, দেখি, আর তাই শুনি।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

হাব্‌শীর প্রেম

(গল্প)

দিল্লী সহর হইতে দিল্লী কটকের ওধার দিয়া যে রাস্তা বরাবর কুতবের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই দিকটায় চলিয়াছিলাম, সদল-বলে, শাহজাদীদের সন্ধানে। সূর্য্য তখন আকাশের অনেকটা পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, মাথার উপর সমস্ত আকাশটায় যেন কে আবির মাখাইয়া দিয়াছে—লালে-লাল আকাশ। প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের ভগ্নস্তূপ-

গুলাকে বাঁয়ে রাখিয়া হুমায়ুনের সমাধি পিছনে ফেলিয়া বরাবর চলিয়াছিলাম—বন্ধু-বান্ধব সিগারেটের ধোঁয়ায় এবং হাস্য-কৌতুকে সারা পথ সচকিত করিয়া চলিয়াছিল, আমি চলিয়াছিলাম নির্ব্বাক, মৌন গতিতে। আকাশ-বাতাস কিসের গন্ধে যেন মাতাল হইয়া আছে—তাহারই নেশায় প্রাণটা আমার বুঁদ হইয়া গিয়াছিল।

একধারে নিজামুদ্দিনের কবর দেখা গেল। ঢুকিয়া পড়িলাম। ভিতরের পথটা অল্প আঁধারে ভরিয়া গিয়াছে। জাহান্-আরার জাফ্রি আঁটা শেষ-শয্যার বাহিরে দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিলাম—পা দুইটা অত্যন্ত ভারী বোধ হইতেছিল—ভিতরের বাতাসে কেমন গুমট বাধিতেছিল। চুপিচুপি বাহিরে আসিলাম। সম্মুখের পথ ধরিয়া খানিকটা আসিয়া এক ঝোপের পাশে বসিয়া পড়িলাম। মাথার মধ্যে যেন কি আকাশ-পাতাল তোলপাড় করিতেছিল। সম্মুখে ছিল একটা খাদ—জল নাই, দুইধারে বড় বড় জঙ্গল গজাইয়া উঠিয়াছে, ভাবিলাম, এ জলে একদিন, না জানি, কি চঞ্চল তরঙ্গ উঠিত,—কাঁকণ বাজাইয়া রূপসী তরুণীর দল স্নানে নামিত—সমস্ত বাতাস চকিতে অমনি হেনা-অগুরুর গন্ধে উতলা হইয়া উঠিত। কোন্ সে অতীত যুগের স্নিগ্ধ সুরভি আসিয়া আমার চিত্তটাকে অবশ করিয়া তুলিল। একটা পাথরে মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদিলাম।

সহসা কে ডাকিল, "কৌন্ রে বেটা ?"

চোখ চাহিয়া দেখি, এক বৃদ্ধ ফকির। উঠিয়া বসিলাম। ফকির কহিল, "বঙ্গালী ?"

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, হাঁ।

ফকির কহিল, "সলীমার গোর দেখিয়াছিস্ ?"

আমি কহিলাম, "না।"

ফকির কহিল, "তুই যে পাথরটায় মাথা রাখিয়াছিস্, তাহারই নীচে সলীমা বিবি ঘুমাইয়া আছে।"

সলীমা বিবি। না জানি, কোন্ হারেম আলো করিয়া একদিন সে বিদ্যুৎ-বরণী ফুটিয়াছিল—তাহারই চোখের ইঙ্গিতে কত শাহজাদা উঠিয়াছে-বসিয়াছে, চলিয়াছে-ফিরিয়াছে। কাজল-টানা ভ্রূর বিলাস-লীলায় কোন্ বাদশাহের সে তখ্ত টলিয়াছে,—রাজায়-বাদশায় যুদ্ধ বাধিয়াছে!

ফকির বলিল, সলীমা ছিল, শাহজাদী জানী বেগমের বাঁদী। জাতে হাব্শী—রঙটি ছিল মিশ্ কালো। কিন্তু যৌবন সেই কালো দেহখানিকেই কষিয়া মাজিয়া এমন ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছিল, যে দেখিলেই তাক্ লাগিত—এ কি কালো পাথরে খোদা মূর্ত্তি, না—অর্থাৎ বান্দার দলে কেহ কেহ বলিত, সলীমা বিবি যেন তাজা আঙুরটি! তেমনি রসালো, তেমনি নরম! বেগমের পেয়ারের পাত্রকে পেয়ার করিয়া জীবন্ত এই মাটীর নীচে ঢুকিয়া বেচারা তার দুঃসাহসের সাজা লইয়াছে।

পাথরটার গায়ে কতকগুলা ফুল পাতা রাখিয়া ফকির চলিয়া গেল। আমি বসিয়াই রহিলাম। ঝাউগাছের পাতাগুলাকে দোলাইয়া বাতাস হা-হা শব্দে গুমরিয়া ফিরিতেছিল—দলের কাহারো কোন সাড়া ছিল না। জাহান-আরার পাণ্ডিত্য লইয়া নিশ্চয় সেখানে তাহারা বিষম তর্ক ফাঁদিয়া দিয়াছে! নির্ব্বোধ!

পাথরের উপর হইতে একটা ফুল লইয়া নাকের কাছে ধরিলাম। সমস্ত মনটা চন্‌-মন্‌ করিয়া উঠিল। নেশা লাগিল। আকাশের পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম, সলীমার কথা। না জানি, এই হাবশী বাঁদীর জীবনটি কি অসীম রহস্যে ভরা ছিল!

হঠাৎ কে আমায় স্পর্শ করিল। কে? ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক তরুণী। তখন চারিধার ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে। সেই আলো-আঁধারে এটুকু বুঝিলাম, তরুণীর গায়ের বর্ণটি মিস্‌ কালো, কিন্তু যৌবনের অপূর্ব্ব তরঙ্গ সারা অবয়বে এক অপরূপ হিল্লোল তুলিয়াছে। সুগোল নিটোল হাত, মুখে লাবণ্য একেবারে ঢলঢল করিতেছে! সদ্য-ফোটা ফুলের মতই শ্রীটুকু!

তরুণী কহিল, "অবাক হয়ে চেয়ে আছ যে! আমায় চেনো না?"

আমি আরো বিস্মিত হইলাম,—মুখে কথা ফুটিল না। সম্মুখে একটা ভগ্ন স্তূপের উপর তরুণী বসিয়া পড়িল। পাৎলা আঁচলখানি কেমন একছন্দে উড়িতে লাগিল—মিষ্ট গন্ধে চারিধার ভরিয়া গেল।

তরুণী হাসিয়া কহিল, "এইখানে রোজ সন্ধ্যায় এসে বসি। এ জায়গার মায়া কিছুতে ছাড়তে পারিনা।"

আমি কহিলাম, "এ জায়গার কি এমন মোহ যে, তার জন্য—"

"বুঝতে পারছ না! কেমন করে পারবে বল! তুমি বিদেশী মানুষ, কিছুই ত জানোনা —ক'জনই বা জানে! যে দু'চার-জন জানত, তারাও কেউ আর এখন এখানে নেই। বেশ, তবে বলি শোন—"

তরুণী বলিতে লাগিল,—

"জানী বেগম ছিল সম্রাট ফরুক্‌-শিয়ারের কন্যা। রূপের দম্ভে ধরাকে সরা দেখিত। তবে সে রূপ কখনো শান্ত আলোর প্রদীপটি জ্বালিয়া চারিধার স্নিগ্ধ-শীতল আলোয় ভরাইতে চাহে নাই—সে রূপ চাহিয়াছিল, লেলিহান্‌ তীব্র শিখায় জ্বলিয়া চারিধার জ্বালাইয়া দিতে!

বাদশা-ওমরাওদের তরুণ পুত্রগুলা জানী বেগমের চারিধারে ঘুরিত, ঠিক যেন সেই প্রভাতের ফুল-বনে ভ্রমরদলের মতই। গুঞ্জন আর গুঞ্জন, তাহার আর বিরাম নাই! জানী বেগম ফুলের মতই ঘাড় দুলাইয়া বলিত, না, না, না! বেচারারা আহার-নিদ্রা ভুলিয়া, দুনিয়া ভুলিয়া সেই পাষাণ-সুন্দরীর রূপের স্তব করিত, আর সেই প্রাণহীনা শাহজাদী নির্দ্দয় কৌতুক বুকে লইয়া তাহাদের সে নৈরাশ্যের বেদনা হাস্যমুখে উপভোগ করিত! ইহাতেই ছিল, তাহার সকল গর্ব্ব, সকল সুখ।

প্রসাদের পাত্রও যে তার না ছিল, এমন নয়। তাহারা গোপনে আসিয়া শাহজাদীর চরণে লুটাইত,—শাহজাদীর তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে চলিত, ফিরিত! এমনিভাবে তাহারা শাহজাদীর চরণে লুটাইয়া ছিল যে, নিজেদের ইচ্ছায় তাহাদের ওঠা-বসাটুকুও ঘটিত না। দরবার হইতে লোক আসিয়া জানাইত, বাদশার তলব। শাহজাদী বলিত, "খবরদার!" ব্যস—পুতুলের মতই তাহারা বসিয়া পড়িত। তারপর বাদসাহী হুকুম অমান্য করার জন্য যখন গর্দ্দানা দিত, শাহজাদী তখন হাসিয়া বলিত, "বেকুব"! অর্থাৎ শাহজাদী সা

হইলে তাহাদের বুকে ধরিত, আবার পর-ক্ষণে সম্মুখে দাঁড়াইয়া কশার ঘায় তাহাদের পিঠের চামড়া উঠাইয়া লইত! মায়া-মমতার এতটুকু ধার ধারিত না।

মহম্মদ ছিল, ফরুকৃশিয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্র; তরুণ যুবা—সুশ্রী। বেচারা যখন আকুল প্রাণে জানী বেগমের মুখের পানে চাহিত, জানী তখন হাসিয়া মুখ ফিরাইত। চোখের জলে মহম্মদের দিন কাটিত। আমি ছিলাম জানী বেগমের খাস বাঁদী। চিঠি-পত্র বহা, সিরাজীর পাত্র আর চাবুক হাতে আগাইয়া দেওয়া, এই সব ছিল আমার কাজ।

প্রাণ লইয়া শাহজাদীর এই নিষ্ঠুর খেলা দেখিয়া আমার বুকটার মধ্যে যে কি করিত, তাহা আমি কথায় বুঝাইতে পারি না। সে যাতনা আমার হাড়ে অবধি বিঁধিত! কিন্তু মুখ যে ফুটিত না। সে স্পর্দ্ধা বা সাহস ছিল না—তখনই কুত্তার মুখে এই দেহটাকে ফেলিয়া দিতে হইবে! তা-ছাড়া আমি ত একটা বাঁদী!

কিন্তু পারিলাম না। মহম্মদের সেই করুণ মুখ, নৈরাশ্যের সেই বেদনা আর দীর্ঘশ্বাস বাঁদীর এই কালো প্রাণটার মধ্যে অত্যন্ত বাজিতেছিল,—চিত্ত আমার ক্ষুব্ধ হাহাকারে ভরিয়া উঠিত। আমার প্রাণে কিসের ক্ষুধা, কিসের পিপাসা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে চাহিত।

একদিন নিজেকে আর সামলাইতে পারিলাম না। ঝম্-ঝম্ শ্রাবণের সে কি ধারা ঝরিয়াছিল! এই যে জায়গাটি, এইখানে ছিল, শাহজাদীর প্রমোদ-কুঞ্জ—ঐ খাদটা ছিল এক প্রকাণ্ড দীঘি। তখন বন-জঙ্গলের চিহ্নও কোথাও ছিলনা—ঐ জঙ্গলটা ছিল গোলাপ-বাগ। অজস্র গোলাপ ফুটিয়া চারি-ধার লালে-লাল করিয়া রাখিত। বেচারা মহম্মদ সেই শ্রাবণের ধারা মাথায় লইয়া চাহিয়া ছিল, শাহজাদীর ঘরের জানলাটির পানে। শাহজাদী চুল এলাইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল, আমি কার্ব্বা হইতে আতর লইয়া মিহি করিয়া চুলে মাখাইতেছিলাম। শাহজাদার চোখের সেই অধীর আকুল দৃষ্টি আমার চোখে পড়িল। দেখিয়াই বুঝিলাম, প্রাণে তাঁহার কি অসহ্য বেদনা।

আমার যৌবন-বনে নিমেষে অমনি বসন্ত ফুটিল, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী গাহিয়া উঠিল। মন দুলিয়া উঠিল। ধৈর্য্যের বাঁধ নিমেষে টুটিল। দ্রুত ঘরে আসিয়া একটা চিঠি লিখিয়া ফেলিলাম—

"প্রিয়তম, আর তোমার এ অধীরতা চোখে দেখিতে পারি না। ওগো আমার যৌবন-কুঞ্জের মালিক, হে আমার জীবন বসন্তের নবীন বিহঙ্গ, এসো, এসো, প্রাণ ভরিয়া এ-যৌবন উপভোগ করিবে, এসো। এই বাঁদী আজ সন্ধ্যার সময় তোমায় আমার প্রেমের দরবারে আনিয়া হাজির করিবে। তবে একটি সর্ত্ত আছে, বাঁদীর মুখেই সে কথা শুনিবে। যদি সে সর্ত্তে রাজী হও, আজই সন্ধ্যায় তাহা হইলে তোমায়-আমায় প্রেমের লীলা চলিবে!

জানী।"

শাহজাদীর পাঞ্জা কোথায় থাকিত, জানিতাম। শাহজাদী তখন ফুলের রাশি লইয়া অলস খেলায় মাতিয়াছিল, কখনো ফুল লোফালুফি করিতেছিল—কোনটা মাথায়

খোঁপায় গুঁজিতেছিল, কোনটা আবার ছিঁড়িতেছিল! বাদশাজাদীর অলস খেলা—সুখের খেলা!

পঞ্জা চুরি করিলাম—চিঠিতে ছাপ মারিলাম। পরে ধীরে ধীরে সে চিঠি লইয়া মহম্মদের হাতে দিলাম।

চিঠি পড়িয়া মহম্মদ চমকিয়া উঠিল। একেবারে আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কি সর্ত্ত, বাঁদী?"

আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়াছিলাম—ঐ উজ্জ্বল চোখ এমন দৃষ্টি-হীন। আমার প্রাণটার মধ্যে একবার যদি সন্ধান করিত ত দেখিত, সেখানে লক্ষ জানী বেগম! বুকে অগাধ প্রেম লইয়া বসিয়া আছে! এই শাহজাদার দল চিরকালই মূর্খ।

আমি বলিলাম, "ঘরে আলো জ্বলিবে না। শাহজাদীর মুখ দেখিতে পাইবেন না।"

প্রেমান্ধ যুবা বলিল, "রাজী।"

৫

তারপর নিশি-নিশি প্রেমের সে কি অপরূপ লীলা চলিল। আমার প্রাণ-পুষ্পের প্রতি দলটিকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া শাহজাদার পায়ে ধরিতাম, শাহজাদা কত আবেগে বুকে তুলিত—কি সোহাগ, সে কি আদর! বাঁদীর শূন্য মন কাণায় কাণায় ভরিয়া গেল! দলিত দ্রাক্ষার মতই আমার যৌবন-সুরা পাত্র ভরিয়া শাহজাদার অধরে ধরিয়াছি, শাহজাদা গভীর আবেগে নিঃশেষে তাহা পান করিয়াছে!

এক-বৎসর ধরিয়া প্রতি রাত্রি এই অপূর্ব্ব সুখের ডালি বিলাইয়া আমায় বিপুল ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়া তুলিল। অল্প-ধনে-ধনী আমি একান্তে বসিয়া ভাবিতাম, হায়রে শাহজাদী, তখ্‌তে বসিয়া কি নুড়ি-পাথর লইয়া তুচ্ছ খেলা খেলিতেছ—আর আমি পথের বাঁদী, প্রেমের মণিহার গলায় পরিয়া বসিয়া আছি। ওগো শাহজাদা, ওগো আমার প্রাণের প্রাণ, প্রিয়তম, ওগো চির-দয়িত, যুগ যুগ ধরিয়া আমার বুকের নিধি আমার বুকে বসিয়া তুমি এমনই রাজত্ব কর।

একদিন ভুল করিলাম—নিমেষের ভুল। কিন্তু আমার সমস্ত যুগ-যুগান্ত সেই এক নিমেষে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

বাহিরে সেরাত্রে জ্যোৎস্না লুটাইয়া পড়িয়াছিল—পাখী গাহিতেছিল,—ঘরে অন্ধকার! শাহজাদার বুকে মাথা রাখিয়া বলিলাম, "আমায় সত্যই ভালবাস, প্রিয়তম?"

"বাসি, বাসি—আমার প্রিয়তমা, বাসি, বড় ভালবাসি, দুনিয়ার চেয়ে তোমায় ভালবাসি, বেহেস্তের চেয়ে ভালবাসি, সকলের চেয়ে তোমায় ভালবাসি!" আবেগে শাহজাদা আমার তৃষিত ওষ্ঠে সুধার ধারা বহাইয়া দিলেন। আমি জ্ঞান হারাইলাম। সেই কুহক-ভরা ক্ষণে দারুণ ভুল করিয়া বসিলাম। আমি বলিলাম, "যদি আমি কুরূপ হই,—বিশ্রী হই, তাহলেও ভালবাস!"

"বাসি, বাসি।" কি গদ-গদ সে কণ্ঠের ভাষা!

আমি দুইবাহুর ডোরে শাহজাদার কণ্ঠ জড়াইলাম, প্রাণ ভরিয়া সে মুখে চুম্বন করিলাম। তারপর উঠিয়া আলো জ্বালিলাম, ভাবিয়াছিলাম, শাহজাদাকে দেখাইব, এই কালো দেহের আবরণে কত প্রেম ভরিয়া

রাখিয়াছি, এই কালো মুখে কত আঁলো! দেখাইব, দেখাইয়া প্রাণে পরিপূর্ণ তৃপ্তি ভোগ করিব!

আলো জ্বলিল। শাহজাদা চমকিয়া শিহরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন,—গর্জ্জন করিলেন, "শয়তানী, তুই বাঁদী!"

শাহজাদার পায়ে ধরিলাম, কত চোখের জল ফেলিলাম। জানী বেগম খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল—শাহজাদার মুখে সমস্ত শুনিয়া সে নিষ্ঠুরা নারী হাসিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল! আমার বুকে তখন আকাশের বাজ হাঁকিতেছিল, হাজার তোপ একসঙ্গে দাগিতেছিল, চোখে দুনিয়া মিলাইয়া যাইতেছিল!

যখন চেতনা হইল, তখন দেখি, জুয়ান্ বান্দার দল আমার চারিদিকে দাঁড়াইয়া। ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখি, শাহজাদা মহম্মদ আর এই শাহজাদী—সম্মুখে দাঁড়াইয়া। একটা রূঢ় স্বর কাণে গেল, "মট্টীমে গাড় ডালো—"

ব্যস! তারপর অন্ধকার, চির-অন্ধকার! কালো হাব্‌শী বাঁদী এই কালো মাটীর তলে মিশাইলাম। কিন্তু আলো,—ওগো সেই ক্ষণিকের আলো! এই কালো দেহের আঁধারে যে আলোর সন্ধান পাইয়াছিলাম—সেই যে সোহাগ, আদর, চুম্বনের শত সহস্র ধারায় যে আলোর লহর ছুটিয়াছিল, কৈ, কৈ, কোথায় সে! তাহারি একটা কণার সন্ধানে নিত্য আমি শুধু ঘুরিয়া মরি—কিছুই মেলে না ত! কত আশায় চারিধারে ঘুরিয়া মরি! শেষে নিশান্তে নৈরাশ্যের বোঝা মাথায় লইয়া ঐ মাটীর তলে আবার আমার আঁধার কারায় ফিরিয়া যাই!

আমার চোখের সম্মুখে সে বাগান কোথায় গেল, ঘর, দীঘি, দীঘির জল, শাহজাদা, শাহজাদী সব গেল, তবু আমার প্রাণে এ আশার যে আর বিরাম নাই! ওগো, যদি সব গেল, তবে এই আমার আশার রেশটুকুও নিবিয়া যাক্ না! আমারো এ আসা-যাওয়ার ছুটি হয় যে, সব ফুরায় যে, তাহা হইলে—"

তরুণী বসিয়া গুমরিয়া-গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি হতভম্বের মত তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। ইতিহাসের সাল-তারিখে-ভরা অলিগলির মধ্য দিয়া মনটা আমার সেই নিষ্ঠুর শাহজাদা মহম্মদকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল,—কোথায়, সে কোথায়?

হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল—চোখ চাহিয়া দেখি, বন্ধুর দল গায়ে বিষম ধাক্কা দিয়া ডাকিতেছে, "রাত হয়ে যাচ্ছে যে হে, ওঠো, ওঠো, তোমায় খুঁজে খুঁজে সব হায়রাণ। এখানে পড়ে ঘুমোচ্ছ, বাঃ! এসো, বাড়ী যাওয়া যাক্!

একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম,—মাথার উপর আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়াছে—চাঁদ যেন জ্যোৎস্নার বন্যা বহাইয়া দিয়াছে! সেই জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ী ফিরিলাম।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা

মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর পরিচয় সকলেই বিশেষভাবে অবগত আছেন। তদ্ভিন্ন 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিক পত্রে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। সম্প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথের লেখনী-প্রসূত আর একখানি সুন্দর পুস্তিকা বঙ্গভাষা অলঙ্কার-স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই অলঙ্কারখানির নাম 'মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা'। এখানি ক্ষুদ্র হইলেও হীরা মাণিক্য প্রভৃতি উজ্জ্বল রত্নে বিভূষিত, ইহার সবই সাচ্চা, ঝুটার নাম-গন্ধও নাই। তাই অধ্যাপক যদুনাথ ইহার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "ব্রজেন্দ্র বাবু যাহা সত্য তাহাই দিয়াছেন যাহা কাল্পনিক বা অসত্য প্রবাদ মাত্র তাহা নির্ম্মম ভাবে ত্যাগ করিয়াছেন।" ব্রজেন্দ্রবাবু চিরদিনই ঐতিহাসিক সত্যের পক্ষপাতী, মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা' পুস্তিকায় তিনি তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় তিনি নূতন নূতন ঐতিহাসিক তথ্য সমাবেশের চেষ্টা করিয়াছেন। তাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতেও তাঁহার গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

মোগলের অসূর্য্যম্পশ্য অন্তঃপুরে মহিলাগণ কিরূপে বিদ্যাচর্চ্চা ও শিল্প শিক্ষা করিতেন, এই গ্রন্থে তাহাই বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। পানিপথ ক্ষেত্রে মোগলের বিজয় নিশান উড্ডীন হইলে সমস্ত হিন্দুস্থানে যে নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, মোগলের অন্তঃপুরেও তাহার অভাব ঘটে নাই। তাই ভারত-বিজয়ী বাবরের মহীয়সী কন্যা গুলবদন্ বেগম হইতে আরঙ্গজেবের কন্যা ইতিহাস-প্রসিদ্ধা জেব্-উন্নিসা পর্য্যন্ত মোগল-অন্তঃপুর-রঙ্গিণীগণ কিরূপে জ্ঞানালোচনা শিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন, 'মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা' তাহারই পরিচয় দিতেছে। গুলবদন্ ও জেব্-উন্নিসার সহিত আমরা সলীমা, নূরজাহান, মমতাজ-মহল, জাহানারা প্রভৃতি ইতিহাস-বিখ্যাত মহিলাগণেরও পরিচয় পাইতেছি। যে সকল মহীয়সী মহিলা মোগল রাজদণ্ড পরিচালনের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানেও যে অতুলনীয়া ছিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ ছত্রে ছত্রে তাহা প্রতিপালনের চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। অসংলগ্ন তথ্য একত্র গ্রথিত করিয়া তাহাকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে ব্রজেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। এ গ্রন্থেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষা গ্রন্থখানিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। কঠোর ঐতিহাসিক তথ্যকে প্রীতিপদ করিতে হইলে যেরূপ লিখন ভঙ্গীর প্রয়োজন, ব্রজেন্দ্রনাথ তাহাও অবলম্বন করিয়াছেন, সেই জন্য গ্রন্থখানি সুখপাঠ্যও হইয়াছে। আমরা আশা করি সাধারণে গ্রন্থখানির সমাদর করিবেন। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই আমরা ইহার বহুল প্রচারের পক্ষপাতী। যাঁহারা বঙ্গ সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন, সেই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ইহার প্রকাশক, কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ইহার প্রাপ্তিস্থান। মূল্য দশ আনা।

শ্রীনিখিলনাথ রায়

নানা কথা। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা ৩নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উইকলী নোট্‌স্ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। স্বনামে ও বীরবলের ছদ্মনামে গ্রন্থকার নানা-পত্রিকায় যে সকল বিচিত্র সন্দর্ভ পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটি এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। এ সন্দর্ভগুলিতে সাহিত্য ও সমাজের নানা কথা আলোচিত হইয়াছে। সকল সন্দর্ভগুলিতেই যুক্তি

ও চিন্তাশীলতার অপূর্ব্ব সমাবেশ আছে—আর গ্রন্থকারের সতেজ সজীব ভাষা সমস্ত বক্তব্যটুকুকে একেবারে প্রাণের দ্বারে পৌছাইয়া দেয়। ভাব ও ভাষার এমন নিপুণ সমাবেশ বাঙলা সাহিত্যে অতি অল্প সন্দর্ভেই দেখা যায়। যে আলোচনায় ভাব ভাষা ও যুক্তি সুদৃঢ়ভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তাহার আবির্ভাবে শিক্ষিত চিন্তাশীল সমাজে রীতিমত সাড়া পড়িয়া যায়। গ্রন্থকারের এই সন্দর্ভগুলি যখন মাসিকপত্রে প্রথম বাহির হয়, তখন সারাদেশে বিপুল আন্দোলন উঠিয়া ছিল। সজীবতার ইহার চেয়ে আর কি প্রমাণ থাকিতে পারে। প্রথম সন্দর্ভ তেল নুন লকড়ি"তে লেখক স্বদেশী ও বিদেশী আচার-ব্যবহার প্রভৃতির কথা পাড়িয়াছেন। "কি উপায়ে কতদূর পর্য্যন্ত আমাদের সামাজিক দেহের আজ আকুঞ্চন করা কর্ত্তব্য, সেই সম্বন্ধে গোটাকতক কথা" তিনি বলিয়াছেন। বেশের সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "আমাদের স্বদেশী বেশের প্রধান দোষ যে, তা যন্ত্রণাদায়ক নয়। বিলাতী সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশ্বাস যে অহর্নিশি গলদ্ঘর্ম্ম হওয়াতেই সভ্য মানবজীবনের চরম সার্থকতা। সহজ বুদ্ধিতে যা দোষ বলে মনে হয়, বিলাতী সভ্যতার প্রতি অতিভক্তিপরায়ণ লোকের নিকট সেইটিই গুণ। ইংরাজি পোষাক যে নয়নের সুখকর নয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু ভক্তদের মতে সেই সৌন্দর্য্যের অভাবেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে ও বেশ পুরুষোচিত বেশ। আমাদের পৌরুষের একান্ত অভাববশত পুরুষ সাজবার ইচ্ছাটা অত্যন্ত বলবতী। কাজেই আমরা ইংরাজের অনুকরণে অন্য সব রং ত্যাগ করে, কাপড়ে ছাই পাঁশ মাটির রং চাপিয়েছি।" ইত্যাদি। কথাগুলি যেমন স্পষ্ট তেমনি নির্ভীক আবার তেমনি সত্য। ভাষার সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "আমরা যদি সংস্কৃতভাষার দ্বারস্থ না হয়ে ঘরের ভাষার উপরই নির্ভর করি, তাহলে আমাদের লেখার চাল স্বচ্ছন্দ হবে, এবং আমাদের ঘরের লোকের সঙ্গে মনোভাবের আদান-প্রদানটাও সহজ হয়ে আসবে। যদি আমাদের বক্তব্য কথা কিছু থাকে তাহলে নিজের ভাষাতে তা যত স্পষ্ট করে বলা যায়, কোন কৃত্রিম ভাষাতে তত স্পষ্ট করে বলা যায় না।" এ কথা যে কত দূর খাঁটি, তার্কিকের দল তাহা স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখিবেন। "ভাষার আড়ষ্ট ভাবটাই সাধুতার একটা লক্ষণ বলে পরিচিত। তাই বাঙ্গলা সাহিত্যে সাধারণ লেখকের গদ্য গদাই-লস্করি ভাবে চলে এবং কুলেখকদের হাতের লেখা জড়পদার্থের স্তূপ মাত্র হয়ে থাকে। এই জড়তার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, লেখাতেও মৌখিক ভাষার সহজ ভঙ্গীটি রক্ষা করা। কলিকাতার ভাষাকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন, "ঐ একটিমাত্র সহরে সমগ্র বাঙ্গলা দেশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এবং সকল প্রদেশের বাঙ্গালী জাতির প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে পরস্পরের কথার আদান-প্রদানে যে সব ভাষা গড়ে তুলেছেন, সে ভাষা সর্ব্বাঙ্গীন বঙ্গভাষা। সুতানুটি গ্রামের গ্রাম্য ভাষা এখন কলিকাতার অশিক্ষিত লোকেদের মুখেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আধুনিক কলিকাতার ভাষা বাঙ্গালী জাতির ভাষা আর খাস্-কলকাত্তাই বুলি শুধু সহরে Cockney ভাষা।" এই গ্রন্থে লেখক এত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন যে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। রচনার যে গুণটি সব-চেয়ে আমাদের চোখ পড়িয়াছে, সেটি ইহার বলিষ্ঠতা। ভাষায়, ভাবে, যুক্তিতে সব বিষয়েই একটা দার্ঢ্য বলিষ্ঠতা আছে; প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছুরির মত তীক্ষ্ণ। এ গ্রন্থ-পাঠে মানুষ চিন্তা করিতে শিখিবে, যুক্তি খাড়া করিতে শিখিবে—"সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো'—ইহাই যে সকল তার্কিকের মূলমন্ত্র, তাঁহারা একবার ভাল করিয়া এই গ্রন্থ পাঠ করুন,—চিন্তার সুবাতাসে মনের গোঁয়ার্ত্তুমি-ভাব দূর হইবে। বিক্ষিপ্ত সন্দর্ভগুলিকে একত্র সংগৃহীত করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যের উপকার সাধন করিয়াছেন, এজন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যানুরাগী সকলেরই ধন্যবাদেরই পাত্র।

ধূপ। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন, ১ চৌরঙ্গী কলিকাতা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। ইহার কয়েকটি

কবিতা পূর্ব্বে 'ভারতী' 'ভারত মহিলা' 'পরিচারিকা' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ধূপের কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা তৃপ্তি পাইয়াছি। এগুলিতে মৌলিকত্ব আছে—পুরাতন কবিতার অনুকরণ নয়। কবিতাগুলি মিষ্ট,—প্রকৃতি, দুঃখ, ভক্তি প্রেম প্রভৃতির বিচিত্র বন্দনায় সরস,—সেগুলিতে সলীল নৃত্য-ভঙ্গিমার সহিত ভাবের গাম্ভীর্য্যটুকু সুন্দর মিশ খাইয়াছে। কবিতাগুলিতে প্রাণ আছে। ভাবে স্নিগ্ধতা আছে। কবির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

উইলিযাম টেল বা সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা। শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন, বি, এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। ভারতী লাইব্রেরী, সিরাজগঞ্জ। কলিকাতা, ভারত মিহির যন্ত্রে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। 'নিবেদনে' উক্ত হইয়াছে "অষ্ট্রীয় শাসক বর্গ কিরূপ অমানুষিক অত্যাচারের সহিত সুইজার ল্যাণ্ড-বাসীদিগকে শাসন করিতেন এবং কিরূপে বীরশ্রেষ্ঠ উইলিয়ম টেল স্বীয় জন্মভূমি সুইজারল্যাণ্ডের উদ্ধার সাধন করেন, তাহার কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক একখানা ইংরাজী বই এর অনুবাদ। অনুবাদ স্থানে স্থানে ভাব অবলম্বনে করা হইয়াছে।" গ্রন্থখানি ছেলেদের পাঠোপযোগী; লেখা চলন সই।

ভারতবর্ষের ভাগ্য পরিবর্ত্তন। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস কর্ত্তৃক রচিত। প্রকাশক বি, কে দাস এণ্ড কোং, কলিকাতা। দাসপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। ঐতিহাসিক বিভাগে এ গ্রন্থখানির একটু বিশেষত্ব আছে এবং সেটুকু উপভোগ্য। গতানুগতিক ভাবে সাল তারিখের উপর দিয়াই রচনা গড়াইয়া চলে নাই। "সময়ে সময়ে ক্ষমতাপন্ন রাজা আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য রাজাদিগকে স্বীয় প্রতাপে বশীভূত করেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে আপনার অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন।" এই গ্রন্থে সেই সকল প্রধান প্রধান রাজবংশের উত্থান পতনের কথাই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। সাল তারিখে কণ্টকিত নয় বলিয়া ছেলে মেয়েরা এ গ্রন্থখানি সখ করিয়া পড়িবে—পড়িতে তাহাদের ভালও লাগিবে, পড়িয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানও তাহারা লাভ করিবে। এ গ্রন্থ পাঠে ছেলেমেয়েদের ইতিহাস পাঠে রুচি হইবে ইতিহাস পাঠের আকাঙ্ক্ষা বাড়িবে,—ইহা বড় সহজ লাভ নহে। এ গ্রন্থ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি।

পূর্ণযোগ। প্রকাশক, শ্রীরামেশ্বর দে, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, বোড়াইচণ্ডিতলা, চন্দননগর। মূল্য আট আনা। "মানুষে ভগবানের স্পর্শ—ইহারই নাম যোগ। ভগবান অর্থে যিনি যাহাই বলুন। লেখক বলেন "মানুষ হইতে বৃহত্তর উচ্চতর বিশ্বজনীন অথবা তুরীয় একটা কিছু জাগ্রত সত্তা এইটুকু স্বীকার করি। আবদ্ধ করিলেই যথেষ্ট। তাহার মতে এই সংযোগ এবং সম্বন্ধ স্থাপন হইতেই যোগ সাধন আরম্ভ। মানুষের মধ্যে যে শক্তি চায় মানুষকে পশুভাব মানুষভাব হইতে দেবভাবে তুলিয়া ধরিতে, তাহারই নাম যোগশক্তি এবং সেজন্য যে পথে চলিতে হয়, জীবনকে গড়িতে হয়, চালাইতে হয় তাহারই নাম যোগ সাধনা। এই বিষয়টি খুব সহজ করিয়া বুঝাইয়া লেখক হঠযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগ প্রভৃতির মূল সূত্র প্রভৃতির আলোচনা করিয়া পূর্ণযোগের কথা তুলিয়াছেন। লেখকের মতে, "মানুষের যে স্থূলজীবন, ব্যক্তিহিসাবে জাতিহিসাবে বিশ্বমানব-হিসাবে তাহার যে ঐহিক প্রয়াস সে সমস্তকেই দিব্যভাবে ভরিয়া দিতে হইবে, একটা বিরাট বিপুল আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, এসকলকে অখণ্ড সামঞ্জস্যে বিধৃত পুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাই পূর্ণযোগ। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা লেখকের বিদ্যাবত্তা, ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছি।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হর পার্বতী

৪৩শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩২৬ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রশ্ন

শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল।

তখন সাত বছরের ছেলেটি—গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ,—একলা গলির উপরকার জান্‌লার ধারে,

কি ভাবচে তা সে আপ্‌নি জানেনা।

সকালের রৌদ্র সাম্‌নের বাড়ির নীম গাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে;

কাঁচা-আমওয়ালা গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

বাবা এসে খোকাকে কোলে নিলে; খোকা জিজ্ঞাসা করলে, "মা কোথায়?"

বাবা উপরের দিকে মাথা তুলে বল্লে, "স্বর্গে।"

সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ,

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুম্‌রে উঠ্‌চে।

দুয়ারে লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড়া টিক্‌টিকি।

সাম্‌নে খোলা ছাদ, কখন্ খোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল।

চারদিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো যেন দৈত্যপুরীর পাহারা-ওয়ালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্চে।

উলঙ্গগায়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে।

তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করচে, "কোথায় স্বর্গের রাস্তা?"

আকাশে আর কোনো সাড়া নেই;

কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অক্ষমতা

মানুষ সমুদ্র পার হয়েচে, পর্ব্বত ডিঙিয়ে গেচে, পাতাল পুরীতে সিঁধ কেটে মণি মাণিক চুরি করে এনেচে, কিন্তু একজনের অন্তরের কথা আরেকজনকে চুকিয়ে দেওয়া, এ কিছুতেই পারলেনা।

আজ মেঘলা দিনের সকালে সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপ্‌টে মরচে। ভিতরের মানুষ বল্‌চে, "আমার চিরদিনের আপন কোথায়, যে আমার শ্রাবণ-মেঘকে ফতুর করে তার সকল বৃষ্টি কেড়ে নেবে!"

যা-কিছু দেখি শুনি, তারা চোখের কানের দেউড়ি পেরিয়ে চলে যায় ভিতর মহলে; সেখানে অদৃষ্ট ছবিতে অশ্রুত গানে গাঁথা পড়ে। মনের সেই না-দেখা না-শোনা জগৎ বলে, "আমি দেখা-শোনার দেশে ধরা দেব।" রোজই বলে, কিন্তু কাজের গোলমালে সে কথা কানে পৌঁছয়না।

আজ মেঘলা সকালে শুন্‌চি, সেই ভিতরের কথাটা বন্ধ দরজার শিকল নেড়ে সারা হল। ভাবচি, "কে আছে যার ডাকে কাজের বেড়া ডিঙিয়ে এখনি আমার বাণী সুরের প্রদীপ হাতে বিশ্বের অভিসারে বেরিয়ে পড়বে?"

আজ মেঘলা সকালে মন বল্‌চে, "আমার কাছে ঠিক মন্ত্রটি বলে' যে চাইতে পারে আমি তাকেই কেবল দিতে পারি। সেই আমার সর্ব্বনেশে ভিখারী রাস্তার কোন্ মোড়ে? যদি সে আমার দুয়ার খুঁজে না পায়, হাত বাড়িয়ে না দাঁড়াতে পারে, তাহলে কি আছে আমার তা নিজেই জান্‌বনা, কাউকে জানাতেও পারবনা। কেবলি বইব, কোথাও পৌঁছে দেবনা, কি চিরদিন সইতে পারি?"

তাই আজ আমার কাজে মন নেই। আজ আমার ভিতরের আকাশে অম্‌নিতর অকেজো মেঘ অম্‌নিতর অকারণ হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্চে। তাদের নানা মূর্ত্তি, তাদের নানা খেলা; তারা নানা বিদ্যুতে চমক দেয়, নানা বজ্রে বাজে, নানা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায়;—কিন্তু তাদের অন্তরে অন্তরে আমার জীবন-জোড়া একটি মাত্র বৃহৎ কান্না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কোট্‌রা

ডাঙায়

মীরবহর ঘাটের কাছে মহাজন-পটি থেকে কাঠগোলা পর্য্যন্ত বাঁশতলার গলি আঁকা-বাঁকা, সরু, অন্ধকার, নর্দ্দমার পাঁক আর কাদায় পিছল। দুধারে চারতলা পাঁচতলা বাড়ির দেওয়াল সোজা উঠেছে; জানলা নেই, বারাণ্ডা নেই, পায়রার খোপের মতো এখানে-ওখানে দু-একটা কেবল ঘুলঘুলি, তার থেকে ময়লা চটের পর্দ্দা ঝুলছে। মুটে-মজুর, গরীব ফেরিওয়ালা, দোকানী-পশারী- এরাই সব এখানে থাকে অল্প ভাড়ায়। বাড়িগুলোর একতলায় মুদির দোকান, কাফিখানা, মদের আড্ডা, চালের আড়ৎ, ফল-ফুলুরীর বাজার—এমনি সব দু সারি। রাস্তায় সারি-সারি গোরুর গাড়ি দিনরাত চলেছে; ভদ্রলোক মোটেই চলেনা; যত কুলী-মজুর বদমাস-গুণ্ডা,—কেউ লাঠি, কেউ ছেঁড়া কম্বল, কেউ খালি ঝুড়ি নিয়ে চলাচল করছে। মাসের পয়লা, তাই আজ বাড়িওয়ালা মাড়োয়াড়ি দুচার জন গরীব ভাড়াটেদের কাছে ভাড়া আদায় করছে, আর যারা অনেক দিনের ভাড়া বাকি ফেলেছে সেই সব নিরুপায় লোকগুলোকে স্ত্রীপুত্র নিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিতে হাজির হয়েছে। কেউ এপাড়া থেকে ওপাড়ায় উঠে যাচ্ছে—ছেলে-কোলে বাক্স-মাথায়; কেউ একটা গোরুর গাড়িতে ভাঙা-চোরা ফুটো-ফাটা মাদুর, তক্তা, ময়লা কাঠের সিন্দুক, ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ি বোঝাই করে চলেছে,—এক আঁটি খড় কিনে যে ঢেকে-ঢুকে যত্ন করে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাবে এমন পয়সা তাদের নেই। এমনি অযত্নে এপাড়া-ওপাড়া এবাড়ি-ওবাড়ি এ-সিঁড়ি ও-সিঁড়ি এ-ঘর ও-ঘর করতে-করতে, এই সব একে ভাঙা জিনিষ ক্রমে আরো-ভাঙা, আরো-ময়লা আরো-পুরোনো হচ্ছে দিনে-দিনে। সন্ধ্যে বেলাতেই রাস্তায় আলো জ্বেলেছে, কিন্তু এমন ধোঁয়া আর ধুলো যে আলো মিট্‌মিট্ করছে। জলে-কাদায়-পিছল রাস্তায় একটা-একটা জায়গা দোকানের আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করছে—আর সব অন্ধকার। আলো-আঁধারের মধ্যে দিয়ে লোকগুলো হন্‌হন্ করে চলেছে কোথায় যে তার ঠিকানা নেই। এই গলির মধ্যে একটা কাফিখানায় মাল্লা মাচারু আর সুঁদরী কাঠের ব্যাপারী মোটাপেট চামারু, দুজনে সবুজ আর লাল কাঁচের দুটো বোতল নিয়ে বসেছে। মাচারু একগাল হেসে বল্লে—"তাহলে নৌকোতে যত কাঠ বোঝাই আছে এই দামেই তো লেবে?" চামারু ঘাড় নেড়ে বল্লে—"বহুত আচ্ছা, তাই হবে।"

দোষ নেই এমন মানুষ কোথায়! মাচারু লোক ভালো, কেবল আরক এক-আধ বোতল ঢক্-ঢক্ করে যে না খেত এমন নয়; কিন্তু তাই বলে মাতাল হতে কেউ তাকে দেখেনি। আর মাতাল হবার জো কি?—তার বৌ ঝুমনী বড় কড়া

গিন্নি! মাচারুর পা যাতে না টলে সেদিকে যেমন, ব্যাপারীগুলো তাকে ঠকিয়ে না নেয় সেদিকেও তার তেমনি নজর ছিল; তবে রোদে জলে সারাদিন খেটে যদি মাচারু কোনোদিন একটু-আধটু আরক খেয়ে তেষ্টা ভাঙ্‌তে চাইত তাতে মানা ছিলনা।

আরকের গুণে মাচারুর চোখ ক্রমেই লাল আর ঘোরালো হয়ে এল; সেইসঙ্গে মালগুলো দাঁও-মাফিক বেচে মনটাও তার ক্রমে দরাজ হতে থাকলো; আর পাওনার হিসেবগুলো মাথার মধ্যেটা তার বেশী করে ঘুলিয়ে দিতে চল্লো! চামারু দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"তবে কাল ভোরেই কাঠগুলো ফিরিস্তি করে গোলাতে তোলাই ঠিক?"

মাচারু জড়িয়ে বল্লে—"খুব ঠিক; কোনো ভাবনা নেই।"

"রাম রাম ভাই!" বলে দুই বন্ধু রাস্তায় বেরিয়ে যে যার ঘরে চল্লো।

মীরবহর ঘাটে বাঁধা নৌকোটা হচ্ছে মাচারুর ঘর-বাড়ী, কাঠের গোলা, আফিস, আফিস-গাড়ি সমস্তই; নৌকোখানা ভারি পুরোণো হয়ে প্রায় অচল হয়েছে এই যা দুঃখ। এবার যে দাঁওটা মারা গেল, এমনি আর দু-এক ক্ষেপ কাঠের চালান বেচতে পারলেই পুরোনো নৌকোর জায়গায় একটা নতুন নৌকো হতে পারবে, এই ভাবতে ভাবতে মাচারু গঙ্গার দিকে চলেছে—বুক ফুলিয়ে, কোমর দুলিয়ে। যেতে-যেতে মাচারু দেখলে, একটা বাড়ির দরজায় গোটা-কতক লোক জড়ো হয়েছে, হাত পা নাড়ছে, কথা-বলা-বলি কচ্ছে, পুলিসের এক বাবু কাগজ-পেন্সিলে কি কি লিখে নিচ্ছে। স্রোত যেখানে বাধে, সেখানে যেমন যতো কুটো-কাটা এসে জমা হয়, তেমনি গলির এইখানটাতে লোক ক্রমেই জমা হচ্ছিল। একটা কুকুর চাপা পড়লো বা গাড়ির চাকা ভেঙে পড়ে সরকারি রাস্তা লোকসান করলে, কি একটা মাতাল বা খানায় পড়ে পাঁকে ডুবে মলো—এই ভাবতে-ভাবতে মাচারু রাস্তার ওধারটায় গিয়ে দেখে, একটা অন্ধকার বাড়ির দরজায় একটা ঝাঁকড়া-মাথা এতটুকু ছেলে ধুলো কাদা আর মুখে-হাতে খানিক চিটে গুড় মেখে বসে দুই চক্ষের জলে ভেসে যাচ্ছে; আর পুলিসের বাবু গম্ভীর হয়ে তাকে এক-একটা সওয়াল কচ্ছেন আর জবাবটা কাগজে টুক্‌ছেন!—"নাম কি?" "নোটো।" "নটবর না নটবেহারি?" ছেলেটা কোনো উত্তর দিলেনা;—'এ মায়ি!' বলে কেঁদেই অস্থির। একটা মজুরনী ছুটো ছেলের হাত ধরে টানতে-টানতে এসে বল্লে—"রহুন বাবু, আমি একবার পুছ্‌ করে দেখি।" তারপর ছেলেটাকে কোলে নিয়ে আঁচলে তার নাক-মুখ মুছিয়ে দুগালে চুমু দিয়ে শুধোলে—"তেরা মায়িকা নাম বোলো বেটা!" ছেলেটা শুধু ঘাড় নাড়লে। এই সময় বাড়িওয়ালি-বুড়ীকে দরজায় দেখে পুলিশবাবু তাকে শুধোলেন, সে কিছু জানে কি না। বাড়িওয়ালি জবাব দিলে—"কে জানে বাবা? কত ভাড়াটে আসে যায়, নাম মনে নেই। তবে এই একতালার ঘর-খানায় একমাস ছিল ওরি বাপ মা। একটি পয়সা ভাড়া দেয়নি। কাজ তো কি করতো জানিনে, তবে রোজ সন্ধ্যেবেলা ছুটোতে

গালাগালি চুলোচুলি করতো আর ছেলেগুলোকে ধরে-ধরে পেটাতো, তার মধ্যে বড় ছুটো ছেলে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতো, ওর মধ্যে এই ছেলেটা ছিল ভালো, তাই এটাকে তারা ফেলে গেছে।"

পুলিশ-বাবু বল্লে—"ছেলেটাকে তুমি রাখো,—যদি তারা খুঁজতে আসে।"

"পোড়াকপাল! তারা আবার ওর খোঁজ নেবে? একটা পেট কমে গেল না তারা বাঁচলো! আর-ছুটো ছেলেকেও হয়তো কোন্ দিন মেরে নর্দ্দমায় ফেলে দেবে। এমন তো রোজই গলিতে গলিতে হচ্ছে!"

এই ছেলের বাপ-মাকে কেউ যাবার সময় দেখেছে কি না, পুলিশ-বাবু শুধোলে। সামনের বাড়ির মেথরাণী বলে উঠলো—"হাঁগো বাবু-সাহেব, মরদটা একটা টিনের পেটারি নিয়ে আর তার বৌ একটা ঝুড়িতে কি-সব নিয়ে আগে গেল। সঙ্গে বড় ছেলে ছুটো একটা বেরাল-ছানার গলায় দড়ি দিয়ে টান্‌তে-টান্‌তে চল্লো হাম দেখা। আরো বহুত আদমি দেখিস্, লেকেন কোই কুছ্ না বোলিস্! ও তো তামাম্ দিনভর্ ওখেনে বোসে রয়েছে বাবু! ভুখ যেমন লাগলো ওই রাস্তার ওধারে দোকানী একটা বাতাসা দিলো, আবার এখন ভুখ্ লেগেছে তাই চিল্লাচ্ছে।"

লোটো যে শুধু ক্ষিধের জ্বালাতেই কাঁদছিল তা নয়; ভয়েতেও বেচারা সারা হচ্ছে—রাস্তার খেঁকি কুকুরটা তার গা শুঁকে বেড়াচ্ছিল এতক্ষণ। রাত্তির আসছে সে ভয়ও একটা রয়েছে; তার উপর সব অচেনা লোকের মুখ। বুকের মধ্যে লোটোর প্রাণ-পাখীটি এই সব দেখে-শুনে ভয়ে যেন ধড়্‌ফড়্ করছে, উড়ে পালাতে চাচ্ছে।

বাজে লোকের ভিড় ক্রমেই বাড়ছে দেখে পুলিশের বাবু ছেলেটাকে নিয়ে বল্লেন—"কেউ যদি এ ছেলেটাকে চাও তো বল বাবু এইবেলা, না হলে আমি একে থানায় নিয়ে চল্লুম।" সেই সময় মাচারু হাসতে হাসতে এসে বল্লে—"থানায় যাবে কেন? গরীব বলে কি ওর কেউ নেই নাকি? আমি নেবো, আন ছেলেটা আমায়।"

ছেলেটা থানায় যায় এটা কারুর ইচ্ছা নয়—যদিও কেউ তাকে নিয়ে মানুষ করতে একেবারেই নারাজ ছিল। সবাই "সাবাস, আচ্ছা কিয়া!" বলে উঠল। মাচারু-বুড়ো একেই আরক খেয়ে দিলদরিয়া, তার উপর লোকে তাকে বাহবা দিতে থাকলো, সে বুক ফুলিয়ে বল্লে—"এতগুলো ছেলে-মেয়ে আমার, বৌ এই একটা ছেলে মানুষ করতে পারবে না!" এই বলে মাচারু পুলিশ-বাবুর সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে দারোগার কাছে চল্লো—যোড়াবাগান থানায়। সঙ্গে তার কতক লোক ভিড় করে মজা দেখতে এল।

দারোগা দস্তুরমতো মাচারুকে তার নাম-ধাম শুধোতে লাগলেন। মাচারু বল্লে—"নাম মাচারু, মশায়! আমার বিয়ে হয়েছে; সে খুব চালাক মেয়েমানুষ, আমিই বরং তার কাছে বোকা বনে যাই! আর হুজুর যদি তাকে দেখতেন তবে বুঝতেন সে পাকা মেয়েমানুষ বটে!" একেই আরক খেয়েছে, তার উপর দাঁওমাফিক সওদা শেষ করে আর এই ছেলেটাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে মাচারু একেবারে

বে-পরোয়া! যা-তা বকে যেতে লাগলো দারোগার সামনে। দারোগা শুধোলেন—"তোমার পেশা?" "হজুর আমি লৌকোর মালিক, মাল্লা, কর্ত্তা। এক দাঁড়ি কিস্তি কাঠ চালান দিই। লৌকোর নাম—কোট্‌রা। এখান থেকে আমাদের জঙ্গল পর্য্যন্ত দুপারের লোক কোট্‌রা আর মাচারু মাঝিকে চেনে!" মাচারুর রকম দেখে লোকগুলো যতই হাসতে লাগলো সে ততই বকে যেতে লাগলো।

"হজুর যদি একবার আসামে চলেন তো দেখবেন কেবল শাল আর সুঁদরীর বন; কেবল চকোর কাঠ,—একএকটা মোটা এই হজুরের বেড়া হবে। গাছ আমি এমন চিনি যে দেখিছি কি বলে দিয়েছি গাছের বয়েস কত। এই এমনি করে দড়িগাছটা চার-দিকে একপাক—দুপাক—তিনপাক জড়িয়ে গাছটার বেড় মেপে নিয়ে হিসেব করতে বসি।" বলেই মাচারু গাছ-মাপার দড়িটা একটা পাহারোলার কোমোরে ধাঁ করে তিন পাক কসে জড়িয়ে ফেল্লে। পাহারোলাটা বলে উঠলো—"দেৎতেরি! ক্যা করতা? ছোড়ো!" মাচারু গম্ভীর হয়ে বল্লে—"বোসনা বাপু, দারোগা-মশায়কে দেখাই গাছটা কেমন করে মাপা হয়। জানেন হজুর, তিনপাক দিয়ে যে ক-হাত হলো তাকে আর ক-হাত দিয়ে—কিজানি আমার বৌ সে কাটাকালি হিসেব করে গাছটা ঠিক কত বছরের বলে দিতে পারে। জুমনীটা ভারি হিসেবি মেয়েমানুষ, হজুরের দপ্তরে মহুরী হবার লায়েক!"

মাচারুর রকম দেখে দারোগা-সুদ্ধ হেসে অস্থির! তিনি বল্লেন—"ছেলেটা নিয়ে তুই করবি কি?"

মাচারু বল্লে—"ওকে কি আর চাকরী করাবো? আমাদের বংশে কেউ চাকরী করেনি। ওকে মাল্লাগিরি শেখাবো, ব্যাপার করবে।" "তোর নিজের ছেলে-পুলে নেই বুঝি?" "ছেলে আবার নেই হজুর! মা ষষ্ঠীর আশীর্ব্বাদে বড় মেয়েটি চলতে শিখেছে, তার পরের ছেলেটা এখনো দুধ ছাড়েনি, আর আর-একটি আসছে। আর এটিকে নিয়ে হল—এক, দুই, তিন, চার। একরকম ঠাসাঠাসি করে লৌকোর খোলের মধ্যে কুলিয়ে যাবে। খরচের একটু টানাটানি হবে, একটু চড়া দরে এবার থেকে কাঠ বেচবো, আর না-হয় বুঝে-সুঝে কম-সম করে খাওয়া-দাওয়া করবো, তাহলেই সব দিক কুলিয়ে যাবে।"

মাচারুর হিসেব শুনে সবাই হাসতে লাগলো। দারোগা তার সামনে একটা খাতা দিয়ে বল্লেন,—"সই কর্।" মাচারু লেখা-পড়া কোনো দিন শেখেনি, কাজেই খাতার পাতায় মস্ত একটা ঢেরা টেনে তার পাশে বুড়ো-আঙুলের ছাপ দিয়ে দিলে। দারোগা নোটোকে মাচারুর কাছে দিয়ে বল্লেন—"এ ছেলের দায়ী তুমি রইলে, যদি এর মা-বাপ খোঁজ করে তোমাকে হাজির কোরে দিতে হবে। তোমার বৌ খুব চালাক বল্লে না? তারি কথা-মাফিক চোলো। আর দেখ, বেশি আরক আর খেওনা। যাও!"

লোকগুলো যে-যার চলে গেছে, অন্ধকারে থানা থেকে নোটোর হাত ধরে বেরিয়ে এসে মাচারু একবার ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চারিদিকে

চাইলে। কেউ কোথাও নেই, কেবল ছেলেটা তার পাশে। মাচারুর বুক দমে গেল। ছেলেটাকে নিয়ে সে করবে কি? নিজেরাই খেতে পায়না তার উপর একটা পরের ছেলে ইচ্ছে করে ঘাড়ে নেওয়া যে কতটা মুখ্‌খুমি এবার মাচারু বুঝলে। হাজার লোক রাস্তা দিয়ে যায়-আসে, কেবা কার খোঁজ রাখে? পরের ছেলেটার জন্তে তারই বা এত মাথা-ব্যথা কেন? সোজা গিয়ে নৌকোয় উঠলেই হতো! এ ছেলেটাকে নিয়ে নৌকোতে গেলে জুম্‌নী তাকে কি-রকম খাতিরটা যে করবে, সেটা ভাবতেই মাচারুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো! ঘরে যেতেও মাচারুর মন সরছে না, এইরাতে থানায় গিয়ে যে আবার সে দারোগাকে বিরক্ত করবে সে সাহসও নেই। মাচারু নোটোকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে বিড়-বিড় করে আপনার মনেই বকতে-বকতে আর জুম্‌নীকে গিয়ে কি বলবে সেটাও আঁচতে-আঁচতে চল্লো। নোটো কাদায় হাঁটতে থেকে-থেকে পড়ে যাচ্ছে; তখন মাচারু মুস্কিলে পড়ে তাকে কোলে নিয়ে নিজের চাদর দিয়ে জড়িয়ে হন্‌হন্‌ করে ঘাটের দিকে চল্লো। নোটো যখন ছোট হাতদুটি দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলে, তখন মাচারুর মনটা যেন কতক হাল্কা হয়ে গেল।

সে ভাবলে না হয় জুম্‌নী যদি বলে তো কাল ছেলেটাকে থানায় ফিরিয়ে দেবো, আজ রাতটা তো ছেলেটা কিছু খেয়ে আর ঘুমিয়ে বাঁচবে! ভাবতে-ভাবতে হাবড়ার পুলের ধারটিতে যেখানে জলের উপরে তার পুরোনো কোটরা-খানি ভাসছে, মাচারু সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। নতুন-কাটা সুঁদরী আর শাল কাঠের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সারি-সারি নৌকো জলের ধারটিতে কালো ছায়া ফেলে আস্তে-আস্তে হেল্‌ছে দুলছে। বাঁধা নৌকোর লণ্ঠনগুলো ঢেউয়ের তালে-তালে দোল খাচ্ছে আর শিকলি-গুলো এটায় ওটায় লেগে এক-একবার কড়্‌কড়্‌ শব্দ করছে। দুখানা গাধা-বোটের উপর দিয়ে পাতা সরু তক্তায় ভয়ে-ভয়ে পা ফেলে নোটোকে কোলে নিয়ে মাচারু আস্তে-আস্তে চল্লো। অন্ধকার হয়েছে; কেবল কোট্‌রার ছোট আলোটা বন্ধ-ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে জলের বুকে সরু একটু সোনালি আভা ফেলেছে। জুমনীর গলা শোনা গেল, উনুনের ধার থেকে মেয়েকে ধমকাচ্ছে—"চেচ্চাস কেনরে লছমিয়া?" আর এখন ফেরার উপায় কি! মাচারু আস্তে-আস্তে নৌকোর পর্দাটা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। জুমনী উল্টোদিকে মুখ করে ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক করে পেঁয়াজের তেল-ফুলুরী ভাজছিল; সে মুখ না ফিরিয়ে শুধোলে—"এত রাত যে?" ফুলুরীর গন্ধ আর উনুনের ধোঁয়া এসে মাচারুর মুখে লাগলো, সে আস্তে-আস্তে নোটোকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে। আগুনের তাত আর ফুলুরীর গন্ধ পেয়ে নোটো বলে উঠলো—"বেশ গরম!" জুমনী ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের মধ্যে নোটোকে দেখিয়ে মাচারুকে শুধোলে—"এ কে?"

মাচারু খানিক ঢোক্ গিলে বল্লে—"তোমার জন্তে একটা নতুন সামিগ্রি এনেছি।" বলেই মাচারু একমুখ কাষ্টহাসি হাসলে; কিন্তু তার মন বলতে লাগলো

নৌকোতে পা না দিলেই ভালো ছিল। ওদিকে জুমনী হাতা-হাতে কটমট্ করে চেয়ে আছে। তখন বেচারা মাচারু আস্তে-আস্তে ভয়ে-ভয়ে সব কথা বলে বল্লে—"আহা ওর কেউ নেই, রাস্তার বসে কাঁদছিল, কেউ নিতে চায়না, শেষ আমিই নিলুম, দারোগাও বল্লেন নিয়ে যাও। কেমনরে বল্‌না, দারোগা বল্লেনা তোকে নিয়ে আসতে?" এইবার জুমনী একেবারে ঝড় বইয়ে দিলে—"তুমি মাতাল না পাগল! এমন কাণ্ডতো কখনো দেখিনি! আমরা আধপেটা খেয়ে মরি এই বুঝি তোমার ইচ্ছে? তোমার সিন্দুক-ভরা টাকা আছে না মস্ত কোটাবাড়ি আছে যে রাস্তা থেকে ছেলে এনে পুষ্‌বে!"

মাচারুর আর কথা নেই, কেবলময়লা কাপড়টা দিয়ে মুখ মুচছে। "নৌকো-খানাতো ফুটো ঝরঝরে! সেটা সারাবার নাম নেই, স্ত্রীপুত্তুর খায় কি সে খবর নেই, বাবু-আনা করে ছেলে পুষতে চাচ্ছেন! তাও আবার পরের ছেলে, কোথাকার কে তার ঠিক-ঠিকানাই নেই!"

পরের ছেলে আর তার যে কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই মাচারু তা বেশ জানতো। সে চোরের মতো চুপটি করে সব শুনতে লাগলো। জুমনী বল্লে—"এখনি ছেলেটাকে থানায় দিয়ে এসো। দারোগা কিছু শোধালে বলবে জুমনী পরের ছেলে মানুষ করতে পারবেনা,—বুঝলে?" জুমনীকে হাতা-হাতে এগিয়ে আসতে দেখে মাচারু বল্লে—"যা বল্লে তাই হবে; আমারি ভুল, মরতে ছেলেটাকে এনেছি। এখনি কি থানায় দিয়ে আসবো?" মাচারু নরম হল দেখে জুমনীর রাগ পড়লো;—হয়তো বা নোটোর শুক্‌নো মুখটি দেখে তার মায়ের প্রাণে একটু ভয় জাগালো—কোন্ দিন হয় তো তার ছেলে-মেয়ে এমনি করে রাস্তায়-রাস্তায় অনাথ হয়ে পেটের দায়ে ভিক্ষে করবে সে-সময়ে যদি কেউ তাদের না দুমুটো খেতে দেয়? জুমনী ঘুরে বসে কড়ায় ফুলুরী ভাজতে-ভাজতে বল্লে—"এই রাতে আর ছেলেটাকে কোথায় ফেলবে, আজ থাক্, কিন্তু কাল সকালে…" বলেই জুমনী উনুনে এক খোঁচা দিয়ে কয়লাগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে বল্লে—"...নিশ্চয় ওকে বিদেয় করবো, বুঝলে?"

মাচারু চুপ করে রইল। জুমনীও একটা কাঁসিতে ফুলুরীগুলো ঝেড়ে ফেলে কোমর-বেঁধে হাঁড়ি থেকে ডাল ভাত গোছাতে বসলো। ধমক ধামক শুনে লছমিয়া চুপ হয়ে গিয়েছিল; জুমনীর ছোট ছেলেটাও একধারে কাঁথায় মুখ লুকিয়ে চুপচাপ্ পড়েছিল; আর নোটো মাঝখানে পা ছড়িয়ে হাঁ-করে বসে ভাবছিল—কি হচ্ছে এ সব! জুমনী ভাত আর ডাল কাঁসিতে ঢেলে মাচারুকে ডাক দিলে—"খেয়ে নাও।" তার পর থাবা-থাবা ডালমাখা ভাত নোটোর নাকে-মুখে গুঁজে দিতে লাগলো। নোটোর খাওয়া দেখে জুমনী অবাক্ হয়ে গেল। তার নিজের ছেলে-মেয়েকে ফেলে সে কেবল নোটোকেই খাওয়াতে ব্যস্ত রইল। বেচারা কত দিন ডাল-ভাত খেতে পারনি; খেয়ে পেটটি ধামা করলে। এমন করে চেঁচেপুঁছে তার

নিজের ছেলে-মেয়েটা যদি খেতে পারতো তবে আর ভাবনা ছিল না। মাচারু কিন্তু মনে-মনে নোটোর খাওয়া দেখে কেবলি ভয় পেতে লাগলো—কাল জুমনী এটাকে বিদেয় করবেই করবে! সে আর কথাটি না, মুখ-গুঁজে খেয়ে চল্লো। খাওয়া হলে জুমনী নোটোকে টেনে নিয়ে বেশ করে হাত-পা ধুইয়ে দিলে। নোংরামি জুমনী আদপে দেখতে পারত না। সাফ-সোফ করে দিতে নোটো যেন ভদ্রলোকের ছেলেটি দেখালো। জুমনী একটু খুসি হয়ে বল্লে—"ছেলেটির বয়স কত গা?"

মাচারু এইবার একটু কথা বলবার সুবিধা পেয়ে হুঁকো-কল্‌কেটা তাড়াতাড়ি একধারে রেখে বল্লে—"রোসো, কত বয়েস এখনি বলে দিচ্ছি।" বলেই মাচারু গাছ-মাপা দড়িটা নিয়ে নোটোকে ঝাঁ-করে জড়িয়ে ফেল্লে। জুমনী অবাক হয়ে শুধোলে—"ও কি হচ্ছে?"

মাচারু গম্ভীর হয়ে বল্লে—"মাপছি এটা কত বড়!"

জুমনী দড়িগাছটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বল্লে—"এ কি গাছ পেলে যে দড়ি দিয়ে মাপতে চলেছো? তোমার বুদ্ধিকে ধন্যি! যাও ওকে ঘুমোতে দাও, পাগলামি করোনা বলছি।" মাচারুর অদৃষ্ট মন্দ; সে আস্তে-আস্তে নিজের মাদুরে চাদর-মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো।

জুমনী নোটোকে লছমিয়ার বিছানায় শুইয়ে গোটা-কুড়ি ফুলুরি চিবোতে বসলো। লছমিয়া হাত মুঠো করে ঘুমচ্ছে—কাঁথাটি জুড়ে; ঘুমের ঘোরে বোধ করলে কি যেন পাশে এলো, সে একবার নোটোর চোখের উপর একটা হাত ফেল্লে, তার খানিক পরে বুকের উপর এক লাথি বসিয়ে অন্য পাশে ঘুরে শুলো। জুমনী ফুলুরীগুলো শেষ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। নদীর ঢেউ নৌকোখানিকে একটি দোল্‌নার মতো দোল দিতে থাকলো, নদী কুল্‌কুল্ করে কি যেন ঘুম-পাড়ানো ছড়া বলতে লাগলো, ঘুমে নোটোর চোখ ঢুলে পড়লো আর সেই অন্ধকারে জুমনী আস্তে-আস্তে তার গায়ে হাত বুলতে লাগলো। নোটো সকালে ডাঙায় থেকেও যেন অগাধ জলে পড়েছিল; এখন জলের উপরে এসে সে যেন ডাঙা পেয়েছে মনে হচ্ছে।

জলে

এতটুকু বটে, কিন্তু ঘুম লছমিয়ার সব-আগে ভাঙ্‌তো। ইষ্টিশানের পাঁচটার গাড়ি ছেড়েছে কি সে আজ চোখ মেলেছে। দেখে মা কাছে নেই, তার জায়গায় আর-একটা ঝাঁকড়া মাথা। লছমি দুহাতে চোখ রগ্‌ড়ে থপ্ করে পাশের মাথাটার চুল-গুলো মুটিয়ে ধরে এক টান দিলে। নোটো হঠাৎ জেগে উঠে বোধ করলে, কে তার ঘাড়ে শুড়শুড়ি দিচ্ছে, নাকটা খাম্‌চাচ্ছে। স্বপ্ন দেখছে ভেবে নোটো চারিদিক চাইতে লাগলো। এত-বড় স্বপ্ন সে কোনো দিন দেখেনি—সেই এক সকাল থেকে আরম্ভ হয়ে আর-এক সকাল পর্য্যন্ত চলছে স্বপ্নটা! মাথার উপরে নৌকোর ছাদের উপর ধুপ্‌ধাপ্ দুম্‌দাম্ মাল-নামানো আর মানুষদের চলে বেড়ানোর শব্দ

হচ্ছে। লছমিয়াও একটু অবাক হলো। এ কোথায় এসেছি, ও কিসের গোল যেন শুধিয়ে সে একটি ছোটো আঙুল ছাদের দিকে তুলে নোটোর মুখে চাইলে।

ভোর না হতেই কাঠের ব্যাপারী চামারু মাল নিতে এসেছে। মাচারুও আজ এমন কোমর বেঁধে মাল-নামানোর কাজে লেগেছে যে যেন তার কথাটি কবার সময় নেই—বিশেষত জুমনীর সঙ্গে। বেচারা মাচারু সকালে উঠেই নোটোকে নিয়ে দারোগার কাছে যেতে হবে ভেবে রাতের মধ্যে একটি-বার চোখ মোদেনি। মাচারু ভেবেছিল সকালে উঠেই জুমনী খিচিখিচি বাধাবে, কিন্তু কে জানে জুমনী কি ভেবেছিল, সে নোটোর নামটি পর্য্যন্ত করলে না। রেহাই পাবেনা মাচারু জানতো, তবু খানিকটা ফুরসুৎ পাওয়া গেল—সেই লাভ ভেবে সে দোমারে হাঁক ডাক এটা-ওটা-সেটা করতে থাকলো—জুমনীর কাছ থেকে যতটা পাবে দূরে দূরে। জুমনী যেন নোটোর কথা বলবার ফাঁক না পায় তাই মাচারু কাজে আজ আর কামাই দিচ্ছে না। মাল-নামানো কাজ আজ হু হু করে চলছে। নৌকার বোঝা ক্রমেই হাল্কা হচ্ছে। চামারু তিন ক্ষেপ মাল গাড়ি-বোঝাই করেছে, জুমনী হালের কাছটায় ছেলে-কোলে দাঁড়িয়ে গুণে চলেছে, ক বোঝা কাঠ নামানো হলো। আজ মাচারু কাজ দেখাতে ব্যস্ত; বেছে-বেছে বড়-বড় শালের কচা একাই নিজের কাঁধে নিয়ে গাড়িতে তুলছে; কেবল খুব যখন ভারি বোধ হচ্ছে তখন তার একমাত্র দাঁড়ী তাকে ডেকে নিচ্ছে। কোট্টয়ার একটিমাত্র দাঁড়ী তাও আবার তার একটা পা কাটা আর পায়ের জায়গায় একটা কাঠের গোঁজ। নোটোর মতো অতটুকু বেলায় একেও মাচারু একদিন কোথা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। এই দাঁড়ির দেড়খানা আর মাল্লা মাচারুর দুখানা এই সাড়ে তিনখানা পা ক্রমাগত নৌকা থেকে উঠছে নামছে—সরু তক্তা বেয়ে মোটা-মোটা কাট বয়ে। এ অবস্থায় জুমনী কেমন করে নোটোর কথা পাড়ে? সে হালের কাছটায় বোদে বসে কোলের ছেলেটাকে দুধ দিতে লাগলো। মাচারুর যেমন আররের তেষ্টা তার এত ছোট ছেলেটারও তেমনি দুধের তেষ্টা কেবলি। কিন্তু মাচারু আজ আরকের নামটি করছে না, কেবল কপালের ঘাম মুচছে আর একটা করে বিড়ি দু-এক টান টানছে আবার কাজে লাগছে। বেলা এগারো, চামারু একবার আরকের কথা পাড়লে মাচারু বিড়ি ধরিয়ে বল্লে—"রোগো ভাই, কামতো হোনে দেও।"

মাচারুর আজ হলো কি, জুমনী তাই ভাবতে লাগলো। আরক খাওয়াতে চাইলে বলে—না! এ যেন সে মাচারুই নয়। ওদিকে লছমিরও সাড়াশব্দ নেই, এত বেলা পর্য্যন্ত একটুও না-কেঁদে সে যে লক্ষীটি হয়ে বসে আছে ঘরের মধ্যে, এরি বা মানে কি? জুমনী উঠে ঘরের মধ্যে গেল, আর জুমনীকে ঘরে যেতে দেখেই মাচারু ভাবলে—হয়েছে এইবার! মাচারু নৌকোর খোলটার উপর দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে আর ভাবছে নোটোকে নিয়ে এইবার জুমনী এলো বলে, থানা শেষ যেতেই হলো দেখছি! ঠিক সেই সম

জুমনী হাসতে-হাসতে বেরিয়ে বল্লে—“মজা দেখসে।” মাচারু জুমনীর হাসি দেখে এমনি অবাক হয়ে গেল যে, সে ডাঙায় আছে কি জলে আছে বুঝতে পারলেনা, কলের পুতুলের মতো জুমনীর সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলে লছমি একমুঠো মুড়ি কোথা থেকে সংগ্রহ করে বিছানার উপরে ছড়িয়ে বসে নোটোর গালে এক-থাবল দিচ্ছে সে, তার গালে এক-থাবল দিচ্ছে নোটো। হাঁড়িকুড়ি কিছু ভাঙা নেই, মারামারি নেই, কান্না-কাটি নেই। জুমনী হেসে মাচারুকে বল্লে—“দেখেছ, দুটিতে কেমন জমিয়ে বসেছে! থাক্ অমনি বসে, চল আমরা কাজে যাই।”

মাচারুকে আর দুবার বলতে হল না, সে ভারি খুসি হয়েই এবারে কাজে লাগলো—বোধ হয় আর থানায় যেতে হল না। আগে-আগে মাল-নামাবার সময় দুপুরবেলায় মাচারু কাজে ছুটি দিয়ে কাফি-খানা টেরেটিবাজারে মুর্গিহাটায় ঘুরে-ঘুরে কাটাতো; কাজেই দুদিনের কাজ হতো দশ দিনে, আর জুমনীকে কেবল বকাবকি খোঁচাখুঁচি করতে হতো—যাতে মাল চট্‌পট্ খালাস হয় সেজন্যে। কিন্তু এবারে আরক নেই কাজও জলের মতো চলেছে। ওদিকে নোটোও বোধ হয় বুঝেছিল তাকে নৌকোটা দখল করতে হবে; সে লছমিকে এমনি বশ করে নিয়েছে যে সেদিন সারা-বেলাটা লছমি না কেঁদে, কাপড় না ছিঁড়ে, জলে পড়ো-পড়ো না হয়ে, কেবল নোটোর ঝাঁকড়া- চুল মুটো-মুটো ছিঁড়ে বেরাল-ছানার মতো টিপে-টুপে চটকে উল্টে পাল্টে ছেলেটাকে নিয়ে খেলে কাটিয়ে দিলে। জুমনী দুর থেকে এই রঙ্গ দেখে ভাবলে ছেলেটা আর-কিছু না হোক ছেলে-মানুষ করতে, ছেলে ভোলাতে কাজে লাগতে পারবে। যতদিন মাল-নামানো চলে ততদিন ওটাকে রাখলে সুবিধে; দেশে যাবার দিন ওকে থানায় দিলেই চলবে। এই ভাবে নোটো রয়ে গেল—আরো কটা দিনের জন্যে—জুমনীর হাতে থাবা-থাবা ভাত ডাল খেয়ে, লছমিকে নিয়ে খেলা কোরে। এখন আর নোটোকে দেখে কে বলবে পরের ছেলে, যেন লছমির আদরের ভাইটি নোটো!

মাল সমস্ত নামাতে তিন দিন গেল। তিন দিনের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর বেলা তিনটেয় শেষ কাঠের বোঝা চালান দিয়ে, মাচারু কপালের ঘাম মুছে গুণছুঁচ নিয়ে নৌকোর পালটায় মস্ত-একটা তালি দিতে বসে গেল। ভোরের আগে জোয়ার নেই, এরি মধ্যে যতটা পারে কাজের ছুতোয় কাটিয়ে দেবার চেষ্টা, পাছে জুমনী ফাঁক পেয়ে থানায় যাবার কথাটা পেড়ে বসে। এই নৌকোখানার মধ্যে দারোগার ভয় মাচারু লছমি আর ওই নোটোর যেমন হয়েছে, জুজুর ভয়ও ততটা কেউ করেনা। জুমনী একবার দারোগার কথা বল্লে হলো, লছমি অমনি চুপ, মাচারু অমনি কাজে লেগেছে আর নোটো বেচারা তো ভয়েই মরে যায়! বোঝেনা দারোগা কি, কিন্তু সে বোঝে দারোগার কাছে গেলেই সে লছমিকে হারাবে; তারপর ভাতও নেই, ডালও নেই, আদর নেই, খেলা নেই, বুড়ো মাচারু নেই

জুমনী মা নেই, দাঁড়ী মাঝি নেই, আছে কেবল কান্না, পেটের জ্বালা, ধুলোয় পড়ে ছট্‌ফট্ করা! যখন নৌকো ছাড়বার সময় এগিয়ে এল তখন কে জানে কেমন করে নোটো সেটা বুঝলে; আর জুমনীকে সে ছাড়তে চায়না, কেবলি তার আঁচল ধরে ঘুরছে! মাচারু যতক্ষণ পায়ে পালে তালি দিয়ে নৌকোর ফাটলে পেরেক মেরে কাটিয়ে দিয়ে যখন বেলা প্রায় পোড়ে এসেছে তখন উঠে বল্লে—"থানায় যেতে হয়তো বলো ছেলেটাকে দিয়ে আসি!" জুমনী গম্ভীর হয়ে বসে রইলো,—কি ছুতোয় নোটোকে রাখা যায় তাই ভাবছে। ওদিকে লছমি অম্‌নি কান্না ধরলে—এমন কান্না যে ভয় হলো বুঝি-বা দম বন্ধ হয়ে মরে! জুমনী তখন বল্লে—"দেখছো তো, যেমন বোকামি তার ফল এখন ভোগো! মেয়েটা ওর ন্যাওটা হয়েছে—এখন আর ছাড়বে কেন? রইলো নোটো এইখানেই, ওকে আমি মানুষ করে তুলবো যেমন করে পারি; কিন্তু বলে রাখছি যেদিন লছমিয়া কান্না ধরেছে আর তুমি এককোঁটা আরক খেয়েছ কি নোটোকে দারোগার কাছে পাঠিয়েছি!"

মাচারু বল্লে—"এই কথাতো? বস্! আজ থেকে দিব্যি করছি—যে-রাস্তায় আরকের দোকান সে রাস্তায় মাচারু চলবে না।" বলেই মাচারু নৌকো খুলতে আরম্ভ করলে—"হেঁইও টানে হেঁইও!" লছমি চোখ মুছে উঠে বসলো; খোঁড়া দাঁড়ী বাঁশের লগীটা দিয়ে সারি-সারি নৌকোর গায়ে ঠেলা দিতে-দিতে পায়ে পায়ে নৌকোর কিনারায় হাঁটতে আরম্ভ করলে। কিনারার ভিড় কাটিয়ে কাদা-জল ছাড়িয়ে কোট্‌রা জোয়ারের টানে ভেসে পড়লো।

ভরা জোয়ার

ছুপ্ ছুপ্ করে জল কেটে ভরা পালে কোট্‌রা চলেছে—নোটোকে নিয়ে সহর ছাড়িয়ে, পাড়াগাঁয়ের মধ্যে দিয়ে সুন্দর বনের দিকে। দুধারে খড়ের চালা, সবুজ মাঠ, তরকারির ক্ষেত, নিঝুম বন, নীল আকাশ জলে ছায়া ফেলেছে, ঘাটে-ঘাটে মেয়েরা নাইতে নেমেছে, খালে বিলে জেলে ডিঙ্গি জাল ফেলে চুপটি করে আছে। মাচারু হাল ধরে বসে রয়েছে--ঘাটে ঘাটে শুঁড়িখানার দিকে চেয়েও দেখছেনা। নৌকোটা এতবার এই সব ঘাটে ঘাটে শুঁড়িখানার কাছে ভিড়েছে যে আজও যেন সেই দিকেই এক-একবার সে নাকটা ফেরাচ্ছে, আর অম্‌নি মাচারু তার উল্টোদিকে হালে মোচড় দিচ্ছে। খোঁড়া দাঁড়ী লোহার আঁকসী-পরানো লগিটা ক্রমাগত ঠেলে ঠেলে চলেছে—রোদে তার পিঠ চক্‌চক্ করছে—আর নৌকোর তক্তায় সারাদিন তার কাঠের পা খট্ খট্ শব্দ করছে। বেচারা খোঁড়া, তার মুখে কথাটি নেই। ছেলেবেলা থেকেই সে দুঃখী। ছোটবেলায় জমীদারের দুষ্টু ছেলে একটা পাথর ছুঁড়ে তার একটি চোখ কানা করে দিয়েছে; জুান হ'য়ে কলে খাটতে গেল, সেখানে একটা করাত-কলে তার পা'টা উড়ে গেল একদিন, তারপর জাহাজের খালাসী হ'ল, কিন্তু একদিন বয়লারের গরম জল ছিটকে

সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়ে হাঁসপাতাল থেকে বের হয়ে এল যখন, তখন খেতে পায় না, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। সেই সময় মাচারু তাকে দেখলে; যেমন দেখা কোট্‌রায় এনে হাজির করা;—নোটোর চেয়ে একটু বড়। সেদিনও জুমনীর সঙ্গে ঝগড়া বেধেছিল আর নোটো যেমন, তেমনি এই খোঁড়া দাঁড়ী নৌকোতে রয়ে গেল—পোষা কোকিল আর কালো বেরাল-ছানার সঙ্গে!

পাকা মাঝি মাচারু আর খোঁড়া দাঁড়ী এমনি কায়দায় নৌকো চালিয়ে চল্লো যে, পঁচিশ দিনে কোট্‌রা বান্‌চাট্রাক, তেলি-খালি, ইল্‌সে ঘাট, কাজীর হাট, সুবর্ণ-খালি, সাধুগঞ্জ হয়ে সিংরি হাট, গাজিখাল, দৌলতপুর, নন্দি-বাজার, সন্ন্যাসী-হাট ঘুরে বেতগাঁ, কাকচিরা, ডাকেটিয়া, আমড়া-ঝুড়ি, চিলমারি, হাড়গিলা-চর, সোলাভাঙ্গা, বেতপুই, মোরেলগঞ্জ পেরিয়ে পোড়াবাড়ি, শিরিশদিয়া, লাঙল-বাঁধের ধার দিয়ে আশা-শুন্নির ঘাটে ভিড়লো। শীতের ক-মাস জল শুকিয়ে নদীর বুকে চড়া পড়েছে;—গোরুগুলো হেঁটে এপার ওপার করছে। একমাস বোঝাই নৌকো চলাচল বন্ধ। এখন বন কাটবার সময়; কাঠ সস্তা; এই সময়টা একটু আরামের আর ছুটির দিন। কোট্‌রার মাস্তুল নামিয়ে, বাঁশ দড়ি-দাড়া একদিকে সরিয়ে নৌকোখানিকে দেখতে হয়েছে যেন একখানি চালা-ঘর ডাঙা ছেড়ে কালো আর খয়েরী হাঁসের মতো নদীর জলে খেলা করতে নেমেছে। নোটো এই তার নতুন বাসার ঝাঁপ খুলে সারাদিন বসে আছে—জলের দিকে একখানি হাত, আর ওপারের বনের দিকে—সূয্যি-ওঠার দিকে, সঁজ্‌ঝো আসার দিকে মুখটি বাড়িয়ে চুপটি করে। সে যেন হঠাৎ খাঁচা-থেকে ছাড়া-পাখী; ডানার খেলা, সুরের খেলা সবই ভুলে কেবল আকাশের দিকে চেয়ে মনে করবার চেষ্টা করেছে উড়তে হয় কেমন করে, গাইতে হয় কি সুরে। জুমনী নোটোকে চুপচাপ থাকতে দেখে স্থির করে নিয়েছে, সে বোবা কালা। কিন্তু সহরের ছেলে নোটো যেমনি নিশ্চয় করে জানলে আর তাকে থানায় যেতে হবেনা, সহরেও থাকতে হবেনা, আর জুমনী-মাসি মাঝে-মাঝে ভয় দেখালেও দারোগা সত্যিই আসছেনা, তখন তার বড়-বড় চোখে সুন্দর মুখে ভয় যেটুকু ছিল মুছে গেল; সে আর চুপ করে তরাস-পাওয়া কাঠবেরালীর মতো একটি কোণে পড়ে রইলনা; দিনে দিনে তার কথাও ফুটলো, হাসিও দেখা দিল মুখে। লছমির সঙ্গে নোটোর খেলা, ঝগড়া, আবার ভাব আবার আড়ি এমনি সারাদিন চলেছে—বাঁশের ছৈ মোড়া কোট্‌রায়। নোটো যেন অন্ধকার কোণের ফুলের চারা, হঠাৎ কে তাকে আলোয় রেখেছে—আর দেখতে-দেখতে সে ফুলে পাতায় ভরে উঠছে!

আশাশুন্নিতে পৌছবার পরেই জুমনীর আর-একটি মেয়ে হলো। কোলের ছেলেটা তখন হামাগুড়ি দিচ্ছে। তিনটি ছিল, হলো চারটি, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের টানাটানিও বাড়লো, কাজও বাড়লো; ছেলেদের শোয়াবার যে বাক্সের মতো খোপটা, তাতেও জায়গা আর কুলিয়ে ওঠেনা। এর উপর আবার সেই খোঁড়া দাঁড়ী ছোক্‌রা! যদি কারু

অন্ন ওঠে তো তারই! বেচারার কাঠের পা হলেও ভয়ে কেবলি আজকাল কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ করে। মাচারুর কোনোদিকে খেয়াল নেই। কিন্তু আর সবাই তো চুপ করে থাকেনা, তারা বলছে নিজেরই ভাত জোটেনা আবার কুটো ছেলে পুষেছ কি করতে? আশাশন্তির পোষ্টমাষ্টার—তিনি একাধারে গাঁয়ের গুরুমশায়, উকিল, ডাক্তার, আচার্য্যি-ঠাকুর, সবই! যার যা মনের কথা সব তাঁর কাছে। সকালে একঘণ্টা কাঠুরে আর মাঝি মাল্লার ছেলেদের তিনি পড়ান। তারপর তাঁকে হাত দেখে জিভ দেখে—কারু জ্বর হয়েছে, কারু পিলে বেড়েছে, কারু পা দায়ে কেটেছে এম্‌নি নানা রোগের ডাক্তারী করে' বেড়াতে হয়; তারপর দাওয়ায় বসে কে কি দায়ে ঠেকেছে, কাঠের দর কোথায় চড়েছে কোথায় কমেছে, কার ছেলেকে কি চাকরি দিলে ভালো হয়, এমনি সব সংসারের বিষয়-কর্ম্মের পরামর্শ দিতে হয়; তারপর ঘটকালি হাত গোনা এম্‌নি কাজ সারা দুপুরবেলা। সন্ধ্যেবেলা আফিসের হিসাব রাখা নিজের লেখাপড়া। পাড়ার লোকের মুখে মাচারুর মুখ্যুমির কথা শুনে পোষ্টমাষ্টার প্রথমটা বিশ্বাস করলেন না। তিনি মাচারুকে চিনতেন; কিন্তু মাচারুর বৌ চালাক বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল—সে কি এমনটা হতে দেবে। তিনি ঠিক খবরটা নিতে একদিন আস্তে-আস্তে বাঁধা কোট্‌রায় হাজির হলেন। জুমনী বসে মাচারুর একটা পুরোনো নীল ফতুয়া কেটে নোটোর জন্যে দুটো কোর্ত্তা সেলাই করছিল। মাষ্টার-বাবুকে দেখে সে তাড়াতাড়ি একটা মোড়া এগিয়ে পায়ের কাছে ঢিপ করে একটা পেন্নাম করে বসলো। মাষ্টার-মশায় কথায়-কথায় নোটোর কথা পেড়ে বল্লেন—"জুমনী যদি ইচ্ছে করে তো লাল-গঞ্জে পাদরী-সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেই তারা নোটোকে এখনি ইস্কুলে ভর্ত্তি করে নেবে। এর পর ভালো চাকরী হতেও পারে।" জুমনা সাফ জবাব দিলে—"জানি তো বাবু আমরা গরীব, পরের ছেলে পালা কি আমাদের কাজ! মাচারু চিরকালই আমায় জ্বালাবে। মনটা ওর নরম, কারুর দুঃখু দেখতে পারে না। দুঃখু দেখলে দুঃখু তো আমারো হয়, কিন্তু আমি হলে কি নোটোকে নিতে চাইতুম না সঙ্গে করে এখানে আনতুম, আমার আর পাঁচটা পেটের ভাবনা ভাবতে হয় বাবু, ওর তো তা নেই, কেবল তুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। কি করি বাবু, ছেলেটা এসে পড়েছে ঘাড়ে, এখনতো ওকে ফেলতে পারিনে, আমাদের যদি দুমুঠো জোটে তবে ওরও জুটবে; ওকে আমি কারু ভিক্ষে-পুত্তুর করে দিতে পাঠাবোনা বাবু।"

এই সময় নোটো জুমনীর আঠারো মাসের ছেলেটিকে কোলে নিয়ে তার মায়ের কাছে এলো। ছেলেটার নতুন দাঁত উঠেছে, তাই সে এক-একবার নোটোর কানটা কুটকুট্ করে কামড়াচ্ছে; নোটোর গাল আর কান লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে হাসছে দেখে মাষ্টার-মশায় বল্লেন—"জুমনী, তুই খুব ভালো কাজ করেছিস রে, দেখিস্ ভগবান তোর ভালো করবেন।" মাষ্টার-মশায় সব কথায় শোলক আওড়াতে ভালোবাসেন—'যে করে পরের ভালো তার হয় পরে ভালো।

বলে তিনি খুসি হয়ে ঘরে গেলেন। জুমনী যদিও মাঝে-মাঝে এখনো দারোগার ভয় দেখাতে ছাড়ে না, কিন্তু সত্যিই নোটোর উপর তার মায়া পড়েছে; এই সুন্দর-মুখ কোঁকড়া চুল পরের ছেলে ঘরে এসে গেছে, আর পর নেই; এ যেন তারি আঁচলের একটুখানি সোনা।

মাচারু বরং এখন এক একদিনে বলে—"জুমনী, ছেলেটাকে বেশি আদর দিচ্ছিস্!" জুমনী তাতে জবাব দেয়—"আদরই করবে না তো এনেছিলে কেন?"

জুমনী নোটোকে আর লছমিকে মাষ্টার-বাবুর কাছে লেখা-পড়া শিখতে দিলে। দুই ভাই-বোনের মতো দুটিকে ঘাটের সরু রাস্তাটি দিয়ে রোজ সকালে আঁচলে মুড়ি আর হাতে সেলেট বই দিয়ে পাঠশালে পাঠিয়ে দেয়। এই রাস্তাটুকুর মধ্যে নোটোর চোখে কত জিনিষ পড়ে! ভাই-বোনে কত খেলাই হয়! খানার ধারে, বরুণা গাছে কোথায় একটা পাখী বাসা বেঁধেছে, সাঁকোর ধারে কোথায় ব্যাংগুলো মস্ত একটা ছাতার কারখানা খুলে বসেছে, রাস্তার ধারে কোন্ পুকুরটায় একটা বোয়াল মাছ তুড়ি দিলেই কাছে আসে, কোন্ তেঁতুলগাছে বাদুড় সব নীচের দিকে ঝুলেছে, কোন্ বনের ধারে বেতগাছ আছে যার খুব ভালো ছিপ হয়, কোথায় কুমোরের চাকা ঘুরছে আর তা থেকে হাঁড়ি কুঁজো সব হঠাৎ বেরিয়ে আসছে, কোন্ ফাটা দেয়ালের উপর একটা বহুরূপী রোদ পোহায় আর মিনিটে দশরকম রং বদলায়, কাঁটাল-গাছের কোন্ কোটরে কাঠবেরালী ক'টা ছানা দিয়েছে—সব নোটোর জানা আছে। তা-ছাড়া লেখা-পড়াতে নোটো সবাইকে হারিয়ে দিলে। খালি শীতকালটা ইস্কুল বসে, তার পর নৌকো-সব ব্যাপারে চলে যায়; ফিরে যখন আসে তখন মাষ্টার-মশায় দেখেন প্রায় সব ছেলে পড়া ভুলে গেছে, কেবল নোটো আর-এক পাতা এগিয়ে গেছে। পাঠশালা থেকে ফেরবার সময় দুটিতে বনের মধ্যে দিয়ে ঘুরে আসতো। সেখানে কাঠুরেরা বড-বড় গাছ পাড়ছে, দেখেই গাছের আগ-ডালে দড়ি বাঁধতে নোটো সরসর্ ক'রে গাছে উঠে যেতো আর নীচে দাঁড়িয়ে লছমি চেঁচাতো—"গিয়ারে গিয়ারে!" এমনি করে নোটোকে একবার পাঠশালে পৌঁছে দিয়ে আবার দেশ-বিদেশে টেনে নিয়ে দু বছর নৌকা এলো আর গেল। বাঁশের ছৈ-ঢাকা কোট্‌রায় দু-বছর থেকে নোটো আট-বছরে পা দিলে।

উজান-ভাঁটায়

মুকুন্দিলাল বলে লোকটা ডিগ্‌ডিগে রোগা, যেন শুক্‌নো কাঠ। গ্রাম ছাড়িয়ে বনের মধ্যে এক কাঠ-গোলা বানিয়ে বসেছে। কারুর সঙ্গে বড়-একটা দেখা-শোনা করেনা, একা-একাই থাকে। পশ্চিম থেকে লোকটা এসে, এখানে একা কেন যে বনের মধ্যে গোলা বানিয়ে বসে আছে তা গাঁয়ের লোক অনেক চেষ্টা করেও আন্দাজ করতে পারেনি। ছ' বছর ধরে লোকটা বিষ্টি নেই বাদল নেই ক্রমাগত কাজ করে চলেছে, একটি দিন ছুটি নেয় না। অথচ লোকটার যে পয়সা-কড়ি নেই তা নয়; ফলাও

কারবার; রুকুলীতে গিয়ে মাঝে-মাঝে উকিল-বাবুর সঙ্গে বিষয়-আসয়ের পরামর্শ করে, আর জমী-জমা প্রায়ই তো কিনছে। পোষ্টমাষ্টার-বাবুর কাছে সব খবর; কিন্তু মুকুন্দির পেট থেকে কেবল যে তার স্ত্রী নেই এই খবরটা ছাড়া আর-কিছু তিনি আদায় করতে পারেননি। মুকুন্দি লোক ভালো এটা কিন্তু সবাই বলে থাকে। যে বনের রাস্তা ধরে নোটো আর লছমি খেলা করতে-করতে কোট্‌রায় ফিরতো, সেই রাস্তা থেকে দেখা যেত, মুকুন্দি কাঠগোলার একপাশে দাঁড়িয়ে কোনোদিন কাঠ চালাচ্ছে কখনো বা করাত দিয়ে তক্তা চিরছে। ছেলেদের দেখলেই সে কাছে ডাকতো আর নোটোর মাথায় হাত বুলিয়ে বলতো—"আমার ছেলেটা থাকলে ঠিক এত বড়টি হতো, তোকে ঠিক তার মতো দেখতে—" কি জানি কি ভেবে এইটুকু বলেই মুকুন্দি চুপ করতো। ছেলে-মেয়েটা জানবার জন্যে পেড়াপেড়ি করলে সে কোনো-দিন নোটোকে খেলার নৌকো কাটতে শিখিয়ে দিতো, নয়তো লছমিকে লজেঞ্চুস কি একটা মাটির পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে দিত। মাচারুর সঙ্গে দেখা হলে মুকুন্দি প্রায়ই বলতো—"দেখো, নোটোকে যদি কোনোদিন তোমাদের না রাখার মতলব হয় তবে আমাকে দিও। আমার ছেলে নেই, আমি ওকে কালেজে পড়িয়ে, সরকারী জঙ্গলের যে আফিস তারি হেড-বাবু করে দিয়ে তবে ছাড়ব,—তাতে যতই খরচ হোক।" কিন্তু তখনো মাচারুর সংসার সমান ভাবে চলছে—কমতি কিছুই নেই, আনন্দের জোয়ার বইছে। সে নোটোকে ছাড়তে নারাজ হল। মুকুন্দি নিশ্বাস ফেলে অপেক্ষা করতে লাগলো। সে জানতো যেদিন মাচারুর সুখের নদীতে ভাটা পড়বে, সে দিন আর নোটোকে দুবার করে চাইতে হবে না, ওরা আপনি এসেই দিয়ে যাবে।

হলোও তাই। যেদিন মাচারু নোটোকে মুকুন্দির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এলো, সেইদিন থেকে যেন দুঃখু-কষ্ট তার সঙ্গে কোট্‌রায় এসে সেঁধোলো। কাঠের বাজার হঠাৎ পড়ে গেল, তার খোঁড়া দাঁড়ী মাল-চালান দেবার সময় পড়ে গিয়ে একটা হাত মচ্‌কে নিষ্কর্ম্মা হয়ে গেল, অর্দ্ধেক মাল খালাসই হলো না, এর উপর সেবার কাঠ নিয়ে নৌকো ছাড়বার ঠিক আগেই জুমনী এমনি জ্বরে পড়লো যে, বাঁচে কিনা! মাচারু রোগী দেখবে, না ছেলেদের দিকে নজর দেবে ঠিক পাচ্ছেনা। রান্নায় নুন দিতে দিচ্ছে সে কুইনাইন। রোগীকে সোডা দিতে দিলে একমোড়ক চুণ। জুমনী দেখে-শুনে বল্লে—"তুমি থাকো, নোটোকে বলো, ওই সব দেখুক-শুনুক।" জীবনে এই প্রথম মাচারু নিজে হিসেব মাপ-জোপ্ করে কাঠ কিনলে। তিন পাক দড়ি গাছে জড়িয়ে- যে ক হাত হলো তার বেশী মাচারুর হিসেব আর এগোতে পারলো না—কাজেই কাঠ কিনতেও ঠকে গেল আবার একলা সেই কাঠ সহরে বেচতে গিয়েও মাচারু আরো বেশী ঠকে এলো। সে শুকনো মুখে জুমনীর কাছে বসে বল্লে—"একটু চট্‌পট্‌ সেরে ওঠবার চেষ্টা করো, না হলে কারবার মাটি হল।" জুমনী যতটা

চট্‌পট্‌ সেরে উঠলো অন্য কেউ তা পারতো না। সে টায়ে-টোয়ে সংসার চালাতে লাগল। হাতে কিছু যদি জমা থাকতো আর-একখানা নতুন নৌকো কিনে নিশ্চয় কারবার আবার জাঁকিয়ে তুলতে পারতো; কিন্তু যা টাকা ছিল জুমনীর অসুখে খরচ হয়েছে, বাকি যা আছে তাতে কোটরাটার ফুটো মেরামত চলতে পারে।

ওদিকে নোটো এখন আর তেমন ছোটোটি নেই যে পুরোনো কাপড়ে, যাহোক-ত-মোঠোয় তার চলে যেতে পারে। এদিকে আবার নোটো বড় হলো বটে কিন্তু গায়ের শক্তি যে সেইসঙ্গে বাড়লো, তানয়; খোঁড়া দাড়ী এক পা নিয়ে যতটা কাজ দেয়, নোটো তার অর্দ্ধেকও দিতে হলে হাঁপিয়ে পড়ে। সে চেষ্টা করে কাজে লাগতে, কিন্তু হাড মজবুৎ নয়। কাজেই দিন-দিন সংসারের টানাটানি বাড়তে লাগলো বৈ কমলোনা। সেবারে সহরে কাঠ বেচে লাভ তো হলোই না, উল্‌টে বরং কোট্‌রার খোলে এমন জল উঠতে আরম্ভ হল যে ভয় হলো মাঝ-পথে বুঝিবা নৌকোটা ডুবে যায়। হয় নৌকোর খোল আগাগোড়া নতুন, নয়তো পুরোনো কাঠের দরে এতদিনের কোটরা বেচে আবার নতুন নৌকো করতে হবে।

সেবারে বর্ষার আগে নৌকো বোঝাই করে মাচারু মুকুন্দিকে কাঠের দাম চুকিয়ে সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসবে, মুকুন্দি মাচারুকে ডেকে বল্লে—"চলো একছিলিম তামাক খাবে, দুএকটা কাজের কথা আছে।" মাচারুকে তামাক দিয়ে মুকুন্দি বল্লে—"বলি শোনো। এখন আমি যেমন একলা, এমন বরাবরই যে ছিলেম, তা ভেবোনা। দেশে আমার জমী জমা ছিল, স্ত্রীপুত্তুরও ছিল! নিজের দোষে সব হারিয়েছি—" বলে মুকুন্দি খানিক চুপ করে রইলো, কথা বলতে তার বাধো-বাধো ঠেকলো। সে দুচারবার ঢোক গিলে শুরু করলে—"আমি কোনোকালে বদলোক নই জানো,—কিন্তু একটা দোষ আমার ছিল।" মাচারু অবাক হয়ে বলে—"তোমার আবার দোষ!"

মুকুন্দি বল্লে—"সে দোষ আমার এখনো আছে—পয়সা ছিল আমার প্রাণ, পয়সার জন্যে আমি সব করতে রাজি! এই পয়সা জমাবার পাগলামি কেমন যে আমাকে পেয়ে বসেছিল, তা বলা যায়না, কেবল জমা, জমা, জমা! কলকাতায় দাইগিরি করলে পয়সা আসবে বলে একটিমাত্র কোলের ছেলেকে নিয়ে স্ত্রীকে সেখানে পাঠাতে আমার একটুও মায়া হলোনা। বেচারার যাবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না; সে বার-বার বলেছিল—একমাত্র ছেলেকে ছেড়ে সে একদিনও থাকতে পারবেনা; কিন্তু আমি তাকে জোর করে পাঠালুম—নিজের ছেলেকে দুধ না দিয়ে পরের ছেলেকে মানুষ করে পয়সা আনতে! নেহাৎ গরীব যে, সেও এমন কাজ করেনা; তাদেরও দয়া মায়া আছে—যাক্‌ সে কথা। তারপর যা ঘটবার তাই ঘটলো। জমীদারের বাড়ী আমার স্ত্রী চাকরী পেলে কুড়ি টাকার। সে এক দালালনীর হাতে নিজের ছেলেকে দেশে পৌছে দেবার সব খরচ দিয়ে ইষ্টিসান্‌ পর্য্যন্ত তাদের পৌছে দিয়ে গেল। কিন্তু ছেলে আমার দেশে পৌছলো না; দালালনী তাকে

নিয়ে কোথায় যে পালালো তারো আর সন্ধান হল না।”

মাচারু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—“তার পর তোমার স্ত্রী কি কল্লে?”

কি আর করবে? যেদিন এই খবর তাকে দিলুম সেইদিনই তার সমস্ত দুধ শুকিয়ে গেল, বুকের ধনকে হারিয়ে সে বুক ফেটে মারা গেল। তারপর থেকে লোকালয় ছেড়ে এই বনে এসে আমি সেই পাপের শাস্তি দিনরাত ভোগ করছি। হারানো-ছেলের জন্যে বুকটা আমার জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে ভাই! বারোবছর এই যন্ত্রণা ভুগছি—আর পারিনে। বুড়ো হয়ে একা মরতে হবে ভেবে আমি ভয়ে মরছি। আমাকে দয়া কর, নোটোকে আমায় দাও, আমার হারানো-ছেলের জায়গায় তাকে বসিয়ে যে-ক'দিন বাঁচি বুকটা জুড়িয়ে নিই।”

মাচারু বড় বিপদেই পড়লো। নোটো বড় হয়ে উঠেছে, সঙ্গে খরচও বাড়ছে সত্যি, কিন্তু ঠিক যে-সময়টিতে সে যাহোক দুপয়সা আনবার মতো হয়ে উঠলো, ঘরের কাজেও হাত লাগাতে লাগলো, সে সময় তাকে ছেড়ে দিলে এতদিনের যা-কিছু খরচ আর পরিশ্রম সব বৃথা হয়ে যায়।

মুকুন্দি তার মনের ভাব বুঝেই বল্লে—“ছেলেটাকে আমি অমনি চাইনে, ওর জন্যে এ-পর্য্যন্ত যা-কিছু তুমি খরচ করেছ সব আমি ধরে দেবো। আর ছেলেটার এতে ভালো বই মন্দ হবেনা। আমি বলছি তাকে সরকারী জঙ্গলের হেড-বাবু যদি না করে দিই তো আমার নাম মুকুন্দি নয়! নোটো যে-রকম বুদ্ধিমান তাতে আমার খুবই আশা হচ্ছে পরে ও একটা মানুষের মতো মানুষ হবে। তোমার কোনো ভয় নেই, ওকে আমি নিজের ছেলের মতো দেখবো। কেমন, রাজি তো? আমাকে নিরাশ কোরোনা, তোমার স্ত্রীকে সব কথা বুঝিয়ে যাতে সে রাজি হয় তাই কোরো।”

সেই রাত্রে যখন সব ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়েছে, তখন মাচারু কথাটা পাড়াতে জুমনী বল্লে—“কথা তো ঠিক, নোটোর জন্যে যা করবার তা আমরা তো করলেম, ওকে রাখতে পারলে তো ভালো হতো কিন্তু তার যখন উপায় নেই, তখন ওর যাতে ভালো হয় তাইতো দেখতে হবে! আমাদের মনে কষ্ট হবে বলে ওর যদি সুরাহা হয় তাতে নারাজ তো হতে পারিনে! ভালো বেসেছি, ছেলেটা গেলে দুঃখু হবে। কিন্তু কি করবো? ভগবান তো কাছে রাখতে দিলেন না! যেখানে ও সুখে থাকবে সেখানেই পাঠাই।”

এ কথা বলাবলি হচ্ছে আর দুজনেরই চোখ যেখানে নোটো ছোট ছেলেদুটির সঙ্গে এক-বিছানায় অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে, ফিরে-ফিরে কেবলি সেই দিকে যাচ্ছে। দুজনে নিঃশ্বেস ফেলে বসে রইলো—চুপটি করে, মুখোমুখি, কতক্ষণ ধরে। নদীর জল পুরোনো নৌকোটাকে কেবলি দোল দিচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে। বোটের পুরোনো তক্তা গুলো খিচ্ খিচ্ করছে কেবলি ঢেউয়ের ধাক্কায়। শেষে মাচারু আস্তে-আস্তে বল্লে—“ছেলেটা কি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে?”

জুমনী আঁচলে দুচোখ মুছে বল্লে—

"যা করেন ঠাকুর, নোটোকো আমি ছাড়তে পারবোনা। ও এখানেই থাকবে মুকুন্দিকে বলে দিও।"

বানের জলে

নোটো পনেরো বছরে পড়েছে। এই তিন বছরের মধ্যে সে যেন দেখতে-দেখতে বেড়ে উঠলো। এখন আর সে পাণ্ডাস মুখ রোগা ছেলেটি নেই, চওড়াবুক জোয়ান জোয়োয়ার হয়ে উঠেছে।

হাল ধরতে, দাঁড় টানতে, রসি ফেলে পাকা খালাসীর মতো "একবাঁও দুইহাত, দুই বাঁও তিন হাত।" বলে জল মেপে চলতে, চর বাঁচিয়ে জলের টান বুঝে মেঘ-হাওয়া দেখে দিনে রাতে নৌকো চালিয়ে যেতে, পাড়ি দিতে, ঘাটে ভেড়াতে, ভিতে ভিতে চলতে সে এখন মজবুৎ হয়ে উঠেছে। এখন পাকা মাঝির মতো নীল কোর্তা লাল রুমাল গলায় বেঁধে নৌকোর ছাদের কিনারা দিয়ে নির্ভয়ে যাওয়া-আসা করতে লেগেছে।

মাচারু আজকাল নোটোর হাতে নৌকোর হাল ছেড়ে দিয়ে কেবল ঘুমোচ্ছে, খাচ্ছে আর হুঁকো টান্‌ছে। লছমিও বড় হয়ে উঠেছে। সে এখন রান্নার কাজে সেলায়ের কাজে মায়ের সঙ্গে সমান হয়েছে।

এ-বছর ভাদরের গঙ্গায় বিষম ঢল নেমেছে। বানে আর তুফানে নদী ভীষণ মূর্ত্তি ধরে দুধারের গ্রাম ভাসিয়ে, পাড় ধসিয়ে, বাঁধ ভেঙে ওলোট-পালোট করতে-করতে যেন পাগলীর মতো সমুদ্রের দিকে ঝাঁপিয়ে চলেছে। ব্যাপারীরা তাড়াতাড়ি নৌকো থেকে মাল খালাস করে দিয়ে বাড়ি ফিরতে পাল্লে বাঁচে। গঙ্গার জল এত বেড়েছে যে, সহরের ঘাটের রানা সমস্তটা ডুবে গেছে; আর-একটু জল বাড়লেই সহরের রাস্তায় জল উঠবে! ক্রমাগত খবর আসছে এ ঘাট ভাংলো, ও গ্রাম ভাংলো। তার উপর বর্দ্ধমান থেকে তার এলো দামোদরের বাঁধ ভেঙেছে, গ্রাম নগর ডুবে গেছে, জল বাড়ছে বই কমছে না! গোরুর গাড়িতে জেটি-ঘাট থেকে ক্রমাগত মাল চলেছে। দালাল ব্যাপারীর ভিড় লেগেছে। কপিকলগুলো কেবলি মাল উঠিয়ে চলেছে। রাস্তার ওপারের যে-সব দোকানী, তারা জল বাড়বার ভয়ে এরি মধ্যে দোকান-পাট বন্ধ করেছে—ঘাটের পাহারাওলা, জাহাজের টিকট ঘরের বাবু—কারু দেখা নেই। গঙ্গার ধারে লোক ক্রমেই কমছে। কালো ত্রিপল-ঢাকা মালবোঝাই গাড়িগুলো সারি সারি নদী থেকে দূরে গলিগুলোর মধ্যে গিয়ে সেঁধোচ্ছে।

মাচারু জল নেই রোদ নেই যত পারে মাল ডাঙায় তুলছে; রাতেও ঘুমোবার সময় নেই,—গ্যাসের আলোতে তেল-বাতি জ্বালিয়ে—কাজ চালাচ্ছে মাচারু। রাত এগারোটার মধ্যে কোট্‌রার পোনেরো-আনা মাল খোলোসা হয়ে গেল। চামারু শেষ গোরুর গাড়িখানার উপরে বসে চলে গেল দেখে, সবাই কোট্‌রার মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লো চাট্টি চাট্টি খেয়ে নিয়ে। সে রাতে নৌকোখানা এম্নি দুলতে লাগলো, বাতাস এমন বইতে থাকলো, শিকল কাঠ দড়ি-দাড়া এম্নি মচ্‌মচ্‌ ঝন্‌ঝন্‌ করতে আরম্ভ করলে যে, কারু আর চোখ বুজতে হলোনা;

মনে হলো পুরোনো তাদের কোট্‌রাখানি যন্ত্রণায় বুড়োমানুষের মতো উ আঁ করে কেবলি এপাশ ওপাশ করছে।

ভোরে ছেলেরা না জাগতেই মাচারু, জুমনী, নোটো আর সেই খোঁড়া দাড়ী উঠে আবার বাকি মাল গাড়ি-বোঝাই করতে সুরু করে দিলে। গঙ্গা আবো ফেঁপে উঠেছে। হাবড়ার পুল বেঁকে একখান যেন ধনুক হয়েছে। পুলের নীচে দিয়ে, মেঘলা আকাশের রং ঘোলা জলে মাখিয়ে নিয়ে, স্রোত চলেছে বেগে তীরের মতো! রাস্তায় একটিও গাড়ী চলছেনা, মাঝ-নদীতে একখানি পান্সি কি ডিঙি পর্য্যন্ত নেই, কেবল টানের মুখে কালো হাঁড়ি, ডুবো নৌকোর তক্তা, ভাঙা খাঁচা, মরা গোরু, বোঝা-বোঝা ভিজে খড়, ভাঙা গাছের ডাল —এমনি সব নানা জিনিষ হুহু করে ভেসে আসছে কোথা থেকে কে জানে! পুলের ওপারে জাহাজের মাস্তল, পোর্ট আফিসের বাড়ীগুলো ঝাপ্‌সা দেখা যাচ্ছে।

ঘাটের সব-উপরের ধাপটা ডুবে রাস্তায় এক হাত জল উঠেছে। চামারু হাঁকছে— "জল্‌দী ভাই, জলদী!" মাচারু, জুমনী আর চামারু জলে কাদায় তিনজনে ঠেলাঠেলি করে গাড়ীতে মাল বোঝাই দিচ্ছে, এমন সময় দমাস্ করে একটা শব্দ শুনে তারা চমকে দেখলে, ইট-বোঝাই একখানা কিস্তি নঙর ছিঁড়ে ঘাটের রানায় এসে পড়ে চুরমার হয়ে একেবারে ডুবে গেল, আর সেখানকার জলটা তোড়পাড় হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগলো। এরা তিনজনে কাঠের পুতুলের মতো সেইদিকে চেয়ে আছে এমন সময় পিছনের দিকে চীৎকার উঠলো—"গিয়ারে গিয়া!" মুখ ফিরিয়েই তারা দেখলে জলের তোড়ে কোট্‌রা রশি ছিঁড়ে মাঝ-গঙ্গার দিকে হুহু করে বেরিয়ে চলেছে! জুমনী "ওরে কি হোলোরে" বলে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। সেই সময় জুমনী দেখলে নৌকোর মধ্যে থেকে নোটো তার ছোট মেয়েটাকে আর লছমিও তার মেজোছেলে-টাকে নিয়ে নৌকোর ছাদে উঠে ডাঙার দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে। মাচারু চেঁচিয়ে বল্লে—"দড়ি! একটা দড়ি ফেলে দে।"

চামারু বল্লে—"ওরে একটা পান্‌সী কি ডিঙি নিয়ে ধর নৌকোখানা!" ডাঙার লোকগুলো ছুটোছুটি চেঁচামেচি কচ্ছে, ওদিকে নৌকো ভেসেই চলেছে দেখে নোটো হেঁকে বল্লে—"দাওনা একটা কাছি ফেলে।"

তিনবার ডাঙা থেকে লোকেরা কাছি ফেল্লে, তিনবারই ফস্‌কে জলে পড়লো,— কোটরা ডাঙা থেকে অনেক দূরে পড়েছে। নোটো বুঝলে এখন তার হাতে নৌকোখানা আর ছেলে-মেয়েগুলোর বাঁচা না-বাঁচা নির্ভর করছে। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে হাল ধরে চেচিয়ে বল্লে—"কোনো ভয় নেই!"

নৌকোখানা স্রোতের ঠেলায় পাশ হয়ে ভেসে চলেছিল, নোটো হাল মুচ্‌ড়ে তাকে স্রোতের টানের মুখে সোজা ঘুরিয়ে দিলে। ওদিকে ডাঙার উপরে মাচারু পাগলের মতো জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাচ্ছে, চামারু দুহাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরেছে, আর জুমনী কাদায় বসে চোখ ঢেকে কেবলি চেঁচাচ্ছে—"এ লছমী, এ বেটা, এ মেয়া পত।"

এদিকে কোটরা স্রোতের মুখে পড়ে পান্সীর মতো তীরবেগে সোজা হাওড়ার পুলটার দিকে চল্লো। নোটো হাল ধরে, ছেলে-মেয়েদের ঘরে যেতে বলে, খোঁড়া দাড়ীকে কাছি লগা নিয়ে ঠিক থাকতে হুকুম দিয়ে, পুলের মধ্যের খিলেনের উপর যে লাল নিশেন সেইদিকে নৌকো ফিরিয়ে দিলে। পুলটা ক্রমে কাছাকাছি আসছে, কিন্তু জল বেড়েছে, পুলের নীচে দিয়ে নৌকো গলতে পারবে কিনা সন্দেহ,—যাঃ। এখন তো ফেরা চলেনা। নোটো হাঁকলে "এ মাঝি, কাঁটা কাছি লগা ঠিক।"

নোটো সজোরে হাল টেনে রয়েছে—পুলের নীচে দিয়ে জলের বাতাস এসে তার মুখে লাগছে, খোলা খিলেন হাঁ-করে যেন নৌকোসুদ্ধ তাদের গিলে ফেল্লে। স্রোতের টানে কোটরা সাঁ সাঁ করে পুলের নীচে দিয়ে বেরিয়ে চল্লো। পুলের উপর থেকে লোকগুলো দেখলে খোঁড়া দাড়ী কাটা ফেলে পুলের সঙ্গে নৌকোটা আটকাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাত-ফসকে হুমড়ি খেয়ে নৌকোর খোলের মধ্যে পড়ে গেল। বড় বড় লোহার কড়িকাঠের খোঁটা সব বাঁচিয়ে নৌকো পুলের ওপারে মুখ বার করলে, নোটোর চোখে ওধারের বাড়ি-ঘর জাহাজ পরিস্কার পড়লো। সেই সময় এক খালাসী পুলের উপর থেকে একগাছা রসি কোটরার উপর ফেলে দিলে। নোটো সেটা জড়িয়ে নৌকোর খোঁটায় বেঁধে দিলে। উপর থেকে হাজারো লোক "সাবাস সাবাস্, বেঁচে থাকো বাবা।" বলে চীৎকার করতে থাকলো। নৌকোটা হঠাৎ একবার থেমে, ঠাণ্ডা ঘোড়া যেমন রাশ মেনে চলে তেমনি সেই পোনেরো বছরের ছোটোছেলের হাতের ইসারায় মুখ ঘুরিয়ে আস্তে-আস্তে কুল্‌পি ঘাটে ভিড়লো। নোটোমাঝি একনৌকো ছোট ছেলে নিয়ে বানের মুখে নৌকো বাঁচিয়ে যমের দুয়োর থেকে ফিরে এলো দেখে দুপারের লোক পিল্‌পিল্ করে ঘাটের দিকে চল্লো। মাচারু আর ঝুমনী হাঁপাতে-হাঁপাতে নৌকোয় উঠেই নোটোর গলা জড়িয়ে আনন্দে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেল্লে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মাচারু এক ঠোঙা তেলে-ফুলুরী, ভালো সন্দেশ আর গোটা-দুই তাল, এক বোতল আরক বাজার থেকে সংগ্রহ করে এনে সবাইকে নিয়ে খেতে বসলো। তার আজ যে আনন্দ, ঘোড়-দোড়ে লাখটাকা পেলেও তেমন হয় না। ফাটা-ফোটা পুরোনো কোটরা আজ তার কাছে বাদশার সোনার ময়ূরপঙ্খীর চেয়ে চমৎকার বোধ হল। নোটোর উপরে মাচারুর ভালোবাসা আজ দুগুণ বেড়ে গেছে, তাই সে কেবলি তাকে কাতুকুতু চিমটি দিয়ে আদর করে বলছে—"তোকে সেদিন যদি দারোগার কাছে ফিরে দিতুম, তবে আজ কি সব্বনাশটা হতো বল দেখি? আঃ, কি কায়দা করেই নৌকোটা চালিয়ে এলিরে নোটো! এই খোঁড়া! শিখে নেরে নোটোর কাছে কেমন করে হাল ধরতে হয়। আমি যে আমি, আমিও অমন বানের মুখে নৌকো ছেড়ে দিতে এখনো সাহস পাইনে!" তারপর একপক্ষ ধরে বুড়ো মাচারু যাকে দেখে তাকেই কি কায়দায় যে নোটো নৌকোখানাকে চালিয়ে গেল, তাই দেখিয়ে

বেড়াতে লাগলো—"জানো, নৌকোটা তীব্র-বেগে চলেছে আর নোটো এই এমনি করে যেমন হালে মোচোড় —অম্‌নি ওঃ, একেবারে নৌকো সোজা চলেছে, বুঝলে……?"

এদিকে প্রতিপদ থেকে জল কমতে সুরু হলো, নৌকো নিয়ে দেশে ফেরবারও সময় এগিয়ে এলো। সেই সময় একদিন মাচারু নৌকোর জল ছেঁচ্‌চে, এমন সময় দারোগার লোক তাকে ডাকতে এলো। "দারোগা আবার ডাকেন কেন!" বলে মাচারু নোটোকে জল ছেঁচ্‌তে বসিয়ে পেয়াদার সঙ্গে থানায় গেল। মাচারু সারাদিনের পরে থানা থেকে যখন ফিরে এলো তখন তার মুখ শুকিয়ে গেছে, ভুরুদুটো যেন রেগে কুঁচকে রয়েছে!

জুমনী বল্লে—"হল কি তোমার?"

মাচারু বল্লে—"আর পারিনে, নোটোকে নিয়ে হদ্দ হয়েছি!"

জুমনী ভয়ে-ভয়ে শুধোলে—"কেন গো, আবার কি গোল হলো?"

মাচারু বলে চল্লো—"যে মাগী নোটোকে ফেলে গিয়েছিল, সেটা তার মা নয়, ছেলেটাকে চুরি করে এনেছিল, মরবার আগে হাঁসপাতালের ডাক্তার-সায়েবকে সব কথা খুলে বলে গেছে, দারোগা আমায় ডেকে সেই-সব কথা বল্লেন।"

জুমনী বল্লে—"তবে নোটোর বাপ মায়ের নাম তুমি জেনেছো তো, এখন তাদের চিঠি দাও!"

মাচারু চমকে উঠে জিভ-কেটে বল্লে—"রামোঃ! বাপ-মায়ের নাম কি পুলিশে কাউকে বলে থাকে!"

"তবে তোমাকে ডাকলে কি কর্ত্তে তারা?" জুমনী বলে উঠলো।

মাচারু চটেই লাল! হাত-মুখ নেড়ে বল্লে—"নাম জানলে কি তোমাদের বলিনে। ভালো আপদ, ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ কোরোনা বলছি!" মাচারু বিড়্-বিড়্ করে বকতে-বকতে নৌকোর নাকটার উপরে উঁচু হয়ে বসে কেবলি হুঁকো টানতে থাকলো।

জুমনী অবাক হয়ে বল্লে—"এর আজ হলো কি? ক্ষেপে গেল নাকি!"

বাস্তবিক সেইদিন থেকে মাচারুর ঘুম নেই, মুখে অরুচি; ঘুমিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে বিড়্-বিড়্ করে বকতে আরম্ভ করলে; জুমনীর সঙ্গেও কথায়-কথায় চোপা ধরলে। নৌকোর কারু সঙ্গে তার বনছেনা, সে যেন সে মাচারু নয়! নোটোকেও সে কথায় কথায় দাব্ড়ি দিচ্ছে।

জুমনী যদি শুধোয়—"ওগো, তুমি দিন দিন এমন হচ্ছো কেন?"

মাচারু চটে উত্তর দেয়—"হবে আবার কি? আমার কি রোগ হয়েছে না কি যে কেবলি শুধোচ্ছো কেমন আছ? দিনরাত টিক্‌টিক্ করোনা বলছি! আমি আর এক দিন এখানে থাকবোনা, কালই নৌকো ছেড়ে দেশে যাবো; জ্বালাতন হয়েছি।"

তার পর দিন সত্যিই নৌকো খুলে মাচারু আবার সহর ছেড়ে চল্লো।

কাণ্ড দেখে জুমনীর মুণ্ডু ঘুরে গেল। সে গালে হাত দিয়ে জলের দিকে চেয়ে চুপটি করে সারা পথ ভাবতে-ভাবতে চল্লো—বুড়ো বয়েসে মাচারুর মাথা খারাপ হলো নাকি?

কোট্‌রা প্রায় আশা-শুন্তির কাছে এসে পড়েছে; লছমি আবার নোটোর কাছে ইস্কুলের পড়া জেনে নিচ্ছে খানিক-খানিক। সেই সময় নোটো কথায়-কথায় বলে উঠেছে—এবার গিয়েই মুকুন্দির কাঠ-গোলায় সে কাজ শিখবে। যেমন মুকুন্দির নাম শোনা, অমনি মাচারু অগ্নিশর্ম্মা হয়ে বলে উঠলো—"ফের তার নাম করছিস্? মেরে হাড় ভেঙে দেবো! মুকুন্দির নাম আর করিসনে, তার সঙ্গে আমি আর কারবারও রাখবোনা!"

জুমনী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—"কেন, মুকুন্দি আবার কি দোষ করলে?"

মাচারু চোখদুটো লাল করে বল্লে—"জানিস্‌নে সে আমার—যাক ও কথা। আমি যা খুসি করবো, তোরা কথা কইবার কে?"

মাচারুর যা-খুসি তাই হলো। সে আশা-শন্তির ঘাটে না ভিড়ে নৌকো নিয়ে একেবারে বনের মধ্যে মুকুন্দিলালের কাঠগোলা থেকে দুকোশ তফাতে অন্য গ্রামের সাম্‌নে নৌকো ভেড়ালো। শুধোলে বলে—মুকুন্দি কেবল তাকে এ-পর্য্যন্ত ঠকিয়ে এসেছে; এ গাঁয়ের ব্যাপারী সস্তায় কাঠ দেবে! এখানে বনগাঁয়ে ইস্কুল নেই—কিছুই নেই; নোটো আর লছমি বনে-বনে সারাদিন জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে জড়ো করতে লাগলো। আর কখনো-কখনো কাজের অবসরে নালার ধারে ঘাসের উপরে বসে বই নিয়ে দুটিতে পড়া আর ছবি দেখা, আর গল্প বলাবলি করতে থাকলো। ঘন বনের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে নালার জলে পড়েছে, সেখানে ছোট ছোট মাছ কিল্‌বিল্ করছে, গহন বনের মধ্যে ঝিঁঝিঁ ডাকছে, পাখী গান গাইছে, হনুমান গাছে-গাছে লাফিয়ে চলেছে, সবার উপরে বনের অন্ধকার গম্‌গম্ করছে—আরো কত কি দেখে শুনে ছেলে মেয়ে দুটি দিন কাটাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলা কাঠের বোঝা মাথায় তারা বনের তলা দিয়ে রোজ ফেরে; তখন দেখে বিকেলের রোদ গাছের তলায় চাকা-চাকা ছাওয়া ফেলেছে, বনের ফাঁক দিয়ে কোট্‌রার সরু মাস্তুলটা দেখা যাচ্ছে—দূর থেকে, আর চড়ার উপরে আগুন জ্বালিয়ে জুমনী-মা রাঁধতে বসেছে; কাছে ছোট ছেলেটা বালির উপর পা ছড়িয়ে আঙুল চুষ্‌ছে, কোলের মেয়েটা বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে খেলা করছে আর নৌকার ছাদে বসে মাচারু আর খোঁড়া দাড়ী হুকো টানছে।

একদিন রেঁধে-বেড়ে তারা খাবার উদ্যোগ করছে এমন সময়ে বনের মধ্যে থেকে মুকুন্দি হাঁটতে-হাঁটতে উপস্থিত।

মাচারু তাকে দেখেই মুখটা ভারি করে বল্লে—"এই যে আসছে!"

মুকুন্দি কাছে এসে বল্লে—"তবে একেবারে আমাকে ভুলে গেলে ভাই!"

মাচারু আম্‌তা-আম্‌তা করে বল্লে—"না, ভুলবো কেন?"

মুকুন্দি আর সে মানুষ নেই, যেন বুড়ো হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। সে একটা লাঠি ধরে নৌকোতে উঠে এলো। জুমনী তার দশা দেখে তাড়াতাড়ি তাকে বসবার একটা বৈঠে এগিয়ে দিয়ে বল্লে—"কিছু অসুখ হয়নি তো? বড় রোগা দেখাচ্ছে!"

মুকুন্দি ঘাড় নেড়ে আস্তে-আস্তে ভাঙা-গলায় বলে—"আর এ দেশ ছেড়ে চল্লুম!

'বোধ হয় এজন্মে আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় কিনা! কারবার গুটিয়ে নিয়েছি, পয়সাও জমিয়েছি, কিন্তু কি হবে এত পয়সা নিয়ে? যাদের হারিয়েছি তাদের তো আর ফিরে পাবোনা, বেঁচে আর সুখ কি!"

মাচারু চোখ-বুজে শুনে যাচ্ছে, একটি কথা কইছে না।

মুকুন্দি বল্লে—"আহা, আজ যদি আমার ছেলেটা কাছে থাকতো তো ভাবনা ছিল কি? সবই আমি নিজের দোষে হারিয়েছি।" বলে মুকুন্দি মস্ত একটা নিঃশ্বেস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে নোটোর মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লে—"মন দিয়ে লেখা-পড়া কাজকম্ম শিখো, বেঁচে থাকো আশীর্ব্বাদ করি। আঃ আমার ছেলেটা থাকলে তোরই মতো আজ এতবড়টি হতো।"

মুকুন্দিকে ঘাড় ধরে নৌকো থেকে নামিয়ে দিতে মাচারুর হাত নিস্‌পিস করতে লাগল—বুড়ো আবার ছেলের কথা পেড়েছে! কিন্তু মুকুন্দি যখন আপনিই লাঠি ধরে আস্তে-আস্তে চল্ল, তখন মাচারু তাকে বল্লে—"একটু তামাক......" এমনি কড়া সুরে এ-কথাটা মাচারু বল্লে যে মুকুন্দি ঘাড় নেড়ে বল্লে—"না ভাই, আর কাজ নেই; মন বড় খারাপ, তোমরা সুখে থাকো, আমি চল্লুম।"

মুকুন্দি চলে গেল। মাচারু গোঁ হয়ে কি ভাবতে লাগলো। সে-রাতে আর তার ঘুম এলোনা; একলাটি নৌকোর ছাদে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিলে। ভোর না হতে মাচারু কাউকে কিছু না বলে সোজা পোষ্টমাষ্টার-বাবুর কাছে আশা-শুন্তিতে হাজির!

সবে সকাল হয়েছে। পোষ্ট-আফিসের দরজা এখনো খোলেনি। বাগানে গোটাকতক হাঁস প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে ঘুরছে। ঘরের মধ্যে থেকে মাষ্টারবাবুর গড়গড়ার ভুর্ ভুর্ শব্দ আসছে। ফটক ঠেলে মাচারু আস্তে-আস্তে ঢুকলো। দূর থেকে মাষ্টারবাবু তাকে দেখে ডাক দিলেন—"এসো, এত সকালে যে! কি মনে করে? বোসো।"

মাচারু একধারে বসে বল্লে—"একটা কথা শুধোবো। আপনি তো জানেন মুকুন্দির স্ত্রীপুত্তুর কেউ নেই, পনোরো বছর হলো সে তার স্ত্রীকে দাইগিরি করতে সহরে পাঠায়। মুকুন্দির স্ত্রী তার কোলের ছেলেকে ডাক্তারকে দেখিয়ে, এক দালালনীর হাতে ছেলেটিকে দেশে মুকুন্দির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই দালালনীটা বজ্জাত ছিল। সে ছেলে চুরি করে তাদের দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করিয়ে দিন চালাতো। মুকুন্দির ছেলেটাকে সে চুরি করে পালালো, চারবছর তাকে মানুষ করলে, কিন্তু ভদ্র-লোকের ছেলেকে ভিখিরি করে তুলতে পারলেনা। তারপর তাকে সে রাস্তায় বসিয়ে সরে পড়লো। মরবার আগে তার সুমতি হয়েছে, তাই দারোগার কাছে সে বলেছে যে নোটো—"

পোষ্ট-মাষ্টার হুঁকো রেখে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—"বল কি? নোটো তাহলে মুকুন্দির হারানো-ছেলে?"

মাচারু উত্তর দিলে—"হুঁ। সেই কথাই দারোগা আমায় বল্লেন।"

পোষ্ট-মাষ্টার মাচারুর হাত ধরে বল্লেন—"এ কথা এতদিন বলতে হয়! আজই তো

মুকুন্দিকে এ খবর দেওয়া চাই,—সে চলে যাচ্ছে।"

মাচারু চোখ মুছে বল্লে—"এই দুমাস ধরে বলবো-বলবো করছি; বলতে পারিনে। ছেলেটাকে ছাড়তে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে মাষ্টার-মশায়! কত কবে তাকে যে মানুষ করেছি, কত যে ভালো তাকে বেসেছি দুজনে, কি বলবো। ছেলে-মেয়েগুলো পর্য্যন্ত তার বশ হয়ে গেছে। ফিরে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে বাবু! বড় দুঃখের ধন আমার নোটো।"

মাচারুর মুখ দেখে পোষ্ট-মাষ্টারের চোখে জল এলো; তিনি বল্লেন—"ফিরে তো দিতেই হবে মাচারু! আমি যদি তোর অবস্থায় পড়তুম তবে তুই কি আমাকে বলতিস-নে এখনি নোটোকে তার বাপের কাছে দিতে?"

মাচারু কেঁদে বল্লে—"সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি। আহা, কাল মুকুন্দি আমার ওখানে এসেছিল, তার দুঃখু শুনে, দশা দেখে আমার বুক ফেটে গেল; সারারাত ঘুম এলনা। নোটোকে আর রাখতে পারবোনা বুঝেছি।"

পোষ্ট-মাষ্টার বল্লেন—"তবে চলো, মুকুন্দির ওখানে আমিও যাই!"

মাচারু বল্লে—"আর একটা দিন নোটোকে কাছে রাখতে দাও মাষ্টার-বাবু!"

মাষ্টার ঘাড় নেড়ে বল্লে—"আর দেরী না মাচারু, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে।"

মাচারু কাঁদছে দেখে আবার তিনি বল্লেন—"শুভকাজে দেরি নয়রে মাচারু। আমার কথা শোন্, দেরী করিসনে!"

মাচারু কাঁদতে-কাঁদতে মাষ্টার-বাবুর সঙ্গে মুকুন্দির কাঠ-গোলায় চল্লো।

৪

ইস্কুল-বাড়িতে

হারানো-ছেলে নোটোকে নিয়ে মুকুন্দি-লাল, কোম্পানীর জাহাজে করে, সহরের দিকে এম্‌নি ভাবে কাউকে কিছু না বলে চলেছে, যেন মনে হচ্ছে, সে আর কারু ছেলেকে নিয়ে পালাচ্ছে।

এ যেন গরীব-গৃহস্থ হঠাৎ মাটি খুঁড়ে লাখটাকা পেয়ে গেছে। তার নোটো সে যে আর কাউকে ভালোবাসবে, সেটা তার সইবেনা, তাই সে জুমনীর আর মাচারুর আর লছমীর আর তার ভাই-বোন আর সেই ছৈ-ঢাকা ছোটখাটো কোট্‌রার থেকে অনেক দূরে নোটোকে নিয়ে একা থাকতে চাচ্ছে। আগে যেমন সে পয়সার জন্যে পাগল ছিল, কাউকে ভাগ দিতে চাইতনা, আজও তেমনি এই ছেলেকে নিজের করে নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

কলের জাহাজ যেমন ছুটেছে হুহু করে, বাঁশি বাজিয়ে, ধোঁয়া উড়িয়ে, নোটোর দিকে চেয়ে-চেয়ে মুকুন্দির মাথাতেও তেমনি নানা খেয়াল বিজ বিজ্ করে উড়ে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে-ঝাঁকে। কখনো সে দেখছে, যেন তার আদরের নোটো এমে-বিয়ে পাশ করে বেরিয়ে সরকারি জঙ্গলের হেডবাবু হয়েছে আর মুকুন্দি আফিসে যেতেই বড়-সাহেব তার পিঠ চাপড়ে বলছে—"হ্যালো মুকুন্দি, টোমার বেটা বহুট্ আচ্ছা কাম করিটেছে!" তার পরে খেয়াল হচ্ছে, যেন নোটো রায়-বাহাদুর খেতাব পেয়ে জরীর পোষাক পোরে, মাথায় পালকের টুপি এঁটে, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে দরবার থেকে বাড়ী এলো, পাড়ার

লোক তাকে দেখতে এসেছে, মেয়েরা সব নোটোকে জামাই করবার জন্যে ঘটকী পাঠাচ্ছে, অমনি একজন এক মেয়েব বাপ —রাজাবাহাদুরের জুড়ি গাড়ি এসে দরজায় লাগলো, তিনিও তাঁর মেয়ের জন্যে দরখাস্ত দিতে এসেছেন।

এদিকে নোটোও যে জাহাজের থেকে মুখ-ঝুঁকিয়ে দু-পারের গ্রাম আর বন মাঠ আর আকাশের দিকে চেয়ে কোনো স্বপ্ন না দেখছিলো তা নয়। তার চোখ ছলছল করছিল,—জুমনীর কথা, লছমীর কথা, মাচাক, খোঁড়া দাঁড়ী, ছোট ভাই বোন, সেই বন-গাঁয়ের ঘাটে-বাঁধা পুরোনো কোটুরার কথা ভাবতে-ভাবতে। সে যেন কোন্ রাজ্যে গিয়ে পড়েছিল,—সেই ছেলেবেলার খেলা-ধুলো, জলে সাঁতার, ঝিকিমিকি আলোর বনে-বনে ঘোরা, চাঁদের আলোয় বালির চড়ায় ছুটোপাটি, নদী বেয়ে নৌকো নিয়ে আনা-গোনা—সব আজ মনে আসছিল। হঠাৎ এ-সব ছেড়ে চলে এসে নোটো যে খুব সুখী হয়েছে তা নয়। কিন্তু এইখানে তার দুঃখু শেষ হলোনা, জাহাজ-ঘাটে নেমে মুকুন্দি তাকে একটা ঠিকে-গাড়িতে করে সহরের নানা গলি পেরিয়ে মস্ত-একটা বাজারে হাজির করলে; সেখানে একটা পালকের টুপি, নতুন সার্ট, গোলাপি মোজা, বার্নিস জুতো, মখমলের উপর জরীর গোটা-বসানো কোট-পেণ্টালুন পরিয়ে জুমনীর হাতের সেলাই-করা পুরোনো খালাসির সাজ ছাড়িয়ে দিলে। নোটোর মনে হলো যেন পুরোনো কাপড়গুলো ধুলোয় পড়ে তার সঙ্গে চিরদিনের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে কাঁদছে। তারপর অন্ধকার গলির মধ্যে বাসা-বাড়ী। নোটোর সেই-সব দিনের কথা মনে পড়লো যখন দালালনী তাকে দুবেলা দুমুঠো এমন করে দিতো যে, কুকুরকেও তেমন কেউ দেয় না। সেখান থেকে ইস্কুলের বেঞ্চি, মাষ্টারের বেত, হেড-মাষ্টারের চোখ-রাঙানী, মোটা-মোটা বইগুলোর হিজিবিজি হ য ব র ল! তারপর রোজ সন্ধ্যেবেলা হোষ্টেলের গরম ঘরে পিদিম জ্বেলে রাত জেগে পড়া-মুখস্থ, নোট লিখতে কেবলি মাথা-ঘামানো। ঘুরে-ফিরে নোটোর মন ছৈ-ঢাকা পুরোনো নৌকোর দিকেই টানতে লাগলো; আর পড়বার বইগুলোর পাতায়-পাতায়, নোটের খাতায় কেবলি সে নৌকা এঁকে চল্লো-ছৈ ঢাকা তাদের পুরোনো কোটুরা! কখনো সেটা বইয়ের পাতার ধার দিয়ে ছাপার অক্ষরগুলোতে ধাক্কা খেতে-খেতে উপরে উজিয়ে চলেছে, কখনো উপর থেকে নীচে নামছে ১৮২ পৃষ্ঠার ঘাট ছেড়ে সমাপ্তির দিকে। কোথাও নৌকো এক শক্ত অঙ্কের ঠিক মাঝে এসে কাৎ হয়ে গেছে; কখনো ম্যাপের আরব্য-উপসাগরে নৌকোটা পাল তুলে নিশেন উড়িয়ে নির্ভয়ে চলেছে। ভূগোলের যেখানে নদীর নাম, সেখানে হাবড়ার পুল এঁকে তার নীচে দিয়ে নোটো নৌকো চালিয়ে দিয়েছে; পুলের উপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে—ধোপার গাধা সারি-সারি। "নীতি-চর্চ্চা"র সব পাতায় লেখা মাচাক তামুক টানছে; প্রাণী-বৃত্তান্তের বইখানার পাতায় লেখা ছেলেরা ছিপে মাছ ধরছে; অঙ্ক-পুস্তকে এ বি সি লেখা একটা জ্যামিতি-সমস্যাকে ঘুড়ির লকে

বেঁধে ছেলে ওড়াচ্ছে—করে দিয়েছে। সংস্কৃত গঙ্গা-স্তোত্র যেখানে, সেখানে কালির চড়া তাতে একটা নোঙর-বসানো, নৌকো নেই! ক্ষেত্র-তত্ত্ব যেখানে, সেখানে পাতায়-পাতায় নোটো জলের ঢেউ টেনে গেছে আর বানে সব মরা গোরু ভেসে যাচ্ছে—লিখেছে। সেকেণ্ড মাষ্টার-মশায় একদিন যখন এই বইগুলো ইস্কুলের হেড-মাষ্টারের সামনে হাজির করে দিলেন, তখন নোটোর বাপের ডাক পড়লো।

হেড মাষ্টার মুকুন্দিকে বইগুলোর চিত্তির-বিত্তির দেখিয়ে বল্লেন—"এ ছেলের কিছু হবে না, অনর্থক পয়সা নষ্ট করছ, নিয়ে যাও, নৌকোর মাঝি করে দাওগে।"

মকুন্দি মাথা-চুলকে বলে—"আর একটা বছর রেখে দেখুন।"

হেড-মাষ্টার ঘাড় নেড়ে বল্লেন—"রাখতে চাও রাখো, ওর লেখাপড়া হবে না।"

লছমির সঙ্গে পাখীর গানে সোনার রোদে ভরা বনগ্রামের পাঠশারখানির পোড়ো সে নোটো, সহরের ইস্কুল-মাষ্টারের রুল খেতে-খেতে ক্রমে প্রথম শ্রেণী থেকে নামতে-নামতে ইস্কুলের সব-নীচের শ্রেণীতে এসে বসলো। বুড়ো মুকুন্দি মাথায় হাত দিয়ে পড়লো। সরকারি জঙ্গলের হেডবাবু হওয়া দূরে থাক্, বরণ-কোম্পানীর কেরাণী যে হতে পারে নোটো—এমন আশাও নেই। তার স্বপ্নে সরকারি জঙ্গলের হেড বাবু, রায়-বাহাদুর, পাড়া-পড়সী, ঘটক ঘটকী রাজাবাহাদুরের এক মেয়ে নিয়ে—নোটোর ক্লাশ-নামার সঙ্গে-সঙ্গে মিলোতে মিলোতে দূরে অদৃশ্য হলো। সে নোটোকে ধমকে মিনতি করে খুব দামী প্রাইভেট্ টিউটারের লোভ দেখিয়ে কিছুই করতে পারলে না। নোটো চেষ্টা করতো ভালো পড়তে, কিন্তু মাসে-মাসে লছমির হাতের লেখা ছোট চিঠি যখন পেতো তখন মন তার কিছুতে বসতে চাইতোনা—ইস্কুলের বেঞ্চিতে, পুঁথির পাতায়। প্রত্যেক চিঠিতে লছমি লিখছে—"এ সময় তুমি যদি আমাদের কাছে থাকতে।" একটা নতুন পাখী বনে এসেছে, লছমি লিখলে—"তুমি যদি থাকতে তো ভারি মজা হতো। বাবা একটা বড় মাছ ছিপে ধরেছে, তুমি থাকলে বেশ হতো। ছোট বোন হাঁটতে শিখেছে, তুমি থাকলে কি মজাই হতো। পুরোনো নৌকো ভেঙে প্রায় অচল হয়েছে—এ সময় তুমি থাকলে যা হয় একটা সুরাহা হতো।" নোটো চিঠি পড়ে বুঝলে, সে না-থাকাতেই যত গোল বাধছে। সে যত তাড়াতাড়ি পারে ইস্কুলের পড়া শেষ করে দেশে যাবার জন্যে কোমর-বেঁধে মন দিয়ে এবার পড়ায় লাগলো। ছেলে আজকাল ভালো পড়ছে শুনে মুকুন্দির আহ্লাদ ধরেনা; তার মাথায় আবার জঙ্গলের বড়বাবু দেখা দিলেন—খেয়ালের ফাষ্টক্লাস গাড়ীতে চলে। নোটো এখন আর বই থেকে চোখ তোলে না। এই সময় লছমির শেষচিঠি এলো। সঙ্গে-সঙ্গে যেন জলের বাতাস এসে তার ঘরের মধ্যে পৌছলো; তার মনের মধ্যে পড়ার-ধমকে-চুপ-করানো বনের পাখী আবার গেয়ে উঠলো। নোটো বই বন্ধ করে চিঠি-খানি আস্তে আস্তে খুলে দেখলে—লছমি চিঠির উপরে তাদের নৌকোটির একটা

আঁদুবাঁকা ছবি দিয়েছে—তার গায়ে একটা টিকিটে লেখা—"পুরাতন কাঠের দরে বিক্রয় করা যাইবে।" এই ছবির নীচে লছমি বাকাচোরা অক্ষরে লিখেছে—"কোট্‌রা আর জলে ভাসবেনা, সব শেষ। মা বাবা বড় দুঃখে আছেন, এ সময় তুমি কাছে নেই, কি আর জানাবো, আমাদের কি দশা হবে কোথায় দাঁড়াবো। কাল এক কাঠওয়ালা নৌকো দেখে গেছে, দরদাম আজ দেবে।"

সে রাতে নোটো স্বপ্ন দেখতে লাগলো, যেন জাহাজ তাকে নিয়ে হুহু করে আশাশুস্তির ঘাট পেরিয়ে যাবার জোগাড় করছে। দূর থেকে আরো দূরে তাদের ঘাটে-বাঁধা কোট্‌রা। নোটো দেখলে, সেখানে লছমি দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাকে ডাকছে। নোটো চীৎকার করে বল্লে—"এই খালাসী, ঘাটে ভেড়াও!" চীৎকার শুনে মুকুন্দি নোটোর ঘরে এসে দেখে, সে বিছানায় ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে বকছে—"ঘাটে ভেড়াও, ঘাটে ভেড়াও, একবাঁও দুইহাত, একবাঁও দেড়হাত!" যেন নোটো একটা নৌকো চালিয়ে যাচ্ছে—স্বপ্ন-নদীর উপর দিয়ে। মুকুন্দির ভয় হলো। সে নোটোর কপালে হাত দিয়ে দেখলে জ্বর! তার হাতের কাছে চিঠিখানা পড়েছিল, সেটা দেখে মুকুন্দি সব বুঝলে। তারপর ডাক্তার আনতে পাঠিয়ে সে আশাশুস্তির ঠিকানা দিয়ে একটা চিঠি ডাকে ফেলে দিলে।

* * *

অনেকদিন পরে জ্বর-বিকার থেকে নোটো সেরে উঠেছে। ডাক্তার তার পড়া বন্ধ করে মুকুন্দিকে হাওয়া-বদলের পরামর্শ দিয়েছেন। মুকুন্দি নোটোকে নিয়ে সুন্দর-বনে আবার ফিরেছে। আজ বনের মধ্যে বাঁশী বাজলো,—নোটো আর লছমির বিয়ে। নদীর তীরে বিয়ের আটচালা বাঁধা হয়েছে। পোষ্ট-মাষ্টার সেদিন গরদ পোরে পৈতে ঝুলিয়ে পুরুত হলেন। বিয়ে হয়ে গেল। আর অমনি সবাই দেখলে—মুকুন্দির কাঠগোলা থেকে পুরোনো কোট্‌রা, নতুন রং নতুন সাজে সাজিয়ে, হলদে ধুতি গোলাপি চাদর-পরা খোঁড়া দাড়ী, আস্তে-আস্তে ঘাটে ভেড়ালে। নৌকোর সবুজ খোলের উপর লাল দিয়ে বড় করে লেখা—"নোতোন কোট্‌রা।"

মুকুন্দি মাচারুকে বল্লে—"ভাই, নোটোর সঙ্গে তোমার নৌকোটাও ফিরে দিলুম, ওটোও আমার সইলনা।"

হাত ধরাধরি করে বর-কনে নিয়ে, আর জুমনী ও ছেলেদের নিয়ে মাচারু নতুন কোট্‌রায় আর-একবার চড়ে বসলো। পুরোনো কোট্‌রা নতুন করে জলের পরশ পেয়ে, ঘাটে ঘাটে ভিড়তে-ভিড়তে নাচতে নাচতে হেলতে-দুলতে মাল উঠিয়ে মাল নামিয়ে চল্লো—জোয়ারের মুখে, ভাঁটার টানে বান কাটিয়ে নতুনতরো ব্যাপার করতে।

সেই সময় বুড়ো মাচারু বুড়ী জুমনীকে বল্লে—"কি গো, দারোগার কাছে ছেলেটাকে দিয়ে আসতে কয় তো এইবেলা বলো।"

জুমনী মুখ ঝোঁকিয়ে বল্লে—"রক দেখো!" তারপর ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করে মুগ্‌গু ভাজতে বসলো।

সমাপ্ত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অঘোরপন্থা

কাচের পেয়ালা ভেঙ্গে ফেল্ তোরা, লওরে অধরে তুলি'
— শ্মশানের মাটী লাগিয়াছে যা'য়—মড়ার মাথার খুলি।
ভাবে বুঁদ হ'য়ে, বুদ্‌বুদে ভরা,
বাসনার রঙ্গে রাঙ্গা-রঙ্-করা,
নীর নাহি যায়, বহ্নির প্রায় সুরায় পড়গো ঢুলি'
টিটকারী দাও মৃত্যুরে, লও মড়ার মাথার খুলি
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড়গো সবাই ঢুলি'।

আমরা ডরি না মৃত্যুরে কেউ—শব শিব একাকার,
জীবন সুরায় নিঃশেষ করি' দেখি যে 'তলানি'-সার।
তখন মাথাটি ঝিম্ ঝিম্ করে,
ব্রহ্মরন্ধ্র বুঝি ফেটে পড়ে,
জ্ঞান কয়, এই জগৎ যেন রে মড়ারই মাথার খুলি—
কঠিন, সুগোল—সবটাই খোল্—সুরায় ভরিয়া তুলি'
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড়গো সবাই ঢুলি'।

জ্বলে' যাক্ বুক বুকের পাঁজর, ঢাল খাও ঢাল খাও!
কঙ্কাল-ভাঙ্গা করোটির বাটি সবারে ঘুরায়ে দাও।
শুনছ কি গান গায়িতেছে তারা,
মরণের পারে গিয়াছে যাহারা?
সে গান শুনিয়া শিহরি' আকাশে তারকা উঠিছে দুলি'।
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে তবু, আমরা তাহাতে ভুলি!
টিট্‌কারী দাও, দাও টিট্‌কারী—
পড়গো সবাই ঢুলি'!

জীবন মধুর, মরণ নিঠুর—তাহারে দলিব পা'য়,
যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়।
দেবতার মত কর সুধাপান,
দূর হ'য়ে যাক্ হিতাহিত জ্ঞান,
আমরা বাজাব প্রলয়-বিষাণ শম্ভুর মত তুলি'—
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি।
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড়গো সবাই ঢুলি'।

দেহের সকল রক্তকণিকা উতরোল উতরোল!
ও কি ও মধুর হাস্য বিকাশি' জগৎ দিতেছে দোল।
অপরূপ নেশা—অপরূপ নিশা!
রূপের কোথাও নাহি পাই দিশা—
সোণা হয়ে যায়, সোণা হয়ে যায় শ্মশানভস্ম, ধূলি।
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি,
চুমকে চুমুক দাও বার বার—
পড়গো সবাই ঢুলি'।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

ফস্কা গেরো

(বা ভামিনী-জীবনীর ২য় পরিচ্ছেদ)*

ক

আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম ভামিনী সেদিন সবেমাত্র ঘরের চৌকাঠে পদার্পণ করিয়াছেন, দুর্গাকালী অমনি ছুটিয়া আসিয়া চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "ওগো টিকিট? টিকিটখানা কোথায়?"

ভামিনী বোকার মত ক্যাল্‌ক্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন—আপ-ব্যাং কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

দুর্গাকালী হতাশ স্বরে বলিয়া উঠিল, "আর কি, যা ভেবেচি তাই! হারিয়েচ ত? আমার মাথাটি খেয়েচ ত? বেশ করেচ!"

---

* শ্রাবণমাসের 'ভারতী'তে "বেম্পতিবারের বারবেলা" নামে গল্পটি ভামিনী-জীবনীর প্রথম পরিচ্ছেদ। ভবিষ্যতেও ভামিনীভূষণের বিচিত্র জীবনের আরও অনেকগুলি ঘটনার কথা আমরা একে একে পাঠকগণকে জানাইব। ভামিনী-জীবনীর প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ এক-একটি সম্পূর্ণ ছোটগল্প।

দুর্গাকালীর নয়ন-তটে বাঁধ ভাঙিয়া অশ্রু-বন্যা উথলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া ভামিনীভূষণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "কি বিপদ! আহা, আগে কি হয়েচে সেটা খুলেই বল ছাই! তা নয়,—একেবারে অশ্রু-বর্ষণের চেষ্টা! একেই ত বাইরের বর্ষার চোটে পায়ের জুতো পর্য্যন্ত ট্যাকা শক্ত হয়ে উঠেচে, তার ওপরে ঘরের ভেতরেও তুমি যদি এত ঘনঘন অশ্রুবৃষ্টি সুরু কর, তাহলে এখানে আমার মন ট্যাকাও আরো-বেশী শক্ত হয়ে উঠবে।"

দুর্গাকালী ভাঙা-ভাঙা গলায় বলিল, "হবে আর কি। যা হবার তাই হয়েচে। যে পাথর-চাপা কপাল আমাদের। এতকাল পরে যদিই-বা একটু সুরাহা হ'ল, তা টিকিট-খানা তুমি ত হারিয়ে বসে আছ?… কি হয়েচে জানো? আমরা লটারিতে জিতেচি। এই দেখ চিঠি! হায়, হায়, হায়!"

তখন ভামিনীর ধাঁ করিয়া মনে পড়িয়া গেল! হ্যাঁ, মাস-কতক আগে একজন লোক জোর করিয়া তাঁহাকে একখানা "বিচিত্র লটারি"র টিকিট গছাইয়া গিয়াছিল বটে। স্ত্রীর হাত হইতে কস্‌-করিয়া চিঠিখানা টানিয়া এক-নিশ্বাসে তিনি পড়িয়া ফেলিলেন। চিঠিতে লেখা আছে, ভামিনীভূষণ "বিচিত্র লটারির"র দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। একসেট গৃহসজ্জার দ্রব্য তাঁহার পাওনা।

পত্র হইতে মুখ তুলিয়া ভামিনী দেখিলেন, দুর্গাকালীর গাল বহিয়া ততক্ষণে সত্যসত্যই অশ্রুবৃষ্টি হইতেছে।

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কান্নায় ক্ষান্ত দিয়ে শান্ত হও প্রিয়ে, শান্ত হও। তোমার টিকিট আমি হারাই-নি গো!"

মধুর দখিনায় যেন একমিনিটে ঝর-ঝর বর্ষা কাটিয়া গেল! দুর্গাকালী একেবারে স্বামীর বুকের উপরে পাগলের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "হারাও নি? হারাও নি? যাও—যাও, এক্ষুনি জিনিষগুলো নিয়ে এস—আঃ, বাঁচলুম শুনে।"

—"নাও কথা। ছুট্ বল্‌লেই কি ছুট্ দেওয়া যায়? দাঁড়াও, আগে আপিসের জামা-কাপড় ছাড়ি, মুখ-হাত ধুয়ে জল-টল্ খেয়ে একটু ঠাণ্ডা—"

—"না না, আগে জিনিষগুলো নিয়ে এসে বাড়ীতে পুরে তারপর যত-খুসি ঠাণ্ডা হোয়ো। দেরি হ'লে যদি সব আবার ফস্‌কে যায়। যে আমাদের কপাল। গেলেই হোলো।"

খ

গৃহসজ্জার দ্রব্য দেখিয়া ভামিনীভূষণের চক্ষু স্থির! এযে রাজ-অট্টালিকার যোগ্য! তাঁহার সেই ছাদ-ভাঙা, স্যাঁৎসেতে, এঁদো-পড়া বাসা-বাড়ীর পায়রা-খোপের মত পাঁচটি ঘর—তাহার মধ্যে এই চকচকে-ঝকঝকে দামী জিনিষগুলি দেখিতেও মানাইবে না, রাখিতেও ধরিবে না। এ ত ভারি মুস্কিলের কথা।

ভামিনী প্রথমেই দেখিলেন, একটা প্রকাণ্ড—যেমন উঁচু তেমনি চওড়া—আলমারি, তাহার ভিতরে চেষ্টা করিলে হয়ত একটা আস্ত ঘোড়াকেই পুরিয়া ফেলা যায়! একটা দেরাজ-টানা-শুদ্ধ বনাত-মোড়া মস্ত টেবিল, তাহার উপর অনায়াসে ভামিনীভূষণ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে শুইয়া থাকিতে পারেন! একখানা বিরাট আরসি

তাহার মধ্যে চার-চারজনের পূর্ণ-প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে, একসঙ্গে! আর একটা সাজ-গোছ করিবার টেবিল—তাহার উপরেও দু-দুখানা বড়-বড় আয়না! এ-ছাড়া মার্ব্বেলের দুটি ত্রিপায়া, দুখানা কৌচ, দুখানা আরাম-কেদারা ও চারখানা গদি মোড়া চেয়ার প্রভৃতি জিনিষও আছে। ভামিনীভূষণের বুকটা ধুক্-পুক্ ধুক্পুক্ করিতে লাগিল। 'এই-সব জিনিষ আমার বাড়ীতে? লোকে বলিবে কি।' সৌভাগ্যের মধ্যে যে এত-বড় দুর্ভাগ্য লুকাইয়া থাকিতে পারে, ভামিনীভূষণ আগে তা মোটেই জানিতেন না!

সন্ধ্যার সময় জন-চল্লিশ মুটে যখন 'হট্ যাও, হট্ যাও' করিতে করিতে লোক তাড়াইয়া ভামিনীভূষণের বাসার সাম্‌নে আসিয়া সারে সারে দাঁড়াইয়া গেল, তখন পাড়ায় দস্তুরমত একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। এবং আশপাশের বাড়ীগুলোর জান্‌লায় জান্‌লায় কৌতূহলী পাড়াপড়্‌সীদের মুখ দেখিয়া ভামিনীভূষণ ক্রমেই অধিক-মাত্রায় দমিয়া যাইতে লাগিলেন।

এমন-কি পাড়ার মুরুব্বি এবং পাঠকদের পূর্ব্ব-পরিচিত গঙ্গারাম হাতী-মহাশয়ও বিস্ময় সম্বরণ করিতে না পারিয়া, খড়ম পায়ে নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ ভামিনীবাবু, এ জিনিষগুলো কাদের?"

ভামিনী অত্যন্ত ম্রিয়মান স্বরে, অপরাধীর মত কাঁচুমাচু মুখে বলিলেন, "আমাদের।"

গঙ্গারাম ভারি হতভম্ব হইয়া গেলেন,—ভামিনীর কথায় বোধহয় তিনি বিশ্বাস করিলেন না।

এর-পর বাড়ীর উপরে আসবাব-তোলার পালা। সে কি যে-সে ব্যাপার? সমস্ত বাড়ী-খানা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—যেন ভূমিকম্প উপস্থিত! তারপর সরু সিঁড়ির উপরে যখন আসবাবে ও মুটেতে কুস্তি বাধিয়া গেল, ভামিনীভূষণ তখন নিরাপদ ব্যবধানে সরিয়া গিয়া মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিলেন, আসবাব, মুটে আর সিঁড়ি—আজ আর কাহারোই অস্তিত্ব থাকিবে না!

দুর্গাকালী একটা হারিকেনের লণ্ঠন লইয়া সিঁড়ির উপরে দাঁড়াইয়া উদ্বিগ্নস্বরে বলিল, "ওরে এই মুটেরা! আস্তে আস্তে তোল! জিনিষ ভাঙ্‌লে তোরা পয়সা পাবি না, তা কিন্তু আগে থাকতে বলে দিচ্ছি।"

সব-চেয়ে হুলস্থুল বাধিল বড় আল্‌মারিটা লইয়া। সিঁড়ির বাঁকের মুখে গিয়া সেটা কোনমতেই আর মোড় ফিরিতে চাহিল না—লাভের মধ্যে দু-চারিবার ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিতেই সিঁড়ির পচা-ঝর্‌ঝরে রেলিংগুলো হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িল। তখন দড়ী বাঁধিয়া বারান্দা বাহিয়া সেটাকে অনেক কষ্টে দ্বিতলে হিড়্ হিড় করিয়া টানিয়া তোলা হইল।

চল্লিশটা মুটেকে কুড়িটাকা পারিশ্রমিক দিয়া ভামিনীভূষণ মুখটি চূণ করিয়া আস্তে আস্তে উপরে উঠিলেন।

দুর্গাকালী ততক্ষণে মহা-উৎসাহের সহিত গাছ-কোমর বাঁধিয়া ঝাঁটা-হাতে আসবাব-গুলোকে ঝাড়-পুঁছ করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

ভামিনীভূষণ শয়ন-কক্ষে ঢুকিতে গিয়া, প্রথমেই টেবিলের গায়ে একটা বিলক্ষণ কষ্ট-দায়ক ধাক্কা খাইলেন। তারপর টাল্ সাম্‌লাইয়া চাহিয়া দেখিলেন, ঘরের ভিতরে আর

তিল-ধারণের ঠাঁই নাই! খাটখানাকে একেবারেই অকেজো ও অনাবশ্যক-বোধে টানিয়া এককোণে সরাইয়া, আলমারির জন্য স্থান সংকুলান করা হইয়াছে। খাটের সাম্‌নে কতকগুলো আসবাব এমন ভাবে সাজানো রহিয়াছে যে, হরেক-রকম জিম্‌নাষ্টিকের কসরৎ না জানিলে খাটের উপরে কোন মতেই উঠিতে পারা যাইবে না। ঘরের আর-একদিকে দুটো জান্‌লার দেড়খানা ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া আছে আরসিখানা।

ভামিনীভূষণ সমস্ত দেখিয়া খানিকক্ষণ বোবা বনিয়া থ হইয়া রহিলেন। তারপর শুক্‌নো গলায় বলিলেন, "ওগো, শুন্‌চ?"

দুর্গাকালী চেয়ারগুলো ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "কি?"

—"আসবাবগুলো বেচে ফেল। অনেক টাকা পাওয়া যাবে!"

দুর্গাকালীকে কে যেন ভারি শক্ত-রকমের একটা গালাগালি দিল! ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে ফোঁশ্‌ করিয়া বলিয়া উঠিল, "অমন লক্ষ্মীছাড়ার মত কথা মুখেও এন না। এমন-সব জিনিষ পেলে লোকে ভাগ্যি মেনে বর্ত্তে যায়, তিনপুরুষ ধরে ভোগ-দখল করে—আর উনি চাইচেন কিনা সব বিক্রী করতে! বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরি!"

স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করার স্বভাব ভামিনীভূষণের ছিল না, তিনি এতক্ষণ পরে নীরবে আপিসের জামা-কাপড় খুলিতে লাগিলেন।

দুর্গাকালী তারিফ করিয়া বলিল, "দেখ দেখি কি চমৎকার দেখতে হয়েচে, চোখ যেন জুড়িয়ে যায়! আমি যেমন ঘর সাজা-বার জন্যে হেদিয়ে মরতুম,—তা এতদিনে ভগবান আমার সে সাধ পূর্ণ করলেন!"

ভামিনীভূষণ বলিলেন, "একি আর ঘর-সাজানো হয়েচে, না ঘরটাকে অন্ধকার গুদোম করে' তোলা হয়েচে! এ ঘরে বাস করা আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।"

দুর্গাকালী খুব সহজ ভাবেই বলিল, "এ ঘরে থাক্‌বে কে? সেদিন মকরের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম, মকরের বাড়ীর পাশেই একখানা দিব্যি বড়সড় খালি-বাড়ী দেখে এসেচি। তুমি কাল্‌কেই গিয়ে সেই বাড়ীখানা ভাড়া করে' এস-গে।"

এইবারে ভামিনীভূষণ একটু বিদ্রোহ প্রকাশের চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "তুমি বল কি! আজ এই চল্লিশটা মুটের ঠ্যালা সাম্‌লাতেই আমার আধহাত জিভ বেরিয়ে পড়েচে, এর ওপরে যদি আবার আমাকে বাড়ীভাড়া আর মুটেভাড়া করতে হয়, তাহলে—"

দুর্গাকালী বাধা দিয়া বলিল, "তবে কি এই দামী জিনিষগুলো—"

—"তোমার দামী জিনিষ চুলোয় যাক্‌! ও-সব বাড়ী ভাড়া-টাড়া আমাকে দিয়ে হবে না—আমার মাইনের দিকে আগে দেখতে হবে ত? এদিকে ক্ষিদেয় আমার পেট চুঁই-চুঁই করচে, তোমার আলমারি-দেরাজ টেবিল-চেয়ার ভক্ষণ করে ত আমার পেট ভরবে না,—এখন আমাকে খেতে-টেতে দেবে কিনা বল!"

দুর্গাকালী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "খালি পেটের কথাই ভাবতে শিখেচ, আমি তোমার কেউ নই—না?"—এই বলিয়া সুর

করিয়া সে আরো যে-সব কথার তুবড়ি ফুটাইয়া গেল, তাহার সংক্ষিপ্ত সার-মর্ম্ম এই যে, ভামিনীভূষণ ক্রমেই অধিকতর অভদ্র হইয়া উঠিতেছেন, বিবাহের পূর্ব্বে এতটা জানিতে পারিলে, সে কখনই তাঁহাকে —ইত্যাদি, ইত্যাদি,—এবং এই-সব কথা বলিতে বলিতেই দুর্গাকালীর দুঃখিত নয়ন-দুটির প্রান্তে সেই বিখ্যাত জিনিষের সঞ্চার হইল, যাহার কাছে পুরুষের সকল যুক্তি তর্কই নাকে খৎ দিতে বাধ্য!

ভামিনীভূষণ ফাপরে পড়িয়া বাহিরের দিকে চাহিবামাত্র দেখিলেন, সরু গলির ওপারে নিজের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া, ঈগলচক্ষু গঙ্গারাম হাতী-মহাশয় নির্নিমেষ-নেত্রে তাঁহাদের দুজনের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছেন। গঙ্গারামের মুখ-চোখ দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছিল, প্রতিবেশীর শয়নকক্ষের দৃশ্যটা তিনি যৎপরোনাস্তি উপভোগ করিয়া লইতেছেন।

ভামিনীভূষণ তখনি দুম্‌দাম্‌ করিয়া ঘরের জান্‌লাগুলো বন্ধ করিয়া দিলেন।

এমন-একটা সরস অভিনয়ের উপরে অসময়ে যবনিকা পড়িয়া গেল দেখিয়া, গঙ্গারাম হাতী নিরাশ হইয়া আপন মনেই বলিলেন, "কাঙালের ঘোড়া রোগ হয়েচে রে! দেখ, হাতই ভাঙে কি ঠ্যাংই খোঁড়া করে।"

গ

সপ্তাহ-খানেক কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে ভামিনীভূষণ খাটের উপরে আসবাব ডিঙাইয়া চটপট্‌ লাফাইয়া উঠিতে এবং লাফাইয়া নামিতে রীতিমত ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছেন।

দুর্গাকালীও এ-কয়দিন ভামিনীভূষণকে অসম্ভব-রকম যত্নাদর করিতেছে—নূতন বাড়ী-ভাড়ার কথা ভুলিয়াও মুখে আনে না। কিন্তু অর্দ্ধাঙ্গিনীর এই নীরবতা দেখিয়া ভামিনীভূষণ বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। কারণ, তিনি স্বচক্ষে সমুদ্র-দর্শন না-করিলেও কেতাবে পড়িয়া জানিয়াছিলেন যে, ঝড়ের পূর্ব্বে দুরন্ত সমুদ্রও থাকে অত্যন্ত শান্ত।

অবশেষে একদিন ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা গেল।

সেদিন নূতন আল্‌মারিটা কি-কারণে খুলিয়াই দুর্গাকালী হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে চ্যাচাইয়া উঠিল।

ভামিনীভূষণ তখন গৃহতলে স্থানাভাবের জন্য বড় টেবিলটার উপরে বসিয়া, একখানা কাপড় কোঁচাইতে ব্যস্ত ছিলেন। স্ত্রীর আর্ত্তনাদে মাথা তুলিয়া বলিলেন, "কি, কি? কি হ'ল?"

দুর্গাকালী আলমারির ভিতর-দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখ তোমার কীর্ত্তি এসে!"

ভামিনীভূষণ স্ত্রীর কাছে গিয়া দেখিলেন, আলমারির নীচের তাকে কাচ্চা-বাচ্চা-সমেত একটা অনাহুত নেংটি-ইঁদুর আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

ভামিনীভূষণ চটিয়া বলিলেন, "এটা আমার কীর্ত্তি কি-রকম?"

দুর্গাকালী স্বামীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল, "তোমার কীর্ত্তি নয়? বললুম এ বাড়ী ছেড়ে উঠে যেতে, তা সেদিন আমায় তুমি যেন তেড়ে মারতে এলে।

এখন দেখচ ত ব্যাপার! এরি-মধ্যে নেংটি-ইঁদুর এসে বাসা বেঁধেছে, আর দুদিন-বাদেই আমার এত-সাধের জিনিষগুলো কেটেকুটে সব ছারখার করে' দেবে!" (একটু থামিয়া, স্বামীর কাছ ঘেঁসিয়া, স্বর বদলাইয়া) "হ্যাঁগা, তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথা তুমি শুনবে না? লক্ষ্মীটি, আমার মাথা খাও! শুনচ? ওগো!" এই বলিয়া দুর্গকালী স্বামীর কণ্ঠে দুখানি বাহু গ্রথিয়া, তাঁহার শ্মশ্রুগুম্ফাবৃত ওষ্ঠাধরে বখ্‌শিস দিল প্রেমসরস একটি চুম্বন।

এই আচম্‌কা আদরে ভামিনীভূষণের মনটা অবশ্যই একটু গলিয়া আসিল—কিন্তু মনের ভাবটা যাহাতে বাহিরে প্রকাশ না পায়, সে-বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সতর্ক হইয়া রহিলেন।

তথাপি ভামিনীভূষণের অবস্থাটা সমাধিগ্রস্তের মত দেখিয়া, দুর্গাকালী বিনাইয়া বিনাইয়া তাহার সাধা গলার পুরনো সুর ধরিল, "ওগো মাগো, এমন লোকের হাতে পড়েছিলুম গো—"

আবার অশান্তির সূত্রপাত। ভামিনীভূষণ হতাশভাবে বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দেৎতোরি! বিয়ে করা কি ঝকমারি! রোজ রোজ আর ঘ্যানর ঘ্যানর ভালো লাগে না, এ বাড়ী ছেড়ে উঠে যেতে চাও, তাই হবে! ওঃ, কি একগুঁয়ে তুমি! বলচি আমার অত টাকা নেই—তা কিছুতেই শুনলে না? তোমরা—মেয়েরা হ'চ্ছ চালকহীন রেলগাড়ীর মত. সামনের পোল ভাঙা দেখেও সেইদিকেই মরিয়া হয়ে ছুটবে!"

ঘ

ভামিনীভূষণ নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। আগেই মুটে-ভাড়ায় তাঁহার কুড়িটাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল। এবারেও মুটে ও বাড়ী ভাড়ায় তাঁহার প'চিশ ও পঞ্চাশ টাকা খরচ হইয়া গেল! তাহার উপরে এই বড় বাড়ীখানার ভাড়া তাঁহাকে মাসে মাসে গুনিয়া দিতে হইবে।

ভামিনীভূষণ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া মানস-নেত্র ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ভবিষ্যতের বর্ণ কাফ্রীর চেয়েও ঘুটঘুটে কালো। যেদিন তিনি লটারির টিকিট কিনিয়াছিলেন, অনুতপ্ত ভামিনীভূষণ এখন সেই অমঙ্গুলে দিনটার উপরে বারংবার অভিশাপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দুর্গাকালী কিন্তু ভাবনা-চিন্তার কোনই ধার ধারে না। সাজানো ঘর পাইয়া সকল কথাই সে ভুলিয়া গিয়াছে, দিন-রাত হাসি-হাসি মুখে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এটা মুছিতেছে, ওটা ঝাড়িতেছে। দুর্গা-কালী এখন সেইস্থানে,—যাহার নাম আনন্দের সপ্তম স্বর্গ।

কিন্তু দুর্গাকালীর দগ্ধাদৃষ্টে ভগবান বেশীদিন স্বর্গবাস লিখেন নাই। অত্যন্ত-হঠাৎ একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল।

ব্যাপারটা খুলিয়া বলাই ভালো।

.. ..

ভামিনীভূষণ একদিন আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, বড় ঘরটার ভিতর হইতে সেই মস্ত-মস্ত আলমারি, টেবিল, আরসি, কৌচ ও চেয়ার প্রভৃতি সমস্ত আসবাব যেন আলাদিনের

বাজীর মত কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং শূন্য ঘরের মেঝেতে পড়িয়া দুইহাতে মুখ চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে দুর্গাকালী, আর তাঁহার ছোটভাই তারিণীভূষণ অনেক চেষ্টা করিয়াও বৌদিদির সে বিষম কান্না থামাইতে পারিতেছে না!

স্বামীর সাড়া পাইয়া দুর্গাকালী আরো চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওগো আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে গো!"

ভামিনীভূষণ বিস্মিত স্বরে ছোটভাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে তারিণী, একি ব্যাপার? ওই-বা কাঁদচে কেন, আর আসবাবগুলোই-বা গেল কোথায়?"

তারিণীভূষণ যাহা বলিল, তাহার সার-মর্ম্ম এই:—

"বিচিত্র লটারী"র স্বত্বাধিকারী সঞ্চিত টাকা-কড়ি লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। আসবাব-বিক্রেতা "মুখার্জ্জি-কোম্পানী"র নিকট হইতে যে জিনিষগুলো সে ভাড়া করিয়া আনিয়াছিল, ভামিনীভূষণের বাসায় সেই জিনিষগুলোর সন্ধান পাইয়া, পুলিস আসিয়া সমস্ত লইয়া গিয়াছে।

দুর্গাকালী বলিয়া উঠিল, "ওরা পুলিস নয় গো, ওরা ডাকাত, ডাকাত!"

তারিণী আবার বলিল, "দাদা, ইন্‌স্পেকটর বলে গেছে, তোমাকে থানায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে!"

ভামিনীভূষণ ভুম্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া গুম্ হইয়া বলিলেন, "হুঁম্!"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

আগমনী

কালাংড়া—কাওয়ালী।

দাঁড়াও গো রাণি! একবার-খানি
আমার ভাঙ্গা ঘরের আঙ্গিন্ পরে;
তোমার ঐ রাঙ্গা পায়ের উজল রাগে
কালো মাটী আলো করে।
আমার এ কুটীরে নাহি রত্ন মণি,
মনোফুলে বিশ্ব-জননি,
রচেছি আসন হের তোমার তরে,
রাখ রাখ পা-দুখানি তার উপরে;
আমি ধুইয়ে দি সযতনে নয়ন-লোরে।
তোমার দরশে আজি অশ্রু-রসে মাগো
হরষ-নিঝর ধার ঝরে।

রচনা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

স্বরলিপি

```
   ॰                  ১                  +
II পা  দা  –া  র্সা । র্সা  –া  র্সা  –া I –সনদা  –া  –া  র্সনা ।
   দাঁ  ড়াও  ०  গো   রা  ०  ণি  ०    এক্  ०  ०  বার্

   ৩                  ॰                  ১
। দা  –া  পা  –া । দা  দা  –া  দা । পা  –দা  পমগা  মা I
  খা  ०  নি  ०   ভা  ঙা  ०  ঘ   রের্  ०  আ  ঙিন্

   +                  ৩                  ॰
I পদা  –া  পা  –া । –া  –সপা  মগা  মা । পা  দা  –র্সনা  দা ।
  প   ०  রে  ०   ०  ०   আ०  মার্  ভা  ঙা  ००  ঘ

   ১                  +                  ৩
। পা  –পদপা  মগা  মা I পা  –দা  পা  –া । –া  –া  –া  –া II
  রের  ०   আ०  ঙিন্  প  ०  রে  ०   ०  ०  ०  ०

   ॰                  ১                  +
II দা  দা  –া  দা । পা  দা  পা  পদপা I মা  গা  –ঋ  মগা ।
   তো  মার্  ०  ঐ   রা  ঙা  পা  য়ের্   উ  জ  ०  ল०

   ৩                  ॰                  ১
। ঋ  –া  সা  –া । সা  দা  –া  দা । পা  –দা  পা  মা ।
  রা  ०  গে  ०   কা  লো  ०  মা   টি  ०  আ  লো

   +                  ৩
I মা  –পা  –মপা  –দা । পা  –া  –া  –া II
  ক  ०  ००  ०   রে  ०  ०  ०

   ॰                  ১                  +
II মা  মা  দা  দা । না  না  র্সা  –া । ঋ́  ঋ́  র্সা  না ।
   আ  মা  র  এ   কু  টী  রে  ०   না  হি  র  ত্ন

   ৩                  ॰                  ১
। র্সা  –া  র্সা  –া I পা  দা  দা  দা । না  –া  র্সা  র্সা I
  ম  ०  ণি  ०   ম  নো  ফু  লে   বি  ०  শ্  জ
```

\+ ৩ ০
I ঋর্সা -ঋর্সা -নদা -া । পা -া -া -া । পা দা পা দা ।
ন ০০ ০০ ০ নি ০ ০ ০ র চে ছি আ

১ + ৩
। পা দা পা মগা I মা -পদা -া দা । না -া র্সা -া ।
স ন হে, র০ তো মা০ ০ র ত ০ রে ০

০ ১ +
। পা দা দা দা । না না র্সা র্সা । নর্সা ঋর্সা -া না ।
রা খ রা খ পা দু খা নি তার্ ০০ ০ উ

৩ ০ ১
। দা -া পা গমা । গমপা দা দা দা । পা দা পা দপা ।
প ০ রে আমি ধু০ ই য়ে দি স য ত নে০

\+ ৩ ০
। মা গা -ঋ মগা । ঋ -া সা -া । র্সা র্গা র্গা র্গা ।
ন য় ০ ন০ লো ০ রে ০ তো মা র দ

১ + ৩
। র্ঋা র্ঋা র্সা র্সা । না -র্সর্ঋা র্সা র্সা । র্দ্মা -া দা পা ।
র শৈ আ জি অ ০০ শ্রু র সে ০ মা গো

০ ১ +
। পা দা -র্সা না । দা দা -া পা । মা -া গা ঋ ।
হ র ০ য নি ঝ ০ র ধা ০ র ঋ

৩ ০ ১
। সা -া গা মা । পা দা -র্সনা দা । পা -পদপা মগা মা ।
রে ০ আ মার ভা ঙা ০০ ঘ রের্ ০০০ আ০ ঙিন্

\+ ৩
I পা -দা পা -া । -া -া -া -া II II
প ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

আকাশ-কুসুম

যার খুসী যা বলুক লোকে বলুক
তুলোনা গো ও-সব কথা কাণে ;
জীবন মোদের চলছে যেমন তেমনি ভাবেই চলুক
আপন পথে গোপন বেদন টানে।

আপন মনের প্রবাসী সব তারা
বুঝতে নারে আপন প্রাণের ভাষা ;
ক্ষণিকের অই ক্ষুদ্র খাতে বহে তাদের তুচ্ছ জীবন-ধারা
নাইকো সাহস-ভরা সুদুর আশা।

অল্পে খুসী কল্পনাতেও দীন,
পক্ষাঘাতে অবশ পক্ষদুটি,
আকাশ ভীরু স্বপ্ন তাদের ভুলতে নারে জাগরণের ঋণ,
মাটীর পরে নিত্য মরে লুটি।

যে ফুলবাস সুদূর সমীরণে
ভেসে এসে গভীর প্রাণে লাগে,
গন্ধবিভোর করে' তুলে এই জীবনের সকল নিমেষক্ষণে,
বাঙিয়ে তুলে ভালবাসার রাগে—
ফুটিয়ে মোরা তুলতে যে চাই তারে
এই আমাদের ঘরের আঙিনায়,
জীবনব্যাপী মরণ-ভোলা পরম সাধনারে
অতি বিজ্ঞ অন্ধ অবজ্ঞায়—
তারা শুধু মিথ্যা স্বপন মানে
কোন্ আকাশের আকাশ-কুসুম তরে
হাতের নাগাল যা-কিছু ধন সকল ছেড়ে চাওয়া আকাশ-পানে
কোন্ দুরাশার অসীম কুহক ভরে।

হায়গো বন্ধু বোঝো নাই তো ভুল এ,
মনের ঢেউ যে লাগে মনের তটে,
গন্ধ যাহার এমন করে' ভরিয়ে রয় প্রাণের কূলে কূলে
বটেই সে তো আকাশ-কুসুম বটে।

নইলে কিসে মিটবে তিয়াস তার
মাটির পরে বাঁধল যে-জন ঘর ?
একান্ত এই মাটীর বাঁধন এই যা-কিছু' সবার পাষাণ-ভার
প্রাণ যে চেপে জাগবে নিরন্তর।

জানো বন্ধু ঘর যে কারে কয়,
সে কি শুধু ইট আর কাঠের স্তূপ ?
অসীম আকাশ পূর্ণ করি যে আনন্দ নিত্য জেগে রয়
তাব সাথে যোগ নাই কি কোনও রূপ ?

সে যোগ বিনে ঘর যে কারাগার
প্রাণের শুধু কবব সে যে হায়।
নাই আনন্দ নাই যে আলো নাই কোনও গান নাই যে গতি তার
বিশ্বগ্রাসী ভয়ের ছায়া ভায়।

মিছে জীবন মিছে এ ঘর হায়,
মিছে মোদের অকূল ভালবাসা,
এই জীবনে এই প্রেমে এই হাতের নাগাল ঘরের অঙিনায়
নাই যদি রয় আকাশ-কুসুম আশা।

মহাকাশে ঘরের আকাশ ভরা,
ঘরে পরে যার খুসী যা বলুক,
আজ যা স্বপন আজ যা সুদূর জীবনে কাল দিবেই দিবে ধরা
জীবন মোদেব এমনি ভাবেই চলুক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

নাচের রেওয়াজ

কতদিন, কতদিন আগে পৃথিবীতে নাচের চলন হইয়াছে, তার আর কিছু লেখাজোখা নাই।

ধরণীও তখন অল্প-বয়সা ছিল, মানুষের মনও ছিল সরল তরল নিশ্চিন্ত সদানন্দ। কাজেই একটু খুশি হইলেই তাহারা হাসিয়া গাহিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া প্রাণের পুলক আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দিত—ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের মত বনচারী ময়ূর ময়ূরীর মত।

নাচের সে গভীর পুলক মানুষের মনে আজ কোথায়? অবশ্য, শিশুরা এখনো মানব জাতির আদিম স্বভাব ভুলে নাই, একটুতেই তাহারা এখনো তাই নাচে-গানে মাতিয়া ওঠে। কিন্তু যাই তাহারা বড়-সড় হয় এবং সভ্যতার মুখোসে মুখ ঢাকে, আদব কায়দা বাঁচাইয়া চলিতে শেখে—অমনি তাহাদের মূর্ত্তি হয় ভিন্ন রকম; তখন তাহাদের মন নাচিলেও চরণ থাকে কেমন-যেন অচপল আড়ষ্ট।

রুস নট ও নটী আডল্ফ্ বোম্ ও কারাসাভিনা
(একটি রূপকথার নৃত্যাভিনয়)

নর্ত্তকী আনা পাভ্লোভা

সুতরাং দেখা যাইতেছে একালকার লোকেরা নাচকে ভালোবাসে নাচ একটা কৃত্রিম আর্ট বলিয়া। সহজ স্বাভাবিক ভাবে নাচিতে তাহারা রাজি নয়, তাহারা নাচিবে আগে থাকিতেই স্থান কাল ঠিক করিয়া, মনের ভিতরে একটা অস্বাভাবিক ভাব লইয়া। সেকালে ছিল ঠিক এর উল্টো। তখনকার লোকেরা নাচকে চাহিত শুধু নাচের খাতিরে। এ হিসাবে তাহাদিগকেই উঁচুদরের আর্টিষ্ট বলা যায়।

য়ুরোপে সব চেয়ে বেশী পুরন্ত হইয়া উঠিয়াছিল প্রাচীন গ্রীসের নাচ। গ্রীক ভাস্করদের হাতে-গড়া অগুন্তি প্রতিমূর্ত্তিতে প্রাচীন নৃত্যের সুন্দর ভঙ্গিগুলি আজ-পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া আছে। সে-সকল নৃত্যে মানব-দেহের রূপ কাব্যের মধুর ভাব, ছন্দ, যতি ও সুর যে শরীরী হইয়া উঠিত, শিলা চিত্রগুলি দেখিলে, এখনো তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। এরূপ আলোচনায় আজ-কাল সেই সব নৃত্য চিত্রের নকল করিয়া নূতন নূতন নাচ সৃষ্টি হইতেছে।

কাব্য, সঙ্গীত ও নৃত্যের সমস্ত বিশেষত্ব এক করিয়া একটি অপূর্ব্ব সুন্দর নৃত্য কলার সৃষ্টি,—এ কীর্ত্তিও সম্ভব হইয়াছিল প্রথম ঐ গ্রীস দেশেই। গ্রীক-নৃত্যের নকলে একালে যে-সকল নূতন নাচের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার একটির নাম 'skirt dance'—বছর-কুড়ি আগে বিলাতের লোকেরা এই নাচে একেবারে মসগুল্ হইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল। তারপর 'সার্পেন টাইন নাচ' চলতি হইয়া skirt danceএর পসার মাটি করিয়া দেয়। শুনিয়াছি, মাপ লইলে 'সার্পেনটাইন' নাচের পোষাক নাকি পায় সিকি-মাইল জায়গা-জোড়া হয়।

ভারতে বিখ্যাত ইংরেজ নর্ত্তকী মড অ্যালেন

ইহাতেই সকলে বুঝিতে পারিল যে, একালে রুসদের মত নাচিয়ে জাতি আর কোথাও নাই। এমন-কি, রুসদের চাষা-ভুষোরা পর্য্যন্ত যে-সব নাচ নাচিয়া সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর মনকে একটু ছাড়ান দেয়, পৃথিবীর অন্যদেশে তাহারও তুলনা পাওয়া ভার। রুসদের 'মাজুর্কা' ও 'জার্ডাস' প্রভৃতি চাষাড়ে নাচও এখন সারা য়ুরোপের অসংখ্য বৈঠকে চলিত হইয়া গিয়াছে। বিলাতে এখন রুস-নাচের খুব রেওয়াজ, অতটা আর কোন নাচের নয়। পৃথিবীর মধ্যে আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নট ও নটী হইতেছেন নিজিনস্কি ও আনা পাবলোভা।

বিলাতে উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ নট নটীর নাম শুনিতে খুব বেশী না-হইলেও, সেখানে বড় বড় নৃত্য বিদ্যালয় আছে অগুনতি। কিং

ইংরেজী বঙ্গালয়ের নাচ

…শেনাবাবুর ভারতীয় 'স্বর্ণ-শস্য' নাচ

ভারতীয় গ্রাম্য নাচ

স্পেনের [illegible] ভাজিনিয়া

সব চেয়ে বড় নৃত্য-বিদ্যালয় ছিল রুশদেশে। সেখানে বাপ-মায়েরা নিজ খরচে ছেলে মেয়েদের সেই বিদ্যালয়ে নাচ শিখিতে পাঠাইয়া দিতেন। বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রুশ-সম্রাট নিজে। এখন বোধহয় বিদ্রোহের হাঙ্গামে সে বিদ্যালয়টি উঠিয়া গিয়াছে।

পৃথিবীতে যে নৃত্য-বিদ্যালয়টি দ্বিতীয় স্থান পাইয়াছে, সেটি আছে মিলান সহরে। ফ্রান্সেও সরকারের সাহায্যে একটি বিখ্যাত নৃত্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বার্লিনও এদিকে পিছপাও নয়। সব দেশেই এখন সমাজে নাচের রেওয়াজ এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় নাচ শিখাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, কিন্তু 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!' আমাদের এ অভাব কতদিনে দূর হইবে?

ভারতবর্ষের পুরাতন মন্দির-গাত্রে ভাস্কর্য্য-চিত্রে বহু-শত নর্তকীর ভঙ্গি-বিচিত্র লীলা-চপল মূর্ত্তি আছে। এবং ভারতের দক্ষিণ-প্রদেশে গমন করিলে, এখনো চোখ-জুড়ানো মন-ভুলানো অনেকরকম গ্রাম্য-নাচ দেখা যায়। আমরা শিক্ষিত হইয়াও এতবড় একটা আর্টকে কুস্থানে, পাঁকের ভিতরে ডুবাইয়া রাখিয়াছি এবং এ জিনিষটা যে ভদ্রসমাজে বিশেষরূপে আশ্রয়লাভের যোগ্য, এ কথাটা ভুলিয়াও একবার ভাবিয়া দেখি না! অথচ সুদূর সাগর-পার হইতে বিলাতী নট-নটীরা এদেশে আসিয়া, ভারতীয়

পার্সী নর্ত্তকী ওহানিয়ান

নাচের শ্রী-ছাঁদ দেখিয়া মোহিত হয় এবং সেই-সব নাচ প্রাণপণে শিখিয়া লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া, ভারত-নৃত্যের নকল দেখাইয়া জনসাধারণের অজস্র প্রশংসালাভ করে!

যে সময় পড়িয়াছে, এখন সব দিক দিয়া ভারতকে জগতের সাম্‌নে আপনার বহুমুখী প্রতিভা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে—দেখাইতে হইবে, ভারতীয় সভ্যতা কোনদিকেই অপূর্ণ নয়! অবশ্য সুধু নাচ নয়—সভ্যতার এমন আরো-অনেক অঙ্গ আছে, যেগুলির প্রতি আজকাল আমরা অত্যন্ত অবহেলা প্রকাশ করিতেছি। অথচ যে পাশ্চাত্য জগতে এখন আমরা ভারতকে জাহির করিতে চাই, সেখানকার লোকেরা ঐ-সব অঙ্গ হইতে সভ্যতাকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখিতে কোনকালেই অভ্যস্ত নয়। সুতরাং, এই সহজ কথাটা যদি আমরা ভুলিয়া যাই, তাহাহইলে বিশ্ব-সভায় ভারতের দাবী গ্রাহ্য হইবে কিনা, সন্দেহ!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

আলোর ফুল্কি

(৬)
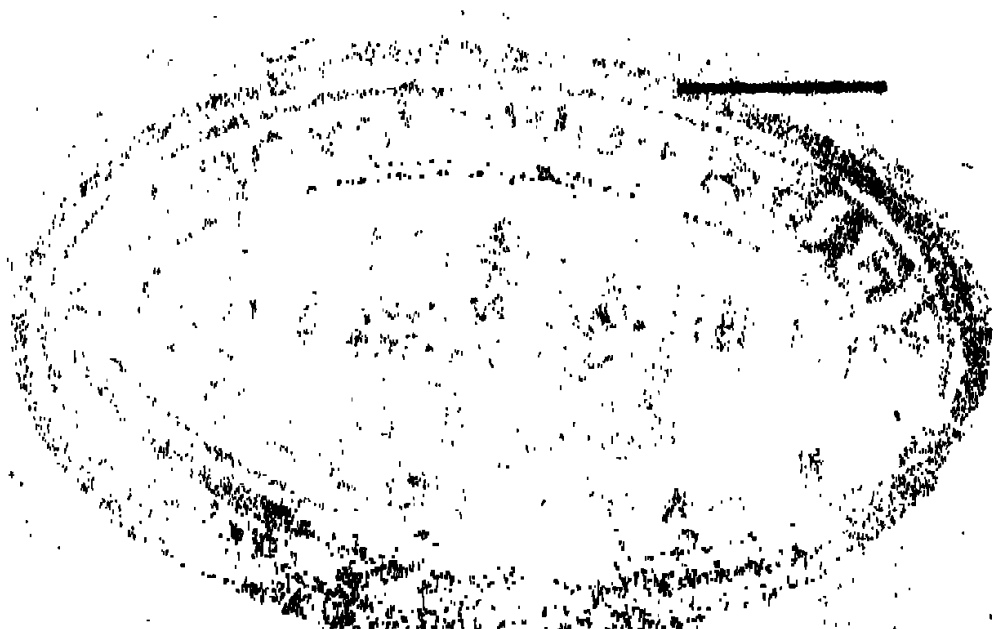
চিনি-দিদি ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে ঘুরছেন—খাতির-যত্ন কোরে ; আর তাঁর ছেলেটিও মায়ের সঙ্গে ঘুর্-ঘুর্ কচ্ছেন আর মাঝে-মাঝে মায়ের দু-একটা ইংরিজি উচ্চারণের আর আদব-কায়দার ভুল হলেই চমকে তাঁকে কানে-কানে ধমকাচ্ছেন। ছেলেটি বিলেতে ভাসাতত্ত্ব পড়তে গিয়েছিলেন কিন্তু সাঁতার মোটেই না জানায় তিন-তিনবার প্লাক্‌ট্‌ হয়ে এসেছেন।

সোনালি-আঁচল উড়িয়ে বনমুর্গি সোনালি যখন হেঁসেল-বাড়ির খিড়কির কাছটায় পৌছলো, তখন রাজ্যের পাখী সেখানে জুটে কিচ্‌মিচ্‌ লাগিয়েছে ;—চিনি-দিদির মজলিসটা খুঁজে নিতে সোনালির আর একটুও কষ্ট পেতে হলনা।

সোনালিয়াকে দেখেই চিনি-দিদি খাতির কোরে কুলতলায় ফাঁকায় নিয়ে বসিয়ে ওদিকে চলে গেলেন। সোনালি শুনতে লাগলো বোল্‌তারা সুর কলস্ত গাছকে ঘিরে-ঘিরে মোচং বাজিয়ে গাইছে—সোনা-ফলের গান, হুল রাগে।

(গান)

মন ভুলে গুঞ্জরি—মুঞ্জরী মুঞ্জরী।
বাতাসে গুঞ্জরি, আকাশে মুঞ্জরী।
ফুলে বউল গোছা গোছা,
ফলে মউল গাছে গাছে,
আমরা বলি গুঞ্জরিয়া
শেষ সবারই আছে আছে।
সবজে পাতার কলি, সোনালি ফুলের মধু,
বঁধু ওগো বঁধু—
ফুলের মঞ্জরী! আমরা গুঞ্জরি।
ফুল ঝরে,ফল ঝরে, কুঁড়ি ঝরে, কলি ঝরে,
মন্ ঘুরে গুঞ্জরি—মঞ্জরী মঞ্জরী!

শুধু যে বোল্‌তারাই গাইছিল তা নয় ; ভোমরা, মৌমাছি, গঙ্গাফড়িং সবাই দলে-দলে বাদ্যি আর গান জুড়ে দিলে। চিনি-দিদি গড়ের মাঠের বাদ্যি যত দল, তাছাড়া কালোয়োতি কীর্ত্তন, বাউল সব-রকম জোগাড়ই করেছিলেন। কেবল চুনোগলির ব্যাংটা তিনি জোগাড় করতে পারেননি। আর সেইজন্যে তিনি সবার কাছে বার-বার দুঃখু জানাতে লাগলেন। কালো-কোট সাদা-কামিজে ফিট্‌ফাট্‌ কাক দরজায় দাঁড়িয়ে মোড়লি কোরে এর-ওর-তার আলাপ-পরিচয় করে বেড়াচ্ছেন—ইনি রাজহংস, ইনি হংসেশ্বরী, তুরস্কের পেরু, ওপাড়ার চটুসাঁই চড়াইমশায় ইনি আমাদের। সোনালি চড়াইকে ধুলোমাখা, কেমন হতভাগা-গোছের চেহারায় আসতে দেখে শুধোলেন—"কোনো অসুখ হয়নিতো ?" চড়াই সোনালিকে ফুলের টবের ইতিহাস বলতে সোনালি হেসেই অস্থির! সোনালি আর চড়ায়ে কথা হচ্ছে, এমন সময় আরো পাখী আসতে লাগলো। ভিড় দেখে সোনালি চড়াইকে নিয়ে একটা ফুলের বোমার আড়ালে সরে দাঁড়ালেন। সেই সময় জিম্মা কাছেই একটা ভাঙা ঠেলা-গাড়িতে লাফিয়ে বসলো, সোনালি তাকে

দেখে একবার ঘাড়-হেলিয়ে নমস্কার করলেন —দূর থেকেই!

জিম্মার চেহারাটা কেমন রাগি-রাগি বোধ হল। ঘোঁটের খবর যেমন শোনা, অমনি সে কুকড়োকে বিপদ থেকে বাঁচাতে শিকলিটা ছিঁড়ে টানতে-টানতে এসে উপস্থিত কুলতলায়। চড়াইকে বোমার পিছনে দেখে জিম্মা রাগে গোঁ-গোঁ করতে লাগলো। ভয় পেয়ে চড়ায়ের ল্যাজ কাঁপতে লেগেছে, এমন সময় ফড়িংদের ট্রীংব্যাণ্ড সুরু হলো; সেই সঙ্গে গঙ্গা-মৃত্তিকার অলকা-তিলকা দিয়ে ছাপমারা গঙ্গাফড়িং কীর্ত্তন ধরলেন—তুড়ি রাগিণীতে খোল বাজিয়ে সূর্য্যের রূপবর্ণনা—

"কনকবরণ, কিয়ে দরশন
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত চাঁদ শোভিত
সিন্দুর অরুণ আর
আহা কিবা সে মধুর রূপ—"

দুএকজন বিলেত-ফেরৎ মোরগ, খোল শুনে দশা পেলেন!

তারপর মৌমাছি গাইতে লাগলো দলে-দলে 'মধু'র গান—

"আলোতে চলি সবাই গুন্‌গুনিয়ে,
আলোতে ফুল ফুটেছে তাই শুনিয়ে
গুন্‌-গুনিয়ে।
বাহিরে সোনার আলো,
ভিতরে সোনার রেণু,
বাহিরে বাজলো বীণা,
ভিতরে বাজল বেণু,
সকালের আলো আলো গুন্‌-গুনিয়ে!"

ফুলের সুবাস, সোনার রেণু, পদ্মের মধু, রোদ-বাতাস সব যেন একসঙ্গে এসে উপস্থিত হ'ল। মধুকরের দল চারিদিকে সুরের মধু-বিষ্টি করে দিলে। বাহবা বাহবা পড়ে গেল। চিনি-দিদি কিন্তু গানও বুঝছেননা, সুরও শুনছেননা। তিনি কেবল কারা কারা তাঁর পার্টিতে এসেছে তারি হিসেব সবাইকে দিচ্ছেন—"বোঝা থেকে শাকের আঁটিটি পর্য্যন্ত কেউ আর আসতে বাকি নেই, দেখেছো ভাই?" একটা শ্যামাপাখী পেয়ারা গাছে বসে শিস্ দিলে, অমনি চিনি-দিদি বল্লেন—"ওই শ্যামদাসা এলেন! ওই বুঝি কাছিমুদ্দি? না না কাছিম-বুড়ো তো নয়। এ তবে কে? সবাইকে তো চিনিনে ভাই, তেনার সব পুরোনো বন্ধু।" একটা ভীমরুল বোঁ-বোঁ করে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, চিনিদিদি তার পিছনে "ভালো আছ? ভালো আছ?"—বলতে-বলতে ছুটলেন।

চড়াই সোনালিকে বল্লে—"চিনিদিদি একেবারে ক্ষেপে গেছেন!" সোনালি মজা দেখবার জন্যে আড়াল থেকে বেরিয়ে দাঁড়ালেন। চিনিদিদি ভীমরুলের সঙ্গে খানিক ছুটে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটু কপি-পাতা খাচ্ছেন এমন সময় হাওয়াতে টুপ-টাপ কোরে পাতার শিশিরের সঙ্গে একটি শিউলিফুল ঝরে পড়লো। চিনিদিদি অমনি বলে উঠলেন—"অ শিউলি, অ শিশির, এতক্ষণে বুঝি আসতে হয়?" এই সময় একটু হাওয়া উঠলো আর টুপ্ করে একটি কুল চিনি-দিদির ঠিক নাকের উপরে পড়ে গেল, চিনিদিদি চমকে উঠে বল্লেন—"এই যে বাতাসি-দিদিও এসেছ! তবু ভালো যে মনে পড়েছে।" বলে কতকগুলো গিনিপিগ্ নিয়ে চিনিদিদি খাওয়াতে চল্লেন। "কে যে চিনি-

দিদির চেনা নয়, তা জানিনে।"—বলে চড়াই এদিক-ওদিক ভালো করে দেখে পা-টিপে-টিপে বেরাল যেখানে আতাগাছের ডালে গুঁড়ি মেরে বসে এদিক-ওদিক দেখছিল, সেইখানে গিয়ে বল্লে—"সব ঠিক তো—বন্দোবস্ত?" বেরাল একবার ওই ওদিকটায় ঘাড় তুলে দেখে বল্লে—"সব ঠিক। আসছে তারা।" এদিকে চিনিদিদি সোনালিকে নতুন বিলিতি-কলে-দিয়ে-ফোটানো দুটি মুরগীর ছানার সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছে, এমন সময় দূরে ময়ূর গলা খাঁকারি দিলেন—"কেও চিনি না কি?" ময়ূর এসে বুক-ফুলিয়ে দাঁড়ালেন, মরগী, হাঁস, তিতির, বটের সব অমনি তাঁকে ঘিরে যেন রথ দেখবার ভিড় করলে। ময়ূর সবাইকে জাঁকালো পোষাক আর গায়ে জহরতের ভাউ বাৎলাতে লাগলেন—খুব বুদ্ধিমানের মতো গম্ভীর মুখ কোরে। জিম্মা কুত্তানি কিন্তু ময়ূরকে দেখে মনে-মনে বল্লে—"এটার মতো দেমাকে অদ্ভুত জানোয়ার আর দুটি দেখা যায় না।" এমন সময় কাক দরজা থেকে ফোকরালেন—"চাটগাঁই মোরোগ।" চিনিদিদি এ-নাম কখনো শোনেন নি, বুঝিবা ভুল করেছে কাকটা ভেবে, সেদিকে যাবেন, এমন সময় সত্যিই সাদা জোব্বা-খাব্বা, কালো চাপদাড়ি, মোড়াসা-মাথায় চাটগাঁই এসে সেলাম করলেন। চিনিদিদির মুখে আর কথা সরলোনা। তারপর কাক একে-একে সব অদ্ভুত মোরগের নাম ফোকরাতে থাকলো—"সিংগালি, বোগদাদি, জাপানি।" সবাই বলে উঠলো—"এক ব্যাপার!" চিনিদিদি বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলেন দলে-দলে অদ্ভুত মোরগ সব আরো আসছে—"সেলেম সাহি, খাঁ খানানি, তখ্‌তে তাউস্, কান্দাহারি, কাবুলী, জবর-দস্ত ঝোঁটনদার, চম্পাধাড়ি, ফুলঝুটি, খুষ্কে-পোষ, ডেকচী, মোগলাই, জবড়জঙ্গ, ইয়াহুদি, চাল বাহাদুর, খেতাববক্স, মেজাজি, পরচুলা, বুলুকচাঁদি, বাজখাঁই, শিব-ই-কুরহাদ, গোল গুম্বজ, কাবাবি।"

চিনিদিদি দেখে শুনে অবাক, কেবল ল্যাজ দোলাচ্ছেন আর বলছেন—"ওমা কোথায় যাবো। ওলো দেখ্, কি হবে গো, এমনতো কখনো দেখিনি।"

নবাবি আমলের মোরগ সব একে-একে এলেন। এবার পাটনাই মোরগ সব আসছেন—"তিলক-ধারী, ভোজপুরি, রাম-দুলালি।"

"ওমা কোথা যাবো?" বোলে চিনিদিদি সবাইকে খাতির করতে ছুটলেন।

এবার গৌড়িয়া মোরগ সব আসছেন—"গোবরগণেশ, চাল-পিটুলি, মোহোনভোগ, বামুনমার, কানাই-চুড়ো, চৌ-গোপলা, ঢেঁকুচ্‌কুচ, ঢাক-পিটুনে, ঝিকুরে-গোঁসাই, বেঁটে-বক্কট, কয়লাধামা, রাজ কুমড়ো, খুতি নাতি।"

কুলতলাটা ঝুঁটিতে, পালকে, চাপদাড়ি, গোঁপ, টিকি আর পোষা-পালা বড়-বড় খেতাব জাহগীর-শিরপেঁচ-ওয়ালা মোরগের ভিড়ে সরগরম হয়ে উঠলো - যেন পালকের গদী। কারু ল্যাজের পালক—মেপে সাতগজ। কারু গলায় যেন উলের গলাবন্ধ জড়ানো রয়েছে। একজনের ঝুটির কেতা যেন রামছাগলের শিং। কারু মাথায় জরীর

তাজ, কারু এক চোখে চসমা, অন্য চোখটা টুপিতে ঢাকা; কারু বুকে ফুলের তোড়ার মতো খানিক পালক, কারু আঙুল দস্তানায় মোড়া, কারু বা আঙুল এত লম্বা যে কিছুই ধরতে পারেনা। কেউ ঝাঁকড়া চুলের উপরে আবার টিক রেখেছে, আর কারু বা মাথায় চুলও নেই, টিকিও নেই—কিছুই নেই। ঘাড়ে-গর্দ্দানে-সমান এই শেষের মোরগটা হচ্ছে সেই নাবজাদা লড়ায়ে মোরগ, যে বিলেত পর্য্যন্ত মেরে এসেছে। এরি দুপায়ে ইস্পাতের কাঁটা-মারা ভয়ঙ্কর দুটো কাতান মানুষ সখ করে বেঁধে দিয়েছে—অন্য মোরগকে লড়ায়ে খুন কোরে বাজি জেতবার আর মজা দেখবার জন্যে। ঘোঁড়দৌড়ের খেলায় যেমন, তেমনি এই মোরগের লড়াই দেখতে আর বাজি লাগাতে লোকে টিকিট পায়না, এত ভিড় হয়।

বেয়াল চড়াইকে গাছের উপর থেকে এই মোরগটা'কে দেখিয়ে বল্লে—"এই সেই বাজখাঁই গুণ্ডা বা লড়ায়ে মোরগ বা নবাব বাজেখাঁর বাবুর্জি-খানার শেষ-পোষা-পাখী। পুরুষানুক্রমে এদের ঘাড় এমন শক্ত যে মোটেই নোয় না, ইনি খালি দিল্লীর লাড্ডু খেয়ে লড়েন।"

এইবার সব বিলেত-ফেরতা মোরগ এলেন—"মিষ্টার চচ্চড়ি, মিঃ ভাজি, মিঃ ঘণ্ট, মিঃ আবার-খাবো, মিঃ চাপাটি, মিঃ বে-হোঁস।" চিনিদিদি ভাবছেন এই সব মোরগের মুরগীদের নিয়ে আসছে-বারে তিনি একটা পর্দ্দাপার্টি দেবেন। দাঁড়কাক তখনো হাঁপাতে-হাঁপাতে ফুকরোচ্ছে—"রামধনুষ, রংবেরং, বুঁদেলা মল্ল, রণছোড় ভাগি, ধান ভগৎজিউ· -" যত মাড়োয়াড় দেশের মোরগ, সিন্দি, কচ্ছি, অরোদা-বরোদা সবাই এলে পর দাঁড়কাক মুখ ফিরিয়ে দেখলে—কুঁকড়ো। সে তাঁর পদবী উপাধি কুকুরোতে যাবে, কুঁকড়ো বল্লেন—"কিছু দরকার নেই। শুধু জানিয়ে দাও আমি কুঁকড়ো এলেম।" দাঁড় কাক তাঁর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মুখটা বেঁকিয়ে জোরে হাঁক দিলে—"কুঁকড়ো-ও-ও!" কুঁকড়ো অতি শান্ত ভালোমানুষটির মতো চিনিদিদিকে নমস্কার করে বল্লেন—"আমাকে মাপ করতে হবে, আমার সাজ-সজ্জা পদবী-উপাধি কিছুই নেই, আমার ঠিক যতগুলো আঙুল হওয়া উচিত তাই আছে, আর মাথার এই লাল একটিমাত্র টুপি, জন্মাবধি এইটেই পরে বেড়াচ্ছি—সে-কথাটা লুকিয়ে লাভ নেই! আর আমার এই গায়ের কাপড়—এটা পোরে এখানে আসাটা বাস্তবিক অন্যায় হয়েছে; দেখনা রংচং বোশ নেই, কেবল একটু কচিপাতার সবুজ আর পাকা ধানের সোনালি। মাফ করো, আমি নেহাৎই একটা সাধারণ কুঁকড়ো, যাকে দেখা যায় ধানের গোলায়, চালের মটকায়, গির্জ্জার চূড়োয়, সোনায়-মোড়া ছেলেদের হাতে টিনের বাঁশির আগায় রং-করা—জলে-স্থলে সর্ব্বত্র, কেবল কোনো চিড়িয়াখানায় আর যাদুঘরে আমার দেখা পাওয়া যাবেনা।"

চিনিদিদি বল্লেন—"তাহোক। তোমার কাজের সাজে এসেছো তাতে কি দোষ? তোমার সময় কোথা যে, সেজে বেড়াবে? কাজের পাখী তোমার সব দোষ মাপ। কিন্তু যারা বিয়েতে যায়—কেরাণীর কিম্বা উকিল বেরিষ্টার মোক্তারের সাজ পোরে

কিম্বা বুট হ্যাট পোরে যায় বৌভাতের ভোজে, তাদের আমি কিছুতে মাপ করিনে।"

দাঁড়কাক কোকরালো—"জুড়ি লোটন পায়রা!" কুঁকড়ো ভাবলেন বুঝি তাঁর বন্ধু কবুদ আর কবুদনী। কিন্তু ফিরে দেখলেন সাদা ছুটি গুজরাটি, পায়রা কি—কি,বোঝবার জো নেই, ডিগবাজী খেতে-খেতে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তারপর দাঁড়কাক ফুকরোলে—"ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর রাজহংস স্বামিজী!" কুঁকড়ো পদ্মবনের মরাল আসছেন ভেবে আনন্দে দরজার দিকে চেয়ে রইলেন—অনেক ক্ষণ পরে পাখীর মত পাখী আসছে ভেবে, কিন্তু হেলতে-দুলতে সাদা মরাল না এসে, নেংচাতে-নেংচাতে এলেন এক পাখী, দেখতে মরালের মতো কতকটা, কিন্তু মোটেই সাদা নয়, সিধেও নয়,—কালো ঝুল। কুঁকড়ো নিশ্বেস ছেড়ে বল্লেন—"মরাল না এসে এল কিনা মরালের একটা বিকট কালো ছায়া।' বোলে কুঁকড়ো একটা দোলার উপরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন—দূরে সবুজ মাঠ, তারি উপরে ধেনু চরছে, বাছুরগুলো ছুটোছুটি করছে, কোথায় আমলকী গাছের ছায়ায় বাঁশি বাজছে তারি শব্দ। পৃথিবীর সবই এখনো এই-সব হরেক-রকম পোষা-পাখী-গুলোর মতো টেরে-বেঁকে অদ্ভুত-রকম হয়ে ওঠেনি, সাদাসিদে গোলগাল যেমন ছিল তেমনিটি আছে। ঘাসের রং সবুজই রয়েছে, আকাশ নীল, জল পরিষ্কার, পাখীরা উড়ছে ডানা ছড়িয়ে, গরু হাঁটছে চার পায়ে, মানুষ চলেছে দু'পায়। কুঁকড়ো আনন্দে এই-সব দেখছেন আর সোনালি আস্তে-আস্তে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলছে—"এই সব চিড়িয়াখানার উপযুক্ত অদ্ভুত সংগুলোকে আমার ভারি খারাপ লাগছে, আর-একদণ্ড এখানে থাকা নয়, চল আমরা দুজনে সেই বনে চলে যাই, সেখানে আলো আর ফুল আর তোমার-আমার 'ভালোবাসা।" কুঁকড়ো ঘাড়-নেড়ে বল্লেন—"না সোনালি, সে হতে পারে না। বিধাতা যেখানে রেখেছেন সেইখেনেই আমাকে থাকতে হবে। আমি জানি এই আবাদটুকুর মধ্যে করবার মতো কাজ আমাদের অনেক রয়েছে, আর, সবার ভালোবাসাও এখানে পাচ্ছি তো!"

সোনালির মনে পড়লো রাত্রের খুটের কথা, কিন্তু ওদের ভালোবাসা যে মোসলমানের মুর্গি পোষার মতো,—সেটা বোলে কুঁকড়োকে দুঃখ দেওয়া কেন? সে বার-বার বলতে লাগলো—"না, না, চল, দুজনে চলে যাই, আহা সেই বনে যেখানে বসন্ত-বাউরী কেবলি বলছে—বৌ কথা কও, আর পাতায়-পাতায় সোনার অক্ষরে ভালোবাসার গান সব লেখা হচ্ছে সকাল থেকে সন্ধ্যে।"

এই সময় ওধারটায় কিচিরমিচির শব্দ উঠলো,—সব পাখীরা ময়ূরকে পাখম ছড়াবার জন্যে পেড়াপিড়ি করছে। চিড়িয়াখানার সব মোরগগুলো তাদের সম্পর্কে পাখম-দাদা ময়ূরের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। অনেক বলা-কওয়াতে ময়ূর পাখম খুলে দেখালেন। পাতি হাঁস হাঁ-কোরে চেয়ে রইল। ময়ূরের কাছে কোটের কাটকুট নমুনো ফ্যাসান্ চাইতে লেগে মোরগদের মধ্যে হট্টগোল বেধে গেল। সবাই ময়ূরকে আপনার-আপনার সাজগোজ দেখিয়ে পাস হতে চাচ্ছে, এক মোরগ অন্যকে ঠেস দিয়ে

বলছে—"তোমার দেখতে হয়েছে ঐ কাপড়ে, যেন স্থড়ুঙ্গে স্থপুরি গাছটি।" সে আবার তাকে এক ধাক্কা দিয়ে বলছে—"আর তোমারই সাজাটা কি দেখতে হয়েছে ?—যেন মগের মুল্লুকের আটচালাখানি—শিং-বের-করা ছুঁচোলো !" সবাই যখন সাজসজ্জা দেখাতে মারামারি বাধিয়েছে তখন কুঁকড়ো গলা-চড়িয়ে বোলে উঠলো—"তাকাও, তাকাও, ওদিকে তাকাও !" কুঁকড়োর কথা-মতো সব মোরগ মায় ময়ূর হাঁস আর যত দেমাকে পোষাকী পাখী সবাই সেই কাপড়-ঝোলানো খড়ের কুশো-পুতুলটার দিকে চেয়ে দেখলে—হাওয়াতে সেই খড়ের কাঠামোর কামিজের হাতাটা লট্‌পট্ করে যেন তাদেরই দেখিয়ে কি বলতে যাচ্ছে। ভয়ে সব পোষাকী পুষ্যি পাখীদের মুখ চুণ হয়ে গেল ! কুঁকড়ো হেঁকে বল্লেন—"তাকাও, তাকাও, উনি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করছেন !" মোরগগুলো কুঁকড়োর দিকেই চেয়ে রইলো। তখন কুঁকড়ো বল্লেন—"ঐ যে কাঠামোটার পায়ে পেণ্টালুন লট্‌পট্ করছে, ওটা কি বলছে জানো ?—আমার এই ছক্-কাটা ছিট একদিন ফ্যাসান ছিল ; উনো-পঞ্চাশ টাকা গজ দরে আমি বিকিয়েছি—এককালে। আর ওই যে ভাঙা তোব্‌ড়ানো সোলার টুপি ওটার মাথায় চড়ানো দেখছো, ওটাই বা কি বলছে ?—আমিও একদিন ফ্যাসান ছিলুম, আশি টাকা দিয়ে লোকে আমায় কিনে ছিল, এখন মেথরও আমাকে মাথায় দিতে লজ্জা পায় ! আর ঐ দেখো কোট,—তার এখনো ভুল ভাঙেনি ; সে এখনো দেখ, চল্‌তি-বাতাসে উড়ে-উড়ে আকাশে ফ্যাসান হাতড়ে বেড়াচ্ছে। চল্‌তি-বাতাস চলে গেল আর ওই দেখ ফ্যাসান-ধরা নিষ্কর্ম্মা কোটের হাতদুটো নিরাশ হয়ে ঝুলে পড়লো !" এই কথা কুঁকড়ো যেমন বলেছেন আর সত্যি-সত্যি বাতাস বন্ধ হল, সব পাখীরা দেখলে দুই হাতা মাটির দিকে ঝুলিয়ে কুশো-পুতুলটা স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তারা সব সেইদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এমন সময় ময়ূর বল্লে—"রাখো, ওটা কি কথা বলতে পারে যে এ-সব বলবে ? তুমিও যেমন !"

কুঁকড়ো ময়ূরকে বল্লেন—"তুমি যা বল্লে ওটাকে, মানুষেরা ঠিক ওই কথাই তোমাকে বলছে ইস্ত-না-গা-দ !"

ময়ূর তার কাছের এক পাখীকে চুপি-চুপি বল্লে যে—এই-সব জাঁকালো জাঁদরেল পোষা মোরগকে সোনালির সাম্‌নে হাজির করাতেই কুঁকড়োটা তাঁর উপর খাপ্পা হয়েছে। তারপর ময়ূর কুঁকড়োকে বল্লে—"আচ্ছা, এই যে সব জাঁদরেল মোরগ এসেছেন, এঁদের তুমি ঠাউরেছ কি শুনি ?"

বুক-ফুলিয়ে কুঁকড়ো উত্তর দিলেন—"দর্জ্জির হাতে সেলাই-করা, কলে-কাটা, কাঁচি-দিয়ে-ছাঁটা নকল ছাড়া এরা আর কিছুই নয় ! সবটাই এদের জোড়া-তাড়া দেখছি, ওর ডানা তার ঝুটি, এমনি সব টুকিটাকি দিয়ে গড়া এদের চেহারাগুলো কাঁসারিপাড়ার সঙের বিজ্ঞাপনে লাগতে পারে ; আর-কোথাও—এমন-কি এই সামান্য গোলাবাড়িতেও—এদের দরকার মোটেই নেই। এদের চলন, বলন, গড়ন সবই বেসুরো, বেয়াড়া, বেখাপ্পা ! ডিমের সুন্দর ভোলটি নিয়ে সব পাখীই বেরিয়ে আসে জগতে, কিন্তু "ডিম

কাটিয়ে এরা যে বেরিয়েছে তার কোনো লক্ষণ তো এদের শরীরে দেখছিনে!"

কুঁকড়োর কথা শুনে একটা পোষাকী মোরগ রেগে বলে উঠলো—"বাড়াবাড়ি করোনা।" কুকড়ো সে কথায় কান না দিয়ে বলে চল্লেন—সূর্য্যের দিকে চেয়ে—"এরা কি সত্যিকার মোরগ? কখনই নয়। কোথায় এদের মধ্যে সেই সকালের আলো, সেই রক্তের মতো রাঙা সুর! সূর্য্য তুমি সাক্ষী, এরা দেখতে হরেক-রকমের বটে, কিন্তু মিথ্যে ছায়া-বাজি বই সত্যি নয়, সত্যি নয়। আর ছায়া-বাজিরই মতো এরা তামাসা দেখিয়ে কোথায় মেলাবে তার ঠিক নেই। এদের কেউ বেঁচে থাকবে না—হ—রে—ক—র—ক—ম—বা—জি—বা—হ—বা" বোলে কুঁকড়ো একটু থামলেন।

ময়ূর শোধালে—"কাকে তুমি সত্যিকার মোরগ বল শুনি?"

"সত্যিকার মোরগ তাকেই বলি যার একমাত্র ধ্যান হল—"বোলে কুঁকড়ো চুপ করলেন। সব পাখীরা অমনি শুধোলে—"কি কি?—ধ্যান হল কি?"

কুঁকড়ো বুক-ফুলিয়ে বল্লেন—"আলোর ফুল্কী—ই—ই—"

সব পোষাকী মোরগ অমনি বাজখাঁই গলায় বলে উঠলো—"কা—লো—কু—ল—চু—র! হাঁ, হাঁ এইতো চোখ বুজলেই আমরা সরষে-ফুলের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো কি যেন দেখতে পাচ্ছি! বাঃ এতো সবাই ধ্যান করে, নতুনটা কি হলো?"—বলে মোরগগুলো কুঁকড়োকে প্রশ্ন করতে লাগলো—তিনি ওড়বে না খাড়বে না নাদে গলা সাধেন? তিনি দক্ষিণী চালে গান করেন না হনুমানের মতে? কোন্ রাগে তাঁর দখল বেশি?

কুঁকড়ো সঙ্গীতশাস্ত্র, স্বরলিপি এ-সবের ধার দিয়েও যাননি; তিনি প্রশ্ন শুনে অবাক হলেন। কুকড়ো গাইবে কুঁকড়োর মতো, হনুমানের মতে কেন যে হনুমান ছাড়া আর-কেউ গাইতে যাবে কুঁকড়ো তা বুঝে উঠতে পারলেন না। এক মোরগ বল্লে—"রোসো, তালটা ঠিক করে নেওয়া যাক্—কা—আ—আ—লো—ও—ও—ও......নাঃ মিল্লো না তো, ফাঁকের বেলায়ও সোম পড়ছে, সোমের বেলাতেও তাই, ফাঁক মোটেই নেই!" ফাঁকা আওয়াজের জন্যে কেন যে এ পাখীটা এত ব্যস্ত তা কুঁকড়ো বুঝলেন না। এক মোরগ মুখে মুখে স্বরলিপি করে যাচ্ছিল, সে বল্লে—"প্রথম লাগল মধ্যম আ—মা; তারপর লো—রি—র—গা—র—গা, এই হলো মা—রি—গা।"

আর-একজন বল্লে—"মা—রি—গা তো নয়, ধ—পা—স্।"

কুঁকড়োর মনে হল, ঠিক সবাই পাগল হয়ে গেছে! এ সব কি খেয়াল? তিনি সাফ জবাব দিলেন—তিনি কোনো গানের ইস্কুলে গান শেখেননি, শাস্তর মাস্তর তিনি জানেনও না, মানেনও না—গোলাপ যেমন ফুল ফুটিয়ে চলেছে, তিনি তেমনি গান গেয়ে চলেছেন, এইটুকুই তিনি জানেন।

কুঁকড়ো শাস্ত্রের কিছুই জানেন না দেখে অন্য মোরগগুলো তর্ক ছাড়লে। কিন্তু গোলাপের শোভা কি কুঁড়িতে কি ফোটা অবস্থায় ময়ূরটার অসহ্য ছিল—দেখলেই সে ঠোকর দিতে ছাড়ত না; কুঁকড়ো

গোলাপের নাম করতেই ময়ূরটা অমনি বলে উঠলো—"গোলাপ আবার একটা ফুলের মধ্যে নাকি?"

কুঁকড়ো গোলাপের নিন্দে শুনে রেগেই লাল; তিনি সব মোরগকে শুনিয়ে বোল্লেন—"কুঁকড়ো কিম্বা মোরগ হয়ে গোলাপের নিন্দে যে সয় সে নরাধম কুলাঙ্গার…"

"হেঃ তে—রি—গো—লা—প!" বোলে বাজখাঁই মোরগ তাল-ঠুকে উপস্থিত—"আওতো কুঁকড়া দেখে।" বোলে।

"আও!" বলেই কুঁকড়ো বুক-ফুলিয়ে এগিয়ে এসে বল্লেন—"তোকেই খুঁজছিলেম ঝুঁটিকাটা কাকাতুয়া!"

বাজখাঁই কেওমেঁও করে বলে উঠলো—"ক্যা বোলা? এ কেসা বাত হুয়া?—কা—কা—তু—য়া—তুয়া কাকা!"

কুঁকড়ো ঠিক তেমনি সুরে বলে উঠলেন—"ক্যা বোলা কা-কা-তুয়া?"

খানিক দুজনে চোখ-পাকিয়ে পালক ফুলিয়ে এ-ওর দিকে চাওয়াচায়ি হল। তারপর বাজখাঁই বল্লে—"তুমসে কুস্তিগীর পাহালোয়ান জাহানদার জবরদস্ত দশ জোয়ানকো সাথ বেলায়েৎমে ময় লড়া হুঁ, আউর জিতা হুঁ, দো-দশকো ঘয়েল ভি কিয়া!"

কুঁকড়োর কাজ খুন নয়,—ভয় যারা পায় তাদের অভয় আর আলো দেওয়া। তিনি কিন্তু তাই বলে কাপুরুষ ভীরু ছিলেন না, এগিয়ে এসে বল্লেন—"তবে লড়ায়ের আগে একবার আলাপ-পরিচয়টা হয়ে যাক্!"

বাজখাঁই চেঁচিয়ে বল্লে—"মেরা নাম ফতে-জঙ্গ ডাগবাহাদুর মালিকিময়দান।"

কুঁকড়ো হেসে বল্লে—"আর আমার নাম কুঁকড়ো।"

লড়াই বাধে দেখে সোনালি ভয় পেয়ে জিম্মার কাছে ছুটে গেল। কুঁকড়ো বল্লেন—"জিম্মা, খবরদার, তুমি এতে কোনো কথা বলতে পাবে না, তুমি নড়তে পাবে না, যেখানে আছ সেখান থেকেই শেষ পর্য্যন্ত দেখ।"

সোনালি বল্লে—"একটা গোলাপফুলের জন্যে প্রাণ দিতে যাবে?"

কুঁকড়ো গম্ভীর সুরে বল্লেন—"ফুলের অপমানে সূর্য্যের অপমান, তা জানো?"

সোনালি চড়াইয়ের কাছে ছুটে গিয়ে বল্লে—"তুমি যে বলেছিলে সব মিটিয়ে নেবে?"

চড়াই গম্ভীর হয়ে উত্তর করলে—"সব মেটে, কিন্তু জাতির ঝগড়া মেটে না গো মেটে না।"

চিনিদিদি বুক চাপড়াতে লেগেছেন আর বলছেন—"একি গো! লোকের বাড়ী নেমন্তন্নে এসে খুনোখুনি!" এই বলছেন আর কুঁকড়োর লড়াই দেখবার জন্যে সবাইকে বসাচ্ছেন—ফুলের টবে, লাউ-কুমড়োর মাচায়। দেখতে-দেখতে সব পাখী দুই পালোয়ানকে ঘিরে বসে গেল কুস্তি দেখতে। সবপ্রথমে মুরগীরা গোল হয়ে বসেছে—ছানাপোনা কোলে, তারপর হাঁস ইত্যাদি, শেষে যত পোষাকী মোরগ, ময়ূর এঁরা।

জিম্মা কুঁকড়োকে ডেকে বল্লে—"জেতা চাই, পাহাড়তলীর নাম রেখো।"

কুঁকড়ো একবার চারিদিক চেয়ে দেখলেন;—সবাই আজ তাঁকে যেন মরতে দেখতে ঘাড়গুলো বাড়িয়ে বসে আছে, মনে

হ'ল। কোথাও একটু ভালোবাসা নেই,—হিংসে আর খুনের নেশায় সবার মুখ বিকট দেখাচ্ছে। কুঁকড়ো একটি নিশ্বেস ফেল্লেন।

সোনালি চোখের জল মুছে বল্লে—"আহা, কাচ্চা-বাচ্চাগুলির কি হবে গো।"

কিন্তু কুঁকড়োর প্রাণে কোনো দুঃখু নেই, তিনি বুঝলেন যে, তাঁকে মরতেই হবে। তবে মরবার পূর্ব্বে কেননা তিনি সবার কাছে প্রচার করবেন—যা এতদিন কাউকে বলা হয়নি। এই তো ঠিক সময়। তবে আর কেন গোপন রাখা তাঁর মহামন্ত্র? কুকড়ো সবাইকে বল্লেন—"শোনো তোমরা আমার গোপন কথা—মহামন্ত্র—যা এতদিন বলিনি, আজ বলে যাবো।"

সবাই যেটা জানতে ব্যস্ত, সেটা আজ কুঁকড়ো প্রচার করবেন, মুরগীদের আনন্দ আর ধরেনা। কুঁকড়ো বাচুক মরুক তাতে কি? মন্তরটা শুনতে পেলেই হ'ল। তারা সবার আগেই গলা বাড়িয়ে বসলো। কুকড়ো সেটা দেখলেন। হাগড়াবাদিটা কেবল তাল ঠুকছিল; তার আর সবুর সয়না। কুকড়ো তাকে বল্লেন—"ভয় নেই, পালাবোনা, একটু সবুর কর।" তারপর সবার দিকে চেয়ে বল্লেন—কথাটা শুনে তোমাদের যদি খুব হাসি পায় তো খুবই হেসো, তামাসা টিটকিরি দিতে চাও তাও দিও, আমি তাই দেখেই সুখে মরবো।" সোনালী চেঁচিয়ে বল্লে—"ছিঃ, ও কি কথা?" জিম্মা বুঝেছিল—কুকড়োর মনের কথাটা কি; তাই সে বল্লে—"বেনা বনে মুক্ত ছড়িয়ে কি লাভ হবে বন্ধু?" কিন্তু কুঁকড়ো যখন বলেছেন তখন তিনি আর সে কথা নড়চড় হতে দেবেননা। তাঁর মুখ দেখে জিম্মা আর সোনালি দুজনেই চুপ হয়ে গেল। কুঁকড়ো চারিদিকে দেখে বল্লেন—"নিশাচরদের বন্ধু—অন্ধকারের পাখী সব। তবে শোনো, আর শুনে আমায় পাগল বোলে খুব হাস। আজ আমার কাছে তোমাদের কিছুই লুকোনো রইলোনা;—কে আমার আপনার, কেবা পর সব চেনা গেল, ধরা পড়লো। তবে আজ আমিই বা লুকিয়ে থাকি কেন আপনাকে না জানিয়ে?" বোলে কুকড়ো আর-একবার চারিদিক দেখে বল্লেন—"আলোর ফুলকি—আলোর ফুল আকাশে ফোটে কেন তা জানো? আমি গান গাই বলে।" প্রথমটা সবাই থ হয়ে গেল, তারপর একেবারে হাসির হুল্লোড় উঠলো- "পাগল। পাগল।"

কুকড়ো বলে উঠলেন—"সবাই হাসছ তো?" বলেই হাঁক দিলেন—"সামাল্ জোয়ান সামাল্।"

লড়াই সুরু হয়ে গেল। তখনো সবাই হাসছে—কি মজা, উনি গান গেয়ে আকাশে আলো জ্বালান, কি আপদ …

কুঁকড়ো বাজখাঁই মোরগের এক প্যাঁচ সামলে বল্লেন—"হাঁ আমিই সূর্য্যের রথ রোজকে-রোজ টেনে আনি।" তার পরেই কুকড়োকে বাজখাঁই এক ঘা বসালে; তারপর আর এক ঘা, আর-এক ঘা। সবাই চারিদিক থেকে চীৎকার করতে লাগলো—"বাহবা বাজখাঁ। চালাও, জোরসে ভাই।" কুঁকড়োর মুখে চোখে ঘা পড়ছে আর সবাই চেঁচাচ্ছে—"খুব হুয়া, বহুত আচ্ছা, জেসাকে তেসা—ইয়েঃ মারা!" ওদিকে কুঁকড়োও বলে

চলেছেন—"আমিই আলো আনি,সকাল আনি আলো—আলো—আলো!" কুকুর চেঁচাচ্ছে—"হাঁ হাঁ!" সোনালি কাঁদছে চোখ ঢেকে আর-সব পাখী তারা বলে চলেছে হাততালি দিয়ে—"চালাও বাজখাঁই চোঁচ, আওর এক লাথ্ তুগুমে, বহবা বাজ খাঁ, খুব লড়ৃতা—ইয়েঃ এক ঘা, উয়োঃ দো ঘাও—মারা—মারা!" বাজ্যের পাখীর গালাগালি হাসি-টিট্‌কিরির মধ্যে কুঁকড়ো এক-এক পা করে ক্রমে মরবার দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর বুক-বেয়ে রক্ত পড়ছে, গায়ের পালক সব ছিঁড়ে-খুঁড়ে চারিদিকে উড়ছে—চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে, মনে হচ্চে পৃথিবী যেন ঘুরছে কিন্তু তবু তিনি যুঝচেন! কিন্তু শক্তি ক্রমেই কমছে। এই সময় তাঁর মোরগ-ফুলের উপরে বাজখাঁ এমন এক ঘা বসিয়ে দিলে যে কুঁকড়ো অসার্ হয়ে বসে পড়লেন। অমনি চারিদিকে সবাই চেঁচিয়ে উঠলো—"বাহবা কি বাহবা! ঘায়েল হুয়া, ঘায়েল হুয়া!"

জিম্মা রাগে ফুলতে লাগলো আর তার দুই চোখ দিয়ে দরদর-কোরে জল পড়তে লাগলো। কুঁকড়োর হুকুম—তার নড়বার জো নেই। কিন্তু সে তার বন্ধুর দুদ্দশা আর দেখতে পারে না। সে ধমকে উঠলো—"তোরা সব পাখী, না মানুষ?" জিম্মা বলতে চায় যে মানুষ ছাড়া এমন নির্দ্দয় আর কে হতে পারে? কিন্তু তার কথা যোগালনা; সে কেবল বলতে লাগলে "ওরে,.এরা পাখী না মানুষ?" কুঁকড়ো যখন সান্ পেয়ে আবার চোখ মেল্লেন, তখন সব চুপচাপ রয়েছে, হায়দারি মোরগ বেড়ায় ঠেস দিয়ে হাঁপাচ্ছে, জিম্মা কেবল কাছে দাঁড়িয়ে; আর দূরে—সব পাখীর দলের থেকে দূরে, ডানায় মুখ ঢেকে রয়েছে সোনালিয়া।

কুঁকড়ো জিম্মাকে বলছেন—"এই শেষ, না যন্ত্রণার আরো কিছু রেখেছে পোষাকী পাখী আর তাদের দলবলেরা?" এমন সময় দেখা গেল, সব পাখী পা-টিপে-টিপে কুঁকড়ো যেখানে পড়ে রয়েছে সেই দিকে দল বেঁধে এগিয়ে আসছে; সবার মুখ শুকনো, যেন কি-একটা ভয়ে সবাই জড়োসড়ো, কেউ আর হাসছে না!

কুঁকড়ো বল্লেন—"আঃ জিম্মা, দেখ দেখ ওরা আমায় ভালোবাসে কিনা দেখ! আহা সবার মুখ শুকিয়ে গেছে! এরা যদি শত্রু তবে আর মিত্র কে? আজ আমার ভুল ভাংলো, এখন সবাই আমায় ভালোবাসে জেনে সুখে মরতে পারবো।"

জিম্মাও একটু অবাক হয়ে গেল—এই যারা মার মার কোরে কুঁকড়োকে গাল পাড়াছল, তারাই আবার হঠাৎ বন্ধু হয়ে উঠলো এমন যে কেঁদেই অস্থির! কুকুর ঘাড় নেড়ে ভালো করে পাখীদের দিকে চাইলে; দেখলে, সবাই ভয়ে-ভয়ে আকাশের দিকে এক-একবার চাচ্ছে আর কুঁকড়োর কাছে পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে। পাখীরা কখন্ কি ভাবে থাকে জিম্মার বেশ জানা ছিল, সে কুঁকড়োকে চুপি চুপি বল্লে—"আমার তো বোধ হয় না ওরা তোমার প্রাণের জন্যে ভয় পেয়েছে একটুও। ভয় ঐদিক থেকে আসছে শিকরে বাজ হয়ে, আর সেটা এসে ঘাড়ে পড়বার আগে সব পাখীরা

চিরকাল যা করে থাকে, আজও ঠিক তাই করছে।"

কুঁকড়ো দেখলেন আকাশের অনেক উপরে থেকে সত্যিই বাজ-পাখী ঘুরে-ঘুরে নামছে। তার কালো ছায়াটা যেন কালো হাতের মতো একবার খানিকক্ষণ ধরে সব পাখীদের উপর দিয়ে যেন তাদের এক-একে গুনতে-গুনতে এক-পাক ঘুরে গেল; অমনি সব পাখী ভয়ে জড়োসড়ো, আর-এক পা কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে এলো। বিপদের সময় কুঁকড়োর আশ্রয় তারা চিরকাল না চেয়েও যে পেয়েছে, বাজ অনেকবার পড়ো পড়ো হয়েছে, আর অনেকবারই কুঁকড়ো সেটাকে সরিয়ে দিয়েছেন, এবারও না হবে না কেন? কুঁকড়ো সেই রক্তমাখা বুক ফুলিয়ে সত্যিই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তারপর ঘাড় তুলে হুকুম হাঁকলেন—"আয় তোরা আয়, কাছে আয়—বুকে আয়, ভয় নেই, ভয় নেই।" অমনি বাচ্ছাগুলোকে ডানার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে সবাই কে কার ঘাড়ে পড়ে—ছুটে এসে কুঁকড়োর গা-ঘেঁসে দাঁড়ালো—কাতারে-কাতারে সব পাখী। পোষাকী মোরগগুলোর কাছে কেউ গেলও না, তাদের আশ্রয়ও কেউ চাইলে না। কেননা পোষাকী তারা নিজেরাই ভয়ে কাঁপছিল এ-ওকে জাপ্‌টে ধোরে! বাজের ছায়া আবার সবার উপর দিয়ে ঘুরে চল্লো—এবারে আরো-কালো, আরো-বড়; আর সবাই—এমন-কি পালোয়ান হায়দারি পর্যান্ত ভয়ে গুটিয়ে যেন পালকের পুঁটলিটি! কেবল সবার উপরে মাথার মোরগ-ফুল লাল নিশেনের মতো উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কুঁকড়ো,—রক্তমাখা বুক ফুলিয়ে। বাজ-পাখী আর-এক পাক ঘুরে এল, এবার সে একেবারে কাছে এসেছে, কাল-বোশেখের মেঘের মতো কালো হয়ে উঠেছে তার ভয়ঙ্কর কালো ছায়া;—সমস্ত যেন অন্ধকার করে আসছে সেটা আস্তে-আস্তে। ভয়ে মায়ের বুকের মধ্যে বাচ্ছাগুলো পর্য্যন্ত কাঁদতে থাকলো। সেই সময় কুঁকড়োর সাড়া আকাশ ভেদ করে উঠলো—"অব্‌তক্ হাম্ জিন্দা হ্যায়, অব্‌তক্ হাম্ দেখতা হ্যায়, অব্‌তক্ হাম মালেক হ্যায়।"

অমনি দেখতে দেখতে বাজের ছায়া ফিকে হতে-হতে কোথায় মিলিয়ে গেল। আকাশ যে-পরিষ্কার সেই পরিষ্কার নীল ঝক্‌ঝক করছে। আহ্লাদে পাখীরা সব আবার গা ঝাড়া দিয়ে যে যার জায়গায় উঠে বসে বল্লে—"এইবার আবার কুস্তি চলুক!" জিম্মা অবাক হয়ে গেল, কুঁকড়োর মুখে কথা সরলো না, সোনালি বল্লে—"তুমি ওদের বাঁচালে আর ওরা তার পুরস্কার দেবে না? বাজ দেখালে ভয়, তার শোধ তুলবে ওরা তোমায় মেরে।"

কিন্তু কুঁকড়ো জানেন আর তাঁর মরণ নেই; যে-পাখীকে সবাই ভয় করে, সেই বাজের কালো ছায়া তিনবার তাঁর মাথার উপর দিয়ে ঘুরে গেছে, ভয় থেকে তিনি সবাইকে বাঁচিয়েছেন, এখন নিজে তিনি নির্ভয়ে যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে এসে হায়দারিকে এক গোঁত্তা বসিয়ে বল্লেন—"আও।" গোঁত্তা খেয়ে হায়দারি ঠিক্‌রে বেড়ার উপর গিয়ে পড়লো। এবার ইস্পাতের পেরেক-আঁটা কাতান কুঁকড়োর উপর চালাবার মৎলব

কোরে সে দুপায়ে বাঁধা ছোরাছুটোয় শান্ দিয়ে নিতে লাগলো। বেরাল গাছের উপর থেকে হায়দারিকে বল্লে—"কেঁও মিঁয়া।"

চড়াই বল্লে—"কাতানি কাটকাটানি।"

জিম্মা বল্লে—"চালাক দেখি, ও কাতান, ওর টুঁটি ছিঁড়বো না!"

আবার কুস্তি চল্লো। জিম্মা দেখছে হায়দারিটা ছোরা না চালায়, এমন সময় হঠাৎ হায়দারি ঝাঁ করে ছোরা উঁচিয়ে 'লেও' বলেই যেমন কুঁকড়োকে কাতান বসাবে, অমনি কুঁকড়ো এক প্যাঁচ দিয়ে তাকে উল্টে ফেল্লেন। হায়দারির নিজের কাটা তার নিজেরই বুকে কেটে বসলো। হায়দারি পড়লেন। তার বন্ধুরা তাকে ধরাধরি করে উঠিয়ে নিয়ে পালালো। পাখীরা স. 'দুও দুও' কোরে তার পিছনে চল্লো। সোনালি আর জিম্মা কুঁকড়োর কাছে ছুটে এসে দেখলে, তিনি চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছেন।

জিম্মা বল্লে—"আমরা এসেছি বন্ধু, আমাদের সঙ্গে কথা কও।"

সোনালি বল্লে—"আমি এসেছি একটিবার চেয়ে দেখো।"

কুঁকড়ো আস্তে-আস্তে চোখ মেলে বল্লেন—"ভয় নেই, কালও আবার সূর্য্য উঠবে—আলো ফুটবে।" এদিকে হায়দারিকে দুও দিয়ে তাড়িয়ে সব পাখী কুঁকড়োকে জয় জয় বোলে খাতির করতে এল।

কুঁকড়ো রেগে হাঁকলেন—"দুও মৎ, তফাৎ রও—!"

জিম্মা বল্লে—"আর কেন? কে কেমন তা বোঝা গেছে, সরে পড়!"

সোনালি বল্লে—"সত্যিকার পাখী যদি থাকে তো সে বনে, তোরা কি পাখী?" তারপর কুকড়োর দিকে ফিরে সোনালি বল্লে—"চল, আর এখানে কেন, বনে চলে যাই চল!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"না, আমাকে এখানেই থাকতে হবে।"

"এত কাণ্ডের পরেও সব জেনেও?" সোনালি অবাক হয়ে শুধোলে।

কুঁকড়ো জবাব দিলেন—"হাঁ, সব জেনেও থাকতে হবে।"

সোনালি অবাক হয়ে রইলো। কুঁকড়ো আবার বল্লেন "হাঁ সোনালি এখন শুধু আমার গানের জন্যেই থাকবো, আর কারু জন্যে নয়। মনে হচ্ছে এদেশ ছাড়লে বিদেশে বিভুঁয়ে গান আমার শুকিয়ে মরবে। আঃ, এই আকাশ, এই দিন—একে আবার আমি গান গেয়ে আলো দিয়ে কাল জাগিয়ে তুলবো, মরতে দেবো না।" পাখীগুলো আবার মুখ কাঁচুমাচু করে কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে এল। তিনি ঘাড়-নেড়ে মানা করলেন—"নাঃ, আর না, কেউ না এখন শুধু আমি আর আমার গান, আর আমার কেউ নেই, কিছু নেই, সরে যাও, আমি দিনের আসা গাই।" সব পাখীরা দূরে সরে গেল; কুঁকড়ো সোজা দাঁড়িয়ে সুর ধরলেন—"অ'-আ-আ···" কিন্তু এ কি! গান কোথায় গেল? তাঁর মনের ভিতর ঘুরছে—সা-সাঁসা। তিনি আবার চাইলেন গাইতে, অমনি মনে হ'ল সুরটা ওডব না খাড়ব? ওটা পঞ্চম না ধৈবৎ? তেতালা না চৌতালা?—এমনি সব নানা শাস্ত্রের বিড়বিড় হিজিবিজি তাঁর গলার

মধ্যে বুকের মধ্যে ঘট্‌ঘট্‌ করতে লাগলো। কুকড়ো নিশ্বেস ছেড়ে বল্লেন—"হায় আমার গান পর্যন্ত রাখলে না;—সব কেড়ে নিলে—কোথায় আমার গান।" বোলে কুঁকড়ো ঘাড় হেঁট করলেন।

সোনালিয়া কাছে ছুটে এল, কুঁকড়ো তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কেঁদে বল্লে—"তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, তোমার ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নেই জগতে, ও আমার স্বপন-পাখী।" সোনালী আস্তে-আস্তে বল্লে—"চলো চলে যাই, যেখানে বে বলি গান আর ফল ফুটছে সেই বন, সেখানে সা রে গা মা বোলে কেউ মাথা বকায় না,—দিনরাত গেয়েই চলে।"

কুঁকড়ো সোনালিকে বল্লেন-"যাবো, তোমার সঙ্গেই যাবো, দুজনে যাবো, শুধু যাবার আগে এদের একবার চোখ-ফুটিয়ে দিয়ে যাবো।" বোলে কুকড়ো সবাইকে ডেকে বল্লেন—"ওগো ফুলতলার নিষ্কর্মার দল। এই সবজী-বাগান হাওয়া খাবার জায়গাও নয়, গুলতোন করবার আড্ডাও নয়, এখানে কাজ চলেছে, ফুল থেকে ফল আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে, হট্টগোলের জায়গা এটা নয়, ঐ শোনো মৌমাছিরাও এই কথাই বলছে।" অমনি সব মৌমাছি বলে উঠলো—"কাজের সময়, সরোনা মশয়। সরোনা মশয়! এসোনা মশয়! এসোনা মশয়!"

তারপর মুরগীদের ডেকে কুকড়ো বল্লেন—"ঐ-সব পোষা-মোরগের পালক দেখে ভুলোনা ভুলোনা! যে ধান ছড়ায় তারি কাছে ওরা ছুটে যায়, গোলাম বনে সেলাম বাজায়। ওদের সবখানিই মিথ্যে দিয়ে গড়া, সত্যির মধ্যে কেবল ওদের পেটটি। আর ময়ূর তোমাকে বলি—দেব-সেনাপতির বাহন বোলে বিধাতা তোমায় ভালো সাজ দিয়েছেন কিন্তু তাই বোলে সাহস বোলে জিনিষ তোমায় একটুও তিনি দেননি, দিয়েছেন তোমার বুকের মধ্যে হিংসে আর দেমাকের বিষ এমনি ভাবে যে তোমার গলায় খানিক পালক পুড়ে কালো হয়ে গেছে, আর তোমার ল্যাজের ডগাটি পর্যন্ত হয়ে গেছে নীল,—পাছে কারু বাড় দেখতে হয় সেই ভয়ে।"

চড়াই অমনি বলে উঠলো—"ছুট্‌!"

কুঁকড়ো চড়ায়ের দিকে ফিরে বল্লেন—"কি কুক্ষণে সহুরে চড়ায়ের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বনের শাল-চড়াই, সেই থেকে কেবলি তুমি ভয়ে-ভয়ে আছ—পাছে কেউ তোমার সহুরে-খোলোস খুলে নেয়! নকল-সহুরে! তোমার চলন নিজের নয়, বলন নিজের নয়, কেননা তোমার আনন্দ নেই, আছে কেবল ধরা-পড়বার ভয়। তুমি নিজেকে পছন্দ কর না কাজেই অন্যকেও ভালোবাসো না। তোমার কি নাম দেবো?—তুমি জলন্ত সলতের পোড়া গুল, তোমাকে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেওয়াই দরকার।"

চিনিদিদি বলে উঠলেন—"বেশ, বেশ।"

চড়াইটা ল্যাজ-গুড়িয়ে এক-কোণে সরে পড়লো, আর পেরুর উপরে এই অপমানের ঝালটা ঝাড়তে গেলে কোনো বিপদে পড়বে কিনা সেটা মনে-মনে বিচার করতে লাগলো। ঠিক এই সময় দূর থেকে চিড়িয়াখানার মালিক ডাক দিলেন—"আয়—আঃ—আয়—আঃ!" অমনি সব পোষাকী মোরগ সেইদিকে দৌড় দিলে।

চিনিদিদি বল্লে—"চল্লে নাকি? চল্লে নাকি?" বোলে তাদের সঙ্গে ছুটলেন।

কুঁকড়ো সোনালিকে বল্লেন—"আর কেন? চল এই বার।"—বোলে কুঁকড়োকে নিয়ে বনের দিকে আস্তে আস্তে-চলে গেল। জিম্মা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ কোরে সেইদিকে খানিক চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে গোলাবাড়িতে ফিরে গেল—মাথা নাড়তে-নাড়তে।

চিনিদিদি ফিরে দেখলেন সবাই চলে গেছে। তিনি তবু যেন সবাইকে খাতির কোরে বেড়াতে লাগলেন আর কেবলি বলতে লাগলেন—"আসছে সোমবারে আসবে তো? নমস্কার। মনে থাকে যেন আসছে সোমবার!"

খালি উঠোনময় চিনিদিদি ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই ভাবে, এমন সময় কাক ফুকরোলে—"কাছিম মিয়া, কাছিম মিয়া।" ..চিনিদিদি তাঁর ছেলেকে বলছিলেন—"আঃ, আজ মজলিস্ কেমন জমেছিল দেখিচিস্।" গুটি গুটি কাছিম এসে কুলতলায় বসলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগমনী

সূর্য্যতপন ডুবু ডুবু; নদীর ঘাটে একা সে।
পশ্চিমেতে রঙ্গের বাহার, পূবের আকাশ ফেকাসে।
কোন্ ঘাটে কোন্ নৌকা লাগে, দেখ্‌চে চেয়ে সুন্দরী
আকুল প্রীতির ব্যথার গীতি বুকে ঘোরে গুঞ্জরি'।
দূরের নৌকা দূরেই গেল, বাড়্‌ল বুকের ছম্‌ছমি,
আর যে পূজার চদিন্ বাকী, আজ যে তিথি পঞ্চমী।

দক্ষিণে অই নৌকা ঘোরে, বাঁকের মোড়ের পশ্চিমেই
চোখে লাগে সাঁঝের আলো, প্রাণের মাঝে স্বস্তি নেই
"ঘাটে আন পাটের ঠাকুর, ভাল-এ ভাল-এ শঙ্করী!
"ওমা তোমার পায়ে দিব পদ্ম-ফুলের অঞ্জলী"।
ঘাটের পাশে নৌকা আসে; অই যেন কে তাকালে!
ঘোম্‌টা টেনে পালায় বালা, কল্‌সী তুলে কাঁকালে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

চার্ব্বি-চর্ব্বণ

(ভিক্টর তিসো হইতে)

ক

কন্‌স্তান্তাইন, রুসিয়ার প্রথম সম্রাট। একদিন তিনি বিরাম-আসনে বসিয়া আছেন, এমনসময়ে তাঁহার ভাঁড় জুলোস্কি আসিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া সেলাম ঠুকিল।

সম্রাট বলিলেন, "কিহে, কি মনে করে?"

—"সম্রাট, আপনাকে এবারে ছোটখাট একটি প্রতিশোধের অভিনয় করতে হবে!"

—"প্রতিশোধের অভিনয়?"

—"হ্যাঁ সম্রাট! হুজুর জানেন বোধ হয়, প্রজারা আপনাকে ভালোবেসে পুজো করলেও, রাজ্যের আমীর-ওমরাওরা আপনাকে দু-চোখে দেখ্‌তে পারেন না?"

—"চুলোয় যাক্! আমি তাদের থোড়াই কেয়ার করি।"

—"আমিই কি হুজুর কেয়ার করি? কিন্তু হিঁসুকুটে নিন্দুকরা যদি যেখানে-সেখানে আপনার নামে মিথ্যে বদনাম রটায়, তাহলে কি তাদের মুখবন্ধ করা উচিত নয়? বলুন হুজুর, আপনিই বলুন!"

—"কি বলে তারা?"

—"তারা কি বলে জানেন? তারা বলে—ওঃ, অসম্ভব!—না সম্রাট, সে কথা আপনার সাম্‌নে বল্‌তে আমার মাথা কাটা যাবে!"

—"ভয় কি? বল সব! আমি হুকুম দিচ্ছি!"

—"কি জানেন, তারা বলে—ইয়ে—আপনি নাকি—ওর-নাম-কি—চর্ব্বির বাতি খেতে ভারি ভালোবাসেন! আস্পর্দ্ধাটা দেখুন হুজুর! যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা!"

সম্রাটের মুখ রাগের আগুনে পুড়িয়া লাল-টক্‌টকে হইয়া উঠিল।

ক্ষাপ্পা হইয়া তিনি হুমকি দিলেন, "কী! এতবড় কথা! কারা বলে এ কথা? নাম কর সকলের! সবাইকেই আমি কোতোল করব!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! সেইটেই হচ্ছে তাদের উচিত-শাস্তি! কিন্তু এ ব্যাপারটা পুলিস-দারোগা ও আবিষ্কার করে নি—আবিষ্কার করেছি আমি—আপনার ভাঁড়। সুতরাং ভাঁড়ামি দিয়েই এই নষ্টামিকে জব্দ করা যাক্! হুজুর কি বলেন?"

—"বেশ, তাই হোক্।"

দু-দিন পরের কথা। রাজবাড়ীতে মহা ধূম! রাজ্যের যত আমীর-ওমরাওদের আজ সেখানে নিমন্ত্রণ।

চারিদিকে বাজ্‌না বাজিতেছে। সাজ-পোষাকের জলুসে সকলের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া, হাসিমুখে সবাই সারি সারি খাইতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সম্রাট

নিজেও আছেন। তাঁহার মেজাজ আজ ভারি খুস। সকলেরই সঙ্গে তিনি গল্প-গুজব, হাসি-মস্করা করিতেছেন।

খাবারের থালার পর থালা আসিতেছে, আর চোখের পলক না-পড়িতেই খাবারগুলি উড়িয়া যাইতেছে কর্পূরের মত। রাজভোজে সকলের পেট ফুলিয়া ক্রমেই ঢাক হইবার জোগাড়!

হঠাৎ সম্রাট চোখ ঠারিয়া ইসারা করিলেন। জরিদার কাপড়ে ঢাকা সোনার এক থালা লইয়া, পরিবেষণকারী ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঢাকুনি খোলা হইলে দেখা গেল, এক থালা চর্ব্বির বাতি! সকলে গালে হাত দিয়া, চক্ষু স্থির করিয়া অবাক!

সম্রাট গম্ভীর মুখে বলিলেন, "চর্ব্বির বাতি আমি ভারি ভালোবাসি। আহা, খেতে কি মিষ্টি। আপনাদেরও কি সেই মত নয়?"

মান বাঁচাইবার জন্য সবাই তার স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়—আহা, চমৎকার।"

সম্রাট মনে মনে হাসিয়া, থালা হইতে একটি বাতি নিজে লইয়া বলিলেন, "ওরে, এঁদের সকলের পাতে বেছে বেছে এক-একটা ভালো দেখে বাতি দিয়ে যা ত!"

সভাসদদের মধ্যে একজন, পাশের আর-একজনকে চুপিচুপি বলিলেন, "গতিক ভারি খারাপ হে! সম্রাটের কাণে সব কথা উঠেচে। তাই এই শাস্তির ব্যবস্থা।"

আর-একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা বলিলেন, "আমরা ঠিক আদব কায়দা মেনে চলব কিন্তু। সম্রাট যদি নিজে বাতি না খান, আমরাও তাহলে কিছুতেই খেতে বাধ্য নই। সম্রাট ঠাট্টা করে যাই-ই বলুন, তিনি ত সত্যি সত্যিই আর ঐ চর্ব্বির বাতিটা দাঁতে চিবিয়ে খেতে পারবেন না।"

কিন্তু হা হতোস্মি। সম্রাট তাঁহার নিজের পাতের বাতিটা অম্লানবদনে মুখের ভিতরে পুরিয়া দিলেন এবং এমন ধীরে-সুস্থে চাখিয়া চাখিয়া খাইতে লাগিলেন যে, দেখিলে মনে হয়, চর্ব্বির বাতির স্বাদটা তাঁহার যার পর-নাই ভালো লাগিয়াছে!

সভাসদদের মাথায় যেন বাজ ভাঙিয়া পড়িল। চর্ব্বির বাতি খাওয়া! ওরে বাপরে এ কি ভয়ানক কথা!

নাছোড়বান্দা সম্রাট নির্দ্দয় স্বরে বলিলেন, "খান্, খান্—সবাই খেয়ে ফেলুন! এমন সুস্বাদু জিনিষটা পাতে ফেলে রাখলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব। ... ... আহা, খেতে কি মিষ্টি!"

হতভম্ব আমীর ওমরাওরা কি আর করেন,—কলের পুতুলের মত চর্ব্বির বাতিগুলো একে একে তুলিয়া লইয়া, চোখ-কাণ বুঁজিয়া বসাইয়া দিলেন এক-এক কামড়! মুখের উপরে সম্রাটকে অপমান করে, এমন বুকের পাটা আছে কার!

সে শুক্‌নো বাতির চর্ব্বির ঢেলা কোঁৎ করিয়া গিলিয়া ফেলা—সে কি বড় সিধে কাজ? খানিকটা যায় দাঁতে লেপ্টাইয়া, খানিকটা যায় গলায় আট্‌কাইয়া। সকলেরই প্রাণ মর'মর', দেহ জর-জর, বুক থর'-থর'! একেবারে কি-হয় কি-হয় অবস্থা আর-কি!

গ

পরদিনের ভোরবেলা।

জুলোস্কি বলিল, "তারপর হুজুর?"

সম্রাট হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন, "তারপর সেই বাতি গিল্‌তে গিয়ে লোক-গুলোর মুখের ভাব যে কি চমৎকার হয়ে উঠল, তা যদি তুমি দেখতে হে! সাবাস জুলোস্কি! আচ্ছা মৎলোব বাৎলে দিয়েচ!"

... ... রাজার নামে নিন্দা-রটানোর শাস্তিস্বরূপ, আমীর-ওমরাওরা যখন আসল চর্ব্বির বাতি চর্ব্বণে বাধ্য হইয়া-ছিলেন, সম্রাট নিজে তখন যাহা ভক্ষণ করিতেছিলেন, তাহা মূলেই চর্ব্বির বাতি নয়—অবিকল বাতির আকারে জমানো, কুল্‌পির-বরফ মাত্র।

(রায়।

হাসি

(গল্প)

আর সইতে পারিনা গো!

স্বামী! যতদিন তিনি কাছে ছিলেন, আমার কেউ ছিলেন না! ততদিন নিজের মনটাকেও বুঝতে পারিনি, বোঝবার চেষ্টাও করিনি! গল্প শুনেছিলুম, এক মস্ত যোদ্ধা তলোয়ারের ঘায় সার-সার গাছ এমনি কেটে ছিলেন যে, যারা দেখেছিল, প্রথমটা তারা ভেবেছিল, গাছ যেমন আস্ত তেমনিই আছে, কাটেনি; তারপর নাড়া দিতেই ধুপ্‌ধাপ করে সব কাটা মাথাগুলো পড়ে গেল! আমারও সেই দশা। যতদিন তিনি কাছে ছিলেন, আমারও অলক্ষ্যে এমন নিঃশব্দে মনের গোড়ায় কোপটি দিয়ে ছিলেন যে আমি তা বুঝতেও পারিনি! তাই না আজ প্রাণটা জলে খাক্ হয়ে যাচ্ছে! কেন তখন তাকে বুঝিনি! তাঁর শত লাঞ্ছনায় আমিও একদিন আমোদ পেয়েছি! হায়রে! আর আজ তিনি নেই, তাঁর স্মৃতির এতটুকু লাঞ্ছনাও প্রাণে আমার বিষ ছিটুচ্ছে—এ কষ্ট কি অসহ্য গো। সেই কথাই বলি।

... ...

চার ভাইয়ের পর যখন আমার জন্ম হল, শুনেছি, তখন চাকর-দাসীদের ডেকে ডেকে কে কি চায় জিজ্ঞেস করে সব বখশিস্ দেওয়া হয়েছিল। মা হেসে বলেছিল, "মেয়ের যত্ন বাঙালীর বাড়ীতে কেমন করে করতে হয়, সবাইকে এবার দেখাব।" সবার মুখে হাসি ফুটিয়েছিলুম বলে আমার নাম রাখা হয়েছিল, হাসি! হাসি, হাসি-মুখী! হায়রে, তখন যদি কেউ বিধাতা পুরুষের মুখে পরিহাসের নিষ্ঠুর হাসিটুকু দেখতে পেত।

জ্ঞান হলে অর্থাৎ ছেলেবেলাকার কথা যতদূর মনে পড়ে আর কি, এটা বেশ বুঝেছিলুম, দাদাদের চেয়ে আমার আদর মা-বাপের কাছে কম ত ছিলই না, ছিল

বরং ঢের-বেশী। লেসে-রেশমে আমায় যেন পাঁতায়-ঢাকা ফুলটির মত করেই রাখা হত! কি আদর! বাবার সঙ্গে ছুটীর দিনে গড়ের মাঠে, ইডেন গার্ডনে, মিউজিয়মে ফিটনে চড়ে বেড়াতে যাওয়া—,তবে গে ঐ বায়স্কোপে, কি সার্কাসে বাবার আমি নিত্য-সঙ্গী ছিলুম। হাস্‌তে হাস্‌তে বাঁয়োস্কোপ থেকে ফিরে যখন দাদাদের ঘরে ঢুকতুম, দাদারা তখন মাষ্টার মশায়ের পড়ার চাপ ঠেলে আমার মুখের পানে কি-সে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে দেখত! দাদারা কোনদিন আড়ালে মার কাছে আব্দার তুললে মা বল্‌ত, "ও মেয়ে, দু'দিন পরে পরের ঘরে চলে যাবে। সেখানে যত্ন আদর মিলবে কি না, কে জানে! তোরা হলি বেটা ছেলে, সবই ত তোদের থাকবে, আমোদ-আহ্লাদও পালাচ্ছে না,—তাছাড়া এখন তোদের লেখাপড়ার সময়, আমোদ-আহ্লাদ বড় হয়ে করিস্ তখন। এখন পড়্‌গে যা।"

আমার বেশ মনে আছে, সেবারে কি একটা মস্ত ব্যাপারে গড়ের মাঠে বাজি পোড়াবার ভারী ধূম বেধেছিল। দাদারা কাগজের নৌকো দোয়াত তৈরি করে পুতুল কিনে দিয়ে আমার মন জুগিয়ে আমার সুপারিশ ধরেছিল,"লক্ষ্মী ভাই হাসি,আমাদের যাতে বাজি দেখতে যাওয়া হয়, করিয়ে দে, ভাই। কাল স্কুল থেকে আসবার সময় তোর জন্যে খুব ভাল জেলি লজঞ্জুস কিনে আনব।" এ আর কি বড় কথা! বাবাকে বলে দাদাদের এমন কত আব্দার কত দিন যে রেখেছি—সেই ছেলেবেলায়!

দাদাদের কাছেই আদরটা কি কম ছিল! ভালো খেলনা, ভালো ছবিটি কোথাও দেখলে তখনি হাসির জন্যে নিয়ে আসত। দাদারা ব্যাডমিণ্টন খেলবার আয়োজন করলে আমিও বায়না নিলুম, আমি খেলবো। অমনি পরদিন আমার জন্যে ব্যাট-ট্যাট্ এসে হাজির। পাড়া-পড়সীরা দেখে জ্বলে উঠত, আড়ালে এ-ওর গা টিপে বলত, বাঁচিনে—কলির চিত্রাঙ্গদা জন্মেছেন! এর পর কি হাল হয়, তাও দেখবো'খন।

… … … …

সত্যি, আজ কেবলি মনে হচ্ছে, কেন এমন সোনার শৈশব ফুরিয়ে যায়,—কেন মানুষ বড় হয়, চিরদিন তেমনি ছোট কেন থাকে না—তার সেই ছোট গণ্ডীটির মধ্যে। সেই আনন্দের লহর,—হাওয়ার মত সেই অবাধ গতিতে ভেসে বেড়ানো—সে কি সুখ!

মা-বাপের কাছে জন্ম-জন্ম ঋণী আমি! এমন মা-বাপ কি কেউ পেয়েছে কখনো। তবে একটা কথা আজ মনে হয়, মা-বাপের মনে স্নেহ-মমতা বিধাতা যতটা ঢেলে দিয়েছেন, মেয়েকে সুখী করবার শক্তি যদি তার সিকির সিকিও দিতেন!

ন'বছর বয়সে আমার খুব অসুখ হয়, একবার। বাড়ী-শুদ্ধ সকলে কি-রকম যে অস্থির হয়ে উঠল! ডাক্তারে-নার্সে বাড়ী ভরে গেল। ক'দিন যেন বাড়ীতে টাকার ছিনিমিনি খেলে গেল। ডাক্তারের দল যেদিন আরোগ্য স্নানের আশ্বাস দিয়ে বাড়ী থেকে চলে গেলেন, বাড়ীতে সেদিন একটা আরামের বিদ্যুৎ খেলে গেল! আমার মুখে-চোখে চুমু দিয়ে গায়ে নতুন গহনা চড়িয়েও বাবার মার সাধ মেটে না

আর! তারপর আমার শরীর সারাবার জন্য বাড়ী শুদ্ধ সকলে পশ্চিমে চললুম। কোথায় রইল, দাদাদের পড়াশোনা!

... ...

একদিন দাদাদের পড়বার ঘরে বসে ছিলুম—দাদারা কলর-বক্স নিয়ে ছবি আঁকছিল, বন-জঙ্গল, নদী, পাহাড়, কত-কি! আমি বসে বসে ফরমাস করছিলুম—আর আব্দার তুলছিলুম, ঐ গাছ-তলায় একটা হরিণ আঁকো না, বড়দা। জলে নৌকো কোথায়? বা রে, পাহাড়ের উপর বরফ কৈ? এমন সময় গম্ভীর আওয়াজ তুলে এক প্রকাণ্ড ভারী গাড়ী এসে আমাদের বাড়ীর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি উঠে খড়খড়ির ধারে এলুম। এমন গাড়ী এ রাস্তায় ঢোকে,—কি গাড়ী? দেখি, একপাল মেয়ে গাড়ীর মধ্যে বসে,—কেমন একটা দীপ্তি তাদের মুখে-চোখে, কি প্রসন্ন হাসি ঠোঁটের আগায় উথলে উঠেছে! কাপড়-চোপড় বেশ সরল ছাঁদে সুশ্রী ভঙ্গীতে পরা। কারো মাথার উপর লাল ফিতের বো বাঁধা, কারো পিঠ বয়ে ছোট্ট বেণী দুলছে, কারো বা মাথায় খোঁপা। তাদের দেখে মনে হল, এরা যেন কোন্ এক অজানা আনন্দ-লোকের জীব। দাদাদের বললুম, এ কি গাড়ী ভাই?

দাদারা বললে, মেয়েস্কুলের গাড়ী—বোকা মেয়ে, তা জানোনা! মেয়েরা ওতে করে স্কুলে যায়।

দিব্যি দলটি! আমি একেবারে নেচে উঠে বললুম, আমিও স্কুলে যাব। বাবাকে বলে মাকে বলে সেই দিনই বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললুম; স্কুলে ভর্ত্তি হলুম। রোজ রোজ একদল সঙ্গীর সঙ্গে সমস্ত পথ হাসিতে গল্পে চকিত করে দিয়ে গাড়ী করে স্কুলে যেতে লাগলুম—পথে নানা আকারের বাড়ী-ঘর, লোকজন বিদ্যুতের মতই কি যে বৈচিত্র্যের হল্‌কা নিয়ে সরে সরে যেত। স্কুলে নানান্ দেশের নানান্ লোকের গল্প-কথা আমার প্রাণের তারে কেমন-এক ঝঙ্কার তুলে দিত। আমি তন্ময় বিভোর হয়ে এক নতুন আনন্দ উপভোগ করতুম!

দিনগুলো দিব্যি কেটে যাচ্ছিল। পৃথিবীটাকে ভারী সুন্দর, আরামের জায়গা বলেই বুঝছিলুম! বইয়ে দেখতুম, দুঃখ বলে কি একটা কথা তুলে বইওয়ালারা কত পাতা তারি বর্ণনায় হা-হুতাশে ভরে দিয়েছে! আমি ভাবতুম, দুঃখ, সে আবার কি! অভাব—তারই বা মানে কি? দুঃখী ত ঐ গরিব ভিখিরীরা—যাদের মুখে অন্ন পরণে একখানা কাপড় জোটে না! তাছাড়া পৃথিবীতে আবার কিসের দুঃখ, কিসের অভাব থাকতে পারে! ভাবতে বসলেই মাথাটা কেমন চন্-চন্ করে উঠত। দুঃখের কথা, দুঃখের প্রসঙ্গ ছেড়ে একেবারে দাদাদের ঘরে, নয় ত মার কাছে কি বাবার কাছে ছুটে যেতুম। মনটা আবার তার সহজ সুর ফিরে পেত!

সুখ আর দুঃখ, এই নিয়েই ত বিধাতার সৃষ্টি। আজীবন দুঃখের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, এমন কি কেউ আছে, এ জগতে? যদি থাকে, না জানি, পূর্ব্বজন্মে কি অসীম তপস্যাই সে করেছিল। আকণ্ঠ সুখ ভোগ করে আমি তখন ভাবতুম, আমিও সেই-দলের একজন, আর আজ—?

সুখ আর দুঃখ, কিছু-কিছু যে ভোগ করেছে তার ভাগ্যেরও তুলনা নেই! কিন্তু ছেলেবেলা একটি দিনের জন্যও দুঃখ যার গায়ে হুল্ এতটুকু ফোটায়নি, পরে যখন তাকে একেবারে অসংখ্য শরে জর্জ্জরিত করে ফেলে, তখন তার কি কষ্ট, কি যাতনা—উঃ! ভগবান, অতি-বড় শত্রুকেও যেন সে যাতনা কখনো ভোগ করতে না হয়!

আমার সুখের মাত্রা কাণায় কাণায় ভরে উঠেছিল—আর ধরছিল না, তাই এক-দিন সেই পাত্রটা হঠাৎ উল্টে দিয়ে সমস্ত সুখের জায়গাটুকু দুঃখ এসে অধিকার করে বসল। আজও সে পাত্র কাণায় কাণায় ভরে আছে, শুধু দুঃখে আর দুঃখে! এ পাত্র কবে ওল্টাবে—কবে চূর্ণ হবে, ভগবান!

আমার বিয়ের বয়স হয়ে এসেছিল। বিয়ে না দিলে নয়! বাবা মা বিষম ভাবনায় পড়ল! এ আদরের মেয়েকে এবার পরের ঘরে পাঠাতে হবে! বাড়ীতে কেমন একটা অস্বস্তি জাগল। বরের দরের জন্য কোন কাতরতা ছিল না ত—আসল কাতরতা আমায় পরের ঘরে পাঠাতে হবে, তাই নিয়ে!

বাবা বললে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইটিকে কাছে রাখতে চাই!

তাও কি হয়?—বলে পাত্রের দল হেসে চলে গেল।

শেষে একজনকে পাওয়া গেল। পনেরো বছরের এক মস্ত আইবুড়ো বোন, বুড়ো মা আর দারিদ্র্য নিয়ে একটি পাত্র কোন্ অজ পাড়াগাঁয় বসে হিম্‌সিম্ খাচ্ছিল,—দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসে সে বললে, আমি রাজী।

অর্থাৎ পাত্রটির লেখাপড়ায় চাড় ছিল খুব, অথচ অবস্থায় কিছুতেই কুলিয়ে উঠছিল না। তার উপর ঘরে বুড়ো মা আর ঐ আইবুড়ো বোন্। বাবার টাকায় বোনের বিয়ে দিয়ে বোনকে বাড়ী থেকে বিদায় করে, মাকে কাশী পাঠিয়ে তিনি আমায় বিয়ে করে আমাদের বাড়ীতে এসে কায়েমিভাবে বসে গেলেন।

তাঁর চাল-চলনটা প্রথমে আমাদের বাড়ীতে সকলের প্রাণে কি যে কৌতুকের উৎস খুলে দিলে! সকলে ভারী মজা পেতে লাগল। আমিও! জামাইবাবু স্নানের ঘরে না ঢুকে বাইরের খোলা কলতলায় স্নান করতে নেমে যান—কোঁচানো কাপড়টাকে আয়ত্ত করে পরতে পারেন না, অনেক সময় খোলা গায়ে চটি পায়েই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন, সাবান চাকররা হুঁস করিয়ে দিলে কোনদিন গায়ে পড়ে, নয়ত পড়েই না! বেরুবার সময় কোঁচার খুঁট দিয়েই জুতোটা ঝাড়তে বসে যান্! চাকর-বাকরেরা মুখ টিপে হেসে সরে আসে—সময় সময় আত্ম-রক্ষার উদ্দেশে মার কাছে এসে তারা নানা অনুযোগ তোলে। মা চোখ রাঙিয়ে বলে, তোরা দিস্ কেন? আগে থাকতে হুঁসিয়ার থাকতে পারিস না! ফের যদি অমন হয়, তোদের সব্বাইকে তাড়িয়ে দেব, নয় জরিমানা করব।

আমার আমোদ হ্ত, রাগ হ্ত, অভিমান হত। ঐ যে ও-বাড়ীর শৈল, রাণু, শেফালি—ওরা যে মুখ টিপে হাসে! কেন? ওরা কেমন শ্বশুরবাড়ী যায়—কত তত্ত্ব-তাবাস আসে—কেমন মানুষের মত তাদের বর! পরিচয় দিতে বুক অমনি তাদের গর্ব্বে উথলে ওঠে।

দাদারা তাঁকে ভালবাসত। বড়দা বলত, গিরীন এমন অঙ্ক কষতে পাবে—মাষ্টার মশায় তেমন পারেন না।

যাই হোক্ অঙ্কশাস্ত্রে প্রচণ্ড নৈপুণ্য আর পাণ্ডিত্যে আমার মন প্রসন্ন হল না। আমি কি যেন চাইতুম তাঁর কাছে—কি, তা নিজেও বুঝিনি কোনদিন—তবে যা চাইতুম, তা কিন্তু পেতুম না! তার উপর তাঁর এই আমাদের বাড়ী পড়ে থাকা, এটা আমার এক এক সময় কেমন বিশ্রী ঠেকত। যখন ঐ বাণু শৈল তাদের শ্বশুরবাড়ীর কথা পাড়ত—বিশেষ করে তখনই। আরো মনে হত, তাঁকে দাদাদের সঙ্গে একরকম করে কেউ দেখচে না, একটু তফাৎ করচে। আবার ভাবতুম, কেনই বা করবে না। আজ মনে হচ্ছে, কেন তখনকার তাঁর সে-সব তাচ্ছল্য আমিও তাঁর সঙ্গে মাথা পেতে নিই নি।

আমায় তিনি ভাল বাসতেন কি? কে জানে। তবে একদিন বড় আনন্দ, বড় তৃপ্তি পেয়েছিলুম। রাঙা কালির অক্ষরে টক্‌টকে ফুলের মতই সে স্মৃতি আমার বুকে ফুটে আছে। সেদিন রাত্রে মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছিলুম। বড় কষ্ট হচ্ছিল। উনি সারারাত্রি শিয়রে বসে মাথায় পটি বেঁধে অডিকলোন দিয়েছিলেন। আর সারারাত্রি কি সে ব্যাকুলতা—একটু ঘুমোও, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি, লক্ষ্মীটি। আহা, সে সুখ জীবনে ভুলবো!

কিন্তু ঐ কি সব। কিশোরী নারীর প্রাণের শত সহস্র কামনা, বিচিত্র সাধ—তার কোন্‌টা মিটেছে আমার! মনটা গুমরে গুমরে উঠত—কিন্তু কেন? কেন? কি যে চায় মন, তাও কি ছাই বুঝছিলুম!

এমনি ভাবেই দিনগুলো গড়িয়ে চলে ছিল। থেকে থেকে মনে হত, বৈচিত্র্য আর আনন্দের আলো-ভরা পথ ছেড়ে এ যেন কোন্ নিরানন্দময় গলির পথে জীবনটা ঢুকে পড়েছে। যাত্রার শেষ কি হয় না, এ পথে? হয়,—তবে ওরি মধ্যে একটু রকম-ফের আছে ত।

মা বাবা আমায় সাজে পোষাকে গহনার ভারে ঢেকে ফেলছিল। কিন্তু তবুও মা বোধ হয় সে গহনা আর কাপড়-চোপড়ের ভার ঠেলে ভিতরটাও দেখতে পেত! মার চোখ ত।

সেদিন একখানা বই হাতে নিয়ে পিঠের উপর এলো চুলের রাশ ছড়িয়ে দিয়ে চুল শুকোচ্ছিলুম—মা এসে চুলগুলি কুলিয়ে দিতে দিতে বললে, তোর সে হাসি-খুসি কোথায় গেল রে সব? আজ যা না, সবাই বায়োস্কোপে যাচ্ছে—

আমি বললুম, না।

মা বললে, আগে অত যে বায়োস্কোপ দেখতে ভালোবাসতিস, তা—

আমি বললুম, ভালো লাগে না।

তবু যেতে হল। বাবার কথায় 'না' বলতে পারলুম না।

বায়োস্কোপ থেকে ফিরে এসে শুনলুম, বাড়ীতে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। আমার সেই ননদটির খুব অসুখ হয়েছে, নন্দাই রোগের ভার বইতে পারবে না বলে স্ত্রীকে ওঁদের দেশের বাড়ীতে ফেলে দিয়ে গেছে। শাশুড়ী কাশী থেকে ফিরে-

ছিলেন—তিনি বুড়ো মানুষ, রোগের ভার নেন কি করে—তাই উনি আমায় সেখানে নিয়ে যেতে চেয়ে ছিলেন। মা বলেছে, ও কি করে যাবে! ছেলেমানুষ, ও কি জানে রোগীর সেবা করতে! তার চেয়ে তোমার বোনকে মাকে এখানে নিয়ে এসো বরং। আমরা ডাক্তার দেখাব'খন খরচ-পত্র করে।

এ কথা শুনেই তিনি একটা উড়ুনি কাঁধে ফেলে চটি পরেই বেরিয়ে গেছেন।

শুনে আমার আপাদ-মস্তক কেঁপে উঠল।

চলে গেছেন! মার উপর রাগ হল একটু। মনে হল, কথাটা ভালো করে বলা হয়নি, নিশ্চয়! আমি বড়লোকের মেয়ে, পাড়াগাঁয়ে কষ্ট হবে—তাই আমার যাওয়া হবে না। আর তাঁর বোনকে এখানে আনা হবে—সেটা কৃপা করে! ঠিক এভাবে কথাটা না বলে অন্য ভাবে কি বলা যেত না? এমন কিছু দরদ ছিল না সত্যি, তবু আমার কেবলি মনে হতে লাগল, নিশ্চয় সে কথাটা থেকে তাঁর অবস্থা, তাঁর দারিদ্র্যের প্রতি ইঙ্গিতটাই বেশী ফুটেছিল। নাহলে ওরকম করে তাঁর ত যাবার কথা নয়। হঠাৎ আমার মনের মধ্যে এ কি হল নিজেই বুঝলুম না! একবাড়ী দাসী-চাকরের সামনে তাঁকেও কথা বলা! আমার সম্পর্কেই ত তিনি এখানকার কেউ একজন!—মনে হল, তাদের চোখে আমিও আজ কত কৃপার পাত্রী! আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলুম না—তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে বসে পড়লুম।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া ভালো লাগল না! মা ডাকলে। বললুম, খাব না। তবু জেদ, তবু পীড়াপীড়ি! অসহ্য লাগল। বললুম, দাও দুধ। রাগে জ্বলতে জ্বলতে একবাটি দুধ গিলে ঘরের আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। কৃত্রিম আলোটা সরে যেতে আকাশের চাঁদ অমনি তার অজস্র হাসির ধারায় ঘরটাকে ভরিয়ে দিলে! আকাশের দিকে চোখ পড়ল—নীল নির্ম্মল আকাশ—চাঁদ হাসতে হাসতে ভেসে চলেছে! সে হাসি এমন বিশ্রী ঠেকল যে, কি বলব! চোখ বুজলুম।

অমনি কত কথা—ক'দিনেরই বা?—ভিড় করে মনের দোরে এসে হাজির হল। আমাকে কতদিন আদর করে তিনি বলেছেন, পাশটাশ করে দু'পয়সা রোজগার করতে পারলেই তোমায় নিয়ে যাব। দু'জনে সুখের ঘর বাঁধব, হাসি! সে কথা শুনে তখন হাসি পেত। আজ মনে হল, আহা, সে কথায় প্রাণের কতখানি ব্যাকুল আশা জেগে উঠেছিল, কি রকম কেঁপে উঠেছিল সে স্বর! শ্বশুরবাড়ী, স্বামীর ঘর! শুনেছি, বাঙালীর মেয়ের স্বর্গ সে।

তারপর মনে পড়ল, নিধে চাকরটা ওঁর একটা চিঠি ডাকে দিতে নিয়ে গিয়ে দেয়নি একদিন, ভাঁড়ার ঘরে ফেলে রেখে-ছিল! সে বলেছিল, ভুলে গেছে। তিনি মলিন মুখে বলেছিলেন, বড্ড দরকারী চিঠি-খানা ছিল। আমি বলেছিলুম, তা ভুল কি মানুষের হয় না? ভুল করেছে—কি হবে! তিনি আর কোন কথা কন্ নি! আজ মনে হল, নিধে সে মিছে কথা বলেছিল—কেন ভুল হল তার? কেন সে ভুলের কৈফিয়ৎ চাইনি? নিশ্চয় এ তার অগ্রাহ্য করা।

বাড়ীর জামাইবাবু কি না! কৈ, দাদাদের কোন কাজে কোনদিন ত এতটুকু ভুল হয়নি! সেই তুচ্ছ ব্যাপারটাই আমার প্রাণে এমন বাজল আজ, নতুন বেদনা নিয়ে! তারপর একদিন কি করে রাত্রের দুধ নষ্ট হয়ে যায়—বামুনদি' সবার জন্য এক-এক বাটি দুধ ঠিক করে রাখে—তাঁর সে রাত্রে দুধ জোটেনি! মা জানতে পেরে বামুনদিকে ধমক দিলে, বামুনদি বললে,—দাদাবাবুদের দিদিমণির দুধ খাওয়া চিরদিনের অভ্যাস—জামাইবাবুর একদিন—

একদিন কি? ফাঁক পড়লেও চলে! বটে? কেন, কেন, কেন? তোমাদের বাড়ী পড়ে আছেন বলে! কেন রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ তখন জ্বলে ওঠেনি? মুখ ফুটে কেন সেদিন বলিনি, দূর করে দাও ঐ বামনীটাকে—এত বড় আস্পর্দ্ধা ওর! হায়রে, তখন যদি বুঝতুম—যদি বলতে পারতুম, তাহলে আজ এ সোনার সিংহাসনে বসেও চোখের জলে সারা হতুম না! এমনি নানা কথা—খুব ছোট, খুব তুচ্ছ—সেগুলোও আজ মনের দোরে বড় জোরে চীৎকার করছিল। কবেকার তাঁর এতটুকু তাচ্ছল্য—এতখানি বড় হয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

আমি তাঁকে ভালবাসি? কে জানে—কোনদিন ত সেটা ভেবে দেখিনি! আজ তাঁর অভাবে চেয়ে দেখলুম, আমার মনের মধ্যিখানটা একেবারে ফাঁক হয়ে গেছে—খালি হয়ে গেছে!

দু'দিন পরে তাঁর এক চিঠি এল—বাবাকে লিখেছেন, রুগ্ন বোনকে নিয়ে তিনি বিপন্ন—আমাকে পাঠালে ভালো হয়। বোনটির জীবনের আশা অল্পই। সে বেচারী বৌকে একবার দেখতে চায়। একবেলার জন্যও যদি দয়া করে—

বাবা বললে, তা হয় কি করে? সেখানে ভারী ম্যালেরিয়া। শেষে কি—

প্রাণটা গেলেই ভালো হত! তিনি সেখানে পড়ে আছেন—তাঁকে ম্যালেরিয়া ধরবে না? আমার বেলায় যত সাবধান! পোড়ারমুখী আমি, কেন তখন শুধু ঘরের কোণে মুখ বুজে পড়ে ছিলুম? কেন বলিনি না—যাব—আমি যাব—ওগো সে আমার ঘর, শ্বশুরের ঘর, স্বামীর ঘর, নিজের ঘর!

সাতদিন পরে খবর এল—তাঁর সে বোনটি মারা গেছে। বৌয়ের সঙ্গে দেখা করব বলে শেষ শয্যায় পড়ে বেচারী কেবলি মিনতি করেছিল। যাক্, সে আপশোষ নিয়েই সে মরেছে, আমাদের আর দুর্ভাবনার কারণ নেই। হতভাগী আমি, তখনো কোন কথা যদি মুখ ফুটে বলি!

বাবা লোক পাঠালে তাঁকে আনতে—নিজে গেল—ফিরে এসে বললে, সে আসতে পারবে না। তাঁর বুড়ো মা মেয়ে হারিয়ে অত্যন্ত কাতর। মাকে ফেলে শ্বশুরবাড়ী রাজভোগ গিলতে তিনি আসতে পারবেন না। বাবা বললে, আহাম্মক!

আমি শিউরে উঠলুম।

মা বললে, কথায় বলে, জন জামাই ভাগ্না, তিন নয় আপনা!

আমার আদরের মাত্রা বেড়ে গেল খুবই। তাতে কি হবে—সে কি ভালো লাগে! সবার অনুগৃহীত হয়ে, সবার

কুদৃষ্টির সাম্নে একটা জড়পিণ্ড হয়ে পড়ে থাকা—উঃ, অসহ্য সে জ্বালা! আমার মনে হত, এ যেন শুকনো গাছের গোড়ায় জল ঢালা হচ্ছে। খাঁচায় আমার একটা পোষা ময়না ছিল—কত কথা বলত, বড় আদরে অনেকদিন ধরে পুষে আসছি। তার আরামের জন্য কত বন্দোবস্ত ছিল। সেটার পানে চেয়ে মনে হল, আমারি মত সুখ-সৌভাগ্য ওর! সোনার খাঁচায় বসে দিব্যি রাজভোগ খাচ্ছে—না! খাঁচা খুলে পাখীটাকে উড়িয়ে দিলুম, বললুম, তোর এ সুখের মাত্রা আজ আমি বুঝেছি রে—আর নয়, তুই উড়ে যা!

তারপর আরো ক'খানা চিঠি এল, আমায় পাঠাবার জন্য মিনতি ভরে—বুড়ো শাশুড়ী শোকে অন্ধ হয়েছেন। একবার যদি—আমি গেলে—

বাবা রেগে বললে, হুঁ—আমার অত আদরের মেয়ে—

মা বললে, বেয়াড়া গোঁ! একটা ছোলা কেনবার সামর্থ্য নেই, এখানে এলেই তো পারে। আমার এত লোকজন—তাদের দুজনের ভার কি আর নিতে পারতুম না?

আমি তখন ঘরের কোণে বসে বসেই চোখের জল ফেললুম, পোড়ারমুখী আমি, কেন তখনও হেঁকে বললুম না, দাও, আমাকে পাঠিয়ে দাও, ওগো পাঠিয়ে দাও আমার স্বামীর ঘরে!

... ...

এমনি করেই পড়ে রইলুম—সোনার পালঙ্কে শুয়ে সোনার অন্ন মুখে দিয়ে—বাপ-মা-ভাইদের সর্ব্ব সোহাগে সোহাগিনী হয়ে। আর ওখানে কোথায় তিনি শীর্ণ কুঁড়ের ছিন্ন শয্যায় অন্ধ মাকে নিয়ে অস্থির! চিঠি তিনি আর কোনদিন লেখেননি। আমার সব চেয়ে বাজত এইটে যে আমার মা বাপের জন্যে আমার সঙ্গেও তিনি সম্পর্ক ভুলে দিলেন, কোন্ বিচারে! আমি একটা চিঠি লিখেছিলুম একদিন। ঝীকে দিছলুম ডাকে দিতে। মা জানতে পেরে এসে বললে, তোর লজ্জা হয় না এতটুকু? এত আদর, এত এ—এ তার পছন্দ হল না! দেখ্ না, নিজেই সে আসবে'খন। চিঠি দিলে আরো গুমর বেড়ে যাবে তার।

মুখের সামনে দুধের বাটি ধরে মা আমায় বুকের মধ্যে টেনে নিলে। আমার প্রাণটা ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। এ আদর চাইনেগো আমি, চাইনে আর! এ সোনার শিকলে কেন আমায় পাকে-পাকে বাঁধচ তোমরা? মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, এ সোনার শিকল ছিঁড়ে দাও তোমাদের। আমি উড়ে যাই সেই দূরে, বনের মাঝে, তাঁর সেই শীর্ণ কুঁড়েটিতে।

... ...

তারপর বহুদিন পরে লোকের মুখে-মুখে খবর এসে পৌঁছুল, জামাইবাবু গোল্লায় গেছেন—তাঁর অন্ধ মা মারা গেছে—একটা দাসীর মেয়েকে নিয়ে তিনি পড়ে আছেন। হাজার কুৎসার কালি তাঁর গায়ে মাখিয়ে জনরব আমার দুই কাণের কাছে বিষম সোরগোল বাধিয়ে তুললে। অসহ্য বোধ হওয়ায় একদিন মাকে আড়ালে ডেকে বললুম, আমায় পাঠিয়ে দাও সেখানে।

সেখানে! তোকে। মা যেন আকাশ থেকে পড়ল! বললে, শুনেছিস্ ত কেলেঙ্কারী কাণ্ড!

শুনেছি। গম্ভীর সুরে আমি বললুম, এ ত তোমাদেরই দোষে মা।

আমাদের। মা অবাক হয়ে আমার পানে চেয়ে রইল। আমি আবার বললুম, পাঠিয়ে দাও আমাকে!

মা ধিক্কার দিয়ে বললে, প্রাণ থাকতে নয়। আমি মলে যা খুসী করো তখন। একটা বওয়াটে গেঁয়ো জানোয়ারের কাছে তোমায় পাঠাতে পারব না আমি, মা হয়ে।

ব্যস! সব চুকে গেল।

টুকরো টুকরো কোলাহলের বিরাম নেই। দিনে দিনে সে ভেসে আসতে লাগল। এই দাসীর মেয়েটা নাকি তাঁর অন্ধ মায়ের সেবায় জীবন পণ করেছিল—তার অসুখে সে অন্ন-জল ত্যাগ করেছিল। তবে—তবে—? বাবা বললে, তার নাম যেন এ বাড়ীতে কারো মুখে না শুনি! খবরদার!

মা বললে, মেয়েটা যে ভেদিয়ে মরে এদিকে। তাকে ধরে-বেঁধে নিয়ে এসোগে!

বাবা বললে, আমার মেয়ের এমন নীচ প্রবৃত্তি হতে পারে না। বাবা আমায় কোলে টেনে নিয়ে বললে, আমাদের বড় মাথা হেঁট করেছে! এক হতভাগার জন্যে এত-বড় অপমান!

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনলুম—পাষাণের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ অচল হয়ে।

জড়োয়া গহনায় বাবা আমার গা ভরিয়ে দিলে—কাপড়ে চোপড়ে আলমারির পর আলমারি ঠেসে দিতে লাগল। একেই বলে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা!

দাদারা বললে, রাস্কেলটার জন্যে মুখ দেখানো ভার। জিতেন সেদিন এমনি ঠাট্টা করছিল। কি লো টেষ্ট্!

সারাদিন কি অসহ্য জ্বালায় জ্বলতুম, তা শুধু অন্তর্যামীই জানতেন। মা সর্ব্বক্ষণ বুকে বুকে রাখত। তাতে জ্বালা যে কত আরো বেড়ে উঠত।

একটু শান্তি পেতুম—রাত্রে নির্জ্জন ঘরে, তাঁর সেই বিয়ের-সময়কার ছবিটিকে বুকে চেপে ধরে! চোখে নির্ম্মল প্রশান্ত দৃষ্টি—কেন আমার উপর থেকে সে দৃষ্টি সরে গেল।...কেন? আমারই অপরাধে!

তারপর একদিন চূড়োন্ত ঘটনা ঘটে গেল। দেশে দেশে খবরের কাগজে মহা বার্ত্তা রটে উঠল। ঝড়ের রাত্রে এক ডুবোন্ত নৌকোর মরণোন্মুখ যাত্রীদের উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি আর সেই দাসীর মেয়েটা দুজনেই স্রোতের মুখে নিজেদের প্রাণ ভাসিয়ে দেছেন। তাঁর সমস্ত পরিচয় কোথা থেকে জেনে কাগজওয়ালারা একেবারে ছেপে দেছে, জয়-গানে কাগজগুলোকে ভরিয়ে তুলেছে।

বাবা বললে, আমার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে একেবারে।

দাদারা বললে, ব্রুট্!

কারো চোখে একফোঁটা জল ত নেইই, মুখে দারুণ বিরক্তি। আমি সরে যাচ্ছিলুম—একধারে, একটু চোখের জল ফেলবার জন্য! বাবা বুকে জড়িয়ে ধরে বললে, তোর দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে হাসি, আজ থেকে তুই মুক্ত!

মা আমার, মনে করিস্, তুই আমার সেই ছোট্ট মেয়েটিই আছিস্—সেই ছেলেবেলাকার হাসি আমার। তোর বিয়ে-থা কিছু হয়নি! একটা দুঃস্বপ্ন শুধু কোথা থেকে এসে হঠাৎ যেন তোর জীবনের উপর দিয়ে ভেসে গেছে!

প্রাণ কি সে কথা মানে গো। আমি যে প্রাণে প্রাণে জানচি, তাঁর প্রাণ কি দিয়ে গড়া—ভিতরে তাঁর কি রত্নের রাশি ছিল। ওগো, এ কথা মানবো না, মানবো না, আমি মানবো না। বাবা গুরুজন—আর তিনি? তিনি স্বামী—আমার দেবতা।

বাবা বললে, সে হতভাগার জন্যে এক-ফোঁটা চোখের জল ফেলিস্‌নে, খবরদার। তাহলে জানবি, সে জল তোর বাবার বুকে ছুরির মত বিঁধবে—! একটা বেয়াড়া জানোয়ার!

মনে হল, এক বিরাট তেজে জ্বলে উঠে বলি, চুপ কর। তোমাদের মুখে ও কথা সাজে না! বিলাসের পুতুল হয়ে বসে আছ সব, ঐশ্বর্য্যের দর্পে দর্পী। কেন তোমরা তাঁর পাশটি থেকে আমার সে ঠাঁইটুকু কেড়ে নিলে? কেন তাঁর পাশে দাঁড়াতে দাওনি আমায়? কেন? কেন?

সেই দাসীর মেয়ের উপর শ্রদ্ধা হল, হিংসাও হল। তাঁর অন্ধ মায়ের সেবায় সে তাঁর ডান হাত ছিল—তারপর এই এত বড় ব্যাপার, এতে সে তাঁর সঙ্গিনী! এত বড় সৌভাগ্যের একটা কণাও যদি আমার ভাগ্যে মিলত, তবে এই হারানো জীবনে যে মস্ত পাথেয় পেতুম আমি! কোন ক্ষোভ থাকত না ত!

নিজের ঘরে গিয়ে তাঁর ছবিটা নিলুম। ছবির পায়ে মাথা রেখে শ্রদ্ধার অঞ্জলি বর্ষণ করতে লাগলুম! আজ জগতের লোক বুঝবে না, কতখানি মহত্ত্ব সে বুকে ছিল! কিছুই বুঝলে না,—শুধু জেনে রইল, একটা দাসীর মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিশ্রী সম্পর্কটুকু—এইটুকু জ্বল্‌জ্বল্ করবে চিরকাল! আমি কেউ নই, তাঁর কেউ নই, এ কথা মনে হতে দুই চোখে অজস্র জল ছাপিয়ে উঠল।

হঠাৎ ঝঙ্কার শুনলুম,—হাসি—

চম্‌কে ফিরে দেখি, বাবা।

ও কি হচ্ছে?

বাবা এগিয়ে এল। আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম। চোখের জল সে হুঙ্কারে কোথায় উবে গেল।

বাবা বললে, দেখি, ও কার ছবি।

ছবিটা বাবা কেড়ে নিলে। বললে, তার জন্যে কান্না হচ্ছে? মানা করে দিছি না?

একটিমাত্র সম্বল রে, শুধু এতটুকু স্মৃতি—তাও হারালুম।

বাবার কড়া হুকুম জাহির হল, হাসি, মনে রাখিস্ যার জন্যে আমার মাথা হেঁট, বংশের মাথা হেঁট হয়েছে, তার স্মৃতিও এ বাড়ীতে থাকবে না।

বাবা ছবি নিয়ে চলে গেল।

মা এসে বুকে জড়িয়ে ধরে ডাকলে, মা—

মার চোখে জল। সেদিন আর কোন লজ্জা রইল না, মুখ ফুটল। স্পষ্ট বললুম, আমি এ বাড়ীতে থাকতে পারব না মা। চোখের জল তোমাদের শাসন মানবে না—মানতে পারবে না, মানতে দেব না আমি।

কিছু ত চাইনে আমি তোমাদের কাছে—গহনা, কাপড় যা-যা দিয়েছ, সব ফিরিয়ে নাও —শুধু আমায় কাঁদতে দাও মা। আমার ইহকাল নষ্ট করেছ তোমরা, পরকালটা আর হারাতে পারব না।

মার মুখে কোন কথা ফুটল না। মা আমার পানে চেয়ে রইল, আর মার দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর্ করে জল ঝরে পড়তে লাগল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আশীর্ব্বাদ

(২৯)

শ্যামাচরণ আজ নরেনকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন, অন্তঃপুরে রন্ধনের ধুম লাগিয়াছে। যদিও শ্যামাচরণ বলিয়াছেন যে বেশী লোকজন আনিবেন না, তবুও গোণাগুন্তি গোটাকতক করিয়া বাজারে জলখাবারেই ত আর পাত সাজান যায় না।—আর শ্যামাচরণকে বিশ্বাসই বা কি? শেষ যদি মত পরিবর্ত্তন করিয়া সবন্ধুবান্ধবেই আসিয়া হাজির হন? তখন মুখুয্যে বাড়ীর সুনাম রক্ষা হইবে কিরূপে? বিশেষতঃ রন্ধনকলার পরিচয় প্রদানের এই ত উত্তম অবসর—এ বাড়ীর মেয়েরা এমন নির্ব্বুদ্ধি কেহ নহেন যে শ্যামাচরণের আর এই সুযোগটি খোয়াইবেন!

দ্বিপ্রহরের পর হইতে মুখুয্যে-ঘরণী পালাও কালিয়া কোপ্তা প্রভৃতির আয়োজনে ব্যস্ত—আর মিষ্টান্ন প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিয়াছেন হাসি ও হাসির দিদিমা। দুজনে মিলিয়া রসগোল্লা, খাজা, পান্তুয়া, সন্দেশ, রভাজা, মালাইভোগ, এ সকল প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন, বাকি কেবল বাদশাহী মিঠাই। বেশনের বড় বড় দানা তপ্তকড়া হইতে ঝাঁঝরিযোগে উঠাইয়া সবে মাত্র এখন দিদিমা তাহা রসে ফেলিতেছেন। পরে ইহার সহিত সর ক্ষীর প্রভৃতি নানা মসলা মিশাইয়া রন্ধন-কার্য্য সমাধা করিবেন। এই মিষ্ট ভোগ মুখুয্যে বাড়ীর নিজস্ব কল্প। এই বিদ্যালাভ পিপাসায় অনেক ঘরণী ইহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত গুরুমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

এক এক রকম মিষ্টান্ন যেমন প্রস্তুত হইতেছে অমনি নাতনীর রসনারূপ কষ্টিপাথর যোগে দিদিমা তাহার ভাল মন্দ যাচাই করিয়া লইতেছেন। মিষ্ট চাকিতে চাকিতে বেচারী হাসির আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্রোহী হইয়াও ফল নাই, অনুযোগ অনুরোধের দায়ে তাহাকে শেষে বশ মানিতেই হইবে। তবে এই ঝগড়া ঝাঁটির মধ্যে পড়িয়া তাঁহাদের হাতের মিষ্টগুলা কিন্তু অধিকতর মিষ্টতা লাভ করিতেছে।

বেলা যখন প্রায় ছয়টা তখন শচীন রন্ধন শালায় গিয়া মাকে বলিল—"গাঙ্গুলি মশায় এসেছেন।"

থুথুব্যেথরণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কজন তাঁরা ?"

শচীন উত্তর করিল—"তা আমি দেখিনি। তোমার কথামত তাঁর গাড়ীখানা বাড়ী ঢুকতেই আমি খবর দিতে এলুম। মোট দেখলুম একখানা গাড়ী; তাহলে চারজনের বেশী লোক ত নয়ই।"

মা বলিলেন—"তুই যা শচীন, দৌড়ে তোর দাদাকে পাশের বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে আয়, লক্ষ্মীছেলে। অমলের সঙ্গে সে দেখা করতে গেছে। ডাকলেই আসবে বলেছে।"

রান্না ঘরের ঠিক পাশেই মিষ্টান্নের ঘর। শচীনের গলা শুনিয়া দিদিমা ডাকিলেন—"শচীন এসেছিস্? আয়, আয়, মিষ্টি গোটা-কতক চেকে যা।"

হাসির মা শাশুড়ীর উদ্দেশে একটু উচ্চ গলায় কহিলেন—"ঠাকুর জামাই এসেছেন মা,—শচীন যাক্ নরেনকে ওবাড়ী থেকে ডেকে আনুক। ফিরে এসে মিষ্টি চাকবে এখন।"

কিন্তু শচীন লোভ সম্বরণে কর্ত্তব্য পালন করিবার ছেলে নয়। সে তাড়াতাড়ি দিদিমার কাছে আসিয়া হাজির হইল। তখন চুলা হইতে মিঠাইএর খোলা নামিয়াছে, তিনি রন্ধনীর ভার হাসিকে অর্পণ করিয়া সরভাজা রসগোল্লা ও পান্তুয়া এক একটা শচীনের হাতে দিয়া বলিলেন,—"শ্যামাচরণ এসে পড়লো, এখনো নরেনের দেখা নেই! আচ্ছা ছেলে যাহোক। খেয়ে নিয়ে শীঘ্র যা, ডেকে নিয়ে আয় তাকে।"

শচীন বলিল—"যাচ্ছি যাচ্ছি—এত তাড়াতাড়ি কি! বাবা ত ঘরে আছেন; জলে ত পড়েননি তাঁরা। আমাকে আর দুখানা সরভাজা আর দুট পান্তুয়া দাও।"

দিদিমা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বলিলেন—"এইবার যা ডেকে নিয়ে আয় দাদাকে! একখানা রেশমী কাপড়, একটু ফোঁটা-চন্দনও ত তার পরতে হবে।"

শচীন অবশিষ্ট পান্তুয়াটা মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল—"দাদা কক্ষণো ও সব পরবে না।"

"না পরবেন! তুমি সবজান্তা। দাদা না পরে তোমাকে পরিয়ে ছাড়ব। এখন যাও তাকে ধরে নিয়ে এস।"

শচীন গামলার জলে হাতটা তাড়াতাড়ি চুবাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে দিদিমার কথার উত্তরে বলিল—"আমি বাড়ী থাকলে ত! আমি যাচ্ছি এখনি বায়স্কোপ দেখতে,—দাদাকে ডেকে দিয়েই চলে যাব।"

বলিয়া সে দ্রুত পদে প্রস্থান করিল।

দিদিমা রুষ্ট স্বরে আপন মনেই বলিলেন—"আজকালকার ছেলেরা যে সব কি রকম হয়েছে! শ্বশুর এসে বসে রইল—আশীর্ব্বাদ নেবেন যিনি, তিনি যে কোথায়, তার ঠিক নেই। আর ভাইটিও তেমনি! ঘরে যাহোক একটা ক্রিয়া-কর্ম্ম—অতিথি অভ্যাগতকে আদর অভ্যর্থনা করতে হবে—তা না, চল্লেন তিনি—বায়স্কোপ দেখতে! বেশ সব শিক্ষা হচ্ছে! যা হাসি, দিদি মিঠাই গুলো বেঁধে কাপড় ছেড়ে নে। তোকেই পরিবেশণ করতে হবে জানিস্ ত। উৎসবের দিনে আজ লাল কাপড় একখানা পরিস্।"

হাসি উঠিয়া দাঁড়াইল, দাসী এক থালা ফুলের মালা আনিয়া বলিল—"মালী দিয়ে গেল গো।"

দিদিমা বলিলেন—"বাইরে আলাদা এক-থালা দিয়েছে ত? আশীর্ব্বাদের সময় দরকার হবে যে

দাসী বলিল—"তা দিয়েছে।"

"দেখ্ দেখি তবে কছড়া গোড়ে ওতে আছে?"

দাসী মালাগুলা একে একে হাতে উঠাইতে লাগিল। "দিদিমা দেখিয়া বলিলেন —"মোট একটি ছড়া গড়ে দেখছি—আর সবই সরু মালা। শ্বশুরের গলায় ঐ ছড়াটা খাবার পরে তুই পরিয়ে দিস হাসি।"

এই সময় হাসির মা পলান্নের জন্য পেস্তা বাদাম লইতে এই ঘরে আসিয়া কহিলেন —"হাসি কেন দেবে—আমিই বুড়োর গলায় মালা পরিয়ে দেব মা?"

দাসী কি শুনিতে কি বুঝিয়া বলিয়া উঠিল,—"বুড়োর গলায় কেন মালা দেবে? দিদিমণি আমাদের রাজরাণী হবে গো, দেখে নিও!"

দিদিমা বলিলেন—"তোরা সেই আশীর্ব্বাদই কর্ সবাই। যা, মালার থালাটা উপরে নিয়ে গিয়ে ছোট কুটরীতে রেখে দে এখন।" দাসী চলিয়া গেল—দিদিমাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসির হাসি মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—"কোন্ রাজা তপস্যা করছে আমার নাতনীর জন্য, কে জানে?"

হাসির মনে পড়িয়া গেল;—হ্রদের ধারের সেই যুবা মূর্ত্তি,—যাহাকে অনুভা রাজকুমার বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল।

সে প্রফুল্লভাবে কহিল—"আমাকে তবে তোমরা বনে পাঠাও দিদিমা,—তবে ত রাজপুত্র আমাকে উদ্ধার করতে আসবে।"

দিদিমা তাঁর মিষ্টহাতেই মিষ্টভাবে নাতনীর গাল টিপিয়া কহিলেন—"ছি রূপসীমণি, ও কথা কি বলে? এই কমল সরোবরে নেমেই তোমার রাজা তোমাকে বুকে তুলে নেবে।"

হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল, দিদিমা মিষ্টগুলি থালায় সাজাইতে বসিলেন। কাজ করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার সেই কথাই ভাবিলেন—"বৌয়ের যদি একটু বুদ্ধি থাকে। অমন সোনার ছেলে শরৎ তাকে কি না হাতছাড়া করলে! বিজনের সঙ্গেও ত আর বিয়ের আশা নেই। সে কিন্তু ভালই হোয়েছে; বাপটা যে ভয়ানক লোক্।"

দিদিমার কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বেই হাসি যখন একখানি নীল বারাণসী সাড়ি পরিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—তখন তাঁহার মনে হইল, যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং তাঁহাকে আসিয়া দেখা দিলেন।

(৩০)

বহির্বাটীতে বিনাড়ম্বরে নরেন্দ্রের আশীর্ব্বাদ-পর্ব্ব সমাধা হইল। সন্ধ্যার সময় বিদায় গ্রহণ করিয়া নরেন্দ্র পূর্ব্ব বন্দোবস্ত-অনুসারে তাহার একটি বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল; আর অতিথি দুইজনকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণলাল অন্তঃপুরে আগমন করিলেন।

দিদিমার দালানের আজ বাহার দেখে কে? একটি চন্দনকাষ্ঠ-যবনিকার ব্যবধানে বিভক্ত দালানের এক অংশ আজ ভোজন-স্থান—অপর অংশ বসিবার স্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ড্রয়িংরুম বিভাগে দিদিমার তক্তাপোষখানির উপর গালিচা

ফুলনের সজ্জা, আশে পাশে কয়েকখানি কৌচ চৌকি এবং মাঝে মাঝে এক একটি ক্ষুদ্র টেবিল। টেবিলগুলি ফুল-ভরা ফুলদানিতে, ফ্রেম-আঁটা ছবিতে সাজান,—একটি টেবিলে রূপার থালায় কয়েকগাছি ফুলমালা, অতিথিগণের সম্মানার্থে রক্ষিত। থামের মাথায় মাথায় কুঞ্চিত রঙিন রেশমী পরদা ঝুলিতেছে, দেয়ালে দেয়ালে সেতার এসরাজ প্রভৃতি যন্ত্রাদির মাঝে মাঝে নানারূপ চিত্রলেখ্য, অধিকাংশই হাসির হস্তাঙ্কিত। কৃষ্ণলালের অনুবর্ত্তী অতিথি দুইজন মধ্যদ্বার-পথে উপবেশন গৃহে সমাগত হইলেন। এই সরল সুন্দর অথচ অনাড়ম্বর গৃহ-সজ্জা দেখিয়া নবাগত অতিথি রাজা অতুলেশ্বর মনে মনে গৃহকর্ত্রীর রুচির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

শ্যামাচরণ এখানে আসিয়াই অন্তঃপুরিকা-গণের সহিত প্রথমে দেখা করিতে গেলেন এবং সেখানে প্রণাম সম্ভাষণাদি শেষ করিয়া দিদিমা ও হাসিকে লইয়া পুনরায় দালানে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরের ভোজে পরিবেষণ করা দিদিমার একটি কর্ত্তব্য কাজ ছিল। গৃহিণী দ্বারান্তরালে আসিয়া উঁকি দিতে লাগিলেন।

রাজা তখন চিত্রলেখ্য দেখিতেছিলেন, ফিরিয়া দাঁড়াইবামাত্র শ্যামাচরণ দিদিমার দিকে দৃষ্টিনির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন—"ইনি কৃষ্ণলালের মাতা, আর এই আমাদের হাসি—ওরফে সুগুণা। প্রণাম কর মা এঁকে,"—

হাসি তৎক্ষণাৎ মুখভরা হাসি হাসিয়া ভূ-লগ্ন হইল। রাজা ব্যতিব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"করেন কি,—করেন কি?" কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখে শেষ হইতে না হইতে হাসি পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল।

তখনকার দিনে বিজুলি-বাতি ছিলনা, আলম্বিত ঝাড় লণ্ঠন এবং দেয়ালগিরিতে আলো জ্বলিতেছিল। হাসি প্রণামান্তে উঠিয়া চকিত দৃষ্টিদানে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায় উজ্জ্বল সেই আলোকে রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লইল।—"এ কি? ইনি কি রাজকুমার অনাদি দা নাকি?" সেইদিন হইতে হাসি ইঁহাকে এই নামেই স্মরণ করে। সেদিন দূর হইতে যাঁহার প্রতিবিম্ব মাত্র দেখিয়াছিল, আজ তাঁহার প্রকৃত রূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল! এ ত অল্পবয়স্ক যুবকের মূর্ত্তি নহে। ইনি যে মহামহিম জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। কি সৌম্য সুন্দর। হাসির কল্পনা প্রকৃতের নিকট পরাজয় মানিল।

বস্তুতঃই রাজা আদর্শ সুপুরুষ,—চিত্রাঙ্কন-তুল্য এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মূর্ত্তি কদাচিৎ নয়নে পড়ে। তাঁহার বর্ণ ইরাণীর ন্যায় স্বর্ণপ্রভ, ক্ষুরধার মুণ্ডিত শ্মশ্রুহীন পরিষ্কার মুখশ্রী রমণীর ন্যায় কমনীয়, দেহ সুগঠিত, অঙ্গুলিগুলি পর্য্যন্ত চম্পককোরক তুল্য সুঠাম—এমন কি কেশরাশিও রেশম কোমল লালিত্যপূর্ণ। তাঁহার ললাট বুদ্ধি বৃহৎ, নয়ন ভাবজ্যোতিঃপূর্ণ এবং ওষ্ঠাধর কারুণ্যরেখা-গঠিত। এই ত্রিভাবের সম্মিলনে তাঁহার রাজ-জনোচিত গাম্ভীর্য্য কবি-জনোচিত সরল মাধুর্য্যে এমন স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়া ছিল যে বয়সে তিনি চল্লিশের কাছাকাছি হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পঁয়ত্রিশের অধিক দেখাইত না।

রাজাকে একবার দেখিলে নয়ন পুনঃ পুনঃ সেই দিকে আকৃষ্ট হইত। বলা বাহুল্য দিদিমাও তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিবার পর প্রসন্নচিত্তে তিনি কহিলেন—"মঙ্গল হোক্" তাহার পর শ্যামাচরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কে হন ইনি শ্যামাচরণ? পূর্ব্বে ত এঁকে দেখিনি।"

আত্ম-পরিচয়-দানে ইঁহাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে রাজার ইচ্ছা ছিলনা—তাই আগে হইতেই এসম্বন্ধে শ্যামাচরণকে তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। দিদিমার প্রশ্নের উত্তরে শ্যামাচরণ কহিলেন, "ইনি দূর সম্পর্কে আমার একরূপ ভাই হন,—নাম অতুল রায়, বিদেশেই বাস করেন, কার্য্যোপলক্ষে কলকাতায় এসে আমার ওখানেই উঠেছেন।"

"অতুল রায়?" দিদিমা একটু ভাবিয়া বলিলেন—"নিখিল রায়ের কেউ হন কি ইনি? তিনি সম্পর্কে আমার ভাই-পো হন।"

রাজা একটু হাসিয়া কহিলেন,—"রায়ে রায়ে একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। আমাকেও না হয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলেই মনে করবেন।" কথাটি দিদিমার বড় মিষ্ট লাগিল। কৃষ্ণলাল মাতার কথায় প্রতিবাদ পূর্ব্বক কহিলেন,—"নিখিল রায় তোমার ভাই পো—না আমার ভাই পো? তার ছেলে আমাকে ত দাদা দাদা করে" দিদিমা বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ তাইত ঠিক। আর বাবা, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি—অত শত মনে রাখতে পারিনে।" রাজা হাসিয়া কহিলেন—"তাহলে আপনারা সকলেই আমাকে স্নেহ-চক্ষে দেখবেন।" তাঁহার মধুর সৌজন্যে মাতা-পুত্র উভয়েই আপ্যায়িত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভৃত্য প্রায় তখনি যবনিকান্তরাল হইতে জানাইয়া দিল—যে আহার্য্য প্রস্তুত। দিদিমার অনুবর্ত্তিতায় সকলে ভোজন-গৃহে উপনীত হইলেন।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

তোমারে দেখেছি

তোমারে দেখেছি আমি তোমার আকাশে,
লভেছি পরশ তব, চঞ্চল বাতাসে,
আলো তব দৃষ্টি আনে মধু হাস্যময়,
অরণ্য-মর্ম্মর তব মর্ম্ম-কথা কয়।
যে বাণী গাহেনি পাখী, বলে নাই নদী;
তৃণ-তলে মূক হয়ে ছিল নিরবধি,
ধরণীর অন্তরের ইষ্ট-মন্ত্র সেই,
মলয়-পরশে তব এক নিমেষেই
তরুণ তরুর কণ্ঠে দিল জানাইয়া,
কি বাঁধনে তব সনে বাঁধা ছিল হিয়া!
অন্তরের মন্ত্র-গৃহে পাতিয়া আসন,
নিভৃতে বসিয়া আছ, হে বিশ্ব-রাজন,
সেই শুভ্র অনাহত পূর্ণ অধিকার—
দ্যুলোকে ভূলোকে ফুটে ওঠে বারবার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দে

দুই পরিচ্ছেদ

(গল্প)

যে সমস্যা আমার জীবনের মজ্জার সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িত, দুটি পরিচ্ছেদে তা ব্যক্ত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক-একজন মানুষের কেমন খুঁৎ-খুঁৎ-করা স্বভাব। তৃপ্তি বোধ করবার যে একটা যন্ত্র আছে, তা বোধ হয় সব মানুষের নেই। আমার স্ত্রী কল্যাণী, রূপে-গুণে কল্যাণী বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি ঐ ধরণের। সে বড় লক্ষ্মী, তাই ঝগড়া করেনা—মনের খুঁৎখুঁতুনি নিয়ে হাঙ্গাম বাধায় না, কিন্তু সে যে দুঃখ পাচ্ছে এ বুঝতে আমার বাকি নেই। কিন্তু কিসের জন্যে তার এ অনন্ত দুর্ভোগ? সাধারণ-মানুষে যে-সৌভাগ্য কামনা করে, তা সবই সে পেয়েছে। তারপর, যখনই যা তার অভাব বলে জেনেছি, পূরণ করে দিয়েছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। এখন হতাশ হয়ে ভাবি, তার ঐ দুশ্চিকিৎস্য রোগ আরাম হবার নয়। এখন তার ঐ রোগের কথা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতেও আমি ভয় পাই। কারণ আমার বিশ্বাস ও-রোগ নাই-পেলে বেড়ে যাবে। ঐ দেখনা আমাদের হরিদাস, তার শরীরে কোনো রোগ আছে কি নেই, ভগবানই জানেন, কিন্তু তার মনে-মনে বিশ্বাস যে তার শরীরটি রোগের একটি মস্ত মিউজিয়ম। সে তারই ভিতরকার গবেষণা নিয়ে মেতে আছে—জগতের আর-কিছুতে তার দরদ নেই। সে সর্ব্বদাই নিঝুম হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু যেই তাকে শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, সে যেন অমনি দানো পেয়ে ওঠে। তখন তার বক্তৃতা থামানো দায়! তার রোগের ঘ্যান্-ঘ্যানানি শুনতে-শুনতে কান ও প্রাণ ঝালাপালা হয়ে ওঠে, মনে-মনে বলবার ইচ্ছা হয়—ত্রাহি মে পুণ্ডরীকাক্ষ। সেই জন্য আমরা তাকে আর ঘাঁটাইনা। পাছে আমার স্ত্রীর অবস্থা ঐ হরিদাসের মতন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, এই ভয়ে আমি খুব সাবধানে থাকি। সেজন্য কল্যাণী হয়ত ভাবে, আমি নিষ্ঠুর। তা ভাবুক মনের রোগকে আদর-দেওয়া কিছু নয়।...

কল্যাণীকে যখন প্রথম বিয়ে করে আনলুম, তখন তার এ-সব বলাই ছিল না। সে বেশ সাধারণ-মেয়ের মতোই ছিল। বাপের বাড়ির জন্য মন-কেমন করলে কাঁদত, খেলনা পেলে ভুলে যেত। কিন্তু তার পর একটু বড় হয়ে হঠাৎ কেন যে এমন হল, কে জানে! বেচারা দুঃখ পাচ্ছে, জানি; কিন্তু কি করব? উপায় নেই। ডাক্তারের ওষুধে যদি আরাম হবে, বুঝতুম, তাহলে তার ব্যবস্থা করতে আমি ত্রুটি করতুম না; কিন্তু এ-রোগের যে চিকিৎসা নেই, কাজেই নাচার!

এক-এক সময় ইচ্ছে হয় তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিই যে তার এই দুঃখটা সম্পূর্ণ

ভুয়ো—কেবল মনের একটা বিকার-মাত্র; মনে একটু জোর করলেই ও-রোগ আপনিই পালাবে। কিন্তু আবার ভাবি, তর্ক করে মেয়ে-মানুষকে এসব কথা বোঝানো যাবেনা। কারণ কোনো জিনিষ হিসেব করে তলিয়ে দেখা তাদের ধাতেই নেই; তাদের নিজেদের মনগড়া একটা জগৎ তৈরি করে নিয়ে তার মধ্যে তারা বাস করে, অন্য জগতের আইন-কানুন তাদের উপরে খাটেনা। কাজেই তাদের সঙ্গে গায়ে-পড়া হয়ে কিছু করতে গেলেই, আমার বিশ্বাস, বিষম বিভ্রাট ঘটবে। তা ছাড়া ওসব হেঙ্গামের ভিতর যাবার আমার অবসর কৈ? কাজেই চুপচাপ থাকাই ভালো। নিজের হাতে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তারপর ঝাঁপাই-ছোড়া আমি পছন্দ করি না।

তাছাড়া আমরা হলুম পুরুষমানুষ। কেবলমাত্র ঘর নিয়েই ত আমাদের কারবার নয়!—বাহরেটাই আমাদের বেশী-করে কাজের ক্ষেত্র। কেবল গৃহ এবং গৃহলক্ষ্মী নিয়ে পড়ে থাকলে আমাদের চলবে কেন? গৃহের প্রয়োজন আমাদের বিশ্রামের জন্য। সেই বিশ্রামটিতে ব্যাঘাত না ঘটলেই হল। তাই গৃহের সুব্যবস্থা রাখার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন আমরা ততটুকু মনই দেব—তার বেশি খরচ করবার পুঁজি আমাদের নেই।...

কল্যাণীর প্রধান খুঁৎখুঁতুনি এই যে, সে সন্দেহ করে, আমি তাকে ভালোবাসিনা। ভালো আবার কি করে বাসতে হয়? মেয়ে-মানুষে যা চায়, তার কোনটারই অভাব ত আমি রাখিনি। গা-ভরে গয়না দিয়েছি, পেট-ভরে খেতে দিই, দাস-দাসীতে বাড়ি ভরে রেখেছি। তার উপর তাকে বলে রেখেছি যখন যা দরকার, বল্লেই সে পাবে। এর উপর মানুষ আর কি করতে পারে? তবু তার মনে সুখ নেই। সে যদি গরীবের ঘরে পড়ত, তাহলে বুঝতে পারত, সে কতখানি পেয়েছে। অতি-সস্তায় পাওয়ার দরুন যাকে সে অশ্রদ্ধা করে ঠেলে-ঠেলে দিচ্চে, গরীবের ঘরে তার একটু কণার জন্যে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে দিন যেত। ঐ ত তার সই কমলা রয়েছে, তাকে দেখেই ত সে বুঝতে পারে, গরীব-সংসারের অনটনে বেচারার কী কষ্ট! দিনান্তে একটু হাত-পা ছড়াবার অবসর নেই, দুবেলা ভালো করে খাওয়া জোটে না, গয়না-গাঁটি, মনের সাধ-আহ্লাদের কথা ত দূরে থাক্, সে-সব মনে আনতেও সে সাহস করে না! কল্যাণী বলে, তবু ও সুখে আছে; কারণ তার স্বামী না কি তাকে ভালোবাসে। স্ত্রীকে যে ভালো-করে খেতে-পরতে দিতে পারে না, তার ভালোবাসার আবার মূল্য কি? আর তার অর্থই বা কি?

ঐ ভালোবাসা কথাটা ভারি গোলমেলে। ওর স্বরূপ যে কি তা তো আমি ধরতে পারলুম না। আমার স্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস আমি তাকে ভালোবাসি না; কিন্তু কি করলে যে ভালোবাসা হয়, সে তো এ পর্য্যন্ত তা বুঝিয়ে বলতে পারলেনা! কমলার স্বামী কুঞ্জ তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসে শুনি। কিন্তু কৈ, তাকে আমি খুব লক্ষ্য করে-করে দেখি, তবু ত কোনো হদিস্ পাই না। আর-সবাই যেমন, সেও তো তেমনি—বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। সকাল বেলা নটার সময় নাকে-মুখে ভাত গুঁজে

ঘাড়িস যায়, সন্ধ্যাবেলা আমাদের তাসের আড্ডায় জুটে রাত দশটা অবধি বাজে গল্পগুজবে কাটায়, একটিবার ত স্ত্রীর নামটি করেনা!

আমার এক-একসময় মনে হয়, নভেলে যেমন পড়েছি তেমনি-ধারা থেকে-থেকে প্রণয়িণীর সামনে চোখে-মুখে একটা হা-হুতাশের ছড়াছড়ি দেখাতে পারলে কিম্বা থিয়েটারের নায়কের মতন গলা কাঁপিয়ে, ঢল-ঢল-চোখে চেয়ে প্রেয়সীর হাত-ধরে কথা কইলে, বোধ হয় তারা ভাবে, খুব ভালোবাসা পেলুম! আমাদের দেশের অল্পবুদ্ধি অপরিপক মেয়ের মন হয় ত তাইতেই ভোলে। কিন্তু সে তো আমি করতে পারি না—এমন হাস্যকর ব্যাপার আমার দ্বারা হবে না। অতএব? অতএব আর কি?—ভগবান আমার অদৃষ্টে দাম্পত্য সুখ লেখেননি।

আমার যদি কোনোরকম বদ্‌খেয়ালি থাকত, তা হলেও না-হয় বুঝতুম। আমার জ্ঞানে আমি কখনো বাইরে রাত কাটাইনি। রোজ ঠিক সাড়ে-দশটার সময় শয়ন-মন্দিরে হাজির দিই। এজন্যে ঘরে-বাইরে আমার স্ত্রৈণ অপবাদও আছে। এবং সময়-সময় আদর্শ স্বামীর উল্লেখ করতে হলে আমার নামও কেউ-কেউ করে থাকে শুনেছি। অথচ এ-বাড়ির এ ধারা নয়! আমিই দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হয়ে জন্মেছি। শুনেছি, আমার পিতামহীর দল স্বামীদের একদণ্ড দর্শন পেলে কৃতার্থ হয়ে যেতেন; তাও আবার কবে কতদিনে যে সে-দর্শন ঘটবে তার কোনো স্থিরতাই ছিল না; তবু তাঁরা হাসিমুখে দিন কাটিয়েছেন। তাঁরা জানতেন—কি জানতেন জানিনা—আমার মনে হয়, তাঁরা স্বামীকে যেটুকু পেতেন, সেটুকু তাঁরা আশাতিরিক্ত বলেই মেনে নিতেন। আর আমার কল্যাণীর চোখে-চোখে অষ্টপ্রহর আমি রয়েছি বল্লেই চলে, তবু তার মনের তুষ্টি নেই। আমার হাতে না পড়ে, আমার দাদামশায়ের হাতে যদি তিনি পড়তেন, তবে বুঝতেন, কত ধানে কত চাল!...

কল্যাণীর মুখ ফুটেছে। সে বলে আমি আমার ব্যবসাকে যত ভালোবাসি, তাকে তত ভালোবাসিনা;—টাকাই আমার সর্ব্বস্ব। কিন্তু কল্যাণীর একথা কি ঠিক? আমরা পুরুষমানুষ—অর্থোপার্জ্জন হচ্ছে আমাদের কাজ। টাকা নইলে যখন চলেনা, তখন টাকাকে ভালোবাসতে হবে বৈ কি। কিন্তু এ টাকা কি শুধু আমার একলার জন্যে? এর কতটুকু ভাগ আমি নিজে গ্রহণ করি? কল্যাণীকে কি এর অধিকাংশ ভাগ দিই না? তার সুখের জন্যেই ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমার এই অর্থোপার্জ্জন। নইলে নিজের জন্যে আমার কতটুকু প্রয়োজন? তাকে ভালোবাসি বলেই ত টাকাকে ভালোবাসি—তার জন্যেই ত টাকা! এ-কথা সে যে কেন বোঝেনা, তা আমি বুঝতে পারিনা। সে বলে, স্ত্রীর-কাছে স্বামীর ভালোবাসাই সব—টাকা কিছুই নয়। এ তার নিতান্ত ছেলেমানুষী ছাড়া আর কি বলব!

কিন্তু যাই বলি, সে যে দুঃখ পাচ্ছে এ দেখে আমার ভারি কষ্ট হয়। আর তার দুঃখ দূর করবার আমার সকল চেষ্টাই যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এ আপশোস্ আমি কিছুতেই ভুলতে পারচিনা।

হঠাৎ একদিন কল্যাণী আমায় বল্লে—"খেটে-খেটে তোমার শরীর খারাপ হয়েছে, চল কোথাও বেড়াতে যাই।" শরীর আমার কিছুই খারাপ হয়নি, অথচ কল্যাণী খারাপ দেখচে কেন, এতে আমার একটা সন্দেহ হল। শেষে আমি তাকে জেরা করে-করে বুঝলুম, তার মনের ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে তার বিশ্বাস, কাজের পরিবেষ্টন থেকে আমাকে সরাতে পারলেই আমার হৃদয়ের ভালোবাসাটা তার উপর গিয়ে পড়বে; এই তার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে নির্জ্জনতা না পেলে প্রেম ফোটেনা, তাই সে আমাকে নিয়ে কোনো নির্জ্জন জায়গায় যেতে চাইছে—সেখানে থাকবে শুধু সে আর আমি। এ কথা শুনে আমার হাসি পেলে। এ বিদ্যে সে নিশ্চয় নাটক নভেল থেকে অর্জ্জন করেছে। আমি তাকে অনেক বোঝালুম, সে কিছুই বুঝলেনা, সে শুধু কাঁদতে লাগল। আমার সাম্‌নে তার এই প্রথম কান্না।

আমি সব সইতে পারি, কেবল সইতে পারিনা এই মেয়ের চোখের কান্না! এই কান্না দেখলে আমার সমস্ত হৃদয় কেমনতর আকুল হয়ে ওঠে,—আমি নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারিনা। এটা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নয় বুঝি, তবু একে দমন করতে পারিনা। আমার চিত্তের সমস্ত দৃঢ়তা এই কান্নার জলে ভেঙে চুরমার্ হয়ে যায়—তখন চারিদিক থেকে কতরকম ধাক্কা যে বুকের উপর আচ্‌ড়ে-আচ্‌ড়ে পড়তে থাকে তা বল্‌তে পারিনা। মন উদাস হয়ে ওঠে, সে যেন কেবলই বলে—জীবনে যা-কিছু উপার্জ্জন করলুম সমস্তই বৃথা, সমস্তই ব্যর্থ! অমনি আমার সমস্তটা একেবারে বদ্‌লে যায়, তখন কি করি, না-করি কিছুই ঠিক থাকেনা।

কল্যাণীর চোখের জল দেখে আমি পাগলের মতো তার দিকে ছুটে গেলুম—মনে-মনে এই কথা ফুক্‌রে উঠল—"ওগো চল, চল, এখনই চল, কোথায় আছে তোমার সেই নির্জ্জন নিরালা কুটীর!" কিন্তু মুখ-ফুটে কিছুই বার হলনা; শুধু আমার থর থর হাত-খানা কল্যাণীর বাঁ-হাতটাকে চেপে ধরলে মাত্র। কল্যাণী কি বুঝলে জানিনা, সে সজোরে আমার হাতটা ঠেলে উঠে চলে গেল। আমি খানিক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে কাজে মন দিলুম। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলুম কল্যাণী যা চায় তাই হবে—তাকে নিয়ে এইবার কোনো নির্জ্জন স্থানে সরে পড়ব। কিন্তু এমনি অদৃষ্ট, ঠিক সেই সময়টা বারবার ব্যবসায় এতগুলো দাঁও জুটে গেল যে কিছুতেই বাড়ি ছাড়তে পারলুম না। তারপর অভিমানে কল্যাণী চুপ করে রইল; যাওয়ার কথা আর উঠলনা।...

আচ্ছা, কল্যাণীকে কি আমি ভালো-বাসিনা? বাসি বৈ কি। নইলে তার সুখের জন্যে আমার এত ব্যাকুলতা কেন? চেষ্টা করেও তাকে ত তাচ্ছিল্য করতে পারিনা। কাজের সফলতায় যে আনন্দ পাই, তার মধ্যে কল্যাণীর সুখৈশ্বর্য্যের স্বপ্নই ত সবটা। তবে আমার ভালোবাসা সে বুঝতে পারেনা কেন? বোধ হয় আমার ভালো-বাসার যে ভাষা, কল্যাণী তা জানে না। সে যে-ভাষায় আমার ভালোবাসার কথা বুঝতে

চায়, সে যে-সুরে আমার প্রেমের গান শুনতে চায়—শুনলে আনন্দ পায়, সে-ভাষা আমার হৃদয় যে জানেনা। তবে আমি কি করব? এ সমস্যার মীমাংসা কেমন করে হবে? দূর হ'ক গে ছাই, ভাববনা। ভেবে লাভ কি? আর ভাববার মতো অবসরই বা আমার কোথায়?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দশটি বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে আমাদের জীবনের বিশেষ-কিছু বদল হয়নি। কেবল ব্যবসার কাজ আমার বেড়েই চলেছে আর অন্যদিকে মন দেবার অবসর সেই অনুপাতে ক্রমেই সংক্ষেপ হয়ে এসেছে। এই ত আমার কথা। কল্যাণীর কি হয়েছে ঠিক জানি না। কেবল হঠাৎ একএকবার তার দিকে চেয়ে মনে হয়েছে তার চেহারার উপর কেমন-একটা উদাস গাম্ভীর্য্য যেন ঘন হয়ে উঠছে। এটা নিশ্চয় বয়সের লক্ষণ। এখন ত আর সে ছেলেমানুষটি নেই।

এই দশ বছরে অর্থ আমার ঘরে ঢের এসেছে। আমি কৃপণ নই, কাজেই কোনো অভাবকে বাড়ির ত্রিসীমানায় আমি থাকতে দিইনি;—চারিদিক আরাম এবং সুখের প্রাচুর্য্য দিয়ে ভরে দিয়েছি। এমন কি, ঐশ্বর্য্য আমার বাড়িতে উপ্‌চে পড়ছে বল্লেও হয়। কিন্তু তবু কল্যাণীর মনে যে সুখ নেই এ বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারি—আগেও যেমন, এখনও সে তেমনি। ওগো প্রেয়সী-রাক্ষসী! বল, বল, ত্রিভুবন লুটে আন্‌লে কি তোমার মুখে হাসি ফুটবে? বল, আরো কত চাও? আরো কত চাও, বল! হীরে-জহরৎ মণি-মুক্তো আরো কি কি কত চাই বল। আমি তাই দিয়ে তোমার পূজার ডালি সাজিয়ে তোমায় প্রসন্ন করবই করব। নইলে আমার শান্তি নেই। তুমি যতই মুখ ফেরাও, আমি জানি, তুমি এইতেই একদিন প্রসন্ন হবে—প্রাচুর্য্যের মধ্যে তৃপ্তির স্বর্গ আছে, তাকে তুমি কিছুতেই অবহেলা করতে পারবে না। সেদিন তুমি বুঝবে আমি তোমায় কত ভালোবাসি।...

প্রেয়সীর জন্যে যখন ত্রিভুবন লুণ্ঠন করবার ফন্দি নিয়ে ব্যস্ত আছি, ঠিক সেই সময় বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ বাধল। সঙ্গে-সঙ্গে আমার সমস্ত আশা-ভরসা ধূলিসাৎ করে আমার ফলাও ব্যবসা টলমল্ করতে লাগল। আমি ব্যাকুল হয়ে চারিদিকে ঝাঁপাই-ছুড়ে বেড়াতে লাগলুম। আমার তখনকার অবস্থা দেখে আত্মীয়বন্ধু সকলেই হায়-হায় করতে লাগল। কেবল কল্যাণী দেখলুম উদাস। কিছুমাত্র চাঞ্চল্য তার নেই। বড়-বড় টাকার থলিগুলো আমার বুকের সিন্দুক খালি করে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে লাগল, কল্যাণী তা শুধু চোখ দিয়ে দেখলে, কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করলে না। পাষাণী, পাষাণী সে!

কিন্তু কৈ, সে জন্যে ত কল্যাণীর উপর আমার কিছুমাত্র অভিমান হয়নি। বরং মনের গোপন-কোণায় যেন একটা স্বোয়াস্তির নিশ্বাস ধীরে-ধীরে বইতে লাগল;—এত দুঃখেও আমি যেন একটু আরাম পেতে লাগলুম। মনে হ'ল, তাইতেই যেন আমি বেঁচে গেলুম! নইলে কল্যাণী যদি সেই চলন্ত টাকার থলিগুলোর উপর হুমড়ি-খেয়ে বুক-দিয়ে পড়ে থাকত, তাহলে সে-টাকা আমি কিছুতেই ঘর থেকে বার

করতে পারতুম না। আমায় আত্মহত্যা করতে হত। কল্যাণীকে আমি রাণী করব —সিংহাসনে বসাব, এই ছিল আমার মনের কামনা, প্রাণ থাকতে আমি তাকে ভিখারিণী করতে পারতুম না। কিন্তু সে যখন রাণীর মতো মুক্ত হস্তে নিজের ঐশ্বর্য্য দু-হাতে ছড়িয়ে দিলে, তখন আমি সেই টাকার থলির কাছ থেকে সরে দাড়িয়ে বাঁচলুম! মনে হল, আমার কল্যাণী তো সত্যই রাণী। রাণী না হলে এমন দান-করবার শক্তি কার?

দেখতে-দেখতে দুদিনের মধ্যে আমার এতকালের সঞ্চিত এতবড় সম্পত্তি কর্পূরের মতো উবে গেল; বসত-বাড়ী পর্যান্ত বাঁধা পড়ল। রইল কেবল কল্যাণীর গায়ে আটপৌরে গয়না ক'খানি। আমি তখন প্রায় জীবন্মৃত। কল্যাণী অষ্টপ্রহর প্রাণান্ত সেবায় আমায় সঞ্জীবিত করে তুলতে লাগল। কল্যাণী যে আমার জীবনের কতখানি কল্যাণ, তা আমি এই সময় বুঝতে পারলুম। তাকে আমি কেবলই আঁকড়ে-আঁকড়ে ধরতে লাগলুম। এখন তার মুখে আর সে বিষাদের ছায়া নেই। ঠোঁটের হাসি দিয়ে, বুকের আনন্দ দিয়ে সে আমার শূন্যতা ভবে তুলতে লাগল। দেখতে-দেখতে আমি অনেকটা সোজা হয়ে উঠলুম। উঠেই দেখলুম কল্যাণীর গায়ের গয়না অনেকগুলি কমে গেছে। যদিও সব বুঝছি, তবু তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"কল্যাণী, তোমার গায়ের গয়না সব কি হ'ল?" সে বল্লে—"সেগুলো ব্যবহারে ক্ষয়ে যাচ্ছিল, তাই যাতে অক্ষয় হয়ে থাকে তার জন্যে বাঁধা রেখেছি।" আমি উঠে বসেছিলুম, এই কথা শুনে শুয়ে পড়লুম—কল্যাণীর কোলে মাথা রেখে। সে ধীরে আমার মাথায় হাত-বুলিয়ে দিতে [illegible] আমি তার চুলের গোছা নিয়ে ন[illegible] নাড়তে ঘুমিয়ে পড়লুম!

কল্যাণীর অক্লান্ত যত্নে আমি [illegible] উঠলুম। সঙ্গে-সঙ্গে অমনি চারিদিক [illegible] অভাবের কঙ্কাল-মূর্ত্তিগুলো আমার [illegible] সামনে দাঁড়িয়ে উঠল, বলে উঠল—যুদ্ধং[illegible]। চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, বন্ধুবান্ধব আ[illegible] স্বজন কেউ কোথাও নেই,—আমি এ[illegible] এমন সময় কানের পাশে কে যেন [illegible] উঠল—"ভয় কি!" ফিরে দেখি হাসি[illegible] কল্যাণী। কি আশ্চর্য্য, এই দুঃখের [illegible] এত হাসি সে পেলে কোথা থে[illegible] তাকে দেখে আমার বুক যেন দশহাত [illegible] উঠল। আমি তাকে কাছে টেনে [illegible] বল্লুম—"কল্যাণী, এই বিপদের দিনে [illegible] করব, তুমিই উপায় বলে দাও।" [illegible] কথায় কল্যাণীর সমস্ত মুখখানি একটি পবি[illegible] আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক[illegible] তাকে লাখ টাকা দামের একছড়া মুক্তো[illegible] মালা উপহার দেবার সময় এমনি-এ[illegible] আনন্দের হিল্লোল দেখবার আশা করে বি[illegible] হয়েছিলুম, সেই কথা আজ মনে পড়[illegible] তখন গর্ব্ব করে বলেছিলুম এক লাখে নী[illegible] দশ লাখে তোমার মুখে হাসি ফোটা[illegible] কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আজ বিনামূল্যে [illegible] অমূল্য হাসিটি কোথা থেকে এল? আ[illegible] আত্মহারা হয়ে কল্যাণীকে বুকের উ[illegible] চেপে ধরলুম।...

কল্যাণী না হলে এখন আর আমার এ[illegible] তিল চলে না। তার পরামর্শ ভিন্ন কাজ কর[illegible]

আমার এতটুকু সাহস হয়না। সে ভরসা না দিলে, আমি কিছুতেই ভরসা পাইনা। হতে পারে এ আমার কাপুরুষতা, কিন্তু কি করব? কাপুরুষ হওয়া ছাড়া আর আমার উপায় নেই দেখছি। কারণ, কল্যাণীর মতো এমন দরদী বন্ধু কোথায় পাব? কল্যাণীর বুদ্ধি এত যে একএকসময় আমার মনে হয়, ব্যবসায়ে দুচারবার যে ঠকেছি, সে সময় যদি নিজের বুদ্ধি না খাটিয়ে কল্যাণীর পরামর্শ নিতুম, তা হ'লে কখনোই আমায় ঠকতে হতনা। একথা কল্যাণীকে বলি। সে তা মানতে চায়না বটে, কিন্তু মনে-মনে খুসী হয়। খুসী-হওয়াটা আজকাল তার খুবই সহজ হয়ে উঠেচে দেখছি। তার জন্যে আমাকে এখন বেশী চেষ্টা করতে হয়না।

কিন্তু এতে আমার মনের তৃপ্তি নেই। আমার কল্যাণীকে যে এত সামান্য মূল্যে গ্রহণ করব, তা হবেনা। সে ত কাঙালিনী নয়, সে যে আমার রাণী! তাকে রাণীর মর্য্যাদা আমায় দিতেই হবে। তার জন্যে আমাকে আবার ধনরত্ন লুঠ্‌তে বেরুতে হবে। আমি যে তাকে কত ভালোবাসি, এ আমায় দেখাতেই হবে। সে যে বলে আমি তাকে ভালোবাসিনা, সে ভুল তার ভাংতে হবে।

অবাক কাণ্ড! জানিনা, কেমন-করে—কোন্ দৈবশক্তিতে—সে ভুল তার আপনিই ভেঙে গেছে। আমি একদিন দুপুরবেলা ঘরে একলাটি চুপ করে শুয়ে আছি, এমন সময় পাখার হাওয়ায় একখানা চিঠির কাগজ একেবারে আমার বুকের উপর উড়ে এসে পড়ল। তুলে দেখি, কল্যাণী তার সইকে চিঠি লিখেছে। পড়্‌তে-পড়্‌তে এক-জায়গায় আমার নিশ্বেস বন্ধ হয়ে এল। সে লিখেছে—"সই, আমার মতন পাপিষ্ঠা নেই। দেবতুল্য স্বামীকে আমি এতদিন মিছে দোষ দিয়ে এসেছি। যে-পাপমুখে তোকে বলেছিলুম তিনি আমায় ভালো-বাসেন না, সে-মুখ আগুন নুড়ো-দিয়ে পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে! আমি অবাগী যে এত ভাগ্যিমানী, তা কি জানতুম! এখন দেবতার পায়ে কেবলই মাথা কুট্‌ছি—এমন স্বামী যেন জন্মজন্মান্তরে পাই।"

আর আমার পড়া হলনা। একটা ব্যর্থতার বেদনায় আমার সমস্ত বুকখানা টনটনিয়ে উঠল। কল্যাণী আমার ভালো-বাসায় তৃপ্তি লাভ করেছে। কেমন করে করেছে জানিনা! কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি—ভালোবাসার সাধ আমার মেটেনি। শুধু একটুখানি হৃদয় দিয়ে কল্যাণীকে আমি তৃপ্ত করতে চাইনা, আমি তাকে প্রাচুর্য্য দিয়ে উচ্ছ্বসিত করে তুল্‌তে চাই। সে তৃপ্ত হয়েছে কিন্তু আমি তৃপ্ত হতে পারলুম কৈ? না, না, এ সামান্য তৃপ্তিতে তাকে ভুল্‌তে দিলে চলবে না!

এতদিন আমার ভয় ছিল ব্যবসার কথা তুল্লে কল্যাণী হয় ত আমার ভালোবাসা-হারাবার ভয়ে আবার মুসড়ে পড়বে, সেই জন্যে সে-কথা চেপেই রেখেছিলুম; কিন্তু আর চুপ করে থাকা চল্‌লনা, আমার সমস্ত হৃদয় কেঁদে-উঠে বল্‌তে লাগল—তোমার দেবী-পূজার আয়োজন কৈ—কোথায় তাঁর নৈবেদ্য? আমি কল্যাণীর মুখের উপর চোখ রেখে সজোরে বলে উঠলুম—"কল্যাণী

আগের মতন আবার আমায় ব্যবসায় মন-প্রাণ দিয়ে লাগতেই হবে।" কি আশ্চর্য্য, কল্যাণী খুসি হয়ে বল্লে—"বেশ ত।"

হতভাগ্য আমি, আর কি তেমন-করে ব্যবসায় সমস্ত মনপ্রাণ আহুতি দিতে পারবো? আমার ভালোবাসার কল্যাণীর অতৃপ্তিই এতদিন আমার উৎসাহের আগুনে ইন্ধন জুগিয়ে এসেছে—এখন কোন্ সম্বল নিয়ে বাণিজ্য করতে বেরুব?

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

পূজোর বাজারে কাজের কথা

(চিঠি)

সম্পাদকমশায়,

অনেকেই অনুযোগ করছেন 'ভারতী'র বীণার তারে 'কাজের কথা'র গম্ভীর সুর মোটেই বাজছে না;—বেচারী বেজায় মিইয়ে যাচ্ছে। তারা জোর কোরে বল্‌ছেন, কোমল করস্পর্শে আর চলবে না, এখন এমন দিন এসেছে যে লগুড়াঘাতে তার তারে-তারে এমন ঝন্‌ঝনা তুলতে হবে, যাতে দেশের অসাড় বুকগুলো কেঁপে ওঠে। কথাটা আমি মানি; কিন্তু লগুড়াঘাতটা বীণার তারের উপর হলে কাজের কি তেমন সুবিধে হবে? বীণার তার সরু, মিহি; আঙুলের স্পর্শেই তা কেঁপে উঠে ভেঙে পড়ে, লগুড়াঘাতে তা একদণ্ড টিঁকবে না, ঝন্‌ঝনা তেমন উঠবে না, রেশও বেশীক্ষণ চল্‌বে কি না সন্দেহ। কাজেই আমার মতে লগুড়াঘাতটা বীণার তারের উপর না হয়ে, যে বুক কাঁপানো দরকার, সেই বুকের উপর হলেই ভালো হয়। বিশেষত যখন দেখা যাচ্ছে শিক্ষা-ক্ষেত্রে আজকাল 'ডিরেক্ট মেথড' অর্থাৎ সোজাসুজি ব্যবস্থাটা বুদ্ধিমানেরা গ্রাহ্য করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। এই কাজের জন্য একদল বেশ ভালো গাঁট্টা-গোট্টা উৎসাহী কর্ম্মীর দরকার। এর একটা 'স্কিম্' আমি শীঘ্রই তৈরি করব, কেবল শক্ত, পাকা লগুড় কোথায় কত জন্মায় ও মরে, এবং বছরে কতগুলোকে ঘুণে ধরে, তার একটা নিখুঁত হিসেব ষ্টাটিস্‌টিক্স জানা কোনো সাহিত্যিক বন্ধুর কাছ থেকে আমাকে সংগ্রহ করে পাঠাবেন।

এই ত গেল প্রথম কথা। তারপর, পর-হিতার্থে লগুড়াঘাত করলে পুলিশ-আইনে যাতে গোলমাল না হয়, এমন-একটা ব্যবস্থার জন্য আপনার এই 'কাজের কথা'র স্তম্ভে মাসে-মাসে খুব জোরে লিখ্‌তে হবে। আমার বিশ্বাস, তাতে আপনি দেশের লোকের সহানুভূতি খুবই পাবেন এবং পরহিতার্থে প্রাণ বলি দিয়ে পরিণামে মহাপুরুষ হয়ে উঠতে পারবেন। এটাকে যদি আমরা সফল কোরে তুল্‌তে পারি, তাহ'লে এর থেকে কালেকে দেশে লগুড় চালানির একটা নতুন লাভের ব্যবসাও প্রতিষ্ঠা পেতে পারবে।

তাতে আমাদের কর্ত্ত লাভ ভেবেছেন কি? আপনার কাগজে অনেক বিজ্ঞাপন পাবেন। আমার মনে হয় এর একটা মস্ত 'ফিল্ড' পড়ে রয়েছে। তবে এস, এস উৎসাহী যুবকদল! দেখ, দেখ কত লগুড় তোমাদের জন্ম উদ্যত হয়ে রয়েছে! তবে এই পূজার ছুটিতে মিছা আনন্দ করে দিন কাটিয়ো না। সম্পাদকমশায়, আপনার এই 'কাজের কথা'র স্তম্ভ ভেঙে নৃসিংহদেবের মতন এই লগুড়কে যদি একবার বার করে আনতে পারেন, তাহ'লে হিরণ্যকশিপু—(কাজ নেই আর বেশী বোলে; সিদিশন্ হয়ে আসচে। সেই জন্ম গোড়াতে খুব জোরে বোলে শেষটা ইঙ্গিতে সেরে দিলুম।) এ যদি আপনি করতে পারেন, তাহ'লে দেশের মস্ত একটা কাজ হয়। তবে লেগে যান এই কাজে—আমি আপনার সহায় রইলুম।

এইবার অন্যান্য কাজের কথা পাড়া যাক।

এখনকার দিনে প্রধান কাজের কথা হচ্চে:—

বিষমিশ্রিত সরিষার তৈল।

সরিষার তেলে বিষ মিশেছে সবাই জানেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে দু-একটা কথা বলতে চাই। বিষ কি শুধু সরষের তেলেই মিশেছে? কোন্ জিনিষে বিষ মেশেনি? ভেবে দেখুন দেখি, আমাদের আহারে-বিহারে-ব্যবহারে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে-চরিত্রে, গানে-গল্পে-সাহিত্যে কোথায় বিষ নেই? তবে শুধু সরষের তেল নিয়ে চীৎকার করলে চলবে কেন? হাঁ, বলতে পারেন বটে যে, সর্ষপ তৈল নাকে দিয়ে নিদ্রা যাওয়াই যখন আমাদের প্রধান ব্যবসা, তখন সেখানে লোকসানটা আমাদের কিছুতেই সহ্য হয় না। বেশ কথা। কিন্তু আমি কি বলি জানেন? আমি বলি, যে মহাত্মা সর্ষপ তৈলে বিষ দিয়েছেন, তিনি আমাদের জাতীয় "সেভিয়র।" (সম্পাদকমশায়, ব্র্যাকেটে চুপিচুপি আপনাকে বাৎলে দিই কি করে সহজে প্রসিদ্ধিলাভ করা যায়:—সবাই যেটাকে মন্দ বলচে, চট-কোরে যদি সেটাকে ভালো বলে ফেলতে পারেন কিম্বা ভালোটাকে মন্দ, তাহলে দেখবেন অনেকেরই কর্ণ আকর্ষণ করবার অধিকার আপনি পেয়েছেন। সেইজন্যই ত আমি এই বিষ-ব্যাপারটাকে দূরবীণের উল্টো-পিঠ দিয়ে দেখাতে চাই।)

যিনি তেলে বিষ দিয়েছেন, তাঁকে আমি "সেভিয়ার" বলছি এই জন্যে যে তিনি আমাদের সর্ষপ তৈল নাকে দিয়ে সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে আমাদের জাগ্রত কোরে তুলেছেন। এই রকম কাজের লোকই তো এখন আমাদের দেশে চাই। এই মহাত্মার ছবি ও জীবনী অবিলম্বে কাগজে ছেপে বার করা উচিত। তাহলে দৃষ্টান্তে নিরুৎসাহী অকেজোর দল কাজে লাগবার চেতনা লাভ করবে। আমাদের জাতীয় জীবনে এ কি সামান্য ব্যাপার?—বিষের ঝাঁজে আমাদের ঘুম ছুটে গেছে। যে জাগরণের জন্য এতকাল ধরে আমরা চেঁচিয়ে গলা ভেঙেচি, লিখে-লিখে কলম ভোঁতা করেছি, সেই জাগরণ এবার এসেছে। কারণ জেগে উঠে আমরা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি—

দেশের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ!

চালের দাম বারো-চোদ্দ টাকা মণ উঠেছে। উপায় কি? তাই ত, উপায়

কি! আমি বলছি, এর উপায় ভেবে ঠিক করতে পারলে, দেশের একটা মস্ত কাজ হয়—এমন কি দেশের প্রাণরক্ষা করা হয়। আমার মতে সকলেরই এই বিষয়টা ভেবে দেখা উচিত এবং সেই অনুসারে কাজ করাও উচিত। কেবল ভাবলে যে কোনো ফল হবেনা, এ আমি অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করেছি। অতএব আমার সিদ্ধান্ত এই যে আপনারা সবাই ভাবুন এবং ভাবান এবং সেই অনুসারে কাজ করবার চেষ্টা করুন। তাহলেই এই মহা বিপদ থেকে অন্ত না হয় শত বর্ষ পরে নিশ্চয় উদ্ধার পাবেন। বি-পু-

কাপড়ের দাম কমে কিসে?

কাপড়ের কল-বসানো, হাতের তাঁত-বসানো, তুলোর চাষ-করা প্রভৃতি অনেক পরামর্শ অনেকেই দিয়েছেন কিন্তু তাতে এ-পর্য্যন্ত বিশেষ কোনো ফল হয়নি। গবর্মেন্টের কাছে কাতর আবেদন করে জোড়া-পিছু দু-চার আনা দাম কমেছে বটে, কিন্তু তাতে কি হবে? তা ছাড়া পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে যখন আমাদের চল্‌চেনা, তখন আমাদের নিজেদেরি সব কোরে নিতে হবে। কিন্তু কি করা যায়?

আমি ভেবে দেখলুম মহার্ঘ্য জিনিস কেনবার সামর্থ্য যখন আমাদের নেই, তখন সস্তা জিনিষ আমাদের কেনা উচিত। তাই এখন দরকার হচ্চে চারিদিকে এই অমূল্য বাণী প্রচার কোরে বেড়ানো—দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায়—খবরদার! মহার্ঘ্য জিনিষ কেউ কিনোনা, সস্তা জিনিষ কেনো।

এই প্রচার-কার্য্যটা যদি ভালো-কোরে আমরা চালাতে পারি, তাহলে শুধু কাপড় কেন, সব জিনিষের দুর্ম্মূল্যতার দুর্ভাবনা আমাদের কেটে যাবে তখন।

এগ্‌জামিনের ফি বৃদ্ধি

আমরা কেউ আপত্তি করার দরকার বোধ করবনা। কারণ এই সমস্ত 'কাজের কথা'র গুণে আমাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল হয়ে আসবে। তবে যদি বলেন, ফি বাড়ানো উচিত কি অনুচিত, সেটা তো বিচার কোরে দেখা দরকার? তাহ'লে আমি বলব নিশ্চয় দরকার! কিন্তু এই দরকার কথাটার ব্যবহারের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখবেন। এ দরকারটা এমন জায়গায় বসানো দরকার, যাতে এমন অর্থ হয় যে বিচারও দরকার, ফি-বাড়ানোও দরকার,—অর্থাৎ যখন যা দরকার তাই বোঝায়।

অন্ন, বস্ত্র এবং শিক্ষা

এই তিনটেই হচ্ছে দেশের প্রধান কাজের কথা। সেইজন্য এই তিন কথারই আলোচনা তাড়াতাড়ি সেরে নিলুম। আশা করি, এতে আপনার পাঠকবর্গ বিশেষ উপকৃত হবেন এবং মনে করবেন এই কাজের কথায় দেশের খুব-একটা কাজ হল। ইতি

নিবেদক

শ্রীকারৎকর্ম্মা বর্ম্মা।

কাজরী

১৬

* * *
** ** **

১৭

বছরখানেক পরে আজ এই ডায়েরি খুলে বসেছি। এই ক'টা মাস কোথা দিয়ে কেমন করে যে কেটে গেছে, কত সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, সোহাগ-আদর কলহ-কোলাহলের ছোট-বড় ঢেউ তুলে! তার মধ্যে আমার এই ডায়েরি—এই প্রিয়সখীর কথা একরকম ভুলেই বসেছিলুম।

এ আমার সখীই বটে! এর কাছে মনটাকে যেমন আগাগোড়া খুলে ধরতে পারি, এমন ত আর কারো কাছে পারিনি কোনদিন!

আমি এখন বাপের বাড়ীতে। এ মাসের গোড়ায় এসেছি। সাম্‌নে পুজো। তিনি গেছেন রাণীগঞ্জের ওদিকে, বড় ঠাকুরের সঙ্গে কোথায়, কোন্ এক কোলিয়ারি দেখতে। কোলিয়ারির কাজ করবেন। তাতে না কি অনেক লাভ,—তাই সব শিখতে-টিখতে গেছেন।

যাবার সময় ব'লে গেলেন, তুমি তোমাদের ওখানে এ ক'দিন ঘুরে এসোগে! আমিও ভেবেছিলুম, ওঁকে ছেড়ে এখানে বাপ-মার কাছেই মনটা টেঁকবে'খন,—তাছাড়া বাপের বাড়ীতে কতদিন যে আসিনি। উনি এখানে থাকলে ত আর আসা চলে না—কাজেই আর কি!

কিন্তু কৈ, কোথায় গেল এখানকার আগেকার সেই সহজ সরল আনন্দের ভাব-টুকু! কিছু ভালো লাগছে না ত! মার আদর, বাপের স্নেহ, ভাইবোনদের ভালবাসা চারিধার থেকে গঙ্গার স্নিগ্ধ ঢেউয়ের মতই আমার মনের উপর এসে পড়ছে, কিন্তু মন আমার জুড়ুচ্ছে না ত!

যাবার সময় বলে গেলেন, সাত-আট দিনের মধ্যেই আমি ফিরব, আর রোজ চিঠি লিখব। সাত-আট দিন ছেড়ে একমাসেরও উপর হল, তিনি গেছেন—সেই শ্রাবণ মাসের শেষে। গোড়ার দিকে চিঠি যা তবু দু' চারখানা পেয়েছিলুম, এখন একদম চুপ-চাপ। আমি রোজ চিঠি দিচ্ছি, কত মিনতি করে বলচি, একটি ছত্র শুধু লিখে জানাও, ওগো, তুমি কেমন আছ! তা কোথায় কি! মন কি চুপ করে থাকতে পারে! ভাগ্যে দিদির কাছ থেকে চিঠি পাই—যে তাঁরা ভালো আছেন। এই কালই দিদি চিঠি দিয়েছে, ওঁরা দুই ভাইয়ে নানান্ জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছেন—কোন্‌দিন রাণীগঞ্জ, কোন্‌দিন ঝেরিয়া, কোন্‌দিন অণ্ডাল, কোন্ দিন বা আসানসোল!

তাই ভাবি, বড়ঠাকুর ত চিঠি লেখবার সময় পান্—আর তাঁর এত কাজ কি যে একটু ফুরসৎ হয় না চিঠি দিতে! তিনি ত

জানেন, তাঁর খবরের জন্য প্রাণ আমার কতটা অস্থির হয়। তবে—!

চারিধারে আনন্দের আভাষ জেগে উঠেছে—জলে-স্থলে আকাশে-বাতাসে, সর্ব্বত্র! পথে-ঘাটে লতায়-পাতায় ফুলে-ফলে, আকাশের নীলে আগমনীর সাড়া পড়ে গেছে। ঐ যে আমাদের বাড়ীর পিছনে যে খোলার বাড়ীটা দেখা যায়, তাদের বৌটি যে ঐ একগলা ঘোমটা দিয়ে ময়লা কাপড় পরে ঘর দোরের কাজ নিঃশব্দে করে বেড়াত,—আজ দু'দিন দেখচি, তারও পরণে একখানি নতুন শাড়ী। তার যে কাজ-কর্ম্ম কলের পুতুলের মত সে করত, তাতে যেন আজ হাসির পরশ, প্রাণের পরশ এসে লেগেছে। কাজ করতে করতে, ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দুনিয়ার পানেও সে আজ ফিরে ফিরে চাইছে! জিজ্ঞাসা করেছিলুম—স্বামীটি বারোমাস বিদেশে পড়ে থাকে—ষষ্ঠীর দিন ঘরে আসবে। তার চোখের দৃষ্টিতে এমন আনন্দের জ্যোতি ফুটে উঠেছে! যে যেখানে আছে, কত আশার স্বপ্ন দেখচে, কত সুখের মালা গাঁথচে, আর আমি!

কাজ, কাজ! ওগো, পুরুষমানুষ বলে কি কাজের মধ্যে এমনি করেই সমস্ত মনকে ডুবিয়ে দিতে হয়! আর অত-বড় মনের দোরে মলিন মুখে কতটুকুর-ভিখারিণী নারী বসে আছে, মুখের পানে চেয়ে, এককণা প্রসন্ন দৃষ্টির প্রত্যাশায়—কাজের ভিড়ে মত্ত পুরুষ তার পানে একটি বারও ফিরে তাকাবার অবসর পাও না! এ'ও কি সম্ভব! আমরা ত শত কাজের মধ্যেও [illegible] চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়তে পারি না। ব্যথার মত, অসহ্য দুঃখের মত ওঁদের চিন্তা আমাদের মনের মধ্যে অহর্নিশি, সর্ব্বক্ষণই যে জেগে আছে!

পুজোর কাপড়-চোপড় কেনা হচ্ছে—বাবা-মা ঠিক করেছেন, পুজোর পরই রাঁচিতে বেড়াতে যাবেন। আমিও যাব, ঠিক হয়েছে। শাশুড়ীর মত পাওয়া গেছে। কিন্তু আমার পা সরতে চাচ্ছেনা। কাল একখানা চিঠি লিখেচি, রাণীগঞ্জে,—রাঁচি যাব,—কবে ফিরব, আবার কবে দেখা হবে, দেখা হবে কি না—এই সব, যা মাথায় এসেছে, তাই লিখে দিয়েচি—জবাবের জন্য শেষ মিনতি জানিয়েছি। দেখি, জবাব মেলে কি না।

১৮

ডাকওলা বাহিরে যেই 'চিঠি' বলে হাঁক দিলে, অমনি আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। ঠাকুরদেবতাকে মনে মনে প্রণাম করে বললুম, হে ঠাকুর যেন!·· প্রার্থনা ব্যর্থ হল না। চিঠি এসেছে! তাঁরই চিঠি।

তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে ফেললুম। মনটায় কে যেন কাঁটা ফুটিয়ে দিলে। মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। চারটি লাইন শুধু! কাজ-কর্ম্মে বড় ব্যস্ত। আমার রাঁচি যাওয়ায় অমত নেই। নিজেরা কবে ফিরবেন, তার কোন ঠিক নেই। তবে ভাল আছেন সব, ভাবনার কারণ নেই—ব্যস্! এইটুকু!

আজ ষষ্ঠী। মা বললে, নতুন কাপড় একখানা পর্‌গে যা। বিরক্তি ধরল। কার জন্যেই বা নতুন কাপড় পড়া!

পাড়ায় থেকে-থেকে বাজনা বেজে উঠচে। ছেলেমেয়েরা সব দল বেঁধে রঙ্-বেরঙের পোষাক পরে পথে যেন রঙের মেলা বসিয়ে দিয়েছে। আমি চুপ করে বন্দীর মত ঘর থেকে বাহিরের এই আনন্দ-মেলা দেখতে লাগলুম। বুড়ী ঘুন্টিদের সাজিয়ে-গুজিয়ে বেড়াতে পাঠালুম। তার পর নিজের মনের শূন্যতার মধ্যে ডুব দিলুম। এ শূন্যতার কি তল আছে গো! চোখের সামনে ঐ যে আনন্দের হরেক রকমের রঙ্ ফুটচে, নিভচে, কাণের কাছে বাজনার রোল মহা সোর-গোল বাধিয়ে তুলচে, মন আমার সে-সব থেকে দূরে-দূরে সরে সরে কোন্ অজানা কোলিয়ারির অফিসের চারিধারে ঘুরে বেড়াতে চায়! কি করছেন তিনি, কি করছেন সেখানে? কিসের কাজ, কিসের এমন আকর্ষণ, এমন মোহ গো যে, আমাকে দিনান্তে একটিবারও মনে পড়ে না—সপ্তাহান্তেও না—একখানি চিঠি লিখেও খবর নিতে চান না! চারিধারের এই বিপুল কোলাহলের মধ্যে মনে হল, আমি যেন এর মধ্যকার কেউ নই। একেবারে স্বতন্ত্র একটা ছায়ার মত ভেসে বেড়াচ্ছি! কি অপরাধ করেছি আমি, ওগো কি অপরাধ যে, আমার এমন কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে?

১৯

কাল বিজয়া দশমী গেছে। মনে বড় আশা ছিল, কাল রাত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা হবেই। ক'দিন ক্রমাগত ভগবানকে ডেকেচি। কাল পথে যতগুলি প্রতিমা দেখেছি, তাদের সব গুলিকে প্রণাম করে মনের বেদনা জানিয়েছি, প্রাণ ভরে শুধু একটি মাত্র প্রার্থনা শুনিয়েছি, দেখিয়ে দাও, তাঁকে এনে দাও মা! কৈ, ঠাকুর ত দয়া করলেন না! ঠাকুরের কি দয়া নেই তবে,—না, এ মাটীর ঠাকুর শুধু ভুয়ো? আর পারিনা। বাবা বলছিলেন, তাঁকে টেলিগ্রাম করবেন। চিঠি-পত্র দেয়না কেন!

মা বললে, সেদিন তত্ত্ব করতে লোক গেছল, বেয়ান বলে পাঠিয়েছেন, তারা সেখানে ভালই আছে,--কাজের ভিড়ে আসতে পারচে না; পূজোর পর আসবে সব।

ভেবেছিলুম, বিজয়া দশমীর রাত্রে তাঁর পায়ে প্রণামটি পৌছে দেবই। আর-বছর বিজয়ার দিনে শ্বশুরবাড়ীতে ছিলুম। সন্ধ্যার সময় গাড়ী করে সব ভাসান্ দেখতে বেরিয়েছিলুম। গাড়ীর মধ্যে ছিলুম আমি, দিদি, বুবুড়ি, আর ছিলেন তিনি। কি সে আমোদ হয়েছিল। গাড়ী বাড়ী ফিরতে দিদি প্রথমে নেমে গেল—তখন তাড়াতাড়ি বিজয়ার প্রথম প্রণামটি গাড়ীতে সবার অলক্ষ্যে তাঁকেই করেছিলুম, তিনি আদর করেছিলেন, সেও ভারী তাড়াতাড়িতে,—অথচ তার মধ্যে কতখানি গভীরতা ফুটে উঠেছিল! এবারকার বিজয়া দশমীর রাত্রিটা তেমনি দুঃখে কাটল!

একটা চিঠি লিখলুম। চারপাতা চিঠি। ভাষা দিয়ে কি মনের বেদনা প্রকাশ করা যায়! যাঁরা কবি, তাঁরাই শুধু তা পারেন—

"মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায়না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়—"

আমাদের এ শুধু ভাষার কুসুম নিয়ে খেলা বৈ ত না! কত কি লিখলুম—যা মনে এল,—কিন্তু কিছু কি জানাতে পারলুম

এ মনে যে গভীর বেদনা বোধ করছি, তার একটা কণাও ত তাবাব মুখে জানানো গেল না।

সন্ধ্যার পর মার কাছে বসেছিলুম, হঠাৎ বাবার সঙ্গে তিনি এসে হাজির! আমি চমকে উঠলুম। এ কি সত্য! নিজের চোখকে নিজেই প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারলুম না। অবাক হয়ে তাঁর পানে চেয়ে ছিলুম—বাবা, মা সামনে, অথচ তা হুঁসই ছিল না। হঠাৎ মার কথা কানে গেল,—মা বললে, "এসো বাবা—"

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। মাথায় ঘোমটা টেনে এককোণে সরে গেলুম। বিজয়ার নমস্কার-আশীর্ব্বাদ সারা হলে মা তাঁকে ঐ ঘরেই বসিয়ে চলে গেল। বাবা আগেই নেমে গেছলেন।

আমি তখনো কাঠ হয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে,—ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দুই চোখের আকুল দৃষ্টি নিয়ে আমি যেন সে কি অপূর্ব্ব সুধা পান করছিলুম। তিনি এধারে-ওধারে চেয়ে উঠে দোরটা ভেজিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি ঢিপ করে পায়ের কাছে প্রণাম করতেই আমায় দু' হাতে তিনি তুলে ধরলেন। বললেন, "কেমন আছ অণু?"

অভিমানে আমার সর্ব্বাঙ্গ ফেটে দুই চোখ ছাপিয়ে জল ঝরে পড়ল। সে কি কান্না! এমন কান্না কখনো কেঁদেছি বলে মনে পড়ে না। নিজেই অপ্রতিভ হলুম। সে কান্না কিছুতে আর থামাতে পারি না। তিনি বললেন, "ও কি, কাঁদছ কেন?" আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছিল। কাছেই একটা চেয়ার ছিল, আমি তাতে বসে পড়লুম। হঠাৎ মা এসে হাজির, হাতে জল-খাবারের থালা। তিনি টুক্ করে জানলার ধারে, একটু সরে দাঁড়িয়ে রইলেন, বাহিরের পানে চেয়ে। মা বললে, "একটু জল খাও। আজ রাত্রে এখানে থাকতে হবে, বাবা।"

সে কথায় না কি হাঁ কি বলবেন? আমি কাণ দুটো খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলুম—বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল। তিনি বললেন, "আজই সকালে এসেচি। আবার দু-তিন দিন পরেই যেতে হবে।"

মা বললে, "ঠিক-ঠাক হল কিছু?"

তিনি বললেন, "হাঁ, আমাকেই সেখানে থাকতে হবে। কাজ-কর্ম্ম নিজেদের না দেখলে নয়।"

মা বললে, "লেখাপড়া—?"

তিনি বললেন, "কি হবে মিছে ল পাশ করে, বলুন! আমি বরাবরই বলছি, পরের হাতে ব্যবসা ফেলে রাখলে কি সে ব্যবসা চলে কখনো। নিজে যদি দেখি, তা হলে দু' চার বছরে ওখান থেকে যা গুছোতে পারব, সারা জন্ম ধরে ওকালতি করলে তার সিকির সিকিও হবে না।"

মা বললে, "বেশ, যা ভাল বোঝ তাই কর, বাবা। তবে বারো মাস বিদেশে পড়ে থাকা—সহ্য হবে কি? আমরাও এখানে ভেবে মরব—"

তিনি হেসে বললেন, "পয়সা পেলে সব সহ্য করা যায়।"

মা বললে, "বেশ—তা আজ রাত্রে থাকবে তো?"

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। বইয়ে পড়েছি—সাজা পাবে কি খালাস মিলবে—এই ভাবনায় হাকিমের রায় শোনবার সময় কাঠগড়ার আসামী ভয়ঙ্কর এক অধীর প্রতীক্ষায় না কি চুপ করে থাকে। মনে হল, এ যেন ঠিক তারই মত। তিনি একটু চুপ করে রইলেন, তারপর একটা ঢোক গিলে বললেন, "আচ্ছা, কিন্তু কা'ল ভোরেই ছেড়ে দেবেন আমায়—ঢের জিনিষ-পত্র কেনার দরকার আছে, আর দেখা-শুনাও করতে হবে বিস্তর।"

মা বললে, "তা না হয় ভোরেই যেয়ো।"

ঠিক করে ছিলুম, খুব অভিমান করে থাকব—এত তাচ্ছল্য কি দোষে! এর শোধ নেবই। কিন্তু এমনি হাল্কা এই মনটা—পারলুম না ত! শুনলুম, স্থির হয়েছে, বড় ঠাকুর তাঁর এটর্ণির অফিস চালাবেন এইখানে—আর উনি কোলিয়ারির কাজ দেখবেন—সেই তপসীতেই থাকবেন। নিজে দেখবেন, পয়সাও তাতে অনেক রোজগার হবে! তাই হোক! পুরুষ মানুষ পয়সাটাই শুধু চিনেছে রে! আমার মনে হয়, ভগবান এসে একবার যদি বলেন, বর নিতে চাস্ কিছু? ত তাঁকে হাত জোড় করে বলি, দাও প্রভু, ঐ পুরুষমানুষদের পয়সার পাহাড়ে বসিয়ে দাও! ওরা পাগলের মত যেমন পয়সা-পয়সা করে ফেরে,—কোন দিকে কারোর পানে তাকাতে সময় পায় না, দেখি, তখন কি নিয়ে থাকে ওরা? হাঁ, আরো স্থির হয়েছে, আমি এইখানেই আপাতত থাকবো—তারপর তিনি গিয়ে সেখানে ভাল করে পাকা বাংলা তৈরি করাবেন—বাংলা তৈরি হলে আমাকে নিয়ে যাবেন।

কত ছবি যে আঁকলেন তিনি রাত্রে! সেখানে চারিধারে খোলা মাঠ,—ক্ষেতে সবুজ রঙের ঢেউ ছুটেছে—তারই মাঝে উঁচু টিলার উপর পরিপাটী নির্জ্জন বাংলাখানি—দিব্যি সাজানো-গোছানো—সেখানে কোন কোলাহল নেই—দুজনে থাকবো শুধু সে কত সুখ! তিনি কাজ-কর্ম্ম সেরে বাংলায় ফিরবেন—আমিও বিকেলে সেজে-গুজে তাঁর প্রতীক্ষায় বসে থাকবো। একখানি রিক্শ গাড়ী থাকবে, দুজনে সেই সবুজ ক্ষেতের মধ্যে কাঁকর-ফেলা রাঙা রাস্তা দিয়ে সেই মানুষ-ঠেলা রিক্শয় চড়ে বেড়াতে বেরুব—নির্জ্জন প্রকৃতির কোলে, ঠিক সেই রূপকথার রাজা আর রাণীর মত! ক্ষেতের ফাঁকে-ফাঁকে দূরে-দূরে চাষী-মজুরদের ছোট-ছোট কুঁড়ে ঘরগুলিতে কত প্রাণীর বাস—তারা দু'হাত তুলে সেলাম দেবে, প্রণাম দেবে, আদর নেবে! তাদের অসুখ হলে আমি গিয়ে খোঁজ নেব—তাদের ছেলে-মেয়েদের হাতে রঙিন খেল্‌না দেব, তাদের রোগের পথ্য জোগাব—সে এক মজার জীবন—নতুন রকমের জীবন-যাত্রা সুরু হবে!

শুনতে শুনতে আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে পড়ছিলুম। এ ছবি দেখলে অভিমান থাকে কখনো?

আমি বললুম, "ক'দিন এমন একলা ফেলে রাখবে? সত্যি, তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারচি না, এখানেও। নিয়ে চল।"

তিনি বললেন, "দু'-তিনটে মাস আর কষ্ট কর, লক্ষ্মী।"